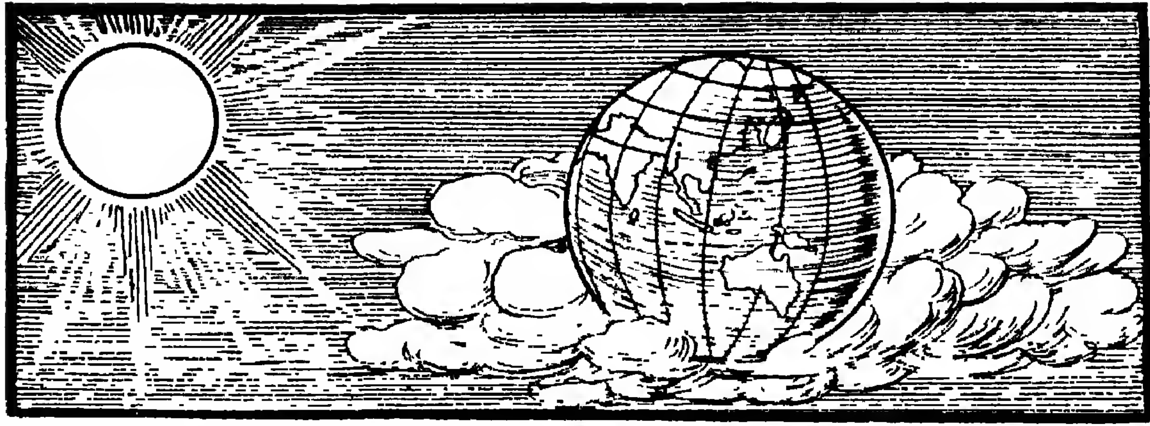
শিশু-ভারতী

[ছেলেদের বিশ্বকোষ]

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

বিষয়-বিভাগ

তৃতীয় খণ্ড, ১১ হইতে ১৫ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৮০১ হইতে ১২০০



এখানে সংক্ষিপ্তরূপে তৃতীয় খণ্ডের বিষয় বিন্যাস ও সূচীপত্র দেওয়া হইল। সমুদয় খণ্ড সম্পূর্ণ হইলে স্বতন্ত্ররূপে বিস্তারিত সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইবে।

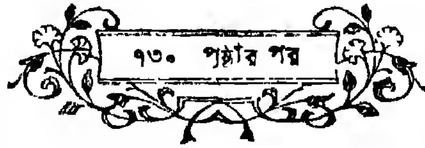
তৃতীয় খণ্ডের সূচীপত্র



শিল্প-কথা

ভারতের স্থাপত্য

(প্রাচীনকাল)



পৃথিবীর সব স্থানেই আদিম অধিবাসীরা পর্ব্বত-গুহায় বাস করিত। অশোকের বহু যুগ পূর্ব্বে লোকেরা পর্ণকুটীর কিংবা গুহায় যে বাস করিত, তাহা অনুমান করা যায়। বৌদ্ধযুগেও শ্রমণদের নির্জ্জন তপস্যার সুবিধা হইবে বলিয়া ভারতের নানা স্থানে বৌদ্ধ-সঙ্ঘের, পাহাড়ের গায়ে খোদাই করিয়া গুহা রচনা করিবার রীতি ছিল। বৌদ্ধেরা বর্ষার সময়ে তিন মাস লোকালয়ে বাহির হইতেন না, নির্জ্জনে থাকিতেন, এইরূপ তাঁহাদের রীতি ছিল। গুহা বলিতে আমরা পর্ব্বত-কন্দরের যে স্বাভাবিক গুহা বুঝি, এগুলি তাহা নয়। এগুলি গুহা-স্থাপত্য।— রীতিমত "প্ল্যান" বা নক্সা করিয়া তৈয়ারী।

অশোকের আমল হইতেই এইরূপ চৈত্য-গুহা ভজন-পূজনের জন্য প্রথম রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। গয়ার নিকটবর্ত্তী বরাবর গুহায় যে খোদিত লিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, অশোক রাজা আজীবক ব্রাহ্মণদের ভজন-পূজনের জন্য এই তিনটি গুহাই উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

গুহাগুলি প্রধানতঃ দুই শ্রেণীর—"চৈত্য" ও "বিহার"। চৈত্যগুহাগুলি ভজন-পূজনের, আর বিহারগুহাগুলি বৌদ্ধ উপাসকদের বাসের জন্য তৈয়ারী। বিহার গুহাগুলির সাম্‌নে অর্থাৎ বাইরের দিকে পাহাড়ের গায়ে সারি সারি থাম-দেওয়া বারান্দা। বারান্দাতে প্রবেশ করিলে সাম্‌নের দেওয়ালের মধ্যে একটা বড় দরজা, আর দুই পাশে ছোট ছোট দুইটি জানালা; আবার তাহারই দুধারে ছোট ছোট দুইটি দরজা। সাম্‌নের বড় প্রবেশ-দ্বার দিয়া প্রবেশ করিলেই একটি প্রকাণ্ড চারকোণা হলের মধ্যে আসিয়া পড়িতে হয়। সেই হলটির আবার চারি-পাশে দেওয়ালের সামন্তরাল ভাবে বিবিধ আলঙ্কারিক খোদিত থামের সার—তাহাতে হলের চারিধারে একটি স্বতন্ত্র বারান্দার মত দেখায়। কোনো কোনো বিহারে

হলের দক্ষিণের ও বামের দেয়ালের মধ্যে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বাসোপযোগী সারি সারি কতকগুলি প্রকোষ্ঠের সার। প্রধান প্রবেশ-দ্বার দিয়া 'হলে' প্রবেশ করিলেই ভিতরে দেওয়ালের মাঝে গর্ভগৃহে প্রকাণ্ড ধ্যানী বুদ্ধমূর্ত্তি বা স্তম্ভ। সব বিহার-গুহা প্রায় উল্লিখিতরূপে সাজাইয়া বিশেষ একটি প্ল্যানে তৈয়ারী। স্থাপত্য হিসাবে এগুলির খুবই মূল্য আছে। পৃথিবীতে পাহাড়ের গায়ে পাথর কাটিয়া এরূপ চমৎকার স্থাপত্য-কলা আর কোথাও দেখা যায় না। এই বৌদ্ধগুহা-স্থাপত্য ভারতের গৌরবের বস্তু।

চৈত্যগুহাগুলি খৃষ্টীয় গির্জ্জা বা চার্চ্চের কাজ করে এবং কতকটা তাহারই মত অর্দ্ধবৃত্তাকার খিলান-দেওয়া ঘর। এই ঘরের শেষভাগে থাকে একটি বিরাট্ স্তম্ভ। ডান ও বাঁ দিকে শ্রেণীবদ্ধ স্তম্ভ দেওয়া পরিক্রমা। ডিম্বাকার হলটি সারি সারি



লোমশ ঋষি—বরাবর গুহা

থাম দিয়া ঘেরা—সামনের দিকটা সোজা ভাবে দেওয়াল দেওয়া।

সুরগুজার অন্তর্গত মধ্যবিভাগে রামগড়ে "যোগীমারা," "সীতাবেঙ্গরা" গুহাগুলি স্বাভাবিক পাহাড়ের গহ্বরমাত্র এবং

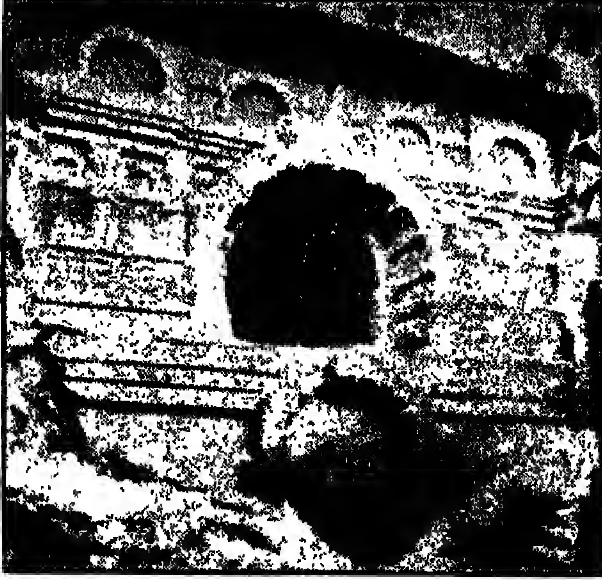


কার্লে গুহামন্দির

বাসোপযোগী করিবার জন্য অল্প-স্বল্প খোদাই-করা হইলেও বৌদ্ধ-গুহাগুলোর মত উন্নত মোটেই নয়। গয়া জেলার বরাবর গুহায় লোমশ ঋষির গুহার প্রবেশ-দ্বার দেখিলেই মনে হয়, যেন কাঠের খোদাই-করা কাজের নকলে তৈয়ারী। এরূপ পাথরের উপর কাঠের কাজের নমুনা প্রায় সব গুহাতেই অল্পবিস্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বম্বের বন্দরের নিকটবর্ত্তী 'সালসেট' দ্বীপে কেনারী গুহাটি প্রাচীন না হইলেও প্রায় অজন্তার পরবর্ত্তী যুগের বলিয়াই মনে হয়। কার্লে-নামক গুহা বম্বে ও পুণার মধ্যবর্ত্তী স্থানে অবস্থিত। ভারতবর্ষের সব চৈত্য-গুহা অপেক্ষা এইটি আকারে খুব বড় এবং প্রাচীন স্থাপত্যের উচ্চতম আদর্শ। শিলা-লিপি হইতে জানা যায় যে, মহারাজ 'ভূতি' বা 'দেবভূতির' দ্বারা খৃঃ পূঃ ৭৮ অব্দে এই গুহা তৈয়ারী হইয়াছিল। এই গুহার সামনে যে সিংহস্তম্ভটি আছে সেটি আবার

২৫০ খৃঃ পূঃ অব্দে স্থাপিত অশোকের স্তম্ভ। এই জন্য এই গুহার কাল নির্ণয় করা শক্ত। কার্লেরই ৪ মাইল উত্তরে "ভাজা" গুহাটি



নাসিকের গিরি-মন্দিরের সম্মুখভাগ

যে বম্বে অঞ্চলের সব গুহাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম গুহা, তাহা শিলালিপি পাঠেই



উদয়গিরির রাণী গুম্ফা

জানা যায়। কার্লের এগারো মাইল উত্তরে কয়েকটি চৈত্যগুহা আছে—সেগুলিকে "বেদশা" বলে। বেদশা-গুহার সামনে অশোকের স্তম্ভের অনুরূপ বড় বড় দুইটি স্তম্ভ আছে। নাসিক গুহাতে শিলালিপি যাহা আছে তাহাতে জানা যায় যে, অন্ধ্রবৃত্তরাজ কৃষ্ণ নাসিকের নগরবাসীদিগকে এই গুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আবার আর একটি প্রাচীনতম শিলালিপি পাঠে জানা যায় যে, এই গুহা সঙ্গযুগের ভদ্রকড়কারাজ কর্তৃক খোদিত হইয়াছিল। ইহা হইতে ঐতিহাসিকেরা এইটিকে কার্লের চেয়েও পুরাতন বলিয়া অনুমান করেন। রাজপুতানায় কচ ও উজ্জয়িনীর মাঝামাঝি "ধূমনারে" অনেকগুলি গুহা আছে। ধুমনারের কাছাকাছি কোলভীতে আরো কতকগুলি গুহা আছে। তবে এগুলি বেশী প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। তাহার মধ্যে অর্জুন-গৃহমন্দিরটি হিন্দুমন্দিরভাবাপন্ন একটি বৌদ্ধ চৈত্য।

বাঙলার শতপন্নি গুহাটিতে খৃঃ পূঃ ৫৪৩ অব্দে একটি বিরাট্ বৌদ্ধ সভা হয়। এই গুহাটি বুদ্ধের সমসাময়িক, কিন্তু স্থাপত্যের বাহুল্য ইহাতে নাই। একটি

মাত্র ৩৩ ফুট ৯ ইঞ্চি লম্বা ও ১৭ ফুট চওড়া চৌকোণা বিহার গুহা। উড়িষ্যার প্রাচীন উদয়গিরি, খণ্ডগিরি গুহাগুলি দশম ও একাদশ শতাব্দীতে জৈনদের দখলে গিয়াছিল। খণ্ডগিরিশিখরে অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী যুগের একটি জৈনমন্দির আছে।

:বম্বের নিকটবর্ত্তী একটি দ্বীপে "হস্তিগুম্ফা" খোদিত আছে। তাহার শিলালিপি হইতে জানা যায়, গুহাটি কলিঙ্গরাজ অহির ২৪



বুদ্ধের সম্মুখে মা ও ছেলে

বৎসর রাজত্ব করার পর নির্ম্মাণ করেন এবং তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি পরে অসংখ্য প্রকার দানধ্যানে রত ছিলেন। হস্তিগুম্ফার দেবদেবীর ছবি দেখিয়া জানা যায় যে, গুহাটি কোনো হিন্দু রাজাই তৈয়ারী করিয়াছিলেন।

উদয়গিরির 'রাজারাণী' ও 'গণেশ' গুহা ছাড়াও 'ব্যাঘ্রমুখী' বলিযাএকটি গুহা আছে। এটিকেও খুব প্রাচীন গুহা বলিয়া মনে হয়। গুহার সম্মুখ ভাগ দেখিতে বাঘের মুখের মত।

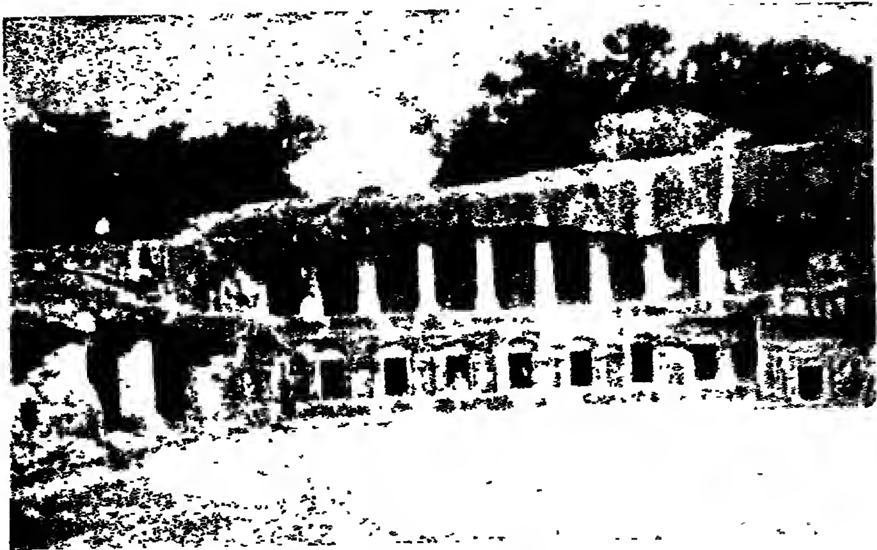


গুহায় চিত্রিত স্তাবক—অজন্তা

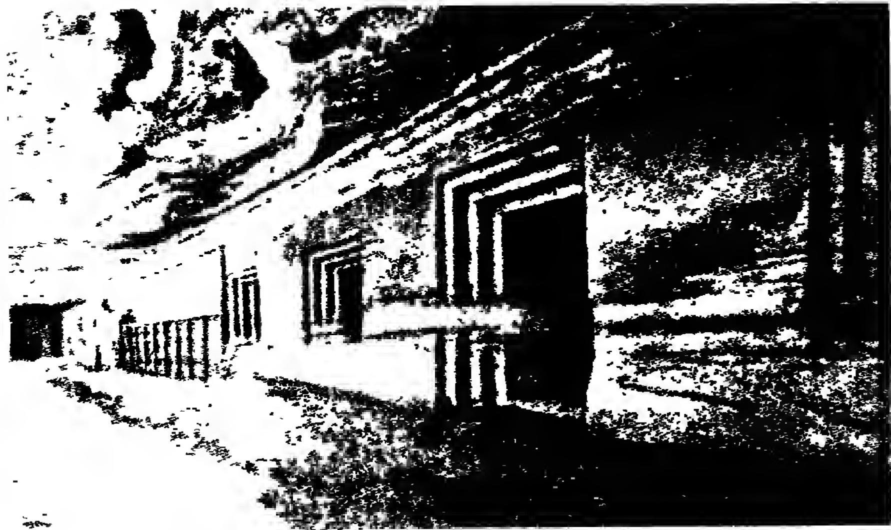


মা ও ছেলে—অজন্তা

নাসিক ও পুনার মাঝামাঝি স্থান জুনীরে



রাণী কা নূর গুহা—দক্ষিণপূর্ব্ব—কটক



বাগ গুহা ৪নং ও ৫নং



ভাজা গুহা



উদয়গিরি পর্ব্বতের বাঘ গুহা



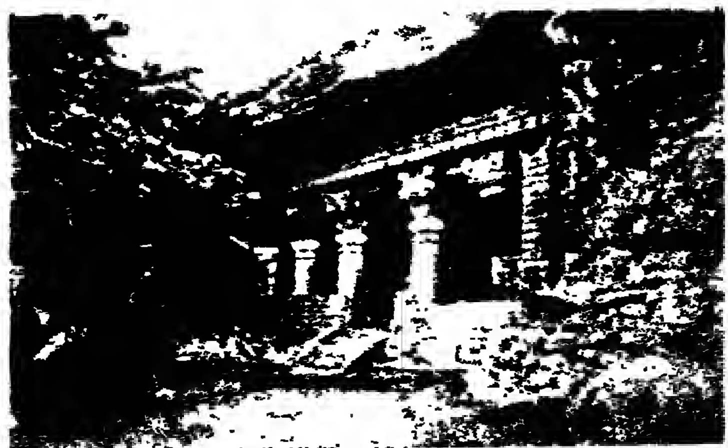
ব্রহ্মনিকল গুহা—এলিফেণ্টা



মহারাজা বা দরবার গুহা—কেনেরী



গণেশ গুহা—কটক

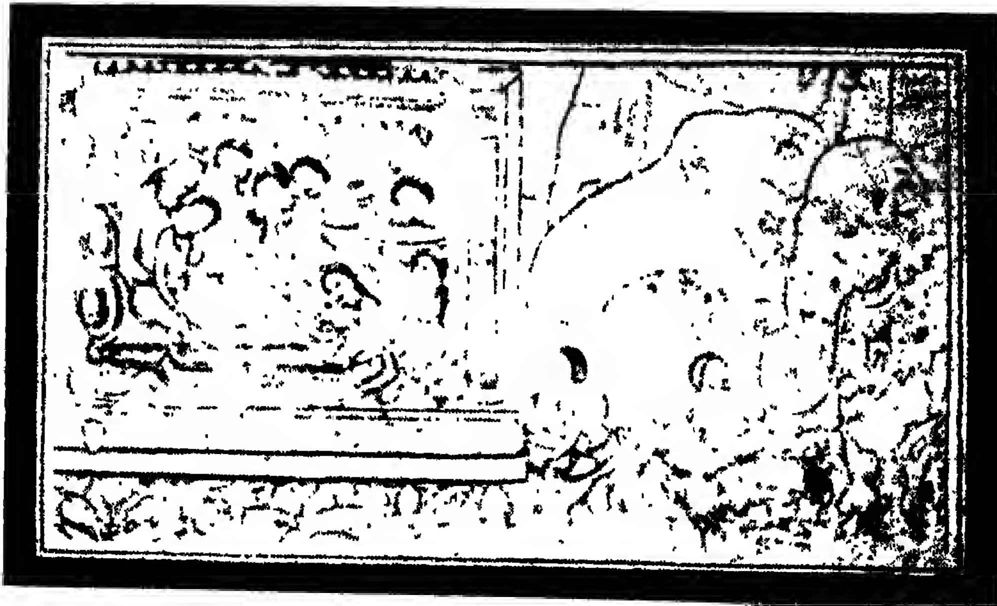


গৌতমিপুরা বিহার গুহা

কতকগুলি গুহা আছে—তাহার মধ্যে একটি ২৫ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া গোল গুহা আছে। আওরাঙ্গাবাদের কাছে আরো অনেক গুহার কথা শোনা যায়। আওরাঙ্গাবাদের নিকট-



গুহা-প্রাচীরের আলঙ্কারিক চিত্র—অজন্তা

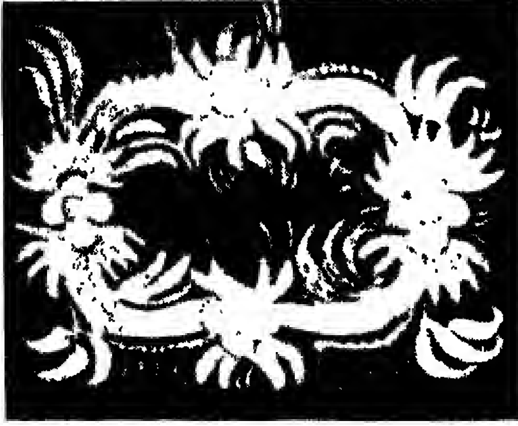


গুহা-গাত্রে চিত্রিত বুদ্ধ-জন্ম—অজন্তা

তাহাতে একসার গোলভাবে সাজান স্তম্ভ আর তাহার ঠিক্ মাঝখানে একটি স্তূপ। বর্ত্তী ইলোরা-গুহাগুলিতে বৌদ্ধ, শৈব, জৈন ও হিন্দুদের নানাবিধ গুহা দেখা যায়। খৃঃ

পূঃ ৭৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ২৫০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যে স্থাপত্যের মধ্যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল, কতকগুলি যে গুহা দেখা যায়, সেগুলি খৃঃ পূঃ প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীর বলিয়া কথিত

অজন্তা গুহার ছাদের আলঙ্কারিক চিত্র



চিত্র—১



চিত্র—২



চিত্র—৩



চিত্র—৪

এই গুহাগুলিতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। এ গুহাগুলির বহির্ভাগও মন্দিরের মত করিয়া কাটিয়া পাহাড়ের কোল হইতে বাহির করা হইয়াছে। এগুলি গুহা-স্থাপত্যের চূড়ান্ত আদর্শ। অজন্তা গুহাগুলি সবই বৌদ্ধযুগের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। অজন্তার দেড়শত মাইল উত্তর-পশ্চিমে গোয়ালিয়র রাজ্যে বাগগিরিগুহাগুলিও বৌদ্ধ আমলের কীর্ত্তি। খান্দেশ, পাতালখোরা, কোলাবা প্রদেশে আরো আছে। লঙ্কাদ্বীপের উত্তর ও মধ্য প্রদেশে দুইটি চিত্রকলাশোভিত গুহা বেলসাহেব আবিষ্কার করিয়াছেন। এই দুটিতে স্থাপত্য-কলার গৌরব করিবার কিছু নাই। এই দুটি পাহাড়ের গায়ের স্বাভাবিক গুহামাত্র।

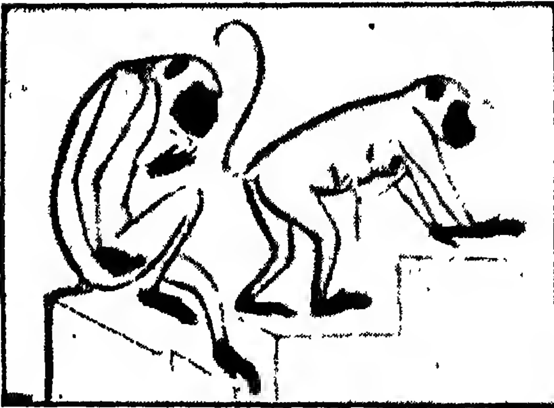
অনেকে বলেন, আমাদের দেশে প্রাচীন স্থাপত্যে খিলান বা গম্বুজের চলন ছিল না—যাহা দেখিতে পাই তাহা মুঘল আমলেই পারস্য বা তুর্কিস্থান হইতে আমদানী। হ্যাভেল সাহেব তাঁহার লিখিত ভারতীয়

স্থাপত্যকলা বিষয়ক পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, তাজমহলের গম্বুজটি পারস্য দেশ হইতে ধার করার প্রয়োজন হয় নাই ; কেননা, যবদ্বীপে চাঁদিসেওয়ার হিন্দুমন্দিরের গঠনও



গুহায় চিত্রিত ডালশুদ্ধ আমের থোলো

কতকটা ঐরূপ। চাঁদিসেওয়ার প্ল্যানের সঙ্গেও তাজের প্ল্যানের হুবহু মিল থাকিলেও



গুহায় চিত্রিত বানর—অজন্তা

উভয়ের মধ্যে বেশ একটা সামঞ্জস্য দেখা যায়। তাহাছাড়া তাঞ্জোর প্রভৃতি দক্ষিণের অনেক প্রাচীন হিন্দুমন্দিরের গম্বুজের সঙ্গে তাজের গম্বুজের মিল আছে। কানিংহাম সাহেব বলেন যে, খৃষ্টশতাব্দীর পূর্ব্বেও হিন্দুরা আসল খিলান রচনা করিতে জানিতেন এবং তাহার প্রমাণ, কানপুর জেলার কুষাণ যুগের রচিত প্রাচীন ভিতরগাঁও মন্দির এবং বিজয়নগরের প্রাচীন পাথরের তোরণদ্বার দেখিলেই জানিতে পারা যায়।

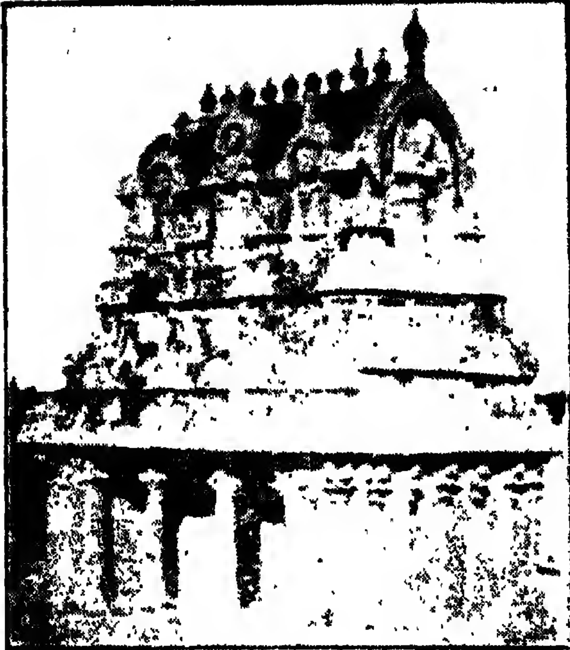
মৌর্য্য রাজ্যের অবসানের পর খৃঃ পূঃ



মাতা ও পুত্র—অজন্তা

দ্বাদশ শতাব্দী অর্থাৎ সঙ্ঘরাজ্যের শেষ পর্য্যন্ত অশোকের আমলের চলিত স্থাপত্যেরই উৎকর্ষ দৃষ্ট হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে দক্ষিণ গুজরাটে এবং কঙ্কনে যখন ইন্দ্রদত্ত এবং মগধে যখন স্কন্দগুপ্ত রাজত্ব করিতেন, তখনও ভারতের স্থাপত্য প্রাচীনভাবাপন্নই ছিল। তবে এখন

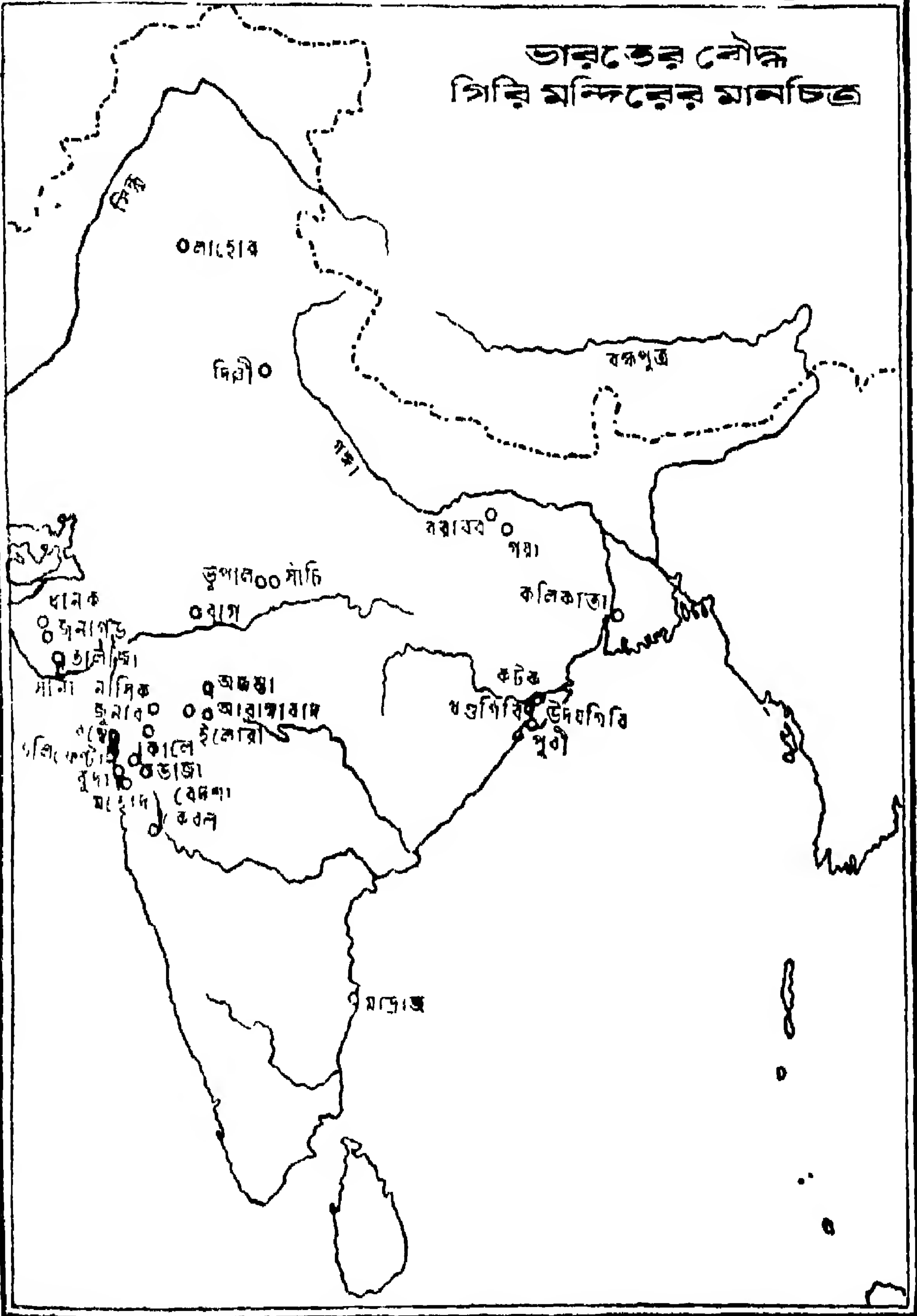
কোন প্রাচীন কীর্ত্তিটি ঠিক্ কোন্ সময়ের, তাহা নির্ণয় করা যায় না। মৌর্য্য-সঙ্ঘযুগের বৌদ্ধ চৈত্যগুহামন্দিরগুলির প্রবেশ-দ্বারের উপর খিলান আছে এবং চৈত্যগুহার ভিতরটা দেখিলে বাঙ্‌লা দেশের আটচালার কথা মনে হয়। খোড়ো চালা-ঘরই যেন এই সব গুহায় ক্রমপরিণতিতে পাথরের এক বিশেষ আকার বা মূর্ত্তি লইয়াছে বলিয়া মনে হয়। পরবর্ত্তী যুগের পুরীর ভুবনেশ্বর বা কোনার্কের সূর্য্যমন্দির প্রভৃতি বাঙ্‌লা দেশের নিকটবর্ত্তী হইলেও বৌদ্ধ চৈত্যগুহার মত বা বাঙ্‌লা দেশের



গণেশরথ মন্দির—মহাবালিপুরম্

চালাঘরের ধরণের একেবারেই নয়। দাক্ষিণাত্যের এবং পুরীর মন্দিরগুলি কতকটা পুরাকালের রাজাদের মাথার মুকুটের মত ছাঁদে গড়া। এইরূপ মন্দির-গুলির মধ্যে দাক্ষিণাত্যের মাদুরা, মহা-বলিপুরম্, তাঞ্জোর, কাঞ্চি, মহীশূরের সোমনাথপুর প্রভৃতি ও লঙ্কার অনুরাধাপুর ও পেলানারওয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

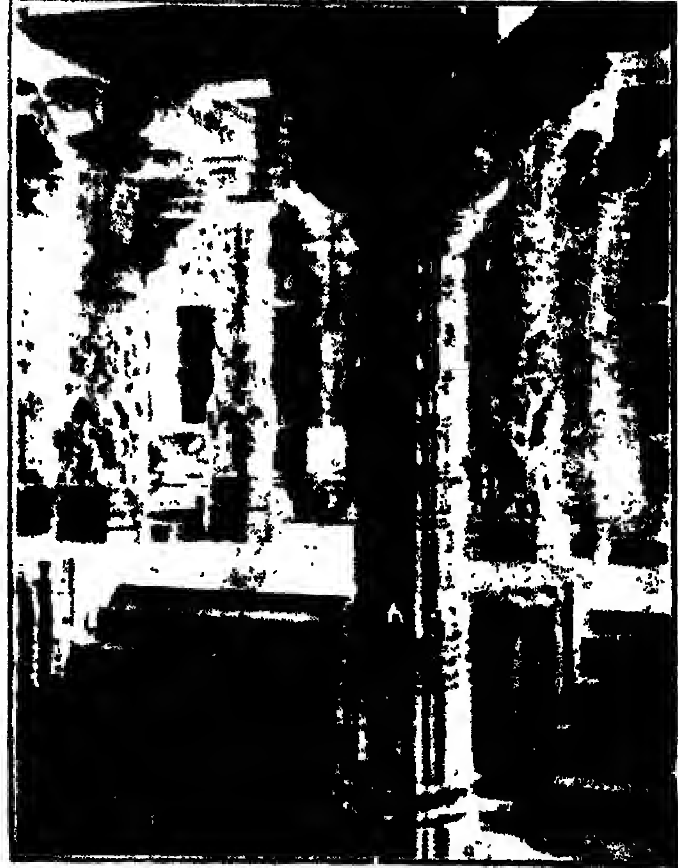
অশোকের আমলের ঠিক পরবর্ত্তী যুগের বা সমসাময়িক হিন্দুমন্দিরের বড় একটা পরিচয় কোথাও পাওয়া যায় না। একমাত্র রামনগরের অহিচ্ছত্র মন্দিরটি খৃঃ পূঃ ১ম শতাব্দী কিম্বা খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর বলিয়া অনুমান করা হয়। এই মন্দিরটির দেয়ালে মাটির পোড়ানো ইটের শিবের বিষয়ে অনেক মূর্ত্তি শোভিত আছে। এটি ভুবনেশ্বর প্রভৃতি মন্দিরের ধরণে তৈয়ারী। ছত্রপুররাজ্যে বুন্দেলখণ্ডে খাজুরাহোতে অনেক ভাস্কর্য্য-শোভিত মন্দির দেখা যায়। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে চান্দেলরাজের দ্বারা এইসব মন্দির গঠিত হয়। এগুলি উত্তর ভারতের (আর্য্যা-বর্ত্তের) বিশেষ একটি ধরণে গঠিত এবং কারু-কার্য্য শোভিত। রাজপুতানায়, মধ্য ভারতে অনেক সূর্য্যমন্দির ও দেবদেবীর প্রাচীন মন্দির নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে। উত্তর ভারতেও অনেক পাথরের ও ইটের তৈয়ারী প্রাচীন মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। কানপুরের ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরটি প্রাচীন-তম। অন্য আর একটি প্রাচীন মন্দির আছে—সেটি কাশ্মীররাজ্যের মধ্যে অবস্থিত। ইটের ও পাথরের উপর কারুকার্য্যের নমুনা এই সব প্রাচীন মন্দিরে যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। পরবর্ত্তী যুগে এই সব প্রদেশে মুসলমানের অধিকারের সঙ্গে সঙ্গেই এইরূপ পোড়ামাটীর কাজ একপ্রকার উঠিয়া গিয়াছে। কিন্তু বাঙ্‌লাদেশে শতবৎসর পূর্ব্বে —কোম্পানীর আমলের পরও কিছুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ কাজ মন্দিরের গায়ে তৈয়ারী করার রীতি ছিল। এখন আর এরূপ কাজ বড় একটা দেখা যায় না। বাঙ্‌লা দেশের মন্দিরগুলি খোড়োচালার মত। ছাদের কার্ণিশগুলি চার কোণের দিকে ঢালু করিয়া তৈয়ারী করা হয়; ঠিক্ এইরূপ ধরণের স্থাপত্য অপর কোনো প্রদেশেই প্রচলিত নাই। এইজন্য বিশেষভাবে ইহাকে বাঙ্‌লার


ভারতের বৌদ্ধ
গিরি মন্দিরের মানচিত্র
সিন্ধু
লাহোর
দিল্লী
ব্রহ্মপুত্র
গঙ্গা
বরাবর
গয়া
ভুপাল
সাঁচি
বাগ
কলিকাতা
জুনাগড়
নাসিক
অজন্তা
আরঙ্গাবাদ
ইলোরা
কার্লে
ভাজা
বেদসা
কটক
খণ্ডগিরি
উদয়গিরি
পুরী
মাদ্রাজ

ধরণ বলা হয়। বিষ্ণুপুর, গৌড় পাণ্ডুয়া, বড়নগর প্রভৃতি স্থানে এইরূপ বাঙলার বিশেষ স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ দেখিতে পাওয়া যায়।

গুজরাটের অন্তর্গত অনেক জৈনমন্দির দেখা যায়। সেগুলি ঠিক্ প্রাচীন আর্য্যাবর্ত্তের ধরণের নয় এবং খুব বেশী কারুকার্য্যে শোভিত হইলেও কোনার্ক, ভুবনেশ্বর প্রভৃতির মত উচুদরের স্থাপত্য বলিয়া মনে হয় না। আবু পাহাড়ে এইরূপ শ্বেতপাথরের দুটি জৈন মন্দির আছে। সে দুটির ছাদের নীচের এবং স্তম্ভের কারুকার্য্য বিশেষ সূক্ষ্ম বলিয়া মনে হয় এবং এই মন্দির ভারতের স্থাপত্যের গৌরবস্বরূপ। গুজরাটে বিখ্যাত গিরনার পর্ব্বতে নেমিনাথের মন্দির, তেজপালের মন্দির এবং সুলতান মামুদ কর্ত্তৃক বিনষ্ট প্রাচীন সোমনাথের শৈব মন্দির বিরাজ করিত। বাঙলা দেশের রাজমহলের উত্তরে পরেশনাথ মন্দিরের পরিচয় অনেকেই জানেন। তাছাড়া গোয়ালিয়ারের জৈনমন্দিরটি আর তার ১৫০ মাইল দক্ষিণ-পূর্ব্বে চান্দেল রাজের প্রাচীন রাজধানী খাজুরাহোর জৈনমন্দির বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

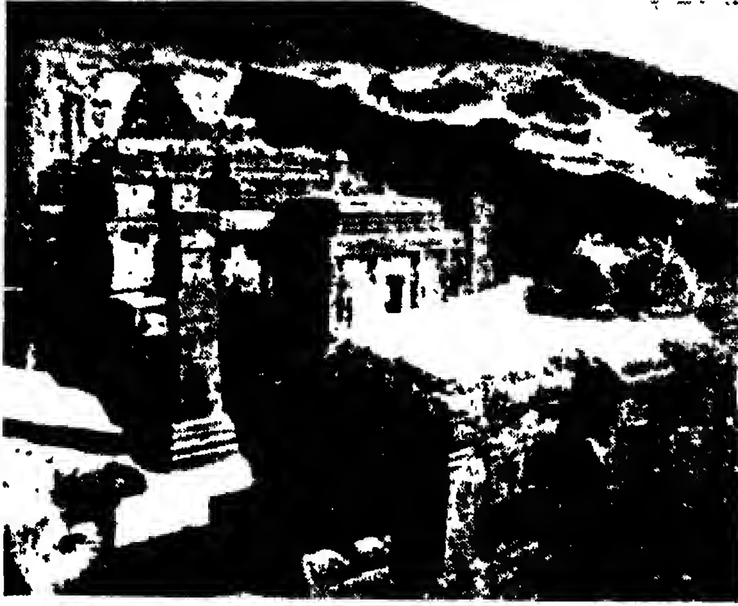
দাক্ষিণাত্যের বিশেষ ধরণের মন্দিরগুলির মধ্যে মহাবলীপুরমের পাহাড় কাটিয়া খুদিয়া বাহির করা সাতটি ধর্ম্মরাজের রথ আছে। সেগুলি মহারাজ নরসিংহ বর্ম্মা যিনি দ্বিতীয় পুলকেশীকে যুদ্ধে হারাইয়াছিলেন, তাঁহারই তৈয়ারী বলিয়া কথিত আছে। নরসিংহের প্রপৌত্রের কীর্ত্তি কাঞ্চি প্রদেশে কৈলাসনাথ ও বৈকুণ্ঠ পরিমল নামক দুইটি খুব বড় মন্দির আছে। পরবর্ত্তী যুগে চোলরাজা রাজেন্দ্র কর্ত্তৃক তাঞ্জোরের বিরাট্ মন্দির রচিত হয়। রামেশ্বরম্, তিনাভেল্লি ও মাদুরার মন্দির সমসাময়িক যুগের তৈয়ারী। তিরুমল নায়ক রচিত মাদুরার মন্দিরটি ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের বলিয়া অনুমান করা হয়। দ্রাবিড়ের মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীনতম অনেকগুলি মন্দির ও ইলোরার কৈলাস মন্দিরটি রাষ্ট্রকূটরাজের দ্বারা তৈয়ারী হইয়াছিল। বিজয়নগরের সংখ্যাতীত ভগ্নাবশেষের মধ্যে দ্রাবিড়ীয় সভ্যতার যুগের বাসভবনের ছোট ছোট সুন্দর সুন্দর প্রাচীন স্থাপত্যের নিদর্শনও যথেষ্ট পাওয়া যায়। একটি ছোট পাথরের সভামন্দির আছে—সেটিকে দেখিতে বাঙলাদেশের



আবু পাহাড়ের জৈন মন্দির

দোচালা ঘরের মত বলিয়া কতকটা মনে হয়।

কাশ্মীরী প্রাচীন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ-গুলিতে যেরূপ খিলান ও থাম দেখিতে পাওয়া যায় সেগুলি ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্যের সঙ্গে মেলে না। সেগুলি পারস্য বা গ্রীসের স্থাপত্যের মত দেখিতে। পাঁচ-মিশালী হওয়ায় স্থাপত্যের সৌন্দর্য্য বা প্রাণ তাহাতে নাই। এসবগুলি দেখিলে গান্ধারে গ্রীক্-প্রভাব জানিতে পারা যায়।



ইলোরার কৈলাস মন্দির

কাশ্মীরের কয়েকটী উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের বিষয় এবার আবার বলিব। পান্দ্রেথানের গ্রীক্‌ভাবাপন্ন মন্দির, লোদুভের ভগ্ন মন্দির, অবন্তিসভামির প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষ, নরেস্‌স্থান ও মার্ত্তণ্ড মন্দির, পরিহাসপুরের স্তূপের ভগ্না-বশেষ, ভেবনাগের ঝরণার বাঁধানো হর্ম্ম্যাবলী ও পাটানের মন্দিরগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বুনীরে একটি ছোট্ট মন্দির আছে এবং মানসবল সরোবরে একটি সিঁদুরের কৌটোর মত দেখিতে প্রাচীন মন্দির আছে—সেটি, যেন একটা পিরামিডের মাথায় আর একটা পিরামিড্ চাপানো এই ভাবে গড়া।

ভারতের স্থাপত্য, ভারতবর্ষ ছাড়াইয়া, শ্যাম, কম্বোজ যব-দ্বীপে কিভাবে যে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল তাহার ইতিহাস এখনো প্রাচীন হিন্দুকীর্ত্তি-গুলি হইতে জানা যায়। আমরা তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের প্রাচীন স্থাপত্য-কীর্ত্তির সামান্য পরিচয় মাত্র দিলাম।



পৃথিবীর ইতিহাস—এলাম


১৭৬ পৃষ্ঠার পর

ব্যাবিলন ও আসিরিয়ার ইতিহাস আলোচনা করিবার সময় আমরা এলামরাজ্যের সঙ্গে খানিকটা পরিচিত হইয়াছি। প্রকৃতপক্ষে এই তিনটি রাজ্যের ইতিহাস অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পরের সহিত জড়িত। কোন একটিকে বুঝিতে হইলে অপর দুইটির বিষয় জানা দরকার। ইহাদের সভ্যতাও অনেকটা একই ধরণের।

ভৌগলিক অবস্থান

এলামদেশ ব্যাবিলনিয়ার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। উত্তরে জ্যাগ্রস পর্ব্বতাবলী ইহাকে মিডিয়া (Media) হইতে পৃথক্ করিয়াছে। দক্ষিণে ইহা পারস্যোপসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার পূর্ব্বসীমানা কিন্তু আমাদের নিশ্চিতভাবে জানা নাই। এই দেশের প্রধান সহর ও রাজধানী ছিল সুসা অথবা সুসান। আজকাল প্যারিস্ যেমন ফরাসী-দেশের কেন্দ্রস্থান, পুরাকালে সুসাও সেইরূপ এলাম-সভ্যতার পীঠস্থান ছিল। ইহাকেই ঘিরিয়া এলাম-রাজ্য ও সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল। সুসার প্রধান দেবতা সুসিনাক ছিল সমগ্র এলামদেশের জাতীয় দেবতা। সুতরাং ইহার মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি করা এলাম-রাজাদের প্রধান কাজ ছিল। ইহা অনুমান করা মোটেই ভুল হইবে না যে, অজানা সহর ও ক্ষুদ্র-রাজ্যের পরাভবের ফলেই এলামরাজ্যের পত্তন হয়। এলামরাজ্যকে দেশীয় ভাষায় আন্সান (Anshan) রাজ্য কথিত হইয়া থাকে।

এলামের সভ্যতার ব্যাবিলনিয়ার সভ্যতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। এলামের ধর্ম্ম ও শিল্প অনেকাংশে ব্যাবিলনের নিকট ঋণী বলিয়া অনুমিত হয় যদিও অতি প্রাচীনকালে এলামের লিপি ও ভাষা ব্যাবিলনীয় লিপি ও ভাষা হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন ছিল। ঐতিহাসিককালে কিন্তু এলামীয়েরা ব্যাবিলনীয় ভাষা ও লিপির ব্যবহার করিত। ইহা সত্ত্বেও তাহারা কোন্ জাতীয় লোক ছিল; তাহা অনুমান করা কঠিন।

অধিবাসী

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, এলামীয়েরা সেমিটিক অথবা আর্য্যবংশোদ্ভূত ছিল না। ঐতিহাসিক হলের (H. R Hall) মতে তাহারা ছিল সুমেরিয়ান্। সে যাহাই হউক, পরবর্ত্তিকালে কিন্তু নানাজাতীয় লোক আসিয়া ইহাদের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছিল।

প্রাচীন ইতিহাস
ব্যাবিলনিয়ার আধিপত্য

অতিপ্রাচীনকালে এলামের রাজারা ব্যাবিলনিয়ার প্রভুত্ব স্বীকার করিতেন। তাঁহাদের উপাধি ছিল প্যাটেসি। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল উর-ইলিম। ব্যাবিলনের ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সার্গন ও নারমসিনের আধিপত্য এলামরাজ্য পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তারপর কিসের (Kish) রাজা উরুমুশও (Urumush) এলাম জয় করিয়াছিলেন। এমন কি, ডার-ইলুর (Dur-ilu) শাসনকর্ত্তা মুতাবিল (Mutabil) ও লাগসের প্যাটেসি গুডিয়া পর্য্যন্ত

এলাম বিজয়ের গৌরব দাবী করিয়াছেন। তবে উরের (Ur) রাজাদের প্রাধান্য এলামে যে অনেকদিন পর্য্যন্ত টিকিয়াছিল, সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ডুঙ্গি ও তাঁহার উত্তরাধিকারী বুরসিন, গিমিলসিন ও ইবিসিন সুসায় যে-সব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার চিহ্ন আজও বর্ত্তমান আছে। এই সময়কার এলামের প্যাটেসিদের নাম কারিবু-সা সুসিনাক্ (Karibu-Sha-Shushinak), খুট্রান্-তেপ্তি (Khutran-tepti), ইদাদু (Idadu), রুখুরাতির (Rukhuratir), বেলি-আরুগল্ (Beli-arugal), উরুকিয়াম ইত্যাদি।

ইহার পরবর্ত্তী যুগে রাজনৈতিক অবস্থার সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন দেখা যায়। খুতুর নান্‌খুন্তি নামে এলামের এক রাজা ব্যাবিলনিয়া জয় করিয়া ইরেক রাজ্যের নানাদেবের প্রতিমূর্ত্তি সুসায় লইয়া যান। (২২৮০ পূর্ব্ব খৃঃ।) কাজেই, এলাম আর ব্যাবিলনিয়ার অধীন থাকে না। বরং ব্যাবিলনিয়া (অন্ততঃ পক্ষে দক্ষিণাংশ) এখন হইতে এলামের করদরাজারূপে পরিগণিত হয়।

খুতুর নান্‌খুন্তি

এলামের রাজারা আর নিজেদের প্যাটেসি বলিতেন না। তাহাদের নূতন উপাধির অর্থ ব্যাবিলনিয়ার অধীশ্বর। এই সময়ে বোধ হয় সিরুকুদু (Shirukdu), তেম্‌তি-আগুন (Tempti-agun) তেম্‌তি-খিস-খনেস্ (Temti-Khisha-Khanesh), সিমেবেলার খুপ্পক (Simebelar-Khuppak) প্রভৃতি এলামের রাজা ছিলেন।

এলামের স্বাধীনতা ও ব্যাবিলনিয়ার আধিপত্য

অনেকদিন পর্য্যন্ত এলামের রাজারা ব্যাবিলনিয়ার উপর নিজেদের প্রভাব বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এমন কি, হাম্মুরাবির পূর্ব্বপুরুষেরা যখন ব্যাবিলন রাজ্যের রাজা ছিলেন তখনও দক্ষিণ ব্যাবিলনিয়ায় এলামীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের রাজধানী ছিল লার্সা (Larsa)। ব্যাবিলনিয়ায় এলামীয় রাজাদের মধ্যে শেষ রাজা ছিলেন খুতুর-মাবুকের পুত্র রিম্‌সিন্ (Rim-sin)। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া হাম্মুরাবি সমগ্র ব্যাবিলনিয়ার অধিশ্বর হন। হাম্মুরাবির পুত্র সাম্‌সু-ইলুনার সঙ্গে যুদ্ধে রিম্‌সিন্ নিহত হন।

রিমসিন ও হাম্মুরাবি

বাইবেলে দেখা যায়, ব্যাবিলনরাজ হাম্মুরাবি (আম্রফেল্), লার্সার রাজা এরি-আকু ও গুমের রাজা টিডল্ এলামরাজ খুতুর লাগামারের (খেদরলাওমার) নেতৃত্বে প্যালেষ্টাইনে অভিযান করেন। এই বিবরণ পাঠে মনে হয়, খুতুর-লাগামার খুব পরাক্রমশালী রাজা ও বড় যোদ্ধা ছিলেন, এবং হাম্মুরাবি প্রভৃতি তাঁহাকে অধীশ্বর বলিয়া স্বীকার করিতেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, রিম্‌সিনের পিতা খুতুর মাবুক এলামের ইমুৎবল প্রদেশের সামন্ত রাজা ছিলেন এবং খুতুর-লাগামার এলামের অধীশ্বর ছিলেন।

খুতুর-লাগামার

যাহা হউক, হাম্মুরাবির বংশধরদের সময় ব্যাবিলনিয়া সম্পূর্ণরূপে এলামের প্রভাব হইতে মুক্ত হয়। আম্মিজা-ডুগা নামে তাঁহার এক বংশধর এলামরাজ সাদিকে (Sadi) পরাজিত করেন। কিন্তু ইহার অল্প দিন পরে এশিয়ামাইনর হইতে হিটাইট্‌রা আসিয়া ব্যাবিলন অধিকার করিয়া লুঠপাট করিয়া চলিয়া যায়; এবং ব্যাবিলনের শূন্য সিংহাসনে কাস্‌সি নামে এক বিদেশীয় রাজবংশ উপবেশন করে। এই কাস্‌সি জাতি পশ্চিম এলামের পার্ব্বত্যপ্রদেশ হইতে আসিয়া ব্যাবিলনিয়া অধিকার করে। কাস্‌সি জাতির সঙ্গে এলামীয়দের কোনরূপ আত্মীয়তা ছিল কি না, তাহা বলা বিশেষ কঠিন। আর যদি তাহারা এলামের বাহির হইতে আসিয়া পার্ব্বত্যপ্রদেশে বসবাস করিতে আরম্ভ করিয়া থাকে, তবে তাহারা ব্যাবিলনিয়ার ন্যায় সমগ্র এলামদেশ জয় করিয়াছিল কি না, তাহাও জানা যায় না। তবে মনে হয় যে, তাহারা কেবল পার্ব্বত্যদেশই অধিকার করিয়াছিল—সুসার রাজসিংহাসন অধিকার করে নাই।

কাস্‌সিজাতির ব্যাবিলনিয়া অধিকার

এ সময়ে এলামের ইতিহাস আমাদের জানা নাই। ইহার অনেকদিন পরে অসুর-উবাল্লিতের দৌহিত্র কুরিগলজু যখন ব্যাবিলনের রাজা, তখন এলামরাজ খুর্ব্বাটিলা (Khurbatila) ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করে। কুরিগলজু কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। তারপর তিনি এলাম আক্রমণ করিয়া রাজধানী সুসা অধিকার করেন। খুর্ব্বাটিলা এলামরাজ্যের কিয়দংশ ব্যাবিলনিয়াকে সমর্পণ করিলে তাঁহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

খুর্ব্বাটিলা

টুকুলটি নিনেবের অধীনে প্রথম এনলিল নাদিন সুম যখন ব্যাবিলনিয়ার উপরাজ হন, তখন এলামের রাজা কিদিন খুত্রুতাস্ (Kidin-Khutrutash) ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া নিপ্পুর ও দার-ইলু অধিকার করেন। তারপর আশেপাশে চারিদিকে লুঠপাট করিয়া অনেক লোককে বন্দী

কিদিন খুত্রুতাসের ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ



করিয়া এলামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। আদাদ্-সুম্-ইদ্দীনের শাসনকালেও তিনি পুনরায় ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করেন। এইবার তিনি আইসেন পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন।

ইহার অল্পদিন পরে খাল্লুতুষিন-সুসিনাক (Khallu-tushin-Shushinak) এলামের রাজা হন। তাঁহার পুত্র সুক্রুক্-নান্‌খুণ্ডি খুব বড় যোদ্ধা ছিলেন। তিনি ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া জামামা-সুম-ইদ্দীনকে পরাজিত করেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যাবিলন-রাজের মৃত্যু হয়। সুক্রুক্-নান্‌খুন্তি সিপ্পার লুণ্ঠন করেন এবং অনেক ধন রত্নাদিসহ এলামে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। উত্তর ব্যাবিলনিয়ায় কিসেও তিনি লুঠপাট করিয়াছিলেন।

সুক্রুক নানখুণ্ডির ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ

সুক্রুক্ নান্‌খুন্তির পরে কুতুর নান্‌খুন্তি ও শিলখাকিন্ সুসিনাক্ পর পর রাজা হন। শিলাখাকিন্ শান্তিপ্রিয় ও ধার্ম্মিক রাজা ছিলেন। তিনি অনেক দেবমন্দির নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার পর তাঁহার দুই-পুত্র খুতেলু-তুসিন সুশিনাক্ ও শিলখিনা-খাম-লাগামার পর পর এলামের সিংহাসনে বসেন। বোধ হয় এই সময়েই ব্যাবিলনের রাজা প্রথম নেবুক্যাড্রেজার এলাম রাজকে হারাইয়া মার্ডুকের মূর্ত্তি লইয়া যান।

শিলাখাকিন-সুসিনাক

ইহার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত এলামের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। তবে এইটুকু জানা যায় যে, আইসিন রাজাদের পরে যে রাজারা ব্যাবিলনের সিংহাসনে বসেন, তাঁহাদের মধ্যে শেষ রাজা একজন এলামীয়-আপ্‌লু উসুর। ইহা হইতে মনে হয়, এই সময়ে এলামীয়েরা আবার ব্যাবিলন জয় করে। কিন্তু বেশীদিন তাহারা ব্যাবিলনিয়ার উপর প্রভুত্ব করিতে পারে নাই। কারণ, আপ্‌লু উসুরের পর ক্যাল্‌ডীয় রাজারা ব্যাবিলনিয়ায় রাজত্ব করেন।

ব্যাবিলনরাজ আপ্‌লু উসুর

এই অন্ধকার-যবনিকা অপসারিত হয় যখন অ্যাসিরিয়া-রাজ চতুর্থ টিগ্‌লাথ পিলেসার ব্যাবিলনিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান করেন। এই সময় হইতে ব্যাবিলনিয়ার আধিপত্য লইয়া এলাম ও অ্যাসিরিয়ার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। ব্যাবিলনে দুইটি দলের উদ্ভব হয়—একদল অ্যাসিরিয়ার অনুরক্ত, অন্যদল (ক্যাল্‌ডীয়েরা) এলেমের সাহায্যপ্রার্থী। ৭৪৩ খৃঃ পূর্ব্বে উম্‌বাদারার খুমবানিগাস (Khumbanighas) এলামের রাজা হন। তিনি ৭১৭ পূঃ খৃঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সঙ্গে টিগ্‌লাথ পিলেসার অথবা শালমানে-সারের কোন সংঘর্ষ হইয়াছিল কি না, আমাদের জানা নাই। তবে শালমানেসারের মৃত্যুর পর ক্যাল্‌ডীয় মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন তাঁহার সাহায্যে ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন। অ্যাসিরিয়ারাজ সার্গন যখন মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীনের বিরুদ্ধে ব্যাবিলনিয়ায় অভিযান করেন, খুম্‌বানিগাস্ ডার-ইলুতে তাঁহাকে প্রতিরোধ করেন। এই যুদ্ধের ফলে সার্গনকে তখনকার মত ব্যাবিলনিয়ার আশা পরিত্যাগ করিতে হয় এবং এলামের আশ্রয়ে মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন নির্ব্বিঘ্নে ব্যাবিলনিয়ায় রাজত্ব করিতে থাকেন।

খুম্‌বানিগাস-ব্যাবিলনিয়ার আধিপত্য

খুমবানিগাসের মৃত্যুর পর এলামের রাজা হন ইশ্তার খুণ্ডু, (Ishtar Khundu) অথবা সুতুর নান্‌খুন্তি (৭১৭—৬৯৯)। ৭১০ খৃঃ পূর্ব্বে সার্গন তাঁহাকে আক্রমণ করেন এবং এলামের সীমান্ত দুর্গ ও প্রদেশ অধিকার করেন। মার্ডুক আপ্‌লু-ইদ্দীন এলাম-রাজাকে নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং সৈন্য-সামন্ত লইয়া এলামের সীমান্তে অগ্রসর হন। সুতুর নান্‌খুন্তি তাঁহাকে এলামে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। বোধ হয় তিনি সার্গনের বিরুদ্ধে সাহায্য করিতে ভরসা পান নাই। এইবার সার্গন মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীনকে ব্যাবিলনিয়া ও বীট্ ইয়াকিন্ হইতে তাড়াইয়া দিয়া ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন। রাজ্যচ্যুত ক্যাল্‌ডীয়রাজ এলামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সার্গনের মৃত্যুর পর এলামসৈন্যের সাহায্যে তিনি পুনরায় ব্যাবিলনের সিংহাসন অধিকার করেন (৭০৩ খৃঃ পূঃ)। কিন্তু এইবার তিনি বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারিলেন না। কারণ, সার্গনের পুত্র সেন্নাকেরিব অবিলম্বে ব্যাবিলনে অভিযান করিয়া কিসের যুদ্ধে ব্যাবিলন ও এলামের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করেন। মার্ডুক পুনরায় এলামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে মার্ডুক-আপ্‌লু-ইদ্দীন আবার এলামরাজের সাহায্যে বীট্ ইয়াকিন হইতে ব্যাবিলনিয়ায় অগ্রসর হন এবং সেন্নাকেরিবের অনুরক্ত বেলুইব্-নিকে এলামের সঙ্গে যোগদান করিয়া অ্যাসিরিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে বাধ্য করেন। সেন্নাকেরিব

সার্গন ও সুতুর-নানখুন্তি

কিসের যুদ্ধ

কিন্তু এবারও মার্ডুক-আপলু-ইদ্দীনকে তাড়াইয়া দেন। পূর্ব্বের ন্যায় এবার তিনি এলামে আশ্রয় লন(৭০০খৃঃপূঃ)

পর বৎসর স্তুত্তুর নান্‌খুন্তির ভ্রাতা খাল্লুসু (Khallushu) তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া তাঁহাকে বন্দী করেন এবং নিজে এলামের সিংহাসন অধিকার করেন। ৬৯৪ খৃঃ পূর্ব্বে সেন্নাকেরিব এলামের পারস্যোপসাগরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ আক্রমণ করিয়া আশ্রিত ক্যাল্‌ডিয়দের উচ্ছেদ করেন। এই সুযোগে এলামরাজ উত্তর ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করিয়া সিপ্পার অধিকার ও লুণ্ঠন করেন এবং সেন্নাকেরিবের পুত্র অসুর-নাদিন্-সুমকে বন্দী করিয়া এলামে লইয়া আসেন। ব্যাবিলনের সিংহাসনে নার্গল উসেজিব্ নামে একজন ব্যাবিলনীয়কে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। কাজেই, ব্যাবিলনিয়া প্রকৃতপক্ষে এলামের অধীনে আসে। নার্গল উসেজিব্ কিন্তু বেশীদিন রাজত্ব করিতে পারেন নাই। এই সময়ে এলামে অন্তর্বিপ্লব উপস্থিত হয়। সেই সুযোগে সেন্নাকেরিব তাঁহাকে বন্দী করেন। এই অন্তর্বিপ্লবের ফলে খাল্লুসু রাজ্যচ্যুত হন এবং খুতুর নান্‌খুন্তি এলামের রাজা হন (৬৯২ খৃঃ পূঃ)। তাঁহার ভাগ্যও বেশীদিন সুপ্রসন্ন ছিল না। এক বৎসরের মধ্যে অ্যাসিরীয়েরা উত্তর ব্যাবিলনিয়া হইতে এলামে অগ্রসর হয় এবং খুতুর নান্‌খুন্তি তাহাদের প্রতিরোধের কোন চেষ্টা না করিয়া জ্যাগ্রস পর্ব্বতের সীমান্ত প্রদেশে পলায়ন করেন। অ্যাসিরীয় সৈন্যেরা পশ্চিম এলাম বিধ্বস্ত করিতে থাকে। এদিকে আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তাহার ফলে উম্মান মেনান্নু (Umman menanu) এলামের সিংহাসন লাভ করেন। এই নূতন রাজা খুবই সাহসী ও শক্তিশালী ছিলেন। ইতিমধ্যে মুসেজিব মার্ডুক আবার ব্যাবিলনের রাজা হইয়াছেন। তিনি অ্যাসিরীয়দের বিরুদ্ধে উম্মান মেনান্নুর সাহায্য ভিক্ষা করেন। সেন্নাকেরিব্ তাঁহাকে শায়েস্তা করিতে চেষ্টা করিলে এলাম-রাজ সসৈন্যে তাঁহাকে বাধা দিতে অগ্রসর হন (৬৯১ পূঃ খৃঃ)। খালুলির (Khaluli) যুদ্ধের ফলে সেন্নাকেরিব্‌কে ব্যাবিলন অধিকারের আশা ছাড়িয়া অ্যাসিরিয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয়। তবে দুই বৎসর পরে উম্মান মেনান্নু হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে আক্রান্ত হইলে মুসেজিব মার্ডুক এলামের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হন। এই সুযোগে সেন্নাকেরিব্ পুনরায় ব্যাবিলন অধিকার করিয়া বসিলেন।

খালুসুর ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ ও আধিপত্য বিস্তার

উম্মানমেনান্নু

খালুলির যুদ্ধ

উম্মান মেনান্নুর মৃত্যুর পর প্রথম খুম্বাখাল্‌ডাস্ রাজা হন (৬৮৯-৬৮১ খৃঃ পূঃ)। তিনি অ্যাসিরিয়ার সঙ্গে সদ্ভাব বজায় রাখিয়া চলেন। তাঁহার পর দ্বিতীয় খুম্বাখাল্‌ডাস্ রাজা হন। প্রথমে যদিও তিনি এসারহাড্ডনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন, শেষের দিকে কিন্তু ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ করেন এবং সিপ্পার অধিকার করিয়া সেখানকার অনেক লোককে হত্যা করেন। অল্পদিন পরে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু হয় এবং তাঁহার ভ্রাতা উর্‌তকি (Urtaki) সিংহাসনে আরোহণ করেন।

খুম্বাখালডাস্

উর্‌তকিও প্রথম প্রথম অ্যাসিরিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রাখিয়াছিলেন। এই সময়ে এলামে অনাবৃষ্টির জন্য দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। লোকের কষ্টের আর সীমা রহিল না। অ্যাসিরিয়া-রাজ অসুরবানিপাল এই দুঃসময়ে এলামীয়দিগের প্রতি বিশেষ করুণা প্রদর্শন করেন। তিনি নিজের শস্যাগার হইতে প্রচুর পরিমাণে শস্য এলামে প্রেরণ করিয়া ক্ষুধার্ত্ত নরনারীর আহার যোগান। অনেক বিপন্ন এলামবাসীকে তিনি নিজের রাজ্যে সাময়িকভাবে আশ্রয় দেন এবং দুর্ভিক্ষ অবসান হইলে সযত্নে স্বদেশে প্রেরণ করেন। অসুর বানিপাল খুবই আশা করিয়াছিলেন এই যথার্থ বন্ধুর কাজ করিয়া তিনি এলামবাসীদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে পারিবেন এবং ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে শান্তি ও সৌহার্দ্দ্য বজায় থাকিবে। উর্‌তকি কিন্তু কৃতজ্ঞতার কোন পরিচয় দিলেন না। এই সময়ে অসুরবানিপালের ভ্রাতা সামাস্ সুমুকিন ব্যাবিলনিয়ায় রাজত্ব করিতেছিলেন। এলামরাজ অকস্মাৎ প্রচুর সৈন্যসামন্ত লইয়া উত্তর ব্যাবিলনিয়া (আক্কাদ) আক্রমণ করিলেন এবং ব্যাবিলনের সন্নিকটে ঘাঁটি স্থাপন করিলেন। ব্যাবিলন রাজ-ভ্রাতার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। বিপন্ন ভ্রাতার সাহায্যার্থে অসুর বানিপাল একদল সৈন্যসহ আগমন করেন। তিনি উর্‌তকিকে এলামে হঠাইয়া দেন। এই বৎসরই উর্‌তকির মৃত্যু হয়। বোধ হয় তাঁহাকে হত্যা করা হয়।

উর্‌তকি

ব্যাবিলনিয়া আক্রমণ ও পরাজয়

উর্‌তকির মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা টিউম্মান (Teummon) রাজা হন। টিউম্মান খুব দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। নিজের সিংহাসনের কণ্টক দূর করিবার

জন্য তিনি তাঁহার পাঁচটি ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তাহারা কিন্তু ইহা জানিতে পারিয়া রাজবংশের অন্যান্য লোকের সঙ্গে অ্যাসিরিয়ায় পালাইয়া যায়। অসুর বানিপাল তাঁহাদিগকে আশ্রয় দেন। টিউম্মান তাঁহার কাছে দূত পাঠাইয়া আশ্রিত রাজপুত্রদের তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ করিলেন। অসুর বানিপাল অবশ্য এই দাবী ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করেন। ইহার ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ আসন্ন হইল। টিউম্মান ব্যাবিলনিয়া আক্রমণের জন্য সমরসজ্জা আরম্ভ করিলেন। আসিরিয়ারাজও চুপ করিয়া রহিলেন না।

অসুর বানিপালের এলাম আক্রমণ উলাইর যুদ্ধ

টিউম্মানকে বাধা দিবার জন্য তিনিও কৃতসংকল্প হইলেন এবং অবিলম্বে দার ইলু অধিকার করিলেন। এলামরাজ এইবার পিছন দিকে হটিয়া উলাই নদীর পারে শিবির স্থাপন করেন। এইখানে দুই দলে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে টিউম্মান ভীষণভাবে পরাজিত হন এবং যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন। কিন্তু শত্রুরা পশ্চাদ্ধাবন করিয়া শীঘ্রই তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে ঘিরিয়া ফেলে। কিছুক্ষণ বাধা দিবার পরে দুইজনেই মৃত্যুমুখে পতিত হন।

অসুর বানিপাল উর্‌তকির পুত্র উম্মানিগাসকে (খুম্মানিগাসকে) এলামের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার ভ্রাতা তাম্মারিতুকে (Tammaritu) খিদালু-প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করা হয়। এলাম প্রকৃতপক্ষে আসিরিয়ার অধীন হইল।

আসিরিয়ার আধিপত্য—উম্মানিগাস

এই সময়ে ব্যাবিলনরাজ সামাস্ সুমুকিন অসুর বানিপালের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে আরম্ভ করেন। উম্মানিগাস্ এই ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়া এলাম স্বাধীন করিতে চেষ্টা করেন। সামাস্ সুমুকিনকে সাহায্য করিবার জন্য তিনি সসৈন্যে ব্যাবিলনিয়ার দিকে অগ্রসর হন। এই সুযোগে তাম্মারিতু তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া এলামের সিংহাসন অধিকার করেন। উম্মানিগাস্ ও তাঁহার পরিবারবর্গকে হত্যা করা হয়। কিন্তু তাম্মারিতুও আসিরিয়ার বিরুদ্ধে সামাস সুমুকিনের সঙ্গে যোগ দেন এবং ব্যাবিলনিয়ায় একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। ঠিক এই সময়ে এলামে পুনরায় বিপ্লব উপস্থিত হয়। ফলে, তাম্মারিতুকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ইন্দবিগাস্ (Indabigash) রাজা হন (৬৪৮ পূঃ খৃঃ)। রাজ্যচ্যুত রাজা আবার অসুরবানিপালের আশ্রয় ভিক্ষা করেন। অ্যাসিরিয়ারাজ ভবিষ্যতে স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহার অপরাধ ক্ষমা করেন।

এলামে অন্তর্বিপ্লব

তাম্মারিতু

ইন্দবিগাস অসুরবানিপালের সঙ্গে কোনরূপ অসদ্ভাব করিতে চাহিলেন না। কাজেই যখন অ্যাসিরিয়ারাজ সামাস্-সুমুকিনকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করেন তখন তিনি তাঁহার সাহায্যের জন্য কোনরূপ চেষ্টা করিলেন না। ইহা সত্ত্বেও কিন্তু শীঘ্রই তাঁহার সহিত অসুরবানিপালের মনান্তর উপস্থিত হয়। সামাস-সুমুকিনের সঙ্গে নবুবেল্ সুমেতি নামে একজন কাল্ডীয় সামন্তরাজ ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া একদল আসিরীয় সৈন্যকে বন্দী করিয়া এলামরাজের হাতে সমর্পণ করেন। অসুরবানিপাল ব্যাবিলন অধিকার করিলে তিনি এলামে পলাইয়া যান। ইন্দবিগাস বন্দী আসিরীয় সৈন্যদের মুক্ত করিয়া আসিরিয়ায় পাঠান। আশ্রিত নবু বেল-সুমেতিকে কিন্তু পরিত্যাগ করিলেন না। ইহাতে অসুরবানিপাল বিশেষ ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ করিবার ভয় দেখান। ইহার ফলে এলামের লোকেরা ভীত হইয়া ইন্দবিগাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং উম্মানাল্‌ডাস অথবা খুম্বাল্‌খাল্‌ডাস্ নামে এক জন অজ্ঞাতকুলশীল লোককে রাজা করে। তিনিও কিন্তু আশ্রিতকে সমর্পণ করিতে রাজী হইলেন না। ফলে, আবার বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তবে বিদ্রোহী নেতা উম্মানিগাস বিশেষ সুবিধা করিতে পারিল না। কাজেই, অগত্যা অসুরবানিপাল এলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন ও সৈন্যসামন্ত লইয়া অগ্রসর হন। উম্মানাল্‌ডাস্ তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিলেন না, এবং পলাইয়া পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অসুরবানিপাল তাম্মারিতুকে পুনরায় এলামের রাজা করেন।

ইন্দবিগাস

উম্মানল্‌ডাস্

এততেও কিন্তু তাম্মারিতুর শিক্ষা হয় নাই। রাজা হইয়াই তিনি আসিরিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিলেন। অসুরবানিপাল অবশ্য বলেন যে, তিনি পুনর্ব্বার এলাম জয় করেন এবং তাম্মারিতুকে দমন করেন। কিন্তু মনে হয়, তাম্মারিতুকে রাজ্যচ্যুত করেন উম্মানাল্‌ডাস্। সে যাহাই হউক, পুনর্ব্বার তাম্মারিতু আসিরিয়ায় পলাইয়া যান। এইবার অসুরবানিপাল তাঁহাকে বন্দী করিয়া রাখেন।

উম্মানাল্‌ডাস্ তাহার রাজ্য হইতে অ্যাসিরিয়দের তাড়াইয়া দেন। সুতরাং আবার তাঁহার সহিত অসুরবানিপালের যুদ্ধ বাধিয়া গেল।

অসুরবানিপালের সুসা অধিকার ও লুণ্ঠন

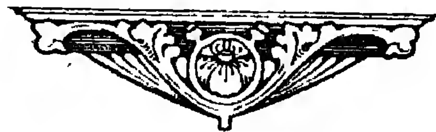
অ্যাসিরিয়রাজ সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করিলে উম্মানাল্‌ডাস্ পুনরায় পার্ব্বত্যপ্রদেশে আশ্রয় লন। বিনা বাধায় অ্যাসিরীয় সৈন্য রাজধানী সুসা অধিকার করিয়া লুঠপাট করিতে আরম্ভ করে। এখানকার দুর্গ, দেবমন্দির প্রভৃতি ধ্বংস করা হয়। রাজাদের কবরভূমি অপবিত্র করা হয়। অনেক দেব মূর্ত্তি ও রাজাদের প্রতিমূর্ত্তি অ্যাসিরিয়ায় পাঠান হয়। দেড় হাজার বৎসর আগে খুতুর নান্‌খুন্তি ইরেক্ হইতে নানাদেবের যে সকল মূর্ত্তি আনিয়াছিলেন অসুরবানিপাল পুনরায় তাহাদিগকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর অ্যাসিরীয় সৈন্য এলাম পরিত্যাগ করিয়া আসে। উম্মানাল্‌ডাস্ বিধ্বস্ত দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। অসুরবানিপালের বিরুদ্ধাচরণ করিতে তাঁহার আর সাহসে কুলাইল না। কাজেই, অসুরবানিপাল পুনরায় যখন নবু-বেল-সুমেতিকে তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে আদেশ পাঠাইলেন, উম্মানা ডাস্ আর অস্বীকার করিতে পারিলেন না। নবুবেলসুমেতি কিন্তু শত্রু হস্তে পড়া অপেক্ষা আত্মহত্যা করা শ্রেয়ঃ মনে করিয়া আত্মহত্যা করিলেন এবং উম্মানাল্‌ডাস তাঁহার মৃতদেহ অ্যাসিরিয়ায় প্রেরণ করিলেন।

অ্যাসিরিয়ার অধীনতা এলামরাজ অধিক দিন সহ্য করিতে পারিলেন না। তলে তলে তিনি স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। অ্যাসিরিয়া-রাজের চক্রান্তে আবার এলামে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। উম্মানাল্‌ডাস্ পলাইয়া পর্ব্বতে আশ্রয় লইলেন। এখানেও তিনি নিস্তার পাইলেন না—তিনি অচিরে অ্যাসিরীয় সৈন্যের হাতে বন্দী হইয়া

পারসিকদের এলাম অধিকার

এলামে প্রেরিত হইলেন (৬৩৫ খৃঃ পূঃ)। ইহার পর এলামের বিষয়ে অনেকদিন পর্য্যন্ত আমরা কিছুই জানি না। বোধ হয় উম্মানালডাসের পরাজয়ের অল্পদিনের মধ্যেই এই দেশ মীদদের অধিকারে আসে। সে যাহাই হউক, পারস্যসম্রাট সাইরাস্ কিন্তু এলামের রাজধানী সুসায় তাঁহার সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এইখানে স্বাধীন এলামের ইতিহাস শেষ

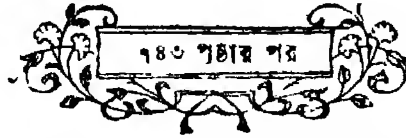
এলামের স্বাধীনতাও যেমন শেষ হইল, ইহার প্রাচীন কীর্ত্তি-গৌরবও সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস পাইতে লাগিল। ক্রমে ইহার নাম পর্য্যন্ত লোকে ভুলিয়া গিয়াছিল। অনেক দিন পরে মাটির নীচ হইতে সুসার অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন বাহির হইতেছে। মাটির হাড়ি, চিত্রিত বাসন কোষন, খেলার পুতুল, মূর্ত্তি ও দেবতার মন্দিরের ভগ্নাবশেষ অনেক কিছুই ইতিহাসানুরাগী পণ্ডিতদের চেষ্টা ও যত্নে আবিষ্কৃত হওয়ায় একদিন রাজধানী সুসা যে অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল, তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। এখন দেশ-বিদেশ হইতে ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তিগণ একদিনকার গৌরবান্বিত প্রাচীন রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া যান। এখনও ঐ সব অঞ্চলে খনন কার্য্য চলিতেছে। কে জানে, ভবিষ্যৎ কালে আরও কত বিচিত্র ঐতিহাসিক কীর্ত্তি বাহির হইয়া প্রাচীন ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল করিবে কি না





নয়-মার পালোয়ান

(পাঞ্জাবদেশের রূপকথা)



এক ছিল গরীব তাঁতি। সারাদিন সে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটত, তবু তার সারাদিন দু'বেলা অন্ন জুটত না। দুঃখে কষ্টে দিন কেটে যায়। একদিন হঠাৎ তার পিঠে খেতে ভারি ইচ্ছে হ'ল। সেদিন সে দিনের কাজকর্ম শেষ ক'রে বাড়ী ফিরে তাঁতি-বৌকে ডেকে বললে, "দেখ, আমি দিন-রাত এত পরিশ্রম করি, কিন্তু ভালমন্দ কিছুই আমার কোনদিন খেতে জোটে না। এবার একদিন আমায় পিঠে খাওয়াতে হ'বে।" তাঁতি-বৌ তো শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। দু'বেলা খেতে যাদের দুটি অন্ন জোটে না, পিঠের জোগাড় তাদের কোথা থেকে হ'বে? যা হোক্, তাঁতী খেতে চেয়েছে, তাই সে বাড়ী বাড়ী ঘুরে চেয়ে-চিন্তে দুধ, ঘি, চিনি, ময়দা সব জোগাড় ক'রে আনলে। তারপর সারা সকাল বসে বসে খুব বেশী ক'রে ঘি আর চিনি দিয়ে চমৎকার পিঠে তৈরী ক'রে রাখলে।

সারা সকাল খেটে দুপুর বেলা বাড়ী এসে তাঁতি তো পিঠে দেখে ভারি খুসী! প্রায় সবগুলি পিঠে সে একাই খেয়ে ফেললে। তারপরে হাতের ঘি খুব ভাল ক'রে সারাগায়ে মুছে নিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে সে আবার তার কাজে বেরিয়ে পড়ল।

তখন দুপুর বেলা। মাথার উপর প্রচণ্ড রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ করছে। জন-মানুষ একটিও দেখা যাচ্ছে না—ফাঁকা মাঠের মাঝখান দিয়ে গাঁয়ের রাস্তা দূরে গাছের আড়াল দিয়ে কোথায় মিলিয়েছে। সেই পথ ধ'রে তাঁতি কাপড়ের বোঝা মাথায় ক'রে চলেছে। বাড়ী বাড়ী ঘুরে বিক্রী করতে হ'বে, তবে তো আবার খাওয়া জুটবে। এখন রোদের তাপে তার গায়ের ঘি গলতে আরম্ভ করেছে। তখন সেই চিনি-মিশানো ঘি-এর গন্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে তার গায়ে বসতে সুরু করল। বিরক্ত হ'য়ে দু-তিন বার সে তাদের তাড়িয়ে দিলে, কিন্তু কোনই ফল হ'ল না। ঝাঁকে ঝাঁকে ফিরে ফিরে বার বারই মাছিগুলি তার গায়ে এসে বসতে লাগল। রাগ ক'রে সে হঠাৎ একবার খুব জোরে হাত তুলে মারলে এক চাটি। মেরে হাত তুলেই সে দেখে যে, এক মারেই নয়টি মাছি মরেছে। দেখে দেখে হঠাৎ তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। অমনি কোথায় বা গেল তার কাপড় বিক্রী করা, আর কোথায় বা গেল কি! কাপড়ের বোঝা সেইখানেই মাঠের মাঝে ফেলে রেখে সে জোরে জোরে পা ফেলে বাড়ী ফিরে এল। হাঁপাতে হাঁপাতে তাঁতি-বৌকে ডেকে বললে, "ওগো আর আমাদের দুখের দিন থাকবে না! এক মারে নয় জনকে মারতে পারি, এত বড় জোয়ান আমি—নয়মার পালোয়ান--আর কি আমি তাঁতির কাজ ক'রে ক'রে শুকিয়ে মরব!" তাঁতি-বৌ জবাব দিলে, "এখানে তো গরীব তাঁতি বলেই সবাই তোমায় জানে। এত বড় জোয়ান তুমি, তা কেউ ম

তার চেয়ে চল, আমরা এমন কোন নূতন দেশে চলে যাই—যেখানে কেউ আমাদের জানে না।"

এই বুদ্ধি ক'রে দুজনে মিলে অন্নবস্ত্র তাদের যা-কিছু জিনিষ পত্র ছিল সব বেঁধে নিয়ে চুপি চুপি গাঁ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল—অনেক দূর দেশের সন্ধানে—যেখানে তাদের কেউ জানবে না। আরেক বার নূতন ক'রে ভাগ্য পরীক্ষা ক'রে দেখ্‌তে হবে তো! সারাদিন হাড়-ভাঙ্গা খাটুনির পরও দুবেলা দুমুঠো পেট ভরে খেতে জোটে না, এত কষ্ট কি আর সয়!



তাঁতি কাপড়ের বোঝা মাথায় ক'রে চলেছে

কত দিনের পর রাত—রাতের পর দিন কেটে গেল! চল্‌তে চল্‌তে তাঁতি আর তাঁতি-বৌ কত গ্রাম, নগর, নদী, বন পার হ'য়ে এক অজানা রাজ্যে এসে পৌঁছল। সেখানে যে দেখে সে-ই তাদের জিজ্ঞাসা করে "তোমরা কে? কোন্ দূরের দেশ থেকে এসেছ?" তাঁতি জবাব দেয়, "আমি নয়-মার পালোয়ান, এক ঘায়ে নয়জনকে মেরে ফেল্‌তে পারি। আমার উপযুক্ত কাজ খুঁজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

শুনে তো রাজ্য জুড়ে সাড়া প'ড়ে গেল। এত বড় জোয়ান এসেছে দেশে, তার কথা কি ক'রে আর চাপা থাকে! নয়-মার পালোয়ানের কাহিনী লোকের মুখে মুখে চারধারে ছড়িয়ে পড়ল। ক্রমে এ-কথা গিয়ে সিংহাসনে রাজার কানে উঠ্‌ল। এতবড় এক-জন যোদ্ধা—রাজা ভারি খুসী হ'য়ে মন্ত্রীকে ডেকে বল্‌লেন, "একে পরম সমাদরে রাজসভায় ডেকে নিয়ে এস। এর উপর সমস্ত সৈন্যের ভার দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হই।"

সেই থেকে তাঁতি রাজার রাজ্যে সেনাপতি হ'য়ে মহাসুখে বাস করতে লাগ্‌ল।

দিন যায়। নয়-মার পালোয়ানের সম্মান আর যশঃ-ঐশ্বর্য্য ক্রমেই বেড়ে চলেছে। দেখে দেখে রাজার সব পুরাণো কর্ম্মচারীদের বড়ই হিংসে হ'ল। তারা দিনরাত কেবল সুযোগ খুঁজতে লাগ্‌ল—কি ক'রে একে জব্দ করা যায়।

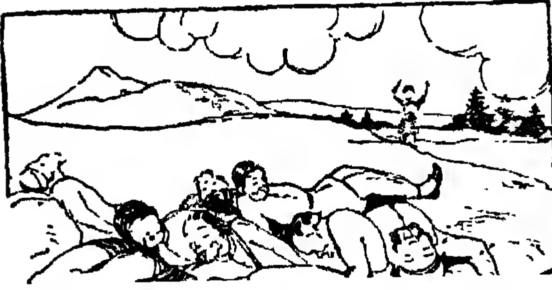
এদিকে হয়েছে কি—সেই রাজ্যে সাত ডাকাতের ভয়ানক উপদ্রব আরম্ভ হ'ল। তাদের সঙ্গে কেউ এঁটে উঠ্‌তে পারে না। সন্ধ্যা বেলায় চাষা দেখে গেল তার ধানের মরাই পাকা ধানে ভ'রে উঠেছে, সকাল বেলায় ঘুম ভেঙে উঠে এসে দেখে কোথায় বা ধান আর কোথায় বা কি। সব শূন্য পড়ে রয়েছে। রাত্রিতে ডাকাতেরা এসে সব ধান লুটে নিয়ে পালিয়েছে। আবার ঘোড়ার পিঠে বাণিজ্যের জিনিষ-পত্র চাপিয়ে সওদাগর চলেছে বাণিজ্যে —হঠাৎ কোথা থেকে সাত ডাকাত এসে চিলের মত ছোঁ মেরে তার সব নিয়ে চলে গেল।

অবস্থা যখন এমন দাঁড়িয়েছে, তখন সব কর্ম্ম-চারীরা মিলে বুদ্ধি ক'রে রাজার কাছে গিয়ে বল্‌লে, "মহারাজ, যে রাজ্যের সেনাপতি হ'চ্ছেন স্বয়ং নয়-মার পালোয়ান, সেই রাজ্যে কি না সাত ডাকাতের এমন অত্যাচার? এর বিহিত করুন।" রাজা ভাব্‌লেন "তাইতো, আমি মিথ্যে এমন ভেবে মরছি।" অম্‌নি নয়-মার পালোয়ানের ডাক পড়ল। আদেশ হ'ল, "তিন দিনের মধ্যে ডাকাত ধ'রে দিতে হ'বে।"

নয়-মার পালোয়ান রাজা হ'য়ে ভাব্‌তে ভাব্‌তে বাড়ী ফিরল। পথেই এক মতলব এঁটে বাড়ী এসে তাঁতি-বৌকে বল্লে, "সাতটা বিষ মাখানো রুটি ক'রে দাও তো।" তাঁতি বৌ রুটি তৈরী ক'রে দিলে। সেই রুটি বেঁধে নিয়ে, বিজন পাহাড়ে সাত ডাকাতের আড্ডা, সেই পাহাড়ের দিকে চল্‌ল।

নির্জ্জন পথে চল্‌তে চল্‌তে অন্ধকার হ'য়ে এল; এমন সময় সাত ডাকাতের সঙ্গে দেখা। তাদের

দেখেই নয়-মার পালোয়ান হাতের বোঝাটি ফেলে দিয়ে ছুটে গিয়ে এক পাথরের আড়ালে লুকিয়ে রইল, যেন সে ভারি ভয় পেয়েছে, আর মাঝে মাঝে সেখান থেকে উঁকি দিয়ে দেখতে লাগল। এদিকে ডাকাতরা তাড়াতাড়ি ক'রে এসে গাঁট খুলে যখন দেখতে পেলে সাতটা বড় বড় সাদা ধবধবে রুটি বাঁধা রয়েছে, অমনি সাতজনে সাতটা খেতে বসে গেল। খাওয়া শেষ হ'তে না হ'তেই এক এক ক'রে সাতজনই সেখানে ম'রে পড়ে রইল। তখন নয়-মারের ফুর্তি দেখে কে। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে তাদের অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে একেবারে রাজার সভায় উপস্থিত! বল্লে, "মহারাজ, পাহাড়ের উপর ডাকাতদের মেরে এই তাদের সব নিয়ে এসেছি। রাজা অবাক্ হয়ে বল্লেন "সে কি! তোমার নিজের অস্ত্র কোথায়?" বুক-ফুলিয়ে নয়-মার বল্লে নয়-মার পালোয়ান আমি, সাতটা ডাকাতকে মারতে আবার অস্ত্র হাতে নেব? দশ বারো জন হ'লেও না হয় একটা লাঠি নেওয়া যেত।"



সাত জনই মরে পড়ে রইল

রাজা খুব খুশী হ'য়ে তাকে অনেক ধন-রত্ন দিলেন আর সেদিন থেকে নয়-মারের আদরও অনেক বেড়ে গেল।

কিছুদিন বাদে আবার ভিন্ন দেশের শত্রু এসে রাজার রাজ্য আক্রমণ করলে। আবার নয়-মার পালোয়ানের ডাক পড়ল। আদেশ হ'ল, "শত্রুদের রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে।" এবার নয়-মারের মস্ত বিপদ্। জীবনে সে কখনও ঘোড়ায় চড়েনি, এখন ঘোড়ার পিঠে চড়ে সেনাপতি হ'য়ে কি ক'রে যুদ্ধ করে? কিন্তু তাই ব'লে পিছিয়ে যাবার লোকও নয়-মার নয়। সে এক ফন্দি আবিষ্কার ক'রে সৈন্যদের ডেকে জড় করলে। তারপর নিজে এক ঘোড়ায় চড়ে বসে একজন সৈন্যকে ডেকে বললে, "ওহে, আমার পা দুটো শক্ত ক'রে ঘোড়ার পেটের নীচে বেঁধে দাও তো।" সৈন্যরা তো অবাক্। সারা জীবনই তাদের ঘোড়ার পিঠে কেটেছে, কিন্তু এমন অদ্ভুত ঘোড়ায় চড়ার কথা তো তারা কখনো শোনে নি! সবাইকে অবাক্ হ'য়ে তাকিয়ে থাকতে দেখে নয়-মার বল্লে "বুঝছ না, আমি হচ্ছি নয়-মার পালোয়ান; শত্রু দেখলে তাদের মারবার জন্য আমার ঘোড়াকে ঝড়ের আগে ছুটিয়ে দিই। তাই আমি পা বেঁধে নিয়ে ঘোড়ায় বসি।" তখন সৈন্যরা এসে তার পা এঁটে ঘোড়ার গায়ে বেঁধে দিলে। সে তখন সৈন্যদের আগে প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। একটা গাছের নীচে দিয়ে ঘোড়া বাতাসের আগে ছুটে চলেছে, তখন তার নুয়ে-পড়া একটা প্রকাণ্ড ডাল নয়-মার পালোয়ান শক্ত ক'রে চেপে ধরল। ভীষণ টানে সমস্ত গাছটাই তখন তার হাতে উঠে এল। সেটাকে কাঁধে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নয়-মার পালোয়ান তো শত্রু-সৈন্যের মাঝে এসে উপস্থিত। তার সে



গাছটাকে কাঁধে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে···এসে উপস্থিত

ভীষণ মূর্তি দেখে শত্রুরা ভাবল "ওরে বাবা, এ নিশ্চয়ই কোন দৈত্য যুদ্ধ করতে এসেছে।" প্রাণের ভয়ে তখন সব শত্রু-সেনা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালিয়ে গেল। শূন্য যুদ্ধক্ষেত্র থেকে নয়-মারের সৈন্যরা জয়ধ্বনি করতে করতে ফিরে এল। তখন সেনাপতিকে নিয়ে সকলের কি আনন্দ! রাজা তাকে পরম সমাদরে রাজপ্রাসাদে আহ্বান ক'রে আন্‌লেন। আর মন্ত্রী পারিষদ্‌রা হিংসেতে দিনরাত জ্বলে মরতে লাগল।

তখন কিছুদিন বেশ সুখে শান্তিতে কেটে গেল। রাজ্যে কোন গোলমাল নেই; হঠাৎ আবার একদিন খবর এল প্রকাণ্ড এক মানুষ-খেকো বাঘের অত্যাচারে প্রজারা অস্থির হ'য়ে উঠেছে। কি উপায় করা যাবে, রাজা তো ভেবে আকুল—হিংসুক মন্ত্রী এই সুযোগে

আবার পরামর্শ দিল "মহারাজ, নয়-মার পালোয়ান থাকতে আমাদের আর ভাবনা কি ?" রাজা যেন অকূলে কূল পেলেন। বল্লেন, "ঠিক্, ঠিক তাই তো।" অমনি রব উঠ্‌ল "কোথায় নয় মার পালোয়ান, ডাক। ডাক্ তাকে।" নয়-মার এসে রাজার দরবারে উপস্থিত হ'ল। রাজা বল্লেন, "সেনাপতি, এবার তো বাঘ মেরে দেওয়া চাই।" —"যে আজ্ঞে, মহারাজ" বলে নয়-মার পালোয়ান তো বেরিয়ে এল।

কি করবে্ ভাবতে ভাবতে সে যখন বাড়ী ফিরে আসছে, তখন রাত হ'য়েছে, সমস্ত আকাশ মেঘে ঢাকা, থেকে থেকে বৃষ্টি পড়ছে, আর সেই বৃষ্টির জল গাছের পাতা থেকে, ছাদের কোণ থেকে টুপ-



বাঘটা ভয়ে ছুটে নয়-মারের ঘরে এসে ঢুকল

টাপ্ করে ঝ'রে পড়ছে। বাড়ীতে ঢুকতে যাবে, হঠাৎ নয়-মার পালোয়ান দেখতে পেলে যে, বাঘটা সেই মিশ্‌মিশে কালো অন্ধকারে গা ঢেকে দোরের সাম্‌নেই একটা গাছের নীচে বসে আছে - থেকে থেকে তার চোখ দুটো শুধু জ্বলছে। তাই না দেখে চম্‌কে উঠে নয় মার পালোয়ান গাছে উঠবে ভেবে এক লাফে যেই না গাছের একটা ডাল ধরেছে, অম্‌নি নাড়া পেয়ে গাছের ডাল থেকে ঝর্ ঝর্ করে একরাশ জল বাঘের পিঠে ঝ'রে পড়েছে। বাঘ ভয় পেয়ে দিয়েছে এক লাফ,—একেবারে ঠেকেছে গিয়ে সেই ডালটায়—যেটাতে নয়-মার ঝুলছিল। অম্‌নি নয়-মার পালোয়ানও হাত ছেড়ে পড়্‌বি তো পড়্ একেবারে ঝুপ্ ক'রে বাঘেরই পিঠে। পড়েই তার কাণ দুটি আঁকড়ে ধ'রে বস্‌ল। বাঘটা ভয়ে ছুটে একেবারে নয়-মারের বাড়ীর ভিতরই একটা ঘরে এসে ঢুকেছে। অম্‌নি তড়াক্ ক'রে তার পিঠে থেকে নেমেই এক লাফে বাইরে এসে নয়-মার পালোয়ান দোর বন্ধ ক'রে শিকল এঁটে দিল। বাঘ বন্দী হ'য়ে রইল। তখন তো তাঁতি আর তাঁতি-বৌ মনের আনন্দে খুব ঘুম দিল।

পরদিন ভোরে জেগে উঠেই নয়-মার পালোয়ান গিয়ে রাজসভায় উপস্থিত—"মহারাজ, কাল রাতে বাঘটাকে ধ'রে একটা ঘরে বন্দী রেখেছি, সৈন্যদের আদেশ করুন তারা বাঘটাকে নিয়ে আসুক।"

রাজা তো অবাক্ হ'য়ে গেলেন। যাকে ধরতে সমস্ত রাজ্যের লোক হিমশিম খেয়ে গেল, তাকে কি না নয়-মার একলা এক রাত্রির মধ্যেই বন্দী ক'রে নিলে। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, "কি করে তুমি একাজ করলে?"

নয়-মার জবাব দিলে, "সে আর কঠিন কাজ কি মহারাজ? বাঘটার দুই কাণ ধ'রে তাকে কাঁধে নিয়ে ঘরের ভিতর ছুঁড়ে দিয়ে শিকল তুলে দিয়েছি।"

তখন তো রাজার সৈন্যসামন্ত গিয়ে বাঘটাকে নিয়ে এল।

এরপর থেকে নয়-মার পালোয়ানের নাম দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়ল। এম্‌নি ক'রে গরীব তাঁতি—কেবলমাত্র তার বুদ্ধির বলে এত ধন উপার্জ্জন ক'রে পরম সুখে বাকী জীবন আরামে বসে কাটিয়ে দিলে।

দুই ভাই

(তিব্বতের গল্প)

তারা ছিল দুই ভাই। বাপ যখন মারা গেলেন—রেখে গিয়েছিলেন প্রচুর ধন-সম্পত্তি আর বাড়ী-ঘর। দুই ভাই আর মা থাকতেন সেই বাড়ীঘরে ধন-ঐশ্বর্য্যের মধ্যে বেশ সুখে-শান্তিতে।

বড় ভাইটি ছিল খুব চতুর, স্বার্থপর আর দুষ্ট-প্রকৃতির। ছোট ভাইটি ছিল সাদাসিধে ভাল মানুষ। এই জন্যই বড় ভাই হয়ে পড়লো সব বিষয়ের কর্ত্তা। ব্যবসা-বাণিজ্য, কারবার যা-কিছু সবই তার হাতে। ছোট ভাই কোন ব্যাপারেই ইচ্ছা করলেও আমল পায় না। বড় ভাই ভাবলো—হতভাগা এই ছোট ভাইটাকে তাড়িয়ে দিতে পারলে সব আপদ চুকে যায়। একদিন বড় ভাই ছোট ভাইকে ডেকে বল্‌ল দেখ,

আমি আর তোমাকে বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াতে পারবো না, তুমি তোমার পথ দেখ, এ বাড়ীতে আর তোমার ঠাঁই হবে না। দাদার মুখে এমন কথা শুনে ছোট ভাইয়ের মনে খুব কষ্ট হলো। সে কাঁদতে কাঁদতে গিয়ে সব কথা জানালো তার মাকে। মা শুনে খুব রেগে গেলেন, বল্লেন— এত বড় হতভাগা হয়েছে? ছোট ভাইকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়? আমি এমন ছেলের বাড়ীতে আর একদিন একবেলাও থাক্‌বো না, আমিও তোর সঙ্গে যাব।



আমি আর তোমাকে খাওয়াতে পার্‌ব না

পরদিন মা আর ছোট ছেলে বাড়ী ছেড়ে চলে গেল। কতদূর গিয়ে একটি ছোট পাহাড়ের নীচে একখানা কুঁড়ে ঘর দেখ্‌তে পেল। ঘরে জন-প্রাণী নেই। ও কুঁড়ে ঘরে যে হয়ত বা একদিন বাস করতো, সে যে আবার ফিরে আস্‌বে তার কোনও চিহ্নও ছিল না—কাজেই মা ও ছেলে সেখানেই থাক্‌বার বন্দোবস্ত করলো। এখান থেকে সহরও খুব দূরে নয়।

পরদিন ভোরের বেলা কুড়ুল কাধে করে ছোট ভাই চল্‌লো বনের দিকে। চারিদিকে ছোট-বড় পাহাড়। বনজঙ্গল—চীড়, দেবদারু, কত সব গাছ। ছোট ভাই অল্প সময়ের মধ্যেই অনেক কাঠ কেটে একটা মস্ত বড় বোঝা পিঠে করে সহরে গেল। সেখানে বেশ ভাল দামে তার কাঠের বোঝা বিক্রি হয়ে গেল। সন্ধ্যে বেলা খাবার জিনিষ-পত্র এবং উদ্বৃত্ত টাকা-কড়ি নিয়ে এসে মাকে বল্‌লো—মা, আর ভাব্‌তে হবে না। আমি আমাদের খোরাক জোগাড় করতে পারবো। মা খুব খুশী হলেন।

পরের দিনও কুড়ুল কাঁধে করে সে চল্‌লো বনের দিকে। আজ সে পাহাড়ের উপরে অনেক জায়গায় ভাল কাঠের সন্ধান করতে লাগলো। তার বরাত



কালো পাথরে গড়া মস্ত বড় একটা সিংহের মূর্ত্তি

ভালো—অনেক-কিছু ভাল কাঠ মিল্‌লো, সে-গুলোর আঁটি বেঁধে আর একটু দূর যেতেই সে দেখ্‌তে পেল, একটা ছোট ঝরণা ঝির ঝির করে বয়ে যাচ্ছে, তার এক পাশে কতকগুলি ছোট-বড় গাছ, সাম্‌নে একটু সমতল জায়গা, সেখানে কালো পাথরে গড়া মস্ত বড় একটা সিংহের মূর্ত্তি। সে ভাবলে—এ সিংহ নিশ্চয়ই এ বনের দেবতা। আমি যে এত সহজে ভাল কাঠ পাচ্ছি সে হচ্ছে এই দেবতারই দয়ায়; কাল সহর থেকে দু'টো মোমবাতি কিনে আন্‌বো, তারপর এই বনদেবতার পুজো করবো।

সেদিন সন্ধ্যার সময় সহর থেকে বাড়ী ফিরবার সময় সে বাজার থেকে দু'টো মোমবাতি কিনে নিয়ে এল

এবং পরদিন সেই সিংহের মূর্ত্তির কাছে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে মূর্ত্তির দুই দিকে মোমবাতি দুটি জ্বালিয়ে দিল। ও কি গো!—ঐ যে সিংহের মাথা নড়লো! সত্যই ত! সিংহ মুখ হাঁ করে গাঙ্ গাঙ্ শব্দে জিজ্ঞাসা করলো—তুমি এ কি কচ্ছো? ছোট ভাই বল্‌লো—প্রভু, আপনি বনদেবতা, তাই আপনাকে পূজো কচ্ছিলাম।

হুম্ হুম্ হুম—তা বেশ। কাল তুমি একটা ভাঁড় নিয়ে এস, আমি সেটা ভরে ধন রত্ন দিয়ে দিব। বেচারা ত হাতে আকাশ পেল। সে হাসি মুখে কাঠের বোঝা নিয়ে সহরে চলে গেল,—ফিরবার সময় একটা কাঠের বড় ভাঁড় কিনে নিয়ে এল।

পরদিন রোজ যেমন যায়, তেমনি সময়ে গিয়ে সিংহের মূর্ত্তির কাছে হাজির হল। সেদিনকার মত সে খুব ভক্তি করে সিংহকে নমস্কার করলো।

হুম্ হুম্ হুম্—সিংহ বল্‌লো, আমি যেকথা বল্‌ছি ঠিক সেই ভাবে কাজ কর। তুমি এই ভাঁড়টি আমার মুখের নীচে ধর, আমার মুখের ভিতর থেকে সোনা বের হবে, ভাঁড় যখন প্রায় ভরে আসবে তখন



মা হাসলেন

তুমি আমাকে বোলো; সাবধান, যেন এক টুকরো সোনাও মাটিতে গড়িয়ে না পড়ে; তাহলে কিন্তু ভয়ানক বিপদ ঘট্‌বে। ছোট ভাই সিংহের কথা একটুও নড়চড় করলো না। সোনায় সোনায় যখন প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এল সেই কাঠের ভাঁড়, তখন সে সিংহকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিল। অমনি সোনা পড়া ক্ষান্ত হল। অনেক স্তুতি-ভক্তি জানিয়ে সোনায় পরিপূর্ণ ভাঁড় হাতে ছোট ভাই মার কাছে সেই কুঁড়ে ঘরে নিয়ে এল। মা দেখে ত অবাক্, ভয়ে অস্থির! ছেলে যখন সব কথা বুঝিয়ে বল্‌লো, তখন মা হাস্‌লেন! মার বুকে আনন্দের জোয়ার খেলে যেতে লাগ্‌লো।

আর কি দুঃখ থাকে? মা ও ছেলে মস্ত বড় বাড়ী করলেন, ক্ষেত-খামার করলেন। গরু, ঘোড়া, ছাগল, চমরী, উট, দাস-দাসীতে বাড়ী-ঘর ভরে গেল,—আর কোন দুঃখ রইল না।

২

কথা কি গোপন থাকে? বড় ভাইয়ের কাছে গিয়ে পৌছলো ছোট ভাইয়ের এই অতুল ধনরত্ন ও ঐশ্বর্য্যের কথা। বড় ভাইও তার বৌকে নিয়ে একদিন ছোট ভাইয়ের বাড়ী এসে উপস্থিত হল। ছোট ভাই তখন বাড়ী ছিল না, সে ব্যস্ত ছিল তার ক্ষেত-খামারের কাজে। মা, বড় ছেলে আর বৌকে খুব আদর-যত্ন করে তাদের খাওয়া দাওয়া ও থাক্‌বার ব্যবস্থা করে দিলেন।

সন্ধ্যেবেলা ছোট ভাই বাড়ী ফিরে এসে বড় ভাই ও তার স্ত্রীকে দেখে খুবই খুসী হল এবং কি ভাবে কেমন করে তার অবস্থা ফিরলো, সব কথা মনের আনন্দে বড় ভাইকে বল্‌লো এবং তার মত বিধি-ব্যবস্থা করলে সেও খুব বড় লোক হতে পারবে, এমন কথা বল্‌তেও কোন দ্বিধা করলো না।

পরদিন বড় ভাই ও তাহার স্ত্রী বাড়ী ফিরে গেল। তার পর বাজার থেকে খুব মস্ত বড় একটা ভাঁড় কিনে নিয়ে চল্‌লো সেই বনে সিংহের সন্ধানে। সহজেই সিংহের মূর্ত্তি খুঁজে পেল। যেমন দেখা, অমনি তাড়াতাড়ি মোমবাতি দু'টি জ্বালিয়ে দিয়ে একেবারে মাটিতে পড়ে লম্বা হয়ে শুয়ে সিংহ-মূর্ত্তির কাছে প্রার্থনা জানাতে লাগলো—আমায় ধন দাও, সোনা দাও—যেমন আমার ছোট ভাইকে দিয়েছ।

হুম্ হুম্ হুম্—সিংহ গর্জ্জন করে উঠে বল্‌লো, তুমি কি চাও? তুমি কে?

বড় ভাই দিলে তার পরিচয়, বল্‌লো, তুমি আমার ছোট ভাইয়ের প্রতি যেমন দয়া দেখিয়েছ, তেমনি আমার প্রতিও দয়া কর। আমাকেও সোনা দাও।

সিংহ বল্‌লো—গাঙ্ গাঙ্! বেশ কথা। তোমার ঐ ভাঁড়টি আমার মুখের কাছে ধর, আমার মুখ

নিয়ে সোণা ঝরে পড়বে, তোমার ভাঁড় যখন প্রায় ভরে উঠ্‌বে, তখন আমাকে ব'লো ; সাবধান, যদি কোন রকমে সোণা গড়িয়ে মাটিতে পড়ে তবে কিন্তু ভয়ানক বিপদ ঘট্‌বে।

বড় ভাই মহা আনন্দে সেই মস্ত বড় ভাঁড়টা সিংহের মুখের কাছে ধরলো, আর অমনি গল্ গল্ করে সোণা ঝরে পড়তে লাগলো। সোণায় সোণায় ভাঁড়টি ভর্ত্তি হ'য়ে উপ্‌চে পড়ে যেতে লাগলো সোণা নীচে—লোভী বড় ভাই, ভাঁড়টি যখন প্রায় ভর্ত্তি হয়ে এসেছিল, তখন সিংহকে আর সে কথা বলে নাই। হঠাৎ সোণার ঝরণা-ধারা থেমে গেল। সিংহ হুম্ হুম্ করে বললো—দেখ, আমার গলার ভিতর খুব মস্ত বড় এক টুকরো সোণা আট্‌কে রয়েছে—তোমার হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে সেই সোণাটা নিয়ে এস তো!

বড় ভাই লোভী মানুষ, ভাবলে না জানি আরও কত বড় একখণ্ড সোণা পাবে, এই না ভেবে যেমন হাত ঢুকিয়ে দিল সিংহের মুখে—অমনি সিংহের দুই দিকের দুই চোয়াল ক্রম্ করে আট্‌কে দিল বড় ভাইয়ের হাত। হাত আর কিছুতেই সে বার করতে পারলো না। কত কাকুতি, কত মিনতি করলো—কোন ফলই হলো না। এদিকে সে দেখলো ভাঁড়ে এক রত্তি সোণাও নেই, আছে শুধু পাথরের টুক্‌রো আর মাটির ডেলা।

সন্ধ্যার সময় স্বামীর খোঁজে এল বড় ভাইয়ের স্ত্রী। সে স্বামীর কাছে জিজ্ঞাসা করলো—একি, তোমার এ দুর্দ্দশা কেন? বড় ভাই আগাগোড়া সব কথা খুলে বললো। বল্‌লো, আমার আর এমন ক্ষমতা নেই যে, আমি সিংহের মুখের ভিতর হ'তে হাত বার করে নিতে পারি।

৩

বড় ভাইয়ের স্ত্রী কি আর করবে? কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বাড়ী ফিরে গেল। সে প্রতিদিন দু'বেলা স্বামীকে খাবার দিতে আস্‌ত, আর সিংহকে মিনতি জানিয়ে বল্‌ত ওকে দয়া কর! দিনের পর দিন যায়, মাসের পর মাস যায়—সে তার সব বেচে কিনে স্বামীকে খাওয়াতে লাগলো। শেষটায় এমন হল যে, কিছুই সে সংগ্রহ করতে পারে না। একদিন মধ্যাহ্নে সে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে স্বামীর কাছে এসে বল্‌লো—আজ আর আমি তোমার জন্য কোন খাবার আন্‌তে পারিনি, ঘরে কিছু নেই, এখন আমাদের দু'জনকেই উপোস্ করে মরতে হবে।

হা-হা-হা—হুম্-হুম্-হুম্—সিংহ একথা শুনে বিকট শব্দে হেসে উঠ্‌লো—অমনি তার দুই চোয়াল খুলে গেল। অমনি বড় ভাই তাড়াতাড়ি তার হাত বার করে নিয়ে ছুটে পালালো! দৌড়তে দৌড়তে তারা দুই জনে গিয়ে হাজির হল ছোট ভাইয়ের বাড়ীতে। ছোট ভাই, বড় ভাইয়ের কাছে তার দুরবস্থার কথা শুনে খুব গাল-মন্দ দিল ; বললো যারা অতি লোভী, তাদের অদৃষ্টে এমনি সাজাই হয়। ছোট ভাই বড়



যারা অতি লোভী হয় তাদের এমন সাজাই হয়

ভাইয়ের সব দোষ ক্ষমা করে অনেক টাকা দিয়ে ক্ষেত-খামার, বাড়ী-ঘর তৈরী করে দিয়ে বল্‌লো—এবার থেকে আর লোভ করো না—ক্ষেত-খামার দেখে শুনে শান্তিতে থাক।

একদিন যে ছোট ভাইকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে এতটুকু কুণ্ঠা করে নি, আজ সেই ছোট ভাইয়ের কৃপা ও যত্নে তার বাঁচবার পথ হল।

এদিকে ছোট ভাই মাকে নিয়ে পরম সুখে ও শান্তিতে বাস করতে লাগ্‌লো—অতি সুখে তাদের দিন যেতে লাগলো।

চীনের বুল্‌বুল্‌

(চীনদেশের গল্প)

অনেক—অনেক দিন আগে চীনদেশে এক রাজা ছিলেন—যাঁর সময় চীনের রাজপুরী ছিল পৃথিবীর সব চাইতে সেরা অট্টালিকা। কিন্তু সে রাজপুরী এত ভঙ্গুর যে, গুঁড়ো গুঁড়ো হ'য়ে ধূলার সাথে মিশে যায়।

সেই রাজপুরীর বাগানে চমৎকার সব ফুল ফুটে থাকতো। প্রত্যেকটি ফুলের সঙ্গে একটি করে ছোট্ট রূপোর ঘণ্টা সব সময় টুং টুং করে বাজতো। যে কেউ রাস্তা দিয়ে যেতো সেই বাগানের দিকে একবারটি চোখ না ফিরিয়ে যাবার উপায় ছিল না।

কিন্তু সেই বাগানের যে শেষ কোথায়, তা কেউ জানতো না। তবে শোনা যেতো, এর শেষে সুন্দর বনভূমি এবং স্নিগ্ধ হ্রদের জল সকলকারই মনোহরণ করত। সেই বন-ভূমির একটি সুউচ্চ বৃক্ষশাখায় একটি বুলবুল আপন মনে এমন চমৎকার গান গাইত যে, হ্রদের জেলের দল গান শুন্‌তে শুন্‌তে জাল টান্‌তে ভুলে যেতো।

দূর দেশের পথিক সেই বনভূমিতে এসে এক মুহূর্ত্ত বুল্‌বুলের গান শুনে ফুল্লমনে আবার রাস্তা চল্‌তে সুরু করত। দেশে গিয়ে গল্প করত এমনটি আর হয় না।

এই বুল্‌বুল্‌কে নিয়ে দেশের লেখক ও কবির দল যে কত গল্প, কত কবিতা, কত ছড়া নানাভাবে নানাভঙ্গীতে রচনা করে ফেল্‌লে, তার আর সীমা-সংখ্যা নেই।

একখানা পুঁথি হঠাৎ গিয়ে চীনদেশের রাজার হাতে পড়ল। সোনার সিংহাসনে বসে রাজা তার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় দেখ্‌তে পেলেন, লেখা আছে—"চীন-সাম্রাজ্যের সেরা জিনিষ হচ্ছে—হ্রদের ধারের বুল্‌বুল্‌।"

রাজা অবাক্ হয়ে ভাব্‌লেন, তাই তো, আমি রাজ্যের রাজা অথচ রাজ্যের সেরা জিনিষটিই আমি কখনও চোখে দেখিনি।

রাজার আহ্বানে মন্ত্রী এলো, সেনাপতি এলো, সহর কোটাল এলো—আর এলো রাজার প্রধান পার্শ্বচর।

সবাই বল্‌লে, বুল্‌বুল্‌। কৈ, তাকে ত কোন রাজসভায় দেখিনি।

রাজা বল্‌লেন, আমি চাই—আজ সন্ধ্যায় এসে বুল্‌বুল্‌ আমাকে গান শোনাবে।

প্রধান পার্শ্বচর তখন রাজপুরীর সমস্ত সিঁড়ি ওঠা নামা করে প্রত্যেকটি জানালা ভালো করে দেখে রাজার কাছে ফিরে গিয়ে বল্‌লেন, মহারাজ, ও বুল্‌বুল্‌ টুল্‌বুল্‌ সব ফাঁকির কথা—কবিদের কল্পনা—ও আপনি বিশ্বাস করবেন না।

রাজা মাথা নেড়ে বল্লেন, উঁহু। পুঁথির প্রত্যেকটি জিনিষই ত' আমার রাজ্যে আছে। একটা কথাও ত' মিথ্যা লেখা হয়নি। বুল্‌বুলের কথাই বা মিথ্যা হবে কেন? আর তা ছাড়া স্বয়ং জাপানের রাজা এই পুঁথি আমায় পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছেন—আমি কোন কথা শুনতে চাইনে। আজ সন্ধ্যের সময় যদি বুলবুলের গান না শুনতে পাই ত, রাজসভার সমস্ত লোককে মেরে ফেলা হবে।

সমস্ত জগৎ চীনদেশের বুল্‌বুলের কথা শুনেছিল—শোনে নি কেবল সেই দেশের রাজসভার লোক। কাজেই, তারা সবাই প্রধান পার্শ্বচরের সঙ্গে রাজ-পুরীর প্রত্যেকটি কক্ষ আঁতি-পাঁতি করে খুঁজে দেখতে লাগ্‌লো।

রাজার পাকশালার একটি ছোট্ট মেয়ে খিলখিল করে হেসে হাততালি দিয়ে বল্লে, ওগো তোমরা মিছে খুঁজে মরছ। সে থাকে গাছের শাখে—হ্রদের তীরে। আমি যখন মাকে খাবার দিয়ে ফিরে আসি, তখন তার গান শুনে আমার পথের সমস্ত কষ্ট দূর হ'য়ে যায়—চোখে জল আসে; মনে হয় মা আমার চুমো খাচ্ছে।

প্রধান পার্শ্বচর তখন দলবল নিয়ে ছোট্ট মেয়েটির সঙ্গে সেই বনের উদ্দেশ্যে রওনা হ'ল। আর তাকে বল্লে, যদি বুল্‌বুল্‌কে পাওয়া যায় তো তোমায় রাজার পাকশালে পাকা রাঁধুনি করে রাখা হ'বে।

একজন প্রধান সভাসদ চল্‌তে চল্‌তে কিসের ডাক শুনে বলে উঠ্‌লেন, আর ভাবনা নেই, এইবার তাকে পাওয়া গেছে। ছোট্ট মেয়েটি খিল্‌ খিল্‌ করে হেসে উঠে বল্লে, না—না—ও ত একটা গরুর ডাক—

আরো খানিকটা এগিয়ে রাজসভার ঘোষক চম্‌কে দাঁড়িয়ে বল্লেন, চমৎকার—এইবার স্থিরনিশ্চয়—ঠিক যেন মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ!

মেয়েটি বলে উঠ্‌ল, ওটা কেন হ'বে? ও ত ব্যাঙ ডাক্‌ছে! কিন্তু আমরা প্রায় এসে পড়েছি—আর বেশী দূর যেতে হ'বে না। এই বলে আঙ্গুল দিয়ে একটা উঁচু গাছের ডালে একটি ছোট পাখীকে দেখিয়ে দিলে।

প্রধান পার্শ্বচর বল্লেন, এ যে একেবারে সাদা-সিদে! নিশ্চয়ই রাজসভার লোকদের দেখে পাখীটা ভয়ে তার রঙ বদ্‌লে ফেলেছে।



মেয়েটি হাত তুলে বল্লে

মেয়েটি হাত তুলে বল্লে ছোট্ট পাখী, আমাদের রাজা তোমার গান শুন্‌তে চেয়েছেন।

—নিশ্চয়ই গাইব—বলে বুল্‌বুল্‌ এমন চমৎকার গান গাইতে সুরু করলে যে, সবাই শুনে অবাক।

প্রধান পার্শ্বচর বল্লে, অপূর্ব্ব! কি আশ্চর্য্য আমরা আগে এর কথা জান্‌তাম না।

বুল্‌বুল্‌ মনে করলে, নিশ্চয়ই এর ভেতর রাজাও আছেন, তাই শুধোলে, রাজা মশাই কি আর একটা গান শুন্‌বেন?

প্রধান পার্শ্বচর বল্লেন, আজ সন্ধ্যাবেলা রাজাকে গান শোনাতে তোমায় আমি নিমন্ত্রণ কচ্ছি—

পাখী মাথা নেড়ে বল্লে, আমার গান বনেই শুন্‌তে ভালো। কিন্তু রাজা মশাই যখন শুন্‌তে চেয়েছেন—তখন নিশ্চয়ই আমি যাবো।

সন্ধ্যাবেলা রাজ্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল। গোটা রাজপুরীটা সেজেগুজে যেন লক্ষ লক্ষ সোনার প্রদীপের মতো জল্‌তে লাগ্‌লো।

বুলবুল আজ রাজাকে গান শোনাবে। রাজা সমস্ত রাজসভার লোককে নিয়ে আকুল আগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগ্‌লেন। পাকশালার ছোট্ট মেয়েটিকে দরজার পাশে দাঁড়াবার ঠাঁই দেওয়া হ'ল। কেন না, সে তখন রাজ পাচিকা আখ্যা লাভ করেছিল।

রাজা মাথা নেড়ে গাইবার অনুমতি দিলে বুল্‌বুল্‌ গান গাইতে সুরু করলে। পাখী এত মিষ্টি গান গাইলে যে, রাজার চ'চোখ আপনা থেকেই জলে ভরে এলো। পাখী তখন আরো মধুর কণ্ঠে রাজাকে গান শোনাতে লাগলো।

রাজা তখন উচ্ছ্বসিত হ'য়ে বল্লেন, পাখীর গলায় সোনার মালা ঝুলিয়ে দেওয়া হ'বে।

পাখী কিন্তু মাথা নেড়ে বলে, রাজা মশাই, আমি কোনো পুরস্কার চাইনে। আমি আপনার চোখে জল দেখেছি। সম্রাটের চোখের জলই আমার গান শোনাবার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রাজসভার সহচরী থেকে সুরু করে সেদিন রাজপুরীতে এমন কেউ ছিল না যে, বুলবুলের সুধা-কণ্ঠের গান শুনে মুগ্ধ হয়নি।

রাজা তখন আদেশ দিলেন, রাজপুরীর ভেতর মণিমাণিক্য-খচিত খাঁচায় পাখীটির থাক্‌বার ব্যবস্থা হ'বে।

দিনে ত্বার এবং রাত্রে একবার করে তার বাইরে যাবার অধিকার থাক্‌বে। বারো জন দাস সব সময় তার পরিচর্য্যা করবে এবং তাদের প্রত্যেকে একটি রেশমের সূতো পাখীটির পায়ের সঙ্গে বেঁধে রাখ্‌বে।

সহর শুদ্ধ লোকের মুখে শুধু ঐ পাখীর কথা। এমন কি, কত ছেলে মেয়ের নাম রাখা হল বুল্‌-বুল। কিন্তু শুধু ঐ নামই। কারো গলা দিয়ে অমন মিষ্টি গান বেরুলো না।

একদিন চীনের রাজা একটি কৌটো উপঢৌকন পেলেন—তার উপর লেখা 'বুল্‌বুল্‌।' রাজা মনে করলেন, তাঁর বুল্‌বুল্‌ সম্বন্ধে নূতন কোনো পুঁথি। কিন্তু কৌটো খুলে দেখেন তার ভেতর কৃত্রিম একটি বুল্‌বুল্‌ পাখী। ঢাক্‌না তোল্‌বামাত্র সে আসল

বুল্‌বুলের গাওয়া একটি গান গাইতে সুরু করে দিলে। পাখীটির ল্যাজ আগাগোড়া মণিমুক্তাখচিত। তার গলায় ছোট্ট করে লেখা— "চীনের রাজার বুল-বুলের তুলনায় জাপান রাজের পাখী অতি নিকৃষ্ট।"



দেখেন তার ভেতর কৃত্রিম একটি বুল্‌বুল্‌ পাখী

সবাই নতুন পাখী পেয়ে খুসী হয়ে উঠ্‌ল। যে লোকটা পাখীটাকে এনেছিল, রাজসভা থেকে তাকে একটা বড় উপাধি দেওয়া হল। সবাই বল্লে, দুটো পাখীকে এক সঙ্গে গাওয়ান হোক। কিন্তু তা হবে কি করে? বনের পাখী আপন মনে গলা খুলে গায়—আর কলের পাখীর আট-ঘাট সব বাঁধা। দুটোতে মিল থাকবে কি করে?

রাজার সভা-গায়ক মাথা নেড়ে বল্লেন, কিন্তু কলের পাখীই তাল বজায় রাখে ভালো, এতটুকু খুঁত নেই। সঙ্গীতের সমস্ত ব্যাকরণ ও মেনে চলে।

কলের পাখীর সুবিধে এই যে, ইচ্ছে করলেই তাকে দিয়ে গাওয়ানো চলে। তা ছাড়া সমস্তটা দেহ ওর মণি-মুক্তো দিয়ে চমৎকার করে গড়া।

সবাই তাকে নিয়ে মেতে উঠ্‌ল। এদিকে ফাঁক পেয়ে আসল বুল্‌বুল্‌ বনে পালিয়ে গেল। রাজা যখন তার খোঁজ করলেন তাকে আর রাজপ্রাসাদে খুঁজে পাওয়া গেল না।

পরদিন রাজার আদেশ পেয়ে সঙ্গীতজ্ঞের দল প্রজাদের সেই নকল পাখীর গান শোনালে। সবাই শুনে ভারী খুসী। কিন্তু গরীব জেলের দল মুখ ছোট করে বল্লে, আমাদের সেই পাখীর মতো এর গলা নয়।

নকল পাখীটির থাকবার ঠাঁই হল—ঠিক রাজার শোবার বিছানার পাশেই। যখন খুসী রাজা গান শোনেন।

রাজা শুদ্ধ লোক সেই পাখীর গান কণ্ঠস্থ করে ফেল্লে। সবার মুখেই ঐ এক গান। রাজ্যের সঙ্গীতজ্ঞের দল নকল পাখীর গান সম্বন্ধে পঁচিশ খানি বিরাট্‌ গ্রন্থ রচনা করে ফেল্লে। তা দুর্ব্বোধ্য শক্ত শক্ত কথায় ভর্ত্তি। সবাই গর্দ্দান যাবার ভয়ে একবাক্যে বল্‌তে লাগলো—ও বই আমরা আগা-গোড়া পড়েছি—এমন গ্রন্থ আর হয় না।

আসল পাখীর সঙ্গে গান গাওয়া কারো সাধ্যি ছিল না। কিন্তু রাজা থেকে সুরু করে রাজ্য শুদ্ধ সবাই এই নকল পাখীর গলা অনুকরণ করে গান গেয়ে রাস্তা চলে। সবাই ভারী খুসী।

এই করে এক বছর কেটে গেল।

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যে বেলা ক্রিং-ক্রিক্ খর্ খর্ শব্দ করে নকল পাখীর গান বন্ধ হ'য়ে গেল।

রাজার সুখ-শয্যার ঘুম ভেঙে গেল। রাজার যত যন্ত্র বিশারদের মাথা সব একসঙ্গে এসে জুট্‌ল। অনেক কায়দা করে এই স্থির হ'ল যে, পাখীকে বছরে শুধু একবার গাওয়ানো চলবে। সঙ্গীতজ্ঞের দল সবাইকে শক্ত শক্ত কথায় বুঝিয়ে দিলে এই হওয়াই ত উচিত।

তারপর আরো পাঁচ বছর কেটে গেল। চীনের রাজা মরণাপন্ন কাতর। প্রজাদের চিন্তার অবধি নেই। ইতিমধ্যে আর একজন নতুন রাজা নির্ব্বাচন করা হ'য়ে গিয়েছিল। রাজা অসাড় হ'য়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন। সবাই ভাব্‌লে, তিনি আর প্রাণে বেঁচে নেই। তাই নতুন রাজাকে সম্মান দেখাতে দল বেঁধে ছুট্‌ল। এদিকে রাজার মনে তখন সমস্ত জীবনের ভালো কাজ আর মন্দ কাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেছে। তারই ফলে রাজার প্রাণ যায় আর কি! তিনি চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, দুন্দুভি বাজিয়ে ওদের কণ্ঠ রোধ কর। আমাকে গান শোনাও—

তারপর রাজা কলের পাখীকে কত অনুরোধ করে বল্লেন, তোমার গলায় আমি সোণার মালা ঝুলিয়ে দিয়েছি—তুমি আমায় একটি গান শোনাও। কিন্তু পাখী নীরব রইল।



রাজা অসাড় হয়ে বিছানায় পড়ে ছিলেন

ঠিক এমনি সময় দূর থেকে সেই আসল বুল্‌বুলের কণ্ঠ শোনা গেল। ধীরে ধীরে রাজার দেহে শোণিত প্রবাহিত হ'তে লাগ্‌ল। সেই সঙ্গীতের অপূর্ব্ব মূর্চ্ছনা শুনে মৃত্যু নিজে সোল্লাসে বল্লে, গাও পাখী, গাও—

তারপর চল্লো গানের পর গান—সে গাইল মন্দির-প্রাঙ্গণের সাদা গোলাপের গান—সে গাইল ফুলের গন্ধের গান—সে গাইল শিশির-ভেজা ঘাসের গান! নদীর কলতানে যে সুরের ঝঙ্কার শোনা যায়, বন-মর্ম্মরে সঙ্গীতের যে মূর্চ্ছনা জেগে ওঠে, সেই পাখীর গানের সুরঝঙ্কার বিশ্ববাসীকে আজ কোন্ অজানা দেশের বাণী শুনিয়ে দিল।

একটা জমাট কুয়াসার মতো মৃত্যু ধীরে ধীরে বাতায়ন পথ দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল। রাজা বল্লেন, পাখী, তুমি আমায় বাঁচিয়েছ। কি পুরস্কার চাও বল—

পাখী বলে, রাজা, তোমার যখন কোন কষ্ট হবে, আমি এমনি করে এসে আবার তোমায় আরাম করবো। একদিন তোমার চোখে আমি জল দেখেছি, সেই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

রাজা বল্লে, তুমি আমার কাছেই থাকো। পাখী বলে, তা হয় না রাজা। লক্ষ লক্ষ পীড়িত লোককে আমায় সান্ত্বনা দিতে হয়। অভাবের তাড়নায় যারা চোখের জল ফেলে এই পৃথিবীতে অন্ধকার দেখে, কুটিল কুচক্রীর ষড়্‌যন্ত্রে পড়ে যেখানে সরলহৃদয় সাধুব্যক্তিরা হা-হুতাশ করে, যেখানে হিংসা দ্বেষ প্রবল হয়ে সত্য ও প্রেমের রাজ্যকে আঁধার করে দেয়—আমাকে সেখানে আশার আলো জ্বেলে দিতে হয়। ক্ষুদ্রেরও যে বড় কাজ আছে, আমি আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করে থাকি, রাজা! তাই আমি তোমার কাছে থাক্‌তে পারবো না। তবে যে সুখদুঃখের কথা কেউ তোমায় বলে না, তাই আমি এসে তোমায় শোনাবো। কিন্তু তুমি কাউকে প্রকাশ করতে পারবে না একটি ছোট্ট পাখী এসে তোমায় সব গোপন কথা বলে দেয়!

এই বলে বুল্‌বুল্‌ ফুড়ুৎ করে উড়ে বনে পালিয়ে গেল।

এর খানিক বাদে রাজপুরীর দাস-দাসীরা যখন তাদের মৃত-রাজাকে দেখ্‌তে এলো—রাজা নিজে এগিয়ে গিয়ে সবাইকে হাসি-মুখে বল্লেন—'সুপ্রভাত'!



সেকালের স্তন্যপায়ী জীব

৬৭ পৃষ্ঠার পর

বৃহদাকার সরীসৃপদের জীবলীলা শেষ হইবার অনেক কাল পর স্তন্যপায়ী জীবেরা আসিয়া পৃথিবীর বুকে দেখা দিল। তাহারা যখন আসিল, তখন পৃথিবীর রূপের অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। তখন পৃথিবীর তেজ অনেক হ্রাস পাইয়া অনেকটা আজকালকার মত হইয়াছে। আজকাল যেমন ঋতুর পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, তেমনিভাবে সেকালেও শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি ঋতুর পরিবর্ত্তন হইতে আরম্ভ করিয়াছে। পৃথিবীর বুকে গাছপালা জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং বর্ত্তমান সময়ে আমরা যে সকল জীবজন্তু দেখিতে পাইতেছি তাহারাও ক্রমে ক্রমে জন্মিতে আরম্ভ করিয়াছে। স্তন্যপায়ী জীবের আবির্ভাবকালের পূর্ব্বসময় হইতে আমরা সেকালের শেষ যুগ বলিতে পারি। এসময় হইতেই ধীরে ধীরে স্তন্যপায়ী জীবের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল—বাড়িতে বাড়িতে শেষে ইহার পূর্ণ পরিণতি হইল মনুষ্যের জন্মে।

স্তন্যপায়ী জীব

যে সমুদয় প্রাণী শিশুকালে মায়ের বুকের স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করে, আমরা তাহাদিগকেই স্তন্যপায়ী জীব বলি। পৃথিবীতে যত জাতীয় প্রাণী আছে তাহাদের মধ্যে ইহারাই প্রধান। মানুষ স্তন্যপায়ী জীব— মানুষ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ প্রাণী। মানুষ-সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই আমরা সেকাল হইতে একালে আসিলাম।

একটা আশ্চর্য্যের কথা এই যে, আজকাল আমরা যে সকল জন্তুকে বৃহদাকার দেখিতে পাই, সেই সব জন্তুই সৃষ্টির সেই প্রথম সময়ে দেখিতে খুব ছোট ছোট ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ঘোড়ার কথা বলিতে পারি।



প্রথম অবস্থায় ঘোড়া দেখিতে খুব ছোট ছিল—কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহার কত না আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

সেকালের হাতী ও একালের হাতীর সহিত তুলনা করিলেও একথা বুঝিতে পারা যাইবে। সেই আদিযুগের হাতীর আকার ছিল খুবই ছোট. মিশরদেশে ইহার কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। একটা কথা তোমাদের কাছে আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইবে, কিন্তু কথাটা যে সত্য, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সেকালের হাতীর শুঁড় ছিল না। কিন্তু হাতীর আকারের উন্নতি ক্রমবিকাশের দিক্ দিয়া খুবই তাড়াতাড়ি হইয়াছিল, বলা যাইতে পারে।

সে যুগের স্তন্যপায়ী জন্তুদের প্রায় সকল গুলিই ছিল স্থূলচর্ম্মী, (মোটা চামড়াওয়ালা) —দৃষ্টান্ত স্বরূপ হাতী, গণ্ডার, টেপির, শূকর প্রভৃতির নাম করিতে পারি।

প্যালিয়োথারিয়ম

স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে সকলের আগে যে প্রাণীর হাড় পাওয়া গিয়াছে, তাহার নাম পণ্ডিতেরা দিয়াছিলেন প্যালিয়োথারিয়ম অর্থাৎ প্রাচীন জন্তু। এই জাতীয় প্রাণীরা ছিল উদ্ভিদ্‌ভোজী। কাহারও কোন অনিষ্ট করিত না। দল বাঁধিয়া চলা-ফেরা করিত।

ইহাদের আবির্ভাবের কিছুকাল পরে নানাজাতীয় হাতী পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। এই শ্রেণীর হাতিজাতীয় জন্তুদের মধ্যে অনেকগুলিই আমাদের বর্ত্তমান সময়ের হাতীর চেয়ে আকারে বড় ছিল। সকলের আগে যে হস্তিজাতীয় জন্তুর চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় পণ্ডিতেরা

ডাইনোথিরিয়ম

তাহার নামকরণ করিয়াছেন 'ডাইনোথিরিয়াম'। এজন্তু ছিল অতি ভয়ানক রকমের। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এত বড় স্থলচর জন্তু আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে জন্মে নাই। এই জন্তুর যে মাথার খুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার আকার শুনিলে তোমরা আশ্চর্য্য হইবে। মাথাটা ছিল তিন হাত লম্বা আর চওড়া ছিল প্রায় দুই হাতেরও উপর। ইহাদের দাঁত দুইটি ছিল অদ্ভুত রকমের। এত বড় দুইটা বড় বড় দাঁত দিয়া তাহারা কি করিত, সে-কথা বলা বড় কঠিন। এই দাঁত দিয়া যে তাহারা শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিত, তাহাও ত মনে হয় না। বোধ হয়, ইহারা শুঁড় দিয়া গাছ টানিয়া নামাইয়া আনিত এবং দাঁত দিয়া উহা শক্ত করিয়া আটকাইয়া রাখিয়া গাছের ডাল-পাতা খাইত। তোমরা দেখিতে পাও যে, জলের ভিতর এবং কর্দ্দমাক্ত ডোবার ভিতর



টিনোসেরাস জাতীয় প্রাণী

মহিষেরা কেমন আরামে পড়িয়া থাকে। এই জন্তুটিও বোধ হয় তীরের কোন গাছের সঙ্গে দাঁত আটকাইয়া আরামে জলে শুইয়া থাকিত।

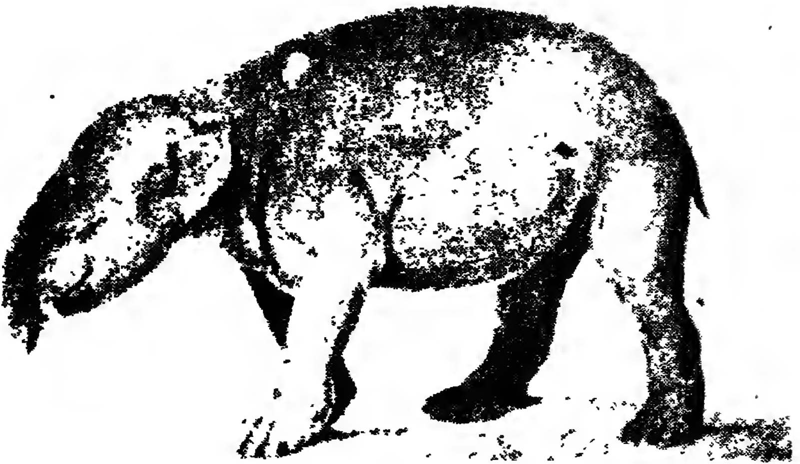
ম্যামথ (Mammoth)-জাতীয় জন্তু আমাদের ভারতবর্ষের হাতীর মতই অনেকটা দেখিতে ছিল। ইউরোপ ও এশিয়ায় অনেক ম্যামথের দাঁত, অস্থি ও দেহের অন্যান্য অংশ পাওয়া গিয়াছে। ম্যামথ ছিল



টেপির জাতীয় পশু

স্থলচর্ম্মী জন্তু, কিন্তু ইহার সারা গায়ে থাকিত লম্বা লম্বা লোম।

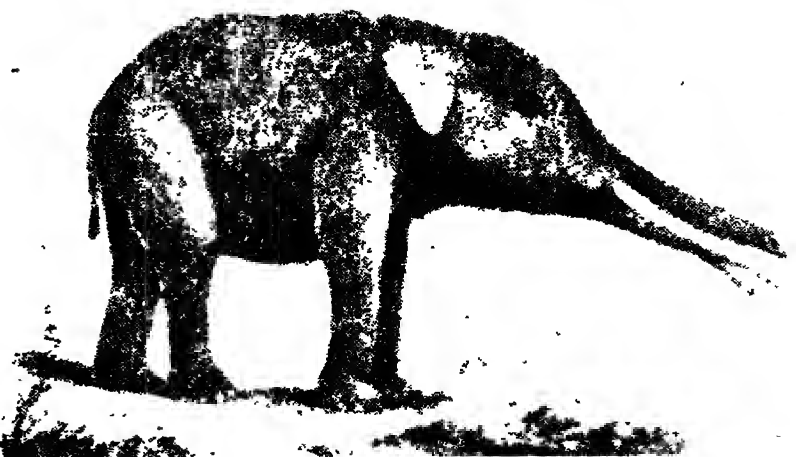
ম্যামথ আকারে হাতীর মতই বড় হইত। অনেকে মনে করেন যে, পরবর্ত্তী সময়ে ম্যামথেরা বেশীর ভাগ এশিয়া এবং সাইবেরিয়ায় বাস করিত; ইউরোপে তত নয়। উত্তর সাইবেরিয়াতে এখনও ম্যামথের অনেক মৃতদেহ পাওয়া যায়; সাইবেরিয়া অত্যন্ত শীতপ্রধান দেশ, অনেক স্থানে সেই প্রাচীন কাল হইতে তিন চারিশত ফুট উঁচু বরফের স্তূপ এখনও পর্য্যন্ত অগলিত অবস্থায় রহিয়াছে। এইরূপ বরফের স্তূপের নীচ হইতে অনেক সময়ে ম্যামথের মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। সেই কবে কোন্ সত্যিকালে হাজার হাজার বৎসর আগে ম্যামথেরা যেমনটি ছিল, তাহাদের মৃতদেহ ঠিক সেইরূপ অবস্থায়ই



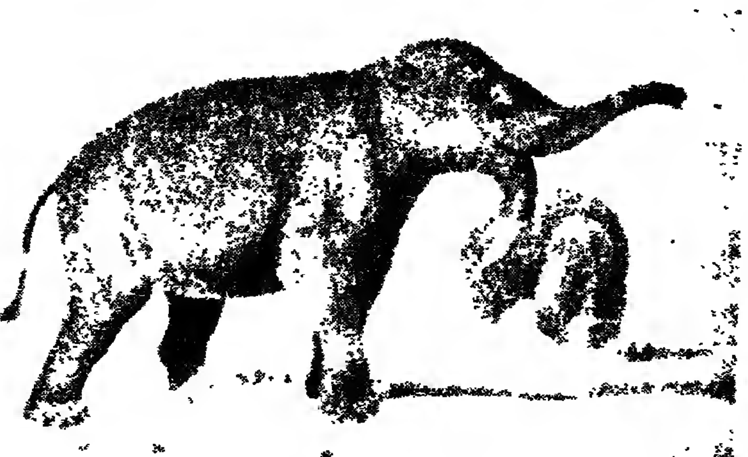
হাতীর পূর্ব্ব অবস্থা—মেবিথিরিয়াম



হাতীর পূর্ব্বপুরুষ—দ্বিতীয় অবস্থা—পেলিম্যাস্টোডান্



টেট্রাবেলোডোন



প্রাচীনকালের হাতী—ডাইনোথিরিয়ম








ম্যামথ



হাতীর পরিণতি




পাওয়া গিয়াছে—এতটুকু বিকৃত হয় নাই, এতটুকু পচে নাই—সর্ব্বদেহ অটুট রহিয়াছে।

১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে রুশদেশের বেক্কেনডফ নামে একজন ইঞ্জিনিয়ার একটা ম্যামথের মৃতদেহ পাইয়াছিলেন।



কেরিযোডন

ঐ ম্যামথটার আকার ছিল উচুতে ১৩ ফুট আর উহা দৈর্ঘ্যে ছিল ১৫ ফুট। এক একটা দাঁত ছিল আট ফুট লম্বা, উঁচু দিকে বাকান, শুঁড় ছিল প্রায় ছয় ফুট লম্বা। লেজ আর কান ব্যতীত উহার সারা শরীরেই ছিল লোম। পিঠে এবং ঘাড়ে ছিল এক ফুট লম্বা কেশরের মত মোটা মোটা লোম। ঐ লোমের নীচে ছিল ঘন ঘন পশম। লেজের আগায় ছিল মাত্র এক গোছা লোম। এই জন্তু দেখিতে যে কিরূপ ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা ছবি দেখিয়াই বেশ বুঝিতে পারিতেছ। এই জন্তুটির মৃতদেহ পেট্রো-গ্রেডের যাদুঘরে রক্ষিত আছে।



ব্রোন্টোপাস--উত্তর আমেরিকা

ম্যামথেরা মানুষের জন্ম সময় পর্য্যন্ত বাঁচিয়াছিল, সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। প্রাচীনকালের মানুষ ও প্রাচীনকালের ম্যামথের ছবি-চিহ্ন এক সঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। সেকালের মানুষ ম্যামথের দাঁতের উপর ম্যামথের যে ছবি আঁকিয়াছিল সেই ছবি শুদ্ধ দাঁত পাওয়া গিয়াছে। কাজেই, সেকালের মানুষ ও ম্যামথের যে একসঙ্গে বাঁচিয়াছিল তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই দাঁতের গায়ে আঁকা ছবি মানুষের অঙ্কিত প্রাচীনতম চিত্র এইরূপ বলা যাইতে পারে।

আমেরিকার যুক্ত-প্রদেশে মাষ্টোডোনের (Mastodon) একটা গোটা মৃতদেহ পাওয়া গিয়াছে। মাষ্টোডোন্ বয়সের হিসাবে ম্যামথ অপেক্ষাও প্রাচীন। ইহার শুঁড় দুই দাঁতের মাঝখান দিয়া লম্বিত হইয়া থাকিত। এক সময়ে ইউরোপ ও এশিয়ায় প্রচুর পরিমাণে মাষ্টোডোন্ বিদ্যমান ছিল

মাষ্টোডোন্ দেখিতে অনেকটা হাতীর মত হইলেও প্রকৃত পক্ষে মাথার দিক্ দিয়া, গলার দিক্ দিয়া এবং দাঁতের দিক্ দিয়া ইহারা আকারে হাতীর মত ছিল না

দক্ষিণ আমেরিকায় একটি বৃহদাকার জন্তুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। সেই জন্তুটির নাম মিগাথিরিয়ম। এইটি দন্তহীন শ্লথজাতীয় জন্তু, কিন্তু আকারে প্রায় হাতীর সমান বড় ছিল। ইহারা লম্বায় প্রায় ১৮ ফুট হইত। ইহাদের পিছন-দিকের পা, লেজ এবং কোমরের হাড়, হাতীর হাড়ের চেয়েও বড় এবং মজবুত ছিল। এই প্রাণি-দেহের অস্থি ইত্যাদির গঠন দেখিয়া মনে হয়, ইহারা অত্যন্ত শক্তি-শালী জন্তু ছিল। বড় বড় গাছ ভাঙ্গিয়া তারপর তাহাদের কচি কচি ডাল ও পাতা খাইয়া ইহারা জীবনধারণ করিত।

ভারতবর্ষেও প্রাচীনকালে একজাতীয় হাতী ছিল—তাহাদিগকে বলিত ষ্টিগোডন্ (Steppodon)। এই হাতীর একটি মাথা পাওয়া গিয়াছে। তাহা দাঁত শুদ্ধ চৌদ্দ ফুট লম্বা! এক একটি দাঁতই ছিল লম্বায় সাড়ে দশ ফুট্।

এতদ্ব্যতীত টেট্রাবেলোডন্ (Tetrabelodon), পেলে-মাষ্টোডন্ প্রভৃতি কয়েক জাতীয় বৃহদাকার স্তন্যপায়ী জন্তু ছিল। ইহাদের চারিটি অতি বৃহৎ দাঁত দুই চোয়ালে দেখিতে পাওয়া যাইত।

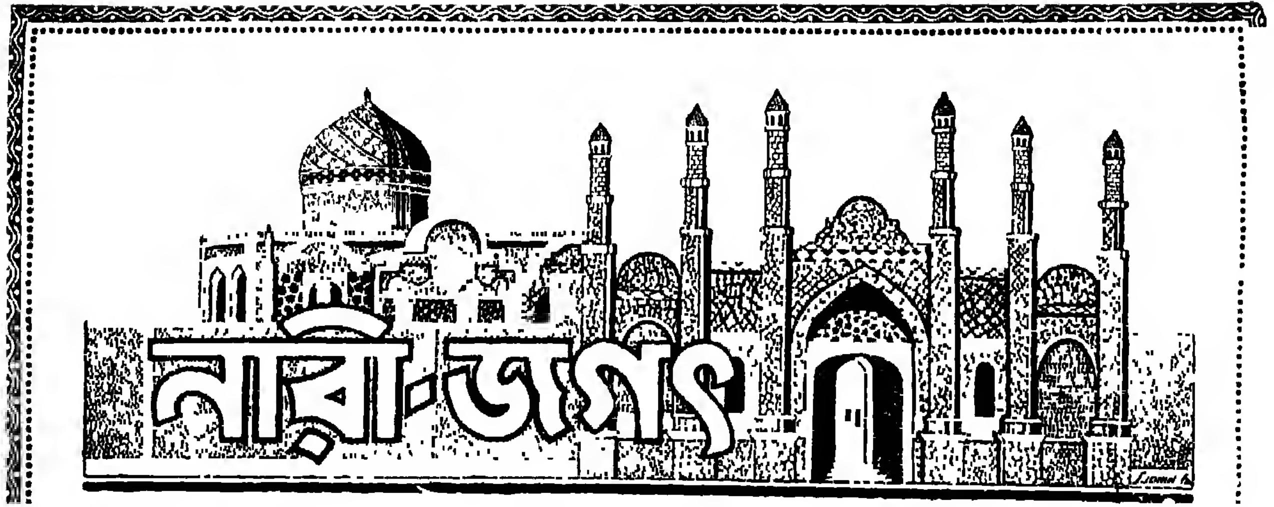


টিনোসেরাস

দিন দিন মাটির নীচ হইতে আরও কয়েক জাতীয় জীবজন্তুর দেহাবশেষ আমরা পাইতেছি। আধুনিক গণ্ডারের পূর্বপুরুষেরাও অতি বৃহদাকার ও দেখিতে অতি বিশ্রী রকমের জন্তু ছিল। এখানে তাহাদের দুই একটির নাম করিলাম। টাইটানোথিরিয়াম (Titanotherium) ও ব্রোন্টোপস্ (Brontopos) এই দুইটি গণ্ডার জাতীয় জন্তু উত্তর আমেরিকায় পাওয়া গিয়াছে। আর্সিনো-থিরিয়ম্ (Arsinotherium) নামক অদ্ভুত জন্তুটির দেহাবশেষ পাওয়া গিয়াছে মিশরের মরুভূমির মধ্যে। ইহাদের নাকের উপর দুইটি প্রকাণ্ড সিং ছিল।

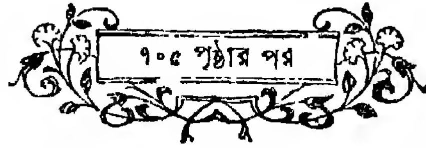


আর্সিনোথিরিয়ম



ধ্যানে ও ধর্ম্মে

রাবেয়া


১০৫ পৃষ্ঠার পর

তুরস্কদেশে বসোরা নগরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগে একটি দরিদ্র মুসলমান বাস করিতেন। তাঁহাব ছিল চারিটি কন্যা, ছোটটির নাম রাবেয়া। অনেকে বলেন, তাঁহাব জন্ম হইয়াছিল ৭১৭ খৃষ্টাব্দে।

পিতামাতা দরিদ্র ছিলেন বটে, কিন্তু বড়ই সৎ ও ধর্ম্মপ্রাণ ছিলেন। গল্প শোনা যায়—রাবেয়া যেদিন পৃথিবীতে আসিলেন, তাঁহাদের ঘর সেদিন অন্ধকার। তেলের অভাবে প্রদীপ জ্বালাইবার সামর্থ্য নাই। শিশুটি ভূমিষ্ঠ হইলে মা যে তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইবেন, এমন একটু ছিন্নবস্ত্রও তাঁহাদের নাই। মা নিরুপায় হইয়া বলিলেন, "প্রতিবেশীদের কাহারও নিকট হইতে আজকার মত একটু ছিন্নবস্ত্র চাহিয়া আন।"

কিন্তু পিতা তাহা পারিলেন না। ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহারও কাছে তিনি কোনও ভিক্ষা করিবেন না, এই ছিল তাঁহার জীবনের পণ।

সন্তানের জন্মমুহূর্ত্তেও তাহার আরামের ব্যবস্থা করিতে না পারিয়া মাতার প্রাণে ব্যথা লাগিল। কিন্তু বুকের দুঃখ বুকে চাপিয়া ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া তিনি কখন্ ঘুমাইয়া পড়িলেন। গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখিলেন, মুসলমানের গুরু মহম্মদ সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতেছেন, "দুঃখ করিও না। এই যে তোমার নবজাত কন্যা, ইনি এমন ধর্ম্মাত্মা হইবেন যে, আমার সত্তর হাজার উপাসক ইঁহার পায়ে শরণ লইবেন।"

অতি দুঃখেও পিতামাতার প্রাণে হাসি ফুটিল।

কিন্তু কয়েক বৎসরের মধ্যে পিতামাতা চলিয়া গেলেন। চারিটি বোন একেবারে অসহায়, অনাথ হইয়া পড়িলেন।

তারপর একদিন বসোরানগরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। চারিদিকে হাহাকার। একদিন রাবেয়া একা হাটিয়া একটু দূরে গিয়া পড়িয়াছেন, এমন সময়ে একজন দুর্বৃত্ত তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া এক ধনীর কাছে ছয় দাইহাম মূল্যে বিক্রয় করিল। রাবেয়া ক্রীতদাসী হইলেন।

প্রভুর ঘরে দিনরাত্রি কঠিন পরিশ্রম তাঁহার মত বালিকার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইত। তিনি শুধু ভগবানের কাছে বেদনা জানাইয়া প্রার্থনা করিতেন। বাল্যকাল হইতেই রাবেয়া কেমন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ঈশ্বরের অনুগত হইয়া তাঁহারই উপর একান্ত নির্ভর করিয়া থাকার মত শান্তি আর নাই।

একদিন একজন অপরিচিত লোককে তাঁহার কাছে আসিতে দেখিয়া ভয়ে রাবেয়া দৌড়াইয়া পলাইতে লাগিলেন। পায়ে হোঁচট্ লাগিয়া হঠাৎ পথের মধ্যে পড়িয়া গিয়া তাঁহার হাতখানা ভাঙ্গিয়া গেল। রাবেয়া ভগবানের কাছে কাঁদিয়া বলিলেন, "দয়াময়, বন্দী হইয়াও যে-হাতের সাহায্যে যথাসাধ্য কাজ করিতেছিলাম, আজ সে হাতখানিও ভাঙ্গিয়া গেল। এখন আমি আর কি করিব? কেন এমন হইল, বল?

হঠাৎ তিনি যেন দৈববাণী শুনিতে পাইলেন, "রাবেয়া, দুঃখ করিও না, তোমার সম্মুখে উজ্জ্বল মহৎ ভবিষ্যৎ।"

রাবেয়া ভাঙ্গা হাত লইয়া প্রভুর গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি সমস্ত কাজ শেষ করিয়া যখনই একটুকু অবসর পাইতেন, অমনই ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বসিতেন। উপাসনার মধ্য দিয়া ভগবানের যে স্পর্শটুকু পাইতেন, তাহাতেই তিনি পৃথিবীর সকল দুঃখ ভুলিয়া যাইতেন।

একদিন গভীর রাত্রে রাবেয়ার প্রভু হঠাৎ ঘুম হইতে জাগিয়া শুনিতে পাইলেন, কোথা হইতে অপূর্ব্ব প্রার্থনার মধুর স্বর ভাসিয়া আসিতেছে। তিনি কৌতূহলী হইয়া শব্দ অনুসরণ করিয়া দেখেন, তাঁহার ক্রীতদাসী অনন্যমনে ভগবানের উপাসনায় নিরত, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘিরিয়া এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ। বুঝিতে পারিলেন, যাঁহাকে তিনি ক্রীতদাসী মনে করিয়া অবহেলা ও অবিচার করিয়া আসিয়াছেন, তিনি মানুষ নন, তিনি দেবী।

পরদিন সকালবেলা তিনি রাবেয়ার নিকটে ক্ষমা চাহিয়া বলিলেন, "তুমি কি চাও বল। আমি আজ হইতে তাহাই করিব।"

রাবেয়ার কোনও বস্তুর উপরেই কোনও আকর্ষণ নাই। তিনি চাহিলেন শুধু মুক্তি ভগবানকে আরাধনা করিবার ও তাহারই মধ্যে জীবন সার্থকভাবে ফুটাইয়া তুলিবার জন্য স্বাধীনতা। প্রভু তাহাই করিলেন।

মুক্তি পাইয়া রাবেয়া একটি আশ্রমে যাইয়া সাধনভজন আরম্ভ করিলেন। রাবেয়ার স্বাভাবিক ধর্ম্মপ্রাণতা দেখিতে দেখিতে স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল। অল্পকালের মধ্যে সমস্ত মুসলমান নরনারী বুঝিতে পারিলেন, ইঁহার মত মহাপ্রাণা নারী মুসলমান সমাজে কমই জন্মিয়াছেন। দলে দলে পুরুষ ও নারী রাবেয়ার কাছে ধর্ম্মের উপদেশ লইবার জন্য আসিয়া উপস্থিত হইল।

রাবেয়ার বয়স তখনও খুবই অল্প। অনেক বিখ্যাত ও সম্ভ্রান্ত যুবক, এমন কি বসেরার শাসনকর্ত্তা পর্য্যন্ত তাঁহাকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন। কিন্তু তিনি সকলকেই প্রত্যাখ্যান করিলেন। তিনি সঙ্কল্প করিলেন, চিরকাল কুমারী থাকিয়া ব্রহ্মচর্য্যকেই জীবনের ব্রত করিয়া লইবেন, কারণ শুধু ব্রহ্মচর্য্যের পথেই তিনি তাঁহার ঈশ্বরের দেখা পাইতে পারেন।

শোনা যায়, তখনকার দিনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধুপুরুষ হোসেন বসোরীও তাঁহার কাছে বিবাহের প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিলেন। অন্যান্য সাধুগণও হোসেনকে বিবাহ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু রাবেয়া বলিলেন, "ভাই সব, একলা থাকার আনন্দই আমার সব চেয়ে বড় আনন্দ। কারণ আমার যিনি প্রিয়তম, তিনি সর্ব্বদাই আমার কাছে। তাঁহার প্রেমের মত এমন প্রেম আমি আর কোথাও খুঁজিয়া পাইব না এবং তাঁহার প্রেমের মাপকাটিতেই আমি সমস্ত মানুষকে বিচার করি।"

হাজার হাজার ভক্তশিষ্য রাবেয়াকে দিনরাত ঘিরিয়া থাকিতেন। কাহারও কোনও সমস্যা মনে আসিলেই তাহার মীমাংসা করিতে হইত রাবেয়াকে। একদিন এক ব্যক্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি ভগবান্‌কে তো ভালবাসেন?"

রাবেয়া বলিলেন, "বাসি"।

"আপনি শয়তানকে শত্রু মনে করেন?"

রাবেয়া উত্তর করিলেন, "না।"

আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্নকারী বলিলেন, "সে কেমন?

রাবেয়া উত্তর দিলেন, "ভগবান্‌কে আমি এত ভালবাসি যে, শয়তানের প্রতিও ঘৃণা করিবার স্থান আমার মনে আর নাই।"

রাবেয়া পৃথিবীতে থাকিয়াও পৃথিবী হইতে দূরে ছিলেন। তাঁহার দেহ ও মনের সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি বড় সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন "আমার কাছে থাকিতে যাহারা ভালবাসে, তাহাদিগকে সুখী করিবার জন্য আমার দেহকে রাখিয়াছি। আমার হৃদয়খানি শুধু তোমারই জন্য প্রভু! আমার দেহ আছে দর্শকের সাথীরূপে, কিন্তু আমার হৃদয়ের সাথী একমাত্র আমার প্রিয়তম তুমি।

রাবেয়ার জীবনের শেষ দিনগুলির কথা সব ভাল করিয়া জানা যায় না। শুধু জানিতে পারি, শেষদিন পর্য্যন্ত তাঁহার মহিমা ক্রমেই বাড়িয়া চলিয়াছিল। ধর্ম্মপ্রাণ মুসলমান নর-নারীগণ রাবেয়াকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষদের সমান আসনে বসাইয়া পূজা নিবেদন করিয়াছিলেন।

তারপর যেদিন ৭৫২ খৃষ্টাব্দে রাবেয়া দেহত্যাগ করিয়া ভগবানের কোলে বিলীন হইয়া গেলেন, সেদিন ভক্তগণ কাঁদিয়া আকুল হইলেন! তাঁহার পুণ্যময় দেহখানি জেরুজালেম নগরের পূর্ব্বপ্রান্তে টরপর্ব্বতের চূড়ায় সমাধিস্থ করিয়া রাখা হইল। এখনও পর্য্যন্ত তাহা অগণ্য মুসলমান নরনারীর নিকটে তীর্থ-ক্ষেত্র হইয়া রহিয়াছে।



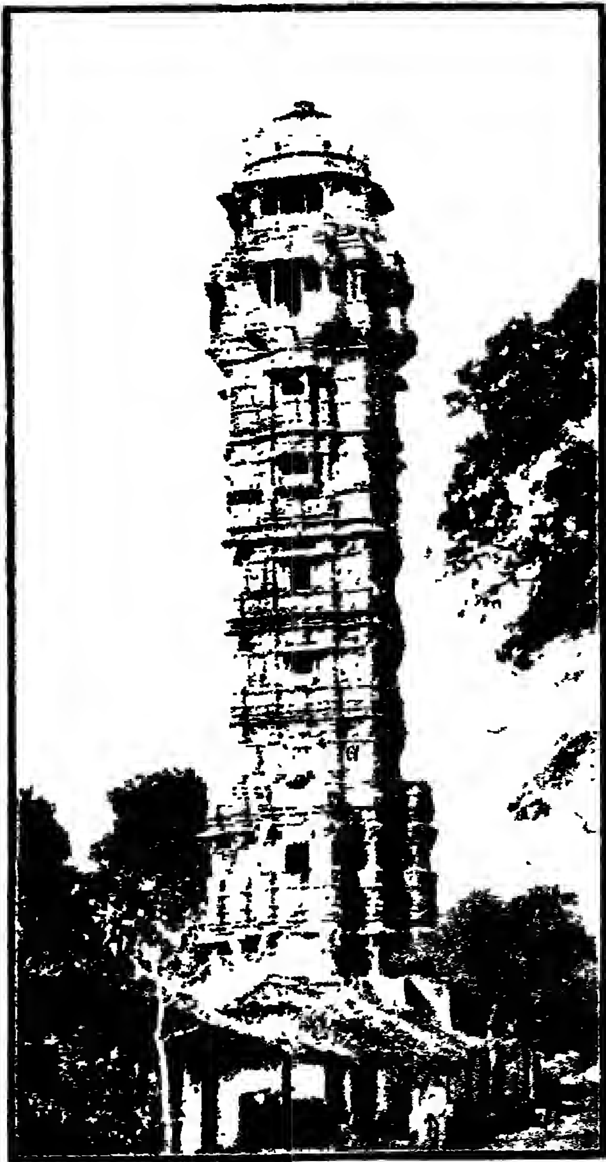
মহানুভব সম্রাট্ অশোক



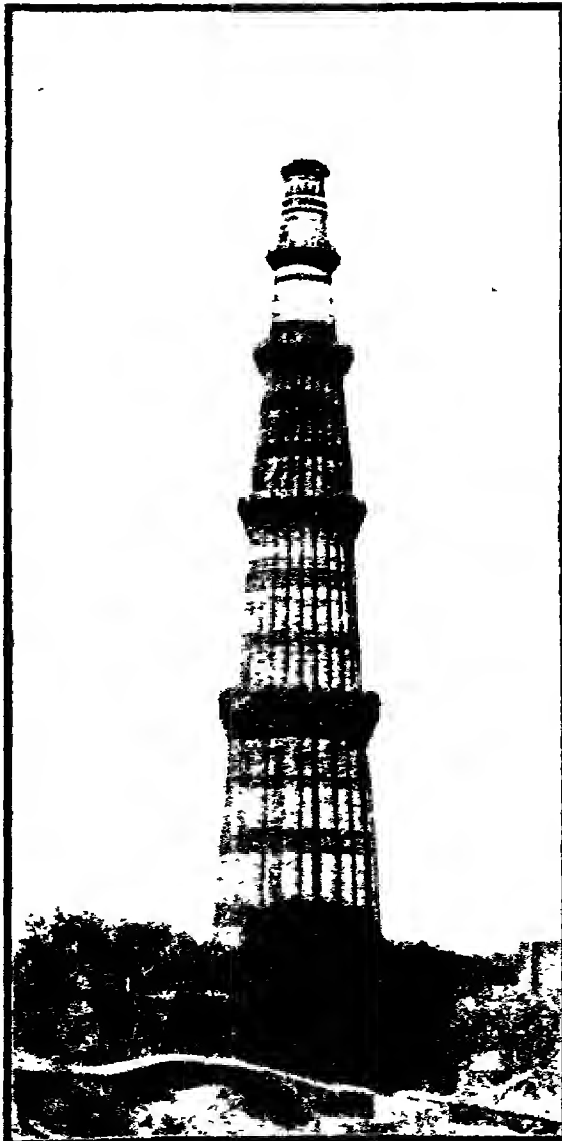
পৃথিবীর ইতিহাসের পৃষ্ঠা সম্রাট্ অশোকের নাম বুকে করিয়া উজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। ইনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের পৌত্র ও বিন্দুসারের পুত্র ছিলেন। কথিত আছে যে, বিন্দু-সারের মৃত্যু হইলে ইনি ইঁহার অন্যান্য সকল ভাইকে পরাজিত ও হত্যা করিয়া আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৪ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। নানা গোলমালে নাকি ইঁহার রাজ্যাভিষেক চারি বৎসর পিছাইয়া যায়। রাজা হইয়া ইনি দেবানাম্প্রিয় (দেবগণের প্রিয়) ও প্রিয়দর্শী এই দুইটি উপাধি লন।

পূর্ব্বে তোমাদিগকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্যের বীরত্বের কথা বলিয়াছি। তাঁহার বিজয়-অভিযানের ফলে উত্তর-ভারতের সমগ্র এবং দাক্ষিণাত্যের অনেকখানি অংশ মগধের পদানত হয়। বিন্দুসার সাম্রাজ্য কিছু বাড়াইয়াছিলেন কি না, জানি না। তবে তিনি চন্দ্রগুপ্তের বিরাট্ সাম্রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। অশোকও মৌর্য্য-বংশধর, দেশজয়ের কামনা তাঁহারও অন্তরে প্রবল ছিল। সেইজন্য তিনি অভিষেকের আট বৎসর পরে কলিঙ্গদেশ অর্থাৎ বর্ত্তমান উড়িষ্যা জয় করেন। যুদ্ধ বিগ্রহ হইলেই দেশে লোকক্ষয়, দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রভৃতি নানারূপ দুর্ঘটনা ও অশান্তি উপস্থিত হয়; কলিঙ্গেও তাহা হইয়া-ছিল। কিন্তু ইহা দেখিয়া অশোকের হৃদয়ে অত্যন্ত করুণা উপস্থিত হয়, এবং তিনি ঠিক করেন যে, জীবনে আর কখনও যুদ্ধ করিবেন না। এই সময় বা ইহার কিছু পরে অশোক উপগুপ্ত নামক এক বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে আসেন, এবং ভগবান্ বুদ্ধের উপদেশে মোহিত হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। তিনশত বৎসর পূর্ব্বে বিম্বিসার অজাতশত্রুর সময় হইতে মগধদেশ যে-বিজয়ের ফলে ভারতের শীর্ষস্থান লাভ করিয়াছিল, অশোক সেই পার্থিব-বিজয়ের পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক দয়া, ক্ষমা ও শিক্ষা দ্বারা মানব-হৃদয় জয় করিয়া ভারতবর্ষে 'ধর্ম্মবিজয়' বিস্তার করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

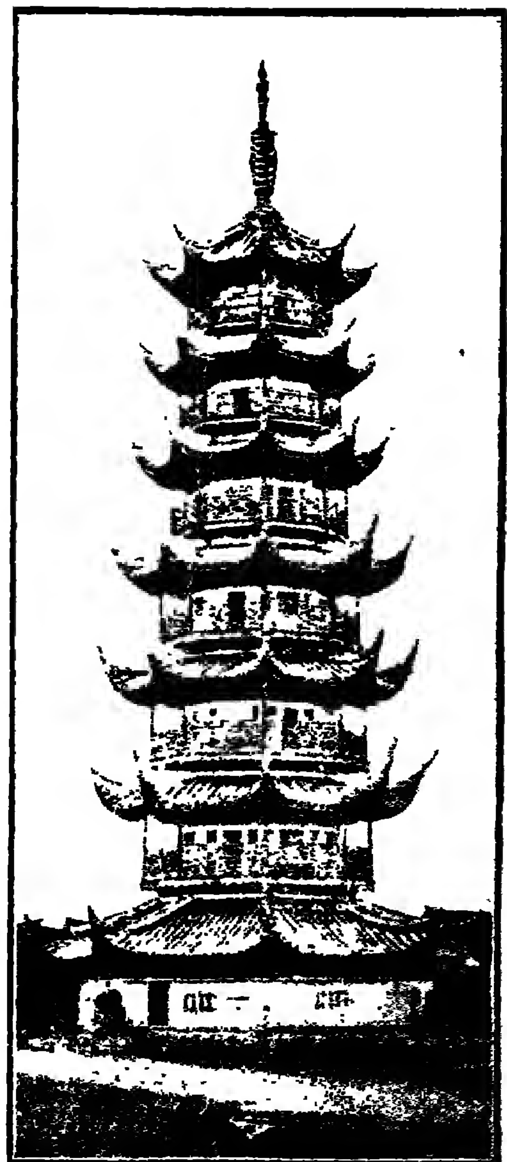
অশোক শুধু নিজের রাজত্বের মধ্যেই ধর্ম্মপ্রচার করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। রাজত্বের



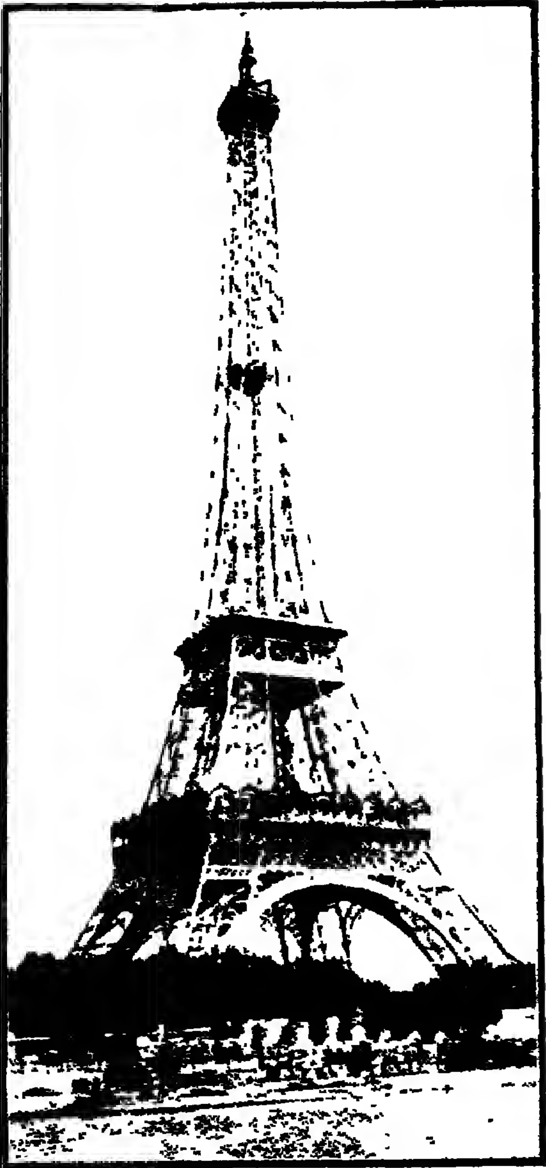
বিজয় স্তম্ভ—চিতোর



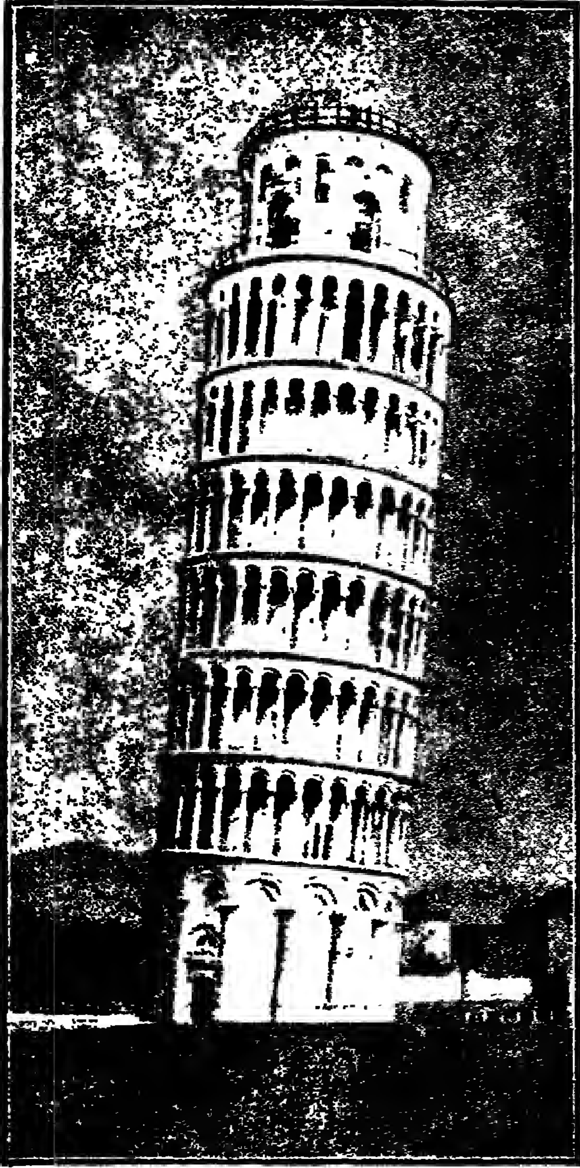
কুতব মিনার—দিল্লী



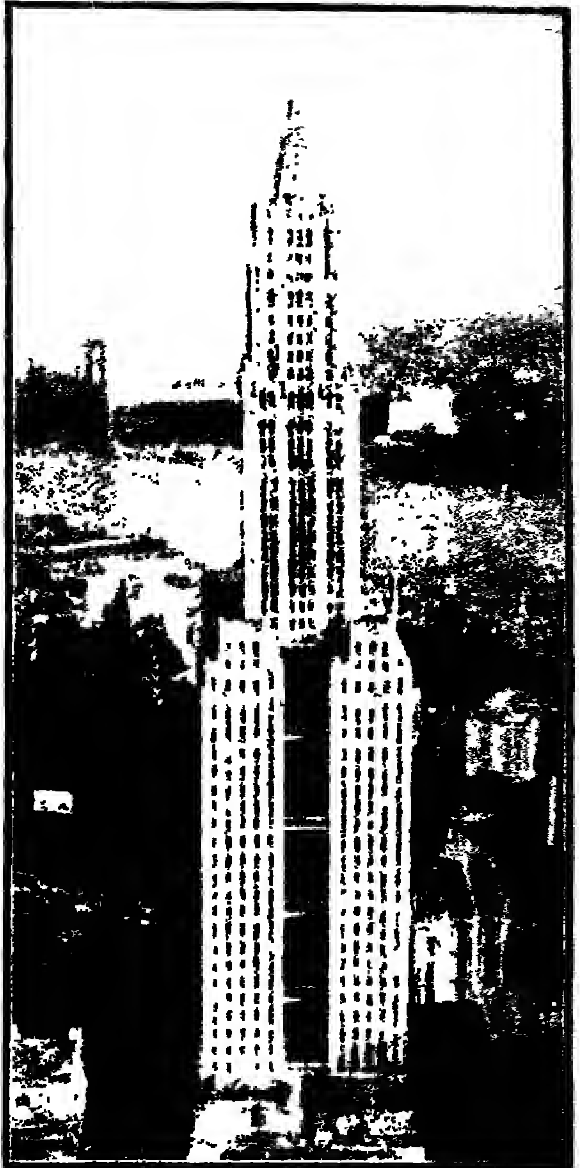
লাং হুয়া প্যাগোডা—সাংহাই



ইফেল টাওয়ার—প্যারিস



শ্বেত মর্ম্মর-স্তম্ভ—পিসা



উলওয়ার্থ টাওয়ার—নিউইয়র্ক

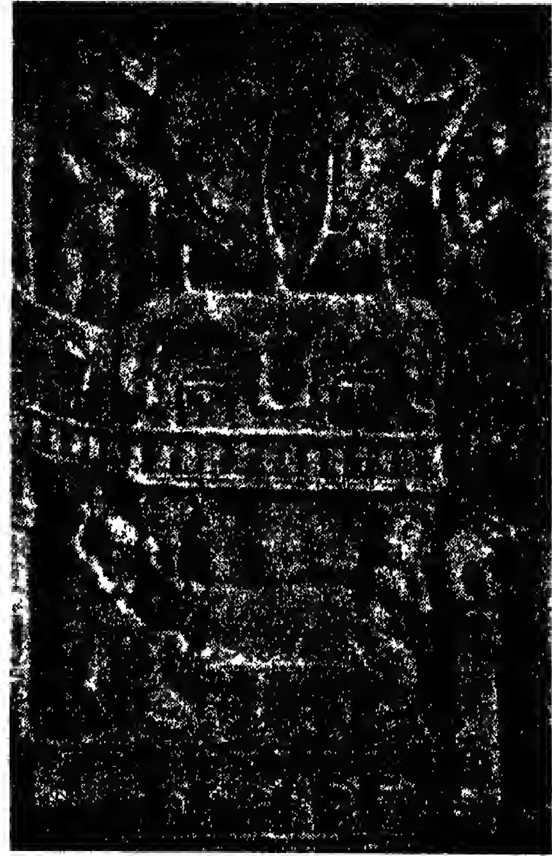
দক্ষিণে চোল, চের, পাণ্ড্য প্রভৃতি যে সকল স্বাধীন রাজ্য ছিল সে সকল দেশেও তিনি দূত পাঠাইয়াছিলেন। আফ্গানিস্তান, সীরিয়া, এমন কি মিশর দেশের গ্রীক্ রাজ্যসমূহেও তিনি ধর্ম্মপ্রচারের চেষ্টা করেন। এইজন্য বিভিন্ন দেশে যে দূত পাঠান হইত, তাহাদের নাম ছিল 'ধর্ম্মমহামাত্র'। বৌদ্ধ-গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, অশোক তাঁহার পুত্র (বা ভ্রাতা) মহেন্দ্র ও কন্যা (বা ভগিনী) সঙ্ঘমিত্রাকে সিংহলদেশে প্রেরণ



অশোকের মন্দির—বুদ্ধগয়া

করেন। যাইবার পথে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রা বুদ্ধগয়া হইতে বোধিবৃক্ষের একটি শাখা ভাঙিয়া সঙ্গে লইয়া যান এবং সেখানে সেই ডাল পুঁতিয়া দেন। কালে সেই শাখা একটি প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হয়।

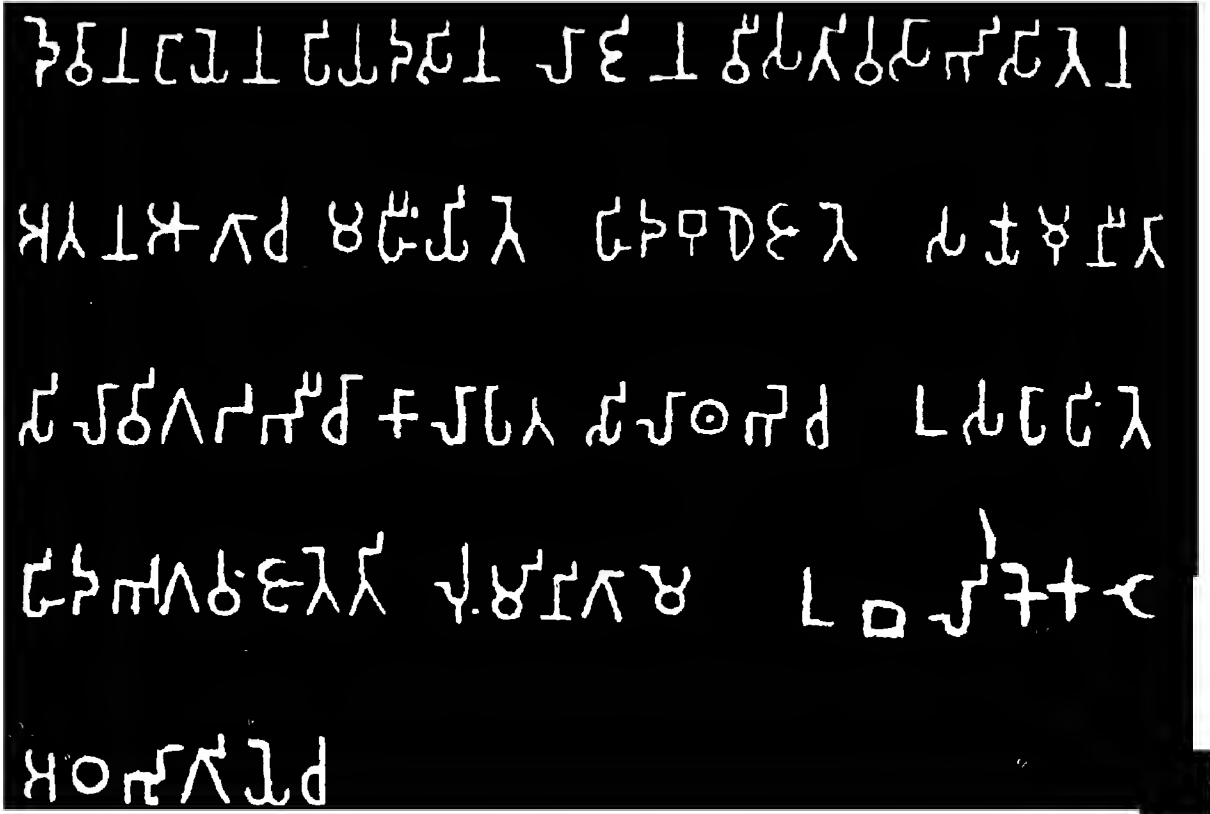
ধর্ম্মপ্রচারের জন্য অশোক বহুবিধ উপায় অবলম্বন করেন, তাহার মধ্যে প্রধান উপায় ছিল পর্ব্বত-গাত্রে ও শিলাস্তম্ভে লিপি উৎকীর্ণ করা। কতগুলি লিপি যে তিনি উৎকীর্ণ করাইয়াছিলেন, তাহা এখনো সঠিক জানা যায় নাই। তবে এখন পর্য্যন্ত ছয়টি স্তম্ভ-গাত্রে সাতটি ও সাতটি পর্ব্বতগাত্রে চৌদ্দটি লিপি পাওয়া গিয়াছে। ইহাছাড়া কতকগুলি অপ্রধান লিপিও পাওয়া গিয়াছে, যাহাকে ইংরাজীতে (Minor Edict) বলা হয়।



বোধিতরু-মূলে উপাসক ও উপাসিকা

অশোকের সময়কার কারুশিল্পও অত্যন্ত চমৎকার। তাঁহার কয়েকটি স্তম্ভের পালিশ এত চমৎকার যে, তাহার উপরে হাত দিলে হাত পিছলাইয়া যায়। বাইশ শ' বৎসর অতীত হইয়াছে কিন্তু স্তম্ভগুলির পালিশ এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। স্তম্ভগুলির উপর সৌন্দর্য্যের জন্য কোনও পশুর প্রতিকৃতি ছিল। সারনাথ স্তম্ভের উপর যে চারিটি

সিংহমূর্ত্তি ছিল, তাহার ছবি দেখ (শিশু-ভারতী, দশম সংখ্যা, ৭৩০ পৃঃ)। মূর্ত্তিটিতে যেন জীবন্ত সিংহের বল ও তেজ ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন পর্য্যন্ত অশোকের দশটি স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছে, তাহার তালিকা শিশু-ভারতীর দশম সংখ্যা ৭২৯-৭৩০ পৃষ্ঠায় দেখ। দূরবর্ত্তী স্থানে লইয়া যাওয়া কিরূপ কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তখনকার দিনে রেল, ষ্টীমার, ক্রেন কিছুই ছিল না, তৎসত্ত্বেও কেমন করিয়া সেই বিরাট্‌কায় স্তম্ভগুলি নিরাপদে সেই সকল স্থানে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল, ভাবিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।



খোদিত লিপির পাঠ :—

(১) দেবানপিয়েন পিয়দসিন লাজিন বীসতিব সাভিসিতেন।
(২) অতন আগচে মহীয়িতে হিদ বুধে জাতে সক্যমুনী তি।
(৩) সিলা বিগড়ভী চা কালাপিত সিলাথভে চ উসপাপিতে।
(৪) হিদ ভগবং জাতে তি লুংমিনিগামে উবলিকে কটে।
(৫) অঠভাগিয়ে চ।

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, স্তম্ভগুলির সমস্ত মির্জ্জাপুরের নিকটবর্ত্তী চুণারের পাথরে প্রস্তুত, ৪০।৫০ ফুট করিয়া উঁচু এবং প্রায় ১৪০০ মণ ভারী। অনুমান কর, এত বিশাল স্তম্ভগুলি চুণার হইতে শত শত মাইল

পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদ এত সুচারুরূপে নির্ম্মিত ছিল যে, ৭০০ বৎসর পরে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ লিখিয়া-ছিলেন, কোনও মানুষ উহা প্রস্তুত করিতে পারে না, অশোক নিশ্চয়ই ভূত-

প্রেতের সাহায্য লইয়া সেগুলি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে আছে যে, অশোক ৮৪,০০০টি স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অশোকের স্তূপসংখ্যা যে প্রকৃতপক্ষে কত, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে মনে হয় যে, উপরের সংখ্যাটি খুব বাড়াইয়া বলা হইয়াছে। আজকাল মাত্র একটি অশোক-



অশোক স্তম্ভের চূড়ার উপরের সিংহমূর্ত্তি

স্তূপের অস্তিত্ব আছে—মধ্যভারতে সাঁচী নামক স্থানে। স্তূপটি ও তাহার চারিপাশের রেলিং দেখিতে অতি চমৎকার। ইহার ছবি তোমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছ।

গয়ার কাছে বরাবর নামে একটি পাহাড় আছে, সেই পাহাড় খুদিয়া অশোক আজীবক * সন্ন্যাসীদের থাকিবার জন্য কয়েকটি ঘর করিয়া দেন। পাহাড় হইতে পাথর কাটিয়া বাড়ী তৈয়ারী করা সহজ কাজ কিন্তু পাহাড় কাটিয়া পাহাড়ের ভিতর ঘর-দোর তৈয়ারী করা কত শক্ত ভাবিয়া দেখ। এই সকল ছাড়া শোনা যায় যে, অশোক কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরের প্রতিষ্ঠা করেন।



অশোক স্তম্ভের উপরিস্থিত প্রস্তরমূর্ত্তি

অশোক যে কত বড় সম্রাট্ ছিলেন, এবং তাঁহার চিন্তা কিরূপে প্রজার মঙ্গলের জন্য নিয়োজিত থাকিত, তাহা তাঁহার লিপিগুলি পাঠ করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায়। এই লিপিগুলি তিনি সংস্কৃতে না লিখিয়া জনসাধারণের ব্যবহারোপযোগী প্রাকৃত ভাষায়

* আজীবকধর্ম্মের প্রচারক মস্করী গোপাল বুদ্ধের সময়কার লোক ছিলেন।

লিখিয়া যান। ৮৩৮ পৃষ্ঠায় তাহার কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।



ছদন্ত জাতক—সাঁচী দক্ষিণ তোরণ



বুদ্ধের অস্থিভস্ম লইয়া কলহ—সাঁচী পূর্ব্ব তোরণ

প্রথম পর্ব্বতলিপি

পূর্ব্বে দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শীর (অশোকের) রন্ধনশালায় খাদ্যের জন্য প্রত্যহ বহু সহস্র পশু হত্যা করা হইত। কিন্তু এখন দুইটি ময়ূর এবং একটি হরিণ প্রত্যহ মারা হয়। হরিণও আবার কোন কোন দিন মারা হয় না। কিছুদিন পরে কোন পশুই আর মারা হইবে না।



সাঁচীর সাধারণ দৃশ্য

দ্বিতীয় পর্ব্বতলিপি

নিজের রাজত্বের সর্ব্বত্র, চোল, পাণ্ড্য, সত্যপুত্র, কেরলপুত্র ও তাম্রপর্ণী * এই সকল সামন্ত রাজ্যে এবং যবনরাজ (গ্রীক্) অন্তিয়োকের (সীরিয়ার রাজা Antiochus Theos) রাজ্যে এবং অন্তিয়োকের নিকটবর্ত্তী অন্যান্য গ্রীক্-রাজ্যে দেবগণের

* চোল প্রভৃতি রাজ্য ভারতের সুদূর দক্ষিণে। তাম্রপর্ণী সিংহলের অন্য নাম।

প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা দুই প্রকার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছেন; মনুষ্যচিকিৎসা ও পশুচিকিৎসা। চিকিৎসার জন্য উপকারী গাছ-পালা যে সকল স্থানে পাওয়া যায় না, অন্যান্য স্থান হইতে সেই গাছপালা আনাইয়া সেই সকল স্থানে আরোপিত করিয়াছেন। পথে কূপ খনন করাইয়াছেন এবং মানুষ ও পশুর উপভোগের জন্য বৃক্ষ-রোপণ করাইয়াছেন।

চতুর্থ পর্বতলিপি

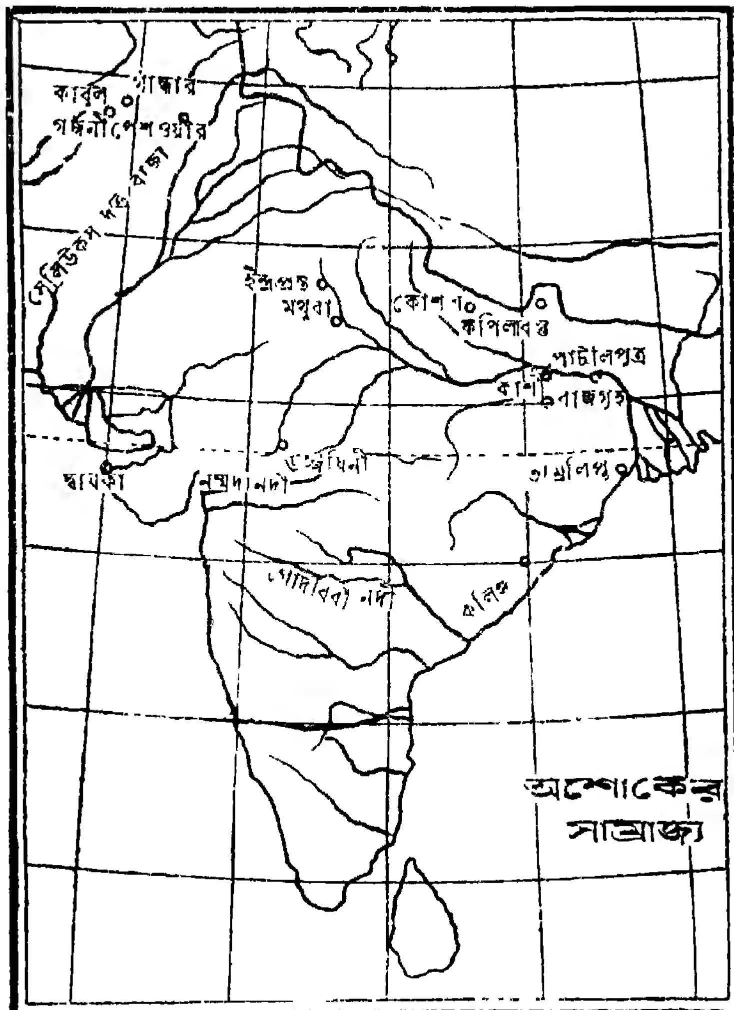
প্রাণিহত্যা হইতে নিবৃত্তি, আত্মীয়-স্বজনের প্রতি অনুকূল ব্যবহার, ব্রাহ্মণ এবং শ্রমণগণের প্রতি উপযুক্ত আচরণ, পিতা-মাতা ও অন্যান্য গুরুজনের শুশ্রূষা—এই সকল গুণ দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজার ধর্ম্ম-প্রচারের ফলে যেরূপ প্রচার হইয়াছে, সেরূপ পূর্বে বহুশত বৎসরেও হয় নাই।

ষষ্ঠ পর্বতলিপি

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা এইরূপ বলিলেন—অনেক কাল হইতে রাজগণ সকল সময়ে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন না। আমি কিন্তু এইরূপ নিয়ম করিয়া দিয়াছি—ভজনাগারে, অন্তঃপুরে, উদ্যানে, শয়ন-গৃহে যেখানেই আমি থাকি না কেন, চরেরা আসিয়া আমার নিকট প্রজাদের সংবাদ জানাইবে। প্রজা-দের কাজ আমি সকল স্থানে এবং সকল সময়ে নির্ব্বাহ করিয়া থাকি। পরিশ্রম করিয়া আমি কখনই তৃপ্তিবোধ করি না, কারণ, সমস্ত পৃথিবীর মঙ্গলসাধন আমি আমার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি।

ত্রয়োদশ পর্বতলিপি

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী অভিষেকের আট বৎসর পরে কলিঙ্গদেশ জয় করেন, সেই যুদ্ধে দেড়লক্ষ লোক বন্দী হয়, একলক্ষ লোক হত হয়, এবং অনেক লক্ষ লোক



(দুর্ভিক্ষাদিতে) মারা যায়। কলিঙ্গ জয় করিয়া প্রিয়দর্শীর মনে অনুশোচনা উপস্থিত হয়। যুদ্ধে যত লোক বন্দী বা হত হইয়াছে, তাহার শতাংশ বা সহস্রাংশও যদি এখন বন্দী বা হত হয়, তাহাও এখন দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শীর নিকট দুঃখের কারণ হয়। রাজা এখন ধর্ম্মবিজয়কেই প্রধান বিজয় বলিয়া মনে করেন। এই লিপি এইজন্য



উৎকীর্ণ হইয়াছে যে, আমার পুত্র-পৌত্রেরা যেন নূতন দেশবিজয়কে লোভনীয় বস্তু বলিয়া মনে না করে। ধর্ম্মবিজয়কেই যেন তাহারা প্রকৃত বিজয় বলিয়া বুঝিতে পারে।

দ্বিতীয় স্তম্ভলিপি

ধর্ম্ম কাহাকে বলে? পাপহীনতা, দয়া, দান, সত্য ও শুচিতা।

তৃতীয় স্তম্ভলিপি

লোকের সর্ব্বদা চিন্তা করা উচিত—এই এই পাপে লোকের অধোগতি হয়। হঠকারিতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ, অহঙ্কার এবং ঈর্ষা—এই সকল পাপে আমার পতন হইতে পারে।

রুম্মিন্দেই স্তম্ভলিপি*

দেবগণের প্রিয় প্রিয়দর্শী রাজা অভিষেকের কুড়ি বৎসর পরে স্বয়ং এখানে আসিয়া পূজা করিয়াছেন। যেহেতু ভগবান্ শাক্যমুনি এইস্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইজন্য তিনি এখানে একটী বিরাট্ পাথরের প্রাচীর ও একটী পাথরের স্তম্ভ রচনা করিয়াছেন।

বরাবর গুহার লিপি

এই ন্যাগ্রোধ নামক গুহা রাজা প্রিয়দর্শী অভিষেকের বারো বৎসর পরে আজীবকদিগকে দান করেন।

উপরের লাইনগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারিবে যে, অশোক কত বড় রাজা ছিলেন। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ, জৈন ও আজীবকগণকেও সমান সম্মান করিতেন। তিনি শুধু নিজের প্রজাদের সুখাস্বাচ্ছন্দ্য ও নৈতিক উন্নতির জন্য ব্যগ্র ছিলেন না। পৃথিবীর যে যে দেশের সহিত তখন ভারতের পরিচয় ছিল, সে সকল দেশবাসীর জন্যও তাঁহার সমান উৎসাহ ও অধ্যবসায় ছিল। তাঁহারই চেষ্টার ফলে বৌদ্ধধর্ম্ম দেশবিদেশে প্রচার লাভ করিয়া পৃথিবীর অন্যতম ধর্ম্মে পরিণত হয়। আবার তাঁহার দৃষ্টি মনুষ্য-সমাজের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, পশুদের উপকারের জন্যও তাঁহার সমান চেষ্টা ছিল। পশুদের জন্য জলপানের ও চিকিৎসার ব্যবস্থা, তাহাদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ—এ সকল বন্দোবস্তও তিনি করিয়াছিলেন।

স্মরণাতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর সর্ব্বত্র সহস্র সহস্র রাজা হইয়াছেন, কিন্তু অশোকের মত মহান্ সম্রাট্ খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। অশোকের নাম ইতিহাস-গগনে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মত সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

*বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনীগ্রামের বর্ত্তমান নাম।

। এই স্থানে লিপিটির অর্থ স্পষ্ট বোঝা যায় না।





আমি যখন বড় হ'ব





এখনো ত বড় হইনি আমি,
ছোট আছি ছেলে মানুষ বলে'।
দাদার চেয়ে অনেক মস্ত হ'ব
বড় হ'য়ে বাবার মত হ'লে।

দাদা তখন পড়তে যদি না চায়,
পাখীর ছানা পোষে কেবল খাঁচায়,
তখন তা'য়ে এম্‌নি বকে' দেব'!
বল্‌ব "তুমি চুপটি করে' পড়।



বল্‌ব "তুমি ভারি দুষ্ট ছেলে !"
যখন হ'ব বাবার মত বড়।
তখন নিয়ে দাদার খাঁচাখানা
ভালো ভালো পুষ্‌ব পাখীর ছানা।

সাড়ে দশটা যখন যাবে বেজে
নাবার জন্য করব না ত তাড়া।
ছাতা একটা ঘাড়ে ক'রে নিয়ে
চটি পায়ে বেড়িয়ে আস্‌ব পাড়া।



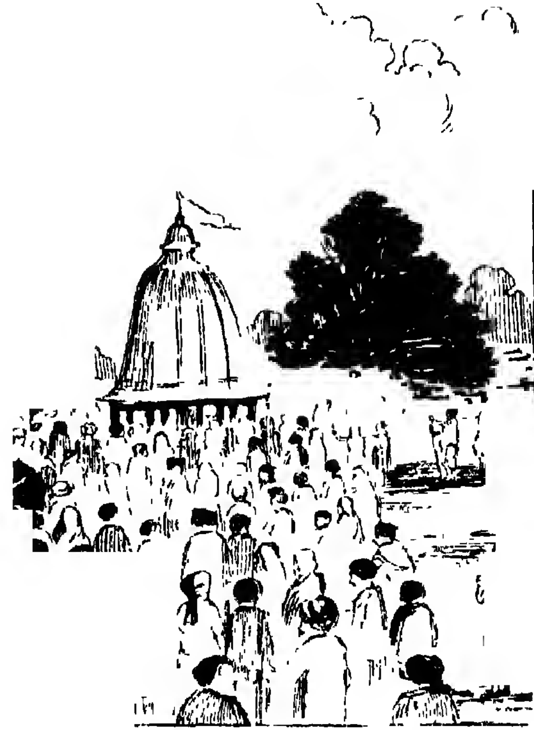


গুরুমশায় দাওয়ায় এলে পরে
চৌকি এনে দিতে বল্‌ব ঘরে,—
তিনি যদি বলেন "শেলেট কোথা,
দেরি হচ্ছে, বসে' পড়া কর।"
আমি বল্‌ব "খোকা ত আর নেই,
হয়েছি যে বাবার মত বড় !

গুরুমশায় শুনে তখন ক'বে—
"বাবুমশায়, আসি এখন তবে।"
খেলা করতে নিয়ে যেতে মাঠে
ভুলু যখন আসবে বিকেল বেলা,
আমি তা'কে ধমক দিয়ে ক'ব,
"কাজ করচি গোল কোরো না মেলা !"

রথের দিনে খুব যদি ভিড় হয়,
একলা যাব, করব না ত ভয়।
মামা যদি বলেন ছুটে এসে—
"হারিয়ে যাবে আমার কোলে চড়"—

বলুব আমি "দেখ্‌ছনাকি মামা
হয়েছি যে বাবার মত বড়!"
দেখে দেখে মামা বল্‌বে "তাই ত,
খোকা আমার সে খোকা আর নাই ত!"





আমি যে দিন প্রথম বড় হ'ব
মা সেদিন গঙ্গা স্নানের পরে
আস্‌বে যখন খিড়কি দুয়োর দিয়ে
ভাব্‌বে "কেন গোল শুনিনে ঘরে?"

তখন আমি চাবি খুল্‌তে শিখে
যত ইচ্ছে টাকা দিচ্ছি ঝি-কে,
মা দেখে তাই বল্‌বে তাড়াতাড়ি
"খোকা, তোমার খেলা কেমনতর?"
আমি বল্‌ব "মাইনে দিচ্ছি আমি,
হয়েছি যে বাবার মত বড়
ফুরোয় যদি টাকা, ফুরোয় খাবার,
যত চাই মা এনে দেব আবার।





আশ্বিনেতে পুজোর ছুটি হবে
মেলা বস্‌বে গাজনতলার হাটে,
বাবার নৌকা কতদূরের থেকে
লাগ্‌বে এসে বাবুগঞ্জের ঘাটে।





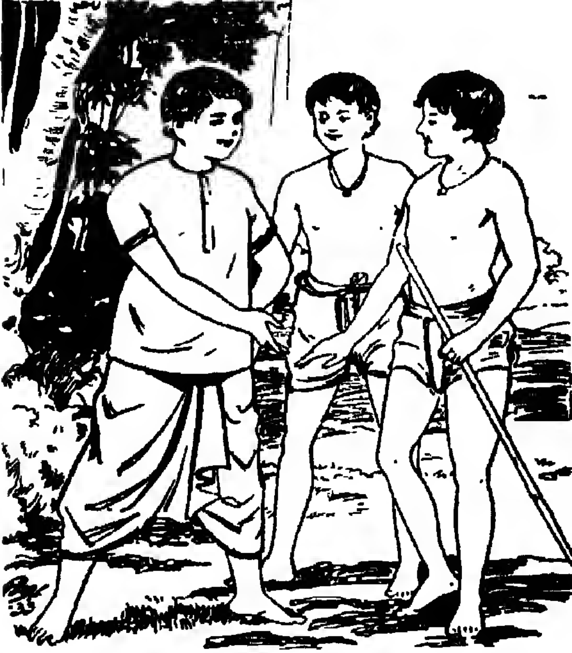
বাবা মনে ভাব্‌বে সোজাসুজি
খোকা তেম্‌নি খোকাই আছে বুঝি,
ছোট ছোট রঙিন জামা জুতো
কিনে এনে বল্‌বে আমায় "পর" !

আমি বল্‌ব "দাদা পরুক এসে,"
আমি এখন তোমার মত বড়।
দেখ্‌চ নাকি যে ছোট মাপ জামার—
পরতে গেলে আঁট হবে যে আমার !

সুবোধ ছেলে নই

নই গো আমি সুবোধ ছেলে, সুবোধ ছেলে নই,
রই না হাতে দিনে রাতে কেবল নিয়ে বই !
ভাইতে 'গোপাল', 'ডুবাল' ব'লে
র'বে না নাম এ ধরাতলে !
রাখালদলে, মোড়ল ব'লে তাদের সাথে রই,
নইগো আমি সুবোধ ছেলে, সুবোধ ছেলে নই।

ধমক দিয়ে করবে কাবু, নইগো তেমন ছেলে,
মিষ্টি কথায় হুকুম মানি সকল কাজ ফেলে,
কাঙাল জনে নাকাল হলে,
চুপ্‌টি ক'রে যাইনে চলে,
পিছ-পা নই দণ্ড-ভয়ে, দণ্ড দিতে গেলে,
ধমক্ দিয়ে করবে কাবু, নই গো তেমন ছেলে !





নিইনে আমি নুইয়ে মাথা, যা পড়ে মোর পাতে,
চড়টি পেলে, চাপড়টি যে দিই গো সাথে সাথে,
ভালো জানি বাইতে ভেলা,
চড়তে গাছে, মারতে ঢেলা ,
ডর করি না গাঁয়ের পথে যেতে আঁধার রাতে,
আপন জনে ঠেক্‌লে দায়ে তরাই হাতে-হাতে !

মহৎ মনের শাসন মানি, প্রণাম করি তায়
চরণ-ধূলা মাথায় নিতে পরাণ সেধে যায়,
গুরু ব'লে তাঁরেই মানি,
শিরে ধরি আদেশ-বাণী,
আশীষ পেলে ধন্য ব'লে জানি আপনায়,
আপন-পরে বিচার ক'রে চলি না সেথায় !

বাতাসের গান





মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে ;
মোরা নাচি সুরধনী কূলে কূলে।

কখনো চলি বেগে কভু মৃদু চরণে,
কখনো ছুটি মোরা ফুল ফল হরণে ,
কোথা হতে এসেছি, কবে যে ভেসেছি,
তা গেছি ভুলে।

খেলি লুকোচুরি কভু বনে,
মাতি নিধি সনে কভু রণে,
ভাসি আকাশে নীরদ সনে
শত পাল তুলে।

যখন থাকি ঘুমে থাকে ঘুমে ধরণী
গহন, নদী, নিধি, নভে মেঘ-তরণী ;
পুনঃ জাগে হরষে মোদের পরশে
নয়ন খুলে

প্রথম গালি

বয়সে আড়াই কি দুই—
মনটি নিরমল যুঁই,
হাল্‌কা যেন হাওয়া,
মেয়ে সে মুখ-চাওয়া,
মায়ের কাছে কাছে
ছায়ার মত আছে;
জানে না মা বিনা কিছুই।

জগৎ মানে যেন,—তার—
মা, দিদি, আপনি সে আর,
এ ছাড়া কিছু নেই,
চেনে না কারোকেই;
অকথা কুকথার
ধারে না কোনো ধার।
শেখেনি আজো 'তুই' 'মুই'





আর সে দিদি চেনে তার
দিদি সে সাথী খেলিবার,
দুটিতে পিঠোপিঠি
তবুও খিটি মিটি
হয় না রেষারেষি
কলহ নাইক নিতুই!

একদা হ'ল দুটি বোনে
পুতুল নিয়ে কি কারণে
ঝগড়া কাড়াকাড়ি,
অমনি দিয়ে আড়ি
হারিয়া কাঁদো কাঁদো
হয়ে সে আধো-আধো
কহিল— "ডিডি! টুমি টুই।"

ছেলের দল

হল্লা করে ছুটির পরে ওই যে যারা যাচ্ছে পথে,
হাল্কা হাসি হাস্‌ছে কেবল, ভাস্‌ছে যেন আল্‌গা স্রোতে



প্রাণের হাসি হাস্‌তে জানে,
খুলতে জানে মনের কল—
ওই যে দুষ্ট, ওই যে চপল,
ওই আমাদের ছেলের দল।

ওরাই রাখে জ্বালিয়ে শিখা
বিশ্ববিদ্যাশিক্ষালয়ে,
অন্নহীনে অন্ন দিতে
ভিক্ষা মাগে লক্ষ্মী হ'য়ে ;

পুরাতনে শ্রদ্ধা রাখে
নূতনেরও আদর জানে,
—ওই আমাদের ছেলেরা সব
নেইক দ্বিধা ওদের প্রাণে ;

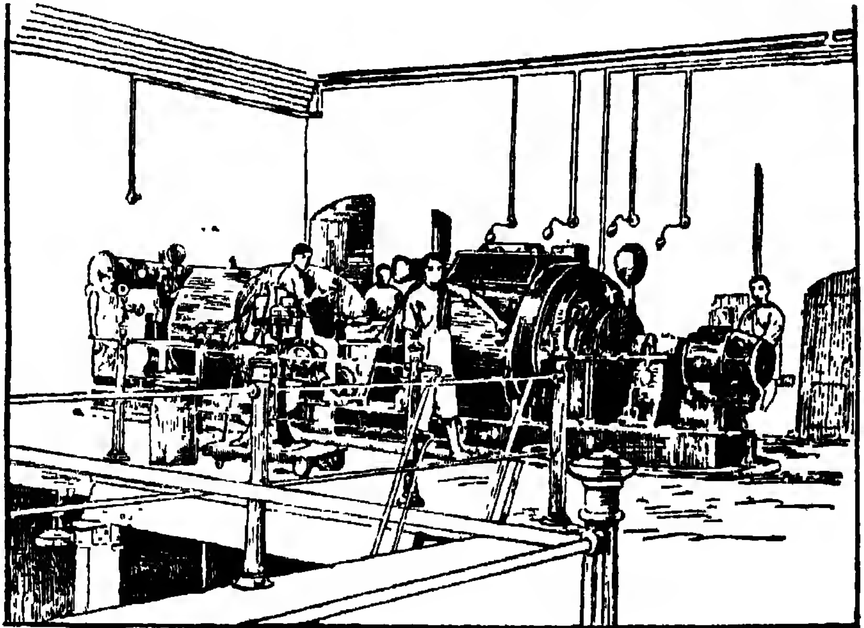
—ওই আমাদের ছেলেরা সব—
ঘুচিয়ে অগৌরবের রব,
দেশ দেশান্তে ছুট্‌ছে আজি
আন্‌তে দেশে জ্ঞান-বিভব।

মার্কিনে আর জার্মানিতে
পাচ্ছে তারা তপের ফল,

কেউ বা শিষ্ট, কেউ বা চপল
কেউ বা উগ্র কেউবা মিঠে,
ওই আমাদেব ছেলেরা সব,
ভাবনা যা' সে ওদের পিঠে।

ওই আমাদেব চোখের মণি,
ওই আমাদের বুকের বল,
ওই আমাদের অমর প্রদীপ,
ওই আমাদের আশার স্থল ;

ওই আমাদের নিখাদ সোণা,
ওই আমাদের পুণ্যফল,
আদর্শে যে সত্য মানে
সে ওই মোদের ছেলের দল।



ওরাই ভালবাসতে জানে
দরদ দিয়ে সরল প্রাণে,

ছিবাচীতে আগুন জেলে
শিখ্‌ছে ওরা কলাকল ;





হোমের শিখা ওরাই জ্বালে,
জ্ঞানের টীকা ওদের ভালে,
সকল দেশে সকল কালে
উৎসাহ তেজ অচঞ্চল,
ওই আমাদের আশার প্রদীপ,
ওই আমাদের ছেলের দল।

মানুষ হ'য়ে ওরা সবাই
অমানুষী শক্তি ধরে,
যুগের আগে এগিয়ে চলে,
হাস্য মুখে গর্ব্বভরে ;

প্রয়োজনের ওজন মত
আয়োজন সে কর্ত্তে পারে,
ভগবানের আশীর্ব্বাদে
বইতে পারে সকল ভারে।

ওই আমাদের ছেলেরা সব,
ত্রুটি ওদের অনেক হয়,
মাঝে মাঝে ভুল ঘটে ঢের,
কারণ ওরা দেবতা নয় ;

মাঝে মাঝে দাঁড়ায় বেঁকে
নিন্দা শুনে অনর্গল,
প্রশংসাতে হয় না কাবু,—
মনের মত দেয় না ফল ;

তবু ওরাই আশার মণি
সবার আগে ওদের গণি,
পদ্মকোষের বজ্রমণি
ওরাই ধ্রুব সুমঙ্গল ;
আলাদিনের মায়ার প্রদীপ
ওই আমাদের ছেলের দল।

পড়ার ঠেলা

কুঁড়েছেলে—সেই যে কবে হাত খড়ি ক'রে
ইস্কুলেতে দিলেন বাবা মোরে,
সেই অবধি কত বছর ধ'রে
প'ড়ে আস্‌ছি ভাই।



সেদিন হতে ঘুচে গেছে খেলা,
না খেলিতে আসে পড়ার বেলা,
তার উপরে পরীক্ষার ঠেলা,
সময় কোথা পাই ?



কাজেরছেলে—পড়তে বসে মন খেলার দিকে ধায়,
খেলতে গিয়ে মরে পড়ার ভাবনায়,
সেজন কোন কাজে সময় কভু পায় ?
পড়ার বেলা পড়ে, খেলার বেলা খেলে,
সময় যে বা নাহি কাটায় অবহেলে,
তারেই সবে তবে বলে কাজের ছেলে।

কুঁড়েছেলে—মৌমাছি ঐ বেড়ায় ফুলে ফুলে,
টুনি পাখী নাচে লেজটি তুলে,
যেতে তাদের হয় না ত ইস্কুলে,
ভাবনা কিছু নাই।
সারি সারি পিঁপড়ে চলে লুটে,
কাট-বিড়ালী ঐ পালাল ছুটে,
ইচ্ছা করে সবার সাথে জুটে
আমিও ছুটে যাই।



কাজের ছেলে—মৌমাছি কি শুধু বেড়ায় ফুলের বনে ?
টুনী পাখী শুধুই নাচে আপন মনে ?
কাজ কি কিছু কারো নাইকো ত্রিভুবনে ?
বল ত ভাই তবে, এত যতন ক'রে
কে গড়িল বাসা ছানাগুলির তরে ?
কেই বা রাখে মধু মৌচাকটি ভ'রে ?

মানবের জীবনধারা







শ্বাস যন্ত্র

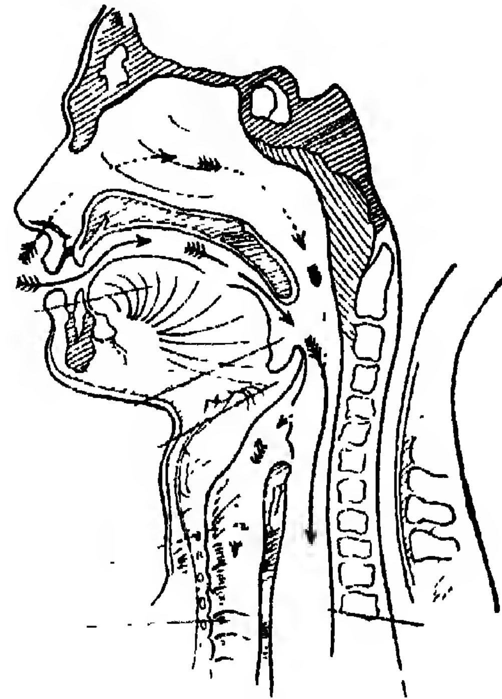


আমাদের দেশে একটা চলতি কথা আছে—'যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ।' ইহার অর্থ এই যে, যে সময় পর্য্যন্ত মানুষ শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে ততক্ষণ পর্য্যন্তই তাহার বাঁচিবার ক্ষমতা থাকে। যখন শ্বাস নিঃশেষ হয় তখন মানুষ এবং প্রাণিমাত্রেরই মৃত্যু ঘটে। শ্বাসপ্রশ্বাস লইয়াই প্রাণীদের জীবন। ছোট-বড় সকল প্রাণীই শ্বাসপ্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া থাকে। আমরা আমাদের জীবনরক্ষার জন্য প্রতি মুহূর্ত্তে নিঃশ্বাসের সহিত বাহির হইতে অক্সিজেন গ্যাস (Oxygen gas) বা অম্লজান নামক বায়বীয় পদার্থ গ্রহণ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার প্রশ্বাসের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon-di-oxide) নামক বিষাক্ত বায়বীয় পদার্থ ত্যাগ করিয়া থাকি। মানুষের বাঁচিবার পক্ষে অক্সিজেন গ্যাসের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী। ইহাকে প্রাণবায়ু বলিলেই ঠিক নাম দেওয়া হয়। আমাদের বাঁচিবার পক্ষে যা-কিছু প্রয়োজন, সে সমুদয়ই অক্সিজেনের সাহায্যেই হয়।

আমরা নাসিকার সাহায্যেই নিঃশ্বাস গ্রহণ করি এবং প্রশ্বাস ত্যাগ করি। কিন্তু এই যে নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, তাহা কিরূপ ভাবে আমাদের দেহের ভিতরে প্রবেশ করে, সে-কথা কি বলিতে পার?—একটা সহজ পরীক্ষা করিলেই কিভাবে আমরা নিঃশ্বাস গ্রহণ করি তাহা বুঝিতে পারিবে। আমাদের গলার কাছে বুকের হাড়ের খানিকটা উপরে যদি আঙ্গুল দিয়া টেপ, তাহা হইলে একটি শক্ত নালী আছে, এইরূপ অনুভব করিবে। যদি ঐ নালীটি একটু জোরে টানিয়া ধর, তাহা হইলে তোমার নিঃশ্বাস বন্ধ হইয়া আসিবে। ঐ নালীটি মুখ-গহ্বরের পশ্চাদ্ভাগের সহিত ও নাসিকার গহ্বরের সহিত সংযুক্ত আছে।

শ্বাসনালী

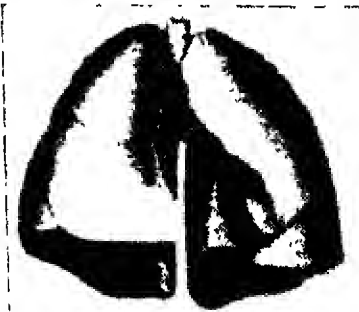
আমরা সাধারণতঃ নাক দিয়াই নিঃশ্বাস গ্রহণ করি, সময় সময় মুখ দিয়াও নিঃশ্বাস লই। কিন্তু যে ভাবেই নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস গ্রহণ



শ্বাসনালী

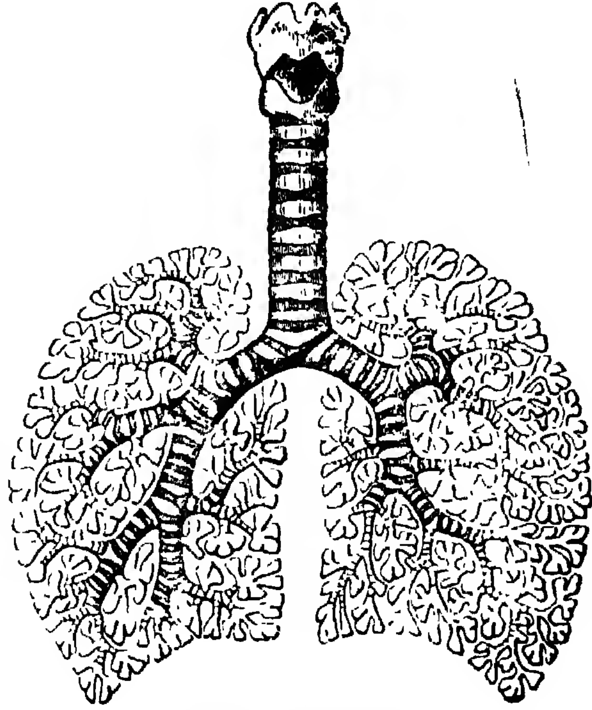
ও ত্যাগ করি না কেন, আমাদের নিঃশ্বাস বায়ু ঐ নালী দিয়াই যাইবে। এই জন্যই এই নালীর নাম শ্বাসনালী। ইংরাজীতে শ্বাসনালীকে বলে Wind-pipe বা trachea। শ্বাসনালী মুখ-গহ্বরের পশ্চাৎ হইতে নীচে বুকের মধ্যে চলিয়া গিয়াছে। বুকের ভিতর প্রবেশ করিয়া এই শ্বাসনালী দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। এক শাখা গিয়াছে বুকের ডান দিকে, আর এক শাখা গিয়াছে বাম দিকে। গাছ যেমন নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া নানা দিকে ছড়াইয়া পড়ে এই দুইটি শাখাও সেইরূপ শত সহস্র প্রশাখায় বিভক্ত হইয়াছে। প্রশাখার যে শাখা, তাহাও আবার লক্ষ লক্ষ শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। এই ভাবে অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া অবশেষে আমাদের এই শ্বাসনালী অতি ক্ষুদ্র এবং সূক্ষ্ম প্রকোষ্ঠে (cell) পরিণত হইয়াছে। এই ভাবে প্রত্যেক সূক্ষ্মনালীর অগ্রভাগে প্রায় ১৭,০০,০০০: ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ আছে। এ সমুদয় প্রকোষ্ঠগুলির উপরটা অতি পাতলা চামড়া দ্বারা নির্ম্মিত। এই সব প্রকোষ্ঠের সহিত শ্বাসনালী যুক্ত থাকায় এইগুলি সর্ব্বদা বায়ুর দ্বারা পূর্ণ থাকে। এজন্যই ইহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে বায়ু-প্রকোষ্ঠ (Air cells)।

আমাদের বুকের দুইদিকে প্রায় ত্রিশ লক্ষ বায়ু-প্রকোষ্ঠ আছে। এখানে যে শ্বাসনালী ও ফুস্ফুসের ফুস্ফুস্ ছবি দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতে ইহার সত্যতা বেশ ভালরূপেই বুঝিতে পারিবে। এইবার ফুস্ফুস কি, তাহা শোন।



ফুস্ফুস্

শ্বাসনালীর যে সমুদয় শাখা-প্রশাখা আছে, সে সমুদয় এবং তাঁহাদের বায়ু-প্রকোষ্ঠগুলি একটা পাতলা চামড়া দ্বারা আবৃত। এই চামড়াটি দেখিতে থোলের মত। আমাদের বুকের দুই দিকে দুইটি এইরূপ থোলে আছে। সেই থোলে দুইটিকেই ফুস্ফুস বলে। ফুস্ফুসের রঙ্ রক্তাভ। ফুস্ফুস্ আমাদের বুকের প্রায় সমস্তখানি জায়গা জুড়িয়া আছে। ফুস্ফুস্ দ্বারা হৃৎপিণ্ড চারিদিক দিয়া বেষ্টিত।



ফুস্ফুসের বায়ু-প্রকোষ্ঠ

আমাদের শরীরের দূষিত রক্ত দুইটি রক্তনালীর দ্বারা ফুস্ফুসে আসে। এই দুইটি রক্ত-নালীর একটি বাম ফুস্ফুসে এবং অপরটি দক্ষিণ ফুস্ফুসে প্রবেশ করিয়া অনেকগুলি ছোট ছোট শাখায় বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। এই শাখাগুলি হইতে আবার চুলের ন্যায় সরু অনেক রক্ত-নালী ফুস্ফুসের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই যে সূক্ষ্ম রক্ত-নালীগুলি আমরা দেখিতে পাইতেছি, এইগুলি আবার ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে এবং অবশেষ চারিটি বৃহৎ নলের আকারে বিশুদ্ধ রক্তকে ফুস্ফুস্ হইতে হৃৎপিণ্ডে পরিচালিত করে।

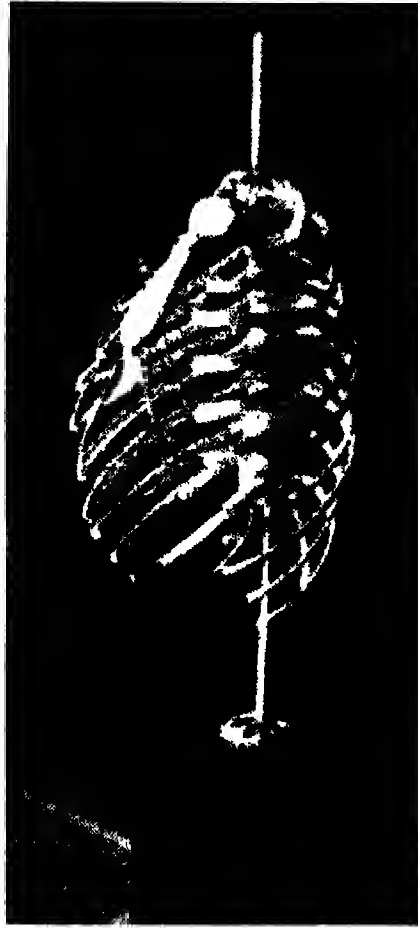
এখন আমরা ফুস্ফুস্ সম্বন্ধে এই জ্ঞান লাভ করিলাম যে, ফুস্ফুস্ একটি বায়ুর থোলের মত, ইহাতে অসংখ্য ছোট ছোট বায়ু-প্রকোষ্ঠ (air cells) আছে এবং ঐ বায়ু-প্রকোষ্ঠের আবরণগুলি চারিদিক হইতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্ত-নালীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে।

শ্বাস-নালী ও ফুস্‌ফুসের প্রয়োজনীয়তা কিসের জন্য, তাহা বোধ হয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। এ দুইটির প্রয়োজনীয়তা হইতেছে শুধু শ্বাস গ্রহণের জন্য। আমরা যখন শ্বাস লই, তখন আমাদের সেই শ্বাসবায়ু কতক নাকের ভিতরে এবং কতক মুখের ভিতরে প্রবেশ করে। তারপর মুখ গহ্বরের পশ্চাদ্দিক্ দিয়া শ্বাস-প্রণালীর মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করে। শ্বাস-প্রণালীর পথে বায়ু ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিয়া তার মধ্যে যে অসংখ্য বায়ু-প্রকোষ্ঠ আছে তাহা পূর্ণ করিয়া ফেলে।

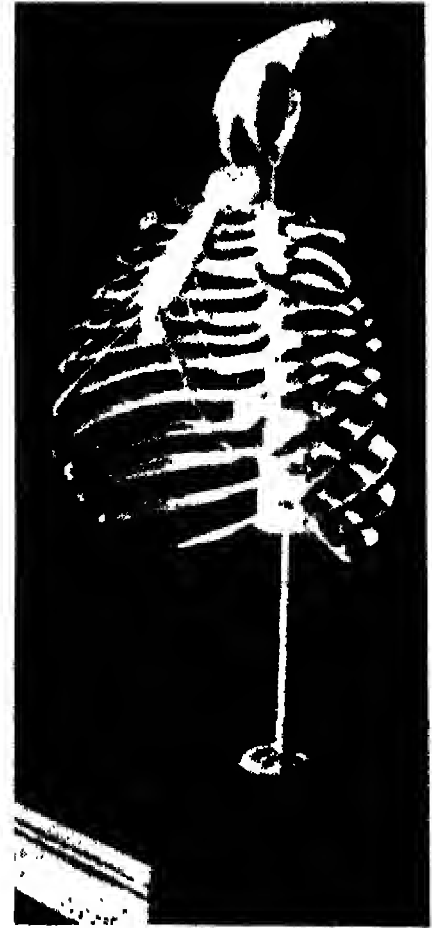
ফুস্‌ফুস্ ও শ্বাসনালীর প্রয়োজনীয়তা

এভাবে বায়ু প্রবেশ করিলে পর, ফুস্‌ফুস্ ফুলিয়া উঠে, পরে যখন আমরা প্রশ্বাস ত্যাগ করি, তখন আবার ফুস্‌ফুসের সমস্ত বায়ু চাপ প্রভাবে বাহির হইয়া আসে। তোমরা ফুটবল কিংবা খেলার বেলুন দিয়া ইহার পরীক্ষা করিতে পার। ফুটবলের মধ্যে যখন তোমরা হাওয়া পুরিয়া দেও, তখন ফুটবলটি ফুলিয়া উঠে, আবার যখন হাওয়া ছাড়িয়া দেও, তখন উহা সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। খেলায় বেলুনেরও এই রকম অবস্থাই হইয়া থাকে। আমরা নিশ্বাস প্রশ্বাস লইবার সময় এ অবস্থাটা বেশ ভাল রূপে বুঝিতে পারি। ইহাকেই আমরা শ্বাস-প্রশ্বাস ক্রিয়া বলি। ইংরাজীতে শ্বাস গ্রহণ করাকে বলে inspiration এবং প্রশ্বাসকে বা শ্বাস ত্যাগ করাকে বলে expiration.

এখন কি ভাবে ফুস্‌ফুসের ভিতর বায়ু প্রবেশ করে, সে-কথা শোন। তোমরা পূর্ব্বে পড়িয়াছ যে, আমাদের বুকের ভিতরটা—যাহাকে আমরা বক্ষের গহ্বর বলি, তাহা পাঁজরার হাড় দ্বারা বেষ্টিত এবং ঐ পাঁজরার অস্থিগুলি সম্মুখভাগে বক্ষের অস্থির সহিত এবং পশ্চাতে যে মেরুদণ্ড আছে তাহার সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। এই পাঁজরার হাড়ের মধ্যে মধ্যেও মাংসপেশী আছে, ঐ মাংসপেশী অন্যান্য মাংসপেশীর ন্যায় সঙ্কুচিত এবং প্রসারিত হইয়া থাকে। এই মাংসপেশীগুলি সঙ্কুচিত হইবার সময় ইহার নিম্নস্থিত পাঁজরার হাড়গুলিকে একটু উপরের দিকে টানিয়া লয়। ইহাতে কি হয়, জান? ছোট পাঁজরাগুলি উপরে সরিয়া যায় আর তাহার নীচের বড় পাঁজরা আসিয়া তাহার স্থান অধিকার করে। এইভাবে বক্ষের পাশাপাশি দৈর্ঘ্য বাড়িয়াথাকে।



পাঁজরা—সাধারণ অবস্থা



পাঁজরা—নিশ্বাস লইলে যেমন হয়

যখন পাঁজরার সম্মুখের সংযোগ-স্থান সকল উপরের দিকে সরিয়া যায়, তখন বক্ষের অস্থিগুলিকে সম্মুখের দিকে ঠেলিয়া দেয়। এইরূপ ঠেলিবার ফলে বক্ষের পশ্চাৎ হইতে সম্মুখের দিকের দৈর্ঘ্য বাড়িয়া থাকে। কাজেই, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, পাঁজরার মধ্যস্থিত পেশীসকল সঙ্কুচিত হইলে আমাদের বক্ষের গহ্বর বৃহৎ

হয়, আবার এই পেশীগুলি যখন বিস্তৃত বা প্রসারিত হয় তখন আবার পাঁজরার হাড়গুলি নিজ নিজ স্থানে চলিয়া আসে এবং বক্ষের গহ্বরও আকারে ছোট হইয়া পড়ে।

ফুস্‌ফুসের ঠিক নীচে একটি পাতলা মাংসপেশী আছে। ঐ মাংসপেশীটি ফুস্‌ফুসের দুই দিকে বক্ষের সহিত সংবদ্ধ। এই মাংসপেশীটি পাঁজরা, বুকের হাড় এবং মেরুদণ্ডের সহিত সংলগ্ন রহিয়াছে। বুকের উপর দিকে উহা দেখিতে একটি খোলা ছাতার মত। ইহার পেশীগুলি বক্ষ উদর হইতে পৃথক্ রহিয়াছে।



মুখ দিয়া নিঃশ্বাস লইতেছে



নাক দিয়া নিঃশ্বাস লইতেছে

শরীরের অন্যান্য মাংসপেশী যেমন সঙ্কুচিত হইয়া থাকে, ইহাও সেইরূপ সঙ্কুচিত হয়। যখন সঙ্কুচিত হয় তখন ইহা নীচের দিকে আসিয়া চেপ্টা হইয়া যায়। চেপ্টা হইবার ফলে আমাদের বক্ষের গহ্বরের আকার বড় হইয়া পড়ে। আবার যখন উহা প্রসারিত হইয়া উপরের দিকে চলিয়া যাইয়া নিজের প্রকৃত আকার—খোলা ছাতার মত হয়, তখন বুকের আয়তনও ছোট হইয়া যায়। এই পেশী সঙ্কুচিত হইয়া নীচের দিকে নামিয়া আসিবার সময় পাঁজরার মধ্যস্থিত পেশীগুলিও সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করে এবং তাহারই ফলে বক্ষের গহ্বর একই সময় চারিদিক্ হইতে স্ফীত হইয়া উঠে।

বক্ষের গহ্বর এইরূপে স্ফীত হইলে পর ফুস্‌ফুসের খানিকটা স্থান খালি হইয়া পড়ে—কিন্তু ফুস্‌ফুসের অবস্থান বুকের চারিদিকে এবং নীচে সংলগ্ন থাকায় বক্ষের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গেই ফুস্‌ফুস্ প্রসারিত হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাহিরের কতক বায়ু মুখ অথবা নাসিকার ছিদ্র এবং শ্বাসনালী দিয়া ফুস্‌ফুসের মধ্যে প্রবেশ করে। ফুস্‌ফুসের মধ্যে বায়ু প্রবেশ করিলে পর ছাতার ন্যায় সেই মাংসপেশী এবং পাঁজরার মধ্যস্থিত মাংসপেশী বিস্তৃত হইয়া বক্ষের গহ্বরকে ছোট করিয়া দেয়। ছোট হইলে পর ঐ মাংসপেশী সমূহ চারিদিক্ হইতে আসিয়া ফুস্‌ফুস্‌কে চাপিয়া ধরে, ঐ চাপের জন্য ফুস্‌ফুসের বায়ু বাহির হইয়া যায়। এইরূপ ছত্রাকার হইয়া গেলেই মাংসপেশী এবং পাঁজরার মধ্যস্থিত মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ বন্ধ হইয়া যায়, তখনই মানুষের মৃত্যু ঘটে।

আমাদের জীবনধারণের পক্ষে ফুস্‌ফুসের কার্য্যকারিতা কত বেশী, তাহা বোধ হয় এখন বেশ বুঝিতে পারিলে। এখানে আর একটি ছোট কথা তোমাদিগকে বলিতেছি। কথাটি ছোট হইলেও সাবধান, কখনও ইহা ভুলিও না। এ কথা যে কেবল তোমাদের পক্ষেই প্রযোজ্য তাহা নয়, অনেক বয়স্ক লোকেরও এই রকম কু অভ্যাস আছে যে, তাহারা নাসিকার পরিবর্ত্তে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকেন। এ খুব মন্দ অভ্যাস। যে সকল ছোট ছোট ছেলে মুখ দিয়া শ্বাস গ্রহণ করে, উহা তাহাদের একটি পীড়াবিশেষ বলিয়া মনে করিবে। ঐ পীড়ার নাম adenoids। এক রকম পাতলা পর্দ্দার সৃষ্টি হইয়া শ্বাস সঞ্চালনের দ্বার বন্ধ হইয়া যায়। এই পীড়ার জন্য নাক দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস গ্রহণ করিতে না পারায় শরীরের মধ্যে অক্সিজেন (Oyxgen) প্রবেশ করিতে পারে না। ফলে, এইরূপ ছেলে-মেয়েদের স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া যায়। তাহাদের চোখে ঘোলাটে ভাব, পড়াশুনায় অমনোযোগিতা ও চেহারায় বিকৃতি ঘটে। যে সকল ছেলেমেয়ে মুখ দিয়া নিঃশ্বাস প্রশ্বাস লয়, বিজ্ঞ চিকিৎসক ডাকিয়া এই ব্যাধির হাত হইতে তাহাদিগকে মুক্ত করা কর্ত্তব্য। যদি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া সুস্থ ও সবল দেহে সুখী হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যের দিক দিয়া যাহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম না ঘটে, তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবে। ইংরাজীতে একটি সুন্দর কথা আছে—"To breathe well is to live well,—to live longer and better." এই উপদেশটি তোমরা জীবনে কখনও ভুলিয়ো না।

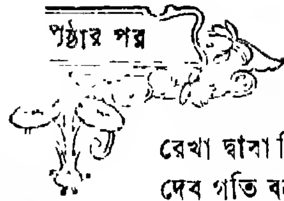


শব্দরেখার বক্রগতি

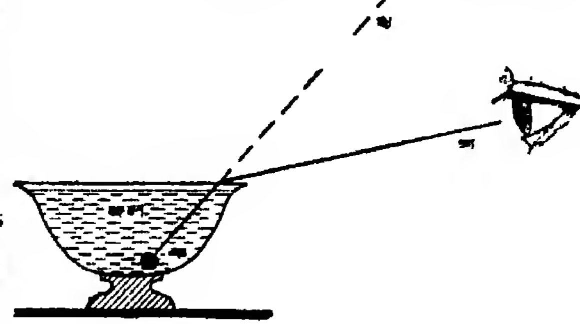
আলোক-রশ্মি যে বাঁকিয়া চলে —সে-কথা তোমরা 'আলো'তে পড়িয়াছ। কেবল যে আলোক-রশ্মিরই বক্রগতি হয় তাহা নহে—সকল প্রকার ঢেউয়ের একই স্বভাব। যখন উহারা এক স্তর হইতে অন্য স্তরে প্রবেশ করে তখন তাহা গতি বাঁকিয়া যায়। কোনও অবস্থায় দক্ষিণে বাঁকে, আবার কখনও বা বাঁয়ে বাঁকে। কেন এইরূপ হয়? বৈজ্ঞানিকের মতে, যদি প্রথম স্তরে ঢেউয়ের গতিবেগ (velocity) দ্বিতীয় স্তরের অপেক্ষা বেশী হয় তাহা হইলে ঢেউয়ের পথ-প্রদর্শক রেখা বামদিকে বক্র হয়; আর যদি দ্বিতীয় স্তরে ঢেউয়ের গতিবেগ প্রথম স্তর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উহা উল্টা দিকে অর্থাৎ ডান দিকে বাঁকিয়া যায়।

এই নিয়ম অনুসারেই শব্দের ঢেউ ভিন্ন প্রকার স্তরে স্তরের সাজানো পদার্থের মধ্য দিয়া অগ্রসর হয়। এই নিয়মের নাম তির্য্যক্ গমন (Refraction)। আলোক-রশ্মির বক্রগতির মত শব্দতরঙ্গের বক্রগতি দেখিতে পাওয়া যায় না।

একটি পেয়ালাতে একটা পয়সা রাখ। ক্রমশঃ দূরে সরিয়া যাও, এবং যখন পয়সাটি আর দেখা যাইবে না, এইরূপ স্থানে দাঁড়াও। এখন কাহাকেও পেয়ালাতে জল ভরিতে বল। জল ঢালিবামাত্রই পয়সাটি দেখা যাইবে।

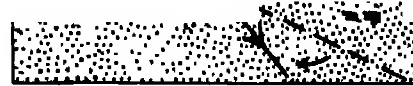

পৃষ্ঠার পর

জল না থাকিলে ক এবং খ রশ্মিগুলি যে ভাবে বিচরণ করিয়া থাকে তাহা বিন্দুযুক্ত রেখা দ্বারা চিত্রে দেখান আছে। জলে তাহাদের গতি বক্র হইয়া 'গ' কেমন চোখের উপর



১ নং

আসিয়া পড়িয়াছে। জলের উপরে বায়ুতে আলোক-



২ নং

রশ্মির গতিবেগ জল অপেক্ষা বেশী হওয়ায় রশ্মিরেখাটি বক্র

হইয়াছে। ২ নং এবং ৩নং চিত্রে শব্দরেখার বক্রতা দেখান হইয়াছে। ২ নং চিত্রে প্রথম স্তর অপেক্ষা দ্বিতীয় স্তরে শব্দের ঢেউয়ের গতিবেগ অধিক। সেইজন্যই উহা দক্ষিণে বক্র হইয়াছে। ৩ নং ঠিক [illegible] উহার বিপরীত। প্রথম স্তরে গতিবেগ দ্বিতীয় স্তর

৩ নং

এই নিয়মেই শব্দ বিস্তার লাভ করে। যদি কোনও স্থানে শব্দ হয় তাহা হইলে সেই শব্দ বায়ুর স্তরে বা পদার্থের স্তরে স্তরে ঐ নিয়মেই অগ্রসর হইয়া থাকে। শব্দের পথ-প্রদর্শক রেখা উপরের দিকে গেলে বা নীচের দিকে আসিলে কিভাবে কেমন করিয়া বাঁকিয়া যায় তাহা বেশ স্পষ্ট করিয়াই বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। সেখানেও ঢেউয়ের গতিবেগের বিভিন্নতাই বক্রতার কারণ। স্তরে স্তরে গতি-বেগ বদলাইয়া গেলে ঢেউ কখনও সোজাসুজি এক রাস্তায় যাইতে পারে না। তাহাকে বক্র হইতে হইবেই।

৪নং

জালের চাকৃতি

শব্দরেখার বক্রগতি একটি সামান্য পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া যাইবে। বিশেষ কিছুই যন্ত্রের দরকার হইবে না। দুই টুকরা তারের জাল, ইঞ্চিতে দুইটি ছিদ্র থাকিলে, সেই জাল দিয়া বেশ কাজ হইবে। এইরূপ দুই খণ্ড জালের দুইটি গোল চাকৃতি ১½ ফুট ব্যাস, (diameter) এর তৈয়ারী করিয়া, দুইটিকে এক সঙ্গে পরিধির উপর বাঁধিয়া ফেল। পরে তাহাদের মধ্যে ধোনা তুলা ভরিয়া মধ্যস্থলে অন্ততঃ দুই ইঞ্চি ফুলাইয়া দাও। তাহা হইলেই তুলার লেন্স (Lens) তৈয়ারী হইল। ইহার কার্য্য ঠিক কাঁচের লেন্সের ন্যায় হইবে। অর্থাৎ যদি লেন্সের সামনে শব্দ করা হয় তবে অন্য দিকের শব্দ-রশ্মিগুলি একত্র হইবে, এবং সেখানে কান রাখিলে শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে। চতুর্থ চিত্রে দেখ, ঘড়ির টিক্ টিক্ শব্দ-রশ্মিগুলি কেমন লেন্সের অপর দিকে একত্র হইয়াছে এবং সেখানে একটি চোঙ রাখিয়া শব্দ শুনা যাইতেছে এই চোঙের এক দিক খোলা আর অপর দিকে রবারের নল-সংযুক্ত করিয়া কানে লাগান হইয়াছে। এইরূপ চোঙ না থাকিলে একটি মাটির কলিকার (তামাক খাইবার) পিছনে রবারের নল গুঁজিয়া দিলেও কাজ হইবে। রবারের নল এবং চোঙের পরিবর্ত্তে মাইক্রোফোন (Microphone) এবং Telephone Receiver ব্যবহার করিলে অতি সুন্দর ভাবে শুনিতে পাওয়া যায়। যাঁহাদের বাড়ীতে টেলিফোন আছে তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন, যাহার সামনে কথা কহা হয়, তাহাকে microphone বলে এবং কানে লাগাইয়া যে যন্ত্রে কথাবার্ত্তা শুনা যায় তাহাকে Telephone Receiver বলে। (ইহাদের তৈয়ার করিবার বিবরণ পরে সময় মত বলা হইবে।

ভূমিকম্পের সম্বন্ধে তোমরা অনেক কিছু শুনিয়া থাকিবে; জাপানে ভূমিকম্প খুব বেশী হয়। ভূমি-কম্পে ঘরবাড়ী ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং অনেক লোকের প্রাণনাশও হইয়া থাকে। এইজন্য সেখানে কাঠের দেওয়াল দিয়া বাড়ী তৈয়ার করা হয়। সিমলা পাহাড় ও কলিকাতা আলিপুরের আবহাওয়া বিষয়ক পরীক্ষাগার হইতে ভূমিকম্পের খবর প্রায়ই পাওয়া যায়। এই সকল স্থানে ভূমিকম্প-নির্দ্ধারক যন্ত্র আছে।

ইংরাজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে একবার ভীষণ ভূমিকম্প হয়, তাহার ফলে বহুলোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল এবং অনেক বাড়ী-ঘর ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছিল।

৫ নং চিত্রে দেখ রেলের পুল ভূমিকম্পে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। ৬ নং চিত্রে দেখ পুলের প্রস্তরস্তম্ভ কেমন কাঁচের বাসনের ন্যায় ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়াছে। একবার ভাবিয়া দেখ এইরূপ স্তম্ভ যখন ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন ভূমিকম্পের প্রকোপ কত বেশী। ভূমিকম্প ব্যাপারটা কি, পুরাকাল হইতেই ইহার



৫নং—ভূমিকম্পে নায়েগ্রা নদীর পুল ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

আলোচনা হইতেছে। পুরাকালে লোকেরা ভাবিত কোনও এক অদৃশ্য অজ্ঞাত কারণে ভূমিকম্পের সৃষ্টি। গ্রীক্‌দেশীয় পণ্ডিতগণ—এরিস্টটল প্লাইনি Aristote Pliny—400 B.C.) বিশ্বাস করিতেন যে পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হইলে, ভূমিকম্প হয়। চীনদেশীয় পণ্ডিতেরাও ইহাই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। এখন অনেক দেশের অশিক্ষিত লোকেরা ভাবে যে, পৃথিবীকে যে ধরিয়া আছে সে মাথা নাড়াইলে ভূমিকম্প হয়। মঙ্গোলিয়া প্রদেশের লোকদের ধারণা যে, শূকর পৃথিবীকে ধরিয়া আছে। ভারতবর্ষের লোকেরা বলে "শেষ নাগ" যিনি পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন, তিনি মাথা নাড়াইলেই ভূমি-কম্পের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিজ্ঞানের বিস্তারের সঙ্গে এই অন্ধ বিশ্বাস এখন দূর হইয়াছে। এখন সকলেই জানেন যে, পৃথিবীর অভ্যন্তরে কোনও কারণে কম্পন হইলে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। বড় বড় পাহাড়—এমন কি হিমালয়ের মত বড় বড় পর্ব্বত সর্ব্বদাই একস্থানে থাকে না। তাহারা হঠাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে উর্দ্ধে উঠিয়া যায়। সেই সময় যে কম্পনের সৃষ্টি হয়, তাহাই ভূমিকম্প রূপে চারিদিকে বিস্তার লাভ করে। সমুদ্রগর্ভে যে এইরূপ কত পাহাড় উপরে নাচে উঠে, তাহার খবর আমরা পাই না। তোমরা যে হিমালয়

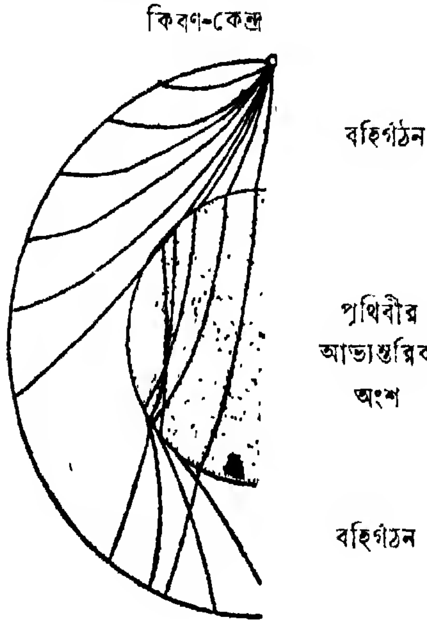
৬ নং—ভূমিকম্পে পাথরের থাম ভাঙ্গিয়া গিয়াছে

পর্ব্বত এখন ভারতবর্ষের উত্তর সীমায় দেখিতেছ, পূর্ব্বে ইহার কোনও অস্তিত্ব ছিল না। পৃথিবীর বয়সের মাপে ইহার উৎপত্তি সম্প্রতি হইয়াছে বলিলেই হয়।

পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগে হঠাৎ যদি বিস্ফোরণ হয়, তাহা হইলে সেই স্থানের ভূমি প্রচণ্ডভাবে কম্পিত হয়। সেই কম্পন, ঢেউয়ের আকারে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ ভূভাগের মধ্যে চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে।

ভূমিকম্পের ঢেউ দুই প্রকারের হয়—এক, লম্বমান ঢেউ (Longitudinal Waves) এবং অন্য, আড় ঢেউ (Transverse Wave)। লম্বমান ঢেউয়ের বিস্তারের সহিত ভূমিকম্প অতিদ্রুত অগ্রসর হয়, আড় ঢেউ-য়ের গতিবেগ অল্প কিন্তু ইহাতে ঘর বাড়ী ধ্বংস হয় বেশী। ভূমিকম্পের ঢেউ ছড়াইবার সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিলে তাহার গতি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে বক্র হইয়া পড়ে।

৭নং ছবিতে ভূমিকম্পের পথ-প্রদর্শক রেখা কেমন বক্র হইয়া গিয়াছে, তাহাই দেখান হইয়াছে। পৃথিবীর নিম্নতম প্রদেশে যদি লোহা থাকে আর তার উপরে

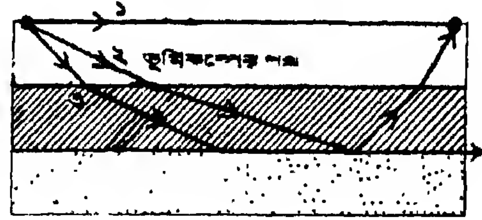


৭ নং

যদি নরম পাথর, মাটি প্রভৃতি থাকে তাহা হইলে ভূমিকম্পের গতি এইরূপ বক্র হইবে। লোহে ঢেউয়ের গতিবেগ, প্রস্তরের স্তর অপেক্ষা বেশী। এই জন্যই উপরের কোমল আবরণ হইতে লোহার স্তরবিন্যাসের ভিতর ঢেউ প্রবেশ করিলেই গতি বক্র হইয়া গিয়াছে। ৮নং চিত্র হইতে বুঝিতে পারিবে যে কোন কোন স্থানে ভূমিকম্প মোটে পৌঁছিতে পারে না। ভূমিকম্পের গতি যদি এইরূপ বক্র হয়, তাহা হইলে তাহার উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা কত কঠিন, তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে

পৃথিবীর উপরিভাগেও ভিন্ন প্রকারের পাথরের এবং মাটির স্তর থাকে। পৃথিবীর মধ্যে কৃত্রিম ভূমি-

ভূমিকম্পের কারণ



৮ নং

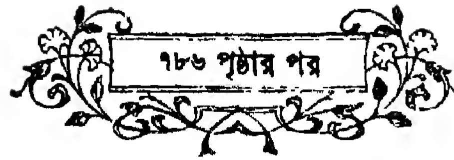
কম্পের ফলে সেই কম্পনও ঢেউয়ের আকারে অগ্রসর হয়। ভূমিকম্পের কতক অংশ পৃথিবীর উপরে উপরেই অগ্রসর হয় এবং কতক অংশপৃথিবীর নিম্ন দেশে যাইতে থাকে। কিন্তু রাস্তায় যদি কোনও ভিন্ন প্রকার পাথরের স্তরে বাধা পায় তাহা হইলে ঢেউয়ের গতি বক্র হইয়া যায়। যদি সেই স্তরে গতিবেগ উপরকার স্তর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে দক্ষিণে বক্র হইবে এবং সেই ঢেউ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসে—পুনরায় পৃথিবীর উপরের স্তরে গিয়া উপস্থিত হয়। এইরূপ অবস্থায় পৃথিবীর উপরে দুইবার ভূমিকম্প বুঝিতে পারা যায়। যে ভূমিকম্প পৃথিবীর উপরে সোজাসুজি আসে, তাহার মাত্রা খুব বেশী এবং অনায়াসেই কোন্‌টি প্রাথমিক এবং কোন্‌টি দ্বিতীয় অর্থাৎ পৃথিবীর অভ্যন্তর হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ, দ্বিতীয়টির মাত্রা অতি অল্প। অনেক সময় দ্বিতীয় ভূমিকম্পটি প্রাথমিক ভূমিকম্পের পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিবে। এই প্রকার গবেষণার দ্বারাই যন্ত্রের সাহায্যে পণ্ডিতগণ পৃথিবীর মধ্যে খনিজ পদার্থ ও পেট্রোলের সন্ধান করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর মধ্যে লম্বমান ঢেউয়ের গতিবেগ

গভীরতা	নাম	ঢেউয়ের গতিবেগ
কিলোমিটার ০,	বহির্গঠন	৫.৬ কিলোমিটার
৬০,	”	৮.০ ”
১৭০০,	”	১২.৭৫ ”
২৯০০,	আভ্যন্তরিক অংশ	৮.৫ ”
৬৩৭০,	”	১১.০ ”



ইব্‌নে বতুতা



মার্কো পোলোর ন্যায় আর একজন সাহসী ভ্রমণকারীর কথা এইবার বলিতেছি। ইহার নাম ইব্‌নে বতুতা। ইবনে বতুতা কিন্তু ইহার প্রকৃত নাম নয়। এই বিখ্যাত পর্যটকের প্রকৃত নাম আবদুল্লা-অল-মুহম্মদ লাওয়তি তানজি ওরফে ইবনে বতুতা। ৭০৩ হিজরী (১৩০৩ খৃষ্টাব্দ) ১৭ই রজব সোমবার দিন মরক্কো রাজ্যের তানজিয়ার নগরে ইব্‌নে বতুতার জন্ম হয়। ইহার পিতার নাম আবদুল্লা। ৭২৫ হিজরী ২রা রজব বৃহস্পতিবার ইনি জন্মভূমি ত্যাগ করেন

পৃথিবীর বিখ্যাত ভ্রমণকারিগণের মধ্যে ইব্‌নে বতুতার নামও উল্লেখযোগ্য। ইনি ক্রমাগত আটাশ বৎসর কাল পৃথিবীর নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আজকাল যেমন চলা-ফেরার নানা সুবিধা, সেকালে ত আর তেমন ছিল না, কাজেই, ইব্‌নে বতুতার এইরূপ ক্লেশসাধ্য ভ্রমণের মধ্যে যথেষ্ট বাহাদুরি আছে।

১৩২৪ খৃষ্টাব্দে মার্কো পোলোর মৃত্যুর বৎসরে ইবনে বতুতা তান্‌জিয়ার ত্যাগ করিয়া মক্কা তীর্থে যাত্রা করেন। উত্তর আফ্রিকা, মিশর ও সিরিয়া পার হইয়া তিনি বোগদাদে পৌঁছেন এবং সেখানে কিছুদিন বিশ্রাম করিয়া লোহিত সাগর পার হইয়া আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে মোম্বাসা প্রদেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তার পর তিনি দক্ষিণ আরব অভিমুখে যাত্রা করেন এখানে নারিকেল ফল দেখিয়া ইবনে বতুতা তাহার এক কৌতুকজনক বর্ণনা দিয়াছেন—"এখানে একজাতীয় গাছ আছে, তাহাতে মানুষের মাথার মত এক রকম ফল হয়। সেই ফলের মাথায় দুটো চোখের মত ও মুখের মত দাগ আছে। এই ফলের উপরের অংশ হইতে দড়ি ইত্যাদি তৈয়ার হয়।" এই বর্ণনাটি কৌতুকজনক হইলেও একেবারে খাঁটি সত্য, কিন্তু মুক্তার বর্ণনা করিতে যাইয়া তিনি লিখিয়াছেন "সূর্য্যের তাপে পোড়ান ঝিনুক"। তাহা একেবারেই ভুল।

ইব্‌নে বতুতা ইহার পর পারস্য উপসাগর পার হইয়া মক্কা যান এবং তার পর লোহিত সাগর পার হইয়া নীলনদের উপকূলে কাইরো (cairo) সহরে অবতীর্ণ হন। এশিয়া মাইনরে কিছুদিন ঘুরিয়া তিনি ভল্‌গা নদী পার হইয়া উত্তর রাশিয়াতেও উপস্থিত হইয়াছিলেন। এখানে কুকুরে-টানা শ্লেজ গাড়ী দেখিয়া ইবনে বতুতা আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। পূর্ব্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্টান্টিনোপল্ দেখিয়াও ইবনে বতুতা বিশেষরূপে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ইহার পর তিনি পারস্য ও আফগানিস্থান হইয়া ভারতবর্ষে যাত্রা করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণের একস্থানে লিখিয়াছেন যে, পথে "তাহার ৩৫০ বৎসরের একজন বৃদ্ধের সহিত দেখা হইয়াছিল, প্রত্যেক ১০০ শত বৎসর পর পর তাঁহার নূতন দাঁত বাহির হইত। এই ঘটনা আমাদের নিকট অসম্ভব বানানো গল্প বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে আফগানদের চুরি-ডাকাতি করিয়া পথিকদের ধন-রত্ন লুণ্ঠন করিয়া লইবার কথা লিখিয়াছেন, তাহা সত্য।

ভারতবর্ষে পৌঁছিয়া ইবনে বতুতা সে সময়ের দিল্লীর সম্রাট মুহম্মদ্-বিন্-তুগলকের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মুহম্মদ বিদেশী ভ্রমণকারিগণের প্রতি অত্যন্ত ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করিতেন। তখনকার দিনে দিল্লী হিন্দুস্থানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল। ইবনে বতুতা আট বৎসর কাল ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে সেকালের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারা যায়। বতুতা ভারতের অনেক আচার ব্যবহারের কথা লিখিয়া গিয়াছেন, সে সকলের মধ্যে স্বামীর মৃত্যুতে সতীদাহের কথা একটি। এ সময়ে বতুতা একটা

ইবনে বতুতা যে জাহাজে চড়িয়া চীন যাত্রা করিয়াছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে সেই জাহাজখানি ঝড়ে পড়িয়া ডুবিয়া গেল! বতুতা অতিকষ্টে প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন। দিল্লীর সম্রাটকে এই শোচনীয় দুর্ঘটনার সংবাদ দিবার জন্য ইবনের আর ভারতবর্ষে আসিবার সাহস হইল না। বতুতা বরাবর সিংহলে চলিয়া গেলেন। সিংহল দ্বীপের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য তাঁহার কাছে খুব ভাল লাগিয়াছিল। সেখানকার বিখ্যাত পর্ব্বত "আডামস্ পিকে" Adam's Peak তিনি আরোহণ করিয়াছিলেন। ঐ দেশে গল্প আছে যে, আডাম স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হইয়া



কুকুরে-টানা শ্লেজ গাড়ী

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন আর একটু হইলে তাঁহার প্রাণদণ্ড পর্য্যন্ত হইতে পারিত। সৌভাগ্যক্রমে নানা কোশলে আবার তিনি সম্রাটের প্রিয়পাত্র হইতে পারিয়াছিলেন। একবার সম্রাটের আদেশে তাঁহাকে চীনসম্রাটের নিকট যাইতে হইয়াছিল। কালিকাটে আসিয়া চীন-সম্রাটের নিকট প্রেরিত সমুদয় উপঢৌকন লইয়া এক চীন জাহাজের যাত্রী হইয়াছিলেন। সে সময়ে জাহাজ পালে চলিত। এই সব জাহাজ দেখিতে বেশ সুন্দর ছিল। এক একটি জাহাজে প্রায় এক হাজার যাত্রী ধরিত। জাহাজের উপর বাড়ী-ঘর, বাগান ইত্যাদি সাজানো থাকায় মনে হইত যেন ভাসমান প্রাসাদ।

এক হাজার বৎসরকাল এই পর্ব্বত-শিখরের উপর এক পায়ের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। সেই পদচিহ্ন এখনও সেই পাহাড়ের চূড়ায় দেখিতে পাওয়া যায়।

সিংহলে কিছুদিন থাকিবার পর ইবনে আবার নানা দেশ দেখিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি ঘুরিয়া অবশেষে চীনদেশের চিংচু (Chinchu) নামক বন্দরে যাইয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ইবনের ভ্রমণ-কাহিনীতে চীনদেশের অনেক সুখ্যাতি আছে। চীনদেশের লোকদের বিদেশী পথিকদের প্রতি আতিথেয়তার কথা অত্যন্ত আনন্দের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন। সেখানে পথিকদের আহার,

বাসস্থান ও সঙ্গের জিনিষপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের সুব্যবস্থার কথা তিনি শত মুখে বলিয়াছেন। সে সময়ে দেশের প্রত্যেকটি ধর্ম্মশালা, অতিথিশালা ভোজনালয় প্রভৃতির তত্বাবধানের ভার এক একজন বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তার হস্তে ন্যস্ত ছিল। যদি কোন অতিথির প্রতি কেহ কোন অন্যায় ব্যবহার করিত, এমন কি তত্বাবধায়কেরও যদি কোনরূপ ত্রুটি বিচ্যুতি প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে তাহাকেও কারারুদ্ধ থাকিতে হইত।

চীনের রাজধানী পেকিন (পিকিন) সহরে ইব্‌নে বতুতা বাজীকরের কৌতুকজনক খেলাধুলা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন। যাদুকর একটি দড়ি শূন্যে



ইব্‌নে বতুতা তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী বলিয়া যাইতেছেন

ছুঁড়িয়া মারিত আর একটি ছেলে সেই দড়ি ধরিয়া উপরে উঠিয়া এক একবার অদৃশ্য হইয়া যাইত, আবার দর্শকদের কাছে আসিত। বতুতা ইহা দেখিয়া এত দূর আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন যে, এ খেলা শুধু যে যাদুকরের কৌশল মাত্র, তাহা জানিয়াও তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

১৩৪৯ খৃষ্টাব্দে ইব্‌নে তাঁহার মাতৃভূমিতে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। মার্কো পোলোর ন্যায় বতুতাও চল্লিশ বৎসর কাল প্রবাসে ছিলেন। এত দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াও ইব্‌নের ভ্রমণ-স্পৃহা নিবৃত্ত হয় নাই। কিছুদিন বিশ্রামের পর পুনরায় ইব্‌নে স্পেন দেশে ভ্রমণ করিয়া আফ্রিকাতে গিয়াছিলেন। এ সময়ে তিনি অসাধারণ ক্লেশ ও ধৈর্য্যের সহিত সাহারা মরুভূমি পার হইয়া নাইগার (Niger) নদীর কূলে যাইয়া উপস্থিত হন এবং সেখান হইতে টিম্‌বাক্তু (Timbuctoo) যাইয়া পৌছেন। সেখানে কিছুদিন থাকিবার পর পুনরায় নিজের দেশে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

মরক্কোর সুলতান ইব্‌নের ভ্রমণ-কাহিনী শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে সাদরে আহ্বান করিয়া নিজ দরবারে আনয়ন করেন এবং তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইব্‌নে মুখে মুখে তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণ বলিয়া যাইতেন আর সুলতানের একজন বিচক্ষণ কার্য্যাধ্যক্ষ তাহা লিখিয়া লইতেন। অনেক-কাল পরে ইব্‌নের এই ভ্রমণ-কাহিনী ফরাসীদের হাতে পড়ে। ফরাসীভাষায় ইহা অনূদিত হয় এবং পরে ফরাসীদের নিকট হইতে এই অপূর্ব্ব ভ্রমণ-কাহিনী অন্যান্য দেশের লোকেদের হাতে যাইয়া পড়ে।

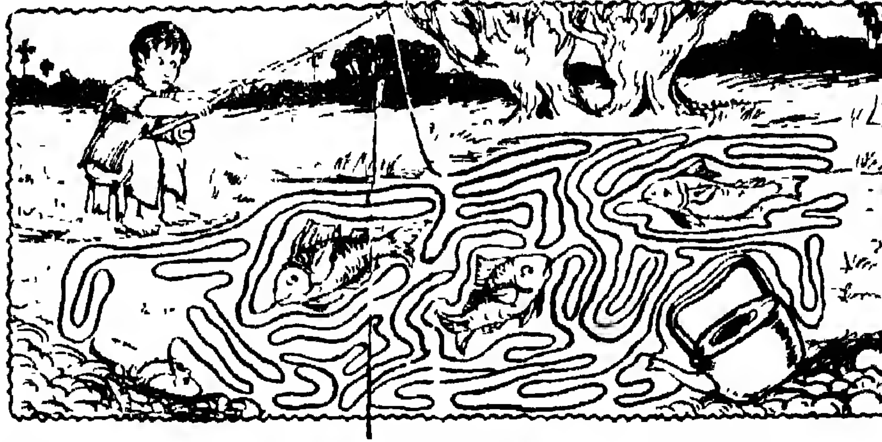
বতুতা হিন্দুস্থান (ভারতবর্ষ), মালদ্বীপ, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ, চীন, আরব, ইরান, শ্যাম, মিশর, ইস্পাহান, মরক্কো প্রভৃতি স্থান পর্য্যটন করিয়াছিলেন।

এই সব ভ্রমণ-বিবরণ হইতে আমরা শত শত বৎসর পূর্ব্বের প্রাচীন ইতিহাস অনেকটা যথাযথরূপে জানিতে পারি।





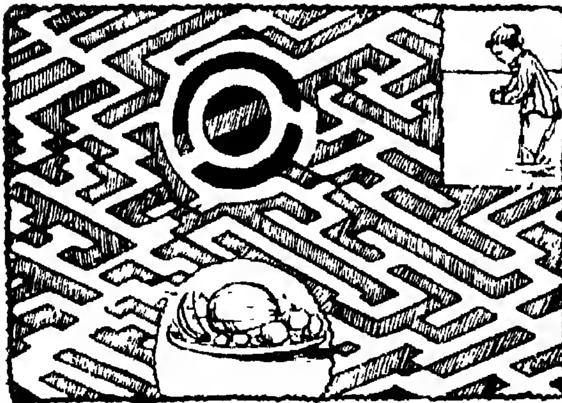
মাছ ধরার বিপদ



ছেলেটি মাছ ধরিতে বসিয়াছে ; কিন্তু জলে মাছ ছাড়াও অন্য জিনিষ আছে। ছিপের সুতা খুঁজিয়া খুঁজিয়া বাহির কর, ছেলেটির বঁড়শিতে কোন্ জিনিষ উঠিল ?

গোলক ধাঁধা





ছোট ছেলেটি ফলগুলি খাইতে চায়। গোলোক ধাঁধার মধ্যে দিয়ে কোন্ পথে সে যাইবে, বাহির কর।

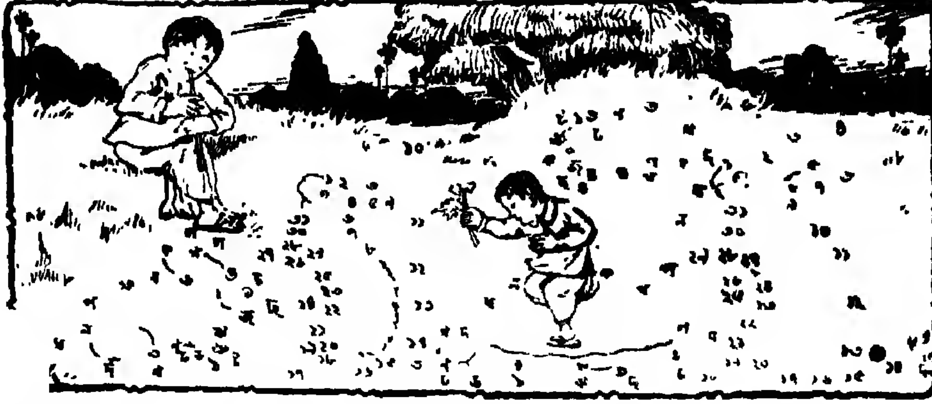
ঝড়ের মালিক

সবই ঝড়ে উড়িয়া গেল। মেয়েটির ছাতা গেল; ফুলের সাজি উল্টাইল; কুকুর ভয়ে চম্পট দিল। কিন্তু, ঝড়ের মালিক সাতটি ভূত লুকাইয়া হাসিতেছে।



উপরের ছবিতে তাহাদের লুকান মুখগুলি খুঁজিয়া বাহির কর।

অদৃশ্য সঙ্গী



(১) ছেলেটি মনের আনন্দে বাঁশী বাজাইয়া তাহার বন্ধু এবং সঙ্গীদের লইয়া আনন্দ করিতেছে। সঙ্গীটি আছে কোথায়? পাঁচটি সঙ্গীকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইলে প্রথমে ছবির বাঁ দিকের 'ক খ গ ঘ' ইত্যাদি অক্ষরের 'ক' হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে 'খ, গ, ঘ, ঙ, চ' প্রভৃতি অক্ষরগুলিকে পেন্সিলের লাইন দিয়া জুড়িয়া দিতে হইবে; সবগুলি অক্ষর (অর্থাৎ 'ক' হইতে 'ভ' পর্য্যন্ত) জোড়া হইলে ১নং সঙ্গীকে দেখা যাইবে। এই ভাবে, পাশের লেখা '১' হইতে '৩১' পর্যান্ত সংখ্যাগুলি ক্রমান্বয়ে লাইন দিয়া জুড়িয়া দিলে ২নং সঙ্গীকে দেখা যাইবে।

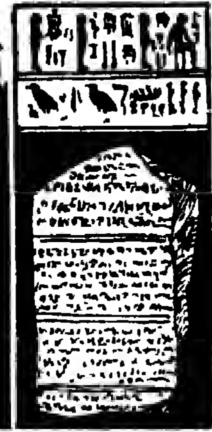
৩, ৪ এবং ৫নং সঙ্গীদের বাহির করিতে হইলে উপরি উক্ত নিয়মে অক্ষর বা সংখ্যাগুলি লাইন টানিয়া জুড়িয়া দিলেই হইবে।



(২) ছোট ছেলেটি হাতে থালা লইয়া কাহাকে খাবার দিতেছে? পাশের ১, ২, ৩, ৪ লেখাগুলি ক্রমান্বয়ে লাইন দিয়া জুড়িলেই দেখিবে, ছেলেটি কাহার জন্য খাবার আনিয়াছে।







রামায়ণ

[মহর্ষি বাল্মীকি রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। তিনি ছিলেন ভারতের আদিকবি। ইঁহার সম্বন্ধে 'শিশু-ভারতী'র ১৫৭ পৃষ্ঠায় পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে। রামায়ণে রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া চিত্রিত করা হইয়াছে। রামায়ণ সম্ভবতঃ ৫০০ খৃঃ-পূর্ব্বাব্দে বিরচিত হইয়াছিল কিন্তু উহার বর্ত্তমান আকারে গ্রথিত হইবার কাল, আনুমানিক প্রথম বা দ্বিতীয় খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ এইরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। রামায়ণের চরিত্রগুলি বড় সুন্দর। রামচন্দ্রের পিতৃভক্তি ও প্রজাবাৎসল্য, ভরত ও লক্ষ্মণের অনুপম ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার পাতিব্রত্যের উজ্জ্বল আদর্শ এবং সে যুগের নৃপতিগণের শাসন-নীতির অত্যুত্তম নিদর্শন চিরন্তন আদর্শরূপে ভারতের গৃহে গৃহে বিরাজিত রহিয়াছে। এখানে সংক্ষেপে রামায়ণের আখ্যানটি বাল্মীকির মূল রামায়ণ অনুসরণ করিয়া লিখিত হইয়াছে।]



সরযূর । কোশল নামে এক দেশ আছে। অযোধ্যা নগরী সেই দেশের মধ্যে অবস্থিত। অযোধ্যানগরী এখনও আছে, কিন্তু প্রাচীন অযোধ্যা আর নাই। সেকালের অযোধ্যা নগরী লম্বায় ছিল আটচল্লিশ ক্রোশ, চওড়ায় ছিল বারো ক্রোশ। তাহার মধ্য দিয়া চওড়া চওড়া রাজপথ শোভা পাইত। ঐ সব রাজপথের মাঝে মাঝে সুন্দর সাজানো তোরণ (ফটক) ছিল। রাজপথের ধারে ধারে উঁচু উঁচু অট্টালিকা শোভা পাইত। সেই অট্টালিকার চূড়ায় নিশান উড়িত। খুব মজবুত প্রাচীর দিয়া অযোধ্যা নগরীর চারিদিক ঘেরা ছিল। সেকালের এই অযোধ্যা নগরীতে দশরথ নামে একজন প্রসিদ্ধ রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার আটজন মন্ত্রী ছিল।

এত সুখে থাকিয়াও রাজার প্রাণে শান্তি ছিল না। কোন সন্তান ছিল না বলিয়া তাঁহার প্রাণ সর্ব্বদাই কাতর হইয়া থাকিত। সন্তান লাভের আশায় তিনি কত তপস্যা করিলেন, কত ব্রত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে কুলগুরু বশিষ্ঠের কথায় তিনি পুত্র কামনা করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। এই যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়াছিলেন ঋষ্যশৃঙ্গ নামে সেকালের একজন মহা তপস্বী ঋষি।

এই যজ্ঞের ফলে, যথাকালে রাজার কৌশল্যা, কৈকেয়ী এবং সুমিত্রা এই প্রধানা তিন রাণীর গর্ভে চারিটি পুত্র জন্মগ্রহণ করিল। কৌশল্যার পুত্রের নাম হইল রাম, কৈকেয়ীর পুত্রের নাম হইল ভরত এবং সুমিত্রার দুই পুত্রের নাম হইল লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন।

ক্রমে রাজকুমারগণের বয়স বাড়িতে লাগিল। তাঁহাদের যেমন সুদর্শন রূপ, তেমনি মনোহর সদ্‌গুণে তাঁহারা অযোধ্যার সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই সময়ে একদিন বিশ্বামিত্র মুনি আসিয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। বিশ্বামিত্র বলিলেন, মহারাজ! আমি একটি যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়াছি। কিন্তু মারীচ ও সুবাহু নামক দুইটা রাক্ষস আমার সেই

যজ্ঞের জায়গায় রক্ত মাংস ফেলিয়া অশুচি করিয়া দিয়াছে—আমার যজ্ঞে বাধা দিয়াছে। আমি অভিশাপ দিয়া তাহাদিগকে বধ করিতে পারিতাম, কিন্তু অভিশাপ দিয়া বাধা দূর করা যজ্ঞে নিষিদ্ধ বলিয়া অভিশাপ না দিয়া আমি আপনার নিকট আসিয়াছি। আপনি আমার যজ্ঞ পূর্ণ করিবার জন্য আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকে আমার সহিত পাঠাইয়া দিন্।

বিশ্বামিত্রের এই কথায় দশরথ আকুল হইয়া বলিলেন, মুনিবর, আমার রামের বয়স এখনো ষোল বৎসর পূর্ণ হয় নাই—সে ত এখন রাক্ষস বধ করিতে পারিবে না। অতএব চলুন, আমি বিপুল সৈন্যবল লইয়া গিয়া রাক্ষস বধ করিয়া আসিব। বিশ্বামিত্র বলিলেন, তাহা হয় না মহারাজ! তা যদি হইত, তাহা হইলে আমি তাহা আপনাকে পূর্ব্বেই বলিতাম।

অনেক কথাবার্ত্তার পর নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত দশরথ বিশ্বামিত্রের কথায় সম্মত হইলেন। বিশ্বামিত্র রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া রাম-লক্ষ্মণকে লইয়া রাজপুরী হইতে বিদায় লইলেন।

তাঁহারা তিন জনে প্রায় ছয় ক্রোশ পথ আসিয়াছেন এমন সময় সন্ধ্যা হইল। তাঁহারা সে রাত্রি তথায় অবস্থান করিলেন। রাত্রি প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র মুনি বলিলেন, বৎস রাম! তুমি স্নান করিয়া এই নদীর জলে আচমন কর। আমি তোমাকে বলা ও অতিবলা নামক দুইটি অস্ত্র দান করিব। এই দুই অস্ত্রের প্রভাবে তুমি পৃথিবীতে বা স্বর্গে অদ্বিতীয় শক্তিশালী হইবে। রামচন্দ্র ভক্তির সহিত বলা ও অতিবলা বিদ্যা গ্রহণ করিলেন।

নানা বন ও আশ্রম পার হইয়া তাঁহারা তিনজনে তাড়কার বনে আসিয়া পৌঁছিলেন। তাঁহাদিগকে আসিতে দেখিয়া তাড়কা চারিদিকে ধূলা উড়াইয়া, মুখ হাঁ করিয়া শিলাবৃষ্টি করিতে করিতে আসিতে লাগিল। রামচন্দ্রের বাণে রাক্ষসী ভীষণ শব্দ করিয়া মরিয়া গেল।

বিশ্বামিত্র রামের বাণ-বর্ষণের কৌশল দেখিয়া অতিশয় সুখী হইয়া তাঁহাকে দণ্ডচক্র, শূল, কালচক্র ব্রহ্মশির, কালপাশ প্রভৃতি অস্ত্র দান করিলেন। ক্রমে তাঁহারা সিদ্ধাশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন. এই সিদ্ধাশ্রমেই বিশ্বামিত্রের তপোবন।

তপোবনে পৌঁছিয়াই বিশ্বামিত্র যে যজ্ঞ করিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সেই যজ্ঞ করিবার আয়োজন করিলেন। পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। ষষ্ঠ দিনে ব্রহ্মা ও বিশ্বামিত্র মন্ত্র পাঠ করিয়া আহুতি দিতেছেন এমন সময়ে সহসা যজ্ঞের বেদী জ্বলিয়া উঠিল—আগুনের শিখা ছুটিতে লাগিল—আকাশে ভয়ানক শব্দ হইতে লাগিল। মারীচ ও সুবাহু শত শত সঙ্গী লইয়া সেই যজ্ঞের বেদীতে রক্তধারা বর্ষণ করিতে লাগিল। রাম লক্ষ্মণ বাণ বর্ষণ করিয়া সেই অগণিত রাক্ষস বধ করিলেন। নিরাপদে যজ্ঞ পূর্ণ হইয়া গেল।

এই সময়ে মিথিলার রাজা জনক এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনিগণকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে বলিলেন, আমি তোমাদের উভয়কে লইয়া রাজা জনকের যজ্ঞ দেখিতে যাইবার ইচ্ছা করিয়াছি। অতএব তোমরা আমার সঙ্গে চল। বিশেষতঃ রাজা জনকের বাড়ীতে একটি ধনু আছে—তোমাদিগকে সেই ধনু দেখাইবার জন্য আমার একান্ত ইচ্ছা।

সেই ধনু দেখিবার জন্য রাম-লক্ষ্মণ অতিশয় কৌতূহলী হইয়া উঠিলেন এবং বিশ্বামিত্র সেই হরধনুর ইতিহাস বলিয়া তাঁহাদের কৌতূহল আরও বাড়াইয়া দিলেন। পরে এক শুভ দিনে ঋষি বিশ্বামিত্র রাম ও লক্ষ্মণকে লইয়া রাজর্ষি জনকের রাজধানী মিথিলার দিকে যাত্রা করিলেন এবং শীঘ্রই তাঁহারা রাজা জনকের যজ্ঞ-সভায় যাইয়া পৌঁছিলেন।

রামচন্দ্র জনকের অপূর্ব্ব যজ্ঞ-সমারোহ দেখিয়া অতিশয় সুখী হইলেন এবং যজ্ঞ পূর্ণ হইলে সেই আশ্চর্য ধনু দেখিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বিশ্বামিত্র পুলকিত হইয়া জনককে বলিলেন, মহারাজ! আপনার গৃহে যে হরধনু আছে তাহাই দেখাইবার জন্য আমি অযোধ্যার রাজা দশরথের পুত্র রাম-লক্ষ্মণকে শিষ্যরূপে আপনার এখানে আনিয়াছি। তাঁহারা আপনার সেই ধনু দেখিবার জন্য ইচ্ছা করিতেছেন। রাজা জনক অত্যন্ত সুখী হইয়া তাঁহাদিগকে সেই ধনুকের নিকট লইয়া গেলেন এবং বলিলেন, যে মহাবীর এই ধনুকে ছিলা চড়াইতে পারিবেন, তাঁহার সহিত আমার প্রাণাধিকা কন্যা সীতার বিবাহ দিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র সেই ধনুর মাঝখানে ধরিয়া তাহাতে ছিলা চড়াইয়া দিলেন। ষোল বৎসরের বালকের এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইয়া গেল। জনক রাজার তখন যে আনন্দ হইয়াছিল, তাহা বলা যায় না। এই সময়ে রামচন্দ্র ধনুর ছিলায় টান দিতেই ধনু মড়্ মড়্ শব্দ করিয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই ভয়ানক শব্দে পৃথিবী

কাঁপিয়া উঠিল। রাম,লক্ষ্মণ, বিশ্বামিত্র ছাড়া বাকি আর সকলেই সেই ভয়ানক শব্দে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

ক্ষণ পরে সকলের মূর্চ্ছা ভঙ্গ হইলে জনক বলিলেন, হে মুনিবর! আমার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। আমি আমার প্রাণাধিকা কন্যা সীতাকে রামচন্দ্রের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা করি। আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন।

বিশ্বামিত্রের সম্মতি পাইয়া রাজা জনক এই শুভ সমাচার জানাইয়া অযোধ্যায় রাজা দশরথের নিকট দূত পাঠাইয়া দিলেন।

মিথিলার রাজদূতগণের মুখে শুভ সমাচার পাইয়া রাজা দশরথ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া অন্তঃপুরে এই সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন। শুনিবামাত্র কৌশল্যা প্রভৃতি রাণীগণ মনের আনন্দে শাঁথ বাজাইতে লাগিলেন।

রাজা দশরথ ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে লইয়া অপরূপ শোভাযাত্রার সহিত মিথিলার দিকে অগ্রসর হইলেন।

যথাসময়ে রাজা জনকের দুই কন্যা সীতা ও উর্ম্মিলার সহিত রাম ও লক্ষ্মণের এবং তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুশধ্বজের দুই কন্যা মাণ্ডবী ও শ্রুতকীর্ত্তির সহিত ভরত ও শত্রুঘ্নের মহাসমারোহে বিবাহ হইয়া গেল।

তৃতীয় দিনে রাজা দশরথ পুত্র ও বধূগণকে লইয়া অযোধ্যার দিকে রথ চালনা করিলেন। পথে মহাবীর পরশুরাম তাঁহাদের পথ অবরোধ করিয়া দাঁড়াইলেন। পরশুরাম বজ্রকণ্ঠে বলিলেন, রাম, তোমার আশ্চর্য্য বীরত্বের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছি। তুমি যদি অদ্বিতীয় শক্তিশালী হও, তবে আমার এই ধনুতে ছিলা চড়াইয়া দাও দেখি। এই বলিয়া পরশুরাম দম্ভভরে রামচন্দ্রের হাতে আপনার ধনু প্রদান করিলেন। তখন রামচন্দ্র ধনুতে ছিলা চড়াইয়া ও শর যোজনা করিয়া বলিলেন, আমি এই শর কোথায় নিক্ষেপ করিব, বলুন। পরশুরামের কথায় রামচন্দ্র তাঁহার তপোবলসঞ্চিত স্থানসকল নষ্ট করিলেন। পরশুরাম রামচন্দ্রের বহু প্রশংসা করিয়া তপস্যা করিবার জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন।

যথাসময়ে মহারাজ দশরথের শোভাযাত্রা অযোধ্যায় উপস্থিত হইল। রাজ্যে শতধারে আনন্দ-স্রোত বহিতে লাগিল। রাজমহিষীগণ পরম সমাদরে বধূগণকে বরণ করিয়া লইলেন।

কিছু দিন পরম সুখে অতিবাহিত হইলে ভরতের মাতুল যুধাজিৎ ভরতকে লইয়া যাইবার জন্য আসিলেন। দশরথের আদেশ পাইয়া ভরত ও শত্রুঘ্ন মাতুলালয়ে চলিয়া গেলেন।

—২—

রাজা দশরথ বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি মনে করিলেন এইবার রামচন্দ্রকে রাজা করিয়া বনে গিয়া ধর্ম্মকর্ম্মে জীবনের বাকি দিন কয়টা কাটাইয়া দিবেন। একদিন তিনি রাজসভায় তাঁহার মনের ইচ্ছা জানাইলেন। রাম রাজা হইবেন শুনিয়া সকলেই খুব খুসী হইল। রামকে রাজা করিবার দিন ঠিক হইয়া গেল। ক্রমে সেই শুভদিন আসিল।

মেজো রাণী কৈকেয়ীর দাসী মন্থরা এই খবর পাইয়া জলিয়া উঠিল। সে রাগে গব্ গব্ করিতে করিতে কৈকেয়ীর নিকট ছুটিয়া গেল এবং রাম যে রাজা হইতেছেন সে সংবাদ জানাইয়া দিল। রাণী কৈকেয়ী রামকে ভরতের মত ভালবাসিতেন, দাসীর মুখে রাম রাজা হইবেন শুনিয়া খুসী হইয়া আপনার গলার মুক্তার মালা তাহাকে পুরস্কার দিলেন। কুঁজী দাসী ইহাতে আরও রাগিয়া গিয়া কৈকেয়ীর-দেওয়া সেই মুক্তার মালা টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল, মেজোরাণী, জান না, তোমার কি সর্ব্বনাশ হইতেছে। রাম রাজা হইলে কৌশল্যা রাজার মা হইবেন। বুঝিয়া দেখ, তখন তোমার কি দুর্গতি হইবে! কৌশল্যা রাজার মা হইয়া তোমাকে গ্রাহ্য করিবে না। রাম রাজা হইয়া হয় ত ভরতকে মারিয়া ফেলিবে অথবা তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া ছাড়িবে।

কুঁজীর মুখ হইতে এই রকম নানা কথা শুনিয়া কৈকেয়ীর মনের ভাব বদ্‌লাইয়া গেল। কৈকেয়ী বলিলেন, তাই ত মন্থরা! এখন উপায় কি বল্ দেখি?

মন্থরা এক গাল হাসিয়া বলিল, উপায়ের ভাবনা কি? অসুরদের সহিত যুদ্ধে যখন রাজার গায়ে অস্ত্র লাগিয়া ঘা হইয়া গিয়াছিল, তখন তুমি রাজার কি সেবাই না করিয়াছিলে! নিজের জীবনের জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া, সেই ঘা-মুখ চুষিয়া বিষ বাহির করিয়া দিয়াছিলে; তখন রাজা সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে দুইটি বর দিতে চাহিয়াছিলেন। আজ তুমি সেই বর দুইটি চাহিয়া লও।

কৈকেয়ী বলিলেন, কি কি বর চাহিব?

মন্থরা কহিল, তুমি এক বরে ভরত রাজা হউক চাহিয়া লও। আর দ্বিতীয় বরে রামকে চৌদ্দ বছরের জন্য বনে পাঠাইয়া দাও। কুটিলা দাসীর কুমন্ত্রণায়

রাণী কৈকেয়ী গায়ের গহনা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিয়া ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরিয়া, চুলগুলি আলু থালু করিয়া ঘরের মেঝেতে পড়িয়া রহিলেন।

রাজা দশরথ কৈকেয়ীকে এই সুখবর দিবার জন্য কৈকেয়ীর ঘরে আসিয়া দেখিলেন, কৈকেয়ী মলিন বেশে মেঝের উপর শুইয়া আছেন—তাঁহার চোখ দিয়া জল ঝরিতেছে! প্রাণাধিকা কৈকেয়ীর অবস্থা দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা বলিলেন, রাণী! "আজ আমাদের পরম শুভদিন। তোমাকে সেই সুসংবাদ দিবার জন্য আমি নিজে তোমার ঘরে আসিয়াছি। কিন্তু এ কি! তোমার এইরূপ অবস্থা কেন? তোমার কি হইয়াছে, বল? তুমি যাহা চাহিবে· আজ আমি তোমাকে তাহাই দিব।

কৈকেয়ী অভিমানভরে বলিলেন, শুনিতেছি, রাম রাজা হইতেছেন। তাহা কোনো রকমেই হইবে না। রামের বদলে আমার ভরত রাজাহইবেন—আর রাম চৌদ্দ বছরের জন্য বনে যাইবেন। আমি এই চাই।



দশরথ ও কৌশল্যার রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন —কৈকেয়ীর ক্রোধ—রাম নির্বাসন

বৃদ্ধ রাজা দশরথের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল! তিনি মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া এই অন্যায় আব্দার ত্যাগ করিবার জন্য কৈকেয়ীকে কত সাধ্য-সাধনা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই কৈকেয়ী জেদ ছাড়িলেন না। দশরথ আবার মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ক্রমে রামচন্দ্র এই কথা শুনিলেন। তিনি কৈকেয়ীর নিকটে আসিতেই কৈকেয়ী রূঢ় স্বরে তাঁহার মনের কথা জানাইলেন। এই নিদারুণ কথা শুনিয়াও রামের মুখের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। রামচন্দ্র বলিলেন মা! ভরত রাজা হইবে এ ত অতি সুখের কথা। পিতার সত্যমুক্তির জন্য আমি ভরতকে রাজ্য দান করিলাম এবং আমি এখনই চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনে গমন করিব। এই বলিয়া রামচন্দ্র কৈকেয়ীর পদধূলি লইয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া কৌশল্যা-মার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন।

কৌশল্যা পুত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া পূজা করিতেছিলেন। সহসা রামচন্দ্রের মুখ হইতে সমস্ত কথা শুনিয়া তিনি প্রাণে যে কি আঘাত পাইলেন, তাহা বলা যায় না। রামচন্দ্র মাকে বুঝাইয়া সীতার কাছে আসিলেন ও তাঁহাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন। দারুণ দুঃখে সীতার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। পরিশেষে তিনি বলিলেন, যদি তুমি বনে যাও, আমিও তোমার সঙ্গে যাইব। এই সময়ে লক্ষ্মণও তথায় আসিয়া পৌঁছিলেন। সব কথা শুনিয়া তিনি ও প্রথমে চটিয়াই আগুন। পরিশেষে লক্ষ্মণও রামের সহিত বনে যাইবেন, স্থির হইল।

সুমন্ত্র রথ সাজাইয়া আনিল। রাম-লক্ষ্মণ বল্কল (গাছের ছাল) পরিয়া রথে চড়িলেন। কৌশল্যার অনুরোধে সীতাদেবী মাত্র বল্কল পরিলেন না। তিনি যে-বেশে ছিলেন, সেই বেশেই রথে চড়িলেন। অযোধ্যার লোক সকল হাহাকার করিতে করিতে রথের পেছনে পেছনে ছুটিল।

সন্ধ্যাকালে রামচন্দ্রের রথ তমসার তীরে পৌঁছিল। অযোধ্যার অধিবাসীরা ঘুমাইয়া পড়িলে রামচন্দ্র তমসা নদী পার হইলেন। ক্রমে তাঁহারা দেবশ্রুতি ও গোমতী নদী পার হইয়া পরদিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গার তীরে

শৃঙ্গবের নগরে উপস্থিত হইলেন। এইখানে গুহক চণ্ডাল বাস করিত। রামচন্দ্র সেই রাত্রি গুহকের বাড়ীতে কাটাইলেন। সকাল হইলে গুহক নৌকা আনিয়া রাম-লক্ষ্মণ সীতাকে গঙ্গা পার করিয়া দিল।

এদিকে রাম-লক্ষ্মণ-সীতা অযোধ্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন শুনিয়া বৃদ্ধ রাজা দশরথ দারুণ শোকে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এ মূর্চ্ছা আর তাঁহার ভাঙ্গে নাই। চারদিন পরে রাজার প্রাণ বিয়োগ হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এই সময়ে ভরত মাতুলালয়ে ছিলেন। সুতরাং রাজার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া কে করিবে? বশিষ্ঠের পরামর্শে রাজার মৃতদেহ তৈল-দ্রোণীর (তেলের গামলার) মধ্যে রাখা হইল এবং ভরতকে মাতুলালয় হইতে আনিবার জন্য লোক পাঠান হইল।



ভরতাভিষেক-উৎসব নৃত্য-গীত

সংবাদ পাইয়া ভরত আসিলেন। সকল অনর্থের গোড়া এই কুব্জী জানিয়া ভরত কুঁজীর উপযুক্ত শাস্তি-বিধান করিয়া গভীর মনোবেদনায় মাকেও অনেক তিরস্কার করিলেন।

বশিষ্ঠদেবের কথামত ভরত পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। রাজ-সিংহাসন শূন্য থাকা উচিত নহে, মনে করিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠদেব ভরতকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার আয়োজন করিলেন। এই উপলক্ষে চারিদিকে নানাপ্রকার উৎসব ও নৃত্য-গীত আরম্ভ হইল। কিন্তু ভরত সিংহাসনে আরোহণ না করিয়া রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য চলিলেন।

গঙ্গা পার হইয়া ভরত মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে প্রবেশ করিয়া জানিতে পারিলেন, রামচন্দ্র এখন চিত্রকূট পর্ব্বতে বাস করিতেছেন। চিত্রকূট পর্ব্বতে চারিভ্রাতার মিলন হইল। রামচন্দ্র ভরতের মুখ হইতে পিতার মৃত্যুসংবাদ পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন এবং মন্দাকিনীর তীরে গিয়া পিতার উদ্দেশ্যে তর্পণ করিলেন।

এই সময় ভরত রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য কত অনুনয় করিলেন। রাম বলিলেন, ভরত, তুমি জ্ঞানী, তুমি আমাকে অন্যায় অনুরোধ করিও না। বোধ হয় তুমি শুনিয়াছ যে, যে সময় আমার স্বর্গীয় পিতা তোমার মাতার পাণিগ্রহণ করেন তখন তিনি কেকয় রাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে, আমি তাহাকেই সাম্রাজ্য দান করিব। ঘটনাক্রমে তাহাই হইয়াছে। অতএব ভাই, তুমি আমাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিও না। আমি অযোধ্যায় গেলে পিতার সত্য ভঙ্গ হইবে, আমিও সত্য ভঙ্গের জন্য নরকগামী হইব; তাই বলি, তুমি অযোধ্যায় ফিরিয়া যাও। চৌদ্দ বৎসরের পর আমি নিশ্চয় অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিব।

জাবালি মুনিও রামচন্দ্রকে কত বুঝাইলেন। বশিষ্ঠদেব, মাতা কৌশল্যা রামচন্দ্রকে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিতে কত অনুরোধ করিলেন কিন্তু পিতৃসত্য রক্ষার নিকটে সমস্ত উপরোধই ব্যর্থ হইয়া গেল।

ভরত কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, যদি একান্তই অযোধ্যায় ফিরিবে না, তবে—

পাদুকা যুগল খুলি দাও মোরে মহাবলী
এ পাদুকা হবে মোর ইষ্টদেব সম।

রামচন্দ্র ভরতকে পাদুকাযুগল (খড়ম জোড়া) দিলেন। ভরত সেই খড়ম মাথায় করিয়া লইয়া সজল নেত্রে বলিলেন, দাদা, আমি অযোধ্যার বাহিরে নন্দী-

গ্রামে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজসিংহাসনে তোমার এই পাদুকা রাখিয়া, চৌদ্দ বৎসর রাজকার্য্য চালাইব। পঞ্চদশ বৎসরের প্রথম দিনে যদি তোমার দর্শন না পাই তাহা হইলে আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিব। কাঁদিতে কাঁদিতে ভরত বিদায় গ্রহণ করিলেন। রামচন্দ্রও চিত্রকূট পর্ব্বত ত্যাগ করিয়া দণ্ডকারণ্যের দিকে চলিলেন।



রাম সীতা লক্ষ্মণ দণ্ডকবনে প্রবেশ করিয়া একে একে পম্পা, পঞ্চাপ্সর প্রভৃতি নানা সরোবর দেখিয়া ক্রমে অগস্ত্য মুনির আশ্রমে পৌঁছিলেন। অগস্ত্য মুনি রামচন্দ্রকে অনেক ভাল ভাল অস্ত্র দান করিলেন। অগস্ত্যের কথায় তাঁহারা পঞ্চবটী বনে বাস করিতে লাগিলেন। এই সময়ে একদিন লঙ্কার রাজা রাবণের ভগিনী শূর্পণখা সেখানে আসিয়া পৌঁছিল এবং রাম-লক্ষ্মণের ভুবনমোহন রূপ দেখিয়া তাঁহাদিগকে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিল। তাঁহারা সম্মত হইলেন না, এজন্য শূর্পণখা প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া সীতাকে খাইতে গেল। লক্ষ্মণ শূর্পণখার নাক কাণ কাটিয়া দিলেন। শূর্পণখার দুরবস্থা দেখিয়া তাহার ভাই খর দূষণ বহু রাক্ষস জড় করিয়া রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিল। যুদ্ধে তাহারা সকলেই মরিয়া গেল। এই সময়ে অকম্পন নামে একটা রাক্ষসের সহিত শূর্পণখা লঙ্কায় পৌঁছিয়া অনেক কথা বলিয়া রাবণকে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। ভগিনীর অপমানে রাবণ রাগিয়া গেল এবং পরামর্শ করিয়া মারীচকে সেই বনে পাঠাইয়া দিল। মারীচ এক সোনার হরিণের রূপ ধরিয়া রাম, লক্ষ্মণ, সীতা যেখানে বাস করিতেন, সেইখানে বেড়াইতে লাগিল। সোনার হরিণ দেখিয়া সীতা সেই হরিণটিকে চাহিলেন। রাম সীতার রক্ষার ভার লক্ষ্মণের উপর দিয়া ধনুর্ব্বাণ লইয়া হরিণের পেছনে পেছনে যাইতে লাগিলেন। কিন্তু কিছুতেই হরিণকে ধরিতে না পারিয়া এক তীর ছুঁড়িলেন। তীর লাগিতেই মারীচ মরিয়া গেল। মরিবার সময় শব্দ করিল—লক্ষ্মণ। রাক্ষসের হাতে আমার প্রাণ যায়, আমাকে বাঁচাও। এই শব্দ শুনিয়া লক্ষ্মণ সীতাকে একলা রাখিয়া চলিয়া গেলেন। এই সময়ে রাবণ পরিব্রাজকের বেশে সেই স্থানে পৌঁছিয়া সীতার নিকট ভিক্ষা চাহিল। সীতাদেবী ভিক্ষা দিতে বাহির হইবামাত্র রাবণ তাঁহাকে জোর করিয়া রথে তুলিয়া লইয়া লঙ্কায় চলিয়া গেল।



রাম-লক্ষ্মণ ঘরে ফিরিয়া দেখিলেন, সীতা ঘরে নাই —ঘর শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাঁহারা সীতাদেবীর অনেক খোঁজ করিলেন, কিন্তু কোথাও তাঁহার দেখা পাইলেন না। অনেক দূর গিয়া দেখিতে পাইলেন, এক বৃদ্ধ পক্ষী পড়িয়া রহিয়াছে। তার ডানা কাটিয়া গিয়াছে—মৃত্যুর যন্ত্রণায় মুখ হাঁ করিতেছে। রাম-লক্ষ্মণ তাহার কাছে আসিতেই অতি ক্ষীণস্বরে সে বলিল, রাবণ সীতাকে চুরি করিয়া লঙ্কায় চলিয়া গিয়াছে। এই কথা বলিয়াই সেই জটায়ু পক্ষী মরিয়া গেল।

রাম-লক্ষ্মণ এই সময়ে দৈবক্রমে জানিতে পারিলেন যে, ঋষ্যমূক পর্ব্বতে সুগ্রীব নামে এক বানর রাজা আছেন; তিনি সীতার সংবাদ বলিতে পারেন। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহারা ঋষ্যমূক পর্ব্বতের পথ ধরিয়া পশ্চিম মুখে যাইতে যাইতে শবরীর আশ্রমে আসিয়া পৌঁছিলেন। শবরী রামচন্দ্রের দর্শন প্রতীক্ষায় বহুকাল ধরিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সে রাম, লক্ষ্মণকে দেখিয়া আপনার জীবন সার্থক মনে করিল ও তাঁহাদিগকে বনের ফল খাইতে দিল। এই সময়ে শবরী তাহার মনের বাসনা পূর্ণ হইয়াছে ভাবিয়া সন্তুষ্ট-চিত্তে প্রাণ পরিত্যাগ করিল।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সহিত সেই স্থান হইতে অগ্রসর হইয়া পম্পা নদীর তীরে আসিয়া পৌঁছিলেন।

৪

রাম-লক্ষ্মণ পম্পার তীরে বসিয়া সীতার জন্য বিলাপ করিতে লাগিলেন। পম্পার মনোহর দৃশ্যে ও তথাকার শীতল বাতাসে তাঁহাদের মনের দুঃখ অনেকটা শান্ত হইল। তার পর তাঁহারা সেই নদী পার হইয়া ঋষ্যমূক পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। এইখানে বানরদের রাজা সুগ্রীব বাস করিতেন। বালী সুগ্রীব দুই ভাই। বালী সুগ্রীবের উপর নানারূপ অত্যাচার করিয়াছে, তাই সুগ্রীব এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিতেছিলেন।

রাম-লক্ষ্মণকে এই ঋষ্যমূক পর্ব্বতে আসিতে দেখিয়া সুগ্রীবের খুব ভয় হইল। সুগ্রীব তাঁহাদের খবর লইবার জন্য হনূমানকে পাঠাইয়া দিলেন।

রামের আদেশে লক্ষ্মণ তাঁহাদের পরিচয় দিলেন। লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাদেবীকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে—সেই পাপীকে শাস্তি দিবার জন্য আমরা বানররাজ সুগ্রীবের সহিত বন্ধুত্ব করিতে আসিয়াছি, ইহাও জানাইলেন।

হনূমান সন্তুষ্ট হইয়া রাম-লক্ষ্মণকে সুগ্রীবের নিকট

লইয়া গেল। রাম-লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব পরস্পরের পরিচয়ের পর অগ্নি সাক্ষী করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপন করিলেন।

সব কথা শুনিয়া সুগ্রীব বলিলেন, বুঝিয়াছি বন্ধু—আর বলিতে হইবে না। সেদিন এক রাক্ষস একটি রমণীকে রথে তুলিয়া আকাশের উপর দিয়া যাইতেছিল। সেই রমণী যেরূপ বিলাপ করিতেছিলেন, তাহা শুনিলে পাষাণও ফাটিয়া যায়। তিনি তাঁর গায়ের গহনা ও চাদর এইখানে খুলিয়া ফেলিয়া দিয়াছিলেন। আমি সেগুলি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। এই বলিয়া সেই চাদর ও অলঙ্কার আনিয়া সুগ্রীব রামচন্দ্রকে দেখাইলেন। সীতার চাদর ও অলঙ্কার দেখিয়া রামের শোক বাড়িয়া উঠিল। এই সময়ে সুগ্রীব বলিলেন, স্থির হও, বন্ধু। আমি সীতার উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিব। রামচন্দ্রও বালীকে মারিবা সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজা করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন।

এই সময়ে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়া খুব অত্যাচার করিতে লাগিলেন। কাজেই, বালীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ বাধিয়া গেল। এই সময়ে রাম গাছের আড়াল হইতে বাণ মারিয়া বালীকে বধ করিলেন। বালীর স্ত্রী তারা ও পুত্র অঙ্গদ বালীর মৃত্যুতে অনেক বিলাপ করিতে লাগিলেন। রামচন্দ্র অঙ্গদকে যুবরাজ করিবেন স্বীকার করিয়া তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা দিলেন

সুগ্রীব যেখানে যত বানর ছিল সকলকে ডাকিয়া পাঠাইলেন এবং সীতার খোঁজ করিয়া এক মাসের মধ্যে সকলকে ফিরিয়া আসিতে বলিলেন। পূর্ব্ব-পশ্চিমে উত্তর-দক্ষিণে বানরদল চলিয়া গেল। একে একে তিন দিকের বানরেরা ফিরিয়া আসিল।

দক্ষিণদিকে যে-সকল বানর গিয়াছিল তাহারা চারিদিকে বেড়াইতে বেড়াইতে একটা গর্ত্ত দেখিতে পাইয়া তাহার ভিতর ঢুকিয়া পড়িল ও অন্ধকারের মধ্য দিয়া বহুদূর চলিয়া গিয়া এক বুড়ীর দেখা পাইল। বুড়ী তাহাদিগকে ঠাণ্ডা জল ও নানারকম খাবার খাইতে দিল। বানরেরা তাহা খাইয়া কেন তাহারা সেখানে আসিয়াছে জানাইল। বুড়ীর নাম স্বয়ম্প্রভা বুড়ী তাহাদিগকে মায়াপ্রভাবে গর্ত্তের বাহিরে বিন্ধ্য-পর্ব্বতের কাছে পৌঁছাইয়া দিল।

এইখানে জটায়ুর বড় ভাই সম্পাতি থাকিত। বানরদের মুখে সব কথা শুনিয়া সে বলিল, দূরে ঐ যে সমুদ্র দেখিতেছ এই সমুদ্রের অপর পারে লঙ্কা। ঐ লঙ্কার রাজা রাবণ সীতাকে রথে তুলিয়া লইয়া গিয়াছে। এই সমুদ্র ৪০০ ক্রোশ বিস্তৃত।

এত চওড়া সমুদ্র কিরূপে পার হওয়া যায়। সকলে এই চিন্তা করিতে লাগিল। শেষে হনুমান লাফ দিয়া সমুদ্র পার হইবে বলিল। হনুমান্ লাফ দিবার জন্য মহেন্দ্র পর্ব্বতে উঠিল।

৫

হনুমান "জয় রাম" বলিয়া পর্ব্বতের উপর হইতে লাফ দিল। উপর দিয়া হনুমান্‌কে যাইতে দেখিয়া নাগমাতা সুরসা আকাশ-জোড়া হাঁ করিয়া তাহার সামনে দাঁড়াইল। সে হনুমান্‌কে গ্রাস করিবার জন্য কুড়ি যোজন মুখ হাঁ করিল। হনুমান্ চল্লিশ যোজন বড় হইল। যেমন যেমন হনুমান্ দেহ বাড়াইতে লাগিল সুরসাও মুখের হাঁ তাহা অপেক্ষা বড় করিতে লাগিল। সুরসা আশি যোজন হাঁ করিয়াছে দেখিয়া সহসা হনুমান্ অঙ্গুষ্ঠ প্রমাণ (বুড়ো আঙ্গুলের মত) রূপ ধরিয়া তাহার মুখের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া গেল। ব্যর্থ হইয়া সুরসা চলিয়া গেল। এইবার সিংহিকা রাক্ষসী আসিয়া হনুমানের সামনে হাঁ করিয়া দাঁড়াইল। হনুমান্ রাক্ষসীর পেটের ভিতর ঢুকিয়া নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়িয়া বাহির হইল। সিংহিকা মরিয়া সমুদ্রে পড়িয়া গেল।

সন্ধ্যার একটু আগেই হনুমান্ লঙ্কার উত্তরধারে উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। হনুমান্ ছোট একটি বানরের রূপ ধরিয়া লঙ্কার নানা জায়গায় সীতার খোঁজ করিতে লাগিল। কিন্তু কোথাও তাঁহার সন্ধান মিলিল না। তার পর হনুমান্ একটি বনে আসিয়া দেখিল, একটি নারী বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিয়াছেন আর কতকগুলা রাক্ষসী তাঁহাকে ঘিরিয়া বসিয়া আছে। হনুমান বুঝিতে পারিল, ইনিই সীতাদেবী। হনুমান্ অশোক গাছের একটি ডালে বসিয়া রহিল এবং সময় বুঝিয়া রাম নাম করিল। রামের নাম শুনিয়াই সীতা গাছের দিকে চাহিলেন। হনুমান সীতাদেবীকে রামের দেওয়া আংটি দেখাইল। আংটি দেখিয়া সীতার চোখে জল ঝরিতে লাগিল। হনুমান্ সীতাদেবীকে রামের কথা বলিল এবং সে যে তাঁহার দর্শন পাইয়াছে তাহা রামকে জানাইবার জন্য তাঁহার মাথার মণিটি চাহিয়া লইয়া সেই স্থান হইতে চলিয়া গেল।

হঠাৎ হনুমানের মাথায় একটু দুষ্ট বুদ্ধি চাপিয়া বসিল। সে রাবণের অমৃত বনে ঢুকিয়া ডাল পাতা ভাঙ্গিয়া তছনছ করিতে লাগিল। খবর পাইয়া রাবণ হনুমান্‌কে ধরিয়া আনিবার জন্য অনেক লোকজন



সীতা ও সরমা

পাঠাইয়া দিল। হনুমান্ ক্রমে ক্রমে মন্ত্রীর ছেলেগুলিকে ও রাবণের পাঁচটি বড় বড় সেনাপতিকে কামড়াইয়া চড় মারিয়া মারিয়া ফেলিল। এইবার আসিল রাজপুত্র অক্ষ। হনুমান্ তারও সেইরূপ দুর্দশা করিল। এই সময়ে ইন্দ্রজিৎ আসিয়া হনুমান্‌কে ব্রাহ্মাস্ত্র মারিয়া কাবু করিয়া ফেলিল ও তার পর দড়ি দড়া দিয়া বাঁধিয়া রাবণের নিকট লইয়া চলিল।

রাবণকে দেখিয়া হনুমান্ বলিল, তুমি ত খুব বড় রাজা দেখিতেছি, কিন্তু তোমার এমন নীচবুদ্ধি কেন? আমার পরিচয় জানিতে চাও? আমি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের দূত—রামচন্দ্রের নফর।

রামচন্দ্রের নাম শুনিয়াই রাবণ চম্‌কিয়া উঠিল। সে ভাবিল, ৪০০ ক্রোশ চওড়া সমুদ্র পার হইয়া এই বানরটা কেমন করিয়া এখানে আসিল। তবে ত ইহার ক্ষমতা খুবই বেশী। তার পর, রামচন্দ্রই বা কত শক্তিশালী! রাবণের মনের কোণে একটু চিন্তা আসিয়া উঁকি মারিল। তবুও রাবণ সেই ভাব গোপন করিয়া রাক্ষসদিগকে হুকুম দিল, এই বানরটাকে মারিয়া ফেল। রাবণের ছোট ভাই বিভীষণ বলিলেন, তা হয় না রাজা! শাস্ত্রে বলে, দূতকে বধ করিতে নাই। তখন রাবণের হুকুমে রাক্ষসেরা হনুমানের লেজে কতকগুলা ন্যাকড়া বাঁধিয়া তেল দিয়া ভিজাইয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া ছাড়িয়া দিল। হনুমান্ 'হুপ' করিয়া লাফ দিয়া একটা বাড়ীর চালের উপর উঠিয়া বসিল। লেজের আগুনে সেই ঘরের চাল জ্বলিতে লাগিল। এইরূপে এক ঘর হইতে অন্য ঘরে লাফাইয়া লাফাইয়া হনুমান্ সারা লঙ্কায় আগুন ধরাইয়া দিল।

এই সময়ে হনুমান্ সেই জ্বলন্ত লেজ লইয়া সীতাকে প্রণাম করিল। সেই জ্বলন্ত লেজের দিকে সীতার দৃষ্টি পড়িবা মাত্র আগুন নিবিয়া গেল। এইবার হনুমান্ সীতার নিকট হইতে বিদায় লইয়া লঙ্কার একটা পাহাড়ে উঠিল ও আবার তেমনি একটা লাফ দিয়া সঙ্গী বানরদের কাছে আসিয়া তাহাদিগকে সীতার কথা বলিল। বানরদের আনন্দ তখন দেখে কে! তাহারা সুগ্রীবের মধুবনে ঢুকিয়া নানা আমোদ করিতে লাগিল। সীতার সংবাদ সকলেই পাইলেন। রাম বলিলেন, হনুমান্, লঙ্কাপুরে আমার সীতাকে তুমি কেমন দেখিলে? হনুমান্ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—কি আর দেখিব প্রভু!

সর্ব্বাঙ্গ তাঁহার রাম, ধূলায় ধূসর,
পরিধান একমাত্র মলিন অম্বর।
হিমাগমে কমলিনী মলিন যেমন,
লঙ্কাপুরে বিষাদিনী সীতাও তেমন।

এই বলিয়া রামচন্দ্রকে সীতার দেওয়া সেই মাথার মণিটি দিলেন। রামচন্দ্র সেই মণি তাঁহার বুকে ছোঁওয়াইলেন। তাঁহার চোখ দিয়া দর দর করিয়া জল ঝরিতে লাগিল।

৬

রামচন্দ্র লক্ষ লক্ষ বানর-সেনা লইয়া সমুদ্রের ধারে পৌঁছিলেন। সৈন্যদলের মধ্যে 'নল' নামে এক বড় কারীকর ছিল। সে গাছ-পাথর দিয়া ছয় দিনে একটা সেতু তৈয়ারী করিয়া দিল।

রামচন্দ্র সসৈন্যে লঙ্কায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন জানিয়া রাক্ষসেরা ভয় পাইয়া গেল। বিভীষণ রাবণকে কত বুঝাইলেন এবং রামের সীতা রামকে ফিরাইয়া দিতে বলিলেন। রাবণ রাগিয়া গিয়া বিভীষণকে লাথি মারিয়া তাড়াইয়া দিল। বিভীষণ আসিয়া রামের নিকট আশ্রয় লইলেন।

ভয়ানক যুদ্ধ বাধিয়া গেল। যুদ্ধে অনেক রাক্ষস ও রাবণের হাজার হাজার ছেলে মরিয়া গেল। তবু রাবণের জ্ঞান হইল না; সে নানারকম কৌশল করিয়া সীতাকে বশে আনিবার উপায় খুঁজিতে লাগিল। বিদ্যুজ্জিহ্ব নামে এক মায়াবী রাক্ষস রাবণের আদেশে রামের মাথার মত একটা মাথা ও ধনুক গড়িয়া আনিল। রাবণ সীতাকে সেই মাথা ও ধনুক দেখাইয়া বলিল, এই দেখ সীতা, রামের মাথা ও ধনুক। সীতাদেবী রামের মাথা ও ধনুক দেখিয়া কাঁদিয়া আকুল হইলেন। সীতার কান্না দেখিয়া রাবণ হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল। রাবণ চলিয়া যাইবার পরেই বিভীষণের স্ত্রী সরমা তথায় আসিয়া পৌঁছিয়া বলিল, সীতা, স্থির হও, রামের কোনো অমঙ্গল হয় নাই। আমি এখনই আসিবার সময় দেখিলাম, রাম-লক্ষ্মণ সৈন্য-সামন্ত লইয়া সুবেল পর্ব্বতের দিকে যাইতেছেন। সরমার এই কথা শুনিয়া সীতা অনেকটা আশ্বাস পাইলেন। লঙ্কাপুরীতে সরমাই সীতার একমাত্র ধ্রুবতারার মত ছিল। দুই সখীতে নানা কথা হইল।

রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীব সুবেল পর্ব্বত হইতে দেখিতে পাইলেন, রাবণ অশোক বন হইতে ফিরিয়া আসিতেছে সুগ্রীবও সুযোগ পাইয়া পথের মধ্যে রাবণকে আক্রমণ করিল। দুইজনে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। সুগ্রীব রাবণের

মাথা হইতে মুকুট কাড়িয়া লইল। এই সময়ে অঙ্গদ আসিয়া রাবণকে বেশ দু-কথা শুনাইয়া দিল।

সুগ্রীব ও অঙ্গদের নিকট হইতে যার-পর-নাই অপমানিত হইয়া রাবণ বড় বড় সেনাপতিদিগকে ডাকিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিতে বলিল। চারিদিকে হাঁক-ডাক পড়িয়া গেল।

ঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধে রাবণের অনেক ছেলে ও সেনাপতি মরিয়া গেল। ইহার পর রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে আসিয়া নাগপাশ অস্ত্রদ্বারা রাম-লক্ষ্মণকে বাঁধিয়া ফেলিতেই রাম-লক্ষ্মণ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

রাম-লক্ষ্মণ নাগপাশে বাঁধা পড়িয়াছেন দেখিয়া বানরেরা হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। বিভীষণ সবই জানিতেন। মূর্চ্ছা কাটিতেই রাম-লক্ষ্মণ গরুড়ের স্তব করিতে লাগিলেন। গরুড় আসিয়া দাঁড়াইতেই সাপের বাঁধন সব খুলিয়া গেল।

ইহার পর ধূম্রাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, অকম্পন, প্রহস্ত, নরান্তক সমুন্নত, মহানাদ, কুম্ভহনু প্রভৃতি রাবণের সেনাপতিরা একে একে যুদ্ধ করিতে আসিয়া মরিয়া গেল। এবার রাবণ নিজেই যুদ্ধ করিতে বাহির হইল এবং লক্ষ্মণের প্রতি ব্রহ্মদত্ত শক্তি ছুঁড়িল। এই শক্তি লক্ষ্মণের বুকে বাজিল। লক্ষ্মণ অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। হনুমান্ লক্ষ্মণকে মূর্চ্ছিত হইতে দেখিয়া তাঁহাকে তুলিয়া রামচন্দ্রের নিকটে লইয়া আসিল। রামচন্দ্র লক্ষ্মণের দেহে বিদ্ধ সেই শক্তির দিকে চাহিবামাত্র সেই শক্তি লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিয়া আপনার স্থানে চলিয়া গেল।

ইহার পর আসিল রাবণের ছোট ভাই —কুম্ভকর্ণ। বড় বড় কলসীর মত তার দুটো কাণ ছিল। এই কুম্ভকর্ণ বড় ভারী বীর ছিল। সে ছ'মাস ঘুমাইয়া এক দিন জাগিত। ঐদিন যুদ্ধ করিতে গেলে তাহার জয় হইবেই। কিন্তু কুম্ভকর্ণের ঘুমের ছ'মাস পূর্ণ হইতে যে এখনো অনেক দেরী। এদিকে যে মস্ত অপমান। রাবণ স্থির হইতে না পারিয়া নানা কৌশল করিয়া কুম্ভকর্ণের জাগাইয়া যুদ্ধে পাঠাইয়া দিল। অসময়ে ঘুম হইতে উঠিয়া কুম্ভকর্ণ ভাল করিয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না —সে রামের হাতে মরিয়া গেল।

ইহার পর আসিল অতিকায়। সেও যুদ্ধ করিয়া রামের হাতে নিহত হইল। ইন্দ্রজিৎ খবর পাইয়া যুদ্ধে আসিল ও রাম-লক্ষ্মণের প্রতি ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিতেই রাম-লক্ষ্মণ অচেতন হইয়া পড়িলেন।

বৃদ্ধ জাম্ববানের পরামর্শে হনুমান্ হিমালয় পার হইয়া বিশল্যকরণী, মৃত্যুসঞ্জীবনী, সুবর্ণকরণী ও সন্ধানী নামক চারিটি ওষধি আনিবার জন্য চলিয়া গেল। কিন্তু ঐ ওষধি ঠিক চিনিতে না পারিয়া সেই পর্ব্বত তুলিয়া আনিল। ওষধির আঘ্রাণ পাইয়া রাম-লক্ষ্মণ চৈতন্য লাভ করিলেন।

ইহার পর যে কত যুদ্ধ হইল, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। কুম্ভ, নিকুম্ভ, সুপার্শ্ব, প্রজঙ্ঘ, শোণিতাক্ষ প্রভৃতি রাক্ষস এই যুদ্ধে মরিয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ এই খবর পাইয়া এক মায়াসীতা নির্ম্মাণ করিয়া রাম-লক্ষ্মণের সম্মুখে আনিয়া কাটিয়া ফেলিলে রাম-লক্ষ্মণ প্রভৃতি কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। বিভীষণ রামচন্দ্রকে সকল কথা বলিলেন। এবার ইন্দ্রজিৎ রাম-লক্ষ্মণকে বধ করিবার জন্য নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করিল। নিকুম্ভিলা যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইলে ইন্দ্রজিৎকে বধ করা কঠিন হইবে, এইজন্য বিভীষণের পরামর্শে লক্ষ্মণ সেই যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে বধ করিলেন।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে বধ করিয়াছে জানিয়া রাবণ লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল ছুড়িল। শক্তিশেল লক্ষ্মণের বুকে বাজিল। হনুমান্ আবার ঔষধ পর্ব্বত লইয়া আসিল। ঔষধের আঘ্রাণে লক্ষ্মণ চেতনা লাভ করিলেন। এই সময়ে মহর্ষি অগস্ত্য আসিয়া রামচন্দ্রকে আদিত্যহৃদয় নামক মন্ত্র দান করিলেন। এই বার রামচন্দ্র ইন্দ্রের প্রেরিত রথে আরোহণ করিয়া রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন ও ব্রহ্মাস্ত্র মারিয়া রাবণকে বধ করিলেন।

হনুমান্ অশোক বনে যাইয়া সীতাকে রাবণের মৃত্যু সংবাদ জানাইল। এই কথা শুনিয়া সীতা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া হনুমানের খুব সুখ্যাতি করিলেন। সীতাদেবী শীঘ্রই রামচন্দ্রের নিকট আসিলেন। সীতাকে দেখিয়া রাম বলিলেন, সীতা, আমি বহু কষ্টে তোমার উদ্ধার করিয়াছি। এইরূপে আমি বংশের মান রক্ষা করিলাম। কিন্তু তুমি কিরূপে রাক্ষসের গৃহে ছিলে, তাহা ত জানি না, এজন্য তুমি যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাইতে পার। রামের মুখে এমন নিদারুণ কথা শুনিয়া সীতাদেবীর যেন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সীতাদেবী বলিলেন, লক্ষ্মণ, আমি আর এ দুঃখ সহ্য করিতে পারিতেছি না—তুমি চিতা জালিয়া দাও; আমি তাহাতে পুড়িয়া মরিব।

সীতার দুঃখে লক্ষ্মণ অতিশয় কাতর হইয়া চিতা সাজাইয়া দিলেন। সীতাদেবী বলিলেন :—

মনসি বচসি কায়ে জাগরে স্বপ্নসঙ্গে
যদি মম পতিভাবো রাঘবাদন্য পুংসি।
তদিহ দহ মমাঙ্গং পাবনং পাবকেদং
সুকৃতদুরিতভাজাং ত্বং হি কর্ম্মৈকসাক্ষী॥

এই বলিয়া অগ্নির ভিতরে প্রবেশ করিলেন।

রামচন্দ্র হায় হায় করিয়া উঠিলেন। এই সময়ে অগ্নিকুণ্ড হইতে অগ্নিদেব সীতাকে কোলে করিয়া উঠিলেন ও সীতাদেবীর পাতিব্রত্যের কথা জানাইলেন। রাম সীতাদেবীকে অতি সমাদরে গ্রহণ করিলেন।

রামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। শুভদিনে বশিষ্ঠদেব তাঁহাকে রাজা করিলেন।

৭

এবার আমরা রামায়ণের যে অংশ লিখিব, তাহাতে অনেকগুলি সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। তোমরা বড় হইয়া সেগুলি পড়িবে। আমরা এখানে শুধু রাম চরিত্রের সঙ্গে যেটুকুর সম্বন্ধ আছে, তাহাই আলোচনা করিব।

রাম অযোধ্যার রাজা হইয়াছেন। অযোধ্যার অধিবাসীদের আনন্দের সীমা নাই। কিন্তু হঠাৎ এই সুখের রাজ্যে শোকের ছায়া পড়িল।

একদিন রামচন্দ্র হঠাৎ শুনিতে পাইলেন, তিনি সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিয়াছেন, এজন্য প্রজাদের মধ্যে কেহ কেহ নাকি তাঁহাকে দোষ দিতেছে। এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র সীতাকে বাল্মীকির তপোবনে ত্যাগ করিয়া আসিতে লক্ষ্মণকে আদেশ দিলেন।

লক্ষ্মণ পূর্ণ-গর্ভা সীতাদেবীকে বাল্মীকির আশ্রমে রাখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন। বাল্মীকি মুনি সমস্তই জানিতেন। তিনি সীতাদেবীর কান্না শুনিয়া সেইখানে আসিলেন ও আদর করিয়া তাঁহাকে আশ্রমে লইয়া গেলেন।

তপবনে আসিয়া সীতাদেবীর দুইটি যমজ পুত্র হইল। বাল্মীকি তাহাদের নাম রাখিলেন লব ও কুশ। লব কুশ বড় হইলে বাল্মীকি তাঁহাদিগকে নানা শাস্ত্র ও ধনুর্বেদ শিখাইলেন এবং তিনি যে রাম-চরিত লিখিয়া রাখিয়াছিলেন তাহা তাঁহাদিগকে সুর লয় সংযোগে শিখাইলেন।

এই সময়ে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ সস্ত্রীক করিতে হয়। এজন্য কেহ কেহ রামচন্দ্রকে পুনরায় বিবাহ করিতে বলিলেন। কিন্তু রামচন্দ্র বিবাহ না করিয়া সোনার সীতা তৈয়ারি করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ পূর্ণ করিলেন।

বাল্মীকি মুনি লব-কুশকে লইয়া রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞের নিমন্ত্রণে নৈমিষারণ্যে আসিলেন। লব-কুশ বাল্মীকি মুনির আদেশে নানা স্থানে রামায়ণ গান করিতে লাগিল। রামচন্দ্র এই বালক দুটিকে এক সভাসদ্ ব্রাহ্মণ দ্বারা নিজের কাছে ডাকাইয়া আনিলেন।

দূর হইতে কৌশল্যাদেবী লব-কুশকে দেখিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। পরিচয়ে জানিলেন, তাঁহারা বাল্মীকির শিষ্য। বাল্মীকি মুনি আসিয়া লব ও কুশের পরিচয় দিলেন।

সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করিবার কথা উঠিল। বাল্মীকি মুনি সীতাদেবীকে আশ্রম হইতে আনাইলেন। কথা হইল, সীতাদেবীকে পুনরায় এই সমস্ত লোকের সম্মুখে অগ্নিপরীক্ষা দিতে হইবে। কিন্তু সীতাদেবী এ দুঃখের ভার আর সহ্য করিতে পারিলেন না। এই সময়ে সহসা পৃথিবী-পৃষ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া গেল। ধরণীদেবী সীতাদেবীকে কোলে লইয়া অন্তর্হিতা হইলেন।

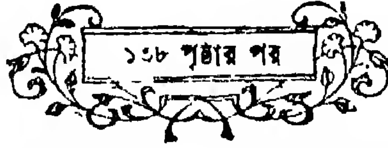
ইহার পর রামচন্দ্র বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই। তিনি ভরতের পুত্র তক্ষকে তক্ষশিলার ও পুষ্কলকে পুষ্কলাবতের এবং লক্ষ্মণের দুই পুত্র অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতুকে কারুপথ ও চন্দ্রকান্ত দেশের রাজা করিলেন। শত্রুঘ্নের দুই পুত্র সুবাহু ও শত্রুঘাতী মথুরা ও বৈদিশপুরীর অধিপতি হইলেন।

এইরূপে কিছুদিন কাটিয়া গেল। একদিন কাল পুরুষ আসিয়া রামের সঙ্গে নির্জ্জনে দেখা করিতে চাহিলেন। লক্ষ্মণ দ্বারে প্রহরী রহিলেন। এই সময়ে দুর্ব্বাসা মুনি তথায় আসিয়া বলিলেন, আমি এখনি রামের সঙ্গে দেখা করিতে চাই। লক্ষ্মণ রামচন্দ্রকে খবর দিলেন। কালপুরুষ ও দুর্ব্বাসা চলিয়া গেলে, লক্ষ্মণ পূর্ব্বের কথামত রামচন্দ্রের নিকট হইতে বিদায় লইবার বাসনা জানাইলেন। লক্ষ্মণকে ত্যাগ করিতে রামচন্দ্রের বুক যেন ফাটিয়া যাইতেছিল। তথাপি সত্যরক্ষার জন্য লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিতে হইল। লক্ষ্মণ সরযূর জলে নামিয়া প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন।

এইবার রামচন্দ্র লব ও কুশকে যথাক্রমে কোশল ও উত্তর কোশলে স্থাপন করিয়া কুলগুরু বশিষ্ঠের পরামর্শে মহাপ্রস্থান করিলেন এবং প্রায় দুই ক্রোশ পথ গিয়া যেখানে সরযূ পশ্চিমবাহিনী হইয়াছেন তথায় প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।



জলের শক্তি ও চাপ


১৩৮ পৃষ্ঠার পর

বায়ুর ন্যায় জল যে আমাদের জীবন-ধারণের পক্ষে, কৃষিকার্যের পক্ষে এবং যাতায়াতের পক্ষে কত দিকে কত ভাবে যে উপকারী, সে-কথা তোমরা জান। পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই এক সময়ে জলকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করিত। বাতাস যেমন বায়বীয় পদার্থের, জলও সেইরূপ যাবতীয় তরল পদার্থের প্রতীক্ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শিশু-ভারতীর দ্বিতীয় সংখ্যায় তোমরা জলের সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিতে পারিয়াছ। এখন বেশ বিস্তৃতভাবে আমরা জলে সম্বন্ধে নানা কথা বলিব।

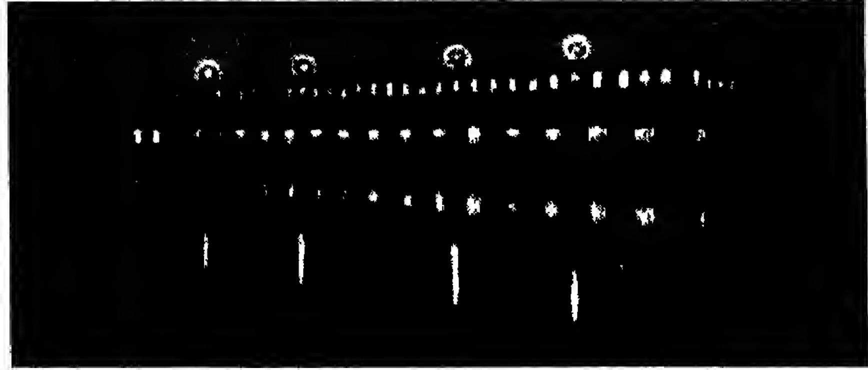
নদীর বুকে যখন ঢেউ থাকে না, পুকুরের জলের যখন বাতাস দোলা দেয় না, তখন সেই শান্ত স্থির জল দেখিতে কি সুন্দর! কিন্তু সেই জলের মধ্যে যখন গতি আসে, তখন সেই জলের কি প্রলয় শক্তিই না আমরা দেখিতে পাই! পুরাণে গল্প আছে, গঙ্গার জলস্রোতের বেগে ইন্দ্রের ঐরাবতের ন্যায় বিকটাকার হস্তীও ভাসিয়া গিয়াছিল তোমরা বাঙ্গলাদেশের দামোদর নদের বন্যার কথা, গঙ্গার প্লাবনের কথা এবং নিম্ন বঙ্গের পদ্মার ভীষণ ভাঙ্গনে শত শত গ্রাম ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যে তাহার কুক্ষিগত হইয়াছে, সে-কথা প্রায়ই শুনিয়া থাক। কাজেই, শান্ত স্থির জলের মধ্যে যে কতখানি শক্তি নিহিত আছে এবং তাহার বেগ যে কত ভয়ঙ্কর, তাহা তোমাদের পক্ষে উপলব্ধি করা কঠিন নহে।



পানচাক্কি

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা কিন্তু প্রকৃতিদত্ত এই জলের বেগকে বৃথা যাইতে দেন নাই। তাঁহারা এই জলের বেগকে নানা কাজে লাগাইয়াছেন। সকল বস্তুর ন্যায় ইহাও যতটা উচ্চ হইতে পড়িবে ও পরিমাণে যত বেশী হইবে, তত বেগ ও শক্তিসম্পন্ন আঘাত ইহার দ্বারা উৎপন্ন হইবে। ডানা বা দাঁড়বিশিষ্ট একটি চাকা যদি জল-প্রপাতের নীচে এমনভাবে স্থাপিত করা হয় যে, জলের ধারা তাহার কোন একটি ডানার উপর আসিয়া পড়ে,

তবে দেখিতে পাইবে যে, পতনশীল জলের বেগ সেই প্রসারিত ডানাটিকে নীচের দিকে ঠেলিয়া দিতেছে, ফলে, চাকাটি তাহার অক্ষের উপর খানিকটা ঘুরিয়া যাইবে। সেই ঘোরায় চাকাটির অন্য একটি ডানা যেমনি জলধারার নীচে আসিয়া পড়িবে, জলধারা সেইটিকেও নীচে ঠেলিয়া দিবে। জলধারা ডানাগুলিকে এই ভাবে একটির পর একটি ঠেলিয়া দিতে থাকায়, চাকাটি ক্রমান্বয়ে ঘুরিতে থাকিবে। চাকাটি এইরূপে চালাইয়া তাহার ঘূর্ণনে বহুবিধ কল চালাইতে পারা যায়। আমাদের দেশে এইরূপ "পানচাক্কি" দিয়া আটা পিশিবার যাঁতা ঘুরাইয়া লওয়া হয়। অনেক স্থলে এইরূপ চাকা দিয়া বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপন্নকারী যন্ত্রসমূহ চালান হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কতকগুলি জলপ্রপাতের দ্বারা নানা কাজ চালান হইতেছে। তোমরা বিশ্ববিখ্যাত নায়েগ্রার জলপ্রপাতের কথা জান। এই প্রপাতের উচ্চতা প্রায় ১৬০ ফিট। তাহার যে অংশ কাজে লাগান হইয়াছে তাহা হইতে অনেক কোটি অশ্বশক্তি পাওয়া যায়। সেই শক্তির দ্বারা নিউইয়র্কের মত বড় সহর ও বফেলো নামক একটি নগর বৈদ্যুতিক আলোকে আলোকিত করা হয় শুধু কি তাই? ঐ শক্তির দ্বারা আরও অনেক কল-কারখানা পরিচালিত হইতেছে। তোমাদের কাছে হয় ত আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু কথাটা গল্প নয়, সত্য। এক আমেরিকার যুক্ত প্রদেশে জলের দ্বারা উৎপন্ন যে শক্তি কাজে লাগানো হইতেছে, ঠিক সেই পরিমাণ শক্তি যদি কয়লায় উৎপন্ন করিতে হয়, তাহা হইলে ১,০০০,০০০,০০০ টন কয়লার প্রয়োজন। তোমরা মিসিসিপি নদীর নাম শুনিয়াছ। সেই নদীর জল হইতে উৎপন্ন শক্তির দ্বারা সহর, বাড়ী-ঘর আলোকিত ও কল-কারখানা পরিচালিত হয়। যে কোম্পানী এই কাজ করিয়া লাভবান্ হইতেছেন, তাহার নাম-The Mississpi River power company এই কোম্পানী মিসিসিপি নদীর জলস্রোতকে কার্য্যকরী শক্তিতে পরিণত করিয়া অজস্র অর্থোপার্জ্জন করিতেছেন। জলের শক্তি সম্বন্ধে আমরা পরে আরও অনেক কথা বলিব। এইবার তোমাদের কাছে জলসম্বন্ধে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলিয়া লইতেছি। আমরা যেমন মাপিবার জন্য ইঞ্চি, ফুট ও ওজনের জন্য সের, ছটাক ব্যবহার করি, পণ্ডিতেরা অনেকগুলি কারণে মাপিবার জন্য সেন্টিমিটার, মিটার নামক পরিমাপ ব্যবহার করেন। ১০০ সেন্টিমিটার এক মিটার ও প্রায় ২½ সেন্টিমিটারে এক ইঞ্চি হয় ইহার সহিত ওজনের পরিমাপের সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য তাঁহারা এক ঘন সেন্টিমিটার জলের ওজন, ওজনের প্রাথমিক মাপের জন্য ব্যবহার করেন ও তাহাকে এক গ্রাম বলেন। হাজার গ্রামকে এক কিলোগ্রাম বলেন। তবে জলের ওজনের তারতম্যের জন্য

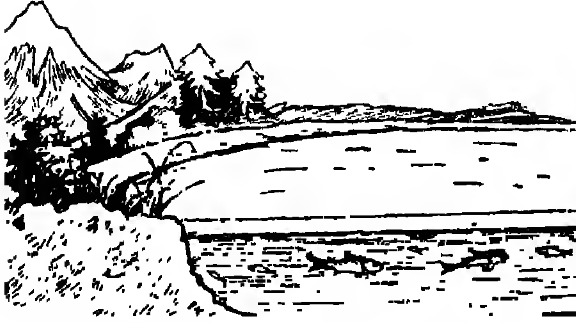


মিসিসিপি নদীর পাওয়ার হাউস—নৈশ দৃশ্য

তাঁহারা চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের এক কিলোগ্রাম জলের মাপ এক হাজার ঘন সেন্টিমিটার না বলিয়া এক লিটার বলেন ও সেইজন্য চার ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের এক গ্রাম জলের মাপ এক ঘন সেন্টিমিটার না বলিয়া এক মিলিমিটার বলেন। এক মিলিলিটার বলিতে গেলে, প্রায় এক ঘন সেন্টিমিটারের সমান। বহুবিধ কারণে পণ্ডিতেরা জলকেই ওজনের প্রাথমিক মাপকাঠি বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। দশ, একশ ও হাজার গুণ বুঝাইতে ও দশমিক শতমিক ও সহস্রমিক ভাগ বুঝাইতে, কথার পূর্ব্বে ডেকা, হেক্টো ও কিলো এবং ডেসি, সেণ্টি ও মিলি এই কথাগুলি ব্যবহৃত হয়। এক কিলোগ্রাম আমাদের প্রায় এক সেরের সমান।

জলের ওজন—সাধারণ তাপে এক ঘনফুট বা ৬ গ্যালন বা ৩০ লিটার জলের ওজন প্রায় ৩০ সের বা ৩০ কিলোগ্রাম। তবে তাপের তারতম্য অনুসারে ইহার ওজনের তারতম্য হয়। চার

সেন্টিগ্রেডে জলের ওজন একটু বেশী পাওয়া যায়। উহার উচ্চে বা ঐ তাপের নীচে জলের ওজন কমিতে থাকে। যদি ঠাণ্ডা জল গরম জলের উপর বিনা আলোড়নে ফেলা হয়, তাহা হইলে, সম্যক্ মিশ্রণ সংসাধিত না হইয়া, ঠাণ্ডা জল ভারি বলিয়া গরম জলের নীচে তলাইয়া যায়। শীতপ্রধান দেশে পুষ্করিণী বা হ্রদের জল ঠাণ্ডা হইতে থাকিলে তাহা ক্রমশঃ তলাইতে থাকে ও নীচের জল উপরে ভাসিয়া উঠিতে থাকে। চার



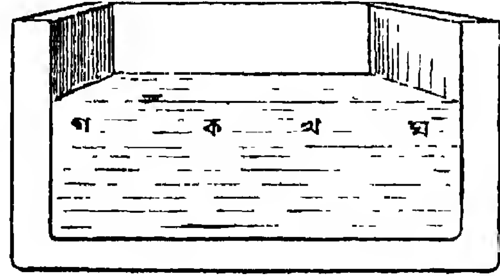
বরফের নীচে মাছ খেলা করিতেছে

ডিগ্রী তাপের নীচে শীত পড়িলে, জল পুনরায় লঘু হইতে থাকায় তাহার তলাইয়া যাওয়া বন্ধ হইয়া যায়। আরও শীত পড়িলে, উপরের জল ক্রমশঃ আরও ঠাণ্ডা হইয়া বরফ হইয়া যায় ও বরফ জল হইতে অনেক হাল্কা বলিয়া উপরেই থাকিয়া যায়। ফলে, নীচের জল তখনও জলই থাকিয়া যায় ও মৎস্যাদি জলচর জীবের অত্যধিক শীতে বরফের চাপে প্রাণ বিয়োগ হইবার সম্ভাবনা বহুলাংশে কমিয়া যায়।

জলের চাপ—একটি পাত্রে জল রাখ, দেখিবে, বেশ স্থির হইয়া আছে। কিন্তু বাস্তবিক ভিতরে বেশ ঠেলাঠেলির চেষ্টা চলিতেছে। উপরের জলের কণাগুলি নীচের জলের কণাগুলির উপর নিজেদের ভার চাপাইয়া রহিয়াছে। ভারের চাপে, নীচেকার জলকণাগুলি তাহাদের চতুষ্পার্শে অবস্থিত কণাগুলিকে ঠেলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে। জল কঠিন পদার্থ না হওয়ায়, ও তাহার কণাগুলির ভিতর আঁট না থাকায় ইহা যে পাত্রে রাখা যায়, এই চাপের জন্য তাহাতে ছড়াইয়া পড়িতে বাধ্য হয় ও অনবরতঃ পরস্পরের ভিতর ও দেওয়ালের উপর সেই চাপের ঠেলা চলিতে থাকে।

এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ যে, পাত্রস্থ জলের এক স্তরে অবস্থিত জলকণাগুলির উপর চাপের পরিমাণ ঠিক একই রকম দাঁড়ায় এবং ইহা দাঁড়াইতে বাধ্য হয়, ইতর-বিশেষ হইবার যো নাই। তাহা না হইলে, সেই স্তরে অবস্থিত কণাগুলি একটি আর একটিকে আটকাইয়া রাখিতে সমর্থ হইত না।

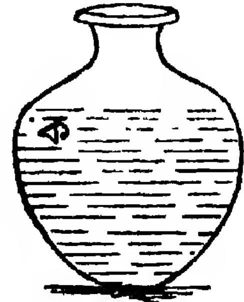
চিত্রে ক ও খ কণা দুইটি একই স্তরে অবস্থিত থাকায়, আমাদের বুঝিতে হইবে তাহারা সমান চাপে রহিয়াছে। পাত্রগাত্রস্থ গ ও ঘ, ক ও খ এর সহিত সমান স্তরে অবস্থিত থাকায় তাহাদের উপরেও ঠিক সেই একই চাপের ঠেলা আসিয়া লাগিতেছে। এই চাপের পরিমাণ কত বল দেখি? নিশ্চয়ই ইহা ক বা



জলপূর্ণ পাত্র

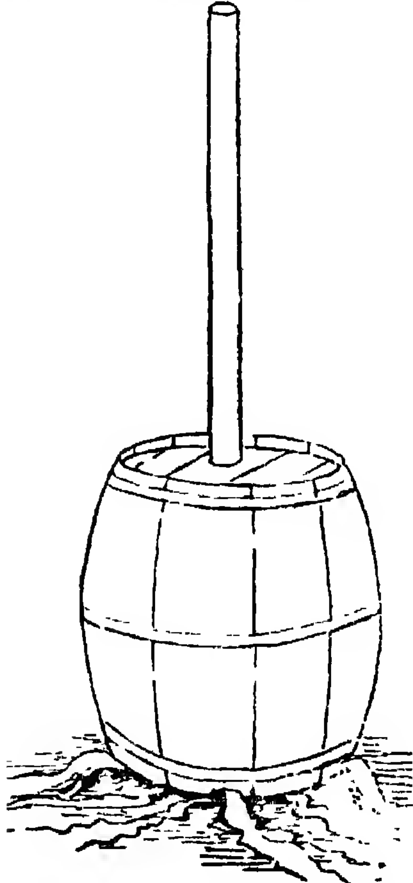
খ'র উপর ঋজুভাবে অবস্থিত জলকণা ও তাহার উপরকার বায়ুকণাগুলির ভারের সমান।

বেশ, এখন তোমাদের একটি প্রশ্ন করি। পার্শ্বস্থ চিত্রানুযায়ী একটি কুম্ভে যদি জল রাখা হয়, তাহা হইলে পাত্রগাত্রস্থ ক স্থানটিতে কত চাপ পড়িতেছে বলিতে পার কি? তুমি হয়ত বলিবে, কিছুই চাপ পড়িতেছে না, কারণ, ক উপরি অঙ্কিত চিত্রের ক, খ, গ, বা ঘ'র মত নহে, ইহার উপর কোনও জলকণা দাঁড়াইয়া নাই। তুমি কিন্তু ভুলিয়া যাইতেছ, এই কণাটি, সমস্তরে অবস্থিত তাহার পার্শ্বস্থ কণাটির কাছে পিষ্ট হইতেছে এবং সেটি আবার তাহার পার্শ্বের কণাটির নিকট চাপ খাইতেছে। এই স্তরে অবস্থিত যে কণাটির উপর সর্ব্বোচ্চ চাপ রহিয়াছে, সে সেই চাপ পার্শ্বস্থিত কণা-গুলির উপর প্রয়োগ করিতেছে ও কণা পরম্পরায় ঠিক সেই চাপই ক'র উপর আসিয়া পড়িতেছে। সেই একই চাপে এই স্তরের কণাগুলি পরস্পর পরস্পরকে আটকাইয়া আছে। আটকাইয়া আছে বলিয়াই আমরা বুঝিতে পারিতেছি, সেই স্তরে সকল



জলপূর্ণ কুম্ভ

কণাগুলির উপর সমান চাপ বহিয়াছে ও সেই চাপের পরিমাণ উপরি উক্ত সর্ব্বোচ্চ চাপের সমান। পাত্রে ছিদ্র করিয়া দিলে, সেই ছিদ্রটি দিয়া, স্থানীয় চাপে জলকণাগুলি ধারারূপে স্থবিৎগতি বাহির হইয়া আসে। একটি চৌবাচ্চায় বিভিন্ন উচ্চতায় যদি কতকগুলি নল বসাইয়া, চৌবাচ্চায় জল পূরিয়া নলগুলি খুলিয়া দিলে, দেখিতে পাইতে সর্ব্বনিম্ন মুখটি দিয়া সর্ব্বোচ্চ বেগে ও ক্রমউর্দ্ধে অবস্থিত মুখগুলি দিয়া ক্রমনিম্ন বেগে জল বাহির হইতে থাকিবে।



পিপার তলার কাঠ ফাঁসিয়া গিয়াছে

জলের চাপের আরও একটি পরীক্ষা দেখা হউক। পাতলা কাঠের ছোট একটি পিপায় যদি একটি সুদীর্ঘ নল চিত্রানুযায়ী খাড়া করিয়া দেওয়া হয়, এবং পিপাটি ও নলের উপরের মুখ পর্য্যন্ত জল ভরিয়া দেওয়া হয়, নলটি যথেষ্ট পরিমাণে দীর্ঘ হইলে ও পিপাটি তেমন সুদৃঢ় না হইলে, দেখিতে পাইবে, পিপার তলার কাঠটি ফাঁসিয়া যাইবে। ছোট পিপাটিতে কতটুকুই বা জল ছিল? সেই জলের নিজস্ব ওজনে পিপার তলার কাঠটি নিশ্চয়ই ফাঁসিয়া যায় নাই। তাহা হইলে পিপার তলার কাঠের উপর এত চাপ কোথা হইতে আসিল, বলিতে পার কি? ইহা সেই সুদীর্ঘ নলে অবস্থিত জলের গুরু চাপ। উপরে পড়িয়াছ, যদি পাত্রের গঠনবশতঃ কোনও জলকণার উপর সেই স্তরস্থ অন্যান্য কণাগুলির উপর অবস্থিত জলকণাগুলি হইতে বেশীসংখ্যক জলকণা ঋজুভাবে অবস্থিত থাকে, তথাপি, ফলে উপরি উক্ত স্তরের সকল কণাগুলির উপর বহুভার পীড়িত কণাটির চাপ সমানভাবে আসিয়া পড়িতে থাকে। সুদীর্ঘ নলে অবস্থিত জলের গুরু চাপ পিপার তলার প্রত্যেক জলকণাগুলির উপর প্রযুক্ত থাকায় তলাটি ফাঁসিয়া যাইতে বাধ্য হয়।

জলের উপরটি অমন মসৃণ ও সমতল হয় কেন? আমরা যাহাকে ভার বলি, তাহা আর কিছুই নহে, সেই বস্তুটির উপর পৃথিবীর আকর্ষণ।

জলের উপরিভাগ সমতল কেন?

সকল বস্তুই পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। আকাশে প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপ করিলে পুনরায় তাহা পৃথিবীর দিকে ফিরিয়া আসে। বাধা না পাইলে, প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক কণা পৃথিবীর কেন্দ্রের যত নিকটে আসিতে পারে, আসিবার চেষ্টা করে। জলের কণাগুলির ভিতরে আঁট না থাকায়, তাহারাও নিজেদের ছাড়াইয়া যতটা পারে পৃথিবীর কেন্দ্রের নিকট আসিতে চেষ্টা করে, কেহ কাহারও অপেক্ষা অধিক দূরে থাকিতে চাহে না। তবে পাত্রের দেওয়ালে বাধা পাওয়ার দরুণ তাহা সম্ভবপর না হওয়ায়, জলকণাগুলি পাত্রের ভিতর পরস্পরের উপর থাকিতে বাধ্য হয়। তথাপি তাহাদের গড়াইয়া পড়া ও পরস্পরকে ঠেকাইয়া রাখা স্বভাববশতঃ জলের উপরিতলস্থ কণাগুলি পৃথিবীর আকর্ষণের ফলে কেহ কাহারও অপেক্ষা পৃথিবী-কেন্দ্র হইতে দূরে থাকিতে অসম্মত হয়। ফলে, উপরকার স্তরটি সমতল দেখায়। বস্তুতঃ ইহা বৃত্তাকার, কারণ বৃত্তাকার না হইলে, কণাগুলির পৃথিবী-কেন্দ্র হইতে দূরত্ব সমান হয় না। আমরা ছোট পাত্রে বৃত্তের মাত্র অতি সামান্য অংশ দেখি বলিয়া ইহাকে সমতল মনে করি। পৃথিবীরও যখন আমরা অতি সামান্য অংশ দেখি তখন আমরা সাধারণতঃ তাহাকে সমতল মনে করি। জল যে বৃত্তাকারে নিজের উপরিভাগকে সজ্জিত করে তাহা, বৃহৎ পাত্রে অবস্থিত জলের সুন্দর উদাহরণ সমুদ্র দেখিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয়। সমুদ্রে জাহাজ দূরে যাইতে থাকিলে প্রথমে

তাহার খোল, পরে পাটাতন ও সর্বশেষে মাস্তুল বা চিমনী দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায়।

যেমন করিয়াই জল রাখা হউক না কেন, ইহার উপরিভাগের প্রত্যেক স্থান তৎক্ষণাৎ সমতল,

চাবি দিয়া জল বন্ধ আছে

মসৃণ বা পৃথিবী-কেন্দ্র হইতে সমদূর হইয়া যাইবে। চিত্রানুযায়ী, চাবিবিশিষ্ট একটি নল দ্বারা দুইটি পাত্রের তলদেশ যুক্ত করা হউক। পাত্র দুইটিতে বিভিন্ন উচ্চতায় জল পুরিয়া নলের চাবিটি খুলিয়া দিলে, জলের উচ্চতা দুইটি পাত্রেই সমান হইয়া যাইবে। এমন কি, একটি পাত্র শূন্য রাখিয়া, অন্য পাত্রটিতে জল পুরিয়া নলের চাবিটি খুলিয়া দিলেও, সেই একই ফল পরিদৃষ্ট হইবে। পৃথিবীর আকর্ষণে ও জলের নিজস্ব স্বভাবে দুইটি সংযুক্ত পাত্রে অবস্থিত জলের উপরিভাগ কোথাও উচ্চ বা নীচে থাকিতে পারে না। নল হইতে সেই একই কারণে জল পড়ে ও উচ্চ ভূমি হইতে নিম্নভূমিতে জল গড়াইয়া যায়। এই নিম্ন-গমনের জন্যই জলে বেগের সৃষ্টি হয়।

বৃষ্টির জলের অনেকাংশ পৃথিবীতে শুষিয়া যায় বা জমির ফাটালে প্রবেশ করে। নীচে তাহার পথ যদিও কোনও প্রস্তর-স্তরে আটকাইয়া যায় ও উপর হইতে অনবরতঃ আরও জল আসিতে থাকে, তাহা হইলে বাহির হইবার কোন ফাটাল বা পথ পাইলে, উপরের জলের চাপে, জল সেই পথ দিয়া নির্গত হইয়া আসে। ফাটালের বহির্মুখ প্রবেশপথের মুখ হইতে নিম্নে থাকিলেই এই নির্গমন সম্ভবপর হয়। বাহির হওয়ার সময় চাপের চোটে জল উৎসের আকারে বাহির হয়। এইরূপে প্রাকৃতিক উৎসের সৃষ্টি হয়। প্রবেশ পথ ও নির্গমন পথের ফাটাল দুইটি যেন উপরি-উক্ত সংযুক্ত বোতলের মত। একদিকে জল ঢালা হইলে অন্য দিক্‌কার জলের উপরিভাগ সমান উচ্চে আসিবার চেষ্টা করে। কাজেই, ইহা উৎসের আকারে ঊর্দ্ধাভিমুখী হয়। ফোয়ারাটিতেও ঠিক একই কারণে ঊর্দ্ধে জল নিক্ষেপ করে। ফোয়ারাটির সহিত সংযুক্ত, কিন্তু কিছু ঊর্দ্ধে অবস্থিত একটি চৌবাচ্চায় জল রাখিয়া ফোয়ারাটি খুলিয়া দিলে উপরি উক্ত কারণে উৎসের আকারে জল নির্গম হইতে থাকে।

প্রাকৃতিক উৎস

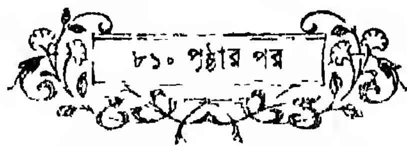
জলের চাপ ও তাহার উপরিভাগের সমতলত্ব প্রাপ্তির প্রয়াস থাকায় বিশ্বসংসারের যে কত উপকার সাধিত হইয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। শিশু-ভারতীর অন্য কোনো সংখ্যায় আমরা এ বিষয়ে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।



শিল্প-কথা

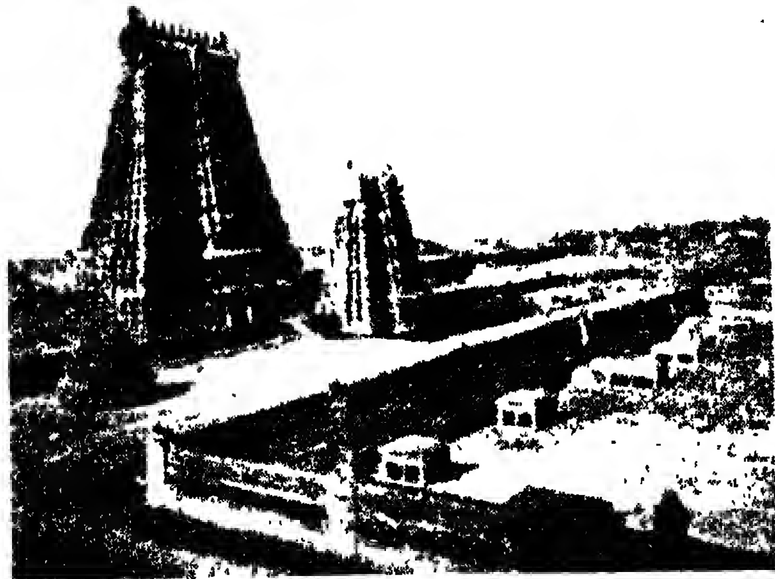
ভারতের স্থাপত্য

(মুসলমানী আমল)


৮১০ পৃষ্ঠার পর

মুঘল শাসনের প্রারম্ভকালে এবং তার পরে অর্থাৎ মধ্যযুগে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক অশান্তির সময় স্থাপত্য কলায় বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নাই। সেই সময় দাক্ষিণাত্য প্রদেশের বিজয়নগর, মহীশূর, তাঞ্জোর, মাদুরা, রামেশ্বরম্ প্রভৃতি স্থানে দক্ষিণী-স্থাপত্যের বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

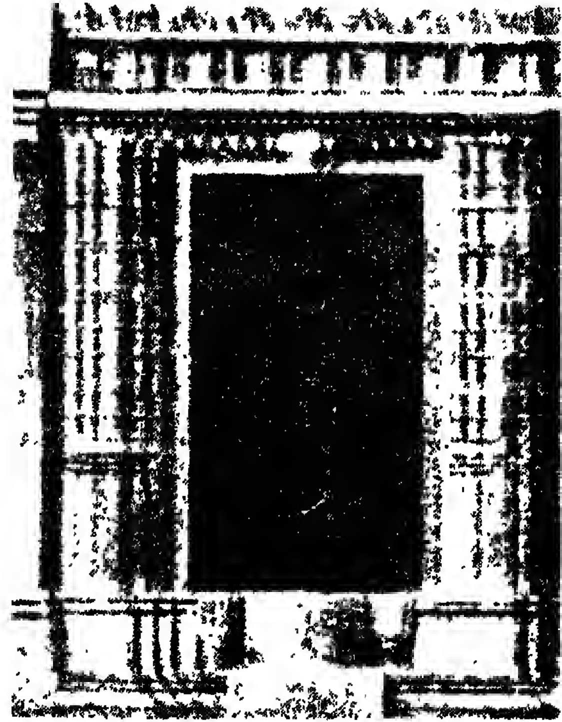
এই দ্রাবিড়ী স্থাপত্যের বিশেষত্ব হইল তাহার গোপুরম্ বা গোপুরা। এই গোপুরম্ বা গোপুরাটি মূল মন্দিরের মতই অসংখ্য ভাস্কর্য্য ও কারুকার্য্যখচিত হয় এবং মন্দিরের আকারের সঙ্গে তাহার মিল থাকে। আমরা এখানে মাদুরার যে ছবিটি দিলাম, তাহাতেও এই দক্ষিণী মন্দিরের আভাষ পাওয়া যাইবে। এই মন্দিরগুলি ভারতের মধ্য ও প্রাচীন যুগের হিন্দুমন্দিরের প্রধান নিদর্শন। যাঁহারা তীর্থ করিতে দাক্ষিণাত্য প্রদেশে আসেন তাহারা শুধু যে দেবতার মন্দিরে দেবতাই দর্শন করিয়া আসেন, কেবল মাত্র তাহাই নহে; তাঁহারা আরও দেখিয়া



মাদুরা মন্দিরের সাধারণ দৃশ্য

আসেন—ভারতীয় হিন্দু স্থাপত্য-কলার অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলা।

ভারতবর্ষে খাঁটিভাবে যখন দাস রাজা কুতুবউদ্দীনের সময় মুসলমান রাজত্বের গোড়া পত্তন হয়, সেই সময়েই দিল্লীতে কুতুব মিনার ও মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে পারস্য বা ইরাণদেশ প্রভৃতি হইতে বহুপ্রসূ ভারতের ধনরত্ন লুণ্ঠনের জন্য যাঁহারা আসিতেন, তাঁহাদের কাজ ছিল শুধু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া লুটপাট করিয়া এদেশের কীর্ত্তিনাশ করা। গঠন কার্য্যের পরিচয় কুতুবের সময় হইতেই পাওয়া যায়। এই সময়ের আলতামাসের কবরস্থান, বাদাউনের প্রাচীন মসজিদ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কুতুবের যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি দিল্লীতে অবশিষ্ট রহিয়াছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতের কারিগরের হাত বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। যদিও এবিষয়ে ইউরোপীয় ঐতিহাসিকেরা মুসলমানী আমলের এই স্থাপত্যের নিদর্শনকে একেবারে বিদেশ হইতে আনীত ইরাণী শিল্পের নকল বলিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করেন না। ইরাণ-তুর্কির শিল্পকলার আমেজ ঐ সব শিল্পে একেবারেই নাই এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না এবং বলাটা সম্পূর্ণভাবে অসম্ভব নাও হইতে পারে। তবে আমরা একথাটাও বেশ যুক্তি সহকারেই বলিতে পারি যে, সে যুগে ঐ সব দেশ হইতে এদেশে কারিগর আনান সহজ ব্যাপার ছিল না। তখন এখনকার মত ষ্টীমার রেল, উড়ো জাহাজ ত আর ছিল না। মুঘলদের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণে দ্রাবিড়ী রাজারা ও রাজপুতানার স্বাধীন ও করদ নৃপতিরা সে সময়ে তাঁহাদের নূতন নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠায় প্রাসাদ প্রভৃতি রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। আজমীর, গোয়ালিয়র, উদয়পুর, অম্বর প্রভৃতি স্থাপত্য-কলার দেশীয় ভাবের শিল্পের ক্রমবিকাশ বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। স্থাপত্য কলার সঙ্গে সঙ্গে উদ্যান-রচনার কৌশলও মুঘল আমলে অনেকটা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। উদ্যান রচনায় মুঘলেরা সিদ্ধহস্ত ছিলেন, একথা বলিলে কোনও অত্যুক্তি হয় বলিয়া মনে করি না। এখন পর্য্যন্ত 'ভুবনমনোমোহিনী' তাজমহলের উদ্যান শোভা, অম্বর প্রাসাদের প্রাচীন উদ্যান গঠন প্রণালী দেখিয়া ইউরোপীয়



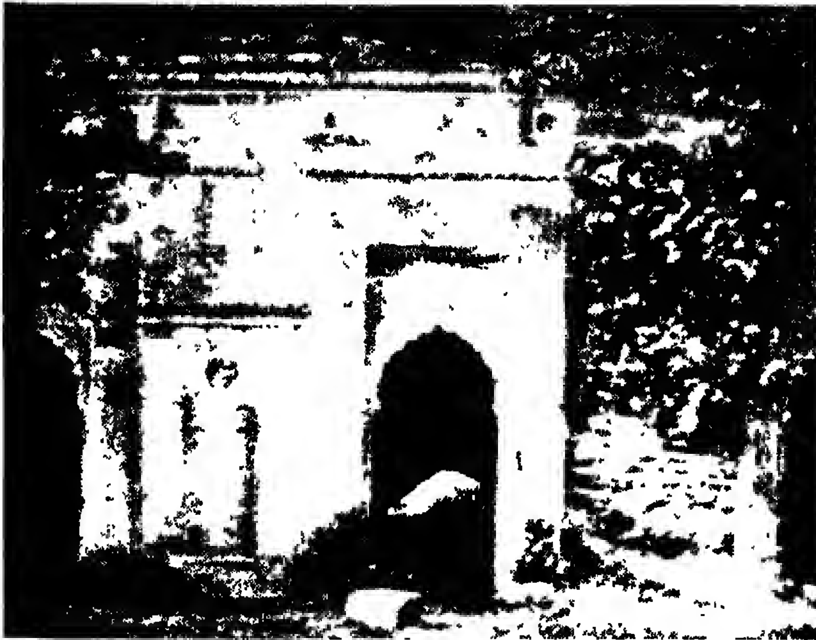
দোলকা হিলাল খাঁ কোয়াসির মসজিদের দ্বার

রসিক ও শিল্পীরা প্রেরণা পাইয়া আসিতেছেন। সম্প্রতি ভারতের নূতন রাজধানী দিল্লী নগরীতে বড়লাটের বাসভবনটিতে শিল্পী লরেন্স সাহেব মুঘল উদ্যানের আদর্শানুকরণে উদ্যান রচনা করিতেছেন। উদ্যান শিল্পও স্থাপত্য কলার একটি বিশেষ অঙ্গ।

মুঘল স্থাপত্যের আকারগত বিশেষত্ব হইতেছে ঘরবাড়ীর মাথায় গোল গম্বুজ এবং খিলানদার বারান্দা। মুঘল খিলান পদ্মের পাপড়ির আকারে অর্দ্ধবৃত্তাকার এবং গম্বুজটিও কতকটা ঐ আকারের হইয়া

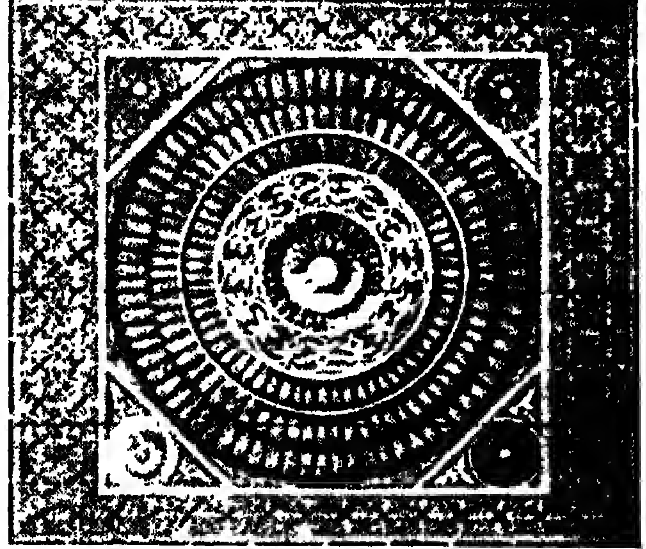
থাকে। বোগ্‌দাদ্, মক্কা প্রভৃতি পারস্য ও তুর্কির স্থাপত্যে যে খিলান ও গম্বুজ দেখা যায়, তাহাতে বেশ একটু বৈচিত্র আছে। গম্বুজ ও খিলান তৈয়ারার প্রণালীটা বিদেশ হইতে আমদানী হইলেও তাহা ভারতীয় শিল্পীর হাতে শিল্পলক্ষ্মীর পদ্মাসনে যে পরিণত হইয়াছে সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ইরাণী স্থাপত্যের 'জাত' ভারতীয় শিল্পীদের হাতে 'আর্টে'র ক্ষেত্রে এই ভাবে যে গিয়াছিল তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে ভারতে স্থাপত্য কলা সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। আমরা এখানে যে দোলকা হিলাল খাঁর মসজিদের ছবি দিলাম তাহা হইতেই মুঘলস্থাপত্য যে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য কলার অপর একটি রূপমাত্র তাহা বেশ বুঝা যাইবে।

কুতুবের পরবর্ত্তী সময়ে ১৩১০ খৃষ্টাব্দে আলাউদ্দীন্ খিলজীর তৈয়ারী তোরণ দ্বারটি



সোনা মসজিদ—গৌড়

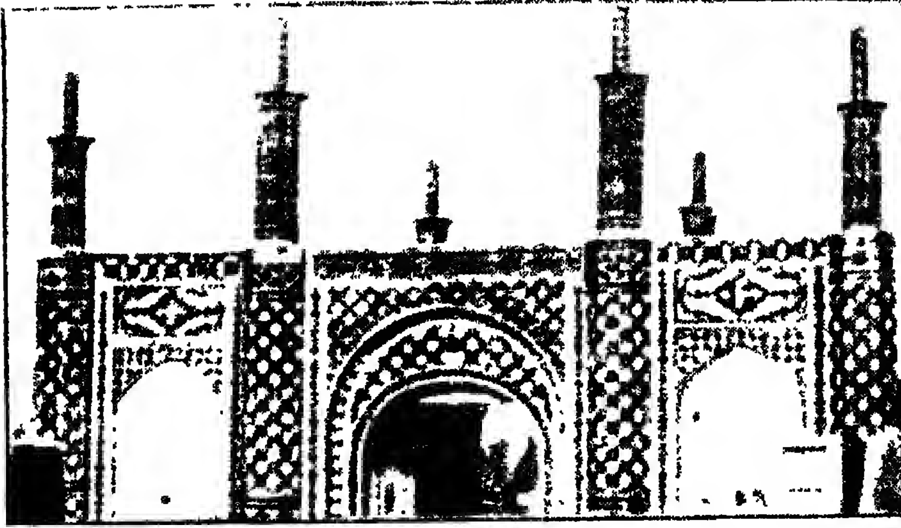
ভারত-ইরাণী স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট আদর্শ। তাহাতে আরব্য ভাষায় লেখা বয়েৎ ও আলঙ্কারিক কাজ অনেক আছে। কুতুব মসজিদের পাথরের দেয়ালের গায়ে বেশ সূক্ষ্ম কাজ করা নক্সা উৎকীর্ণ আছে।



জৌনপুরের জুম্মা মসজিদের ভিতরের কারুকার্য্য

সেগুলি দেখিয়া তাহার সূক্ষ্ম কাজের সৌন্দর্য্যে অনেকেই মুগ্ধ হন। চতুর্দ্দশ খৃষ্টাব্দে তোঘলক্ বংশের রাজত্বকালে খুব জমকাল বৃহৎ আয়তনের সাদাসিধা ধরণের মসজিদ প্রভৃতি তৈয়ারী হইয়াছিল। গায়সউদ্দীন তোঘলকের কবরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। জৌনপুরের অটলা মসজিদাদিও প্রাচীন ভারত ও মুঘল আমলের সংমিশ্রণে গঠিত একটি স্থাপত্যকলা। পাঁচ তলার মত উঁচু দুই দিকে চৌকো থামের পদ্মাকার খিলাল ও তাহাতে ঘুলঘুলি দেওয়া। ঠিক্ সামনেটা কতকটা চৈত্য

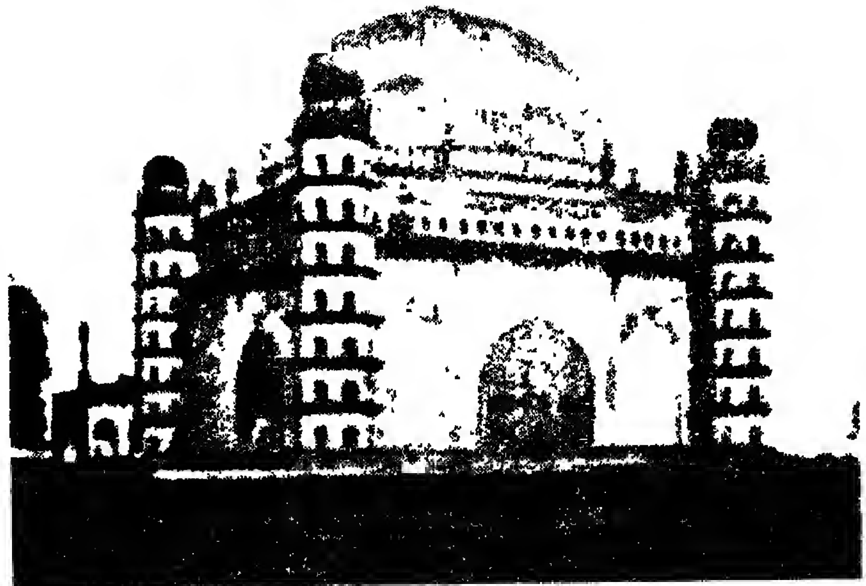
গুহাপথের মত দেখিতে। ৮৮৩পৃষ্ঠার জৌনপুরের জুম্মা মসজিদের কারুকার্য্যের ছবিটি দেখিলে প্রাচীন ভারতীয় আলঙ্কারিক শিল্পের কথা মনে হইবে। পদ্মের নক্সা একেবারে প্রাচীন ভারতের নিজস্ব জিনিষ। নক্সাটির ধারে আরবী নক্সা এবং মধ্যে পদ্ম, ভারত ও পারস্যের অপূর্ব্ব মিলন। এইটি ১৪০৮ খৃষ্টাব্দে মার্কী রাজ্যর দ্বারা স্থাপিত হয়। এই রাজ্য ১৪৭৬ খৃঃ পর্য্যন্ত জৌনপুরে আধিপত্য করিয়াছিল।



টেহরণের ইরাণী স্থাপত্য

বাঙ্গালায় গৌড়, পাণ্ডুয়া এবং মালদহের প্রাচীন মসজিদগুলি স্থাপত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। এই সব মসজিদের গায়ে ভারতের শিল্প কলায় প্রচলিত পদ্ম, লতা প্রভৃতি দেখা যায়। এগুলি নামেমাত্র ইরাণী, আসলে এগুলি ভারতের একটি বিশেষ নিজস্ব রূপ ধারণ করিয়াছিল। খোরাসাণের ইরাণী স্থাপত্যের ছবিতে খিলান ও মিনারগুলি দেখিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়।

গুজরাটে অনেকগুলি মুঘল কীর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ আহমাদাবাদে। মালবের (লাল-ওয়ায়) মাণ্ডুর প্রাচীন কীর্ত্তি দর্শনীয়। এগুলি গুজরাটের সুলতান আহমদ সাহের আমলে ১৪১১ হইতে ১৪৪৩ খৃষ্টাব্দে তৈয়ারী হইয়াছিল। আহমদ সাহের মসজিদে প্রাচীন ভারতের স্থাপত্য রীতির পরিচয় বেশ পাওয়া যায়।



গোল গম্বুজ—মুহম্মদ আবিলশাহের সমাধি—বীজাপুর

সেখানকার মহাদিজ খাঁর তৈয়ারী একটি স্থাপত্যে প্রাচীন ভারতের ছায়া খুব সুস্পষ্ট ভাবে আছে। আবুতুরাজের কবরের হিন্দু বা বৌদ্ধ মন্দিরের মত থামগুলি দেখিবার জিনিষ।

দাক্ষিণাত্য প্রদেশে বীজাপুরে আদিল-শাহের কবরটি বেশ মাপ ও প্রমাণের সঙ্গে সুঠাম ভাবে গঠিত। ইহার গম্বুজটি পৃথিবীর মধ্যে রোমের সেন্টপিটাসের পরেই উল্লেখ-যোগ্য। এত বড় গম্বুজ আর কোথাও কোন দেশের স্থাপত্যে পৃথিবীতে আজ পর্য্যন্তও তৈয়ারী হয় নাই। সকল দেশের স্থপতির কাছেই এটি একটি বিস্ময়কর ব্যাপার। ইহার গঠন প্রণালীর মধ্যে এমন একটি বিশেষত্ব আছে যে, ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কালে তৈয়ারী হইলেও এখন পর্য্যন্ত অটুট ভাবে অবস্থান করিতেছে।

সাসেরামে সুর রাজ্যের প্রধান রাজা শের সাহের যে কবরটি আছে সেটি মুঘল সময়কার একটি অপূর্ব্ব স্থাপত্য কলা। গম্বুজটির সঙ্গে বাড়ীটির এমন সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া তৈয়ারী করা হইয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, এই স্থাপত্য-কলা যেন আপনা হইতেই একটি পুষ্পের মত বিকশিত হইয়া আছে। মোটামুটি এই স্থানের স্থাপত্যের ভাবটাতে যেন বৌদ্ধ স্তূপের গাম্ভীর্য্য অনুভূত হয়। তাজের মধ্যে যেমন হাওয়ার উপর গড়া হাল্কা ভাব আছে, এটিতেও আছে স্তূপের মত স্তম্ভিত ভাব।

বাবরের সময়ের স্থাপত্য কীর্ত্তির মধ্যে সাম্ভালে জুম্মামসজিদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। হুমায়ুন রাজ্য লইয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে শান্তিতে রাজ্য করা খুব কমই হইয়াছিল। নির্ব্বা-সনেই বেশীকাল তাঁহার কাটিয়া গিয়াছিল। তাই উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্ত্তি তাঁহার সময়ের কিছুই নাই। তাঁহার কবরটি তাঁহার বেগম সাহেবা তৈয়ারী করিয়াছিলেন, আকবরের আমলে। তারপরেই আকবরের যুগ।

আকবর তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে (১৫৫৬—১৬০৪) নানান প্রাসাদ, দুর্গ, মসজিদ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। আকবর অতিশয় স্থাপত্যানুরাগী ছিলেন। উহা ছিল তাঁহার একটা নেশা। এমন কি, শোনা যায়, সম্রাট স্বয়ং রাজমজুরদের কাজ তদারক করিতেন। আকবর নিজে তদারক করিয়া ফতেপুর দুর্গ তৈয়ারী করিয়াছিলেন, এরূপ ছবি তাঁহারই



শের সাহের সমাধি

আমলের আঁকা প্রাচীন চিত্রে আমরা দেখিয়াছি। আকবর ঈশ্বরবিশ্বাসী ছিলেন ও সকল ধর্ম্মকে রক্ষা করাই রাজার প্রধান কর্ত্তব্য বলিয়া মানিতেন। তিনি নিজে একবর্ণ লিখিতে পড়িতে না জানিলেও নানা শাস্ত্র বিষয়ে অভিজ্ঞ পণ্ডিত রাখিয়া ভারতের প্রাচীন শাস্ত্র ও শিল্প বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহারই ফলে ফতেপুর সিক্রীর স্থাপত্য কলা ভারতের একটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থাপত্য কীর্ত্তিরূপে পরিচিত হইয়া আছে। পৃথিবীর নানাদেশে 'আত্মভক্ষ্যধনুগুণ' রাজপ্রাসাদ অনেক আছে

আকবরের স্থাপত্যে হিন্দু প্রভাবই বেশী দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের মনে হয় যে, আকবর ভারতবর্ষকে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদের চেয়ে নিজেদের দেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহারই ফলে আকবরের ফতেপুরের কীর্ত্তিগুলির মধ্যে ভারতের শিল্পকলার পূর্ণবিকাশ হইয়াছিল।

ভারতের স্থাপত্য কলার বিষয় বলিতে গেলে ফতেপুরের কীর্ত্তির কথা না বলিলে তাহা অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। প্রবাদ আছে, আকবর মাঝে মাঝে নির্জ্জনেঈশ্বর চিন্তা করিবার জন্য ঘোড়ায় চড়িয়া আগ্রার কেল্লা হইতে একাকী বহুদূরে চলিয়া যাইতেন। একবার তিনি ফতেপুর অঞ্চলে ঘোড়ায় চড়িয়া নির্জ্জনে উপাসনা করিতে গিয়াছিলেন তাঁহার ঘোড়াটি ছাড়া পাইয়া তাঁহাকে সেস্থানে রাখিয়া কোথায় যেন অদৃশ্য হইয়া গেল! উপাসনা শেষ হইলে পর আকবর দেখিলেন যে, তাঁহার পাশেই তাঁহার প্রিয় অশ্ব আসিয়া দাঁড়াইয়া আছে। এই ফতেপুরে সে সময়ে সলিম চিস্তি নামক এক ফকির থাকিতেন। আকবর তাঁহার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠেন এবং অনেকের অমতে তাঁহার আদেশেই তিনি এই স্থানে নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন এবং উহার নাম দেন ফতেপুর সিক্রি।

১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে এস্থানের বাড়ী-ঘর তৈয়ারী হইতে আরম্ভ হয় এবং ১৫ বৎসরে এই

বটে কিন্তু সেগুলি দেখিলেই 'অ-বুনেদী' বলিয়া মনে হয়। মনে হয় যেন রাজৈশ্বর্য্য দেখাইবার অন্য কোন উপায় না পাইয়া অসম্ভব রকমের মত বড় বড় কামরা এবং সেগুলি নানা অনর্থক গিল্‌টি-করা লতা-পাতার নক্সায় ভরিয়া দিয়াছে। ফতেপুরের আকবরের প্রাসাদ ঠিক্ তার বিপরীত ভাব মনে আনিয়া দেয়। মনে হয়, বুঝি



বুলান্দ্ দর্‌ওয়াজা—ফতেপুর সিক্রি

এইমাত্র প্রাসাদটি ত্যাগ করিয়া লোকজন সব কোথায় চলিয়া গিয়াছে। তাহাদের চলিয়া যাইবার পায়ের শব্দ বুঝি এখনও শোনা যায়।

বাসোপযোগী করিয়া অথচ স্থাপত্য কলার মাপ প্রমাণ ও ভঙ্গীতে সুসংযত রাখিয়া এরূপ রাজপ্রাসাদ কোন দেশের কোন রাজা কোথাও করিয়াছেন কি না, জানি না।

প্রাসাদগুলি ফতেপুরে শেষ হয়। এই প্রাসাদের তোরণদ্বার বুলান্দ দরওয়াজার মত উঁচু। এইরূপ উৎকৃষ্ট স্থাপত্যের উদাহরণ ভারতবর্ষ কেন পৃথিবীর অন্য কোথাও আছে কি না, তাহাও সন্দেহস্থল। দিল্লী ও আগ্রার প্রসাদে দেওয়ানী আম ও দেওয়ানী খাস প্রভৃতি দরবার-গৃহ মর্ম্মর প্রস্তরের অপূর্ব্ব সৃষ্টি।

মুঘল রাজত্বের শেষ অবস্থায় স্থাপত্যের দুর্দ্দশার ইতিহাস বুঝিতে হইলে লক্ষ্ণৌ, ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলের মসজিদ প্রভৃতি দেখিতে হয়। লক্ষ্ণৌয়ের মচ্ছিভবন, ইমামবাড়ার বিশেষত্ব এই যে, এইটির মত একটি বিরাট খিলানের উপর ২০০ফুট হলঘর ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। বড়হল ঘর বড় জনতার জন্য তৈয়ারী হইয়া থাকে, তাই তাহাতে পাঠ বা বক্তৃতা-কালে যাহাতে সবাই বেশ স্পষ্টভাবে শুনিতে পায়, সেই ভাবে তৈয়ারী করিতে হয়। লক্ষ্ণৌয়ের এই ইমাম-বাড়ায় কথা বেশ স্পষ্ট শোনা যায়। লক্ষ্ণৌয়ের, যুক্তপ্রদেশের গভর্ণমেণ্টের ১৯২৫ সালের তৈয়ারী কাউন্সিল হলটি এ বিষয়ে ব্যর্থতার একটি উদাহরণ। ইউরোপীয় আধুনিক স্থাপত্য বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনেক উন্নত হইতেছে বটে কিন্তু এ সব বিষয়ে মুঘল স্থাপত্যে বা তার পূর্ব্বেকার ভারতীয় স্থাপত্যে কোনও দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না।

স্থাপত্য কলায় দেশ, কাল, উপযোগিতা প্রভৃতি না দেখিয়া কিছু করা যায় না। শীতপ্রধান, গ্রীষ্মপ্রধান, বর্ষাপ্রধান প্রভৃতি দেশের আবহাওয়া ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়া তবে স্থপতি ভিত্তি স্থাপন করিতে পারেন। আমাদের প্রাচীন শিল্পশাস্ত্রগুলিতে এ বিষয়ে বিশেষ বিধান দেওয়া আছে। সেগুলি পড়িলে ভারতের স্থাপত্যের অনেক তথ্য জানা যায়।

জাহাঙ্গীরের কীর্ত্তির মধ্যে আকবরের কবরটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটিকে মর্ম্মর প্রস্তর দিয়া নির্ম্মাণ করিতে ৪১১ লক্ষ ৪৮ হাজার ৮১৬ টাকা সাত আনা দুই পয়সা খরচ হইয়াছিল বলিয়া তখনকার বাদশাহ-নামা পুস্তকে লিখিত আছে। শাহজাহানের তাজের কীর্ত্তি জগতের একটি অমূল্য স্থাপত কলা। তাজ শুধু ভারতের গৌরব নয়, পৃথিবীর স্থাপত্য কলার মধ্যে গৌরব করিবার মত জিনিষ। মনে হয়, যেন শ্বেত পাথরে একটি স্বপ্নপুরী কে রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। এই তাজের উপর পৃথিবীর কত বড় বড় কবি যে কবিতা রচনা করিয়াছেন, তার ইয়ত্তা নাই এবং যুগে যুগে কত যে রচিত হইবে, তাই বা কে জানে। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আঁকা



সেকেন্দ্রা—আকবরের সমাধি

"তাজের স্বপ্ন" ও "শাহজাহানের অন্তিম শয্যা" এই দুইখানি ছবি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শাহজাহান তাহার নিজের জন্য কারিগরেরা যে এটিকে রচনা করিয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

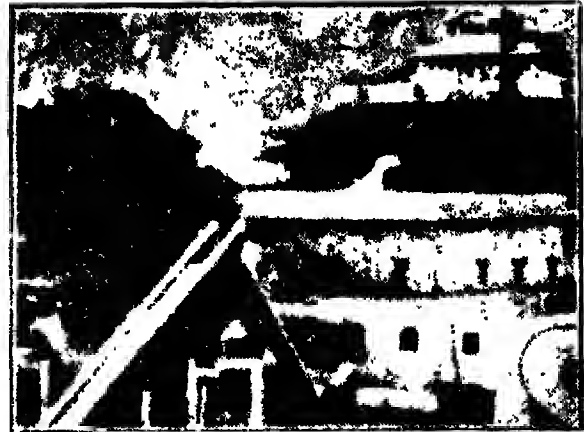
মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজীবেরর সময়ের



বেণীমাধবের ধ্বজা—কাশী

কালো কষ্টি পাথরের একটি কবর তাজের বিপরীত দিকে যমুনার অপর তীরে নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

আজ যে ভারতের কোন্ কারিগরের চিন্তা-প্রসূত, একথা কোন দেশের লোকেরই বলিতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যেক দেশের লোকের ইচ্ছা হয়, তার গৌরবের অংশী হইতে। তাজের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইউরোপীয়-দের মধ্যে নানারূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। কোন ইউরোপীয় তাজকে ইটালির, কেহ বা ইরাণী শিল্পীর কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মোট কথা, ভারত-সম্রাটের আদেশে ভারতীয় স্থাপত্য কীর্ত্তি—কাশীর, বেণীমাধবের ধ্বজা। কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার মত দুইটি

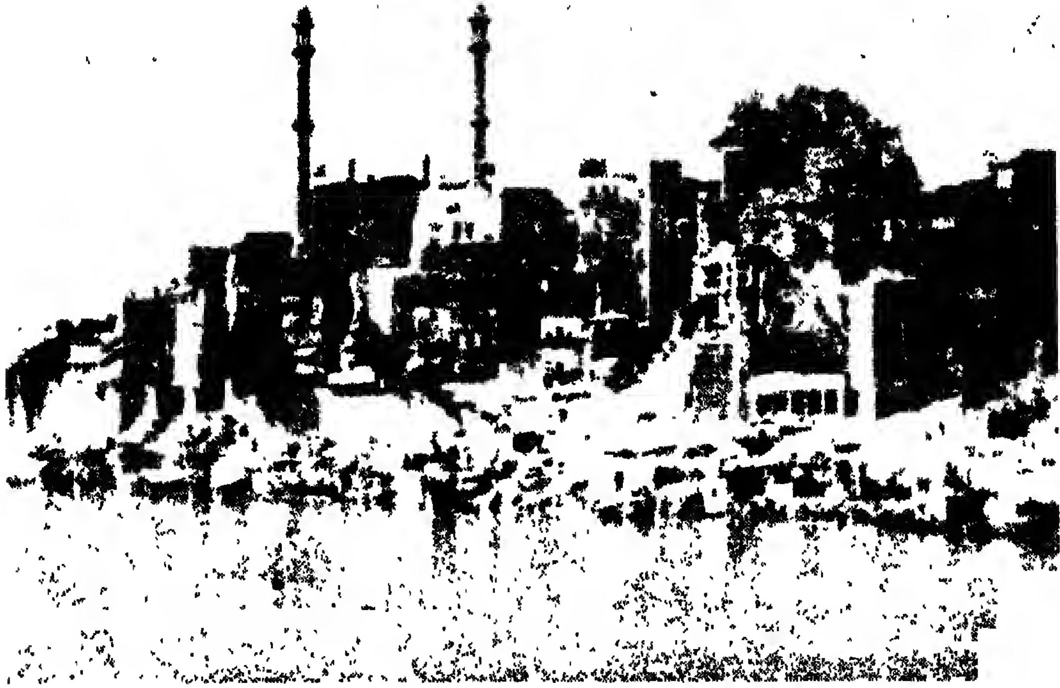


জয়পুরের জয়সিংহের প্রাসাদ ও যন্ত্র-মন্ত্র

মিনার সংযুক্ত আওরঙ্গজীবের তৈয়ারী



"তাজের স্বপ্ন" ও "শাহজাহানের অন্তিম শয্যা" এই দুইখানি ছবি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। শাহজাহান তাঁহার নিজের জন্য

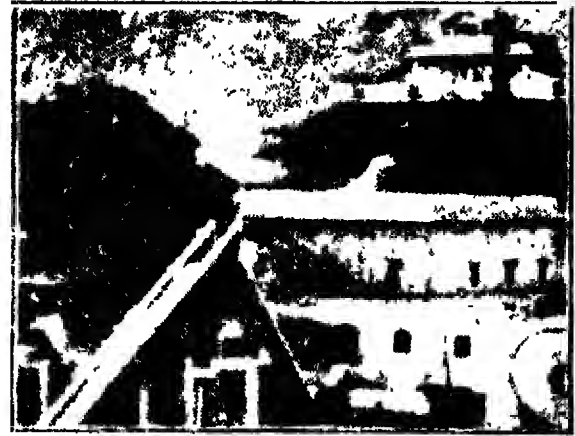


বেণীমাধবের ধ্বজা—কাশী

কালো কষ্টি পাথরের একটি কবর তাজের বিপরীত দিকে যমুনার অপর তীরে নির্ম্মাণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ হয় নাই।

আজ যে ভারতের কোন্ কারিগরের চিন্তা-প্রসূত, একথা কোন দেশের লোকেরই বলিতে ইচ্ছা হয় না। প্রত্যেক দেশের লোকের ইচ্ছা হয়, তার গৌরবের অংশী হইতে। তাজের নির্ম্মাণ সম্বন্ধে ইউরোপীয়-দের মধ্যে নানারূপ প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। কোন ইউরোপীয় তাজকে ইটালির, কেহ বা ইরাণী শিল্পীর কল্পনা-প্রসূত বলিয়া মনে করেন। কিন্তু মোট কথা, ভারত-সম্রাটের আদেশে ভারতীয় কারিগরেরা যে এটিকে রচনা করিয়াছিল, একথা বলাই বাহুল্য।

মুঘল বাদশাহ আওরঙ্গজীবেরর সময়ের স্থাপত্য কীর্ত্তি—কাশীর, বেণীমাধবের ধ্বজা। কাশীর বেণীমাধবের ধ্বজার মত দুইটি



জয়পুরের জয়সিংহের প্রাসাদ ও যন্ত্র-মন্ত্র

মিনার সংযুক্ত আওরঙ্গজীবের তৈয়ারী



বিশেষ ধরণের মসজিদ লাহোর, লক্ষ্মৌ প্রভৃতি অঞ্চলেও দেখিতে পাওয়া যায়। অযোধ্যার নবাব সাফ্‌দার জাঙ্গের কবর— যেটি দিল্লীতে আছে সেটি তাঁরই আমলের একটি কীর্ত্তি।

মুঘল আমলের হিন্দু রাজাদের কীর্ত্তির মধ্যে জয়পুরের স্থাপত্য ও সহর পত্তনের নক্সাটি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য। এটি জয়সিংহের আমলের তৈয়ারী। জয়সিংহ যখন বাঙ্গালা দেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন, তখন তাঁহারই এক বাঙ্গালী কর্ম্মচারী বিদ্যাধর ভট্টাচার্য্য এই রাজধানীর নক্সা শাস্ত্রানুযায়ী তৈয়ারী করিয়া দিয়াছিলেন। যদিও প্রাচীন পদ্ধতিতে এই সহর পত্তন করা হইয়াছিল কিন্তু আধুনিকতা-হিসাবে সুপ্রশস্ত রাজপথ এবং গলিপার্শ্বস্থ 'ফুটপাথ' তাহাতে বিরাজ করিতেছে। সারা সহরটিই গোলাপী রঙের, মনে হয় যেন চিরযৌবনা পুরীটি গোলাপী ওড়না পরিয়া সর্ব্বদা সাজিয়া-গুজিয়া রহিয়াছে। জয়পুর সহর ছয়টী সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া নির্ম্মিত হইয়াছে।



জয়পুর অম্বর প্রাসাদের জগৎ শরণের মন্দিরের একটি ব্রাকেট

প্রত্যেক ভাগের দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। রাজপথগুলি অতিশয় প্রশস্ত এবং সেই সুপ্রশস্ত রাজপথগুলির উভয় পার্শ্বে রক্তবর্ণের কৃত্রিম প্রস্তরে নির্ম্মিত সৌধাবলী দর্শকগণের বিস্ময় উৎপাদন করে। সেই সময়ে নির্ম্মিত অট্টালিকাগুলির বহির্ভাগ দেখিতে প্রায় একরূপ ছিল। জয়সিংহ জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনুশীলন করিতেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দিল্লী, জয়পুর উজ্জয়িনীর নানা প্রকারের যন্ত্র-মন্ত্রের স্থাপত্য চিহ্ন এখনো অটুট রহিয়াছে। কাশীর মানমন্দির ইনিই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা ভিন্ন তিনি কল্পদ্রুম ও সম্রাট নামক দুইখানি জ্যোতিষের গ্রন্থে গ্রহগণের গতি সম্বন্ধে সবিশেষ পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ঐ সকল স্থানের মানমন্দির তিনি

মুঘল সম্রাট্ মুহম্মদ শাহের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈয়ারী করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।



জয়পুরের যন্ত্র-মন্ত্রের ছবি

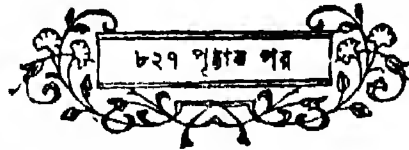
আজমীর, যোধপুর, মিবার প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যে এখনও প্রাচীন কালের ভাবধারা দেখিতে পাওয়া যায়। নতুবা আধুনিক সহরগুলিতে ব্যবসাদারদের কার্য্যকরী (কেজো) স্থাপত্যে ভারতের শিল্প কলার ঐতিহ্যকে ব্যর্থ করিয়া তুলিতেছে। তবে এখন বাঙ্গলাদেশে কলিকাতা ও বোম্বাই অঞ্চলের দেশীয় স্থাপত্য কলার স্থাপনার উদ্যোগ হইতেছে, যদিও বাঙ্গালায় যে চেষ্টাটা হইতেছে তাহার ভিতর প্রাচীন স্থাপত্যে অনেক কিছু থাকিতে পারে, তবু আশা করা যায় যে, হামা দিতে দিতে এক দিন এই শিশু-স্থাপত্য দাঁড়াইয়া উঠিতে পারিবে এবং ভবিষ্যতে একটা সচল স্থাপত্য কলা দেশের বুকে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া শিল্পকলার ইতিহাসে এক আলোকময় নব যুগের সূচনা করিবে।





অচিন দেশের পুরাণ

(যুক্তাক্ষরবর্জ্জিত ভাষায়)



তোমাদের যে দেশের কথা বলচি, সে দেশ ছিল কি না, তা' কেউই জানে না। তাই সেই অচিন দেশটির নাম আমি দিলুম জিঙলা মুলুক। এখন এই দেশের লোকেরা ছিল কি না, যখন জানা নেই, তখন ধরে নেওয়া যাক্ যে তাদের বলা হোত জিঙ লালুলু। আর তারা বাস করত অতিশয় আদিম কালে এই পৃথিবীতে, যে-কালের খবর ইতিহাসেও মেলে না। সেই অতি আদিম জিঙলা-লুলুরা ছিল খুবই জঙ্গী। কাঁচা মাংস খেতো তারা। এমন কি, বুড়ো হয়ে গেলে তাদের নিজের বাপ-পিতামহকেই মেরে খেয়ে ফেলবার লোভ সামলাতে তারা পারত না। তারা এক সিমিঙবোঙাকে মান্‌তো, আর তার তিরিশ কোটি ভূত পেতনী চেলা পল্‌টনের তারা উপাসনা করত। যদি ঘরে কারু অসুখ হোতো তো তারা সেই সব উপদেবতার নামে মানৎ করত, মুরগী বলি দিত। এমনকি, মাঝে মাঝে মানুষ বলি দিতেও তারা ছাড়তো না। এই ভাবে তাদের জুলুমে পৃথিবীতে পাপের বোঝা বাড়তে লাগল। তাদের উপর দেবতারা গেলেন ভীষণ চোটে! পৃথিবীর এই মানুষদের পাপের ঝাঁজে আকাশে গোলোকপুরীতে সিমিঙবোঙার সিংহাসন উঠল নোড়ে! সিমিঙবোঙা তখন তাঁর দরবারে অহিঙফাঁক ও সিসিমাসি তাঁর দুই ভাইকে তলব করলেন। তাঁরা দরবারে হাজির হতেই তাঁদের বল্‌লেন, দেখ অহিঙফাঁক, পৃথিবী তো জিঙলালুলুরা একেবারে নয়ছয় ক'রে ছারেখারে দিতে বসেচে—পৃথিবী তো সবে এই সুরু হ'ল, খুনি এরা সেই শেষের ভয়ানক দিনটাকে টেনে আনতে চায়! তোমরা ভাই এখন আমায় কি করতে বল? আমি ত কিছুই ভেবে কূল-কিনারা করতে পারচি না! তখন তাঁরা দুভাই বল্‌লেন আপনার হুকুম হলেই আমরা দুজন আকাশ ছেড়ে মাটিতে নেবে যাই আর দেখি কি বিহিত একটা করতে পারি। সিমিঙবোঙা তখন তাঁর গোলোক-পুরীর দরবারের সবাইকার মত নিলেন। তাঁর দরবারের নারা, হারা, চারা, দাঁড়া ছোটবড় সব রকমের রঙবেরঙের দেবতারাই তাতে সায় দিলেন।

এদিকে বহু যুগ থেকে জিঙলালুলুদের দেশে একটা কথা সকলেই শুনে আসচে যে, তাদের দেশে নাকি সিমিঙবোঙার ভাই অহিঙফাঁক আর সিসিমাসি দুই দানব অবতার কোনো সময় কোন দুই যমকের পেট চিরে বের হবেন—আর সেই দিনই নামি জগৎ ছারেখারে যাবে। সিমিঙবোঙার ভায়েরা একদিন শুভদিন দেখে হিড়িঙাপড়িঙ আর হুকাহুসা যমক দুভায়ের পেট চিরে দেখা দিলেন। সেদিন খুব ঝড় জল,—ঘন ঘন বাজ পড়তে লাগল, যেন পৃথিবী রসাতলে যাবে, এম্‌নি ভাব। জিঘলালুলুদের মধ্যে বুড়ো বুড়ো যাঁরা তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, হয়ত বা দানব

অবতার ত্নজন ধরায় নেবে এসেচেন, তাঁদের মুলুকে কোথাও-না-কোথাও। তাঁরা খোঁজ করতে বেরোলেন লাঠি সোঁটা ঢাল তলোয়ার নিয়ে—তাঁদের ত্নজনকেমেরে শেষ করতে। পুরোণো লোকেরা বল্‌লে, "যেখানে যত যমক মেয়ে-পুরুষ আছে কাউকেও ছাড়বে না—তাদের বাড়ী চড়াও কর, আর ঐ যে সিঁদুরে মেঘের টুকরোটা দেখা যাচ্চে পুব কোণে, চলতে চলতে এটি যে বাড়ীর মাথার উপরে গিয়ে লেগে থাকবে, তোমরা তাদের ত্নজনকে সেখানে পাবেই পাবে। সবাই মিলে তারা দেশের যেখানে যত যমক ছিল, তাদের তো উৎখেৎ করে মারলে! অবশেষে তিনদিন খোঁজের পর তারা দেখলে পাহাড়তলীতে হিড়িঙপিড়িঙ, হুকাহুসা



যমক দুই ভাই·· পেট চিরে মরে পড়ে আছে

যমক ভায়েদের ঘরের মাথার উপর সিঁদুরে মেঘের টুকরোটা গিয়ে লেগে রইল। জিঙলালুলুরা তখন তাদের ভিটেতে চড়াও হ'ল। ঢুকে দেখে সব শেষ! যমক দুই ভাই দাওয়ার উপর পেট চিরে মরে পড়ে আছে! ঘরে আর কেউই নেই! আসলে হয়েচে কি—এরই ভিতর এরা আসতে না-আসতেই এক ঈগলপাখী সিমিঙবোঙার ভাই ত্নটিকে, পায়ের দুই থাবায় ছোঁ মেরে উঠিয়ে নিয়ে তার পাহাড়ের গায়ে গুহার বাসয় নিয়ে গেছে। জিঙলালুলুরা আর কি করে! শেষকালে হতাশ হয়ে যে-যার ঘরে ফিরে গেল।

২

মাসের পর মাস, বছরের পর বছর যায়। সে দেশের লোকেরা কেউ কেউ ধরে নিলে যে, হিড়িঙ-পিড়িঙ, হুকাহুসা যমক ভায়েদের পেট চিরে সিমিঙবোঙার দুই ভাই এসেচেন, আবার কেউ কেউ শুনে হেসে উড়িয়ে দিলে। এমনি ক'রে দুটো দল হয়ে গেল তাদের ভিতর। যারা অহিঙফাঁক ও সিসিমাসিকে মান্‌তে লাগ্‌ল তারা হ'ল অহিঙসিসের দল, আর যারা তাদের মান্‌লে না অহিঙসিসেরা তাদের অবুঝের দল বলে উড়িয়ে দিলে।

এখন একদিন গাঁয়ের সবচেয়ে একটি বুড়ো লোক—তাঁর নাম ছিল হিঙোহোঙা, সিমিঙবোঙার কাছে পুজো দেবেন মনে করলেন। সিমিঙবোঙার পূজোতে তাঁদের হয় মানুষ, নয়ত মুরগী বলি দিতে হয়। তিনি পাহাড়ের উপরে চোড়ে ভাবলেন সিমিঙবোঙার পুজো দেবেনপাহাড়ের উপর—যাতে খুব উচুতে উঠ্‌লে তিনি আকাশের খুব কাছাকাছি হ'তে পারবেন, আর তাঁর কথা সিমিঙবোঙা তাহলে সহজেই শুনতে পাবেন। তাঁদের তাছাড়া একটা ধারণা ছিল যে, তাঁদের দেবতা সিমিঙবোঙা কানে কিছু কম শোনেন, তাই তাঁরা পুজো করবার আগে খুব ঢোল পিটিয়ে দেবতাকে সজাগ ক'রে তুল্‌তেন। যাই হোক, বুড়োটি পাহাড়ে চড়তে চড়তে পথে পদে পদে খানা খাল অনেক বাঁধা পেতে লাগলেন। তাই তিনি ভাবলেন, মাঝপথে কিছুকাল জিরিয়ে নেবেন।

একটা পাথরের উপর জিরোতে গিয়ে দেখেন' নিকটেই একটা গুহার ভিতর ঈগলপাখীর বাসায় দুটি চমৎকার ছেলে খেলা করচে। আর তাঁদের মাথার উপরে দিনের বেলায় দুটি তারা চক্‌-চক করচে। তিনি তাঁদের দেখে মনে মনে বেজায় ভয়ও পেলেন, আবার তাঁর ভরসাও হ'ল এই ভেবে যে,হয়ত তাঁদের অহিঙসিসের দুজন দেবতার তিনি আজ দেখা পেলেন ভেবে; ছেলে দুটির যেমন রঙ্‌ তেমনি চেহারা! মাথায় বড় বড় কোঁকড়া কোঁকড়া চুল। পরণে বাকলের জামা, হাতে তীর-ধনুক। তাঁদের কাছে যেই গেলেন অমনি তাঁরা উভয়ে দাঁড়িয়ে উঠে

বসবার পাতার তৈরী আসন দিলেন। তাঁকে পেয়ে ছেলে দুটি খুব খুসী হলেন, অনেক কথা বলতে লাগলেন। তারপর বড় বড় ভাল ভাল বিষয় নিয়ে অনেক আলাপে বেশ জমে উঠল। বুড়ো হিঙোচোঙা তাঁদের কথা শুনে খুবই অবাক হয়ে গেলেন, আর তাঁদের অনুরোধ করলেন, তাঁর বাড়ীতে গিয়ে বাস করতে। তখন ছেলে দুটি বুড়োকে ঈগলের ডিম দুটি দেখিয়ে বললেন যে, ঈগল পাখী যখন খাবারের খোঁজে উড়ে চলে যায় তখন তাদের উপর সেগুলির পাহারার ভার পড়ে। ছানা দুটি বের হবার পর তবে তারা অন্য কোথাও যেতে পারবে। তাঁরা ঈগলের



ঈগল পাখীর বাসায় দুটি ছেলে খেলা করচে

কাছে এইরূপ কথা দিয়েচেন। তাছাড়া ঈগল তাদের মানুষ করেচে আর এত ভালবাসে যে, নিজের দুটি ছানা ডিম ফুটে না বের হ'ল তাদের দুজনকে সে ছেড়ে থাকতে পারবে না।

৩

ডিম ফুটে তার দুটি ছানা বের হতেই ঈগল পাখী তাদের দুজনকে দিলে ছেড়ে। অহিঙফাঁক ও সিসিমাসি তখন বেশ বড়-সড় হয়ে উঠেচেন। একদিন ঈগল পাখীর কাছে অনেক ক'রে বিদায় নিয়ে তাঁরা পাহাড়-টাহাড় পার হ'য়ে একেবারে সটান জিঙলা-মুলুকে এসে পড়লেন। তাঁরা গাঁয়ে ঢোকবার পথেই কুয়োর ধারে দেখলেন একটি লোক অসুখে ভুগচে—প্রায় মর-মর তার হাল, আর তার গায়ে মাছি ভন্ ভন্ করচে। তাঁরা কাছে যেতেই লোকটি কাতর স্বরে তাঁদের কাছে জল চাইলে। তাঁদের কাছে ঘটি-দড়ি কিছুই ছিল না। তবে দু জনের মাথায় ছিল বাকলের তৈরী পাগ্ড়ী, তাই খুলে তাঁরা গেরো বেঁধে কুয়োয় তার একটা খুঁট ডুবিয়ে নিলেন। পাগড়ীর ভিজে খুঁটের জলটা নিঙড়ে লোকটির মুখে দিতেই সে



সে চোখ চেয়ে উঠে বসল

চোখ চেয়ে উঠে বসল। লোকটি কাঁপতে কাঁপতে উঠে বসে অবাক্ হয়ে তাঁদের দুজনের দিকে তাকিয়ে রইল। তাঁরাও দুজনে দেখলেন যে, তাঁদের হাতের জল খেয়ে মানুষটা গেল বেঁচে। পাড়ার মেয়েরা এসেছিল জল-তুলতে, তারাও সেই আজব ঘটনা দেখে গিয়ে গাঁয়ের সবাইকার কাছে রটিয়ে দিলে। তখন দলে দলে লোক আসতে লাগল। এর ভিতর অহিঙসিসের দলেরা দল পাকিয়ে বলাবলি করতে লাগল, যদি এঁরাই সেই দেবতা হন ত এঁদের

অবুঝদের হাত থেকে ত বাঁচাতে হবে? এখন কি উপায় করা যায়? কেননা, তাদের দেশের মাথা যিনি সেই মোড়ল তিনি রইলেন অবুঝদের দলে।

এমন সময় সেখানে বুড়ো হিঙোহোঙা এসে পড়লেন। তিনি দেবতাদের ঈগলের বাসায় সব প্রথম দেখেছিলেন। তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বললেন যে, তিনি তাদের দেবতা দুজনকে বাঁচাবার উপায় ঠিক্ করবেন; তাদের সে বিষয়ে ভাববার কোনো দরকার নেই। তিনি তখন নিজে গেলেন অহিঙফাঁক আর সিসিমাসির কাছে। তাঁদের বল্লেন, "যদি বাঁচতে চান অবুঝদের হাত থেকে, তো কোথাও লুকিয়ে স'রে পড়ুন আপনারা। আমি এখন না হয় কিছুদিন আপনাদের আমার বাসায় লুকিয়ে রাখতে পারি। বরং গোপনে কখন সখন পথে ঘাটে বের হবেন। তাতে কিছু ভয় থাকবে না।

সিসিমাসি তা' শুনে বল্লেন—

"আমরা হক্ যা' তাই করি।
তাতে যদি যাই মরি।
তবু তায় নাহি ডরি॥
হক্ হ'লে ঠকে না।
হক্ কথা ঢাকে না॥"

বুড়ো হিঙোহোঙা অনেক ক'রে তাঁদের দুজনকে বোঝালেন। তখন অহিঙফাঁক আবার বল্লেন—

'হক্কে হঠাতে পারে হিম্মৎ হেন।
দুনিয়ায় কারো নাই এটা ঠিক জেনো॥
ছাই চাপা আগুনে ঢেকে বসে থাক।
পড়তে যে হবে তাতে, মনে জেনে রাখ॥"

তখন বেচারী বুড়ো কাজে কাজেই তাঁদের নিজের বাড়ীতে রাখবার যোগাড় করলেন। তাঁরাও তাতে রাজী হলেন।

৪

কিছুদিন বেশ আরামে বুড়ো হিঙোহোঙার বাড়ীতে অহিঙফাঁক আর সিসিমাসি বাস করবার পর দলে দলে কাতারে কাতারে অবুঝদের দল লাঠি সোঁটা তীর ধনুক নিয়ে বেরোল তাঁদের দুজনকে বধ করতে। বুড়ো হিঙোহোঙার বাড়ীতে যে তাঁরা দুজন ডেরা গেড়েচেন, সে খবর অবুঝদের জানতে আর বাকি রইল না। কেননা, তার বাড়ীতে দলে দলে অহিঙসিসের দল তাদের গুরু দু'জনের মুখে উপদেশ শুনতে জমায়েৎ হোতো। সে খবর অবুঝেরা সবাই জেনে গিয়েছিল। বুড়ো দেখলেন মহা বিপদ! কি ক'রে দেবতা সিমিঙবোঙার ভাই দুটিকে অবুঝদের হাত থেকে বাঁচাবেন। অহিঙসিসেবা বুড়োর মনের ভাব বুঝতে পারলেন তাঁকে কিছু না বলেই খুব সাহস ক'রে অবুঝরা তাঁদের মারতে সেখানে যেই এল, অমনি তাদের সামনে এগিয়ে গিয়ে তাঁরা দাঁড়ালেন, আর মুখে কেবল আওড়াতে লাগলেন:—

"মার দিয়ে কি মারতে পার
সত্তি যা তার আছে।
ছাইয়ের মাঝে আগুন শিখা
মরেও সে যে বাঁচে॥"

তীরের খোঁচা, শূলের খোঁচা, ও মা! সবই যে তাঁদের গায়ে তুলোর গাদার উপর পড়লে যেমন হয় বিঁধেও বিঁধলো না—ফস্‌কে প'ড়ে যেতে লাগল। তারা দিবারাত্র ধরে তিন দিন তাঁদের দুজনকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে একটুও আঘাত করতে পারলে না। তখন তারা হার মেনে মাথা হেঁট করে যে-যার ঘরে ফিরে গেল।

৫

অবুঝেরা দেখলে আর কোনো উপায়ই নেই, উপদেবতা দুটিকে নিধন করবার। অথচ দেখতে দেখতে অহিঙসিসের দল বেড়ে চলেচে। অনেক বড় বড় শেঠ ধনী সদাগর জমিদার তাদের দলে গিয়ে জুট্‌ল। তারা যখন তখন অহিঙসিসের দলের লোকেদের কাছে তাদের দেবতা দুজনের অলৌকিক নানা রকমের কাহিনী শুনতে লাগ্‌ল। তারা শুনলে যে, ঐ দুজন উপদেবতা নাকি আকাল হবে জেনে কি একটা শোলোক আউড়ে দিতেই জল এসে গেল। ধান আনাজপাতিতে দেশের খেত-খামার ভরে গেল। আবার নাকি কোনো একটা মড়ার গায়ে দুজনে হাত ঠেকাতেই সেটা নাকি বেঁচে গেল। এমনিতর অনেক আজ্‌গুবি কথা শুনতে লাগল। তারা অহিঙসিসের দলের কাছে যত এই সব আজগুবি কথা শোনে, ততই যায় চোটে। কি যে করবে তা' আর ভেবে পায় না। অবশেষে মৎলব করলে যে, তাদের ভিতর একজন অবুঝ অহিঙসিসের দলে গিয়ে যোগ দেবে; তার পর কিছুদিন পরে সুযোগ বুঝে উপদেবতা দুজনকে বাড়ীতে খেতে ডাকবে। আর সেই সুযোগে তাদের মাটিতে পুঁতে ফেল্‌বে।

যা ভাবা তাই করা। অবুঝ হিমাঙদেড়ো গেল বুড়ো হিঙোহোঙার বাড়ী, আর গেল তিনজন তার

চেলা অহিঙসিসের দলে ঢুকতে। বুড়ো বড়ই সাদাসিধে মানুষ, আসল মৎলব যে কি, তা, কিছুই বুঝতে পারলেন না। তিনি তাদের সবাইকে দেব-গুরু দুজনের কাছে সোজাসুজি নিয়ে গেলেন। অহিঙফাঁক আর সিসিমাসি দুজনে মিলে তাদের সবাইএর মাথায় হাত রেখে আশীষ বাণী দিলেন আর মাটীর হাঁড়ির ভিতর থেকে সিঁদুরে মাটী বের ক'রে তিলক কেটে তাদের নিজেদের দলের জাতে আনলেন। আর মুখে আওড়াতে লাগলেন—

"দুঃখে সুখে সমান ভেবে
চল্‌বি এই ভবে,
জান্‌বি, যে তুই যাবার কালে
সাথে সে না রবে।"

তা ছাড়া অহিঙফাঁক অনেক ভাল ভাল সৎ উপদেশ তাদের সবাইকে দিলেন। আর দুঃখ ক'রে বল্‌লেন, অবুঝের দল বুঝচে না যে আমরা দুজন হলেম ভগবান সিমিঙবোঙার দুই সহোদর; আমাদের মানলে সিমিঙবোঙার দরবারে সটান যেতে পারবে, পৃথিবীর যখন শেষ দিন আসবে। চেলা হিঙোহোঙাকে তাদের আরো ভাল ক'রে তাঁরা দুজনে বোঝাতে বলায় বুড়ো আরো ভাল ক'রে অনেক বড় বড় কথা সহজ ক'রে তাদের বুঝিয়ে দিলেন। বল্‌লেন, "যেমন সদাগরকে খুসী করতে হ'লে তার চোপদারকে আগে খুসী করতে হয়, এও তেমনি এঁদের দুজনকে খুসী করলেই এঁদের বড় ভাই সিমিঙবোঙাও তাদের উপর খুব খুসী হবেন। আর কোনই ভাবনা তাদের থাকবে না।

হিমাঙদেড়ো আর চেলা তিনজন তিলক কেটে দিনকতক বুড়োর বাড়ী দেবগুরুর হিতোপদেশ শুনতে রোজ রোজ যেতে লাগ্‌ল। দেখলে, গুরু দুজনের আর বুড়োর তাদের উপর কোনো ধোঁকা নেই। তখন এক দিন তারা দেবগুরুদের আর বুড়োকে তাদের বাড়ীতে খেতে যেতে অনুরোধ করলে। এদিকে হিমাঙদেড়োর বাড়ীতে খাবার ঘরের মেঝের মাঝখানে দুটো বেশ বড় বড় খাল কেটে রাখলে। আর তার উপরে একটা মোটা চাদর বিছিয়ে দিলে। তার চারপাশে পাত পেতে রাখলে খাবারের। খাবারের খুব বেশী বেশী আয়োজন রাখলে—যাতে চাখতে চাখতে বেশ রাত হয়ে যায়। যথাসময়ে গুরু দুটিকে নিয়ে বুড়ো হিঙোহোঙা এলেন হিমাঙদেড়োর বাড়ীতে খেতে। হিমাঙদেড়ো আর তার তিন চেলায় মিলে খুব খাতির করে তাদের খেতে বসালে সেই কাপড়ে ঢাকা খালের চারপাশে। বুড়ো খেতে বসে দেখলেন যে, তাঁরা সাতজন গুণতিতে খেতে বসেচেন, আর মাথার উপর একটা টিক্‌টিকি দোরের উপর মাথা নাড়চে আর টিক্‌টিক্ করচে। এইসব দেখে তাঁর ত গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল, ভাল বোধ হ'ল না। মনের ভাব মনেই চেপে গেলেন, গুরুদেব দুজনকে আর জানালেন না। এদিকে খাওয়া দাওয়া শেষ হ'তে বেশ একটু রাত হয়ে গেল। তখন হিমাঙদেড়ো



তাঁরা সাতজন গুণতিতে খেতে বসেছেন

একটা কোনো ছুতো ক'রে বুড়ো হিঙোহোঙাকে ঘরের বাইরে দাওয়ায় ডেকে এনে বসালে আর পান-তামাক খেতে দিলে। এদিকে এরই ভিতর কাজ শেষ করলে চেলা তিন জন। টিপ্ করে অহিঙফাঁক আর সিসিমাসি দুজনকে ঘরের মেঝের ভিতরকার খালে পুঁতে মাটি চাপা দিলে।

দাওয়ায় বসে বসে এদিকে শীতে বুড়ো কাঁপচেন আর সারারাত তামাক টানচেন, আর ভাবচেন যে, গুরু দুইজন বুঝি খাওয়া দাওয়া শেষ ক'রে মনের খুসীতে ঘরের ভিতরে বসে বসে তাস পাশা খেলচেন।

ভোর হোতেই তাঁর ভুল ভাঙল—বুঝলেন যে কি আসলে ঘটেচে তাঁদের দুজনের কপালে। তাড়াতাড়ি সেখান থেকে সরে পড়লেন নিজের বাড়ী। চেলারা সবাই এল তাঁর কাছে। সব ঘটনা শুনে ত সবাই হা-হুতাশ করতে লাগল। এক দল ত মহা ক্ষেপে গল, বললে এখুনি আমরা হিমাঙদেড়োর বাড়ী লুটবো, ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে বেশ ক'রে সাজা দিয়ে আসব। তখন বুড়ো হিঙোহোঙা বল্‌লেন—জান ত গুরুর আদেশ

> "মারলে বলে মারিস যদি
> মরবি যে রে তুই,
> ভালবাসায় মরবে যে রে
> লুটবে পড়ে ভুঁই।"

তখন তার কথা শুনে তারা সবাই চুপ ক'রে রইল—মনের রাগ মনেই চাপা দিলে। আর এদিকে অবুঝের দল আপদ ছটো গেছে জেনে নানারকম উৎকট বিকট উৎসব করতে লাগল দেশময়।

৬

একদিন বুড়ো হিঙোহোঙা কি একটা কাজে কোথাও যেতে যেতে পথে একটি বটগাছের ছায়া পেয়ে সেখানে জিরোবেন ভেবে বসে পড়লেন। গাছের তলায় বসে বসে নানান কথা ভাবচেন, বিশেষ ক'রে তাঁর দেবতা দুজনের কথা, এমন সময় দেখেন, অদূরে দুজন লোক একটা ঝোপের আড়ালে বসে কথা কাটাকাটি করচে একটা কি বিষয় নিয়ে। তাদের মধ্যে একজন বলচে "তারা মরে গেছে।" আর একজন বলচে "আলবাৎ মরেনি।" আবার অন্যটি বলচে "তুই কি ক'রে জান্‌লি সে মরেনি?" অপরটি বলচে "হাঁরে, আমি কাল রাত দুটোর সময় তাদের দুজনের কথা ঐ ঘরের মেঝের নীচে শুনতে পেয়েচি। তখন হিঙো-হোঙা ধীরে ধীরে তাদের মুখে একে একে তাঁর দেবতা দুজনের সব খবরই পেয়ে গেলেন। যারা ঝগড়া করছিল, তারা হল হিমাঙদেড়োর তিনটি চেলার মধ্যে দুজন—যারা অহিঙফাঁক ও সিসিমাসিকে খাবারের ঘরে মাটিতে পুতেছিল। বুড়ো বাড়ী ফিরে গিয়ে অহিঙসিসের দলের প্রধান চেলাদের সবাইকে ডেকে পাঠালেন। শেষে নানা কথার পর ঠিক হ'ল যে, অবুঝদের মোড়ল সিসিং-দেড়োর কাছে তারা সব কথা বলবে আর যদি তাদের দ। তা দুজনের মড়া দেহদুটিকে হিমাঙদেড়োর ঘরের মেঝে থেকে খুঁড়ে পাওয়া যায় তো তার সৎকারের ভার তারাই নেবে। অনেক ঝগড়াঝাঁটি কথা-কাটির পর অবুঝ দলের মোড়ল তাতে রাজি হল। হুকুম দিল, অবুঝ সেনাপতি নিজে যাবে সেই ঘর খোঁড়াতে আর অহিঙসিসের দল তাঁর সামনেই সৎকার করবে, কোনো জাঁকজমক করতে তারা দেবে না। মোড়ল সিসিংদেড়োই ছিল সে দেশের প্রবল লোক, তাই তারা তাতেই রাজী হয়ে গেল—বেশী কিছু আর গোল করতে সাহস করলে না।

তারপর সদলবলে অহিঙসিসের ও অবুঝদের দল সেনাপতি সমেত হাজির হল হিমাঙদেড়োর বাড়ীর



দুজন লোক একটা ঝোপের আড়ালে বসে কথা কাটাকাটি করচে

মেঝে খুঁড়তে। এ কি? কেঁচো খুঁড়তে যে সাপ বেরুল? মেঝে খুঁড়তেই অহিঙফাক আর সিসিমাসি দুজন টপ্‌ ক'রে মাটির ভিতর থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এলেন আর সবাইকে দুহাত তুলে আশীষ করলেন। এখন অবুঝদলের সেনাপতি বল্‌লে, যখন এঁরা জীবিত কবর থেকে বেরিয়েচেন তখন মোড়ল মশাইয়ের হুকুমমত এঁদের দেহের সৎকারই তোমরা করতে পার—এম্‌নি এঁদের ছেড়ে দিতে পারব না।

দু'দলের সে বিষয়ে অনেক বাদ-বিবাদ হবার পর ঠিক্ হ'ল যে, মোড়লের কাছে এঁদের দুজনকে নিয়ে যাওয়া হবে, তারপর বিচারে তিনি যা রায় দেবেন, তাঁদের নিয়ে তাই করা হবে।

মোড়লের কাছে দুজনকে আনা হোল। তাঁরা মোড়লকে অভিবাদন করলেন না বোলে মোড়ল মশাই গেলেন ভীষণ চোটে। অবুঝের দল ত মার মার কাট কাট ক'রে উঠ্‌ল! তখন অহিঙফাঁক আর সিসিমাসি বললেন, "দেখ মোড়ল, আমরা আকাশ ছেড়ে মাটীতে পা দিয়েছি তোমাদের পাপ ভার লাঘব করতে। আর তা ছাড়া পৃথিবীকে এমন আমরা এগিয়ে দিয়ে যেতে চাই যে, মানুষেরা দেবতার মত মগজ খাটিয়ে এমন কল-কারখানা সব বানাবে যে, দেবতাদেরও তাক্ লেগে যাবে। এমন কি, হাওয়াই জাহাজ তৈরী ক'রে আকাশে গোলোকপুরীর কাছা-কাছি তারা সশরীরে গোঁ গোঁ ক'রে ঘুরতে পারবে অবশ্য যদিও তারা গোলোকে পৌঁছুতে পারবে না। আমরা মানুষদের দেবতা সিমিঙবোঙার দুই সহোদর। তোমরা বোধ হয় জান না যে, তোমরা মানুষেরা যখন মরে যাও তখন তোমাদের পুড়িয়ে দেওয়ার পর তোমরা এক একটি গোলক হ'য়ে মাটীর ভিতর পৃথিবীর পেটের ভিতর চলে যাও। আর সেখানে সব সময়ই বাঁই বাঁই ক'রে চরখীর মত পাক দিতে থাক। তাই মাঝে মাঝে যখন এই কানা ভূত দেহগুলো ঠোকাঠুকি করে, তখনই ওঠে মাটী কেঁপে। আর যখন ধরার মানুষগুলো সব মরে যাবে, একটিও লোক কেউই আর বেঁচে থাকবে না—সেই পৃথিবীর শেষের দিনে মানুষের ভূতগোলাগুলো রকেটের মত ফেটে মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে তুবড়ীর মত চোঁ চাঁ ক'রে আকাশে একেবারে গোলোকপুরীতে গিয়ে পৌঁছবে। সেখানে তখন ভগবান সিমিঙবোঙা থাকবেন, আর আমরা তাঁর দুভাই দুপাশে গিয়ে বসবো তোমাদের বিচার করতে। যারা ভাল কাজ করচে তারা থাকবে আমাদের কাছে আকাশে, আর যারা খারাপ কাজ ক'রে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছিল তারা যাবে ঝপ্ ক'রে নীচে পড়ে একেবারে পাতালে তলিয়ে সটান নরকে। তাই আমরা বলচি যে, ভাল চাও তো সবাই অহিঙসিসের দলে এসে যোগ দাও, আর আমাদের দুজনকে মানো।

"মানলে পরে অহিঙসিসে
দুঃখ যাবে ঘুচে,
পাপ যা তুমি করেচ তা'
অমনি যাবে মুছে।
দেবতা দেবেন আকাশে ঠাঁই
পূজলে তাঁরে ভাই,
এর বেশী আর ধরার মাঝে
আর কি বল চাই?
অবুঝ যারা বোঝেনাকো
পুরাণে যা লেখে,
চোখ চেয়ে যে দেখেনাকো
ঘুমোয় থেকে থেকে।
তাই বলে সব দলাদলি
ঘুচিয়ে এস কাছে,
অহিঙসিসের দলে সবাই—
দেরী না হয় পাছে।
নইলে পরে নোঙর-ছেঁড়া
তরীর মত ভেসে
যেতেই হবে, জেনো মনে
কোথাও অবশেষে।"

অবুঝ মোড়ল সিসিংদেড়ো তো শুনে রেগেই লাল। চেলারা তার এই মারে তো সেই মারে! মোড়ল বল্লে "হা, যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা? ভগবানের নামে তোরা আবার কথা কোস? দাঁড়া দেখাই মজা তোদের?" তার সেনাপতিকে হুকুম দিলে "এদের দুজনকে পথের তেমাথায় যেখানে দাগী আসামীদের খুঁটোতে বেঁধে কাল কুকুরদের দিয়ে খাওয়ানো হয় সেইখানে এদেরও সেই বিধান দিলুম।" হুকুম পেয়েই অমনি সেনাপতি আর তার দলের লোকেরা তাঁদের দুজনের গলায় দড়ি বেঁধে হিড়-হিড় ক'রে টেনে নিয়ে চল্‌ল পথের তেমাথায়। অহিঙসিসের দল হায় হায় করতে লাগল! তারা সোজা পথ-ঘাট ছেড়ে দিয়ে কাদা খোঁচা বন আঘাটা দিয়ে অহিঙ-ফাঁক আর সিসিমাসি দুজনকে গলায় দড়ি দিয়ে টান্‌তে টান্‌তে নিয়ে চল্‌ল। সবাই দেখলে, তাঁরা বেশ হাসি মুখেই মরতে চলেচেন। যখন তাঁদের দুজনকে পথের তেমাথার উপর এনে ফেল্‌লে, তখন খুব জল ঝড় সুরু হয়ে গেল—যেন মহা অকাল পড়ে গেছে।

বড় বড় যমদূতের মত কালো কালো কুকুর তাঁদের উপর লেলিয়ে দেওয়া হ'ল তাঁদের খুঁটোয় বেঁধে রেখে। অহিঙসিসের দলে মহা কান্নাকাটি প'ড়ে গেল! অহিঙফাঁক তখন বুড়ো হিঙোহোঙাকে আর তাঁর

F. 3—12

দলের সবাইকে কাছে ডেকে বলে দিলেন যেন তারা না দুঃখ করে, তাঁরা পৃথিবীর লীলা শেষ ক'রে চল্‌লেন ব'লে। আর ব'লে দিলেন যে, যে লোকের চোখে পড়বে যে আকাশের গায়ে রামধনু বেয়ে একটি সিঁদুরে মেঘ নেমে এসে তাঁদের দুজনকে আকাশে উড়িয়ে নিয়ে চলচে, তিনিই হবেন তাঁদের আদি বা আসল চেলা, আর তারই হাতে তাঁদের দুজনের কাজের ভার পড়বে। তাছাড়া আর সবাইকে অনুরোধ করলেন যে তারা যেন কেউ একজন একটি মোটা কাছি দড়ি তাঁদের সামনে আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেন।

তাঁদের কথামত অহিংসিসের দলের একজন একটি মোটা কাছি দড়ি আকাশে ছুঁড়িতেই গেল সেটা আটকে। তারপরেই সবাই দেখলে তেমাথায় খুঁটোয় বাঁধা গুরু দুজন আর নেই। সবাই অবাক হ'য়ে হা ক'রে রইল। আর এদিকে বুড়ো হিঙোহোড়া দেখলেন যে, আকাশের উপর একটি চমৎকার রামধনুর মাঝখান বেয়ে একটি সিঁদুরে মেঘ নেমে এল, আর তারই উপর ভর দিয়ে তাঁদের দেবতা দুজন আকাশের উপর হাসতে হাসতে উঠে গেলেন।

বুড়ো হিঙোহোড়ার উপর অহিংসিসের দলের কাজের ভার পড়ল। তাদের দেবতা দুজনকে গলায় দড়ি দিয়ে টেনে তেমাথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল ব'লে অহিংসিসের দলেরাও একটা ক'রে দড়ি গলায় ঝোলাতো। হিমাড়দেড়োর বাড়ী যাওয়ার সময় সাত জন ছিল আর মাথার উপর টিকৃটিকি ছিল ব'লে এঁরাও সাতজন এক জায়গায় বসতেন না, আর টিকৃটিকি দেখলেই মেরে ফেলতেন। ঈগল পাখী দেবতা দুজনকে পালন করেছিলেন ব'লে ঈগলের পূজো করতেন, আর কালো কুকুর দেখলেই 'দেখ্‌মার' করতেন।

নার্সিসাস

(গ্রীক্‌পুরাণের গল্প)

সে আজ কতদিনের কথা। গ্রীস দেশে এক জন শিকারী ছিলেন—তাঁর নাম নার্সিসাস। তাঁর একটি পরমা সুন্দরী বোন ছিল। দুজনে সর্বদাই এক সঙ্গে থাকতেন, আর দুজনের চেহারায় এমন আশ্চর্য্য মিল ছিল যে, পাড়া প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত কে ভাই কে বোন অনেক সময় বুঝতে পারতো না। দুজনার সাজ পোষাক ছিল এক রকম আর দুজনারি সুন্দর মুখ দুখানি ঘিরে সোনালি রং-এর কোঁকড়ান গোছা গোছা চুল ঘিরে থাকত। নার্সিসাস বোনটিকে বড়ই ভালবাসিত, এবং খুব ভাল করে ধনুর্বিদ্যা শিখিয়েছিল। সারাদিন বনে বনে মৃগয়া করে দুজনার দিন আনন্দেই কাটিত।

এ পৃথিবীতে সুখের অন্তরালে মরণ তো সঙ্গে সঙ্গেই আছে। একদিন বোনটি মারা গেল। নার্সিসাস একাই পড়ে রইল। সে বিষণ্ণ মুখে চারিদিকে ঘুরে বেড়াত। বনের যে সব জায়গায় দুজনায় খেলত, বিশ্রাম করত, শিকারের সন্ধানে ফিরত, সেই সব জায়গায় ঘুরে বেড়াতে তার সব চেয়ে ভাল লাগত। এমনি করে সেই সব জায়গায় ঘুরে আপন মনকে বোঝাতে চাইত —বোনটি যেন সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

বোনের মৃত্যুর দুচার দিন পরেই নার্সিসাস একদিন একটি স্বচ্ছ জলাশয়ের কাছে গিয়েছিল পাড়ের উপর হাঁটু পেতে মুখ ঝুঁকিয়ে জল খাবে, এমন সময় আপন মুখের প্রতিবিম্বের উপর তার নজর পড়ল।



বনে বনে মৃগয়া করে দুজনার দিন কাটিত।

জীবনে এই সে প্রথম তার আপন মুখের ছায়া দেখলে। কাজেই সে বুঝতেই পারলে না, কার মুখ দেখছে। তার মনে হল ভগবান তার কাতর প্রার্থনায় তার বোনটিকে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

তাকে বুকে নেবার জন্যে, সে দুখানি ব্যাকুল হাত জলের উপর বাড়িয়া দিল। নাড়া পেয়ে জলে ঢেউ উঠল—মুখের ছায়া কোথায় মিলিয়ে গেল। তখন তার বড় ভয় হ'ল। ভাবলে বুঝি, জল হাত দিয়ে ছুঁয়েছে বলে, জল-দেবতা রাগ করে বোনটিকে কেড়ে নিয়ে গেলেন। তাই সে তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলে স্থির স্বচ্ছ জল আবার একখানি আয়নার মত হল, তখন নার্সিসাস সন্তর্পণে এগিয়ে এল, জোরে নিশ্বাস ফেলতেও তার ভরসা হচ্ছিল না। এবারে আবার সেই মুখের ছায়া দেখলে, সেই বাবরি ছাঁটা চুল, সোনালি রেশমের মত, কোঁকড়ান সুন্দর, মুখের চারিদিক ঘিরে রয়েছে। সেই দুটি ডাগর চোক, শান্ত দৃষ্টি—সুন্দররাঙা ঠোঁট, হ্রদের মধ্য হ'তে তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রয়েছে। নার্সিসাস মৃদু কোমল সুরে বোনের নাম ধরে ডাক দিলে। ভয় হয়, পাছে সরে যায়। জিজ্ঞাসা করলে, আমায় চিনতে পারছ কি? কথা কও মণি, আমি যে বড় একা। নার্সিসাস কথা কয়, ঠোঁট দুখানি নড়ে, ছায়াতেও ঠিক তেমনি দেখা। সে ভাবে, বোন তার কথার উত্তর দিচ্ছে, তবে সে এখন মৃত্যু-দেশের অতিথি। তাই তার কথার শব্দ শোনা যায় না। নার্সিসাস সেদিন সারারাত, তারপর সারাদিন ধরে সেই থানটিতে পড়ে রইল। খানিক ক্ষণ এক দৃষ্টে চেয়ে দেখে, বার বার আদর করে কথা কয়, কাকুতি মিনতি করে বলে, ফিরে এসো, ফিরে এসো। দিনের পর দিন অনাহারে অনিদ্রায় সেখানে হত্যা দিয়ে থেকে, ক্রমে সে এমন দুর্ব্বল হয়ে পড়ল যে, মুখ নুইয়ে জলের মধ্যে আর প্রতিবিম্ব দেখতে পায় না। রক্তশূন্য মুখ জলজ ফুলের মত একেবারে সাদা পাঙাশ হয়ে গেল। সোণালি চুলের রাশ চোখের উপর, শ্রীহীন অস্থিসার মুখের উপর শৈবালগুচ্ছের মত ঝুলে পড়ল, আর শ্রান্ত দেহে নার্সিসাস মাটীতে শুয়ে পড়ল, তখন স্বচ্ছ জলের মধ্যে সে মুখের ছায়া আর দেখা গেল না।



আপন মুখের প্রতিবিম্বের উপর তার নজর পড়ল

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সূর্য্যদেব অস্তাচল-চূড়ায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে একটিবার চারিদিকে ভাল করে দেখে নিলেন। গাছের মাথায় সোণার আলো ঝল-মল করে সমুদ্রের নীল জল ঘোর লাল হয়ে, আকাশে মেঘের সোপানগুলি সোনার পাতে ঘন মোড়া হল, তপনদেব তাঁর রাতের সঙ্গিনী ছায়া দেবীর মন্দিরে ধীরে ধীরে নেমে গেলেন। হ্রদের তটে নার্সিসাসের মৃত শরীর তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। তিনি তাঁকে একটি ফুলে পরিণত করে হ্রদের জলের মধ্যে ফুটিয়ে তুললেন। এই ফুলের নাম নার্সিসাস। আমাদের কুমুদ ফুলের মতই সাদা—তেমনি স্নিগ্ধ এর সৌরভ।

লরেল গাছের পাতা

ড্যাফনি (Daphne) বলে কোনও জলরাজের একটি পরমাসুন্দরী মেয়ে ছিল। তিনি তাকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন। তার জন্যে তিনি একখানি বাড়ী গড়েছিলেন। বাড়ীখানি নদীর তীরে যে উঁচু পাহাড়

ছিল তাই খোদাই করে নির্ম্মাণ করেন। তার দেওয়াল ছিল সাদা মর্ম্মর পাথরের, নানা জলজ ফুল শেওলা দিয়ে সাজান ছিল। জলকন্যারা ঘরের মেঝের জন্যে একখানি সবুজ গালিচা বুনে দিয়েছিল। শাঁক আর শামুক হতে সারাদিনই বাণার আলাপের মত সঙ্গীত শোনা যেত।

প্রাতরাত্রিতে জলরাজ মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। সেখানে যত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য সুন্দর শামুক আর উপল পাথর কুড়িয়ে পেতেন মেয়েটির খেলবার জন্যে বাড়ী নিয়ে আসতেন। তিনি তাকে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বলতেন, আর নানা গান গেয়ে



বনের···জীবজন্তুর সঙ্গে তার ভারি ভাব ছিল

শোনাতেন। আবার কখনো বা একখানি সাদা ফুর ফুরে মেঘে জড়িয়ে নিয়ে তাঁকে তার দেশ-বিদেশ বেড়াবার সঙ্গী করে নিতেন।

উষার শুকতারা পূবের আকাশে দেখা দেবামাত্র ড্যাফনির ঘুম ভেঙে যেত। লতাপাতা ফুল, বনের পাখী আর জীবজন্তু এদের সবারি সঙ্গে তার ভারি ভাব ছিল। তাদের সঙ্গে যখন থাকত তখন আর তার কোন বন্ধুর অভাব বোধ হ'ত না।

একদিন ড্যাফনি ফুল পাতা তুলে, ফল কুড়িয়ে পাখীর সাথে গান গেয়ে, খরগোস হরিণের সঙ্গে ছুটো ছুটির পাল্লা দিয়ে খেলা করে বেড়াচ্ছিল, এমন সময় সূর্য্যদেব তাকে দেখে একেবারে মোহিত হয়ে গেলেন। এমনটি তো কখনো দেখেননি, স্বপ্নেও না··· কল্পনায়ও যে এমন মূর্ত্তি গড়ে তোলা যেতে পারত, সত্যিকার মানুষটি দেখে তাও সম্ভব বলে মনে হ'ল না। কিছুক্ষণ তাকে দেখবার পর চমকটা যখন ভাঙ্‌ল, তখন তার সঙ্গে কথা কইবার জন্য সূর্য্যদেব উৎসুক হলেন; আকাশে চলা তার হীরকের মত জলজলে উজ্জ্বল



তোমায় ছেড়ে আমি কোথাও যাব না

রথ হ'তে তিনি নেমে বল্লেন, সুকুমারি, তুমি কোথায় যাচ্ছ? এখানে এস, আমার সঙ্গে কথা কও—তোমার মত সুন্দরী মেয়ে জীবনে আমি আর কোথাও দেখিনি, দেখ্‌ব বলে আশাও ছিল না। কিন্তু ড্যাফনি তাঁর কথায় কাণই দিল না—তার কাছ হতে দৌড়ে দূর হতে সুদূরে পালিয়ে চল্‌ল। এই পৃথিবী আর এই পৃথিবীর মানুষজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়দের ছেড়ে যাবার তার কোনই ইচ্ছা ছিল না। কন্দর্প—যার গ্রীক নাম কিউপিড, গ্রীকরা বলত, সে ছোট্ট ছেলেটি আবার অন্ধ—তার তূণে অনেক তীর—কার ভাগ্যে কোন্‌টি বিঁধবে অজানা। সোনার তীর যাকে বেঁধে সে হয় মুগ্ধ,

নীসের তীর যার বুকে বাজে, সে আর অপরকে চায় না। সূর্য্যদেব হলেন মুগ্ধ অনুরাগী, আর ড্যাফনি সেই পরম সুন্দর দেবতাকে দেখে ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগল—তার চোখে তাঁকে দৈত্য দানবের মত ভয়ঙ্কর দেখাল। নদীর তীরে বাড়ীর কাছে এসে করুণ স্বরে কেঁদে উঠে বল্লে—"বাবা তুমি কোথায় গেলে, আমায় বাঁচাও, আমাকে কে এক জন চুরি করে কোথায় নিয়ে যেতে চায়—আমি যাব না, যাব না, তোমায় ছেড়ে কোথাও যাব না।

তার বাবা কন্যার সে কাতর কণ্ঠ শুনতে পেলেন। ড্যাফনির পা দু'খানি যেমনি নদীতীরের নরম কাদার মধ্যে গিয়ে পড়ল অমনি শিকড় হয়ে তার মধ্যে আটকে গেল; তার কোমল তরুণ দেহ বাকলে ঘিরে নিল, বাহু দুটি শাখায় পরিণত হ'ল, কম্পিত হাত দুখানি কচি কিশলয়, ছড়িয়ে পড়া এলোচুল রাশি রাশি ঘন সবুজ পাতা হয়ে দেখা দিল। দেখতে দেখতে একটি লরেল গাছ, সুন্দরী ড্যাফনির স্থান অধিকার করে দাঁড়াল। সূর্যদেব আপলো (Appollo) ছুটে এসে যখন দুখানি হাত বাড়িয়ে দিলেন, তখন তাঁর মধ্যে ধরা দিল বাকলে মোড়া কঠিন একটি লরেল গাছ।

মানুষের দুঃখের শেষ হয়, কেননা তার জীবনের একটা সীমা আছে—তবে দেবতার মরণও হয় না,



বন তার মধ্যে ধরা দিলো... একটি লরেল গাছ ও আসে না। সূর্যদেব ড্যাফনিকে ভুলতে পারলেন দুঃখ তাঁর অমর হয়ে রইল।

গরীব ব্রাহ্মণের গরু চুরি

পঞ্চ তন্ত্রের

এক গ্রামে এক গরীব ব্রাহ্মণ বাস করতো। ব্রাহ্মণের রোজগার করবার ক্ষমতা ছিল না, পাঁচজনে যা দিত, তাতেই কোনমতে তার দিন গুজরান হোত। তার উপর সে যেমন গরীব, তেমনি সাধাসিধে।

ব্রাহ্মণের দুরবস্থা দেখে এক পড়শীর বড় দয়া হোল। সেই লোকটি ব্রাহ্মণকে একটা গরু ও বাছুর দিল। গরু ও বাছুর পেয়ে ব্রাহ্মণ অনেক যত্নে ভালো ভালো জিনিষ খাইয়ে তাদের বেশ মোটাসোটা করে তুললো।

সেই নধর হৃষ্টপুষ্ট গরু দুটো দেখে এক চোরের ভারি লোভ হোল। গরু দুটোকে চুরি করবার মতলবে চোরটা একগাছা মোটা দড়ী নিয়ে রাতের বেলা বেরিয়ে পড়লো। পথে যেতে যেতে হঠাৎ এক বিকট আকার মূর্ত্তি দেখে চোর ভয়ে চমকে উঠলো;—গজালের মত তার বড় বড় দাঁত আর করাতের মত তাদের ধার, ত্রিশূলের মত উঁচু নাক,

বড় বড় ড্যাবডেবে চোখ, শুকনো ডালো দুই গাল।

তি দেখে চোরটা ভয়ে কাঁপতে

কাপ/ জ্ঞাসা করলে— আপনি কে মশাই।

ন—আমি একটা ভূত: এখন তুই

কে,

চোর বললে—আমি একজন চোর, এক গরীব বামুনের দুটো বেশ সুন্দর গরু আছে, আমি এখন তাই চুরি করতে চলেছি।

চোরের কথা শুনে ভূতের বড় আনন্দ হোল, সে বললে- দেখ, আমি প্রতি দিন অন্তর একদিন করে খাই, চলো আজ এই বামুনকে খেয়ে আসি।

তখন দুজনে তারা বামুনের বাড়ী গিয়ে এক কোণায় লুকিয়ে রইল। শেষে বামুন ঘুমুতে গেল এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো।

ভূত আস্তে আস্তে তার গুপ্ত স্থান হতে বামুনের ঘরের পানে চল্‌ল বামুনকে খাবার জন্যে। তাই দেখে চোর বল্‌ল—দাঁড়াও ভাই, আগে আমি গরু দুটো হাত করি, তারপর তুমি বামুনকে খেয়ো।

ভূত বল্‌ল—তা কি হয়! তুমি গরু চুরি করতে যাবে, আর শব্দ হবে, তাতে বামুনের ঘুম ভেঙে যাবে,



আপনি কে মশাই?

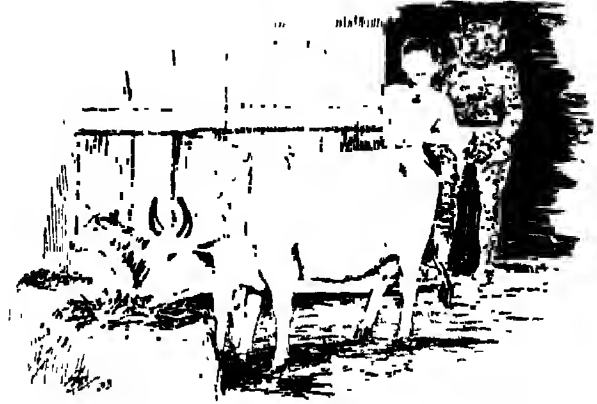
মাঝখান থেকে আমার খাওয়া হবে না। চোরেরও জিদ্ বেড়ে গেল। সে বল্‌লে—আর তুমি বামুনকে খেতে যাও, কোনো বাধা বিপদ উপস্থিত হোক;



বামুন অল্প সময়ের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়ল

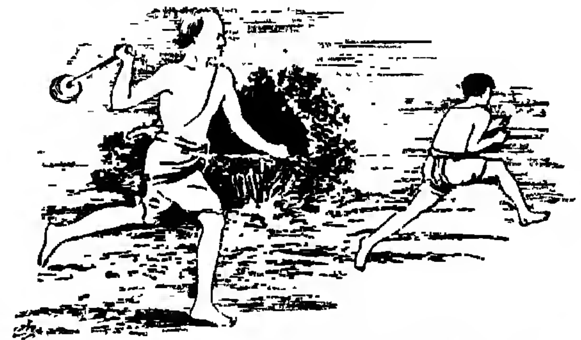
শেষে আমার গরু দুটো হাতছাড়া হবে। একটু দাঁড়াও, আমি গরু দুটোকে আগে চুরি করি, তারপর বামুনকে খেয়ো।

ভূতও শোন্‌বার পাত্র নয়; এই নিয়ে তাদের বেশ বচসা চল্‌তে লাগ্‌ল। ভূত বলে, আমি আগে, চোর বলে আমি আগে। এভাবে দু'জনে এমনভাবে চীৎকার করতে লাগলো যে, সে গোলমালে বামুনের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে এসে বামুন দেখে, দু'জন লোক দাঁড়িয়ে। চোর তখন নিজের সাফাই গেয়ে বামুনকে বল্‌লে—দেখ ঠাকুর, এটা হচ্ছে একটা ভূত, তোমাকে খাবার জন্য এসেছে।



একটু দাঁড়াও, আমি গরু দুটোকে আগে চুরি করি

ভূতও চুপ করে রইল না। সে বল্‌লে—আর এটা হচ্ছে একটা চোর, তোমার গরু চুরি করতে এসেছে। সমস্ত দেখে শুনে বামুন নিজের ভয়ঙ্কর বিপদের

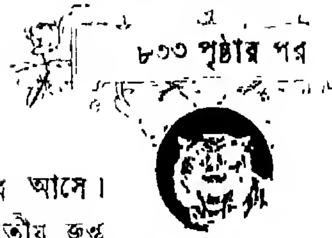


বামুন এক গাছা লাঠি নিয়ে চোরকে তাড়া করলে

কথা বুঝতে পারলো। তারক-ব্রহ্ম নাম জপ করে কোনমতে ভূতের হাত হতে নিজের প্রাণ বাঁচিয়ে বামুন তখন এক গাছা লাঠি নিয়ে চোরকে তাড়া করে তার গরু দুটো রক্ষা কর্‌লো।



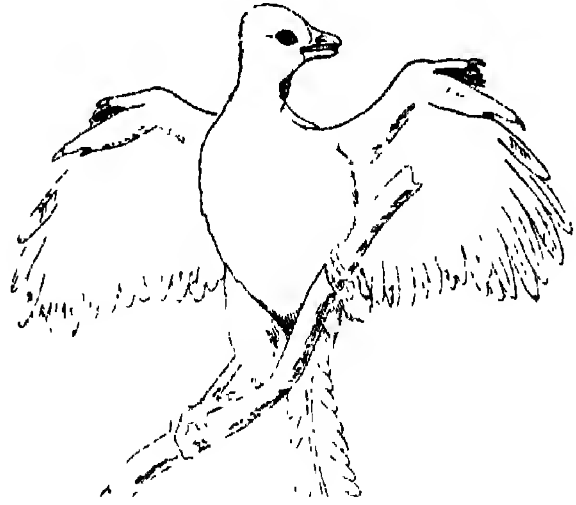
সেকালের পাখী



৮৩৩ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীর বুকে কেবলি একটা পরিবর্ত্তনের ধারা চলিয়া আসিতেছে। জীব-জগতে ও প্রাকৃতিক জগতে একই ধ্বংস-লীলা চলিতেছে। এক যায়, আর আসে। জীবজগতের প্রাণীদের মধ্যে কত জাতীয় জন্তু জানোয়ার ছিল, কত রকমে তাহাদের জীবন-লীলা চলিত, সে ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা অনেক কথাই বলিয়াছি। আমাদের জীবন কতটুকু স্থায়ী—পৃথিবীর বয়সের সেই অজানা ইতিহাসের তুলনায়। আমরা শুধু জল-বুদ্বুদের মত বাঁচিতেছি ও মরিতেছি। কাজেই, আমরা জীবজগতের যে-কথা বলিয়াছি ও বলিতেছি, তাহা শুধু আমাদের বিদ্যা, বুদ্ধি ও অনুসন্ধিৎসার সাহায্যেই পারিতেছি। পৃথিবীর বুকে তাহার যে অতীত ইতিহাস আছে, সে ইতিহাস হইতেই আমরা সে-কালের কাহিনী জানিতে পারি।

মানুষ যখন পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে সে-কালের পশু-পক্ষীরাও তেমনি ধ্বংসপথে চলিতে লাগিল। মানুষ জঙ্গল কাটিয়া বাসোপযোগী গ্রাম ও নগর নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, জন্তু-জানোয়ারেরা তাহাদের বাসভূমি বনের মধ্যে তাহাদের এই আক্রমণে অনেকে প্রাণ হারাইল, অনেকে প্রাণ বাঁচাইতে গিয়াও আবার প্রাণ বাঁচাইতে পারিল না। এই ভাবে যে সকল জীব এক সময়ে নিরাপদে বনভূমিতে বাস করিত, তাহারা মানুষের বংশ বৃদ্ধি এবং শিক্ষা ও সভ্যতা-বৃদ্ধির সহিত বিলুপ্ত হইয়া গেল। এখনও আমরা গভীর অরণ্য মধ্যে এবং পর্ব্বত-শিখরে যে সকল দেখিতে পাই, হয়ত একদিন তাহারাও মানুষের অত্যাচারে পৃথিবীর বুক হইতে চির দিনের জন্য বিলুপ্ত হইবে। জন্তু-জানোয়ারদের ধ্বংসের মূলে মানুষই যে প্রধানতঃ দায়ী, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সে-সব জীবজন্তুর কথা তোমাদের কাছে বলিয়াছি ও বলিতেছি।



প্রাচীন কালের পাখী

আমরা এইবার তোমাদের কাছে কয়েকটি লুপ্ত পাখীর কথা বলিব। সে প্রায় সত্তর বৎসর আগে নিউজীল্যাণ্ড (Newzealand) হইতে একজন ভদ্রলোক

অধ্যাপক রিচার্ড ওয়েনের (Prof Richard Owen) নিকট একখান হাড়ের টুকরা পাঠাইয়াছিলেন। এই হাড়খানি তাঁহার বাগানে পাওয়া গিয়াছিল। ওয়েন্ ঐ হাড়ের টুক্রাটাকে বেশ ভাল ভাবে পরীক্ষা করিয়া স্থির করিলেন যে, উহা অষ্ট্রীচ্ পাখীর উরু দেশের মধ্যাংশ হইবে। কয়েক বৎসর পরে ঐরূপ আরও অনেকগুলি হাড়ের টুক্রা নিউজীল্যাণ্ড হইতে অধ্যাপক ওয়েনের নিকট প্রেরিত হয়। অধ্যাপক এইবার সেই সব হাড়ের টুকরাগুলি পরস্পর সম্মিলিত করিয়া একটা পাখীর কঙ্কাল খাড়া করিলেন। ঐ কঙ্কালটি কতকটা অষ্ট্রীচ পাখীর মত হইয়া পড়িল। তখন অনুসন্ধান দ্বারা প্রকাশ পাইল যে, সত্য সত্যই এইরূপ বিরাটাকারের একটা পাখী নিউজীল্যাণ্ডে এক সময়ে বাঁচিয়া ছিল-তাহার নাম ছিল



মোয়া পাখী



মোয়া পাখীর কঙ্কালের পাশে দাঁড়াইয়া স্যার রিচার্ড ওয়েন



ফেরোরাকস্—(প্রাচীন কালের পাখী)

মোয়া (Moa)। ছবিতে দেখ, অধ্যাপক ওয়েন্ সাহেব মোয়া পাখীর কঙ্কালের পাশে দাঁড়াইয়া আছেন।

পলিনিশিয়া দ্বীপবাসীরা, সে প্রায় পাঁচ শত বৎসর আগে মোয়া পাখী শিকার করিয়া বেড়াইত এবং তাহার মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত। এইরূপ ভাবে শিকারের পর শিকারের ফলে মোয়া পাখীর বংশ ধ্বংস হইয়াছে। মায়োরি জাতীয় লোকদের পূর্ব্ব পুরুষদের অতিরিক্ত শিকারপ্রিয়তাই এইরূপ ধ্বংসের কারণ। মাদাগাস্কার দ্বীপে যে সকল মোয়া পাখী বাঁচিয়া ছিল, তাহারা নিউজীল্যাণ্ডের মোয়া পাখীদের অপেক্ষা আকারে অনেক ছোট ছিল।

ডোডো

ডোডো নামে একজাতীয় পাখীও আজ আর পৃথিবীতে বাঁচিয়া নাই। সে অনেক দিন আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় মাদাগাস্কার (Madagascar) দ্বীপের কাছাকাছি মরিশাস (Mauritius) দ্বীপে ডোডো পাখীদিগকে বিচরণ করিতে দেখা যাইত। সেকালের পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজ নাবিকেরা সমুদ্র পথে যাতায়াতের কালে ডোডো পাখী দেখিতে পাইত। এই পাখীর শরীরটা ছিল খুব বড়, আর পাখা দুইটি ছিল খুব ছোট। ঐ ছোট দুইটি পাখার উপর ভর করিয়া ইহারা মাটির উপরে বড় একটা উঠিতে পারিত না। কাজেই, নাবিকেরা অতি সহজেই ইহাদের মাথার উপর লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র ফেলিত। এই ভাবে ডোডো পাখী মারিয়া নাবিকেরা তাহাদের মাংস খাইবার স্পৃহা নিবৃত্তি করিত। ঐ দ্বীপের অধিবাসীদের শিকার করিবার ফলে এবং নাবিকদের অত্যাচারে অতি শীঘ্রই এই পাখীর বংশ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে (১৬১০—১৬২০ খৃষ্টাব্দে)



ডোডো পাখী



ডোডো পাখীর কঙ্কাল
(সোলেনহোফেন হইতে চূণা পাথরের মধ্যে প্রাপ্ত)

ইউরোপে জীবন্ত ডোডো পাখী প্রদর্শিত হইয়াছিল। প্রায় আড়াই শত বৎসর আগে মিঃ ইলিয়াস আসমোল (Mr. Elias Ashmole) নামে একজন ভদ্রলোক তাঁহার সংগৃহীত জীবজন্তুর দেহ, কঙ্কাল প্রভৃতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণিতত্ত্ববিভাগের যাদুঘরে দান করেন। ঐ সংগ্রহের



ওক পাখী

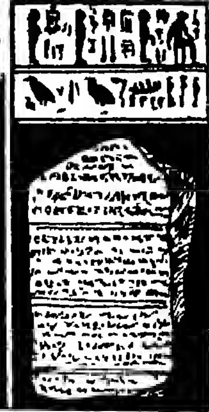
মধ্যে একটি ডোডো পাখীও ছিল। কালক্রমে ঐ ডোডো পাখীটির দেহাবশেষের উপর কীট প্রভৃতির এমন আক্রমণ আরম্ভ হইল যে, কিছুদিন পরে উহা একেবারে চূর্ণীকৃত হইবার উপক্রম হইল। তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ ডোডোর ঐ দেহটিকে নাশ করিবার জন্য আদেশ করিলেন। যাদুঘরের অধ্যক্ষ উহাকে ফেলিয়া দিবার সময় উহার মাথা ও একটি পা কাটিয়া রাখিয়াছিলেন। এই পা ও মাথাটি এবং লণ্ডন যাদুঘরের অপর একটি পা এবং কোপেনহেগেনের (Copenhagen) যাদুঘরে রক্ষিত একটা মাথার খুলি মাত্র ইউরোপের যাদুঘরে বিদ্যমান রহিয়াছে। ডোডোর বংশ লোপ পাইয়াছে। ডোডো জাতীয় পাখী বিলুপ্ত হইয়া যাইবার অনেক পরে মরিশাস (Mauritius) দ্বীপের একটি হ্রদের কাদা মাটির নীচে হইতে একটি ডোডোর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাহার ছবি দেওয়া হইল।

ওক্ (Auk) পাখীর কথা (শিশু-ভারতীর— প্রথম খণ্ড ১০৮ পৃষ্ঠা) পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে। আজ প্রায় ১০০ একশত বৎসর হইল, ওক্ পাখী সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে। এই পাখী দেখিতে প্রায় ২ ফিট উঁচু হইত। দেখিতে অনেকটা পেঙ্গুইন পাখীর মত ছিল। আমরা সময়ে সময়ে খবরের কাগজে ওক্ পাখীর ডিমের দাম শুনিয়া আশ্চর্য্য হইয়া যাই। ওক্ পাখীর ডিম সংগ্রাহকেরা সময় সময় এক একটি ডিম ৩০৯ পাউণ্ড দামেও বিক্রয় করিয়াছে। এ পাখীর ডিম সচরাচর স্কটল্যাণ্ডের উত্তর ভাগের পার্ব্বত্য দ্বীপে, সেটল্যাণ্ড (Shetland), আইসল্যাণ্ড (Iceland) এবং গ্রীনল্যাণ্ডে পাওয়া গিয়াছে। নিউজীল্যাণ্ডের সমুদ্রতীরে বালুকার নীচে সময় সময় এই কঙ্কাল পাওয়া যায়। এখন সারা পৃথিবী খুঁজিলেও একটিও ওক্ পাখীর সন্ধান পাইবে না।

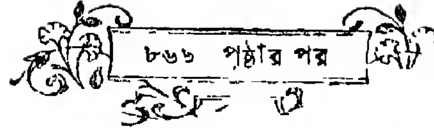








হোমার


৮৬৬ পৃষ্ঠার পর

আমাদের দেশে যেমন বাল্মীকি আদিকবি, গ্রীস-দেশের হোমারও তেমনি ইউরোপের আদিকবি। গ্রীকেরা হোমারকে বলিতেন —যুদ্ধের কবি, কেন না, হোমারের বিখ্যাত কাব্য-গ্রন্থ ইলিয়াড এবং ওডিসী ("Illoid and Odyssey") মানবসভ্যতার প্রথম অবস্থায় যুদ্ধ-কাহিনী লইয়াই রচিত হইয়াছে।

সেকালে মানুষ যখন ধীরে ধীরে সংকীর্ণ গোষ্ঠী বা সমাজ ছাড়িয়া জাতি গড়িয়া তুলিতেছিল, সেই সময়ে হোমার ফিনিশিয় নাবিকদের মুখে নানা গল্প ও কাহিনী শুনিয়া বিভিন্ন দেশের জাতি ও সমাজ এবং মানুষ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিয়া লইতেন।

হোমারের কবিতা স্বচ্ছ ও সরল। সেকালের লোকেরা যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শুনতেই ভাল বাসিত বোধ হয়, সেইজন্যই হোমারের কাব্য যুদ্ধের কাহিনীতেই পূর্ণ। তাঁহার ভাষা এত সুন্দর যে, পড়িতে পড়িতে মনে হয়, যেন চোখের সম্মুখেই সব ঘটনা ঘটিয়া যাইতেছে।



হোমার

হোমার মানুষ হিসাবে কেমন ছিলেন, কিভাবে জীবনযাপন করিতেন, এ-সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। এমন কি, তিনি কোথায় কোন্ সময়ে জন্মিয়াছিলেন, কখন্ কাব্য রচনা করেন, সেকথাও আমাদের জানা নাই। গ্রীক্ ঐতিহাসিক হিরো-ডোটাস্, হোমার তাঁহার সময়ের ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ খৃষ্ট পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, বলিয়াছেন। কিন্তু ট্রয়ের পতন যে ১২৫০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দের পরে ঘটে, তাহা একরূপ নিশ্চিত এবং মনে হয় যে, উহার কিছুকাল পরেই হোমার আবির্ভূত হইয়াছিলেন। হোমার অন্ধ ছিলেন বলিয়া একটা

জনপ্রবাদ বরাবর চলিয়া আসিতেছে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় তাঁহার একখানি ছবি দেওয়া হইল।

হোমারের যে-কাব্য আজ জগতের লোকের কাছে এত আদর পাইতেছে, সেই কাব্য সেকালে লিখিত অবস্থায় ছিল না। লোকে মুখে মুখে আবৃত্তি করিত, গান গাহিত। এইভাবে বৎসরের পর বৎসর ইহা চলিয়া আসিয়াছে। তার পর যখন লিখিত হয়, তখনও অনেক দিন পর্য্যন্ত অন্ততঃ ১০০০ এক হাজার বৎসর, উহা হয় ত কোনও লাইব্রেরীর এক কোণে অযত্নে ধূলা-বালিতে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—পরে এক শুভদিনে সেই ধূলি-ধূসরিত পুঁথির পাতা জ্ঞানীসমাজের কাছে আদরলাভ করিয়া দেশ বিদেশে প্রচারিত হইল।

ইংরাজ কবিদের মধ্যে পোপ (Pope), কাউপার (Cowper), চাপমেন (Chapman), উইলিয়ম মরিস (William Morris) এবং আরও অনেকে হোমারের সেই গ্রীক্ ভাষায় লিখিত কাব্য-কাহিনী ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন! এইরূপে নানা ভাষায় অনুবাদ হওয়ার ফলে হোমারের অমর কাব্য ইলিয়াড ও ওডিসীর গল্প পৃথিবীর সব দেশের লোকের কাছেই পরিচিত। এখানে হোমারের যে ছবিখানি দেওয়া হইল ইহা কিন্তু হোমারের প্রকৃত ছবি নহে। গ্রীক্ ভাস্করেরা পরবর্ত্তী কালে হোমারের যে কাল্পনিক মূর্ত্তি গড়িয়াছিলেন ইহা তাহারই ছবি। আজকাল অনেকে মনে করেন যে আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে হোমারের কাব্য বিরচিত হইয়াছিল।

ইলিয়াডের গল্প

প্রথম, ইলিয়াডের গল্প শোন। শোনবার আগের কিন্তু 'ইলিয়ড' এই কথাটির অর্থ আমাদের জানা দরকার। ট্রয়ের নাম কি, তোমরা কখনো শুনেছ? এশিয়া-মাইনরের প্রান্তে সমুদ্রের তীরে ট্রোজা বলে একটি দেশ ছিল। তারই রাজধানী ছিল ট্রয়। গ্রীক্ ভাষায় কিন্তু এর নাম ছিল 'ইলিয়াম্'। ইলিয়ামে যে সব ঘটনা ঘটেছিল, তাই অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছে বলেই কাব্যটির নাম "ইলিয়াড্"। এই একটি গ্রীক্ শব্দ—যার অর্থ "ইলিয়াম সম্বন্ধে"। ইলিয়ামে ট্রোজানদের সঙ্গে গ্রীকদের যে ভয়ানক যুদ্ধ হয়, তারই কাহিনী নিয়ে লেখা হয়েছে এই 'ইলিয়াড'। অবশ্য এই যুদ্ধের কতখানি সত্য, আর কতখানি কবির কল্পনা, তা একেবারেই ঠিক্ ক'রে বলা যায় না।



হেলেন

ট্রয়ের রাজা ছিলেন প্রায়াম্। তাঁর ছিল দুটি ছেলে, হেক্টর এবং প্যারিস। হেক্টর ছিলেন যেমন বড় বীর, প্যারিস্ ছিলেন তেম্‌নি দেখতে অতি সুন্দর।

সেই সময়ে গ্রীস্ দেশে স্পার্টা নামে একটি রাজ্য ছিল। মেনেলাস ছিলেন তার রাজা। মেনেলাসের রাণী, হেলেন, ছিলেন অপূর্ব্ব সুন্দরী। সৌন্দর্য্যের জন্য তিনি জগতে বিখ্যাত ছিলেন।

একবার প্যারিস ট্রয়ের দূত হ'য়ে কোন কাজে স্পার্টায় যান। মেনেলাস সে-সময় দেশে ছিলেন না। হেলেনের সেই আশ্চর্য্য রূপে মুগ্ধ হয়ে প্যারিস তাঁকে বন্দী করে নিয়ে ট্রয়ে পালিয়ে যান। মেনেলাস ফিরে এসে খবর শুনে ভয়ানক ক্রুদ্ধ হ'লেন। গ্রীস সেই সময়ে অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। তখনি দূত পাঠিয়ে মেনেলাস রাজাদের আহ্বান করলেন।

তারপর সবাই একত্র হ'য়ে ট্রয়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে চল্‌লেন। এত বড় অপমানের প্রতিশোধ তো নিতে হ'বে।

সৈন্য এবং জাহাজ সাজিয়ে সবাই ট্রয়ের দিকে যাত্রা করলেন। এই যুদ্ধ যাত্রার কাহিনী বড় সুন্দর ক'রে ইলিয়াডে বর্ণনা করা হ'য়েছে। দলের নেতা ছিলেন—আগামেম্‌নন্‌। পথে এক জায়গায় দেবতার কোপে পড়ে গ্রীক্‌দের জাহাজ সব সমুদ্রে আট্‌কে গেল। সেই সময় আগামেমননের মেয়েকে অর্ঘ্যরূপে দিয়ে তবে দেবতাদের ক্রোধ শান্তি করা হয়। যা হোক্‌, অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম ক'রে সমুদ্রতীরে এসে অবতরণ ক'রে গ্রীকেরা তো ট্রয় নগরী অবরোধ করলেন। দশ বৎসর ধরে দীর্ঘ অবরোধ চল্‌ল। গ্রীক আর ট্রোজান্‌ সৈন্যদের মধ্যে কত যুদ্ধ হ'য়ে গেল। দুই দলের বড় বড় যোদ্ধারা নিজেদের মধ্যে কত যুদ্ধ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কোন পক্ষ পরাজয় স্বীকার করলে না।



বিরোধ সুরু হল

যুদ্ধের ফলাফল যখন এমনি অনিশ্চিত, সেই সময় গ্রীক্‌দের আর এক বিপদ্‌ উপস্থিত হ'ল। তাদের নিজেদের মধ্যে ভয়ানক ঝগড়া বেধে গেল, ব্যাপার কিন্তু অতি সামান্য গ্রীক্‌দের মধ্যে সবচেয়ে বড় যোদ্ধা ছিলেন একিলিস্‌। তাঁর মত এত বড় সাহসী আর বীর তখন ছিল না বল্‌লেই হয়। এই একিলিসের একটি ক্রীতদাসকে আগামেমনন্‌ জোর ক'রে নিজের জন্য নিয়ে যান। এই নিয়েই প্রথম বিরোধ সুরু হ'ল কিন্তু ফল হ'ল ভয়ানক। একিলিস্‌ রাগ করে বলে বস্‌লেন যে, তিনি আর যুদ্ধ করবেন না। অনুচরদের নিয়ে তিনি নিজের শিবিরে চলে গেলেন। একিলিস্‌ যুদ্ধ করবেন না শুনে ট্রোজান্‌রা দেখলে তাদের চমৎকার সুযোগ উপস্থিত। সাহসে ভর ক'রে বেরিয়ে এসে তারা প্রবল ভাবে গ্রীকদের আক্রমণ করলে। গ্রীকরা সে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারলে না তাদের পরাজয় সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। এই বিপদের দিনে বুক বেঁধে সামনে এসে দাঁড়ালেন একিলিসেরই একান্ত প্রিয় বন্ধু পেট্রোক্লাস। একিলিসের পোষাক পরে তিনি গ্রীক্‌ সৈন্য চালনা করতে লাগলেন। তাই দেখে একিলিস্‌ ফিরে এসেছেন



হেক্টর স্ত্রীর নিকট হইতে বিদায় নিয়ে যুদ্ধযাত্রা করলেন

ভেবে ট্রোজান্‌রা অবশ্য আবার দুর্গে গিয়ে আশ্রয় নিল। কিন্তু যে যুদ্ধ হল, তাহাতে পেট্রোক্লাস নিহত হলেন।

প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুর খবর পেয়ে একিলিস্ শোকে দুঃখে একান্ত অধীর হ'য়ে পড়লেন। এর প্রতিশোধ না নিয়ে কি আর তিনি স্থির থাকতে পারেন? দেবতাদের দেওয়া বর্ম্ম পরিধান ক'রে তিনি তখনই যুদ্ধক্ষেত্রে চললেন। ক্রুদ্ধ একিলিসের সেই ভীষণ আক্রমণ ট্রোজানরা সহ্য করতে পারল না। তখন তাদের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা রাজকুমার হেক্টর যুদ্ধে যাবার আগে স্ত্রীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে এসে যুদ্ধ আরম্ভ করলেন। এইটিই



হেক্টর ও একজন গ্রীকবীরের যুদ্ধ

ইলিয়াডের সব চেয়ে বড় যুদ্ধের কাহিনী। যুদ্ধের শেষে হেক্টর নিহত হ'লেন। তাঁর মৃতদেহ নগরে নিয়ে আসা হ'লে সমস্ত ট্রয় শোকে আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল। মহাসমারোহে হেক্টরের মৃতদেহের সৎকার করা হ'ল।

যদিও বিখ্যাত ট্রোজান্ যুদ্ধের সমাপ্তি এখানে হয়নি, ইলিয়াড বইটি কিন্তু এখানেই শেষ হ'য়ে গেল। ইলিয়াড পড়লে মনে হয় হোমার যেন শুধু একিলিসের বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করতেই বইটি রচনা ক'রে গিয়াছেন। যাই হউক, এই যুদ্ধের শেষ কি ক'রে হ'ল, তা আমরা এখানেই একটু দেখে লই।

হেক্টরের মৃত্যুর পরও যখন ট্রোজানরা পরাজয় স্বীকার করলে না, তখন যুদ্ধ করে জয়লাভের আশা



হেক্টরের মৃত্যুতে তাঁর স্ত্রীর বিলাপ



টান্‌তে টান্‌তে সেটাকে···ভিতরে নিয়ে এল

ছেড়ে দিয়ে গ্রীকরা কৌশল অবলম্বন করলে। গ্রীক্দের সঙ্গে ছিলেন ইথাকার রাজা ইউলিসিস্। যেমন বীর্য্যের জন্য, তেমনি অসাধারণ প্রখর বুদ্ধির জন্য তিনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁরই পরামর্শ অনুসারে গ্রীকরা কাজ সুরু করলে। গাছ থেকে কাঠ কেটে এনে তারা বসে বসে একটা প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া তৈরী কর্ল্লে। এই ঘোড়ার ভিতরে তাদের কয়েকজন বিখ্যাত যোদ্ধা লুকিয়ে রইল। তারপর এই ঘোড়াটিকে ট্রয়ের দ্বারের সম্মুখে রেখে তারা এমন ভাব দেখালে যে, তারা চলে যাচ্ছে।

তাই দেখে, গ্রীকরা চলে গেল ভেবে, ট্রোজানরা সাহস করে বাইরে বেরিয়ে এল। সামনেই এরকম একটা প্রকাণ্ড কাঠের ঘোড়া পড়ে রয়েছে দেখে তাদের ভারী মজা লাগল। টান্তে টান্তে সেটাকে তারা সবাই মিলে নগরের ভিতরে নিয়ে এল। এতকাল পরে যুদ্ধ শেষ হ'য়েছে। শত্রুরা অবরোধ ত্যাগ করে ফিরে গিয়েছে। সারাদিন তাই ট্রয় নগরীতে উৎসব চল্তে লাগল। রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে কখন যে গ্রীকরা চুপিচুপি ফিরে এসে দ্বারে অপেক্ষা করছে, তা আর উৎসব-মত্ত ট্রয়বাসীরা কেউ দেখেনি। অনেক রাতে উৎসব-ক্লান্ত সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সেই সময়ে ঘোড়ার ভিতরে যারা লুকিয়েছিল, তারা ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে এসে দুর্গদ্বার খুলে দিল। সেই খোলা দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে গ্রীকরা ভীষণভাবে ট্রোজানদের আক্রমণ করল। ট্রোজানরা ভাল করে চোখ মেলে চাইবারও সময় পেলে না। গ্রীকরা ট্রয় নগরী অধিকার করে হেলেনকে উদ্ধার করে নিল, ট্রয়বাসিগণের অধিকাংশই নিহত হল। আগুন জ্বালিয়ে গ্রীকরা সমস্ত সহরটি ধ্বংস করে দিয়ে নিজেদের দেশে ফিরে গেল।

ওডিসী

ইলিয়াডের বিখ্যাত যুদ্ধের শেষে যে ইউলিসিসের বুদ্ধিবলে গ্রীকরা ট্রয় নগরী জয় করলে, সেই ইউলিসিসেরই কাহিনী নিয়ে ওডিসী রচিত হয়েছে। ইউলিসিসের গ্রীকনাম ছিল ওডিসীয়ুস। ওডিসীউসের সম্বন্ধে লেখা বলেই বইখানার নাম ওডিসী।

দশ বৎসর যুদ্ধের পরে ট্রয় জয় ক'রে গ্রীক্ রাজারা তো যা-যার দেশে ফিরে চল্লেন। ওডিসীয়ুস্ও নিজের সৈন্য এবং জাহাজ নিয়ে দেশের দিকে যাত্রা করলেন। দশ বছর হ'ল বাড়ী ছেড়ে এসেছেন। রাণী পেনিলোপ তাঁর পথ চেয়ে আছেন, ছেলে টেলিমেকাস্ কত বড় হয়ে গিয়েছে - এদের সবাইকে দেখ্বার জন্য যে তাঁর মন কিরকম উৎসুক হয়ে উঠেছিল, তা তো বোঝাই যায়। কিন্তু মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা কি আর সবই সফল হয়? ইউলিসিসেরও বাড়ী ফিরে যাবার সেই একান্ত আকাঙ্ক্ষা বহুকালের জন্য স্বপ্নই রয়ে গেল।

প্রচণ্ড ঝড়ের বেগে ভুল পথে গিয়ে, কত অজানা জায়গায় ঘুরে, কত বিপদের মাঝখান দিয়ে ঘর-ছাড়া ওডিসীয়ুস্ আবার যখন নিজের ঘরে ফিরতে পারলেন তখন ট্রয়ের যুদ্ধের পরে আরও দীর্ঘ দশটি বছর অতীত হয়ে গিয়েছে।

এই দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী বিচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী এবং ভ্রমণ অন্তে ওডিসীয়ুসের গৃহে প্রত্যাবর্তন—ওডিসীতে তারই বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। কাহিনীগুলি সব এখানে বর্ণনা করা সম্ভব নয়, শুধু কয়েকটি বলছি। বড় হয়ে তোমরা সবগুলি পড়ে দেখো।

যুদ্ধের শেষে ইথাকার দিকে যাত্রা করার সঙ্গে সঙ্গেই দুর্ভাগা ওডিসীয়ুসের বিপদ আরম্ভ হল। প্রবল ঝড়ে জাহাজ উড়িয়ে যে সমুদ্রের কোথায় কতদূর নিয়ে ফেল্ল, তা আর নাবিকরা কিছুতেই ঠিক্ করতে পারল না। চারিদিকে শুধু জল। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে, কোথাও আর মাটী দেখা যায় না। ক্ষুধা-তৃষ্ণায় যখন সবাই অধীর হয়ে পড়েছে, এমন সময় হঠাৎ তীর দেখা গেল। সবাই মিলে সেখানে নেমে পড়লেন। যুদ্ধ করে, সেখানকার অধিবাসীদের তাড়িয়ে দিয়ে সকলে মিলে যখন খুব আমোদে মত্ত হয়ে আছে সেই সময় পরাজিত দেশবাসীরা ফিরে এসে হঠাৎ তাদের আক্রমণ করে বেশীর ভাগ লোককেই হত্যা করলে। মাত্র অল্প কয়েকটি অবশিষ্ট অনুচর নিয়ে ওডিসীয়ুস্ বহু কষ্টে জাহাজে পালিয়ে এসে রক্ষা পেলেন।

আবার জাহাজে চড়ে ভাস্তে ভাস্তে সবাই মিলে এক অজানা দ্বীপে এসে নামলেন। এদিকে ওদিকে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে সামনে দেখলেন একটা প্রকাণ্ড গুহা রয়েছে। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সাজান—বড় বড় পাত্রে ভরা রয়েছে দুধ। দেখেই মনে হয় যে, নিশ্চয়ই এখানে

কেউ বাস করে। মনের আনন্দে খাওয়া দেবে ওডিসীয়ুস্ আর তাঁর সৈন্যেরা তো সবাই সেই গুহার ভিতরই রয়ে গেল। ভাবলে যে, গুহার অধিকারী এলে তাঁর সঙ্গে আলাপ করে বন্ধুত্ব স্থাপন করবে। বিপদ যে কি ভীষণ আসছে, তা তো বেচারীরা কল্পনাও করতে পারে নি।



একটা প্রকাণ্ড ভেড়ার নীচে ঝুলে থেকে ওডিসীয়ুস্ সাইক্লপকে ফাঁকি দিল

এখন হয়েছে কি, এই দ্বীপটা ছিল এক-চক্ষু দৈত্যের দেশ—এদের বলা হ'ত সাইক্লপ্স্। সকলেরই কপালের মাঝখানে একটা ক'রে চক্ষু। সারাদিন তারা পাহাড়ে পাহাড়ে ভেড়ার পাল চরিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সন্ধ্যা বেলায় বাড়ী ফিরে আসে। যে গুহাটায় ওডিসীয়ুস্ আর তাঁর নাবিকেরা আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেটা ছিল সাইক্লপ্স্‌দের রাজার। সন্ধ্যা বেলা দৈত্যরাজ তার ভেড়ার পাল নিয়ে বাড়ী ফিরে এল; এসে গুহার মুখে একটা প্রকাণ্ড পাথর দিয়ে বন্ধ ক'রে দিলে। কুড়ি পঁচিশ জন লোকও ঠেলে তাকে সরাতে পারে না, এমনি ভারী পাথর সেটা। তারপর যখন দৈত্য বিশ্রাম করতে যাবে তখন দেখলে অন্ধকার গুহার এক পাশে ওডিসীয়ুস্ তাঁর লোকজন নিয়ে বসে আছেন। অমনি আর কি কথা আছে? বিনা বাক্যব্যয়ে কয়েকজনকে তুলে টপাটপ্ মুখে পুরে দিয়ে আরাম ক'রে দৈত্যরাজ ঘুম দিলে। পরদিন ভোরে উঠে আবার আরো কয়েকটিকে তুলে জলযোগ সেরে ভেড়ার পাল নিয়ে দৈত্য বেরিয়ে গেল। যাবার সময় কিন্তু পাথর দিয়ে সাবধানে গুহার মুখ বন্ধ ক'রে যেতে ভুলল না। ওডিসীয়ুস্ দেখলেন মহা বিপদ্। বসে বসে ভাবতে লাগলেন কি উপায়ে দৈত্যের হাত হ'তে রক্ষা পাওয়া যায়। অবশেষে সব ভেবে ঠিক্ ক'রে রাখলেন। ততক্ষণে সন্ধ্যা হ'য়ে এল। যথাসময়ে দৈত্য তো ফিরে এসে আবার তার জলযোগের আয়োজন করতে লাগল। ওডিসীয়ুসের সঙ্গে একটা চামড়ার থলেতে ছিল মদ। তাই এনে তার সামনে ধরে তিনি জানালেন যে, এ অতি সুস্বাদু পানীয়। এটা পান ক'রে পুরস্কার-স্বরূপ দৈত্যরাজ যেন তাদের সবাইকে মুক্তি দান করেন। দৈত্য তো খেয়ে মহাখুসী। বল্‌লে, "তোমার নাম কি?" ওডিসীয়ুস্ বল্‌লেন, "কেউ না"। দৈত্য বল্‌লে, "আচ্ছা, এর পুরস্কার এই যে তোমাকে সব চেয়ে পরে খাব।" বলেই আবার তাঁর কয়েকটি নাবিককে তুলে নিয়ে টপাটপ্ মুখে পুরে জলযোগ শেষ ক'রে ঘুমিয়ে পড়ল। মদের নেশায় দৈত্যের ঘুম যখন খুব গাঢ় হ'য়ে এসেছে, তখন ওডিসীয়ুস্ একটা তীক্ষ্ণ বর্শা আগুনে গরম ক'রে নিয়ে সেটা প্রাণপণ বলে দৈত্যের চোখে বিঁধিয়ে দিলেন। যন্ত্রণায় ভীষণ চীৎকার ক'রে দৈত্য তো জেগে উঠ্‌ল। তার চীৎকার শুনে অন্য দৈত্যারা সব ছুটে এল। কিন্তু দোরের সেই ভারী পাথর সরায় কার সাধ্য। তখন তারা বাইরে থেকে জিজ্ঞাসা করতে লাগল, "রাজা, তোমায় কে মেরেছে?" দৈত্যরাজ চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগল "কেউ না, কেউ না"। তারা সবাই বিরক্ত হ'য়ে বল্‌লে, "তবে কেন চীৎকার ক'রে আমাদের তুলে আন্‌লে?" বলে সবাই যে যার ঘরে ফিরে গেল। দৈত্যরাজ নিরুপায় হ'য়ে চুপ্ ক'রে রইল। এদিকে ওডিসীয়ুস্ করলেন কি—তাঁর নাবিকদের এক এক জনকে এক একটা ভেড়ার নীচে বেঁধে দিয়ে নিজেও অন্য একটার নীচে ঝুলে রইলেন। দৈত্যদের ভেড়া এক একটা

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কি না, কাজেই তার নীচে যে মানুষ রয়েছে তাকে খুঁজে বের করা একটু কঠিন কাজ।

ভোর বেলা দৈত্য ভেড়াগুলি নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় খুব সাবধানে তাদের পিঠ হাতড়ে দেখে নিল—যেন কেউ ভেড়ার পিঠে চড়ে বেরিয়ে যেতে না পারে। ভেড়ার নীচে ঝুলে যে এরা বেরিয়ে যাবে তা কি আর দৈত্য ভাব্‌তে পেরেছে? এদিকে বাইরে এসেই ওডিসীয়ূস্‌ তাঁর লোক জনদের নিয়ে একেবারে জাহাজে উঠে বস্‌লেন—আর তাঁদের ধরে কে? এমনি ক'রে তো এই মহাবিপদ্‌ থেকে সবাই উদ্ধার পেলেন!

সার্সি ইউলিসিস্‌কে যাদু-করা সরবৎ পান করিতে দিল

কিন্তু এখানেই কি এর শেষ আছে? এবার যেতে যেতে সবাই মিলে পড়লেন সায়রেন বলে রাক্ষসীর হাতে। এরা ছিল তিন বোন। দূর সমুদ্রের কোলে একটা পাহাড়ের উপর এরা থাকত। কোন জাহাজ যখন সে-পথে যেত তখন তারা তিন বোন অপূর্ব্ব রূপবতী তিনটি মেয়ের বেশ ধ'রে পাহাড়ের উপর বসে বসে গান গাইত। এমন মিষ্টি গান কেউ কখনো শোনেনি। বহুদূর থেকে সেই গানের অপূর্ব্ব ঝঙ্কার যখন নাবিকদের কানে যেত, তখন তারা পাগল হ'য়ে উঠ্‌ত।

আরো ভাল ক'রে শুন্‌বে ভেবে তারা পাহাড়ের নীচে জাহাজ এনে রাখত। তিন বোন তখন গান গাইতে গাইতে নেমে এসে তাদের ধরে খেয়ে ফেল্‌ত। গানের মায়ায় নাবিকেরা সব এমনি মুগ্ধ হ'য়ে থাক্‌ত যে, পালাবার কথা মনেও আস্‌ত না!

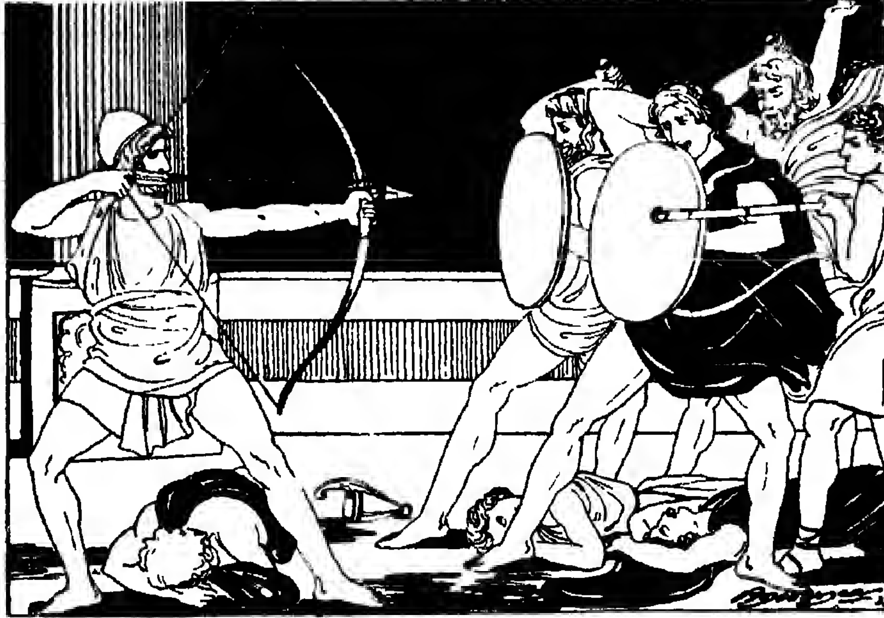
এখন ইউলিসিস্‌কে এই সায়রেণদের পাহাড় অতিক্রম করতে হ'বে। কি করা যায়? বুদ্ধি ছিল তাঁর আশ্চর্য্য; তার একটু পরিচয় তো তোমরা সাইক্লপ্‌সদের গল্পেই পেয়েছ! এবারও ভেবে ভেবে তিনি একটি সুন্দর উপায় ঠিক্‌ করলেন। মোম দিয়ে খুব

বুড়ো দাসী ইউলিসিস্‌কে চিনিতে পারিল

ভাল ক'রে তাঁর নিজের নাবিকদের সকলের কাণ বন্ধ ক'রে দিলেন, যেন গানের সুরের এতটুকু রেশও তাদের কাণে না যায়। নিজের কিন্তু তাঁর এই সায়রেণদের গান শুন্‌তে ভয়ানক লোভ হ'ল। তখন আপনাকে খুব শক্ত ক'রে জাহাজের মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে লোকজনদের বল্‌লেন সেই পাহাড়ের সামনে দিয়ে যেতে। সুরের সেই অপূর্ব্ব ঝঙ্কার যখন দূর থেকে কানে এসে লাগ্‌ল, তখন তিনি তো একেবারে পাগল হ'য়ে উঠলেন। কিন্তু হাত পা বাঁধা, কিছুই করবার উপায় তো নেই; কথা বল্‌লেও নাবিকরা শুন্‌তে

পাবে না। কারণ তাদের তো কান বন্ধ, কাজেই, নিরাপদে সায়রণেদের হাত এড়িয়ে সবাই চললেন। গানের সুর ক্রমে মৃদু হ'তে মৃদুতর হ'য়ে মিলিয়ে গেল। এমনি ক'রে আরো একটি বিপদের অবসান হ'ল।

এবার যেতে যেতে পড়লেন সার্সি বলে এক মায়াবিনীর হাতে। পথ ভুলে সব পথিক যারা তার দ্বীপে গিয়ে উঠত, সার্সী তাদের এক রকম যাদু-করা সরবৎ পান করতে দিত। ক্লান্ত পথিক সেই পানীয় শেষ করতে না করতেই জন্তুর আকারে পরিণত হ'য়ে যেত। ওডিসীয়ুসের অনুচররাও এই মায়াবিনীর মায়ায়



যারা পেনিলোপকে বিয়ে করতে এসেছিল তাদের মেরে তাড়িয়ে দিলেন

জানোয়ারে পরিণত হ'য়ে গেল। কিন্তু ওডিসীয়ুসের তীক্ষ্ণবুদ্ধির কাছে সার্সিও হারমানলে। ওডিসীয়ুস্ সেই পানীয় স্পর্শও করলেন না। তাঁর প্রখর বুদ্ধি দেখে সার্সি অত্যন্ত খুসি হ'য়ে গেল। পুরস্কারস্বরূপ সে সমস্ত জানোয়ারকে আবার মানুষ ক'রে দিলে।

এই রকমে কুড়িটি ভয়ানক বিপদের মাঝ থেকে নিজের অসামান্য বুদ্ধির বলে উদ্ধার পেয়ে অবশেষে ওডিসীয়ুস্ আপনার দেশে ফিরে এলেন। ট্রয়ের যুদ্ধের পর তখন আরো দশ বৎসর কেটে গিয়েছে। দীর্ঘ দশ বৎসর পরে ভ্রমণক্লান্ত ওডিসীয়ুস্ কিন্তু দেশে ফিরে যা দেখলেন তাতে বুঝলেন যে, নিশ্চিত বিশ্রামের অবসর জুটাবার আসা এখনও বহু দূরে।

কুড়িবৎসর হয়ে গিয়েছে তিনি দেশছাড়া! একমাত্র রাণী পেনীলোপ ব্যতীত আর সবাই তাঁর ফিরবার আশা ছেড়ে দিয়েছে। রাণী কিন্তু তাঁর প্রতিজ্ঞায় স্থিরচিত্তে দিন কাটাচ্ছিলেন। তাঁর মনে জাগছে যে ওডিসীয়ুস্ একদিন ফিরে আসবেনই। কিন্তু অন্যেরা তা মানবে কেন? পেনিলোপের সৌন্দর্য্য, বুদ্ধি আর উদারতার খ্যাতি ছিল দেশ জোড়া। কাজেই ইউলিসিস্‌কে মৃত মনে ক'রে যারা পেনিলোপকে বিয়ে ক'রে ইথাকার রাজা হবার আশায় সেখানে এসে উপস্থিত হলেন, তারা রাজপ্রাসাদেই অপেক্ষা করতে লাগলো। কৌশলে রাণী তাদের সবাইকে এতদিন ভুলিয়ে রেখেছিলেন। তিনি একটি কাপড় বুনতে আরম্ভ করলেন। সবাইকে বল্লেন যে, কাপড়টি বোনা যত দিন না শেষ হয় ততদিন তিনি বিয়ে করবেন না। সারাদিন বসে তিনি যেটুকু বুনতেন, রাত্রিতে বসে সেইটকু খুলে রাখতেন। কাজেই, বোনা আর তাঁর শেষ হচ্ছিল না।

এমনি ক'রে দিন কাটছিল। এমন সময় ওডিসীয়ুস্ ফিরে এলেন। এই দীর্ঘকালে তাঁর অনেক পরিবর্ত্তন হ'য়েছিল। তাঁকে যে মানুষ করেছিল সেই বুড়ো দাসী আর তাঁর কুকুর শুধু এই দুজনই তাঁকে চিনতে পারলে।

যাই হোক্ অবশেষে টেলিমেকাসের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে তাঁর সাহায্যে যারা সব পেনিলোপকে বিয়ে করতে এসেছিল তাদের মেরে তাড়িয়ে দিলেন। তখন সবাই শুনল যে ওডিসীয়ুস্ আবার ফিরে এসেছেন। পেনিলোপ তো প্রথমে বিশ্বাসই করতে পারলেন না যে হারানো ওডিসীয়ুসই আবার এতদিন পরে ফিরে দেশে এসেছেন। তারপর যখন বুঝলেন যে, সত্যি ইনি ওডিসীয়ুস তখন যে তাঁর কি রকম আনন্দ হ'ল তা তো তোমরা বুঝতেই পার। এতদিন পরে ওডিসীয়ুসেরও সকল বিপদের অবসান হল। স্ত্রী-পুত্রকে ফিরে পেয়ে তিনি সুখে আবার রাজত্ব করতে লাগলেন।



স্বরলিপি চিহ্নের ব্যাখ্যা

১। আমাদের সঙ্গীতে সাধারণতঃ তিনটি সপ্তকের ব্যবহার আছে। যথা উদারা (নিম্ন), মুদারা—(মধ্যম), তারা (উচ্চ)।

উদারা সপ্তকের চিহ্ন,— স্, র্, গ্, ম্, প্, ধ্, ন্।

মুদারা সপ্তকের চিহ্ন,— স, র, গ, ম, প, ধ, ন,।

তারা সপ্তকের চিহ্ন'— র্স, র্র, র্গ, র্ম, র্প, র্ধ, র্ন।

২। এই সাতটি স্বরের মধ্যে চারিটিতে কোমল ও একটিতে কড়ি আছে। তার চিহ্ন, যথা— কোমল রে-ঋ; কোমল গা - জ্ঞ, কোমল ধা = দ, কোমল নি - ণ ও কড়ি মা = হ্ম।

৩। মাত্রার চিহ্ন - া (আকার)। যথা— সা একমাত্রা, সা—া, দুই মাত্রা, সা—া—া তিন মাত্রা ইত্যাদি। দুটি বা ততোধিক স্বর এক মাত্রার মধ্যে ব্যবহারের চিহ্ন, যথা—সরা,— সরগা, সরগমা ইত্যাদি।

৪। আধ মাত্রার বিশেষ চিহ্ন -ঃ, যথা—সঃ, রঃ ইত্যাদি।

৫। কোনও এক স্বর যখন এক স্বরে বিশেষ ভাবে গড়িয়ে যায় অর্থাৎ যাকে বলে 'মীড়', তখন সেই দুইটি স্বরের মাঝে মাঝে উপরে এই ⁀ চিহ্ন বসে।—সা মা, মা জ্ঞা, সা ণা ইত্যাদি।

৬। স্বর টেনে রাখার সাধারণ চিহ্ন ছোট হাইফেন (-) স্বর বা মাত্রার মাঝে। আমি স্বরের মাঝে হাইফেন চিহ্ন বাহুল্যবোধে বর্জ্জন করেছি। কেননা, এক স্বরে থেকে আর এক স্বরে যাওয়া আসার সময় সুরের টান সাধারণতঃ গলায় থাকেই, তাই শুধু মাত্রার মাঝে হাইফেন অর্থাৎ স্বর টেনে রাখার চিহ্ন ব্যবহার করেছি। কারণ, সেটা দরকার না হলে নাও রাখা যায়। যেমন—বিরাম অর্থাৎ সুরের ক্ষণিক বিশ্রাম।

৭। হাইফেনবর্জ্জিত মাত্রা বা আকার বিরামের চিহ্ন অর্থাৎ যে কয় মাত্রায় হাইফেন নেই সেই কয় মাত্রা থেমে থাকতে হবে কিংবা থেমে পরবর্ত্তী স্বর অনুসারে গাইতে হবে। যথা — রা সা া া। মা পা না র্সা!

৮। তালের ভাগ চিহ্ন শুধু একটি বড় দাঁড়ি (।) ব্যবহার করেছি, এই সংক্রান্ত অন্য সব চিহ্ন বর্জ্জন করেছি বাহুল্য বোধে।

৯। যখন কোনও আনুষঙ্গিক স্বর কোনও স্বরকে ছুঁয়ে যায়, তখন ক্ষুদ্র অক্ষরে একটু উপরে এই রকম লিখিত হয়। যথা—স রা গা ইত্যাদি।

১০। অস্থায়ী যে পর্য্যন্ত গেয়ে অপর কলি ধরতে হয়, সে স্থানের উপর ॥ ছোট ছোট যুগল দাঁড়ি চিহ্ন বসে।

১১। পুনরাবৃত্তি চিহ্ন " { } "। যথা— { সা রা গা মা } অর্থাৎ এই অংশ দুইবার গাইতে হবে।

১২। পুনরাবৃত্তি লঙ্ঘনের চিহ্ন " () "। যথা— { সা রা (গা মা) পা ধা }। এই অংশ দ্বিতীয় বার আবৃত্তি করবার সময় "(গা মা)" এই অংশটুকু বাদ দিয়ে একেবারে "পা ধা" এই অংশ ধরতে হবে।

১৩। কোনও একটি কলি শেষ করে আস্থায়ীতে ফিরে যাবার সময় যদি আস্থায়ীর কোনও কোনও স্বরের পরিবর্তন হয়, তা হ'লে পরিবর্তিত স্বর পূর্ব্ব স্বরের মাথার উপরে এই রকম "[ ]" [গা] [ম পা ন র্সা র্রা র্সা] ব্রাকেটের মধ্যে দেওয়া হয়। যথা—সা রা সা, মা পা না ইত্যাদি।

১৪। প্রত্যেক কলির শেষে যুগল স্তম্ভ (II) বসে। যে কলির শেষে আস্থায়ীতে ফিরে যাবার দরকার, সেখানে যুগ্ম যুগল স্তম্ভ ··II II বসে। গানের প্রথম যুগল স্তম্ভ আমি সাধারণতঃ ব্যবহার করেছি কলি শেষ ক'রে আস্থায়ীতে ফিরে গিয়ে ঠিক্ যেখান থেকে ধরতে হবে তারই আগে।

গান

মিশ্র বেহাগ খাম্বাজ——দাদরা

মোরা নাচি ফুলে ফুলে দুলে দুলে,
মোরা নাচি সুরধুনি কূলে কূলে।
কখনো চলি বেগে, কভু মৃদু চরণে,
কখনও ছুটি মোরা ফল হরণে,
কোথা হ'তে এসেছি, কবে যে ভেসেছি,
তা গেছি ভুলে।

খেলি লুকোচুরি কভু বনে;
মাতি নিধি সনে কভু রণে;
ভাসি আকাশে নীরদ সনে শত পাল তুলে।
যখন থাকি ঘুমে, থাকে ঘুমে ধরণী
গহন, নদী নিধি, নভে মেঘ তরণী,
পুনঃ জাগে হরষে, মোদের পরশে, নয়ন খুলে।

স্বরলিপি

+ ০
II { সা না -া | সা -া রা | -া রা -া | রা -া গা | রা গা -া
মো রা - না - চি - ফু - লে - ফু - লে -

+ ০ ||
মা -া ধপা | ক্ষপা মা -া | গা -া -া | }
দু - লে - দু - লে - -

+ [মা গা গমপধনর্সা না] [ধপমগরগা]
{ গা মা -া | পা -া পা | -া পা ক্ষা | ধা পা মা | গা রগা -া
মো রা - না - চি - সু - র - ধু - নী -

+ ০
মা -া ধপা | ক্ষপা মা -া | গা -া রা | } II
কু - লে - কূ - লে - -

+ ০
-া -া সা | গা গা -া | া মা -া মা | মামা -া | মা গা পা
- - ক থ নো - চ - লি বেগে - ক - ভু
- - য খ ন - থা - কি ঘুমে - থা - কে

০ +
মা গা মা | রা -া গা | রা গা মা | গা -া গা | গা গা মা
মৃদু - - চ - - র - - ণে - ক থ নো -
ঘুমে - - ধ - - র - - ণী - গ হ ন -

০ + ০
পা -া পা | ধা পা -া | পা -া পা | পা পা া- | পা -া ক্ষা
ছু - টি মো রা - ফু - ল ফ ল - হ - -
ন - দী নি ধি - ন - ভে মে ঘ - ত - -

\+

পক্ষা পা ধা | ক্ষধা পক্ষা পা | (পা মা গা |) } া -া া | -া -া -া |

র - - - গে - ক ক থ নো - - - - -

ব - - ণী - - য খ ন - - - - -

\+

{ -া মা গম | পা -া পা | -া পা -া | পা | পা -া পা | -া ধা |

- কো থা- হ' - তে - এ - সে সে - ছি - ক -

- পু নঃ জা - গে - হ - ব যে যে - - মো -

\+ ০ +

না -া র্সা | না ধা -া | না ধা পা | { -া মা গা | মা -া ধপা

বে - যে - ভে - সে সে - ছি - তা : গে ছি -

দে - র - প - র শে - ন - য ন -

০

ক্ষপা মা -া | মগা রগা | II

- তু - লে - -

খু - লে - -

\+ ০ +

{ পা -া পা | -া পা -া | পা -া না | ধা না -া | র্সা -া নর্সা |

খে - লি - লু - কো চ্ - - বি - ক - ভু

\+

র্রা র্সা না | সা -া -া | -া -া -া | পা র্সা র্সা | -া র্সা -া |

- ব - নে- - - - মা - তি - নি-

• +

না -া না | -া ধা না | না সা ধনা | র্রর্সা না -া | ধপা |

দি - স - - নে ক - ঃ র ণে - -

\+ ০

মা গা -া | (পা -া পা | - পা -া | না পমা | গা মা -া |

- - - খে - লি লু - কো - চ্ - রি -

\+ ০ +

পা - না | -া না র্সা | ধনা -া গা | -া মা -া |) } গা ণা ণা |

খে - লি - লু কো চ্ রি - ভা - সি

০ +

-া ণা -া | ধা -া ধা | -া ধা ণা | ধা -া র্সণা | ধণা ধা -া |

- আ - কা - শে - নী র - দ - -- স

০ + ০

পা -া -া | মা গা -া | মা -া ধপা | ক্ষপা মা -া | মগা রগাঃ রঃ | II II

নে - - শ ত - পা - ল ' - তু - লে - -

১২



জাতীয়তার কথা

জাতীয়তার আদর্শ মানুষের মনে খুব বেশীদিন ধরিয়া জাগে নাই। প্রথম শুনিলে একথা হয়ত বিশ্বাস হইবে না, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এ উক্তি সত্য। জাতীয়তা বলিতে আজকাল আমরা কি বুঝি ?··· একটি সমষ্টির লোকের মধ্যে এমন কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ আছে যাহার ফলে তাহারা একত্র সংঘবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে এবং তাহাদের এই গুণগুলির প্রকাশ এবং পরিস্ফুটনের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র-স্থাপন করিতে চায়। একটি দলের মধ্যে বর্তমান এই যে এক প্রকারের বিশিষ্ট গুণ, ইহা নানাকারণে হইতে পারে। বহু বছর ধরিয়া এক জায়গায় বাস করিলে এই একজাতীয় বিশিষ্ট মনোবৃত্তির সৃষ্টি হইতে পারে। এই ধর্মাবলম্বী হইলেও ইহার উদ্ভব হয়। একই প্রবংশ (race) হইতে যদি এক সমষ্টির লোক উদ্ভূত হয় তাহা হইলেও এই মনোভাব জন্মিতে পারে। সবচেয়ে বেশী প্রবল হয় এইবোধটি, যদি একদল লোক একই অবস্থায় কোন রাজা বা শাসনকর্তার অধীনে একভাবে সুখদুঃখ অনুভব করিতে শিখে। তখন নিজেদের অদৃষ্ট সম্বন্ধে যে একটা একতার সৃষ্টি হয় তাহার বন্ধন খুবই দৃঢ় হয়।

এই যে একত্ব-বোধ, ইহা পাঁচ শত বছর আগেও কোন সমষ্টি বা জাতির মধ্যে দেখা যায় নাই। রোম্যান্ এবং গ্রীক্ সাম্রাজ্য স্থাপিত হইয়াছে খৃষ্টের জন্মের বহু দিন আগে, কিন্তু তখন এই বিচিত্রি-একত্ব বোধ ছিল না। আমাদের দেশেও চন্দ্রগুপ্ত বা অশোকের সময় এই জাতীয়তা বোধ ছিল না। ইউরোপে মধ্য-যুগ পর্য্যন্ত ধর্ম্মযাজকের প্রভাবই ছিল খুব বেশী এবং তাঁহারা ছিলেন অনেকটা বিশ্বপ্রেমিক। কোন বিশেষ জাতি বা দেশকে প্রাধান্য দেওয়া তাঁহাদের নীতিবিরুদ্ধ ছিল এবং তাঁহাদের গুরু পোপ্ ছিলেন সকল দেশেরই ধর্ম্ম-উপদেষ্টা। পোপ্ যে শুধু ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন এমন নহে, রাজনৈতিক অনেক ব্যাপারেও হস্তক্ষেপ করিতে তিনি ইতস্ততঃ করিতেন না।

এই ব্যবস্থার মূলে প্রথম বিপ্লব ঘটিল প্রোটেষ্ট্যান্টি-জম্-এর অভ্যুদয়ে। তখন ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ। খৃষ্ট-ধর্ম্ম তখন প্রায় পোপেরধর্ম্ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ধর্ম্মযাজকদের মধ্যে নানারকম কুসংস্কার, গোঁড়ামি এবং উচ্ছৃঙ্খলতা দেখিয়া মার্টিন লুথার প্রতিবাদ আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সঙ্গে পোপের ভীষণ সংঘর্ষ বাধিল। ফলে, মার্টিন লুথারের অধিনায়কত্বে ইউরোপে খৃষ্টধর্ম্মের এক নূতন শাখার (প্রোটেষ্ট্যান্টিজ্ম্-এর) সৃষ্টি হইল।

ইহার পরই ইউরোপের নানা রাজ্যের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিরোধ সুরু হইল। একদল পোপের পক্ষাবলম্বন করিল, অপর একদল মার্টিন লুথারের প্রবর্ত্তিত নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। পোপ সমস্ত ইউরোপের ধর্ম্মগুরু হিসাবে সকল দেশের রাজার উপরেই তাঁহার ক্ষমতা বিস্তার করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ইংলণ্ড জার্ম্মাণী এবং আর অনেক দেশ খুবই গম্ভীর ভাবে প্রচার করিল যে, তাহাদের নিজেদের দেশের ধর্ম্ম নিয়ন্ত্রণ করিবার অধিকার তাহাদের নিজেদের রাজার, বাইরের ধর্ম্মগুরু, পোপের নয়।



এইভাবে জাতীয়তার প্রথম উদ্ভব। কিন্তু এই যে জাতীয়তার সূচনা হইল, ইহাকে ঠিক জাতীয়তাবোধ বলা চলে না। কারণ, বিভিন্ন জাতির জনসাধারণ ইহাতে একটুও উদ্বুদ্ধ হইল না, কয়েকটি রাজা নিজেদের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া এই সুযোগ তাহার একটু সদ্ব্যবহার করিলেন মাত্র। লোকের একত্ববোধ – যাহা জাতীয়তার ভিত্তি—তাহা তখন পর্য্যন্ত জাগিল না।

লোকের চেতনা হইল ফরাসী বিপ্লবের প্রারম্ভে এবং পরে। সে হইতেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের কথা। রাজা এবং শাসনযন্ত্রের অত্যাচারে সারা ফরাসীদেশ ক্ষেপিয়া উঠিল, বিপ্লবের ধ্বজা উড়িল। ফরাসীদেশের জনসাধারণ দেখিল, একত্র হইয়া তাহারও অসম্ভবকে সম্ভব করিতে পারে। তাহার পর তাহারা "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা" এই বাণী প্রচার করিয়া সমস্ত ইউরোপকে আহ্বান করিল তাহাদের পতাকার নীচে সমবেত হইতে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত ফরাসীদেশের লোকেরা তাহাদের নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যস্ত ছিল, ততক্ষণ সমস্ত ইউরোপ তাহাদের প্রতি সহানুভূতিই প্রকাশ করিয়াছিল। ফরাসীবিপ্লবের ঢেউ ইউরোপের অন্যান্য দেশের জনসাধারণকেও চঞ্চল এবং আত্মজ্ঞানসম্পন্ন করিয়া তুলিয়াছিল, এবং তাহারও তাহাদের দেশের শাসনযন্ত্রকে পরিবর্ত্তন করিতে উদ্যোগী হইতেছিল।

এমন সময় ফরাসীদেশে বিশ্ববিশ্রুত নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভ্যুদয় হইল। তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার সম্মুখে বিপ্লবের সমস্ত ঢেউ থামিয়া গেল। খুবই ধীরে ধীরে অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার সহিত তিনি সমস্ত ফরাসী দেশের অধিনায়ক হইয়া বসিলেন।

কিন্তু ফরাসী দেশের অধিনায়কত্ব পাইয়াই তিনি তৃপ্ত থাকিতে পারিলেন না। তাঁহার আশা ছিল, অদম্য, আকাঙ্খা ছিল বিশাল। ধীরে ধীরে তিনি ইউরোপের রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সুদক্ষ সেনাবাহিনীর সম্মুখে সমস্ত ইউরোপ মাথা নত করিল।

ইতিমধ্যে ফরাসীবিপ্লব মন্ত্রে সমস্ত ইউরোপের জনসাধারণের চেতনা হইয়াছে। নেপোলিয়ন ইউরোপের রাজাদের পদানত করিলেন বটে কিন্তু জনসাধারণকে পারিলেন না। তাহারা দেখিল, নেপোলিয়ান "সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা"র পুরোহিত নহেন, তিনি হইতেছেন সাম্রাজ্যলোলুপ অত্যাচারী— এই লালসার সম্মুখে অন্যদেশ বা জাতির স্বাধীনতাকে বলিদিতে তাঁহার এতটুকু কুণ্ঠা হয় না।

প্রত্যেক দেশের নরনারীর বিশিষ্ট একত্ববোধ প্রবল হইয়া উঠিল। প্রত্যেক দেশের জনসাধারণ তাহার বিরুদ্ধে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল; ফল হইল এই যে, কয়েক বছরের মধ্যে নেপোলিয়নের বিশাল সাম্রাজ্য তাসের ঘরের মত ভাঙ্গিয়া গেল। জাতীয়তার প্রচণ্ডশক্তির সম্মুখে আপনার পরাজয় স্বীকার করিয়া নেপোলিয়ান নির্জ্জন সেণ্ট্‌হেলেনা দ্বীপে চিরকারাবাস বরণ করিয়া লইলেন।

ইহার পর হইতেই জাতীয়তার প্রধান স্বরূপ প্রকাশিত হইতে লাগিল। সারা ঊনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপের সমস্ত জাতি উঠিয়া পড়িয়া লাগিল তাহাদের একত্ব বোধকে দৃঢ়ীভূত করিতে। এতদিন জার্ম্মাণী অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল, সেখানে বিস্মার্কের নেতৃত্বে বিশাল জার্ম্মাণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হইল। এদিকে ইটালীর জাতীয়তা-যজ্ঞে পুরোহিত হইলেন ম্যাট্‌সিনী ও গ্যারিবল্ডী। ম্যাট্‌সিনী গম্ভীর কণ্ঠে জাতীয়তার মন্ত্র প্রচার করিলেন— অত্যাচারী অষ্ট্রিয়াকে দূর করিতে হইবে, ছোট ছোট প্রদেশগুলি সংঘবদ্ধ করিতে হইবে, সাম্য এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। তাঁহার এই বাণীর আহ্বানে সমস্ত ইটালী জাগিয়া উঠিল, এবং এই যজ্ঞের সম্পূর্ণতা আনিল গ্যারিবল্ডীর শৌর্য্য এবং সাহস।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রারম্ভে এই জাতীয়তা বোধই নানাবিপ্লবের সৃষ্টি আরম্ভ করিল। জাতীয়তা বোধসম্পন্ন দেশগুলি—বিশেষতঃ ফ্রান্স, ইটালী, জার্ম্মাণী এবং রুশিয়া মনে করিতে আরম্ভ করিল যে, তাহাদের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিতে হইলে তাহাদিগকে সর্ব্বদা রণসাজে সজ্জিত থাকিতে হইবে। রণসম্ভার লইয়া তাহাদের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইল। এদিকে দক্ষিণপূর্ব্বসীমান্তে বলকান রাজ্যসমূহের মধ্যে অন্তর্বিপ্লব জাগিয়া উঠিল, তাহাদের প্রভু তুরস্ক এবং অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে। ফল হইল এই যে, সামান্য একটা অছিলায় যখন মহাসমর বাধিয়া উঠিল তখন সকল রাজ্যই নিজ নিজ জাতীয় আত্মসম্মান রক্ষা করিবার মিথ্যা একটা প্রেরণায় যুদ্ধে ঝাঁপ দিয়া পড়িল।

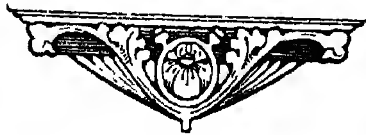
চারবৎসর ব্যাপী অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর যখন শান্তি স্থাপিত হইল তখন সকলেই দেখিল জাতীয়তার প্রচণ্ড

একটা অহমিকার উদ্দীপ্ত হইয়া তাহারা যে তাণ্ডব-সংহারে মত্ত হইয়াছিল তাহাতে জগতের বা বিজেতা দেশসমূহের কোন কল্যাণ সাধিত ত হইলই না বরং সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিক নানা সমস্যা রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া দেখা দিল। কয়েকজন দূরদর্শী নেতা দেখিলেন জাতীয়তাবোধকে ভাল ভাবে সংযত না করিলে ইউরোপীয় সভ্যতার পরিত্রাণ নাই, তাই তাঁহারা প্রতিষ্ঠা করিলেন আন্তর্জাতিক মহাসংঘ বা লীগ্ অব্ নেশন্‌স্ এর। এই মহাসংঘ জাতীয়তা-বোধের অহমিকাটুকু নিয়মিত করিবার ভার লইয়াছে। ইহার কার্য্য-প্রণালীর কথা পরে আলোচনা করিব।

এই ত ইউরোপের জাতীয়বাদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। আমাদের দেশের জাতীয়তাবাদের ইতিহাস আরও ছোট। ইংরেজদের এদেশে আসার পূর্ব্বে যথার্থ জাতীয়তাবোধ আমাদের ছিল কি না, সন্দেহ। জনসাধারণের রাষ্ট্রগত একত্ববোধের সৃষ্টি হইয়াছে বৃটিশশাসনের সংঘাতে। আমাদের দেশের নানাধর্ম্ম-সম্প্রদায় এবং ভাষা স্বভাবতঃই কোন দৃঢ় একত্ববোধের পরিপন্থী কিন্তু বিগত পঁচিশ ত্রিশ বৎসর ধরিয়া এই সব বিভিন্নতা সত্ত্বেও আমাদের দেশে যে একটি জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হইয়াছে তাহা নিরপেক্ষ বিচারক মাত্রই স্বীকার করিবেন। আমাদের সার্ব্বজনীন দারিদ্র্য, আমাদের অভাব অভিযোগ, আমাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতালাভের দাবী, এসমস্তই আমাদের জাতীয়তা-বোধকে সংহত এবং প্রবুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, এবং এই চেতনা ধীরেধীরে আমাদের মূর্খ কৃষক এবং দিন-মজুরদের মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িতেছে।

জাতীয়তা এই কথাটির মধ্যে এমন একটি সম্মোহন-শক্তি প্রচ্ছন্ন আছে যে, মানুষ স্বভাবতঃই ইহার কাছে মাথা নত করে। এই বোধটি অতি মহৎ এবং সূক্ষ্ম, কিন্তু তাই বলিয়া ইহা যে সব সময়ই সুস্থ এবং সাধু, তাহা বলা যায় না। জাতীয়তাবোধ যদি রাষ্ট্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের মধ্যে তীব্র এবং পৃথক ভাবে দেখা যায়, তবে রাষ্ট্রের ঐক্য তাহাতে নষ্ট হইয়া যায়। জাতীয়তাবোধসম্পন্ন প্রত্যেক সমষ্টিই যদি নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র বা শাসনের দাবী করে, তাহা হইলে বিশাল রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকে না, এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক রাষ্ট্রের সৃষ্টিতে জগতের অকল্যাণই হয় বেশী। আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খৃষ্টান ইহারা সকলেই যদি বলে যে তাহাদের জন্য পৃথক্ রাষ্ট্র চাই, তাহা হইলে ভারতের সংহত জাতীয়তা থাকে কোথায়? শুধু তাহাই নয়, জাতীয়তাবোধ প্রবল হইলেই অন্যান্য দেশ জয় করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়; জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ পদানত করিবার ইচ্ছা জাগে এবং তখনই সাম্রাজ্যবাদের Imperialism এর) গলদগুলি পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সর্ব্বোপরি খুব তীব্র জাতীয়তা বোধের ফলে বিদ্বেষ, প্রতিযোগিতা এবং সংঘর্ষের সম্ভাবনা বর্দ্ধিত হয় এবং তখন জাতীয়তার চেয়েও বড় আন্তর্জাতিকতার আদর্শ ভুলিয়া যাইবার ভয় থাকে।

তাই বলিয়া জাতীয়তার আদর্শ যে অলীক বা অসার এমন নয়। সবদেশের বা জাতিরই কোন না কোন বিশিষ্ট গুণ আছে। জাতীয়তা বোধ এই গুণগুলি রক্ষা করিবার পক্ষে সহায়তা করে। জাতীয়তাবোধ যদি না থাকিত, তবে আজ আমরা নানাদেশের বিচিত্র সাহিত্য বা চিত্র সম্ভারের অধিকারী হইতে পারিতাম না; নানাদেশের রাষ্ট্রগত বৈশিষ্ট্য এবং উৎকর্ষ ও মানুষের অজানা থাকিত। হাজার হইলেও মানুষ নিজের পারিপার্শ্বিক স্বাতন্ত্র্য ভুলিতে পারে না, সে যে বিশ্বের সন্তান তাহা বুঝিতে তাহার দেরী লাগে। যতদিন পর্য্যন্ত মানুষের মন এই রকম থাকিবে, জাতীয়তাবোধের মূল্য সভ্যতার ইতিহাসে এতটুকুও কমিবে না।











পিঠে তার আঁটা তার
জীবন্ত বর্ম,
নাকে শিং- [illegible] দিয়ে
মাটি খোঁড়া কর্ম।
বড়ো তার দেহখান
কুঁচকানো চর্ম
চলে সদা এক রোখে
বোঝা তার মর্ম॥



[illegible] বোনো [illegible]
[illegible] উঁচু
[illegible]
[illegible] জুড়ে [illegible]।
দেখতে ভারি [illegible]
[illegible] বড়,
একটুতে হয় [illegible]
[illegible]



ছিপছিপে দেহখানি
[illegible],
[illegible]
দেখো, [illegible]
গায়ে তার [illegible]
বড় বড় চোখ,
দেখে তাকে [illegible]
খুশী হয় লোক॥



টগ্‌বগ্‌ টগ্‌বগ্‌
বগি টেনে চলে,
বাঁকা ঘাড়ে ডাক ছাড়ে
লোকে ঘোড়া বলে।
পথে যেন চলে সেজে
কাজ বেশী ভারি,
চিঁহি চিঁহি ছাড়ে ডাক
মাঝে মাঝে তারি॥



কাফ্রি দেশে জেব্রা থাকে
ঘোড়ার মতন দেহ,
বাঘের মতন ডোরা-কাটা—
পোষ মানে না কেহ।
বনের ছাড়া ঘোড়া এরা
থাকে দলে দলে,
হাওয়ার বেগে আপ্‌নি এরা
ছুটে ছুটে চলে॥



পরের বোঝা বইবে সোজা
গর্দভ লম্বকর্ণ,
মাথার ভারে চলতে নারে,
উজ্জ্বল মেটে বর্ণ।
আকাশখানি সকমোটা
ভোজন করেন পর্ণ,
তাহার চিঁ-পোঁ ডাকে ছোটে
হাবে মাণিক স্বর্ণ॥



খরগোশ থর থর
কান দুটি তুলে
বন থেকে বের হ'য়ে
পথ ভুলো ভুলে
নিমেষে যে সে নাহি,
কে বা তারে পায়.
কান তুলে সদা দেখে
ফিরে ফিরে চায়।
মিউ মিউ বাঘ মাসী
মিটি মিটি চায়,
বাগে পেলে চুরি করে
মাছ পাত খায়।
দুধ খেতে কাছে আসে
ভয়ে দেখে তাই
এই দেখ আছে ঘরে
এই দেখ নাই!
ঘেউ ঘেউ ঘেউ ডাকে
ঘর দেখি ভ'রে রাখে,
ফেলে পরে কিছু দিকে
আর দেখা নাই।
খায় দায় থাকে শুয়ে
বিছানায় কভু শুয়ে.
যাহা দিবে খেয়ে নেবে
দিলে পাবে তাই।



পারস্য

৭৭৫ পৃষ্ঠার পর

সাধারণ পরিচয়

পারস্য দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার একটি বিখ্যাত দেশ। প্রাচীন কালে পারস্য সাম্রাজ্যের খুবই খ্যাতি ছিল। সে সময়ে আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ দিক দিয়া (খৃঃ পূঃ ৫২২—৪৮৬) সমুদয় কাবুল প্রদেশ গান্ধার এবং থর বা ভারতীয় মরুভূমির সীমান্ত পর্য্যন্ত সমুদয় দেশ পারস্য নৃপতিদের অধিকারভুক্ত ছিল। বর্ত্তমান সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য নেহাৎ ক্ষুদ্র নহে; কিন্তু পূর্ব্বের গৌরব আর নাই। বর্ত্তমান পৃথিবীর ইতিহাসে পারস্য এশিয়ার একটি স্বাধীন দেশ বলিয়া পরিচিত হইলেও তেমন প্রসিদ্ধ নহে।

সীমা ও পরিমাণ

পারস্য সাম্রাজ্যের পরিমাণ উত্তর-দক্ষিণে ৭০০ মাইল এবং পূর্ব্ব-পশ্চিমে ৯০০ মাইল। মোট পরিমাণ ৬২৮,০০০ বর্গ মাইল। উত্তর সীমায় ট্রান্‌স্‌ককেশিয়া (Transcaucasia), কাস্পিয়ান সাগর (Caspian Sea) রুশ-তুর্কিস্থান (Russian-Turkistan), আর পূর্ব্ব দিকে তুর্কিস্তান (Turkistan), বেলুচিস্থান (Beluchistan) এবং আফগানিস্তান (Afganistan)। দক্ষিণে পারস্য উপসাগর (Persian Gulf) এবং ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে পারস্য উপসাগর ও এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত তুরস্ক। লোকসংখ্যা আনুমানিক ৯,৫০০,০০০। প্রতি বর্গ মাইলে পনের জন মাত্র লোক বাস করে। পারস্যের লোকেরা তাহাদের দেশকে "ইরাণ" বলিয়া পরিচয় দেয়।

পারস্যের অধিবাসী

এদেশের লোকেরা আর্য্য জাতির ইরাণীয় শাখার অন্তর্গত। বর্ত্তমান সময়ে ইহাদের মধ্যে মোঙ্গোলিয়, তাতার, আরব এবং তুর্কীদের রক্তের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। সহর ও গ্রামের লোকেরা এখনও সেকালের প্রাচ্য বা পূর্ব্ব দেশের আদর্শ ভুলিয়া যায় নাই, পাহাড়ের দিকে বা পার্ব্বত্য অঞ্চলে বেশীর ভাগই একটা অসভ্য জাতির বাস—ইহারা চাষ-বাস করিয়া ও পশুপালন করিয়া এখান হইতে ওখানে এইভাবে নানাস্থানে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া বাস করে। সুন্নি সম্প্রদায়ের মুসলমানের সংখ্যাও হইবে প্রায় ৮,৫০,০০০। এতদ্ব্যতীত পার্শি, ইহুদী, আর্মেনীয় প্রভৃতি জাতীয় লোকেরও বাস আছে।

সাধারণ বর্ণনা

পারস্য দেশ একটি উচ্চ মালভূমি। এই মালভূমি অসমতল এবং সাধারণ ভাবে প্রায় দুইহাজার ফুট উঁচু হইবে। আবার নানা পর্ব্বতশ্রেণীর দ্বারা বিভক্ত। সেজন্য কোথাও মরুভূমি, কোথাও সমতল ভূমি এইরূপ দেখা যায়। দেশের মধ্যভাগের উচ্চতা সমুদ্রতটরেখা হইতে প্রায় ৬০০০ ফুট উঁচু। সীমান্ত প্রদেশগুলি পাহাড়-পর্ব্বতে ঢাকা। সেই পাহাড়ের মধ্য দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া অসমতল পথ চলিয়া গিয়াছে। দেশের মধ্যস্থলে মরুভূমি। মরুভূমিটি সুবৃহৎ। এই মরুভূমির জন্য দেশের আবহাওয়া, রাষ্ট্রনীতি এবং অধিবাসীদের ধর্ম্ম ও চরিত্রের মধ্যে অনেকখানি প্রভেদ দেখা যায়।

এই বিরাট্ মরুভূমির নাম লুট্ (Lut)। ইহার মধ্যে কতকগুলির স্থানের নাম কাভির(Kavir)। মধ্যবর্ত্তী

দুই পর্ব্বতশ্রেণী ছাড়া পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি উত্তর-পশ্চিমে ও দক্ষিণ-পশ্চিমে যে পাহাড় আছে

পারস্যের মানচিত্র

মালভূমির উত্তর ও দক্ষিণদিকে দুইটি পর্ব্বত শ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়। এই দুই পর্ব্বত-শ্রেণী হইতে অন্যান্য ছোট ছোট পাহাড়ের সারি নানাদিকে চলিয়া গিয়াছে। এলবার্জ (Elburz) পর্ব্বতশ্রেণীর মাবেন্দ (Demavend) পর্ব্বত-চূড়া উচ্চতায় ১৮,৫০০ ফিট্। এই



এলবার্জ পর্ব্বতের উপরিস্থ এক অধিত্যকা

তাহার উচ্চতাও স্থানে স্থানে নেহাৎ ন্যূন নহে

পারস্যে নদীর সংখ্যা বড় কম। এমন কি, সমগ্র পারস্যে কারুণ (Karun) নদী ছাড়া এমন একটি নদী নাই, যেনদীর ভিতর দিয়া নৌকা চলাচল করিতে পারে,

এদেশে হ্রদ অনেক আছে। কতকগুলির জল মিষ্ট, কতকগুলির জল লোণা। এদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হ্রদের নাম হইতেছে উরুমিয়া (Urumiah)।

এ দেশের আবহাওয়া বিচিত্র রকমের—এক এক প্রদেশে এক এক প্রকার। মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডের আবহাওয়া শীতের সময় যেমন অতিশীত, গ্রীষ্মকালে তেমনি অতি-গ্রীষ্ম! পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি স্থানেও গ্রীষ্মের সময় মানুষের বাস অসম্ভব হইয়া পড়ে। কাস্পিয়ান সাগরের যেদিকে বনভূমি, সেদিকে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুবই বেশী।



টেহেরানের উত্তর দিকস্থ এলবার্জ পর্ব্বতের একটি ক্রমনিম্ন পথ



নামড পরিবার তাহাদের উষ্ট্র ও অশ্ববাহিনী লইয়া পার্ব্বত্য পথের উপর দিয়া যাইতেছে

পারস্য দেশ খনিজ দ্রব্যের জন্য বিখ্যাত। এদেশে লোহা, তামা, সীস, রসাঞ্জন প্রচুর পাওয়া যায়। নিশাপুরে Turquoise জাতীয় খনিজ পদার্থের খনি আছে।

এ দেশে চাষের জমি বড় কম। চাষবাসের জন্য এখনও সেকালের সহজ যন্ত্রপাতি ব্যবহার হয়। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে যব, গম, ধান, মটর, সীম,

মসুর, কলাই এবং জনার প্রধান। তুলাও এ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কাস্পিয়ান হ্রদের দিক্‌টায় রেশমও জন্মে খুব বেশী। সেই রেশমই ইস্পাহান ও অন্যান্য স্থান হইতেই নানা দেশে রপ্তানী হয়। তামাকও পারস্য হইতে প্রচুর পরিমাণে বাহিরে রপ্তানি হইয়া থাকে। আফিমের চাষ দিনদিনই বাড়িয়া চলিয়াছে।



বন্দর আব্বাসের নিকটস্থ খর্জ্জুরকুঞ্জের নিকটস্থ ভূমিতে কৃষক ক্ষেত্র কর্ষণ করিতেছে

এখানকার দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে নীলের চাষও হয়। এদেশে প্রচুর পরিমাণে ফল পাওয়া যায়। পারস্যের তরমুজ ও খেজুর ভুবন-বিখ্যাত।

পারস্যের উট, ঘোড়া খচ্চর, ভেড়া, গৃহপালিত জন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জন্তু বলিয়া গণ্য। এখানকার ভেড়ার লোম দেশবিদেশ চালান দেওয়া হয়।

এদেশে কলকারখানা নাই বলিলেই চলে। সৌখীন দ্রব্য—কার্পেট (গালিচা) কুটীর শিল্পের মধ্যে পরিগণিত। এদেশের কার্পেট হাতে তৈয়ারী হয়। এদেশের গালিচার কারুকার্য্য দেখিবার মত বটে। এখানকার পশমী শাল যেমন সুন্দর তেমনি গরম।

১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পারস্যে প্রথম মাত্র ছয় মাইল দীর্ঘ রেলপথ খোলা হয়। বেলজিয়ামের একটি কোম্পানী টেহেরান্ (Teheran) হইতে অব্দুল আজিম (Abdul azim) নামক একটি ছোট পল্লীর সহর পর্য্যন্ত রেল-পথ খোলেন। ইহার পর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাসে এক রুশ কোম্পানী রুশিয়া সীমান্তের জুল্‌ফা (Julfa) নামক স্থান হইতে তাব্রিজ (Tabriz) পর্য্যন্ত রেল পথ খুলিয়াছিল। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট কারুণ নদীতে ষ্টীমার চালাইয়া থাকেন। বড় বড় সহর হইতে কতকগুলি ভাল ভাল পাকা রাস্তা তৈয়ারী হইয়াছে। এই সব পথে উট্-গাড়ী ও লোকজন যাতায়াত করিয়া থাকে। বড় বড় সহর হইতে নিয়মিত ভাবে ডাক চলাচল করে। তার বা



খোরাসান প্রদেশের একটি গ্রাম্য পথের উপর দিয়া গ্রাম্য নর-নারীগণ যাইতেছে

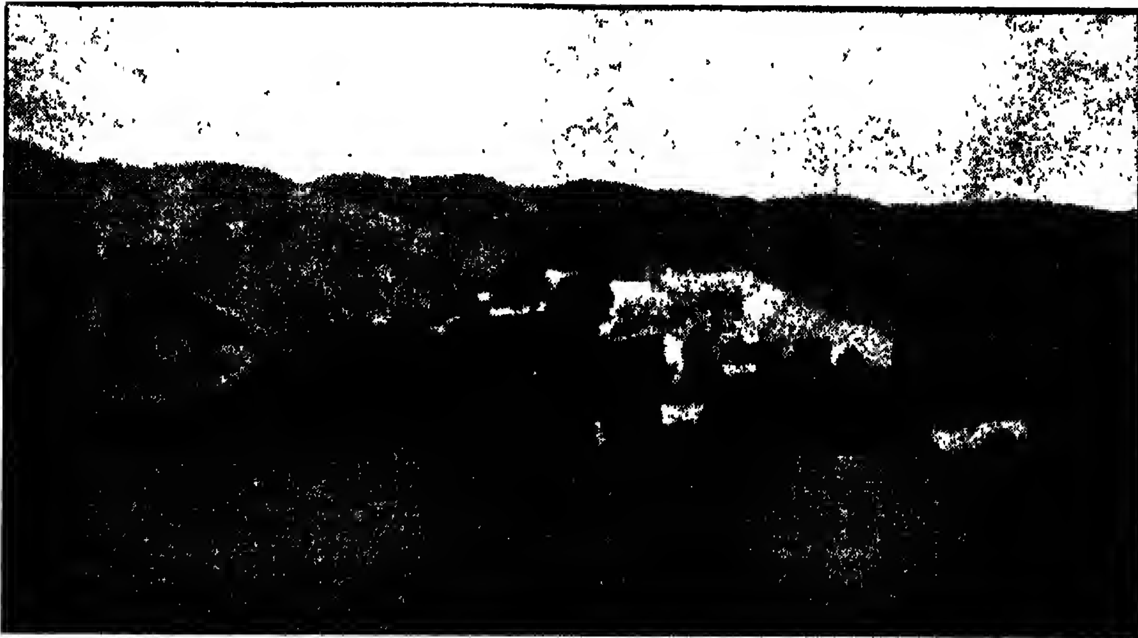
টেলিগ্রাফের লাইন ১০,৭৫০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে।

পারস্যের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র হইতেছে-তাব্রিজ (Tabriz), টেহেরান্ (Teheran) এবং ইস্পাহান্ (Ispahan)। পারস্যের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চলের ব্যবসা-বাণিজ্য সাধারণতঃ উট, খচ্চর ইত্যাদির পিঠে করিয়া চালান দেওয়া হয়। এ সকল পথে চুরি, ডাকাতি খুব বেশী হইয়া থাকে। কাস্পিয়ান সাগর ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্ত্তী বন্দরে বিদেশী জাহাজ প্রায়ই যাতায়াত করে। এই দেশের বহির্বাণিজ্য চীন, তুর্কী, ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকার নানাদেশের সহিত চলিয়া আসিতেছে। রুশিয়ার সহিতই পূর্ব্বে এদেশের লোকের ব্যবসা-বাণিজ্য বেশী চলিত। কিন্তু রুশিয়ার বিবিধ অশান্তি ও বিপ্লবের পর হইতে তাহা একেবারেই হ্রাস পাইয়াছে। এখান হইতে আজকাল আমেরিকার যুক্তরাজ্যে প্রচুর পরিমাণে গালিচা রপ্তানী হয়।



ইস্পাহানের রাজপ্রাসাদ

সে অতি প্রাচীনকালে পারস্যের লোকেরা এদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বাস করিত। তাহার পূর্ব্বতন নাম ইরাণ। খৃষ্ট-পূর্ব্ব নবম শতাব্দীতে অ্যাসিরিয়ার লোকেরা পারসিকদিগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নিকট হইতে কর আদায় করিত। ৬৬০ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে মিডদের (Mede) কাছে



খোরাসান প্রদেশের পার্ব্বত্য প্রদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রাম

আসিরিয়ারা পরাজিত হইলে পারসিকেরা মিডিয়ার অধীন হন।

পারস্যের অতি প্রাচীন ইতিহাস ৫৫০ খৃষ্ট



রাজা কুরুসের সমাধি

হইতে আরম্ভ করা যায়। এ সময়ে ফাস প্রদেশে আকেমেনিয়ান রাজত্ব প্রতিষ্ঠাপিত হয়। কিংবদন্তী এই যে, আকেমেনিস নামে একজন ক্ষমতাশালী রাজা এই রাজ্য স্থাপন করেন। সেকালের পুরাতন শিলালিপি, মূর্ত্তি, স্তম্ভ প্রভৃতি এখনও নানাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সময়কার রাজাদের মধ্যে দুইজন নৃপতি ইতিহাসে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়া গিয়াছেন। একজন কুরুস (Cyrus) দ্বিতীয়, দরায়ুস (Darius)। কুরুস সুপ্রসিদ্ধ পারসিক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। ঐ সময়ে মিডিয়াও তাঁহার হস্তগত হয়। সে সময় হইতেই মিডিয়া ও পারসিকেরা পরস্পরের মিশ্রণের ফলে এক হইয়া গিয়াছিল। কুরুসের

প্রাচীন ইতিহাস

প্রতিষ্ঠাপিত বিশাল পারসিক সাম্রাজ্য কাবুল উপত্যকার কিয়দংশ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল।

কুরুসের পর দরায়ুস (Darius) ৫২১ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে দরায়ুস দুইবার গ্রীসদেশে অভিযান প্রেরণ করেন কিন্তু একবারও সফলকাম হইতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বার তাঁহার সৈন্যগণ মারাথনের (Marathan) রণক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে পারস্যের সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং বিস্তৃত পারসিক সাম্রাজ্যকে কুড়িটি স্বতন্ত্র প্রদেশে বিভক্ত করেন। গ্রীকদের প্রতিষ্ঠাপিত এশিয়া মাইনরের সাম্রাজ্য দরায়ুসের হাতে আসিয়া পড়ে। গ্রীসদেশ অধিকার করিবার জন্য পরাজিত হইয়াছিল। দরায়ুসের সময়ে পারস্যে প্রথম দারি (Daric) নামে ১৩০ গ্রেণ ওজনের স্বর্ণমুদ্রা প্রচলিত হয়। ৪৮৬ পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে দরায়ুসের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জারাক্সেস (Xerxes) রাজা হন।



প্রাচীন পারস্য সম্রাটের রাজপ্রাসাদের সোপানাবলী

জারাক্সেসও গ্রীসদেশ জয় করিবার জন্য এক বিপুল বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার

গ্রীসদেশ বিজয়ের আশা পূর্ণ হইল না। স্পার্টার প্রসিদ্ধ বীর লিয়োনিডাস্ (Leonidus) মাত্র ৭,০০০ গ্রীক-সৈন্য লইয়া থার্মোপলির গিরিপথে পারসিকদিগের আক্রমণ গতিরোধ করিয়াছিলেন। এই ভাবে প্রত্যেক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া পারসিকদের ইউরোপ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার আশা ও আকাঙ্ক্ষা চিরদিনের জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। ৪৬৫ পূর্ব্ব-খৃষ্টাব্দে জ্যারাক্সেসের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর



নাথশী রুস্তমে একিমিনিড নৃপতিদের সমাধি

পর একশত বৎসর কালের ইতিহাস শুধু আত্ম-কলহ ব্যতীত আর কিছুই নহে। অবশেষে ৩৩০ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে গ্রীসের বিজয়ী বীর আলেকজাণ্ডারের হাতে পারসিক সম্রাট পরাজিত হন। আলেকজেণ্ডারের



বৃটিশ মিউজিয়ামেরক্ষিত দরায়ুসের নামাঙ্কিত শিলমোহর

বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আকেমেনিয়ান নৃপতিদের রাজত্ব-কাল বিলুপ্ত হইল। আকেমেনিয়ান নৃপতিরা স্বেচ্ছাধর্ম্মী ছিলেন, নিজেরা যাহা মনে করিতেন তাহাই হইত। প্রজাদের সুখদুঃখের ভাগ্য-বিধাতা তাঁহারাই ছিলেন। সেকালের পারস্যের রাজাদের যুদ্ধ ও মৃগয়া এই দুইটিই প্রিয় ছিল। রাজারা নিজে যুদ্ধের সময় সৈন্যদের মধ্য-স্থানে অবস্থান করিতেন। সে সময়ে প্রত্যেক পারসিকই অশ্বারোহণ, শরসন্ধান এবং সত্যকথনের জন্য যশস্বী ছিলেন। এজন্য সেকালের পারসিকেরা সত্য সত্যই বীরের জাতি ছিল। সে সময়ে দেশে জরথুস্ত্র দেবের ধর্ম্মমত প্রচলিত ছিল।

জরথুস্ত্র

(জরথুস্ত্র সম্বন্ধে শিশুভারতীর ২৪৮—২৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।)

আলেকজেণ্ডার পারস্য জয় করিলেন বটে, কিন্তু দেশের শাসন সংরক্ষণ সম্বন্ধে তিনি কোনও ব্যবস্থা



পার্সিপোলিসে দরায়ুসের প্রাসাদ

করিয়া যান নাই। গ্রীকেরা রাজা হইয়াও রাজ্য ও প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেন না। খৃঃ পূঃ তৃতীয়



একিমিনিড যুগের শিলমোহর—সিংহ-শিকারের দৃশ্য



স্বর্ণমুদ্রা

শতাব্দীতে পারস্য নৃপতিদের রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠাপিত

হইল। এই রাজ্যের স্থাপনকর্তা পূর্বতন আকে-মেনিয়ানদেরই একজন বংশধর। এ নূতন রাজবংশ



পারস্যের সৈন্য

প্রতিষ্ঠাপিত হওয়ায় পারস্যে এক নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। এ সময়েই দেশে জাতীয়তার প্রতিষ্ঠা



সাসানিড্‌যুগের রৌপ্যমুদ্রা

হইয়াছিল। এ যুগে জরথুস্ত্র দেবের ধর্মপ্রভাব পুনঃ-প্রতিষ্ঠাপিত হয়। এই বংশের রাজাদের মধ্যে নৃপতি নসীরবানের নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাকে প্রজারা নাম দিয়াছিল ন্যায়বান্ নসীরবান্। ইসলাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক হজরত মুহম্মদ এই পুণ্যবান্ নৃপতির রাজত্ব-কালে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে, নৃপতি নসীরবানের মন্ত্রী বুজুরমিহির (Buzurmihr) কর্ত্তৃক



পার্সিপোলিসে প্রাপ্ত উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড—রাজা ও অর্দ্ধসিংহ অর্দ্ধ ড্রাগন মূর্ত্তি

পহ্লবী ভাষায় সংস্কৃত পঞ্চতন্ত্র অনূদিত হইয়াছিল।

এ বইয়ের নাম হইতেছে—"কলীল ওয়াদিম্নার"। পঞ্চতন্ত্র পরে আরব্যভাষায় অনূদিত হয়।

সেসানিয়ান বংশের রাজা Yezdigird-এর রাজত্ব-কালে ইহা নবউন্মেষিতমোস্লেমশক্তির করতলগতহয় এবং ক্রমশঃ উহা মুসলমান সাম্রাজ্য হইয়া পড়ে। প্রথম চারিজন খলিফা অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণতার সহিত রাজ্য শাসন করেন। পরেমুসলমানদিগেরমধ্যেপ্রতিপত্তিশালী ওমায়েদ বংশ পারস্য সাম্রাজ্যের শাসন-ভার গ্রহণ করেন। এ সময়ে পারস্যের মুসলমানেরা 'সিয়া' ও 'সুন্নী' এই দুই সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ওমায়াদ বংশ সুন্নী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

আব্বাসিদ বংশ

৭৪৯ খৃষ্টাব্দে আব্বাসিদবংশীয়েরা পারস্যের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহারা প্রায় পাঁচশত বৎসর কাল রাজত্ব করেন। এ সময়ে পারস্য সাম্রাজ্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। আরব্যোপন্যাসের নৃপতি হারুন-অল্-রসিদ আব্বাসিদবংশীয় ছিলেন। এই বংশের অন্যতম খলিফা মামুনও একজন রণজ্ঞ নৃপতি ছিলেন এই সময়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা সাহিত্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রভৃত উন্নতি হইয়াছিল।

হারুন-অল্-রসিদ

খলিফা মামুন

এই যুগে পারস্য দেশে বহু খ্যাতিমান্ ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদের মধ্যে রুদাগির, আল্‌বিরুনি, আবিসেনা, অল্‌গজ্জালী, আবুলকাসেম (ফির্দ্দৌসী), নিজামী ওমর খৈয়াম [জ্যোতির্ব্বিদ্] প্রধান ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবিতকালে দেশের লোকের কাছে কবি বলিয়া সম্মান লাভ করেন নাই। তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল জ্যোতির্ব্বিদ্ হিসাবে। কিন্তু আজ নিজামীর 'শিরি ফরহাদ, 'লয়লা মজনু,' ফির্দ্দৌসীর শাহনামার সঙ্গে সঙ্গে ওমর খৈয়ামের রুবাইর নামও সগৌরবে উচ্চারিত হইয়া থাকে। Fitzgerald সাহেবের অনুবাদের পর হইতে রুবাই আজ পৃথিবীর সব ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার অনুবাদের সংখ্যা কম নহে।

আব্বাসিদ বংশের রাজত্বের শেষ কালে খলিফাদের ক্ষমতা লোপপাইতেথাকে এবং একে একে নানাদিক্ হইতে বহিঃশত্রু আসিয়াএদেশ আক্রমণকরিয়া বিপন্ন করিয়া ফেলিতে থাকে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোঙ্গলবীর চেঙ্গিস্ খাঁ পারস্য অধিকার করেন। পরেতাঁহারপৌত্র হলাগুখাঁরাজধানী বাগ্‌দাদ অধিকারকরিয়াআব্বাসিদ বংশের পরিবর্ত্তে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

চেঙ্গিস খাঁ

মোগলদের পরেতুর্কীরা তৈমুরলঙ্গের অধিনায়কতায় আসিয়া পারস্য জয় করেন। সে সময়ে সুলতান বায়াজিদ পারস্যের নৃপতি ছিলেন। তৈমুর ১৩৩৫ খৃষ্টাব্দেপারস্যেররাজসিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তুর্কীরা প্রায় এক শত বৎসর

পসারগিডির উৎকীর্ণ প্রস্তরখণ্ড

কাল পর্যন্ত পারস্যে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এ সময়ে মোগলেরা ক্ষমতাশালী হইয়া পুনরায় পারস্য অধিকার করে। ক্রমে মোগলদের প্রভাবও হ্রাস পাইল, তখন 'সফাভি' বংশ প্রাধান্য লাভ করিল। এই বংশের শ্রেষ্ঠ

নৃপতির নাম শাহ আব্বাস। এ সময়ে পারস্যের রাজধানী ইস্পাহানে স্থানান্তরিত হয়। এই রাজাদের পরে পারস্য আফগানদের হাতে আসে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহাবীর নাদির শাহের আবির্ভাব হয়। নাদির শাহ আফগানদের হাত হইতে দেশের স্বাধিনতা ফিরাইয়া আনেন।

নাদির শাহ

নাদির শাহ বীর ও সাহসী ছিলেন কিন্তু তাঁহার নৃশংসতার কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় যেরূপ ভাবে লিখিত আছে, কোন দিন কোন কালে মানুষ তাহা ভুলিবে কি না সন্দেহ।

কিছু সংস্কার করিতে আরম্ভ করিলেন। খাদ্যদ্রব্যাদির উপর যে শুল্ক ছিল, তাহা হ্রাস পাইল। রাজকর্ম্মচারীর নিয়োগ সম্বন্ধে বিবিধ নূতন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইল। রাজ্যের মধ্যে যে সব বিদ্রোহ, ষড়যন্ত্র ও অশান্তি ছিল, তাহা দমন করিয়া তিনি বেশ শান্তি আনিয়াছিলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে রাষ্ট্রীয় সংস্কারের জন্য দেশের মধ্যে একটা জাতীয় দলের সৃষ্টি হইল। তাহার ফলে এক জাতীয় পরিষদ গঠিত হইল। ইহার সভ্যগণ গণতন্ত্র মত রাজ্যশাসন বিধি প্রবর্ত্তনের জন্য উদগ্রীব হইলেন। ১৯০৬ খৃষ্টাব্দের ৭ই অক্টোবর এই জাতীয়সঙ্ঘের



পার্সিপোলিসের ধ্বংসাবশেষের দৃশ্য

নাদির শাহের পর আবার পারস্যে এক নূতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইল, তাহার নাম কজর্ বংশ। এই বংশের নৃপতি মুহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর শাহ নসীর উদ্দীন সিংহাসনে বসিয়া বেশ দৃঢ়তার সহিত রাজ্য শাসনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং রাজ্য বিস্তারের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার এই উদ্যম সফল হয় নাই। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নাসীর উদ্দীন এক আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ছেলে মুজঃফরুদ্দীন সিংহাসনে বসেন। ইনি সিংহাসনে বসিয়া প্রধান উজীরের পদ তুলিয়া দিয়া কয়েকজন মন্ত্রী লইয়া এক নূতন মন্ত্রণা-পরিষদ গঠন করেন এবং রাজ্যের উন্নতির জন্য অনেক

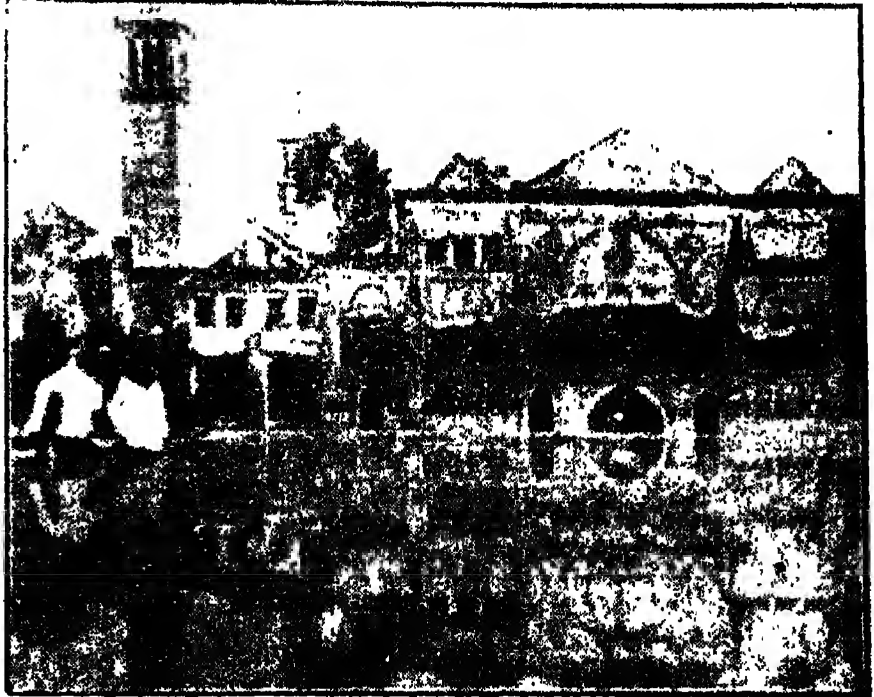
কজর্ বংশ

প্রতিষ্ঠা হইল। ইহার অব্যবহিত পরেই মুজঃফরুদ্দীন সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহার স্থানে তাঁহার পুত্র মুহম্মদ আলিকে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে পারস্যের সিংহাসনে বসান হইল। এই সময়ে পার্লামেণ্ট এক নূতন বিধান অনুসারে রাজস্বের উপর অধিকার লাভ করে।

এ সময়ে জাতীয় দলের সহিত শাহের কলহ চলিতে থাকে। দুই দলে কিছুদিন যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে, পরে জাতীয় দল জয়ী হইয়া রাজ্যশাসন ব্যাপারে সম্পূর্ণরূপে প্রাধান্য লাভ করে। ১৯০৯ সালে শাহ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইলেন। তাঁহার স্থানে জাতীয় দলে শাহের সাতবৎসর বয়স্ক পুত্র আহম্মদ মির্জাকে সিংহাসনে

বসাইয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। এই বালককে ১৯০৯সালের ১৭ইজুলাই সিংহাসনে বসান হইয়াছিল।

ইহার কিছু দিন পরে রুশ ও ইংরাজের মধ্যে অর্থনৈতিক ব্যাপার লইয়া গোলযোগ ঘটে। রুশিয়া পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া রাজ্যের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি করিতে থাকে। এসময়ে আমেরিকা যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেন্ট মিঃ টাফ্‌ট (Taft) মধ্যবর্ত্তী হইয়া মিঃ মার্গান সুষ্টার (W- Morgan Shuster) নামক একজন অর্থনীতিদক্ষ ব্যক্তিকে পারস্যের রাজস্ব ব্যাপারের পরিচালনার জন্য নিযুক্ত করেন। সুষ্টারের নিরপেক্ষ রীতিনীতি পারস্যের প্রাচীন শাসনে অভ্যস্ত ধনীদিগের ভাল লাগিল না। যেখানে এক দিন ঘুষ লইয়া কারবার চলিত—বিচার বিবেচনা বলিয়া কিছু ছিল না, সেখানে এইরূপ একটা সাধুসংস্কার তাহাদের ভাল লাগিল না। ওদিকে রুশিয়াও সুষ্টারের নিয়োগ ভাল চক্ষে দেখিতে ছিলেন না। কাজেই, রুশিয়ার জবরদস্তীতে সুষ্টারকে তাঁহার কাজ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। সুষ্টারের পর ইংরাজ ও রুশ দুই দলেরই পরামর্শানুসারে একজন বেলজিয়মবাসী অর্থসচিবের কার্য্যে নিযুক্ত হন, কিন্তু তাঁহাকে এক বৎসরের মধ্যেই কাজ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল।



টেহারানের পার্লামেন্ট প্রাসাদ—বাহারিস্তান

পৃথিবীব্যাপী মহাসমরের সময় পার্লামেন্টে খুব ভালভাবে শাসন-সংরক্ষণ করিতে না পারিলেও মোটের উপর দেশের মধ্যে কোনরূপ অশান্তি বা গোলযোগ ছিল না। যুদ্ধ শেষ হইলে পার্লামেন্ট দেশের রাজস্ব সম্বন্ধে বিধি-ব্যবস্থা নিজের হাতে গ্রহণ করিতে চাহিলেন, কিন্তু তাহা হইল না। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে রিজা খাঁ নামে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ রাজ্যশাসন ব্যাপারে অধিকার লাভ করেন। পার্লামেন্টে তাঁহাকে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন। ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে শাহ আহম্মদ পারস্য ত্যাগ করেন। সেই বৎসরই পার্লামেন্ট তাঁহাকে রাজা বলিয়া অস্বীকার করেন এবং রিজা খাঁকে শাহ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। দেশের ধনী, বণিক্, জমিদার ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মতানুসারেই এই কার্য্য সম্পাদিত হয়। ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে যে রাজবংশ পারস্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত ছিলেন, ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাহা লোপ পাইল। বর্ত্তমান সময়ে এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, শ্যাম, আফগানিস্তান ও পারস্য এই কয়টিই স্বাধীন দেশ বলিয়া পরিচিত।

পারস্যে জাতীয় শিক্ষা প্রচলিত। জনসাধারণের মধ্যে কোরাণশরীফের উপদেশ অনুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হয়।

শিক্ষা

সম্প্রতি একটি শিক্ষা পরিষদ গঠিত হইয়াছে। দেশের মধ্যে যাহাতে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার লাভ করে, সেজন্যও চেষ্টা [illegible] শিক্ষিত টেহারানে ইউরোপীয় প্রণালী অনুযায়ী [illegible]। তাঁহাদের বিশেষ ব্যবস্থা হইয়াছে। পারেরাজা ও রাণীর সহিত কলেজ আছে, সে কয়টি রাণী ইহাতে অত্যন্ত উৎসাহ অর্থ-সাহায্যে পরিচালিত। ফার্দ্দিনান্দ (Ferdinand) সাহিত্য এবং অর্থনীতি, পরামর্শ করিয়া যাহা হয় স্থির দেওয়া হইয়া থাকে। [illegible]। সময় যাইতে লাগিল—সৈনিক বিদ্যালয় আছিয়া গেল কিন্তু কিছুই হইল না! ফরাসীদের দ্বারা খেয়ালই করেন না, কিংবা নানা

কাজের অজুহাত দেখাইয়া কথাটা চাপা দিতে লাগিলেন। স্পেনের লোকেরা তাঁহার এইরূপ অদ্ভুত সঙ্কল্পের কথা হাসিয়া উড়াইতে লাগিল। কলম্বস জন্মভূমি জেনোয়ার লোকদের সাহায্য ভিক্ষা করিতে লাগিলেন, কেহ সাহায্য করিল না। আবার পর্তুগাল গেলেন, কিন্তু কেহ তাঁহার কথা কাণে তুলিল না। ইংল্যাণ্ডের রাজা সপ্তম হেন্‌রির নিকট ভাইকে পাঠাইয়া সাহায্য ভিক্ষা করিলেন, কোন সাহায্য মিলিল না। কলম্বসের হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেল, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, তাঁহার উদ্দেশ্য সাধু, কিন্তু কেহই তাঁহাকে সাহায্য করিল না।

ছয় বৎসর পরে স্পেনের রাজা ফার্দিনান্দ তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। কিন্তু নাবিক জুটিল না! কেহই তাঁহার এই সমুদ্র-যাত্রার সঙ্গী হইতে চাহিল না;— তাহারা মনে করিতেছিল, কলম্বসের সঙ্গে গেলে আর তাহারা প্রাণ লইয়া ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। নাবিকেরা পলাইয়া যাইতে লাগিল—কারাবন্দীদিগকে নাবিকের কাজে নিযুক্ত করা হইল। রাজার হুকুম পর্য্যন্ত কেহ মানিতে চাহে না, এমন ধারা দুরবস্থার মধ্যে কলম্বসের মন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল, যদিও বা এত ক্লেশের পর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইবার আশা হইয়াছিল, শেষটায় কি না তাহাতেও ব্যাঘাত ঘটিল। সৌভাগ্যক্রমে পিন্‌জোন (Pinzon) নামক দুইজন সঙ্গতিশালী স্পেনীয় ভদ্রলোক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া জাহাজ সজ্জিত করিলেন এবং ঘুষ দিয়া, ভয় দেখাইয়া —এইরূপ নানা উপায়ে অনিচ্ছুক নাবিকদিগকে কলম্বসের সঙ্গী করিয়া দিলেন।

এই ভাবে সব ঠিক্ হইল। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের এক শুভ দিনে কলম্বস্ অজ্ঞাতের সন্ধানে যাত্রা করিলেন। নাবিকদের মনে একটুক্ উৎসাহ ছিল না। যাত্রাকালে, পরিবার পরিজনেরা অশ্রু সিক্তনয়নে তাহাদিগকে জন্মের মত বিদায় দিতে আসিয়াছিল। জাহাজ যতই পশ্চিম মুখে যাইতে লাগিল, ততই তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিল। চারি দিকে বিশাল বিস্তৃত অনন্ত সাগর—আর তাহার মধ্যে দিয়া তিনখানি ছোট ছোট জাহাজ ভাসিয়া চলিয়াছে। সকলের চেয়ে বড় জাহাজ সান্টামেরিয়া (Santa-maria) ৬৫ ফিটের বেশী দীর্ঘ নয়, অপর দুই খানা পিন্টা (Pinta) ও নিনা (Nina) পঞ্চাশ ফিটেরও কম। নাবিকেরা দেশে ফিরিয়া যাইবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল—কিন্তু কলম্বস তাহাদিগকে নিরস্ত করিয়া এবং কেনারি দ্বীপে জাহাজগুলি মেরামত করিয়া ও মিষ্ট জল ও কাঠ সংগ্রহ করিয়া পশ্চিম দিক লক্ষ্য করিয়া আবার জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন। সঙ্গী নাবিকেরা তাঁহাকে ভয় দেখাইতে লাগিল, গালি-মন্দ দিতে লাগিল কিন্তু কলম্বস্ প্রফুল্লচিত্তে পশ্চিম দিকে যাইতে লাগিলেন।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল; কোথায় মাটি! মাটির চিহ্ন কোথাও নাই। নাবিকেরা গৃহে ফিরিবার জন্য কাঁদিতেছে। তাঁহার হুকুম তামিল করিতে চাহিতেছে না, সকলের অবস্থা অতি শোচনীয়, এমন সময় একদিন দেখা গেল যে, জাহাজের মাস্তুলের উপর পাখী আসিয়া বসিতেছে,—একটা গাছের ডাল ঢেউয়ের বুকে ভাসিতে ভাসিতে চলিয়াছে। কলম্বসের মন এইবার আশা ও উৎসাহে পূর্ণ হইল। পিন্টা জাহাজের লোকেরা সহসা চীৎকার করিয়া উঠিল— মাটি, মাটি, মাটি, (Land, Land, Land)! নাবিকেরা অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগবানের মহিমা-গীতি গাহিতে আরম্ভ করিল।

জাহাজ তিনখানা তীরে নঙ্গর করিল। দেখা গেল, ইহা কতকগুলি দ্বীপের সমষ্টি। নাবিকেরা স্পেন দেশের রাজপতাকা প্রোথিত করিল। তাহাদিগকে দেখিয়া দ্বীপের অধিবাসীরা পলাইয়া গেল; আবার তাহারা দল বাঁধিয়া ফিরিয়া আসিয়া অবাক্ দৃষ্টিতে এই নূতন দেশের লোকদের দেখিতে লাগিল। কলম্বস্ দ্বীপের নানাস্থান মাপ-জোক করিলেন, প্রত্যেকটি দ্বীপে স্পেনদেশের রাজপতাকা প্রোথিত করিলেন। এই দ্বীপপুঞ্জের দৃশ্য দেখিয়া কলম্বস্ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। এখানকার অনেক ফুল, ফল, গাছ, পাতা ও লতা তিনি দেশে আনিয়াছিলেন। ঐ দ্বীপের লোকেরা তাঁহাকে সে দেশের ফুল, ফল, লতা পাতা ও তামাক গাছ দেখাইয়া, তামাকের পাতা চুরুটের মত করিয়া কি-ভাবে খাইতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিল। কলম্বস্ ও তাঁহার সঙ্গিগণের প্রতি দেশীয় লোকেরা খুব ভাল ব্যবহার করিয়াছিল। কলম্বস্ সোনার কথা বলিলে তাহারা ইঙ্গিতে বুঝাইয়া দিল যে, এখান হইতে অল্প দূরে এক রাজা আছেন, তাঁহার খুব সোনা আছে।

কলম্বস্ ও তাঁহার সঙ্গিগণ মনে করিলেন যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের কাছাকাছি কোথাও আসিয়াছেন। এজন্য এই দ্বীপপুঞ্জের নাম দিয়াছিলেন পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (West Indies)। কলম্বস্ তখনও বুঝিতে পারেন নাই যে, ইহার অনতিদূরেই এক অজানা

মহাদেশ আছে—সেই মহাদেশকেই এখন আমরা আমেরিকা বলিয়া অভিহিত করি।

কলম্বস্ স্পেনে ফিরিয়া আসিলে দেশের লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মানিত করিয়াছিল। ইহার পরও আবার কলম্বস্ তিনবার সমুদ্র-যাত্রা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে তিনি ট্রিনিডাড (Trinidad) আবিষ্কার করেন। সেবারেই তিনি দক্ষিণ আমেরিকার তটরেখা দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ নূতন নূতন দেশ আবিষ্কার এবং দেশের লোকের কাছে প্রীতি ও শ্রদ্ধা লাভ করাটা অনেকেই ভালভাবে দেখিত না, এজন্য এক দল লোক তাঁহার শত্রু হইয়াছিল। দ্বিতীয়বার সমুদ্র-যাত্রা সময় কলম্বসের একদল শত্রু-পক্ষীয় লোক তাঁহাকে বন্দী করিয়া শিকল দিয়া হাত-পা বাঁধিয়া স্পেনে প্রেরণ করিয়াছিল। রাজ-দরবার হইতে মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কলম্বস্ বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার সৌভাগ্যের দিন অন্তহিত হইয়াছে। রাজ্ঞী ইসাবেলার মৃত্যুর পর রাজা ফার্দিনান্দ আর তাঁহাকে কৃপার চক্ষে দেখিলেন না। ১৫০৬ খৃষ্টাব্দে ভগ্নস্বাস্থ্য ও ভগ্নহৃদয় লইয়া কলম্বস্ পরলোক গমন করেন।

কলম্বস্ মরিয়া গিয়াছেন কিন্তু এই নির্ভীক্ বীরের অসাধারণ আবিষ্কার-কাহিনী পৃথিবীর ইতিহাসে অমর হইয়া রহিয়াছে।

কলম্বসের নিজমুখে বর্ণিত ভ্রমণ-কাহিনী

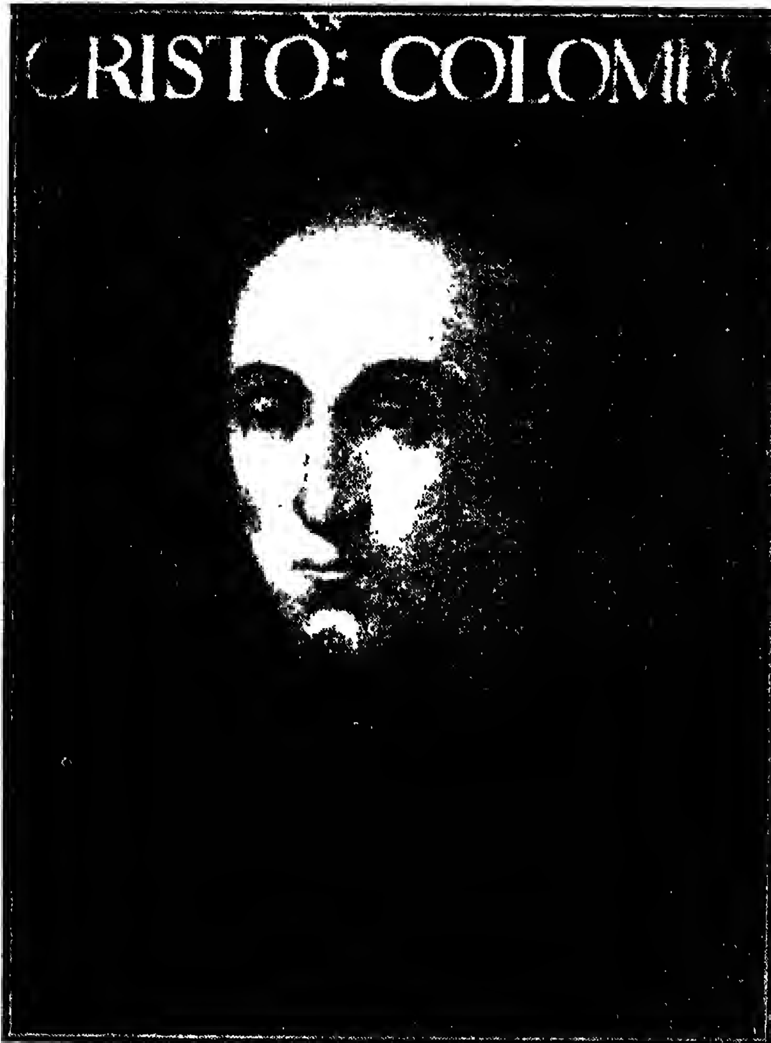
আমার ছেলেবেলার কথা সবটাই যে বেশ ভাল ভাবে মনে আছে, তা নয়। তবে এ কথাটাই বেশ ভাল করে মনে আছে যে, ছেলেবেলায় আমি সমুদ্র দেখ্‌তে খুব ভালবাস্‌তাম। আমাদের বাড়ীর কাছেই ছিল সমুদ্র। সমুদ্রের নীল জলে ঢেউয়ের খেলা, তার অনন্ত বিস্তার, আর তার বুকে দূর-দেশান্তরে যে-সব জাহাজ ভেসে যেত, সে সকলের দৃশ্য আমি উৎসুক ভাবে পরম কৌতূহলের সহিত দেখ্‌তাম। আমাকে কোথাও খুঁজে না পেলে আমার ভাইয়েরা আমাকে বরাবর খুঁজিতে আস্‌ত সাগরের তীরে। আমি নাবিকদের কাছে তন্ন তন্ন করে দেশ-বিদেশের খবর নিতাম। জাহাজের কোন্ অংশটির কি নাম, কোন্ পালটি কি ভাবে খাটাতে হয়, বাতাসের গতি কখন কোন্ ঋতুতে কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, এইসব নানা খবর তাদের কাছ থেকে জেনে নিতাম, তারাও একটি ছোট কৌতূহলী বালকের কাছে তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, দেশ বিদেশের কাহিনী, লোকজনের কথা বলে যেত, আমি নির্ব্বাক্ কৌতূহলে সব শুনে যেতাম। আমার মনে হত আমিও তাদেরই একজন হয়ে অনন্ত সাগর মাঝে তরী ভাসিয়ে দিয়ে নূতন নূতন দেশে চলে যাই না কেন? জেনোয়া (Genoa) বন্দরের এমন



কলম্বস্ স্পেনের রাজপতাকা প্রোথিত করিলেন

একখানি জাহাজ ছিল না—যে জাহাজের আসা-যাওয়া, চলাফেরার কোন খবর আমার অজানা ছিল।

আমাদের তাঁত ছিল। বাবা কাপড় বুনে বাজারে বিক্রী করে অর্থোপার্জ্জন করতেন। আমাকে দিয়েও তাঁতের কাজ করাতে চেয়েছিলেন, কিন্তু আমি সে কাজে মন দিতে পারলাম না। ঈশ্বর আমাকে যে কাজের জন্য পাঠিয়েছিলেন আমি সে-কাজের দিকেই ঝুঁকে পড়লাম। সাগরের জল দিন-রাত্রি আমায় যেন তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্য আহ্বান করত, আমি কি সে ডাক উপেক্ষা করতে পারি! আমার বয়স যখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর, তখন আমি প্রথম জাহাজে চড়ে বিদেশ যাত্রা করি। তার আগে কিছু দিনের জন্য আমি স্কুলে পড়েছিলাম। সেখানে আমি ল্যাটিন্, ব্যাকরণ বেশ ভাল করেই শিখেছিলাম। কিন্তু সকলের চেয়ে আমার পড়তে ভাল লাগত, জ্যামিতি, জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান এবং নৌ-যাত্রার কাহিনী। বাবা যখন বুঝতে পারলেন যে, নাবিক হওয়াই হচ্চে আমার জীবনের লক্ষ্য, তখন তিনি আর আমাকে কোন বাধা দিলেন না বরং যাতে আমি নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধে অনেক কথা জান্‌তে পারি, দেশ-বিদেশের ইতিহাস, পৃথিবীর মানচিত্র দেখে কোথায় কোন্ দেশ আছে সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারি, সে দিকে যত্ন নিলেন এবং উৎসাহিত করলেন। আমি মার্কো-পোলোর বিচিত্র ভ্রমণ-কাহিনী পড়ে মনে মনে কত-কিছু কল্পনা করতাম; ভাবতাম আমিও তাঁর মত নানা দেশে যাব এবং আরো বেশী কিছু করবো—কোনও নূতন দেশ আবিষ্কার করে।



ক্রিষ্টোফার কলম্বস্

সেকালে সমুদ্র-যাত্রা বড় নিরাপদ ছিল না। ভেনিসের ও জেনোয়ার (Venetians and Genoese) নাবিকদের মধ্যে কলহ লেগেই ছিল। আমি যৌবনে প্রথম যে জাহাজের কাপ্তেন হয়ে সমুদ্র-যাত্রা করি, সে জাহাজখানাকে ভিনিসের নাবিকেরা আগুন ধরিয়ে দিয়ে পুড়িয়ে ফেলেছিল আমি অতি ক্লেশে আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলাম, ভাগ্যিস আমি খুব সাঁত্‌রাতে পারতাম, নতুবা ওখানেই জীবন নাশ হত। সে বিপদ হতে যে বাঁচতে পেরেছিলাম, তা একমাত্র ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন আর কি বলবো!

চৌদ্দ বৎসর বয়স হ'তে আটাশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমার জীবন বেশীর ভাগই সমুদ্রের বুকের উপর দিয়ে কেটেছে। পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ—যে দিকেই হোক না কেন, যতদূর দৃষ্টি চলে, আমার জাহাজ ভাসিয়ে দিতাম। ছেলেবেলা হ'তেই আমার মনে

হ'ত, যদি বরাবর পশ্চিম-মুখো যাই, তা হলেই আমি ভারতবর্ষে পৌছে যাব। কিন্তু অর্থ চাই, সাহসী নাবিক চাই—এ দুটির একটিও জেনোয়াতে মিলবার সম্ভাবনা নাই দেখে আমি ১৪৭৪ খৃষ্টাব্দে লিস্‌বনে গেলাম। এখানকার লোকেরা অজ্ঞাত নানাদেশের বিষয় অনেক সংবাদ জানতো। ইতিমধ্যে আমি গিনি (Guinea), মেডিরিয়া এবং ইংলণ্ডে গিয়েছিলাম। আমার বয়স চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হবার পূর্ব্বে আমি একথা বলতে পারি যে, এমন কোন দেশ ছিল না যে, দেশে পূর্ব্ববর্ত্তী নাবিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি যাই নাই।

ভারতবর্ষ আবিষ্কারের সঙ্কল্প

আমি লিস্‌বনে বিবাহ করে সেখানেই স্থায়িভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করি। আমার সঙ্গে আমার ভাই বার্থোলোমিউ (Bartholomew) থাকতেন। বার্থোলোমিউ আমার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দেশ বেড়িয়ে ছিলেন। তিনি মানচিত্র খুব ভাল আঁকতে পারতেন, আর নিজে ছিলেন সাহসী ও নির্ভীক নাবিক। এসময়ে আমি ছবি এঁকে এবং ভূ-গোলক তৈয়ারী করে কিছু কিছু অর্থোপার্জ্জন করে সংসারের ব্যয় নির্ব্বাহ করতাম। লিস্‌বনের লাইব্রেরীতে যে সকল মানচিত্র, ভ্রমণ বিবরণ এবং সমুদ্রযাত্রায় ব্যবহারোপযোগী যন্ত্রপাতি ছিল, আমি সে সকলের ব্যবহার সম্বন্ধে বেশ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলাম। এখানে টোস্‌কেনেলি (Toscanelli) নামে একজন ইটালি দেশীয় নাবিকের আঁকা মানচিত্র আমার বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল টোস্‌কেনেলিও বরাবর পশ্চিমাভিমুখে জাহাজ চালিয়ে ভারতবর্ষে পৌছবার কল্পনা করছিলেন। ইঁহার আঁকা মানচিত্র খানা পেয়ে আমি যে কতদূর উপকৃত হয়েছিলাম, সে-কথা বলে শেষ করা যায় না।

এ সময়ে সংবাদ এলো যে, বার্থোলোমিউ দিয়াজ নামে একজন নাবিক আফ্রিকা মহাদেশ প্রদক্ষিণ করে ঐ মহাদেশের দক্ষিণাদিকের একটা অন্তরীপের কাছা-কাছি এমন ঝড়ে পড়েছিলেন যে, তিনি ঐ অন্তরীপের নাম দিয়েছেন—ঝড়ো অন্তরীপ (Stormy Cape)। কিন্তু পর্ত্তুগালের রাজা অন্যান্য নাবিকদের মনে ভয়ের পরিবর্ত্তে আশা ও উৎসাহ সঞ্চারের জন্য ঐ অন্তরীপের নাম দিলেন "উত্তম আশা অন্তরীপ" (Cape of Good Hope)। এ সংবাদে লিস্‌বনের নাবিকদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গিয়েছিল। আমার প্রাণে নবীন আশা ও উৎসাহ সঞ্চারিত হ'ল। আমার দৃঢ় সঙ্কল্প হ'ল যে, এবার আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করব—যাব অজ্ঞাতের সন্ধানে। আমি রাজার কাছে আমার প্রার্থনা জানাবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠলাম। এ সময়ে নাবিকদের কাছে যে কত আশ্চর্য্য ও অদ্ভুত গল্পই না শুনতাম!

১৪৮০ খৃষ্টাব্দে আমি পর্ত্তুগালের রাজা দ্বিতীয় জনের নিকট আমার প্রার্থনা জানালাম। আমার এই অভিযানের বিষয় জ্ঞাত হয়ে তিনি বললেন—আমি আমার ভৌগোলিকদের সঙ্গে পরামর্শ করে তোমায় অনুমতি দিব। ভৌগলিকেরা আমার এই সঙ্কল্প একটা বাতুলের কল্পনা বলে উড়িয়ে দিলেন। পরে কিন্তু রাজা এক চালাকি করলেন। তিনি আমার মানচিত্র, যন্ত্রপাতি এসব দিয়ে গোপনে একজন নাবিককে ভারতবর্ষ আবিষ্কারের জন্য পাঠিয়ে দিলেন আটলান্টিক মহাসাগরের পথে সে জাহাজ ভেসে চললো। কিছুদিন পরে একটা ঝড়ে পড়ে বিপর্য্যস্ত-ভাবে সে নাবিক তার জাহাজ নিয়ে বন্দরে ফিরে এলেন। রাজা ভেবেছিলেন, যদি অল্প আয়াসে ও অর্থব্যয়ে ভারতবর্ষ আবিষ্কারটা হয়, তাহলে সব গৌরবটা যে তাঁরই হ'বে। আমি এ ব্যাপারটা জানতে পেরে লিস্‌বন ছেড়ে যাওয়াই সঙ্গত মনে করলাম। লিস্‌বন ছেড়ে স্পেনদেশে এলাম। এখানে এসে দেখলাম যে, স্পেনের সঙ্গে মুরদের লড়াই চলছে। এদিকে আমার ভাই বার্থোলোমিউকে ইংলণ্ড ও ফরাসীদেশে পাঠিয়েছিলাম—যদি কোথাও কোন সুযোগ মিলে। কিন্তু কোথা হ'তেও আশার বাণী এল না। এত নিরাশার মধ্যেও আমি আমার আশা ছাড়িনি। দিনরাত নিজের সঙ্কল্প কি করে পূর্ণ হয়, সেকথা নিয়েই বিব্রত থাকতাম। রাজা ও রাণী যখন যে শিবিরে যেতেন আমি সেই শিবিরে যেতাম—তাঁদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করে আমার মনের অভিলাষ ব্যক্ত করবার জন্য যে কত বড় আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা আমায় ছিল—সে বলে বোঝান কঠিন। অবশেষে একদিন সৌভাগ্যের সূত্রপাত হ'ল; রাণী ইসাবেলার শুভদৃষ্টি আমার উপর পড়ল। গ্রানাডা নগরী (Granada) আবিষ্কৃত হলেই তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য আহ্বান করবেন। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী গ্রানাডা আবিষ্কৃত হ'লে পর রাজ্ঞী আমাকে তাঁর সহিত দেখা করবার জন্য অনুজ্ঞা প্রেরণ করলেন। রাজ্ঞীর সঙ্গে আমার একটা সর্ত্ত লেখাপড়া হ'ল। সেই

সর্ত্তে এইরূপ লেখা হ'ল যে—আমি যে সকল দেশ আবিষ্কার করবো—বা দ্বীপ আবিষ্কার করবো, সে সকলেও প্রতিনিধি শাসনকর্ত্তা হব আমি, যে সকল জিনিষপত্র, ধন-রত্ন পাওয়া যাবে তার দশ ভাগের এক ভাগ আমার হবে। ভবিষ্যতের কোনও অভিযানে যে ব্যয় হবে, সে ব্যয়ের এক-অষ্টমাংশ আমি বহন করবো এবং লাভের হিসাবেও এক-অষ্টমাংশ আমার প্রাপ্য হবে।

রাণী ইসাবেলা আমার এই অভিযান ব্যাপারে এতদূর উৎসাহ প্রকাশ করলেন যে, যদি ব্যয় সংকুলানের জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে তিনি নিজের গায়ের অলঙ্কার বিক্রয় করে কিংবা বাঁধা দিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতেও কার্পণ্য করবেন না। ক্রমে ক্রমে আমাদের নৌ-বহর তৈরী হয়ে গেল। আমার জাহাজখানির নাম দেওয়া হ'ল "সান্তা মেরিয়া" (Santa Maria)। ছোট জাহাজখানি কেবলমাত্র ১০০ টন মাল বহন করবার উপযোগী ছিল। পিণ্টা (pinta) ৫০ টন এবং নিনা (Nina) চল্লিশ টন মাল বহনোপযোগী ছিল। আমি কিছুতেই নিরাশ হলাম না হ'ক না ছোট আমার এই নৌ-বহর, তবু কি ভয়? আমার দলে মাত্র ৯০ জন নাবিক ছিল। এরা কেউই অজ্ঞাতের সন্ধানে এই যে যাত্রা, তাহা প্রীতির চক্ষে দেখে নাই—দেখা সম্ভবপরও নয়। আমার এই যাত্রা আনন্দের যাত্রা হয়েছিল এমন কথা বলা চলে না। যে সকল নাবিক আমার সহযাত্রী হয়েছিল, তাদের অশ্রুধারা সকলকে বিচলিত করেছিল। তারা ভেবেছিল, এই যাত্রা—অন্তিমের যাত্রা; এই যাত্রার পরে আর কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবে না। ধীরে ধীরে বন্দর ত্যাগ করে আমাদের জাহাজ সাগরের দিকে ভেসে চল্‌লো। মাটির চিহ্ন যখন চোখের আড়ালে পড়লো—তখন দেখা গেল যে, 'পিণ্টার' একটি অংশ ভাঙ্গা। বোধ হয় কেহ ঐভাবে পালাতে চেষ্টা করেছিল তাই, পিণ্টার এই অবস্থা। সে যাক্ সপ্তাহ তিন পরে কেনারী দ্বীপে গিয়ে আমি জাহাজের এই ভগ্নাংশ মেরামত করতে পেরেছিলাম। ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে আমরা কেনারীজ দ্বীপপুঞ্জ ত্যাগ করে পশ্চিমদিকে জাহাজ চালাতে সুরু করলাম।

রাণী ইসাবেলার উৎসাহ

টেনেরিফ পার হবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এক বিপদে পড়লাম। এ সময়ে ওখানকার আগ্নেয় গিরির মুখ হতে ধোঁয়া আর গলিত ধাতুনিঃস্রাব সব বেগে নির্গত হচ্ছিল। নাবিকেরা এরূপ অগ্ন্যুৎপাতকে কুলক্ষণ বলে মনে করে,—তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠ্‌লো—এ যাত্রায় আমাদের কখ্‌খনো সুফল হবে না। একবার একটা হাওয়া খুব জোরে এসে আমাদের জাহাজগুলোকে দোলাতে সুরু করলো,—জাহাজের নাবিকেরা সেই ঝড়ো হাওয়ায় পড়ে ছেলেমানুষের মত কাঁদ্‌তে সুরু করে দিল। অনেকে ত আমার পায়ের কাছে লুটোপুটি খেয়ে বল্‌তে লাগলো—আমাদের পাড়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে এস।

এইরূপ নানা বাধা-বিপদ অতিক্রম করে চল্‌তে সুরু করলাম, এক নিমেষের জন্যও আমি কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হই নাই। আমি এই সময়ে আমাদের যাত্রার হিসাব-নিকাশের দু'টো খাতা করেছিলাম, একটাতে মিথ্যা-ভাবে হিসাব লিখতাম আর একটাতে সত্যিকার সব কথা লিখ্‌তাম। নাবিকদের সেই মিথ্যা খাতাখানা দেখাতাম। কিন্তু কিছুতেই এই দুর্দ্দান্ত নাবিকদের মন পাওয়া যেত না, তারা সর্ব্বদাই মুখ ভার করে থাক্‌তো। এসময়ে কম্পাসটা আশ্চর্য্যভাবে ঘুরতে সুরু করে দিল। ধ্রুবতারার দিকে মুখ মুখো না নড়ে কেবলই পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে পড়তে লাগলো। শেষবার আমরা সারাগোনা (Saragona) সাগরে এসে পৌছলাম। এ সময়ে জাহাজের খাদ্যসম্ভার ফুরিয়ে এল, বাতাসও বিরুদ্ধ হ'ল, নাবিকেরা আমার বিপক্ষে একটা ষড়্‌যন্ত্র করতে আরম্ভ করলো, আমাকে মেরে ফেলাই হ'ল তাদের উদ্দেশ্য। আমি তাদের বেশ হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়ে নানাভাবে উৎসাহিত করতে আরম্ভ করলাম। এ সময়ে ডাঙ্গার কাছাকাছি যে আমরা এসে পড়েছি তার অনেক নিদর্শন পেলাম। পাঁচ সপ্তাহ কাল নানা অশান্তির ভিতর দিয়ে কেটে গিয়ে অবশেষে শান্তির নাগাল পেলাম। ১০ই অক্টোবর তারিখে নাবিকেরা বিদ্রোহী হয়ে বল্লে—কোথায় মাটি? আমরা সব ফিরে যাব—জাহাজ ফিরিয়ে নেব। আমি তাদের বুঝিয়ে বল্লুম, এতদূর এগিয়ে এসে এখন ফিরে যাওয়া কি ভাল? ফিরে যেতে যেতে আমরা হয়ত পথেই মারা যাব, তার চেয়ে এগিয়ে চলাই কি ভাল নয়? আমার কথার উপর বিশ্বাস করে যে তারা চুপ্ করে থাক্‌তো, তা নয়; হঠাৎ এমন সুযোগ এল, যে জন্য বিধাতার কাছে আমি মুক্তকণ্ঠে কোটি কোটিবার নমস্কার জানাচ্ছি। সাগরে জলে এক-টুক্‌রা কাঠ আর একটা গাছের ডাল দেখে সকলেরই নিশ্চিত বিশ্বাস হ'ল যে, ডাঙ্গা কাছেই আছে। এইবার

নাবিকদের সকলের প্রাণের মধ্যে একটা নূতন উৎসাহের সঞ্চার হ'ল—সকলেই ডাঙা দেখবার আকাঙ্ক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রইল।

অক্টোবর মাসের ১১ই তারিখ রাত্রিতে আমি ও একজন নাবিক ডেকের উপর থেকে দেখ্‌তে পেলাম যে, দূরে যেন একটা আলো নড়াচড়া কচ্ছে। এ আলোটা যে ডাঙার উপর, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পর দিন ভোর না হতেই প্রায় ছয় মাইল দূরে সমুদ্রের পার দেখা গেল। জাহাজ ওখানে নঙ্গর করতে আদেশ করলাম। কখন ভোর হবে, কখন মাটিতে পা ফেলবো, এইরূপ একটা ব্যাকুলতা সব নাবিকদের মধ্যেই দেখা গিয়েছিল। এ সময় আমার মনের অবস্থা যে কিরূপ হয়েছিল, সে কথা বুঝিয়ে বলা অসম্ভব। আমার অনুমান যে সত্য, সেটা মনে করে আমি একটু গর্ব্বিত হয়েছিলুম। আমার বিশ্বাস হ'ল, এ দেশটা হচ্ছে সিপানজো (Cipanjo—জাপান)। ভারতবর্ষে যাবার পথ এদিক্ দিয়েই পাব। যখন ভোরের আলো ফুটে উঠলো তখন নাবিকেরা গান গাইতে গাইতে তীরের দিকে জাহাজ চালাতে সুরু করলো। তারপর পারের কাছাকাছি এসে জাহাজের নোঙ্গর ফেলা হ'ল, নৌকা পাঠিয়ে দেওয়া গেল। আমি স্পেন দেশের প্রতিনিধি-রূপে রাজকীয় পোষাক-পরিচ্ছদ পরে রাজপতাকা হাতে করে নৌকায় চড়ে তীরের দিকে চল্‌লাম। আমি তীরে অবতরণ করে প্রথমই মৃত্তিকা চুম্বন করলাম এবং নিরাপদে মাটিতে পা দিতে পেরেছি বলে ঈশ্বরকে সহস্রবার ধন্যবাদ দিলাম। তারপর রাজা ফার্দ্দিনান্দ (Ferdinand) এবং রাজ্ঞী ইসাবেলার নামে এই দ্বীপের উপর স্পেনের রাজ-অধিকার প্রতিষ্ঠা করলাম। দ্বীপের নাম দিলাম সেন-সালবাডোর (San Salvador)। নাবিকেরা মনের আনন্দে রাজা ও রাণীর নামে জয় ঘোষণা করল। কৃতকার্য্যতার পরশমণির স্পর্শে এম্‌নি করেই সোনা ফলে।

ডাঙ্গায় পৌঁছা

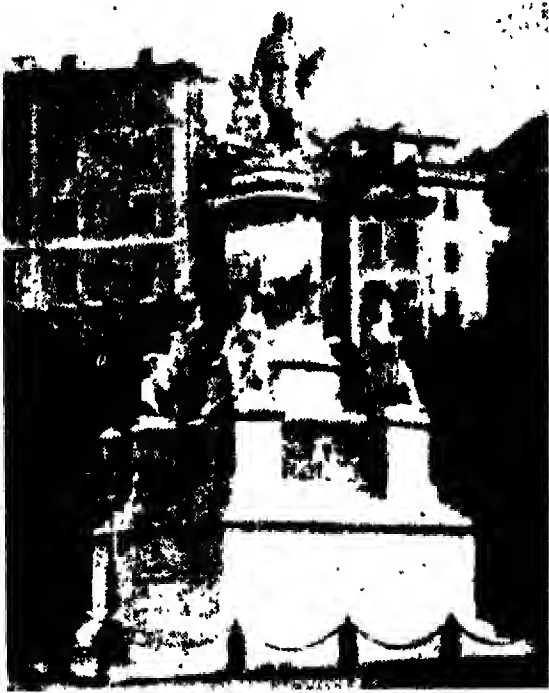
এখানকার আদিম অধিবাসীরা আমাদের দেখে প্রথমটায় দূরে পালিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমরা তাদের অনুসরণ করলাম না, কিংবা কোন অন্যায় করলাম না দেখে তারা আমাদের বিশ্বাস করে কাছে এল। লোকগুলির চেহারা দেখতে বেশ,—বলিষ্ঠ গড়ন, তামাটে রঙ, কিন্তু প্রায় সকলের নাকেই সোনার আংটি দেখ্‌তে পেলাম। আমি ইসারা করে জিজ্ঞাসা করলাম তারা এই সোনার আংটি কোথায় পেল? অসভ্যেরা ইঙ্গিত করে বুঝিয়ে দিল যে, সোনা তারা



আমি তীরে অবতরণ করে প্রথমেই মৃত্তিকা চুম্বন করলাম

উত্তর-পশ্চিম, দক্ষিণ-পশ্চিম এবং দক্ষিণের দেশ থেকে সংগ্রহ করে আনে। আমি মনে করলাম যে, ওখানেই হবে সিপানজো, আর তারি কাছাকাছি হবে বুঝি বা

কুবলাইখাঁনের রাজ্য। অল্প সময়ের মধ্যে দেশীয়দের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। আমি মনে করলাম আমি এদের মধ্য হ'তে দুজন লোককে স্পেনে নিয়ে যাব এবং এরা আমাদের অনেক কাজে লাগবে। আমি এইবার বুঝতে পারলাম, আমরা একটা দ্বীপপুঞ্জের মধ্যস্থিত একটি দ্বীপে মাত্র এসেছি। এখান থেকে আবার দক্ষিণ দিকে চল্লাম—সত্য কথা বলতে কি, শুধু সোনা পাওয়ার লোভে। এখানকার দ্বীপপুঞ্জের প্রাকৃতিক শোভা



কলম্বসের স্মৃতিস্তম্ভ

বর্ণনাতীত। আমরা এখন যে বড় দ্বীপটিতে গিয়ে পৌছলাম, তখন উহাকে স্বর্গ বলেই মনে করেছিলাম। স্বর্গে নাকি শোক দুঃখ, আপদ বিপদ কিছু থাকে না, কিন্তু আমাদের এই সর্গে আমার পক্ষে অনেকখানি বিপদই এসে এক সঙ্গে জুটলো। আমার কাপ্তান পিন্‌জোন্ (Pinzon) বিশ্বাসঘাতকতা করে আমার পিন্‌টা (Pinta) জাহাজখানা চুরি করে পালিয়ে গেলেন। মনে, নূতন দেশ আবিষ্কারের গৌরব লাভের জন্যই বোধ হয়। আমি এ দ্বীপটির নাম রেখেছিলাম হিস্‌স পানিওয়ালা (His Paniola) অর্থাৎ কি না স্পেনের দেশ। সান্টা মেরিয়া (Santa Maria) একটি জলমগ্ন পাহাড়ে লেগে বাণচাল হয়ে গেল, আমি এবং নাবিকেরা অতি কষ্টে বেঁচেছিলাম বাকী ছিল শুধু ছোট নিনা (Nina)। নিনায় আমাদের সকলকে ধরবার মতন জায়গা ছিল না এত টুকুও। কি করি! এখানকার অধিবাসীদের প্রধান ব্যক্তির সাহায্যে একটা আশ্রয়-স্থান স্থির করলাম এবং কোন রকমে জাহাজ ইত্যাদি মেরামত করে ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের কোন এক তারিখে দেশাভিমুখে রওয়ানা হলাম।

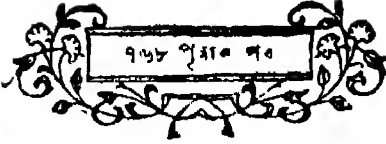
দেশযাত্রা

আমাদের প্রত্যাবর্ত্তন কালের কয়েকটা দিন বেশ নিরাপদে কেটেছিল। কিন্তু শেষটায় এমন ঝড় দেখা দিল যে, 'নিনা' রক্ষা পায় কিনা, তাই সন্দেহজনক হয়ে উঠলো। আমিও এবার ভীত হয়ে পড়েছিলাম। মনে শুধু এই বেদনা টাই হয়েছিল বেশী করে—যদি মরে যাই, তা হ'লে দেশের লোকদের কাছে আমার এই নূতন দেশের আবিষ্কার বার্ত্তাটা অজানা রয়ে যাবে। এজন্য তাড়াতাড়ি একটা পাচমেন্টের উপর আমার ভ্রমণ বিষয়ক সমুদয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করে একটা কৌটার ভিতর পূরে মোমের আবরণী দিয়ে সমুদ্রের জলে ফেলে দিলাম। আর একটা রেখে দিলাম জাহাজের মাস্তুলের উপর। একদিন হয়ত বা কারো হাতে পড়বে—পড়ে তারা জানতে পারবে যে, কি ভাবে কোন্ পথে গিয়ে আমরা নূতন দেশের সন্ধান জেনেছিলাম। পাহাড়ের মত উচু ঢেউ তুলে সাগর তুমুল গর্জ্জনে আমাদের জাহাজখানাকে হেলিয়ে দুলিয়ে চলে যাচ্ছিল। ভগবানের অপার দয়ায় আমরা ক্রমে ঝড়ের হাত থেকে উদ্ধার পেয়ে একদিন শুভ দিনে দেশে ফিরে এলাম।

যখন আমাদের ছোট জাহাজখানি এসে তীরে ভিড়লো, তখন যেন সারা সহরের লোক এসে ভেঙ্গে পড়লো। মস্ত মিছিল করে, ঘোড়ায় চড়ে এবং জনগণের মুখে আনন্দপূর্ণ বিজয়-ধ্বনি শুনতে শুনতে রাজদরবারে গিয়ে পৌছলাম। দরবারের সকলে অত্যুগ্র আগ্রহের সহিত আমার এই নূতন দেশ আবিষ্কারের কথা শুনলেন। আমি যে অজানা পথে আটলান্টিক মহাসাগর উত্তীর্ণ হয়ে নূতন পৃথিবী আবিষ্কার করতে পেরেছি, সে আনন্দের কাছে পরবর্ত্তী জীবনের শত শত ব্যর্থতা, বিপদ ও অশান্তিকে আমি নগণ্য বলে মনে করি।"



শঙ্করাচার্য্য



শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের কেরল প্রদেশে চিদম্বর নামক গ্রামে এই মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল। ইঁহার পিতা শিবগুরু একজন সুপণ্ডিত এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। ৬৪৮ শকে (ইংরাজী ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে) ১২ই বৈশাখ শুক্লপক্ষীয় তৃতীয় তিথিতে শঙ্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। গল্প আছে যে, ইঁহার পিতামাতা তাঁহাদের গ্রামের কাছাকাছি বৃষ নামক পর্ব্বতে যাইয়া সেখানকার মন্দিরস্থ মহাদেবের আরাধনা করিয়া শঙ্করাচার্য্যকে লাভ করিয়াছিলেন।

প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের প্রতিভা শৈশবকাল হইতেই প্রকাশ পায়। শঙ্করের প্রতিভাও অতি শৈশব হইতেই বিকাশ পাইয়াছিল। শিবগুরু বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ছিলেন। কাজেই, বিদ্যার মর্ম্ম তিনি বুঝিতেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, শঙ্করের বয়স পাঁচ বৎসর পূর্ণ হইলেই উপনয়ন সংস্কারের পর তাঁহাকে বেদ শিক্ষা দিবেন। মানুষের সব আকাঙ্ক্ষাই কি বিধাতা পূর্ণ করেন? শিবগুরুর আশাও পূর্ণ হইল না, শঙ্করের বয়স যখন মাত্র তিন বৎসর, তখন তিনি ইহলোক ত্যাগ করিলেন। শঙ্করের জননী সন্তানের বয়স যখন পাঁচ বৎসর হইল, তখন তাঁহাকে উপনীত করিয়া সেকালের প্রথমত অধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহ পাঠাইয়া দিলেন। শঙ্কর ষোল বৎসর বয়স পর্য্যন্ত গুরুগৃহে বাস করিয়া সর্ব্বশাস্ত্রে এইরূপ অধিকার লাভ করিলেন যে, সে-সময়েই দাক্ষিণাত্যের সর্ব্বত্র অসাধারণ পণ্ডিত বলিয়া তাঁহার খ্যাতি বিস্তৃত হইয়াছিল। চতুষ্পাঠীর শিক্ষা শেষ হইলে শঙ্করাচার্য্য গুরুর আশীর্ব্বাদ মস্তকে লইয়া গৃহে আগমন করিলেন।

গৃহে আসিয়া শঙ্কর অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা লইয়াই নিযুক্ত থাকিতেন। একদিকে শাস্ত্র অধ্যয়ন, অন্য-দিকে মাতৃসেবা, এ দু'টিই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধান কাজ। তাঁহার মাতৃভক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে, আমরা এখানে তাহার একটি গল্প বলিতেছি।

শঙ্করের জননী প্রতিদিন প্রাতে গ্রাম হইতে অনেকটা দূরে একটি নদীতে স্নান করিতে যাইতেন। একদিন স্নান করিয়া ফিরিবার সময় ক্লান্তিবশতঃ পথের মধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া থাকেন। বেলা বাড়িয়া চলিল—মা বাড়ী ফিরিতেছেন না, ইহাতে শঙ্কর অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়িলেন এবং মায়ের খোঁজ করিবার জন্য নদীতে যাইবার পথ ধরিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিছুদূর গিয়া দেখিলেন, তাঁহার মা পথের ধারে একটা গাছের নীচে মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িয়া আছেন। ইহাতে শঙ্করের প্রাণে অত্যন্ত বেদনা লাগিল তিনি সেবা ও শুশ্রূষা করিয়া মাতার মূর্চ্ছা দূর করিয়া তাঁহাকে বাড়ীতে লইয়া আসিয়া ভাবিতে লাগিলেন—মা প্রতিদিন বাড়ী হইতে অনেক দূরে নদীতে স্নান করিতে যাইয়া ক্লান্ত হইয়া পড়েন—তাঁহার এই কষ্ট দূর করিবার কি কোন উপায়ই

আমি করিতে পারি না—যাহাতে মা বিনা ক্লেশে প্রতিদিন নদীতে স্নান করিতে পারেন ?

মাতৃভক্ত ও ঈশ্বরবিশ্বাসী শঙ্কর এজন্য দেবতার নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ভক্তের ভগবান্ ভক্তের কামনা পূর্ণ করেন, শঙ্কর এইরূপ বিশ্বাস করিতেন। কাজেই, তিনি দেবতার নিকট প্রার্থনা করিলেন—"দয়াময়, তুমি কৃপা করিয়া এই কর, মা প্রতিদিন যে নদীতে স্নান করিতে যান সেই নদীটি যেন আমাদের বাড়ীর নিকটদিয়া প্রবাহিত হয়, তাহা হইলে আর মা'র আমার কোন ক্লেশ হইবে না"। প্রবাদ আছে শঙ্করের এই প্রার্থনা বিধাতা পূর্ণ করিয়াছিলেন। সেই নদীর গতি পরিবর্তিত হইয়াছিল এবং শঙ্কর-জননীর স্নানের ক্লেশও দূর হইয়াছিল।

শঙ্কর যদিও অধ্যয়নও অধ্যাপনা লইয়াই থাকিতেন তবু তাঁহার কাছে সংসারের কোন আকর্ষণ ছিল না। সংসারের কোন বন্ধনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে তাঁহার মন চাহিত না। তাঁহার হৃদয়ে বৈরাগ্যের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। তিনি চাহিতেছিলেন—সন্ন্যাসীর বেশে ভারতের নানাস্থান ভ্রমণ করিবেন। কিন্তু মা তাঁহাকে সংসার ছাড়িয়া যাইতে দিতে চাহিতেন না। কেমন করিয়া মায়ের নিকট হইতে সংসার ত্যাগের অনুমতি লাভ করিবেন, তাহাই হইল তাঁহার প্রধান চিন্তা; একদিন একটি দৈব ঘটনায় তাঁহার সে সুযোগও ঘটিয়া গেল। শঙ্কর একদিন একটি পুষ্করিণীতে স্নান করিতেছেন, এমন সময় একটা কুমীর আসিয়া তাঁহার পা ধরিয়া টানিতে থাকে। শঙ্কর পুকুরের জলে ঐরূপ অবস্থায় পড়িয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিলেন "মা, আমাকে কুমীরে ধরিয়াছে।" তাঁহার চীৎকার শুনিয়া জননী পাগলের মত পুকুরের ঘাটের দিকে ছুটিয়া আসিলেন। ছুটিয়া আসিয়া দেখিলেন, শঙ্করের সমস্ত শরীর জলমগ্ন। নিরুপায় জননী পুত্রের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিলেন। এই সময় শঙ্কর মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা, তুমি যদি আমাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি দেও, তাহা হইলেই এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইতে পারি নতুবা আর উপায় নাই।" শঙ্করের মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া স্নেহময়ী জননী পুত্রের জীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে সংসার ত্যাগের অনুমতি দিলেন। জননীর মুখ হইতে যেমন অনুমতির কথা বাহির হইল অমনি কুমীরও তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গেল।



শঙ্করাচার্য্য

শঙ্কর যখন তীরে উঠিলেন, তখন সকলে আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল যে, তাঁহার পায়ে কুমীরের দংশনের কোনও চিহ্ন নাই। এইবার শঙ্কর প্রকৃত সন্ন্যাসী হইলেন। এখন তিনি গৈরিক বসন পরিয়া ও হাতে দণ্ড লইয়া ভ্রমণে বাহির হইলেন।

সে সময়ে নর্ম্মদাতীরে গোবিন্দযোগী নামে একজন সিদ্ধ যোগীপুরুষ বাস করিতেন। শঙ্কর তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণের জন্য নানা দেশ, বন, নদ, নদী অতিক্রম করিয়া নিবিড় অরণ্যবাসী গোবিন্দযোগীর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দযোগী

তাঁহাকে দীক্ষা দান করিলেন এবং ধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। শঙ্কর এইখানে কিছুকাল অবস্থান করিয়া গুরুর আদেশে কাশীধাম গমন করেন এবং সেখানে যাইয়া ব্যাসকৃত ব্রহ্ম সূত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এ সময়ে বহুলোক তাঁহার সহিত ধর্ম্মালোচনা করিতে আসিত। যাঁহারা তাঁহার নিকট শাস্ত্র বিচারার্থ আগমন করিতেন, তাঁহারা পরিশেষে শঙ্করাচার্য্যের নিকট তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন। এ সময়ে শঙ্কর বেদান্তমত ঘোষণা করিবার জন্য দেশ ভ্রমণে বাহির হইলেন।

সে সময়ে তীর্থরাজ প্রয়াগে বৌদ্ধবিজয়ী কুমারিল ভট্ট নামে একজন পণ্ডিত বাস করিতেন। ভট্ট প্রকৃত পক্ষেই অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। শঙ্কর যখন তাঁহার নিকট বিচারার্থিরূপে উপস্থিত হইলেন, তখন তিনি বলিলেন—তুমি যদি আমার শিষ্য মণ্ডনমিশ্রের সহিত বিচার প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পার, তাহা হইলে আমিও পরাজিত হইলাম, এইরূপ স্বীকার করিয়া লইব। কিন্তু এই বিচারের মধ্যস্থতা করিবেন তাঁহার পত্নী উভয়ভারতী। উভয়ভারতী বিদ্যা-বুদ্ধিতে দেবী সরস্বতীর তুল্যা।

শঙ্কর কুমারিল ভট্টের কথা মানিয়া লইলেন এবং মণ্ডনমিশ্রের সহিত তর্ক করিবার উদ্দেশ্যে মাহিষ্মতী নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। উভয় পক্ষে অষ্টাদশ দিবস পর্য্যন্ত শাস্ত্রালাপ চলিয়াছিল। উভয়ভারতী মধ্যস্থা ছিলেন। বিচারে মণ্ডনমিশ্র পরাজিত হইলেন। উভয়ভারতী, শঙ্করের সহিত তর্কযুদ্ধে স্বামীর পরাজয় হইল দেখিতে পাইয়া শঙ্করের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্মনীতি সম্বন্ধে তর্ক করিতে আরম্ভ করিলেন। শঙ্কর সন্ন্যাসী—তিনি গৃহধর্ম্মের সম্বন্ধে কি জানেন? কাজেই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইল। শঙ্কর উভয় ভারতীর নিকট হইতে একমাসকাল সময় গ্রহণ করিয়া বলিলেন যে, পরে আমি আসিয়া আবার আপনার সহিত গৃহধর্ম্মনীতি সম্পর্কে তর্ক করিব।

একমাস পরে শঙ্কর যখন মণ্ডনমিশ্রের গৃহে আগমন করিলেন, তখন উভয় ভারতী বিচারে আর প্রবৃত্ত হইলেন না, তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেন।

অতঃপর শঙ্কর নানাদেশ ভ্রমণ করিয়া শৃঙ্গেরীতে গমন করিয়া সেখানে কিছুকাল বাস করেন। এ সময়ে তাঁহার শিষ্যেরা নানাগ্রন্থ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। কিছুকাল ঐ স্থানে বাস করিয়া স্নেহময়ী জননীকে দেখিবার জন্য তিনি পুনরায় কেরলে ফিরিয়া আসেন। দেশে আসিবার কিছুদিন পরেই তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার শেষ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া তিনি দেশ ত্যাগ করিলেন। কথিত আছে যে, এ সময়ে দেশের লোকেরা তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার করেন নাই।

শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষে পুনরায় বেদান্ত মত প্রতিষ্ঠার জন্যই আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নিজমত প্রতিষ্ঠার জন্য বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সহিত অনেক তর্কযুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। যাহাতে নিরীশ্বরবাদ (নাস্তিকতা) দূর হইয়া মানুষ ঈশ্বরবিশ্বাসী হয় ইহাই ছিল তাঁহার একান্ত চেষ্টা। বেদান্ত মতের উপর তাঁহার ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ লোকের জন্য তিনি শিবের আরাধনার প্রবর্ত্তন করেন। শঙ্করের শিষ্যেরা তাঁহাকে শিবের অবতার বলিয়া মনে করিতেন। শঙ্করাচার্য্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে চারিটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। দ্বারকায় সারদা মঠ, নীলাচলে গোবর্দ্ধন মঠ, দাক্ষিণাত্যে শৃঙ্গেরী মঠ ও বদরিকাশ্রমে যোশী মঠ। এই সকল মঠের সন্ন্যাসী অধিকারীরা এখন লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নিকট আচার্য্যের ন্যায় সম্মান লাভ করেন।

শঙ্করাচার্য্যের কিভাবে মৃত্যু হইয়াছিল সে বিষয়ে ভাল করিয়া কিছুই জানা যায় না। কথিত আছে, কেবলমাত্র ৩২ বৎসর বয়সে হিমালয়ের অন্তর্গত কেদারনাথতীর্থে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শঙ্করের লিখিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য, মোহ মুদ্গর, গঙ্গার স্তব ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

শঙ্করাচার্য্যের বাণী

ক্ষণকালও যদি সাধুসঙ্গ লাভ করা যায়, তাহা হইলে মুক্তির পথ আপনা হইতেই মানুষের নিকট আসিয়া উপস্থিত হয়।

ধন, জন, যৌবন ও ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব করিও না,—কাল নিমেষ মধ্যেই এই সকল হরণ করিয়া লয়।

আজ যে দেহ তোমার বলিষ্ঠ ও সুন্দর, কিছুদিন পরে তাহা রোগ ও জরায় জীর্ণ হইয়া যাইবে—অতএব ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া ধর্ম্মপথে চলাই কর্ত্তব্য।

জ্ঞানের অহঙ্কার, ধর্ম্মের অহঙ্কার সমস্ত, বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে তৃণের ন্যায় লঘু জ্ঞান করিয়া চলিলেই প্রকৃত ধর্ম্ম-পথের সন্ধান পাইবে।



দেহের উৎকর্ষ

৫৫১ পৃষ্ঠার পর

আনন্দ একটি বিশেষ মানসিক অনুভূতি। ব্যায়াম বা খেলার দ্বারা শরীর গড়বার কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও একমাত্র এই অনুভূতি দেহকে সম্পূর্ণ সুস্থ রাখতে সমর্থ। অপরদিকে দুঃখের প্রভাবও দেহের ওপর তেমনিই গভীর। কোন রোগ না থাকলেও দুঃখ দেহকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে পারে। আনন্দ ও দুঃখ পরস্পরের বিরোধী। কিন্তু সুখের কথা এই যে, খেলার সংস্কার (play instinct) আনন্দের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, মানসিক আনন্দ ও শারীরিক গতির সমন্বয়ে যে সংযুক্ত ফল আমরা পাই, তাহাকেই স্বাস্থ্য বলে।

ব্যায়াম শারীরিক গতি নিরূপিত করে স্বাস্থ্যলাভ করবার একটি সুচিন্তিত ধারা। তোমাদের মনে হতে পারে যে, ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে হাত পা সঞ্চালন করলেই যদি মানুষ সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে, তা'হলে আমরা চারিদিকে এত জীর্ণ শীর্ণ লোক দেখি কেন ; বিশেষ করে যাদের পেশী সঞ্চালন করে জীবিকা উপার্জ্জন করতে হয়, তারাই বা দৈহিক উৎকর্ষের আদর্শ হয়ে ওঠে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে আমরা কয়েকটি মূল তথ্য জানতে পারি। পেশী ও দেহের অস্থির জোড়গুলির উদ্দেশ্য—গতি, এ কথা তোমরা পূর্ব্বেই জেনেছ। দেহে নানা প্রকারের জোড় আছে, কোনটা দরজার কব্জার মত কাজ করে। যেমন কনুই; কোন জোড়া বা এমন ভাবে তৈরী, যা শরীরের সংযুক্ত দুটি অংশকে কব্জার মত চালিত করা ছাড়া একটা বৃত্তের পরিধি ভেতর ঘোরাতে পারে। যেমন কাঁধের জোড়, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের নিত্য-কার কাজকর্ম্মে আমরা এই জোড়াগুলিকে তাদের নির্দ্ধারিত পরিধিতে ব্যবহার করি না, অর্থাৎ দেহের পেশী ও জোড়াগুলির গতি আমরা আমাদের জীবনধারণের ধারার দরুণ দুভাগে বিভক্ত করে ফেলেছি। প্রথম, অভ্যাসগত গতি, দ্বিতীয়, যা অভ্যাসগত নয়। কাঁধের বা উরু ও কোমরের জোরের গতির আলোচনা করলেই কথাটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এই দুটি স্থানের পেশী ও জোড় এমন ভাবে তৈরী, যাতে হাত অথবা পা শুধু ওপর ও নীচের দিকেই চালানো যায় না—চক্রাকারেও ঘোরানো যায়। কিন্তু আমাদের প্রাত্যহিক কাজে এই অঙ্গ-দুটিকে উপর-নীচে তোলা-নামানো ব্যতীত চক্রাকারে ঘোরাবার দরকার হয় না, সুতরাং এই তোলা-নামানো একান্ত অভ্যাসগত গতি। ছোট ছেলে-মেয়েদের অস্থির জোড়ের নমনীয়তা পরীক্ষা করবার একটা নিয়ম আছে। কারণ, ব্যবহার না থাকলে এই জোড়গুলি অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়ে যায় এবং তাদের গতির পরিধি কম হয়ে আসে। তোমরা যদি কাঁধ থেকে বাহুটি বৃত্তাকারে ঘোরাবার চেষ্টা কর, দেখতে পাবে যে, তোমাদের মধ্যে অধিকাংশের বাহু ঠিক

চক্রাকারে ঘোরে না, কতকটা ত্রিকোণ পরিধিতে সঞ্চালিত হয়। তার কারণ অব্যবহারে অস্থির জোড় ও তার সম্পর্কীয় পেশী সম্পূর্ণ কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়েছে। যদি কাঁধের উৎকর্ষ লাভ করতে হয়, তবে নিরন্তর ব্যবহারে ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের সঞ্চালনের দ্বারা এই জোড়কে নমনীয় ও সবল করে তুলতে হবে।

এখন তোমরা বুঝতে পারছ যে ব্যায়াম অভ্যাসগত গতির ওপর নির্ভর করে না, এবং যে-সব পেশী ও অস্থির সংযোগস্থল আমরা সহজে ব্যবহার করতে পারি না. সেই গুলিকে নানাদিক থেকে সঞ্চালন করা তার একটি উদ্দেশ্য। এ উপায়ে সঞ্চালন করলে দেহের সেই অংশটির সম্পূর্ণ গতি, ক্ষিপ্রতা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি আমরা লাভ করতে পারি।

ব্যায়ামের সফলতা অন্যান্য জিনিষের ভিতর পৈশিক বাধার (muscular resistance) তারতম্যের ওপর নির্ভর করে। পেশীর শক্তি যদি প্রদত্ত বাধাটাকে আয়ত্ত করতে পারে, তাহলে পেশীর কোন উন্নতি হয় না। বাধা যদি অপেক্ষাকৃত বেশী হয়, পেশী নিরন্তর তার সংঘর্ষে এসে প্রাকৃতিক নিয়মে বাধাকে আয়ত্ত করবার উপযুক্ত শক্তি সঞ্চয় করে এবং ক্রমশঃ এমন অবস্থায় এসে পরে যে বাধা আরো না বাড়ালে উৎকর্ষ লাভের সব প্রচেষ্টা একটা অভ্যাসগত আচারে দাঁড়ায়। কথাটা উদাহরণের দ্বারা বোঝানো দরকার।

তোমাদের মধ্যে অনেকেই খালি হাতে ব্যায়াম করে থাক। এই প্রকারের ব্যায়ামে পৈশিক বাধা প্রদান করে তোমারই দেহ বা ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ভার। ওঠা-বসা বা বৈঠক করতে গেলে উরু ও পায়ের পেশীগুলি দেহের উপরিভাগের ওজনের বাধা পায়, কারণ ঐ ওজনের বাধা আয়ত্ত করতে এই পেশীগুলির যতটুকু শক্তির দরকার, গোড়াতে সেটা থাকে না। নিরন্তর চর্চ্চায় সেগুলি পুষ্টিলাভ করে' এমন শক্তিসম্পন্ন হয় যে, দেহের উপরিভাগের ওজন আর বাধা দিতে পারে না। এ অবস্থায় তোমরা কাঁধের ওপর অন্য কোন ভার রেখে বাধা বৃদ্ধি কর। ভার বৃদ্ধি হলে পেশী গুলি আবার এই নূতন বাধার অধিকতর প্রয়োজনের জন্য পুষ্টতর হতে থাকে। কিন্তু শুধু পূর্ব্বাভ্যাসটাই থাকলে সেটা অভ্যাসগত গতিতে দাঁড়িয়ে কেবল পেশীর সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি করতে পারে, তাতে পেশীর বা শক্তির বৃদ্ধি হতে পারে না।

যান্ত্রিক ব্যায়ামের উৎপত্তির এই মুখ্য কারণ। যান্ত্রিক ব্যায়ামের বাধাও আমরা দুভাগে বিভক্ত করতে পারি। এক, কোন যন্ত্রে ব্যায়ামকারীর দেহ-ভার প্রয়োজন মত বাধা দেওয়ার কাজ করে, তার ফল সীমাবদ্ধ; দ্বিতীয়, কোন যন্ত্র এমনভাবে তৈরী করা হয় যাতে যন্ত্রটাতেই একটা পরিবর্দ্ধনশীল বাধা পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য, এই দ্বিতীয় প্রকারের ব্যায়ামই পেশী ও অস্থির সম্পূর্ণ পরিণতি ঘটাতে পারে। আমরা সর্ব্বপ্রকার ব্যায়ামের ফলের পরিমাপ এই উপায়ে নির্ণয় করতে পারি। কিন্তু শুধু এই কথাটা তোমাদের মনে রাখতে হবে যে, কুস্তি খালি-হাত বা যান্ত্রিক কোন ব্যায়ামের পর্য্যায়ে আসে না। কুস্তির পৈশিক বাধা শ্রেষ্ঠতম, প্রতিদ্বন্দ্বী বদলানোর জন্য নিয়ত পরিবর্দ্ধনশীল, নিত্য-নূতন। শুধু প্রতিদ্বন্দ্বীর দেহভার ও শক্তি-প্রয়োগের ক্ষমতাই অধিকতর বাধা দেয় না, তার অনেকগুলি মানসিক বুদ্ধি ও চতুরতা, প্যাঁচ ইত্যাদি প্রয়োগের পটুতা প্রভৃতি এক অভিনব বাধার সৃষ্টি করে। এই কারণে কুস্তিকে ব্যায়াম হিসাবে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

পরিবর্দ্ধনশীল বাধা ও তৎসম্পর্কীয় পেশীর উন্নতির কথা পড়ে তোমরা ভাবতে পার যে, দেহের উন্নতির বুঝি আর কোন সীমা নেই—ক্রমাগত চর্চ্চার জোরে বুঝি বা এই ক্ষুদ্র মানুষের দেহকে হিমালয়ের মত বিরাট্ করে তোলা যায়। এক ঘটোৎকচের মৃত্যুর সময়ে নিজের দেহ বিস্তার করা ছাড়া এমন কথা গল্পেও শোননি। মানুষের দেহের চরমোৎকর্ষের ও সীমা আছে। সধারণতঃ তুমি যে-জাতির লোক, যে-বংশে তোমার জন্ম, সেই জাতি ও বংশের দৈহিক মাপকাঠির সীমা পর্য্যন্ত তুমি পৌছতে পার। কখনো কখনো ব্যতিক্রম যে ঘটে না, তা নয়। সেই ব্যতিক্রমের ও কারণ তোমার দৈহিক চর্চ্চা, খাদ্য, পরিবেষ্টন ইত্যাদি। বাঙ্গালী হয়ে অবাধ শরীরচর্চ্চার দ্বারাও একজন বুলগেরিয়ান বা জার্ম্মানের বিরাট্ অবয়ব পেতে পার না। অপর পক্ষে শরীরচর্চ্চার ও উপযুক্ত খাদ্যের অভাবে একজন পিগ্‌মীর মত স্বল্পও হয়ে যেতে পার না। সুবিধা পেলে জাতীয় দৈহিক মাপকাঠির সীমায় যেতে পার, অসুবিধায় তার নিম্নতম সীমায় নেমে যেতে পার। তোমার জন্মমুহূর্ত্তে তোমার পিতামাতার স্বাস্থ্য, তোমার দৈহিক উত্তরাধিকার উত্তরকালে তোমার দৈহিক উন্নতি নিরূপিত করবে, অবশ্য যদি এই উত্তরাধিকারের কোন অপব্যয় না হয়।

এ-কথা আমরা আবার আলোচনা করবার সুযোগ পাব।

মুখ থেকে মলদ্বার পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক প্রণালীকে পাকপ্রণালী বলা হয়। তোমরা জান যে, খাদ্য দেহের পাকপ্রণালীর ভিতর দিয়ে সঞ্চারণ করতে করতে, প্রণালীর বিভিন্ন অংশের নানা আন্তরিক রসের প্রতিক্রিয়ার পর তার প্রকৃষ্ট অংশ রক্তপ্রবাহে মিশিয়ে দেয়। রক্তপ্রবাহের কাজ দুটি,—খাদ্যাংশ ও অক্সিজেন দেহের সর্ব্বত্র সরবরাহ করা এবং দেহের ক্ষয়প্রাপ্ত অংশগুলি ও দূষিত পদার্থ বহন করে নিয়ে বিভিন্ন উপায়ে দেহ হতে বার করে দেওয়া।

আমাদের নড়াচড়া, শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া বা অন্য নানা প্রকার শারীরিক ক্রিয়ার জন্য পৈশিক ও অন্য নানা কোষের নিরন্তর ক্ষয় হচ্ছে, অপরদিকে সেই ক্ষয়পূরণের কাজও তেমনি নিরন্তর চলছে। ব্যায়াম পেশীর ক্ষুধা বৃদ্ধি করে, অর্থাৎ ব্যায়ামে পেশীর ক্ষয় অত্যন্ত বেশী হয়, কাজেই পেশী রক্তপ্রবাহ থেকে অধিকতর খাদ্য সংগ্রহ করে' পূর্ব্বেকার চেয়ে অধিকতর পুষ্ট ও দৃঢ়তর হয়; পেশী পুষ্টিলাভ করলে এবং এই শক্তির প্রয়োজনের জন্য কোষবৃদ্ধি হলেই আমরা পূর্ব্বের চেয়ে বলবান্ হয়ে উঠি।

ব্যায়াম আরম্ভ করবার প্রথম কয়দিন সর্ব্বাঙ্গে বেদনা হয়, কিন্তু প্রায়ই তিন চারিদিন পরে সেই বেদনা আর থাকে না, অবশ্য অধিকতর বাধার কোন নূতন ব্যায়াম যদি অভ্যাস না করা হয়। বেদনার কারণ এই যে, অনভ্যস্ত অভ্যাস ও বাধার অনুপযুক্ত হওয়ার জন্য পেশীর কোষগুলি ভেঙে গিয়ে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ সৃষ্টি করে। যতক্ষণ সেই বিষাক্ত পদার্থ রক্তস্রোতে মিশে স্থানান্তরিত না হয় এবং অধিকতর সুস্থ সবল কোষ তৈরী না হয়, ততক্ষণ বেদনা যায় না।

দেহের যে অংশের ব্যায়াম করা হয় সেই অংশে রক্তপ্রবাহ অত্যন্ত দ্রুত হয়ে ওঠে। কারণ, তখন এই রক্তপ্রবাহকে যা কাজ করতে হয়, তার মধ্যে প্রধান সেই অংশের পেশীর ক্ষুধা মেটাবার জন্য খাদ্য সরবরাহ করা, ও ক্ষয়িত পদার্থ সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। ব্যায়ামের সময়ে পেশীতে ভাঙাগড়ার কাজ একই সময়ে চলতে থাকে। অঙ্গসঞ্চালন ও বাধার কারণে কোষগুলি ভাঙতে থাকে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখতে পাবে যে, তুমি দেহের যে অংশের ব্যায়াম করছ, সাধারণ সময়ের চেয়েও সে অংশটা স্ফীত হয়েছে। তার কারণ আর কিছু নয়, ঐ অংশটার প্রয়োজনের জন্য সেখানে প্রচুর রক্ত প্রবাহিত হচ্চে।

ব্যায়াম চর্চ্চার দ্বিতীয় মুখ্য প্রয়োজন বিশ্রাম। বিশ্রামের সময় রক্তের খাদ্যাংশ নূতন নূতন এবং সবল কোষ তৈরী করে ও বিষাক্ত পদার্থ স্থানান্তরিত হয়। বিশ্রাম নানা উপায়ে হয়, তার মধ্যে নিদ্রা প্রধান। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, ব্যায়াম একটা উপায় ব্যতীত আর কিছু নয়। খাদ্য এবং বিশ্রামের একটিরও অভাব হলে ব্যায়াম লাভের না হয়ে ক্ষতিকর হয়।

দৌড়ানোর কথায় আমরা এ বিষয়টা আরো পরিষ্কার করে বোঝাতে পারব। দৌড়ানো একটা অত্যন্ত প্রাকৃতিক এবং প্রকৃষ্ট ব্যায়াম। দূর-দৌড়ানোতে পেশীর ক্ষয় অত্যন্ত বেশী হয়ে থাকে। তোমরা ব্যবসাদার দৌড়বাজের দেহ দেখ্‌লে নিশ্চয় ভাব যে, দৌড়ানো প্রকৃষ্ট ব্যায়াম হওয়া সত্ত্বেও তাদের দেহ সুপুষ্ট নয় কেন? তার কারণ এই যে, দূর-দৌড়ানোতে দেহের যে পেশী ক্ষয় হয়, সেটুকু পূর্ণ করবার জন্য অত্যন্ত দীর্ঘ বিশ্রাম ও পুষ্টিকর খাদ্য দরকার। দৌড়বাজেরা প্রায়ই পেশীগুলিকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দেবার পূর্ব্বেই আবার দৌড় অভ্যাস করে, এবং গতি(speed) অব্যাহত রাখবার জন্য পেশীনির্ম্মাণকারী প্রধান খাদ্যের অনেকগুলি ব্যবহার করে না।

বিবিধ প্রকারের ব্যায়ামের কথায় আমরা এগুলি বিশদভাবে আলোচনা করবার চেষ্টা করব।



খাদ্য-শস্য

ভূমি কর্ষণ


৬৬৩ পৃষ্ঠার পর

তোমাদের মধ্যে অনেকেই নিজের হাতে অনেক রকম ফুল, ফল বা সব্‌জী গাছের চারা রোপণ রোপন করিবার পূর্ব্বে কোদাল, খুরপী প্রভৃতির সাহায্যে মাটী গভীর ভাবে ভাল করিয়া আল্‌গা করিয়া লইয়াছ। ধান, পাট, আলু, তামাক, ইক্ষু, গম প্রভৃতি শস্যের বীজ বপন করিবার পূর্ব্বেও লাঙ্গল দিয়া ক্ষেত্রের মাটী এইরূপ আল্‌গা করিয়া দেওয়া হয়। কোন প্রকারের গাছ জন্মাইবার পূর্ব্বে এইরূপ ভাবে মাটী আল্‌গা করিয়া দেওয়াকেই ভূমি কর্ষণ বলে।

তোমরা জান যে, শিকড়ই গাছকে মাটীর সহিত দৃঢ়ভাবে আট্‌কাইয়া রাখে। তোমরা যদি একটি বেগুন গাছকে মাটী হইতে টানিয়া উঠাইবার চেষ্টা কর, দেখিবে, উহাকে উপড়াইয়া তুলিতে তোমাদের কত জোরের দরকার হইবে। ইহা হইতেই শিকড় কি ভাবে গাছকে মাটির সহিত শক্ত ভাবে আট্‌কাইয়া রাখে, ঝড়-ঝাপ্‌টা ও জীব-জন্তুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করে, তাহা তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। তোমরা ত কতবার দেখিয়াছ যে, প্রবল ঝড়ের সময় বড় বড় গাছ কত বেশী নাড়া পাইয়াও সহজে পড়িয়া যায় না; শিকড়ই তাহাদিগকে সবলে ধরিয়া রাখে বট, অশ্বত্থ, আম, কাঁটাল প্রভৃতি গাছের শিকড়ের তুলনায় পেঁপে, লেবু, বেগুন, মরিচ, লাউ, কুমড়া, ধান, ভুট্টা ইত্যাদি গাছের শিকড় খুব ছোট ও সরু; তাহা হইলে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, যে গাছকে আট্‌কাইয়া রাখিতে যেমন জোরালো শিকড়ের প্রয়োজন, সাধারণতঃ সেই গাছের সেইরূপ শক্ত ও বড় শিকড়ই থাকে। গাছকে মাটীর সহিত দৃঢভাবে আট্‌কাইয়া রাখিবার জন্য অনেক রকম গাছের শিকড় উহার দেহের দুই পাশ হইতে আড়াআড়ি ভাবে অনেক শাখা-প্রশাখা বাহির করিয়া চারিদিকে ছড়াইয়া দেয়। সুতরাং তোমরা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে যে, মাটীর ভিতরে শিকড় যাহাতে অনায়াসে ও অবাধে শাখা প্রশাখা বাহির করিয়া বিস্তৃত হইতে পারে, সেই জন্যই ভূমি কর্ষণের দ্বারা ক্ষেত্রের মাটী উত্তমরূপে আল্‌গা করিয়া দেওয়া হয়।

শিকড়ের আর একটি কাজ মাটীর ভিতর হইতে গাছের খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করা। মাটী যতই গভীর ও আল্‌গা ভাবে কর্ষিত হইবে, শিকড় ততই মাটীর ভিতরে ও আশে পাশে ছড়াইয়া গিয়া গাছের খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবে। কিন্তু গাছের খাদ্যের উপাদানগুলি মাটীর ভিতরের জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া তরল অবস্থা প্রাপ্ত না হইলে শিকড় তাহা গ্রহণ করিতে পারেনা। সুতরাং মাটীতে যথেষ্ট পরিমাণে জল থাকা একান্ত আবশ্যক। যদি কোন মাটীতে জলের অভাব হয়, তাহা হইলে জল সেচন করিয়া উহার জলের অভাব পূরণ করিতে হয়।

গাছ যে কৈশিক আকর্ষণের সাহায্যে মাটী হইতে খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করে, ইহা "মাটী" প্রবন্ধে তোমাদের বলা হইয়াছে। যে মাটীর কণা যত সূক্ষ্ম,

তাহার কৈশিক আকর্ষণ তত প্রবল। সুতরাং ভূমি কর্ষণ দ্বারা মাটীর কণাগুলিকে খুব সূক্ষ্ম করিয়া দিলে গাছ অধিক পরিমাণে জল ও তাহার সহিত খাদ্যের উপাদান সংগ্রহ করিতে পারে।

মাটীতে এক প্রকারের অসংখ্য জীবাণু বিদ্যমান আছে। ঐ জীবাণুগুলি বাতাস হইতে যবক্ষারজান গ্রহণ করিয়া মাটীতে সঞ্চিত করে। তোমরা জান, যবক্ষারজান গাছের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন। মাটীতে বায়ু চলাচল যত বেশী হয়, এই জীবাণুগুলি তত বেশী কার্য্যকরী হইয়া উহা হইতে যবক্ষারজান সঞ্চিত করিতে পারে। মাটীর কণাগুলি যতই সূক্ষ্ম হইবে, উহাতে বায়ুর চলাচল ততই বৃদ্ধি পাইবে। সেই জন্য ভূমি কর্ষণের দ্বারা মাটীকে গুঁড়া ও আল্‌গা করিয়া দিতে হয়।

জমিতে উত্তাপ বিদ্যমান থাকা বিশেষ প্রয়োজন। উহা না থাকিলে বীজ হইতে সহজে অঙ্কুর বাহির হইতে পারে না। গাছের বৃদ্ধির পক্ষেও উত্তাপের বিশেষ প্রয়োজন। কর্ষণের দ্বারা জমির মাটী আল্‌গা করিয়া দিলে সূর্য্যের উত্তাপ সহজে মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

আমাদের যেমন নানা প্রকার শত্রু আছে, গাছেরও সেইরূপ অনেক প্রকারের শত্রু আছে। এমন অনেক কীট-পতঙ্গ আছে, যাহারা আমাদিগকে কামড়াইলে আমাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া যায়; এমন কি, আমাদের জীবন নাশও হইতে পারে। সেইরূপ অনেক প্রকারের কীট-পতঙ্গ আছে, যাহারা গাছের পরম শত্রু। এই সকল কীট-পতঙ্গের মধ্যে অনেক প্রকার কেবল গাছ-পাতা খাইয়াই জীবনধারণ করে। ইহাদের মধ্যে আবার অনেক প্রকারের কীট-পতঙ্গ মাটীতেই ডিম পাড়ে, মাটীর ভিতরেই বসবাস করে। ভূমি কর্ষণের দ্বারা মাটীতে যে সকল পোকা বসবাস করে, তাহাদিগকে ও তাহাদের ডিম, বাচ্চা প্রভৃতিকে অনেক পরিমাণে বিনাশ করা যায়।

আগাছা কাহাকে বলে, জান কি? তোমরা হয় ত বলিবে যে, ঘাস, জঙ্গল ইত্যাদিকেই আগাছা বলে। কিন্তু কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে সে-কথা ঠিক খাটে না। জমিতে যে শস্য রোপণ করা হয়, তাহা ছাড়া যদি সেই জমিতে অন্য প্রকার শস্য জন্মে, তবে তাহাকেও আগাছা বলিয়া ধরিতে হইবে। মনে কর, পূর্ব্ব বৎসরে যদি কোন জমিতে সরিষার চাষ করা হইয়া থাকে, এবং সরিষার বীজ জমিতে ঝরিয়া পড়ে, পর বৎসর সেই জমিতে মটর বপন করিলে, সেই মটর ক্ষেতেও অনেক সরিষা গাছ জন্মিয়া থাকে। এরূপ স্থলে মটরের ক্ষেতের এই সরিষা গাছকেও আগাছা বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। এইরূপ আগাছা ও ঘাস জঙ্গল প্রভৃতি শস্যের আর একটি প্রবল শত্রু। কেন, বলিতে পার? কারণ, উহারা শস্যক্ষেত্রে জন্মিতে পাইলে, মাটিতে যে খাদ্যের উপাদানগুলি থাকে, তাহা অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়া শস্যের খাদ্যে ভাগ বসায়। ফলে, শস্য উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্জীব হইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া ঘাস, জঙ্গল, আগাছা ইত্যাদি ক্ষেত্রে জন্মিলে শস্যের উপযুক্ত পরিমাণে আলো-বাতাস পাওয়ার পক্ষেও বাধা ঘটায়। তোমরা হয়ত জান, আলো-বাতাসের অভাব হইলে গাছ-পালা ভালরূপে বাড়িতে পারে না। ইহা ছাড়া শস্য সকল কোন জঙ্গল ও আগাছার কাছে বসবাস করিতেও ভালবাসে না। ভূমি কর্ষণ করিয়া মাটী ওলটপালট করিয়া দিলে ঘাস-জঙ্গল, আগাছা প্রভৃতি মরিয়া যায় এবং উহারা জমিতে পচিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায়। তোমরা মনে করিয়া রাখিও, জমিতে যে সকল আগাছা জন্মে, ফুলফল ধরিবার পূর্ব্বেই ভূমি কর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে নষ্ট করিয়া ফেলা উচিত। তাহা না করিলে উহাদের বীজ মাটীতে পড়িয়া যায় এবং তাহা হইতে পুনরায় নূতন আগাছা জন্মিয়া শস্যের অনিষ্ট করে।

ভারী মাটী ও হাল্‌কা মাটী কাহাকে বলে, তাহা তোমরা জান। পুনঃপুনঃ ভূমি কর্ষণের দ্বারা ভারী মাটীকে হাল্‌কা করিয়া ফেলা যায়। আমরা যদি ভারী মাটী (এঁটেল মাটী)-কে হাল্‌কা করিতে চাই, তাহা হইলে উহার সহিত ভাল করিয়া বালি মিশাইয়া দিতে হইবে। এই মিশ্রণ কার্য্যটিও কর্ষণ দ্বারাই সহজে সাধিত হয়।

মাটীর সহিত গোবর ও এই প্রকার অন্য কোন সার মিশ্রণের জন্য ভূমি কর্ষণের প্রয়োজন। এমন অনেক প্রকারের উদ্ভিদ আছে—(ধঞ্চে, শণ, বরবটী ইত্যাদি) যাহা ক্ষেত্রে জন্মাইলে ভূমির উর্ব্বরতা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং উহার স্বাভাবিক অবস্থার ও পরিবর্ত্তন সাধিত হয়। এই সকল গাছে ফুল ধরিবার সময় ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া গাছগুলিকে মাটীতে মিশাইয়া দিতে হয়। গাছগুলি দুই এক মাসের মধ্যেই পচিয়া মাটীর উন্নতি সাধন করে।

তোমরা মনে করিও না যে, ভূমি কর্ষণ করিয়া বীজ

ছড়াইয়া দিলেই প্রচুর শস্য জন্মিবে। আমাদের ঘর বাড়ী যেমন সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিতে হয়, শস্যের ঘর-বাড়ী মাটীকেও সেইরূপ পরিষ্কার রাখা আবশ্যক। এই জন্যও আগাছা পরিষ্কার করিতে হয়। ক্ষেত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না করিলে শস্য সকল রীতিমত সুস্থ সবল হইতে ও বাড়িতে পারে না।

তোমরা অনেকে হয়ত দেখিয়াছ যে, কৃষকেরা মাঝে মাঝে খুরপী, কোদাল দিয়া মাটী আল্‌গা করিয়া দেয়। ইহা দ্বারা কেবল যে আগাছা নষ্ট করিয়া দেওয়াই তাহাদের উদ্দেশ্য, তাহা নহে, মাটী ঐরূপ ভাবে আল্‌গা করিয়া দিলে, জমির মধ্যে সঞ্চিত রস সূর্য্যের তাপে বাষ্প হইয়া যাইতে পারে না অর্থাৎ ইহা দ্বারা মাটীর ভিতরকার রস যাহা গাছের পক্ষে অতিশয় প্রয়োজনীয় তাহা রক্ষা করা হয়। তোমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে, বর্ষাকালে দুই চারি দিন রৌদ্র পাইলে জমি যখন শুকাইয়া যায় ও উহার মাটী আল্‌গা করিবার উপযুক্ত হয়, তখনই কৃষকেরা খুরপীর সাহায্যে মাটী আল্‌গা করিয়া দেয়। ইহাতে জমির রসের অপচয় হইতে পারে না। বর্ষা শেষ হইবার পর যে সকল জমিতে শস্য থাকে না, সেই সকল জমিও কৃষকেরা ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই কর্ষণ করিয়া থাকে। কোদাল, খুরপী দ্বারা ক্ষেত্রের মাটী আল্‌গা করাকেও ভূমি কর্ষণ বলে। এমন অনেক শস্য আছে—যেমন ইক্ষু, কপি, আলু, তামাক, হলুদ প্রভৃতি যাহাদের গাছের গোড়ায় মাটী দিয়া আলি বাঁধিয়া দিতে হয়। গাছের গোড়ায় মাটী দেওয়াও ভূমি কর্ষণের অন্তর্গত।

১	২	১	২

বিভিন্ন প্রকারের শস্যের জন্য গভীর ও অগভীর চাষ করিতে হয়। যে সকল শস্যের শিকড় মাটীর অনেক নীচে প্রবেশ করে, সেই সকল শস্যের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন। আবার যে সকল শস্যের শিকড় মাটীর নীচে বেশী দূরে যায় না, তাহাদের জন্য গভীর চাষের প্রয়োজন নাই। সাধারণতঃ শীতকালে বা গ্রীষ্মকালে যে সকল শস্যের চাষ করা হয়, তাহাদের পক্ষে গভীর চাষ অনেক সময় উপকারী। কারণ, তাহা দ্বারা ঐ সকল শস্য মাটীর নীচের সঞ্চিত রস অনায়াসে পাইতে পারে। বর্ষাকালে ফসলের জন্য গভীর চাষের তত প্রয়োজন হয় না। কারণ, তখন জমির উপরের স্তরেই প্রচুর পরিমাণে রস থাকে। কাদা মাটীও গভীর ভাবে চাষ করিবার প্রয়োজন হয় না। যে সকল ক্ষেত্রে পলি মাটী পড়ে, তাহাতেও গভীর চাষের আবশ্যকতা নাই।

পুনঃপুনঃ ভূমি কর্ষণ করিলে ও ক্ষেত্রের মাটী আল্‌গা করিয়া দিলে জমির উর্ব্বরতা শক্তি খুবই বৃদ্ধি পায়। জেথ্রো টাল্ (Zethro Tull) নামক এক জন প্রসিদ্ধ ইংরাজ কৃষক বলিয়া গিয়াছেন যে, পুনঃ-পুনঃ উত্তমরূপে ভূমি কর্ষণ করিলে, ক্ষেত্রে সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। জেথ্রো টাল্ সাহেবের উপদেশ অনুসারে মিঃ স্মিথ নামক অপর এক জন ইংরাজ এইরূপ ভাবে ক্ষেত্রের মাটী আল্‌গা করিয়া এবং সার প্রয়োগ না করিয়া প্রচুর পরিমাণে গমের ফলন পাইয়াছিলেন। যেরূপ জমিতে পার্শ্ববর্ত্তী সকল কৃষক ১৬ বুসেল হিসাবে গড়পড়তা গমের ফলন পাইতেন, তিনি সেইরূপ জমি হইতেই ৩৪ বুসেল হিসাবে গম পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার জমি সমান আয়তনে নিম্নলিখিতরূপে ভাগ করিয়া প্রথম বৎসর এক চিহ্নিত জমিগুলিতে গম বপন করিতেন এবং ২ চিহ্নিত জমিগুলিতে কোন শস্য না জন্মাইয়া উহাদিগকে কেবল পুনঃ পুনঃ গভীর ভাবে চাষ দিয়া রাখিতেন। দ্বিতীয় বৎসরে আবার এই সকল জমিতে গম জন্মাইতেন। সেই সময় ১ চিহ্নিত জমিগুলি আবার পুনঃপুনঃ চাষ দিয়া আল্‌গা করিয়া রাখিয়া তৃতীয় বৎসরে ঐগুলিতে গমের চাষ করিতেন।

১	২	১	২

পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সমতল ভূমিতে শস্য বপনের জন্য ভূমি কর্ষণ করা হইয়া থাকে কিন্তু পার্ব্বত্য অঞ্চলের পাহাড়-পর্ব্বতের উপরেও অনেক রকম শস্য জন্মান হয়। ঐ সকল পাহাড়-পর্ব্বতের উপর স্থানে স্থানে শাবলের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্রের সাহায্যে গর্ত্ত খুঁড়িয়া ঐ গর্ত্তের ভিতরে দুই তিন রকমের শস্যের বীজ একই সঙ্গে রোপণ করা হয়। এইরূপ ভাবে শস্য উৎপাদন করাকে "ঝুম" কৃষি বলে। ইহাও ভূমি কর্ষণের অন্তর্গত।



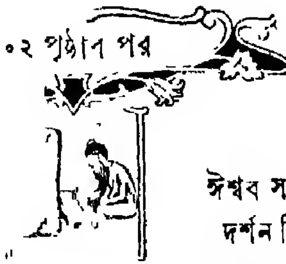


ভারতীয় দর্শন ও দার্শনিক

উপক্রমণিকা

['দর্শন' সম্বন্ধে সাধারণভাবে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এই প্রবন্ধে হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় দর্শন ও ভারতীয় দর্শন সবিস্তারে আলোচনা করা হইবে।]

১০২ পৃষ্ঠার পর



মানুষ আজ যত রকম বিদ্যার অধিকারী, দর্শন তাহার মধ্যে একটি প্রধান। এই দর্শন কাহাকে বলে, তাহা লইয়া অনেক সময় মতভেদ দেখা যায়; সকলে ইহাকে ঠিক একই অর্থে গ্রহণ করেন না। কথাটির সোজা অর্থ দেখা, সত্য দৃষ্টির নামই 'দর্শন'। কিন্তু দেব দর্শন বা রাজ-দর্শন দেখা অর্থে দর্শন হইলেও বিদ্যা-অর্থে দর্শন নয়, বিদ্যা-অর্থে দর্শন যাহা দেখিতে চায়, তাহা পারমার্থিক সত্য। মানুষের চারিদিকে যে বিরাট্ জগৎ রহিয়াছে, তার অর্থ কি, তাহা জানিবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে স্বতঃই উদিত হয়। এটা কি? সেটা কি? আমি কি? কোথা হইতে আসিয়াছি?—এরূপ প্রশ্ন শিশুরাও সর্ব্বদা করিয়া থাকে। এই জিজ্ঞাসাই যখন আরও গভীর আকার ধারণ করে, তখন তাহাকে দর্শন কহে। আমি ক্ষুদ্র জীব, আমার চারিদিকে একটা বিশাল বিশ্ব রহিয়াছে এবং এ-সকলের উপর ভগবান্ আছেন। জীব ও জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের বিষয় আলোচনা করে যে বিদ্যা, তারই নাম দর্শন। কিন্তু এই জীব ও জগতের সম্পর্কে যে-সব প্রশ্ন উঠিতে পারে, তার কোনটিরই সুষ্ঠু মীমাংসা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে সম্ভব হয় না। সুতরাং ঈশ্বর সম্পর্কে আলোচনাও দর্শনের অঙ্গ।

দর্শন কাহাকে বলে?

দর্শন বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন। বিজ্ঞানও সত্যের অনুসন্ধান করে, কিন্তু এই দুই অনুসন্ধানের ভিতর একটু পার্থক্য আছে। দর্শনের ন্যায় বিজ্ঞানও জানিতে চায়, এই জগৎটা কি, মানুষের দেহ-মনের উৎপত্তির কথা বিজ্ঞানও ভাবে। কিন্তু দর্শনের আলোচনা বিজ্ঞানের আলোচনার চেয়ে আরও গভীর ও বিস্তৃত। বিজ্ঞানের কাছে ক্ষুদ্র সত্যও সত্য এবং তাহারও প্রচুর মূল্য আছে; আর, তার আলোচনাও সে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া করে। কিন্তু যে-সব ক্ষুদ্র সত্যের অনুসন্ধান দর্শনের বিষয়ীভূত নহে, এ-সব সত্য সম্বন্ধে বিজ্ঞানের অনুসন্ধানের ফল লইয়া দর্শন নিজের গবেষণা আরম্ভ করে। একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি হয় ত আরও স্পষ্ট হইবে। যে আলোকের সাহায্যে আমরা চারিদিকের বস্তু সকল দেখি, তাহা একটি সত্য এবং যে চক্ষুর সাহায্যে আমরা দেখি, তাহাও একটি সত্য। এই উভয়ের সম্বন্ধেই বিজ্ঞানের অনুসন্ধিৎসা রহিয়াছে। পদার্থ বিজ্ঞানের গবেষণার ফলে আমরা আলোকের স্বরূপ জানিতে

দর্শন ও বিজ্ঞান

পারি ; আর শরীর বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা চক্ষুর গঠন ও ক্রিয়া প্রণালী জানিয়া থাকি। এই জ্ঞান হইতে চিকিৎসা প্রভৃতি ব্যাপারে মানুষের প্রচুর উপকার হইয়া থাকে ; সুতরাং এ-সব জ্ঞান তুচ্ছ বিষয় নহে। তথাপি, দর্শনের অনুসন্ধান এ-সব জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করিতে চাহে না। এ সব বিষয় বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত।

আলোক কি, তাপ কি, বিদ্যুৎ কি, এই সব ক্ষুদ্র-বৃহৎ বিক্ষিপ্ত সত্যের অনুসন্ধান করিয়া পদার্থ বিজ্ঞান সাধারণ ভাবে জড় জগৎটা কি, সে-সম্বন্ধেও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তেমনি, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া সারা দেহটা সম্বন্ধে শরীর-বিজ্ঞানও একটা সিদ্ধান্ত করে। আবার মানুষের দেহের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণীর দেহের তুলনা করিয়া, বিজ্ঞানের অনুসন্ধান জীবদেহ সম্বন্ধে একটা বিস্তৃততর সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তারপর, জড় ও চেতনের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া চেতনের স্বরূপ, তাহার উৎপত্তি ও অভিব্যক্তি এবং জড় হইতে তাহার পার্থক্য প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞান কতকগুলি সাধারণ সত্যের আবিষ্কার করে। এ সমস্তই বিজ্ঞানের এলাকার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এই পর্য্যন্তই বিজ্ঞানের সিমানা। এর পর দর্শনের রাজত্ব। বিজ্ঞান এই বিরাট্ বিশ্বের বিভিন্ন প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কতকগুলি সাধারণ সত্যের অনুসন্ধান পায় বটে, কিন্তু তাহা দ্বারা সমগ্র বিশ্বের কোন সমীচীন ব্যাখ্যা হয় না—তাহার প্রদেশ-বিশেষের ব্যাখ্যা হয় মাত্র। প্রাণিদেহের ব্যাখ্যা দ্বারা আমরা পর্ব্বত-দেহের ব্যাখ্যা করিতে পারি না। প্রাণিদেহের ব্যাখ্যা-প্রণালী আরও বিস্তৃতভাবে প্রয়োগ করিলে তাহা দ্বারা উদ্ভিদ্-দেহেরও ব্যাখ্যা হইতে পারে বটে, এবং এই ব্যাখ্যা-প্রণালী আরও বিস্তৃত করিয়া আমরা হয় ত পর্ব্বত-দেহেরও আংশিক ব্যাখ্যা করিতে পারি। এই ভাবে বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা-প্রণালী যে ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতেছে না, এমন নয়। কিন্তু তথাপি, এই সব কোন ব্যাখ্যা-প্রণালী দ্বারাই জীব ও অজীব, চেতন ও অচেতন—সমস্ত বিশ্বের এক সঙ্গে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। তাহা দিতে গেলেই বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিয়া দর্শনের রাজ্যে পদার্পণ করিতে হয়। সমগ্র বিশ্বকে এক সঙ্গে দেখিবার মত দৃষ্টি বিজ্ঞানের নাই। তার ফলে, ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত-সমূহ অনেকটা বিক্ষিপ্ত এবং অসম্পৃক্তভাবেই থাকিয়া যায়। ইহাদের ঐক্য সম্পাদনের ভার দর্শনের উপর। বিভিন্ন বিজ্ঞানের চরম সিদ্ধান্তগুলির সামঞ্জস্য সম্পাদন করিয়া দর্শন সমগ্র বিশ্বসম্বন্ধে একটা বিরাট্ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে চায়।

দর্শনের বিষয়

দর্শনের মোট আলোচ্য বিষয় তিনটি—জীব, জগৎ ও ঈশ্বর। জীব ও জগৎ সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবান্তর প্রশ্নের মীমাংসা বিজ্ঞানও করে ; কিন্তু এ-সকলের পরমার্থিক স্বরূপ কি, তার মীমাংসা করে দর্শন। আর, ঈশ্বর সম্বন্ধে বিজ্ঞানের বিশেষ কিছুই জানিবার নাই—ঈশ্বর বিশেষভাবে দর্শনেরই আলোচ্য বিষয়। ঈশ্বর আছেন কি না, কেন আমরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, ঈশ্বরের স্বরূপ কি, আমাদের সঙ্গে এবং এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ,—এই সব প্রশ্নও বিশেষভাবে দর্শনেরই অন্তর্গত,—বিজ্ঞানের নহে।

বিজ্ঞান আগে, না, দর্শন আগে?

বিজ্ঞান ও দর্শনের যে সম্বন্ধ আমরা দেখিয়াছি, তাহা হইতে এরূপ মনে করাও ভুল হইবে যে, বিজ্ঞান আগে আবির্ভূত হইয়া তাহার অনুসন্ধান সমাপ্ত করিলে পর দর্শনের আবির্ভাব হয়। পরন্তু, ইতিহাসে দর্শনের আবির্ভাবই আগে হইয়াছে, বিজ্ঞান আসিয়াছে তার অনেক পরে। আগে মানুষ সমগ্রভাবে এই বিশ্বটা কি, তাহাই জানিতে চাহিয়াছে। তার পর ক্রমশঃ জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ও ভূতল, জড় ও চেতন প্রভৃতি খণ্ড সত্যের অনুসন্ধান করিয়াছে। তখনই ভিন্ন ভিন্ন বিজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়াছে। দার্শনিক আলোচনা বিজ্ঞানের আলোচনার চেয়ে বয়সে প্রবীণ।

দর্শনের জন্মভূমি

বিজ্ঞানের জন্মের বহু পূর্ব্বে মানুষ দর্শনের প্রশ্নসমূহের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে। দর্শনের দীর্ঘ ইতিহাসের আলোচনা করিলে দেখা যায়, সকলের প্রথম দুইটি জাতি বিশেষ ভাবে দার্শনিক গবেষণা আরম্ভ করিয়াছে। প্রাচীন-কালে ভারত এবং গ্রীসে দর্শনের প্রথম আবির্ভাব হয়। সুদূর অতীতে চীনে ও মিশরেও দর্শন শাস্ত্রের চর্চ্চা হইয়াছিল বলিয়া কিছু কিছু প্রমাণ পাওয়া যায় ; সুতরাং গ্রীস্ এবং ভারতকে দর্শনের আদিম জন্মভূমি মনে করায় কোন দোষ নাই।

ভূগোলে বর্ত্তমানে যেটিকে গ্রীস্ দেশ বলা হয়, দর্শন-শাস্ত্র সর্ব্বপ্রথম সেখানে ঠিক দেখা দেয় নাই।

এশিয়া মাইনর ও গ্রীস্

গ্রীসের অধিবাসীরা অতি প্রাচীন-কালে—খৃষ্ট জন্মিবার বহু পূর্ব্বে—এশিয়া মাইনরে এবং ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বদিকস্থ দ্বীপসমূহে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল।

প্রথম দার্শনিক চিন্তা এই ঔপনিবেশিক গ্রীকদের ভিতরেই আবির্ভূত হয়। দর্শনের এই প্রথম আবির্ভাব খৃষ্ট জন্মিবার ৫০০।৬০০ শত বৎসর আগেকার ঘটনা—অর্থাৎ বর্ত্তমান সময় হইতে আড়াই হাজার বৎসর আগে উহা ঘটিয়াছিল। তার পর ক্রমে গ্রীক্-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি এথেন্সে উহা বাসভূমি লাভ করিয়াছিল; এবং সকলের চেয়ে বেশী পুষ্টি উহার সেখানেই হইয়াছিল। পরে, বিবিধ রাষ্ট্র বিপ্লব ও সামাজিক বিপ্লবের ফলে কখনও বা উহা আলেকজান্দ্রিয়ায়, কখনও বা রোমে আশ্রয় লাভ করে। ইতিমধ্যে খৃষ্টান ধর্মের আবির্ভাব হয় এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিরা অনেকেই এই ধর্মের অন্তর্গত হইয়া পড়েন। ফলে দার্শনিক চিন্তাধারায় অনেক পরিবর্ত্তন ঘটে—উহার আশ্রয়-স্থানও বদলিয়া যায়। আগে উহা নগরে নাগরিকদের আশ্রয়ে পুষ্টিলাভ করিতেছিল; কিন্তু খৃষ্টীয় ধর্মের বিস্তার এবং শক্তিলাভের পরে উহা লোকালয়ের বাহিরে নির্জ্জন মঠে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীদের ও ধর্ম-যাজকদের আশ্রয়ে পোষিত হইতে থাকে। এই ভাবে ইউরোপের দর্শন দীর্ঘকাল জীবন যাপন করে। কিন্তু খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে এবং তন্নিকটবর্ত্তী সময়ে ইউরোপের ইতিহাসে অনেক বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঘটিয়া যায়—যার ফলে দর্শন-শাস্ত্রও আবার সংসারী লোকের হাতে আসিয়া পড়ে; এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার আকৃতি ও পরিচ্ছদও বদলিয়া যায়। বর্ত্তমানে ইউরোপে জার্ম্মানী, ফ্রান্স, ইটালী এবং ইংলণ্ডেই দর্শনশাস্ত্রের চর্চ্চা বিশেষভাবে চলিতেছে। আর ইউরোপের বাহিরে আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নাম করা যাইতে পারে। ইউরোপে যে দর্শনশাস্ত্রের সাক্ষাৎ আমরা পাই, তাহা গ্রীসের উপনিবেশসমূহে এবং গ্রীক্ জাতির ভিতর উৎপন্ন হইয়া ক্রমে রোমক জাতির সাহায্যে রোম-সাম্রাজ্যের মধ্যে রোমক-সভ্যতার ছায়ায় আশ্রয় পায়, পরে, এই সাম্রাজ্যের ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে খৃষ্টান মঠবাসীদের আশ্রয়ে উহা দীর্ঘকাল জীবন যাপন করে। তারপর উহা খৃষ্টান ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে বর্ত্তমান ইউ-রোপীয় জাতিদের মধ্যে এবং তাহাদের প্রভাবে সমগ্র জগতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এই দর্শনেরও আগে আমাদের ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতের দর্শন ইউরোপের দর্শনের চেয়ে ঢের প্রাচীন। এই দর্শনের গভীরতাও কম নহে। কিন্তু ভারতের রাষ্ট্রীয় অবস্থার দরুণ ইহা

ইউরামেরিকা ও ভারতবর্ষ

বাহিরে তেমন বিস্তৃত লাভ করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষ হইতে একটি বিরাট্ ধর্ম্ম বাহিরে গিয়াছে—তার নাম বৌদ্ধ ধর্ম্ম। এই ধর্মের আনুষঙ্গিক যে দর্শন, তাহারও ভারতের বাহিরে সাক্ষাৎ মিলে। কিন্তু ইহা ছাড়াও ভারতে অনেক রকম দার্শনিক চিন্তা দেখা গিয়াছে; সেগুলি বাহিরে তেমন বিস্তার লাভ করিতে পারে নাই। ভারতের বাহিরে সিংহল, যব প্রভৃতি কতকগুলি ক্ষুদ্র বৃহৎ দ্বীপে ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা ছাড়া ভারতের বাহিরে কোথাও হিন্দু নাই এবং হিন্দু দর্শনেরও কোন চিহ্ন নাই। বর্ত্তমানে অবশ্যই ইউরোপ প্রভৃতি দেশে হিন্দুদর্শনের ন্যূনাধিক চর্চ্চা হইয়া থাকে। বিগত শতাব্দীতেও জার্ম্মানীতে শোপেনহর, হেগেল্ প্রভৃতি দার্শনিকেরা হিন্দু দর্শনের প্রভাব অনেকটা অনুভব করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাপি ভারতীয় দর্শন মোটামুটি ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ রহিয়াছে।

ইউরোপীয় দর্শনের যুগ-বিভাগ

ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসে সাধারণভাবে তিনটি যুগ দৃষ্ট হয়। ১ম, প্রাচীন যুগ, অর্থাৎ প্রধানতঃ গ্রীকদর্শনের যুগ, দ্বিতীয় মধ্যযুগ অর্থাৎ খৃষ্টীয় ধর্মের আব্-ছায়ায় যতদিন দর্শন-শাস্ত্র ছিল, সেই যুগ; আর ৩য়, আধুনিক বা বর্ত্তমান যুগ। প্রাচীন যুগের দর্শনে খৃষ্টান ধর্মের কোন প্রভাব নাই,—সেই-জন্য, উহার সহিত ভারতীয় দর্শনের অনেকটা সাদৃশ্য রহিয়াছে। ইউরোপের মধ্যযুগের দর্শন প্রকৃত-প্রস্তাবে খৃষ্টান ধর্ম্মেরই আলোচনা—স্বাধীন দার্শনিক চিন্তা উহাতে বিশেষ কিছু ছিল না। তারপর, খৃষ্টীয় পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীতে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রভাব কতকটা অমান্য করিয়া দর্শনে একটা স্বাধীন চেষ্টা দেখা দেয়, এবং ক্রমশঃ এই স্বাধীন চিন্তা-ধারা পুষ্টিলাভ করিয়া বর্ত্তমান যুগে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এখনও পাশ্চাত্য দর্শনে—ইউরোপে ও আমেরিকায়—খৃষ্টান ধর্ম্মের প্রচুর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইলেও দর্শনকে এখন আর ধর্মের অধীন বলা চলে না। এক সময়ে তা-ও ছিল; কিন্তু বর্ত্তমানে দার্শনিক চিন্তার স্বাধীনতা সকল দিকেই স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতবর্ষেও দর্শন ধর্মের শাসন অবহেলা করিতে পারে নাই। শাস্ত্র যাহা বলে, তাহাই ভাল করিয়া বুঝিবার চেষ্টার নামই অনেক সময় 'দর্শন' হইয়াছে। কোন গৃহীত মতামতের বন্ধন স্বীকার না করিয়া স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধানই প্রকৃত পক্ষে দর্শন।

কিন্তু দর্শনের এই স্বাধীনতা সকল সময়ে স্বীকৃত হয় নাই এবং দর্শনও সব সময় সে স্বাধীনতা দাবী করতে পারে নাই—ভারতবর্ষেও নয়। হিন্দু দর্শনের বেদ এবং বৌদ্ধ দর্শনে বুদ্ধের বাণী অভ্রান্ত সত্য হিসাবে গৃহীত হইয়াছে। দর্শনের সত্যানুসন্ধিৎসা অনেক সময়ই এই সব বাণীর প্রকৃত অর্থ বাহির করা ভিন্ন আপাততঃ আর কিছুই ছিল না। কিন্তু ইহারই ভিতরে এই সব গৃহীত ধর্মগ্রন্থ অমান্য না করিয়াও ভারতে দার্শনিক চিন্তাধারা প্রচুর স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল এবং এমন অনেক সূক্ষ্ম তত্ত্বের আবিষ্কার করিয়াছিল, যাহা এখনও জগতের শ্রদ্ধা লাভ করিয়া থাকে। তাহার কারণ, প্রথমতঃ যে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা দর্শন করিতে চাহিত, তাহাও একটা স্বাধীন চিন্তারই ফল ছিল; আর দ্বিতীয়তঃ ব্যাখ্যাও অনেক সময় সূক্ষ্ম বিশ্লেষণের সাহায্যে মূলকে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে। ব্যাখ্যাকারদের এই শক্তি আইনে এবং দর্শনে উভয়েই বিশেষ ভাবে দৃষ্ট হয়। বেদ বা শ্রুতির যে অংশকে আশ্রয় করিয়া ভারতীয় দর্শন উৎপন্ন ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেই উপনিষদগুলিও একটা স্বাধীন চিন্তারই ফল। আর, যে বুদ্ধের বাণী আশ্রয় করিয়া বৌদ্ধ-দর্শন গঠিত হইয়া উঠিয়াছে, সেই বুদ্ধও বৈদিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন এবং তাহার প্রচারিত ধর্ম্মে একটা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা স্পষ্ট। তথাপি, ধর্ম্মপ্রচারের এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানের নাগপাশ ভারতীয় দর্শন একেবারে ছিন্ন করিতে পারে নাই, একথা মানিয়া লওয়ায় কোন দোষ নাই।

ধর্ম ও দর্শন

কিন্তু ধর্ম্ম-শাসনের এই অধীনতা ভারতীয় দর্শনের ঠিক নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নহে। কেন না, এ জিনিব পাশ্চাত্য দর্শনেও রহিয়াছে। সেখানেও ধর্ম্মের শাসন অমান্য করা সহজ-সাধ্য হয় নাই। ভারতীয় দর্শনের যাহা বৈশিষ্ট্য, সেটি এই যে, ইহা মোক্ষশাস্ত্র। ইউরোপের দর্শন শুধু জ্ঞান দেয়; পরমার্থিক সত্য জানিতে মানুষের যে ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা হয়, তাহা চরিতার্থ করে। ইহার বেশী কোন ফল তাহার অভিপ্রেত নয়। কিন্তু ভারতীয় দর্শন শুধু জ্ঞানের জন্য জ্ঞান-চর্চ্চা নহে। তাহাতেও জ্ঞানের কথা আছে—কিন্তু সে জ্ঞান অন্য একটা বড় জিনিব পাওয়ার উপায় মাত্র; সেই বড় জিনিষটির নাম মোক্ষ বা মুক্তি। জীবনে নানারকম দুঃখ মানুষ পায়, এ-সব দুঃখ হইতে কিসে মুক্তি পাওয়া যায়, ভারতীয় দর্শন প্রধানতঃ তাহাই বলিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতীয় দর্শন সাধারণভাবে ইহা ধরিয়া লইয়াছে যে, জীবন দুঃখময়, সুতরাং এই দুঃখের নিবৃত্তি মানুষের পরম-কাম্য। ইউরোপীয় দর্শন জীবনটাকে দুঃখময় বলিয়া সব সময় মনে করে নাই, সুতরাং মুক্তিপ্রাপ্তিই ইহার চরম কাম্যও নহে; সত্য জিজ্ঞাসা চরিতার্থ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

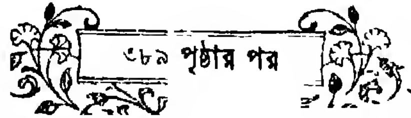
ভারতীয় দর্শনের বৈশিষ্ট্য

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের চেয়ে দীর্ঘ। কারণ, ইহার আরম্ভ অনেক আগে। বর্ত্তমানে অবশ্যই ইউরোপের চিন্তাধারা অনেক গভীর ও পুষ্ট এবং নানা দিকে উহা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। সেই অনুপাতে বর্ত্তমানে ভারতীয় দর্শন হয় ত অনেকটা নিঃস্ব প্রতীয়মান হইবে। কিন্তু তথাপি ইহার ইতিহাস এখনও একেবারে সমাপ্ত হইয়া যায় নাই, আর অতীতের দিকে তাকাইলে ভারতকে দার্শনিক চিন্তায় মোটেই দীনও মনে হইবে না। মূল্য ইহার যাহাই হউক না কেন, ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস যে ইউরোপীয় দর্শনের ইতিহাসের চেয়ে দীর্ঘতর, সে-বিষয়ে আর কোন সন্দেহ চলে না। এই দীর্ঘ ইতিহাসে যুগ-বিভাগ অপরিহার্য্য। মোটামুটি সমগ্র ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস চারটি যুগে বিভক্ত হইতে পারে। ১ম,—বেদ ও উপনিষদের যুগ; ২য়—সূত্রকারদের যুগ; ৩য়—ভাষ্যকারদের যুগ; আর ৪র্থ—পরবর্ত্তী সংগ্রহকর্ত্তা ও ব্যাখ্যাকারদের যুগ।

এইটি প্রধানতঃ হিন্দু দর্শনের যুগবিভাগ। হিন্দু দর্শনের পাশাপাশি ভারতবর্ষে আরও দুইটি বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য চিন্তাধারা আবির্ভূত হইয়াছিল—তাহা বৌদ্ধ ও জৈন দর্শন। এই দুইটির বেলায় এই যুগ বিভাগ ঠিক প্রযোজ্য নহে। ইহারা খৃষ্ট জন্মিবার ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্ব্বে এবং বুদ্ধ ও মহাবীরের মৃত্যুর পর আবির্ভূত হইয়া হিন্দু দর্শনের পাশাপাশি এবং তারই সঙ্গে আড়াআড়ি করিয়া বাড়িয়া চলিয়াছিল। এই সব দর্শনের সঙ্গে হিন্দু দর্শনের যে অনেক বাদ-বিতণ্ডা হইয়াছিল, তাহার প্রমাণ আছে। তার পর দেখা যায়, হিন্দুর দর্শনের নিকট পরাস্ত হইয়া ইহারা ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া পড়ে এবং ভারত হইতে ইহাদের পঠন-পাঠনও একরূপ উঠিয়া যায়। আমরা ক্রমশঃ এ সমস্তেরই একটু বিস্তৃত আলোচনা করিব।



মানুষ কি খায়?


৩৮৯ পৃষ্ঠার পর

পৃথিবীতে যে কোন প্রাণীই দেখি না কেন, মানবের ন্যায় অন্য কোন প্রাণী এত বিভিন্ন প্রকার খাদ্য খায় না। আবার মানবের খাদ্য দেশকালপাত্র ভেদে বিভিন্ন। এক দেশের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্য অন্যদেশের লোকেরা হয়ত ঘৃণাভরে ফেলিয়া দিবে। আমরা মাডাগাস্কার (Madagascar)-অধিবাসীদের ন্যায় ঘাসফড়িং, পঙ্গপাল, মাকড়সা, গুটী পোকা প্রভৃতি দিয়া ভাতকে সুস্বাদু করিতে পারিব না, কিংবা শীতপ্রধান দেশের এস্কিমোদের (Eskimo) ন্যায় শীলমৎস্যের শুষ্ক চর্ব্বির টুকরা আনন্দ সহকারে চর্ব্বণ করিতে পারিব না।

আমাদের ধারণা যে ইউরোপের সকল জাতিরই বুঝি মাংস প্রধান খাদ্য, কিন্তু তাহা নহে। ইটালি দেশের কৃষকদের ভুট্টাই প্রধান খাদ্য। ইউরোপের অনেক দেশের কৃষকেরা মাংস, দুগ্ধ বা ভাল ফল খাইতে পায় না—এ-সব ধনীদের জন্য। এশিয়ায় সর্ব্ব জাতিই প্রায় দিনে দুইবার আহার করে। কোন জাতির ভাত প্রধান খাদ্য, আবার কোন জাতির যব, গম বা ভুট্টা প্রধান খাদ্য। তিব্বতের লোকেরা প্রত্যেকবার খাবার সময় চা খাইবে, আবার সে চা লবণ ও মাখম দিয়া অদ্ভুতভাবে তৈয়ারী করিবে। তারা চায়ের সঙ্গে মাংস রাঁধিয়া ঐরূপ চায়ের সঙ্গে খাইবে। কর্পূরের দেশ ফরমোজার (Formosa) আদিম অধিবাসীরা লবণের পরিবর্ত্তে আদা পছন্দ করে। মাদ্রাজের দিকের লোকেরা লঙ্কা ও রসুন জলে সিদ্ধ করিয়া ভাজা পেঁয়াজের সঙ্গে পরম পরিতোষপূর্ব্বক ভাতের সঙ্গে খাইবে। আবার ব্রেজিলের আদিম অধিবাসীরা বিষাক্ত শিকড়ও বাদ দেয় না; তারা কাসাভা (cassava plant) গাছের শিকড় নিংড়াইয়া অতি ভয়ঙ্কর বিষ (prussic acid) বাহির করিয়া দিয়া সেই শিকড় শুকাইয়া ও গুঁড়া করিয়া আহার করে। আমাদের দেশে গরীব সাঁওতালেরা বৎসরের কয়েক মাস কেবল মহুয়া খায়। আবার ফরাসীদেশের কোন কোন স্থানের গরীব লোকেরা কয়েক মাস চেষ্টনাট (chestnut) ফল চূর্ণ করিয়া তার রুটী করিয়া কাচা চেষ্টনাটের তরকারি দিয়া খায়। সুবৃহৎ এমেজন নদীর তীরবর্ত্তী লোকেরা কচ্ছপ খাইতে ভালবাসে। কোন জাতি সর্প খায়, কেহ বা বাদুর খায়, কেহ বা শৃগাল খায়। মেরুর নিকটবর্ত্তী দেশগুলিতে তুষারপাতের জন্য চাষ আবাদ করা যায় না। সে দেশের লোকেদের জীব হিংসা ছাড়া গতি নাই। তারা শিকারের জন্য স্থান হইতে স্থানান্তরে যায়। গ্রীনল্যাণ্ড (Greenland) প্রভৃতি দেশে শীলমৎস্য শিকারই প্রধান পেসা। কারণ তারা শীলমৎস্যের চামড়ায় বস্ত্রাদি ও জুতা প্রস্তুত করে, চর্ব্বিতে আলো জ্বালে ও রন্ধন করে, মাংস ভক্ষণ করে, আবার শীলমৎস্যের পেটের ভিতরের পাতলা চামড়া (membrane) জানলার কাঁচের পরিবর্ত্তে ব্যবহার করে। মেসোপটেমিয়া, আরব প্রভৃতি দেশের লোকেদের খেজুরই প্রধান খাদ্য। চীনদেশে বাঁশের শিকড়, এক প্রকার পক্ষীর বাসা, পচা ডিম প্রভৃতি

উপাদেয় খাদ্য। চীনেরা খড়ির ভিতর ডিমকে তাজা রাখে আর ঐরূপ ডিম যত পুরাতন হইবে তার দামও তত বেশী হইবে। ব্রহ্ম ও চীন দেশে মৎস্য প্রভৃতি পচাইয়া ঐরূপ খাদ্য অতি উপাদেয় বলিয়া ভাতের সঙ্গে মাখিয়া আহার করে। আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের মধ্যে অনেক পঙ্গপাল, উচ্চিংড়ে, পিপড়ে, পিপড়ের ডিম, পদ্মের শিকড় প্রভৃতি খায়। আবার পুরাকালে অনেক অসভ্য জাতিরা নরমাংসলোলুপ ছিল, যুদ্ধের বন্দীদিগকে উৎসব করিয়া পোড়াইয়া খাইত। আধুনিক যুগে সভ্যতার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানব আর নরমাংস খায় না বটে কিন্তু ফরমোজার অসভ্য জাতিরা নরমুণ্ড প্রিয়। যতদিন না কেহ অন্ততঃ একটি মানুষ মারিয়া তাহার মুণ্ড না আনিবে ততদিন তাহাকে সাবালক বলিয়া ধরা হয় না। আবার যে গৃহে যত নরমুণ্ড থাকিবে সে গৃহস্বামীর সম্মান তত বেশী হইবে। সেখানে নরমুণ্ডের খুলির পাত্র সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান পাত্র বলিয়া ধরা হয়।

ক্যানাডা, নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড প্রভৃতির দেশে এত বেশী মৎস্য বধ হয় যে, দেখিলে আতঙ্ক হয়। অসংখ্য জাহাজ বোঝাই লক্ষ লক্ষ মণ মৎস্য খাদ্য, তৈল বা চর্ব্বির জন্য বধ করা হয়। একবার ভয় হইয়াছিল যে, বুঝি ঐ স্থানের মৎস্যকুল নির্ম্মূল হইবে। সেইজন্য বৎসরের কয়েক মাস মৎস্য ধরা আইন অনুসারে বন্ধ করা হইয়াছে। উত্তমাশা অন্তরীপের নিকটে তিমি মৎস্যও ঐরূপ ভাবে নির্ম্মূল হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল।

আবার সম্প্রতি পাশ্চাত্য দেশের একটি হোটেলে একটি মৃত সিংহের মাংস রন্ধন করিয়া অতি উপাদেয় ভাবে ভক্ষণ করিয়াছে। কোন কোন মানব ফল-মূল বা দুগ্ধ ছাড়া কিছুই খান না—তাহাতে তাঁরা মেধাবী, সবল, সুস্থ ও দীর্ঘায়ু হইতেছেন, আবার কেহ কেহ মৎস্য মাংস ছাড়া অন্য কিছু খান না—ইহাতেও তাঁরা পূর্ব্বোক্ত মানবের সমকক্ষ হইতেছেন। আবার দেখা গিয়াছে যে, যুদ্ধের সময় বাধ্য হইয়া মানুষ জুতা সিদ্ধ করিয়াও খাইয়াছে। কাকও কাকের মাংস খায় না কিন্তু মানুষ মানুষের মাংসও খাইয়াছে। মানুষই সর্ব্বভুক্—মানুষের ক্ষুধা মিটাইতে যে কত লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণ নাশ হয়, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ভারতবর্ষের রাজধানীর নাম কি ?

দিল্লী বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের রাজধানী। দিল্লী যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। ১৯১১ খৃষ্টাব্দে ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জ কলিকাতা হইতে মুঘলদের রাজধানী, প্রাচীন দিল্লী নগরীতে পরিবর্ত্তন করেন। ১০,০০০,০০০ পাউণ্ড অর্থব্যয়ে দিল্লী নগরীতে সুন্দর সুন্দর প্রশস্ত রাজপথ, বৃহৎ ও মনোহর প্রাসাদ ইত্যাদি নির্ম্মিত হইয়াছে।

উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু প্রদেশ কে কে প্রথম গিয়াছিলেন ?

আমেরিকার যুক্তরাজ্যের নৌ-বহরের কমেণ্ডার রবার্ট ই, পিয়ারী (Commander Robert E, Peary) ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে সর্ব্বপ্রথম উত্তর মেরুতে (North Pole) পৌঁছিয়াছিলেন। নরওয়ের অধিবাসী রোয়েল্ড আমুণ্ডসেন (Roald Amundsen) ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ১৬ই ডিসেম্বর দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছিয়াছিলেন। কাপ্তান স্কট ইহার কাছে পরাজিত হন।

ইংরাজী ভাষায় কত শব্দ আছে ?

ইংরাজী ভাষার সব চেয়ে বড় অভিধানেও ৪১৪,৮২৫ শব্দের বেশী শব্দ সঙ্কলিত হয় নাই। অভিধানের মধ্যে এমন অনেক শব্দ আছে যাহা কখনও কেহ ব্যবহার করে না।

আকাশে যদি চাঁদ না থাকিত তাহা হইলে পৃথিবীর কি অবস্থা হইত ?

যদি আকাশে চাঁদ না থাকিত, তাহা হইলে সমুদ্রের বুকে স্রোতের ধারা এমন প্রবল হইত না। আর অনেকগুলি রাত্রিতে অন্ধকারই খুব বেশী দেখিতে পাওয়া যাইত।

পৃথিবীর কয়েকটি বড় দ্বীপের নাম কর।

গ্রীনল্যাণ্ড (Greenland) ৮২৫,০০০ বর্গ মাইল।
নিউ গিনি (New Guinea) ৩৪০,০০০ বর্গ মাইল।
বোর্ণিয়ো (Borneo) ৩০১,০০০ বর্গ মাইল।

পৃথিবীর লোক-সংখ্যা কত ?

পৃথিবীর লোক সংখ্যা দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত পৃথিবীর লোক-সংখ্যা হইতেছে, ১,৮৫০,০০০,০০০। সংখ্যা দেওয়া কঠিন! কেননা, এমন কোন কোন দেশ আছে যেখানে লোক-সংখ্যা গণনা করা হয় না। ইউরোপের জনসংখ্যা—৫০০,০০০,০০০ এশিয়া—১,০০০,০০০,০০০, উত্তর আমেরিকা—১৪৫,০০০,০০০, দক্ষিণ আমেরিকা—৬৫,০০০,০০০, এবং আফ্রিকা—১৪০,০০০,০০০

পৃথিবীর ওজন কত ?

পৃথিবীর বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা পৃথিবীর ওজন সম্বন্ধে অনেক কিছু গবেষণা করিয়াছেন। ১৭৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে হেন্‌রি কেভেণ্ডিস্ নামে একজনক ইংরাজ বৈজ্ঞানিক, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা পৃথিবীর ওজন নির্ণয় করেন। তিনি স্থির করেন যে, পৃথিবীর ওজন হইবে ১২,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ পাউণ্ড। বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিকেরাও কেভেণ্ডিসের এই নির্দ্ধারণকে সমর্থন করিতেছেন।

আমরা কি চাঁদের দেশে বাস করিতে পারি ?

না। চাঁদে জলও নাই, বাতাসও নাই। দিনের বেলায় ভয়ানক তাপ ও রাত্রি বেলায় ভয়ঙ্কর শীত। এমন দেশে কেমন করিয়া জীব বাস করিবে ?

পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী কোন্‌টি ?

দক্ষিণ আমেরিকা আমাজন (Amazon) নদী হইতেছে পৃথিবীর সব চেয়ে বড় নদী। ২,৭০০,০০০ বর্গ মাইল ভূখণ্ড আমাজনের স্রোতোধারায় ধৌত হয়। ব্রেজিল (Brazil), বোলিভিয়া)Bolivia, ইকুয়েডার (Ecuador) এবং পেরু (Peru) ও কলোম্বিয়া (Columbia) দেশের মধ্য দিয়া আমাজন নদী প্রবাহিত হইতেছে। ইহার দৈর্ঘ্য ৪০০০ হাজার মাইল। মিসিসিপি (Mississipi) এবং মিশৌরি (Missouri) এ দুইটি নদী ও উপনদী মিলিয়া দৈর্ঘ্যে (৪,২০০) আমাজনের চেয়ে দুইশত মাইল বেশী দীর্ঘ। সমুদ্রের কাছাকাছি ইহার প্রশস্ততা ২০০ দুই শত মাইল।

আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের বংশধরগণকে ইণ্ডিয়ান বলা হয় কেন ?

আমেরিকা যখন প্রথম আবিষ্কার হয়, তখন উহাকে ইণ্ডিয়া বা ভারতের একটি অংশ বলিয়া ধরা হইয়াছিল। সেইজন্যই আমেরিকার নিকটবর্ত্তী দ্বীপ-পুঞ্জের নাম ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ্ (West Indies) বলা হয়।

নিষিদ্ধ নগরী বা দেশ কোন্‌টি ?

তিব্বত নিশিদ্ধ দেশ (Forbidden Land) বলিয়া পরিচিত। পূর্ব্বে তিব্বতীয়েরা তাহাদের দেশে কোন বিদেশীয় লোককে প্রবেশ করিতে দিত না। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোন ইংরাজ তিব্বতে যাইতে পারেন নাই। ১৮১১ খৃষ্টাব্দে টমাস্ মেনিং (Thomas) Manning) নামে একজন ইউরোপীয় সর্ব্বপ্রথম নিষিদ্ধ দেশের রাজধানী—নিষিদ্ধ নগরী লাসায় গমন করেন। পরে আরও প্রায় ছয় জন ইউরোপীয় তিব্বতে গমন করিয়াছেন।





পৃথিবী পরিক্রমণ

পশ্চিম ইউরোপের জাতিদের পৃথিবী পরিক্রমণের চেষ্টা

১৭১ পৃষ্ঠার পর

পরিক্রমণ কথার অর্থ বোধ হয় তোমরা জান না। পরিক্রমণ মানে চারিদিকে ঘুরিয়া আসা। পূর্ব্বের (শিশু-ভারতী ১৬৬ পৃষ্ঠা) প্রবন্ধে বলিয়াছি যে, প্রাচীনকালে পণ্ডিতগণ বহুদূর না যাইয়াও অঙ্ক কষিয়া বাহির করিয়াছিলেন, পৃথিবী অসীম নয়, গোল। তাঁহারা মোটামুটি হিসাব করিয়া ঠিক্ করিয়াছিলেন যে, পৃথিবীর পরিধি বা বেড় ২৫,০০০ মাইল। পৃথিবী যদি গোল হয়, তাহা হইলে উহার এক স্থান হইতে ক্রমাগত একদিকে চলিলে পুনরায় সেই স্থানেই আসিয়া পৌঁছান যায়। কিন্তু বহুকাল পর্য্যন্ত এরূপ কোন চেষ্টা কেহ করে নাই। কেন করে নাই, তাহা বোঝা তেমন শক্ত নয়।

প্রথমতঃ, পণ্ডিতেরা পৃথিবীকে গোল ও সীমাবদ্ধ মনে করিলেও সাধারণ লোকে সেই মত গ্রহণ করে নাই। কারণ, পণ্ডিতেরা যাহা শীঘ্র বুঝিতে পারেন, সাধারণ লোকের তাহা বুঝিতে বহু বিলম্ব হয়। তাহারা পৃথিবীকে আদি অন্তহীন সমতল ক্ষেত্র বলিয়াই মানিত। নিজ নিজ দেশ বা পার্শ্ববর্ত্তী দেশ ব্যতীত অন্যান্য দেশ সম্বন্ধে তাহাদের কোন ধারণাই ছিল না। তাহারা মনে করিত যে, যে সমস্ত দেশে তাহারা যায় নাই, তথায় নানারূপ রাক্ষস, যক্ষ এবং নরমাংস-ভোজী দৈত্য বাস করে। তোমরা এসম্বন্ধে সংস্কৃত রামায়ণের কিষ্কিন্ধাকাণ্ড, যেখানে বানর-রাজা সুগ্রীব সীতার অন্বেষণে বানর সেনাকে চারিদিকে পাঠাইতেছেন, সেই কয়টি অধ্যায় পড়িয়া দেখিতে পার। আমরা এখানে তাহার কতকাংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দেখিবে কি সব অদ্ভুত দেশের কথা ও প্রাণীর কথা ইহাতে আছে।

—সুগ্রীব বিনতনামা বানরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে কপিবর, তুমি,পূর্ব্বদিকে যে সমস্ত পর্ব্বত, দুর্গ, বন ও নদী আছে, সেই সেই স্থানে সীতার অন্বেষণ করিবে।

ভাগীরথী, সরযূ, কৌশকী, কালিন্দী, যমুনা ও যমুনা যাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, সেই মহাগিরি যামুন, সরস্বতী, সিন্ধু, শোণ, শৈল ও কাননসমূহে সুশোভিত শৈলময়ী প্রভৃতি এই সমস্ত নদী এবং ব্রহ্মমাল, বিদেহ, মালব, কাশী, কোশল, মগধ, মহাগ্রাম, পুণ্ড্র প্রভৃতি এই সকল দেশ; কোষকার ভূমি অর্থাৎ কোষের তন্তুৎপাদক জন্তুদিগের উৎপত্তি-স্থান, রজতাকার অর্থাৎ রজতের খনি, এই সকল স্থানে রামের প্রিয় ভার্য্যা সীতাকে অন্বেষণ করিবে। পরে সমুদ্রের অন্তর্গত পর্ব্বত, সমুদ্র দ্বীপ সমীপবর্ত্তী নগর, মন্দর পর্ব্বতের কটিস্থিত গ্রাম সকল এবং যাহাদের

কর্ণপুর অতিশয় বিশাল, যাহাদিগের কর্ণ ও ওষ্ঠ পর্য্যন্ত মুখ লৌহের ন্যায় কঠিন; যাহারা অতিশয় বেগবান্ একপাদ, অক্ষয় বলবান্ ও নরমাংসভোজী, যাহাদিগের কেশপাশ অতিশয় সূক্ষ্ম, যাহারা স্বর্ণ-কান্তি ও সুন্দর দর্শন, যাহারা অপক্ক মৎস্যভোজী, জলচর ও ঘোর দর্শন, এই সমস্ত দ্বীপবাসী নরশ্রেষ্ঠ কিরাতদিগের আশ্রম এবং যে যে দেশে পর্ব্বত লঙ্ঘন পূর্ব্বক অথবা প্লবঙ্গ ও ভেলা দ্বারা গমন করা যায়, সেই সেই দেশ অন্বেষণ করিবে।

অনন্তর তোমরা যত্নবান্ হইয়া সপ্তরাজ্যোপরিবেষ্টিত যবদ্বীপ, স্বর্ণকার সমূহে সুশোভিত সুবর্ণদ্বীপ অন্বেষণ করিবে। ইক্ষু নামক মহাসমুদ্রের সমীপবর্ত্তী সুপ্রশস্ত দ্বীপ অন্বেষণ করিয়া দেখিবে। সেই সমুদ্র সমীপে মহাকায় অসুর সকল বহুকাল বুভুক্ষিত থাকিয়া ব্রহ্মার বরপ্রভাবে নিরন্তর প্রাণিগণের ছায়া ভক্ষণ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

এই ভাবে সুগ্রীব ঋষভ পর্ব্বত শিল নামক ত্রয়োদশ যোজন বিস্তৃত অতি মহৎ এক পর্ব্বত এবং যেখানে শশাঙ্কের ন্যায় শ্বেতবর্ণ, পদ্মপলাশ মহান্ বিশাললোচন ধরণীধর সর্প আছে, সে দেশের কথা বলিয়াছেন। সে সময় শ্রীমান্ উদয়াচলের কথা এবং একে একে সুবর্ণময় সৌমনস্ শৃঙ্গের বিষয় ও জম্বুদ্বীপের পরিচয় দিয়া সুগ্রীব বলিতেছেন, সূর্য্যের উদয়স্থান বা উদয়াচলের পূর্ব্বদিকে গমন করিতে পারা যায় না। যেহেতু সেই পূর্ব্বদিক্ দেবগণসমাবৃত, চন্দ্র-সূর্য্য বিরহিত ও অন্ধকারাবৃত। সুতরাং কেহই তথায় গমন করিতে সমর্থ হয় না। হে কপীন্দ্রগণ! আমি যে সমস্ত শৈল, গুহা, কানন ও নদীর কথা বলিলাম, আর যাহা বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি, তোমরা সেই সমস্ত স্থান অন্বেষণ করিবে। পরন্তু যে স্থানে সূর্য্য প্রকাশিত না হন, সে স্থানে তোমরা গমন করিতে পারিবে না এবং তাহার পর আমারও বিদিত নাই। (কিষ্কিন্ধাকাণ্ড ৪০ অধ্যায়)।

সুগ্রীব সুরবর্ত্তীপত্তন, জটায়ুর, অবন্তী, অঙ্গলেপ, আলক্ষিত নামক অরণ্যের কথা বলিয়াছেন, "যে স্থানে সিন্ধু ও সাগরের সঙ্গম হইয়াছে তথায় শত শৃঙ্গবিশিষ্ট বিশাল বৃক্ষসমূহে পরিব্যাপ্ত সোম নামক মহাগিরি বিদ্যমান আছে। তাহার প্রান্তভাগে সিংহ নামক পক্ষীসকল বাস করে এবং তাহারা তিমি মৎস্য, হস্তী প্রভৃতি বৃহদাকার জন্তু সকলকে কুলায়ে আনয়ন করিয়া থাকে। বাল্মীকি রামায়ণ–(৪০।৪১।৪২।৪৩ সর্গ)।

এই বর্ণনা পড়িয়া মনে হয় যে, যে-কবি রামায়ণ লিখিয়াছিলেন, তিনি কখনও বিদেশে যান নাই অথবা দেশের বাহিরের খবর তাঁহার মোটেই জানা ছিল না। শুধু কল্পনার আশ্রয় লইয়া তিনি রাক্ষস ও অসুরের অলীক কাহিনীতে পুস্তক পূর্ণ করিয়াছেন। এখন ইউরোপের কথা বলিতেছি।

বহু প্রাচীনকাল হইতেই ভূমধ্য সাগরের চারিপার্শ্বস্থ গ্রীস, ফিনিশিয়া, ঈজিপ্ট (মিশর), কার্থেজ, রোম প্রভৃতি দেশের লোকে খুবই সভ্য হইয়াছিল। (১) গ্রীকদের প্রাচীন মহাকাব্য Odyssey তে ইউলিসিস্ নামক এক প্রসিদ্ধ বীরের সমুদ্র-যাত্রা বর্ণিত আছে। (শিশু-ভারতী ৯১১-৯১২ পৃষ্ঠা) তাহাতে একচক্ষু নরভুক রাক্ষস (Cyclop),

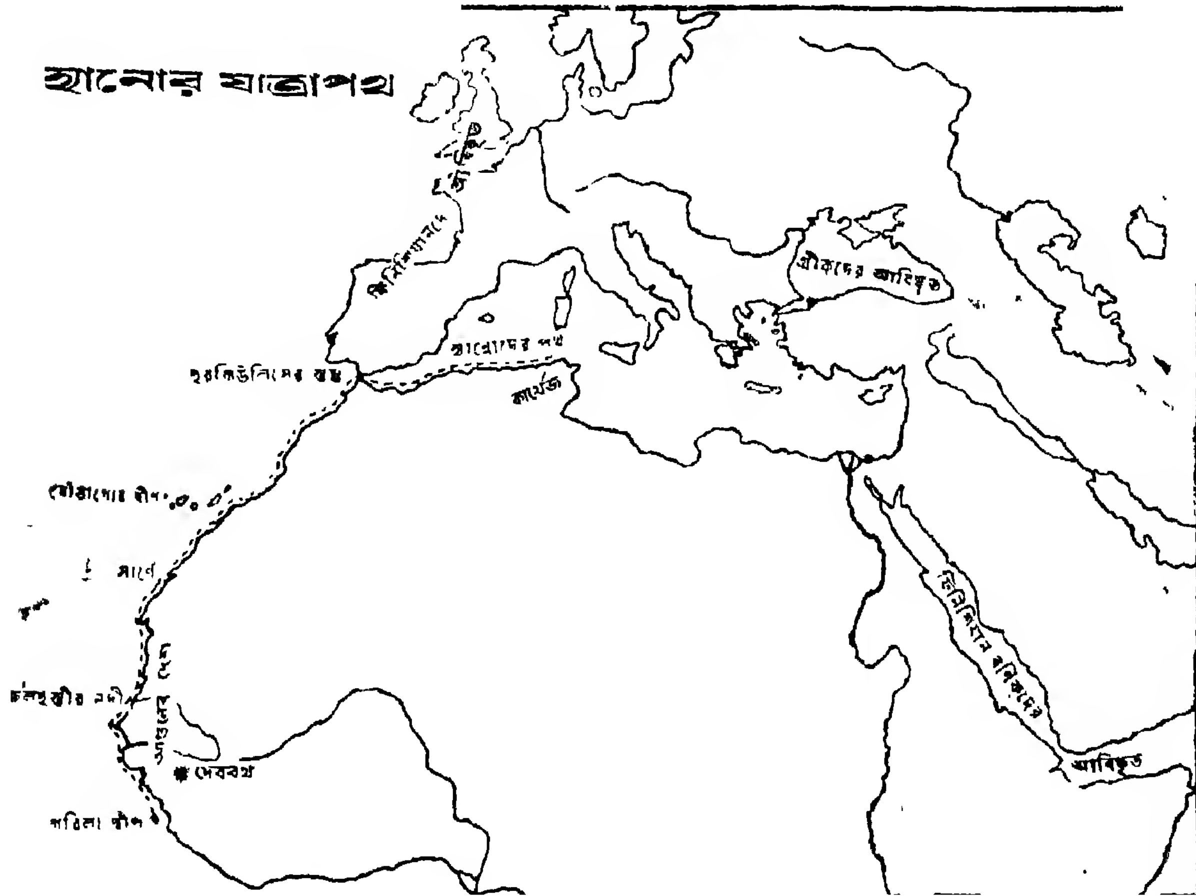


১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পৃথিবীর ম্যাপ

মানুষকে মায়াতে জানোয়ার করিয়া রাখিতে পারে এরূপ অপদেবতা, এবং নানা-রূপ অদ্ভুত জানোয়ারের কথা লেখা আছে, যাহারা কোনকালে বাস্তবিক জগতে বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু লোকে এই সমস্ত গল্পে বিশ্বাস করিত বলিয়া নেহাৎ দায়ে না

পড়িলে কেহ বিদেশে যাইতে চাহিত না। খৃষ্টের প্রায় ১৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ ধারণা ইউরোপে বর্ত্তমান ছিল। তখনকার লোকের পৃথিবী সম্বন্ধে কিরূপ অদ্ভুত জ্ঞান ছিল, পূর্ব্ব পৃষ্ঠার ম্যাপ হইতে তাহা বুঝিতে পারিবে। ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে পৃথিবীতে ইহা অপেক্ষা ভাল ম্যাপ ছিল না।

এই সময়ে ইউরোপের লোকের পশ্চিম মোটেই বাঁচিয়া থাকিতে পাবে না। আর এক মতে, পশ্চিম সাগরের সীমানায় সর্ব্বদা অন্ধকারময় কুয়াসা বর্ত্তমান আছে, সেখানে দিগ্বিদিক দেখা যায় না এবং মানুষ সেখানে গেলে তাহার গায়ের রঙ নিগ্রোদের মত কালো হইয়া যায়। সুতরাং ভূমধ্য সাগরের পশ্চিমে যাওয়ার জন্য লোকে মোটেই চেষ্টা করে নাই।



সাগর (আটলান্টিক মহাসাগর) সম্বন্ধে আরও কতকগুলো অদ্ভুত ধারণা ছিল। তাহারা মনে করিত যে, সূর্য্য-দেবতা সারাদিন খাটুনির পর শ্রান্ত হইয়া রোজ সন্ধ্যা-কালে পশ্চিম-সমুদ্রে ডুবেন ; সুতরাং তাঁহার দেহের গরমে জল এত উত্তপ্ত হয় যে, সর্ব্বদাই তাহা টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতে থাকে। সুতরাং সেই সমুদ্রে মানুষ-জন গেলে

(২) কার্থেজদেশীয় হ্যানোর সমুদ্র-যাত্রা —খৃঃ পূর্ব্ব ৫০০ অব্দ।

প্রাচীনকালের লোকে আটলান্টিক মহাসাগরে জলযাত্রা মোটেই করিত না, এই কথা বলা সম্পূর্ণ সত্য হইবে না। কারণ খৃষ্টের জন্মের পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে উত্তর আফ্রিকার উপকূলে কার্থেজ নামক নগর সভ্যতায় ও বাণিজ্যে বিশেষ বিখ্যাত হইয়া

উঠে। কার্থেজবাসীরা প্রথমে ফিনিশিয়া দেশ হইতে আসিয়া উত্তর আফ্রিকায় উপনিবেশ স্থাপন করে, এবং দুই তিন শত বৎসরের মধ্যে বাণিজ্যে খুব বিখ্যাত হইয়া উঠে। তাহারা পঞ্চাশ দাঁড়ওয়ালা নৌকা গঠন করিয়া পশ্চিম এশিয়া হইতে কাপড়, লালরঙ্, কাঁচের দ্রব্যাদি লইয়া আধুনিক স্পেন, ইতালী, ফ্রান্স, এমন কি আটলান্টিক মহাসাগর বাহিয়া আধুনিক ইংলণ্ড পর্য্যন্ত যাইত। তখন পশ্চিম ইউরোপের লোকে অসভ্য ছিল, তাহারা পশুর চর্ম্ম পরিয়া থাকিত, এবং বোধ হয় তামা, পিতল বা লোহা ইত্যাদি ধাতুর ব্যবহারও জানিত না।

ফিনিশিয় বণিকেরা কাপড়, কাঁচের জিনিষ ইত্যাদি দিয়া ইংলণ্ড হইতে রাঙ্গ আনয়ন করিত এবং এই রাঙ্গের সহিত তামার মিশাল দিয়া পিতলের জিনিষ তৈয়ার করিত। তৈয়ারী জিনিষের পূর্ব্বদিকে খুব কাট্‌তি ছিল, সুতরাং ইহাতে কার্থেজবাসী-দের খুবই লাভ হইত। এইরূপ বহু দূরদেশে যাইতে যাইতে কার্থেজীয়দের সাহস খুব বাড়িয়া যায়। আনুমানিক পাঁচ শত পূর্ব্ব খৃষ্টাব্দে হ্যানো নামক বিখ্যাত নাবিক পঞ্চাশ দাঁড়ওয়ালা ষাটখানা নৌকা এবং তাহাতে প্রায় ৩০০০০ লোক, এবং বহুদিবসব্যাপী প্রবাসের উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য লইয়া আফ্রিকা মহাদেশের উপকূলভাগ জানিবার জন্য মহান্ চেষ্টা করেন। তাঁহারা আধুনিক জিব্রাল্‌টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া আফ্রিকার কূল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে যাইতে আরম্ভ করেন। তাঁহারাই প্রথম আফ্রিকাতে অনেক অদ্ভুত জানোয়ার — যেমন গরিলা, সিন্ধুঘোটক প্রভৃতি দেখিতে পান। অনুমান, তাঁহারা নাইজার নদী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে কোন সভ্য লোক দেখিতে পান নাই।


প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য-জাহাজ

জিব্রাল্টার প্রণালী ভূমধ্য সাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরকে সংযুক্ত করিয়াছে। এই প্রণালীর দুই দিকে দুইটি পাহাড়, মধ্যে সরু জল-প্রণালী। গ্রীসের লোকের বিশ্বাস ছিল যে, পূর্ব্বে এই দুই পাহাড় যুক্ত ছিল এবং ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যে কোন যোগ ছিল না। পরে গ্রীক্ নর-দেবতা হার্কিউলিস্ একটি পাহাড় উপ্‌ড়াইয়া ফেলিয়া দুই সমুদ্রের মধ্যে যোগাযোগ করিয়া দেন।

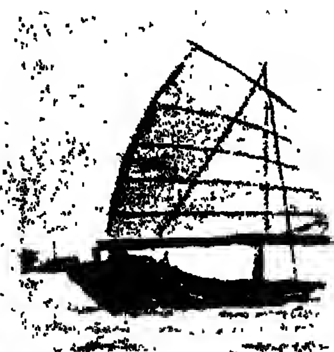


সেই জন্য এই প্রণালীর প্রাচীন নাম ছিল Pillars of Hercules। সপ্তম শতাব্দীতে তারিক্ নামক একজন আরবদেশীয় যোদ্ধা আফ্রিকা হইতে আসিয়া এই প্রণালী অতিক্রম করিয়া জিব্রাল্টার পর্ব্বতের কাছে স্পেনের তৎকালীন রাজাকে পরাস্ত করেন। তাঁহার নামানুসারে পাহাড়ের নাম হয় জিবল্ তারিক অর্থাৎ তারিকের পাহাড়। উক্ত নাম হইতে বর্ত্তমান নাম জিব্রাল্টার হইয়াছে।

মধ্যযুগ—খৃষ্টের জন্মের প্রায় ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে রোমদেশের লোকেরা প্রায় একশত বৎসর যুদ্ধের পর কার্থেজ নগরের ধ্বংস



আরবের বাণিজ্য-জাহাজ—ডাও



হংকংএর বাণিজ্য-জাহাজ—জাঙ্ক



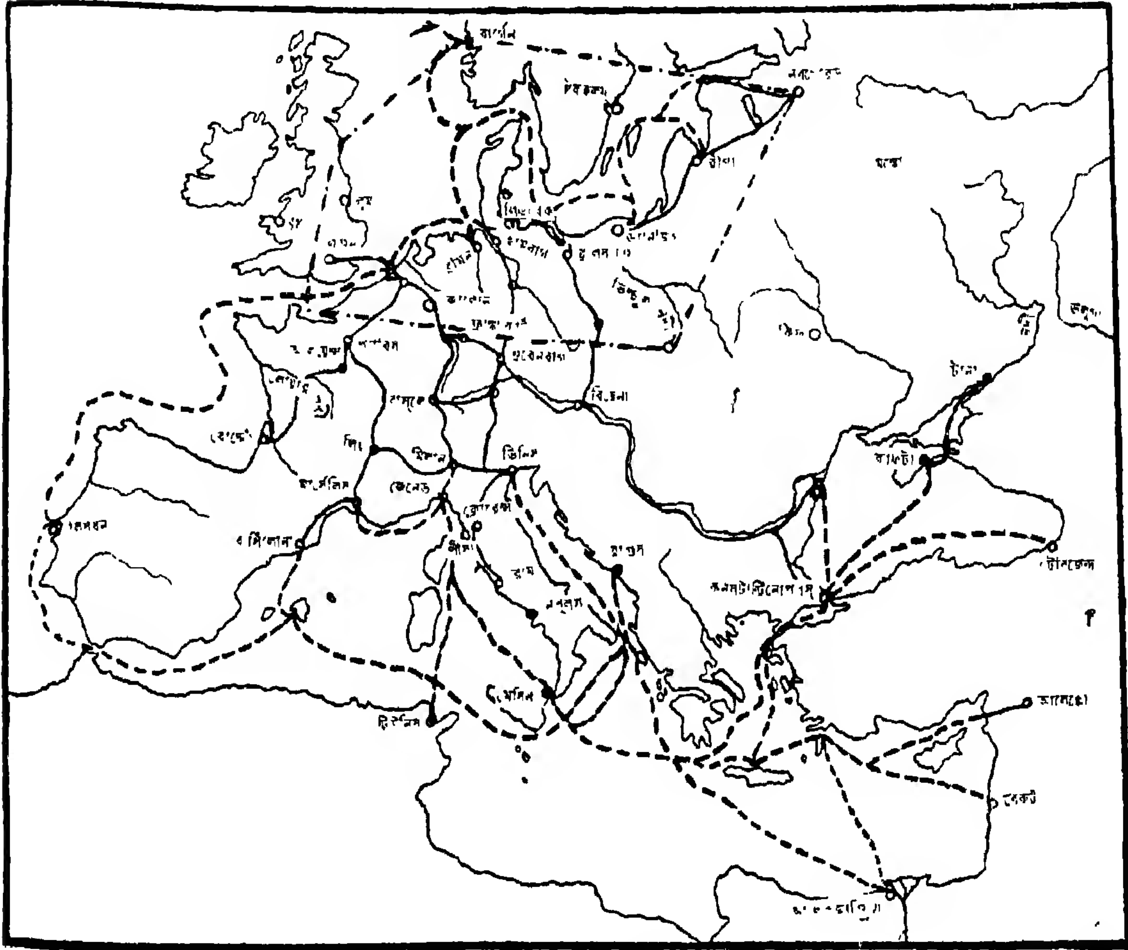
চীনের বাণিজ্য-জাহাজ—জাঙ্ক

সাধন করেন। তাহার পরে প্রায় দুই হাজার বৎসর ইউরোপের লোকেরা ভূমধ্য সাগরের পশ্চিমে যাওয়ার চেষ্টা করে নাই। রোমান্‌রা যুদ্ধ লইয়াই ব্যাপৃত থাকিত, তাহারা বিদেশের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য করা ভাল বুঝিত না। কিন্তু তখন পূর্ব্ব দেশে চীন, ভারতবর্ষ ও আরবদেশের মধ্যে খুবই বাণিজ্য চলে। খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই ভারতবর্ষের নানাপ্রদেশের বিশেষতঃ কলিঙ্গ ও বাঙ্গলার লোকেরা সমুদ্র অতিক্রম করিয়া সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বোর্ণিও, পূর্ব্ব উপদ্বীপ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করিতে যাইতেন এবং এই সমস্ত দেশে খুব বড় বড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নানাবিধ ভারতীয় ধর্ম্ম প্রচার করিয়া হিন্দু-সভ্যতার বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সমস্ত দেশ হইতে তাঁহারা ফিলিপাইন, চীন ও জাপান পর্য্যন্তও যাইতেন। চীনদেশ হইতেই বড় বড় নৌকা করিয়া বণিকেরা ভারতবর্ষ, পারস্য ও আরবদেশে বাণিজ্য করিতে আসিতেন।

অনেকে মনে করেন, চীনদেশের লোকেরা প্রশান্ত মহাসাগর অতিক্রম করিয়া আমেরিকা পর্য্যন্ত যাইতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু এই সমস্ত সমুদ্র যাত্রা নানা কারণে ক্রমে স্থগিত হইয়া যায়। ভারতবর্ষে খৃষ্টীয় সপ্তম অষ্টম শতাব্দীর পর হইতে বৌদ্ধেরা নিস্তেজ হইয়া যান এবং খুব গোঁড়া ব্রাহ্মণেরা প্রবল হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলিলেন যে, যাহারা সমুদ্র-যাত্রা করিবে, তাহাদিগকে জাতিচ্যুত করা হইবে সুতরাং লোকে জাতি হারাইবার ভয়ে আর বিদেশে যাইত না। তাহাদের স্থান পূর্ণ করে আরবদেশের লোকেরা। তাহারা চীনদের সহিত বাণিজ্য চালাইতে লাগিল। তোমাদের মধ্যে অনেকেই আরব্য উপন্যাসে সিন্ধুবাদ নাবিকের কথা পড়িয়াছ। কিন্তু সমুদ্র-যাত্রা খুব কষ্টকর ব্যাপার। সমুদ্রে ঝড়-বাদলা আছে, নানা স্থানে নিমজ্জিত পর্ব্বত আছে যাহার উপর পড়িলে জাহাজ টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইতে পারে। তাহার পর মহাসমুদ্র অতিক্রম করিতে হইলে বহুদিনের

খাবার সংগ্রহ করিয়া লইতে হয়। সব চেয়ে সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করাই কঠিন ব্যাপার। আমরা স্থলে দিক ঠিক করি দিনের বেলায় সূর্য্য দেখিয়া, এবং রাত্রে তারকা দেখিয়া। কিন্তু অন্ধকার রাত্রে যখন সমস্ত তারকা লুপ্ত হইয়া যায়, তখন মহাসমুদ্রে লোকে কি করিয়া দিক ঠিক করিবে? তাহারা তখন হয়ত দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া উত্তর দিক মনে করিয়া দক্ষিণ দিকে জাহাজ চালাইবে, এবং গন্তব্য স্থানে উপস্থিত না হইয়া মহাসমুদ্রে অজ্ঞাত স্থানে উপনীত হইবে। এইরূপে প্রাচীনকালে সমুদ্রগামী লোকদের অনেক বিপদ হইত, এবং অনেক লোকে সমুদ্রে প্রাণও হারাইত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে কয়েকটি বিষয়

ইউরোপের চতুর্দ্দশ শতাব্দীর বাণিজ্য-পথ



সম্বন্ধে জ্ঞান হওয়াতে সমুদ্রযাত্রা কতকটা সহজসাধ্য হয়।

এতক্ষণ পূর্ব্বদেশের জাতিরা পৃথিবীর কত অংশ আবিষ্কার করিয়াছিল তাহা বলিলাম। যদিও ভারতবর্ষ ও আরবদেশে পৃথিবী গোল এই তথ্য পণ্ডিতদের মধ্যে জানা ছিল, তথাপি তাঁহারা কখনও সমস্ত পৃথিবী ঘুরিয়া দেখিবার চেষ্টা করেন নাই। সে চেষ্টা প্রথম করে,—পশ্চিম ইউরোপের স্পেন ও পর্টুগালের লোকেরা, এবং তাহাদের এই প্রচেষ্টার ফলেই সমস্ত পৃথিবীর ইতিহাস পরিবর্ত্তিত হয়। এখন সেই প্রচেষ্টার কথা বলিব।

ভারতবর্ষ, চীন ও আরবদেশ যখন খুব

সভ্য ছিল, তখন ভূমধ্যসাগরের প্রান্তবর্ত্তী দেশ ব্যতীত ইউরোপের অপরাপর দেশের লোকে বর্ত্তমানকালে আফ্রিকাবাসী নিগ্রোদের মত অত্যন্ত অসভ্য ও বর্বর ছিল। তাহাদের না ছিল লেখা পড়ার জ্ঞান, না ছিল নিয়মবদ্ধ সমাজপ্রণালী বা কোনরূপ নগর বা দুর্গ। খৃষ্টের দুই তিন



প্রাচীন পারস্যের নক্ষত্র-যন্ত্র

শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে রোমনগরের লোকেরা প্রবল হইয়া উঠিয়া উত্তর-পশ্চিমে ইউরোপের অধিকাংশ স্থানে আপনাদের প্রভুত্ব বিস্তার করে, এবং বর্ত্তমান ফ্রান্স, জার্ম্মানির কতকাংশ, ব্রিটেন, স্পেন, পর্টুগাল প্রভৃতি দেশ রোমানদের দখলে আসে। রোমানদের সংস্পর্শে আসিয়া এই সমস্ত দেশের লোক ক্রমশঃ সভ্য হইতে থাকে। খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে জার্ম্মানদেশীয় অসভ্যজাতিগণের আক্রমণে রোমসাম্রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়, কিন্তু এই চার পাঁচ শত বৎসরে এই সমস্ত দেশ রোমের ভাষা, লিপি ও সভ্যতা গ্রহণ করে। এখনও ফ্রান্স, স্পেন, পর্টুগাল প্রভৃতি দেশের ভাষা ইতালীদেশে প্রাচীন-কালে প্রচলিত লাটিন ভাষা হইতে উদ্ভূত। রোম সাম্রাজ্য ধ্বংশ হইলেও রোমের প্রভাব নষ্ট হয় নাই। কারণ, রোম নগর হইতে খৃষ্টান ধর্ম্মগুরু পোপের আদেশে খৃষ্টান সন্ন্যাসীরা এই সমস্ত দেশে যাইয়া খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দীতে দক্ষিণ-পশ্চিম ইউরোপের সমস্ত দেশে বড় বড় রাজ্য, নগর, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি গড়িয়া উঠে। কিন্তু তখন আর এক বিপদ উপস্থিত হয়। ৬৩০ খৃঃ অব্দ হইতে আরবদেশীয় লোকে মহম্মদ প্রচারিত মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া সমস্ত পৃথিবী জয় করিবার জন্য উদ্যম করেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ৭১২ খৃঃ অব্দে তাঁহাদের একজন সেনাপতি তারিক মাত্র ৩০০ শত সৈন্য লইয়া জিব্রাল্টার প্রণালী অতিক্রম করিয়া স্পেনের রাজাকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন, এবং অচিরকাল মধ্যে সমস্ত স্পেন-দেশ আরবদেশীয় মুসলমানদের দখলে আসে। খৃষ্টানেরা যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া স্পেন পর্টুগালের উত্তর-পশ্চিম কোণে আশ্রয় লয়। মুসলমানেরা ফ্রান্স দেশও জয় করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহারা Poitiers নগরের বিখ্যাত যুদ্ধে ফরাসী যুদ্ধ-নেতা Karl the Hammerer বা মুষলধারী কার্লের নিকট হারিয়া যান।

স্পেনদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রায় ৭০০ বৎসর বর্ত্তমান থাকে। তাঁহারা কর্ডোভা (Cardova), গ্রানাডা (Granada) প্রভৃতি সহরে বড় বড় দুর্গ, রাজ-প্রাসাদ ও বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন। খৃষ্টানেরা তাহাদিগকে মুর বলিত। এই মুরজাতীয়

পণ্ডিতেরা প্রাচ্যদেশের সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, রসায়ন বা দ্রব্যতত্ত্ব ইত্যাদিতে খুব বিজ্ঞ ছিলেন, এবং এখন আমরা যেমন বিজ্ঞান ইত্যাদি শিখিতে বিলাত নাই, তখন ইউরোপের লোকেরা এই সমস্ত বিদ্যা শিখিতে কর্ডোভা ও গ্রানাডার বিশ্ববিদ্যালয়ে যাইত। ক্রমে এইরূপে ইউরোপের লোকেরা প্রাচীন গ্রীক, আরব ও হিন্দু পণ্ডিতদিগের আবিষ্কৃত সমস্ত বিদ্যা জানিতে পারিল এবং পৃথিবীর বাস্তবিক আকার সম্বন্ধে তাহাদের ঠিক ধারণা হইল।

এই সময়ে পৃথিবীর শিল্প, বাণিজ্য, সভ্যতা, প্রায় সমস্তই মুসলমানদের হস্তগত ছিল। (মানচিত্রে দেখ)। ইউরোপে তখন চিনি, কার্পাস ও রেশমীবস্ত্র, মসলা ইত্যাদি অজ্ঞাত ছিল। তাহারা পরিত মাত্র পশমী বস্ত্র, এবং চিনি জানা ছিল না বলিয়া বনজাত মধু খাইত। রন্ধন করিতে কোন মসলা ব্যবহার করিত না, শুধু পোড়াইয়া, চর্ব্বিতে ভাজিয়া বা সিদ্ধ করিয়া খাইত। মুসলমান বণিক্গণ এই সমস্ত জিনিষ স্থলপথে পারস্য, সিরিয়া, বর্ত্তমান মিশর, তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ভিতর দিয়া আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া, কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ ইত্যাদি সহরে আনয়ন করিত, এবং এই সমস্ত বন্দর হইতে ইটালীর ভেনিস্, জেনোয়া এই দুই সহরের লোকেরা এবং মুসলমান বণিকেরা জাহাজে মাল বোঝাই করিয়া পশ্চিম ইউরোপে বিক্রয় করিতেন। এই বাণিজ্যের ফলে ভেনিস ও জেনোয়ার লোকেরা খুব সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা খুবই অসুবিধা ভোগ করিতে লাগিল। ইহার উপর আর এক বিপদ উপস্থিত হইল—পশ্চিম ইউরোপের লোকেরা খৃষ্টান এবং তাঁহারা তীর্থ করিতে জন্মস্থান জেরুজালেম নগরে যাইতেন। কিন্তু জেরুজালেম নগর ছিল মুসলমানদের দখলে, তাঁহারা প্রথম প্রথম খৃষ্টানদিগকে অবাধে তীর্থ করিতে দিলেও ১২০০ সন হইতে তীর্থযাত্রীদের উপর খুব অত্যাচার আরম্ভ করেন। ইউরোপের লোকেরা মুসলমানদের তাড়াইবার জন্য অনেকবার একত্র হইয়া যুদ্ধযাত্রা করে, কিন্তু দুই তিন শত বৎসর চেষ্টা করিয়াও তাহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। এই সমস্ত যুদ্ধকে বলে Crusade বা ক্রুশের যুদ্ধ। পরন্তু ১৪৫৩ খৃঃ অব্দে তুর্কীজাতীয় মুসলমানেরা কনষ্টাণ্টিনোপ্‌ল্ সহর দখল করিয়া পূর্ব্ব ইউরোপ হইতে খৃষ্টানদিগকে সম্পূর্ণ তাড়াইয়া দেয়। তখন ইউরোপের মহাসঙ্কট উপস্থিত হয়।

এই মুসলমান শক্তির বিরুদ্ধে ইউরোপের খৃষ্টান জগতের প্রথম চেষ্টা আরম্ভ হয় স্পেন ও পর্টুগাল হইতে। পাঁচ শত বৎসরের সভ্যতার ফলে স্পেনের মুসলমানেরা ক্রমে ক্রমে যুদ্ধবিদ্যায় অপটু হইয়া পড়ে, এবং স্পেনের উত্তর-পশ্চিমাংশ হইতে খৃষ্টানেরা আসিয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদিগকে দক্ষিণ দিকে হটাইতে থাকে। এইরূপে বর্ত্তমান পর্টুগাল, এবং স্পেন দেশে অনেকগুলি খণ্ডরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যে, মুসলমান জেতাগণকে আফ্রিকা দেশে হটাইয়া দিতে হইবে। এই চেষ্টায় একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন পর্টুগালের রাজপুত্র নাবিক হেন্‌রি (Henry, the Navigator ১৩৯৪-১৪৬০)। কিন্তু তিনি সরাসরি মুরদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হইয়া অন্যরূপে তাহাদিগকে ঘাল করিবার এক উপায় মনে মনে স্থির করিলেন। তাঁহার উদ্ভাবিত উপায়কে এখন শুধু খেয়াল ছাড়া কিছু বলা যায় না, কিন্তু এই খেয়াল হইতেই পৃথিবীতে যুগান্তকারী ঘটনারাশির সূত্রপাত হইয়াছিল।

শিল্প-কথা



কারু-শিল্প

(কাঠের কাজ)


৮৯০ পৃষ্ঠার পর

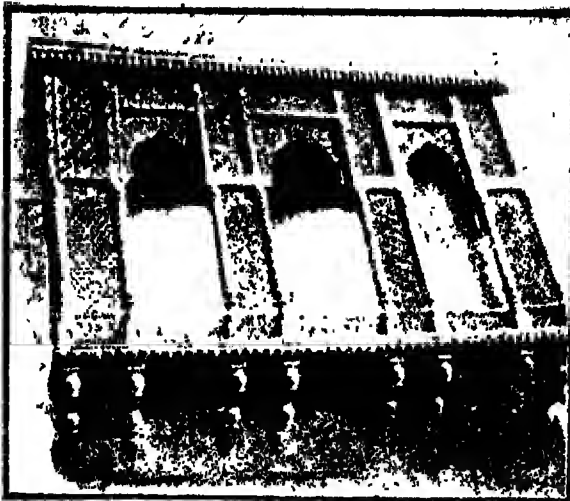
শিল্পকথা বলিতে চারু ও কারু দুই-ই বুঝাইয়া থাকে। কারুশিল্পকে ইংরাজীতে Crafts বলে। একদিন সব দেশেই কারুশিল্পের প্রভাব ছিল, কিন্তু ইউরোপে যেমন কলকারখানা ও যন্ত্র-পাতির প্রচলন হইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে কারু-শিল্পের (Crafts) ও পতন হইল—হাতের কাজের দিকে কাহারও তেমন লক্ষ্য রহিল না। কাজেই, তাহা লোপ পাইবার পথে চলিল। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম হাতের কাজের দুর্গতির প্রতি দেশের লোকের দৃষ্টি পড়ে এবং তাহারি ফলে চারু ও কারুশিল্পের উন্নতির জন্য (Arts and Crafts) আন্দোলন উপস্থিত হয়। উইলিয়ম মরিশ্ (William Morris) সাহেবের উদ্যোগে প্রথমে আবার হাতের কারিগরির প্রচার কারুশিল্পের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমরা শিল্পকথা বলিতে যেমন চারু ও কারুশিল্প দুইই বুঝি, আর্ট (Art) বলিতেও ঠিক্ তাহাই বুঝায়। এই নূতন Crafts শব্দটি হাতের কাজ বুঝাইতে তখন হইতেই ইংরাজীতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে।

প্রাচীন যুগ

ভারতবর্ষের কারুশিল্পের ইতিহাস অত্যন্ত প্রাচীন। মোহেন্ জো দাড়োর প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ আবিষ্কারের পর হইতে আমাদের দেশের কারুশিল্প যে খুবই প্রাচীন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। জে, এফ্, ব্লেকার (J F. Blacker) তৎপ্রণীত The A. B. C of Indian Art নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন India merits the name "Home of Manufacture" because the crafts have been and are essentially composed of hand

workers; which is just what the word "Manufacture" means এ কথা কয়টি অতি সত্য। কারু-শিল্পের যা কিছু কাজ, সে সবই হাতের কাজ। কারুশিল্পের কাজ করিতেও যন্ত্র-পাতির ব্যবহার হয়, সে যন্ত্র-পাতি কিন্তু অতি সহজ। যেমন, কুমোর— তার চাকার ব্যবহার করে, তাঁতী—তাঁত চালায়। এই সব যন্ত্র-পাতির আকার অনেকটা সেই সভ্য যুগের, মিশরের কুমোর, তাঁতী যেমন ধরণের যন্ত্র-পাতি ব্যবহার করিত, ভারতের এই সব শিল্পীরাও সেই রকম যন্ত্র-পাতিরই ব্যবহার করিয়া আসিতেছে। কালে সেই সব যন্ত্রপাতির আদর্শেই কলের সৃষ্টি হইয়াছে। এখন কলের কাছে হাতের কাজ হার মানিয়াছে।

যে অতি প্রাচীন কালে শ্রীমূর্ত্তি অর্থাৎ দেব-দেবীর মূর্ত্তি, ঘরবাড়ী সবই যে কাঠের দ্বারা তৈয়ারী হইত, সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই। কাঠের জিনিষ অস্থায়ী, সুতরাং তার নিদর্শন সবই আজ লোপ পাইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ হইতে কাঠের কাজের অনেক নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। তোমরা পুরীর মন্দিরের কথা নিশ্চয়ই জান। সেখানে



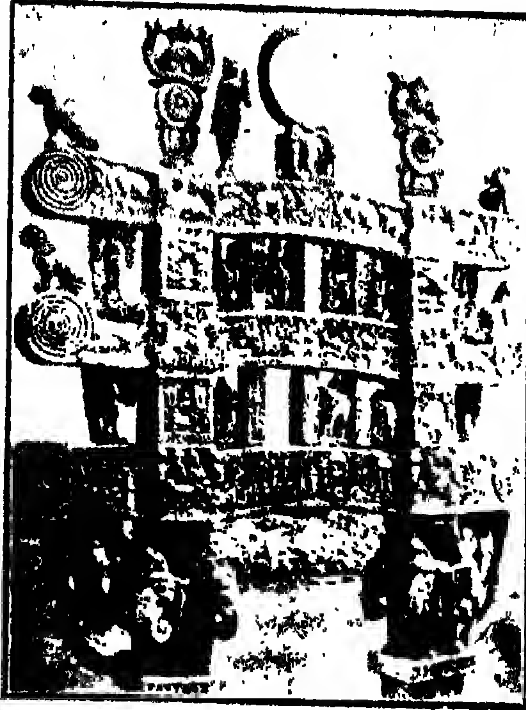
কাঠিয়াবারের কাঠের অলিন্দ

জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি এখনও সমুদ্রে-ভাসিয়া আসা কাঠে তৈয়ারী হয়। এজন্যই শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের মূর্ত্তিকে "দারু ব্রহ্ম" বলে।

অজন্তা গুহার চিত্রের মধ্যে কাষ্ঠনির্ম্মিত অলিন্দ-প্রকোষ্ঠে (Balcony) রাজারা বসিয়া আছেন, এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমরা অজন্তার সেই চিত্রের আদর্শ অনুকরণ করিয়া একটি মঞ্চ-গৃহ প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তাহার চিত্র ২৭৮ পৃষ্ঠায় লক্ষ্ণৌ শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রদর্শিত ছবির সঙ্গে দিলাম। কাঠের কাজ বলিতে হয়ত তোমরা কেবল সাধারণ ব্যাবহারিক নিত্যকার প্রয়োজনীয় কাঠের জিনিসের কথাই ভাবিতেছ। কিন্তু আমি যে কাঠের কাজের কথা বলিতে যাইতেছি, তাহা যেমন ব্যাবহারিক, তেমনি তাহা নয়নরঞ্জক ও মনোরঞ্জক হাতের কাজ। কেবলি যে উহা সূক্ষ্ম কারিগরি, তাহা নহে; উহার ভিতর মানুষের সৃষ্টির ক্ষমতা এবং সূক্ষ্ম রসানুভূতিরও পরিচয় পাই! আমরা আজকাল সাধারণতঃ আমাদের আশে-পাশে যে সমুদয় চেয়ার, টেবিল, কৌচ প্রভৃতি দেখি, সেগুলি বিলাতের আমদানী কাঠের কাজ এবং তাহার বেশীর ভাগই যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া থাকে। আমাদের দেশের হাতের গড়া কাঠের কাজের নৈপুণ্য দেখিয়া দেশ-বিদেশের লোকেরা বিস্মিত হইয়া যান। কাঠের কাজ আমাদের দেশের অতি প্রাচীন শিল্প। সেই প্রাচীন যুগ হইতেই আমাদের দেশে উহা চলিয়া আসিতেছে।

বৌদ্ধ যুগেরও পূর্ব্বে আমাদের দেশের রাজারা যে সকল কাঠের তৈয়ারী আসন প্রভৃতি ব্যবহার করিতেন, তার নিদর্শন যদিও বড় একটা রক্ষা পায় নাই, তথাপি সে সমুদয়ের আদর্শ পরবর্ত্তী সময়ে প্রস্তর স্থাপত্যের মধ্যে কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা ভিন্ন ভরহুৎ, সাঁচী, অমরনাথ প্রভৃতি স্থানের অতি প্রাচীন (খৃঃ পূঃ ৩য় ও ১ম শতাব্দীর) স্তূপ বেষ্টনী রেলিংগুলি এবং তোরণ দ্বারের নির্ম্মাণ-প্রণালী দেখিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, প্রাচীনতম কাঠের কাজের আদর্শের অনুকরণ করিয়া এ সমুদয় প্রস্তর-স্থাপত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। সেকালের প্রত্যেক প্রাচীন দেবমন্দিরে দেবতাদের জন্য কাঠের তৈয়ারী রথের প্রচলন ছিল। এখনও পুরীর জগন্নাথের রথ, কাঞ্জিভারামের উৎকৃষ্ট কারুকার্য্য-করা কাঠের রথ প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। অবশ্য এই রথগুলিও অতি প্রাচীন যুগের রথের নূতন সংস্করণ। প্রাচীন কাঠের রথের আদর্শে গঠিত সেকালের প্রস্তর নির্ম্মিত রথ মহাবলীপুরমে আছে। প্রাচীনকালের কাঠের কাজগুলি এইরূপে পাথরের কাজের ভিতর ছদ্মবেশে আজও বাঁচিয়া রহিয়াছে। বৌদ্ধ চৈত্যগুহার প্রবেশ-পথের উপর যে অর্দ্ধচন্দ্রাকার গবাক্ষ থাকে, তাহার মধ্যেও ঐরূপ কাঠের কাজের ধরণেরই পাথরের

অনুকৃতি দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, গুহার ভিতরে ছাদের মধ্যে যে পাথর রহিয়াছে, তাহার



সাঁচী স্তূপের তোরণ-দ্বার—কাঠের কাজের অনুরূপ তৈয়ারী পাথরের কাজ

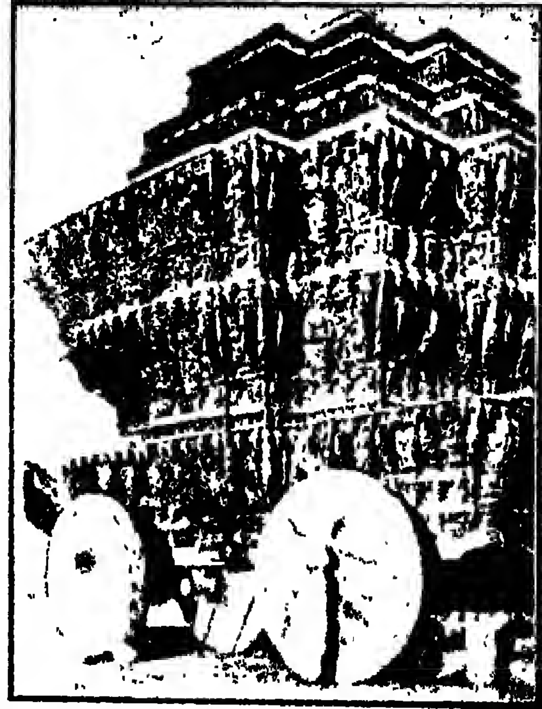
মধ্যেও কাঠের কড়িবর্গের অনুকৃতি দেখিতে পাইয়া থাকি। বৌদ্ধভাস্কর্যের মধ্যে বুদ্ধদেবের পরিনির্বাণ



মহাবালীপুরমের পাথরের রথ

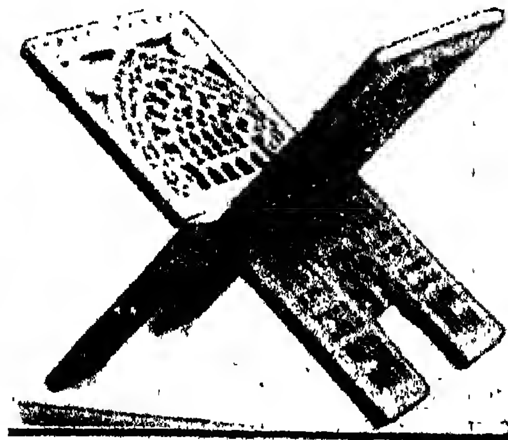
চিত্রে পালঙ্ক, জলচৌকি প্রভৃতির নিদর্শন দেখা যায়।

এবিষয়ে অনুসন্ধান করিলে হয়ত আরও অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। বৌদ্ধযুগে প্রাসাদ



মাদ্রাজের একটি প্রাচীন রথ

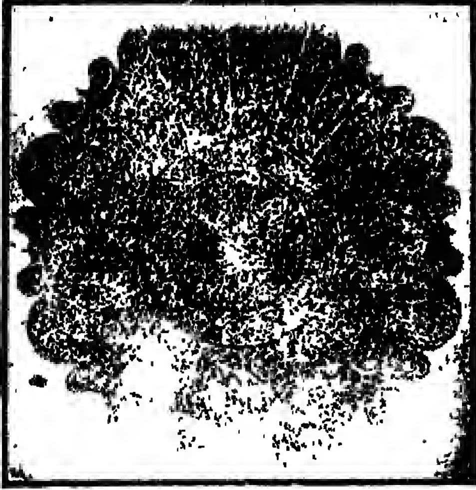
ইত্যাদির স্তম্ভ যে কাষ্ঠদ্বারা নির্ম্মিত হইত, তাহার অনেক নিদর্শন আছে। কুশনালী জাতকের কিয়দংশ



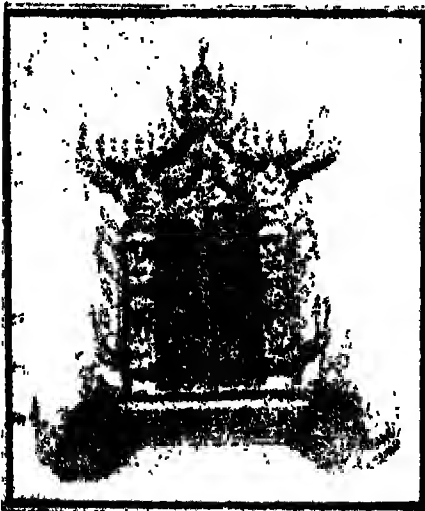
কাঠের বই রাখিবার তক্তা

উদ্ধৃত করিয়া তাহা প্রমাণ করিতেছি। বারাণসীরাজ

একস্তম্ভ প্রাসাদে বাস করিতেন। যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন স্তম্ভটি বড় জীর্ণ হইয়াছিল। রাজ-ভৃত্যগণ যখন দেখিল স্তম্ভটি নড়িতেছে চড়িতেছে, তখন তাহারা রাজাকে জানাইল। রাজা সূত্রধরদিগকে

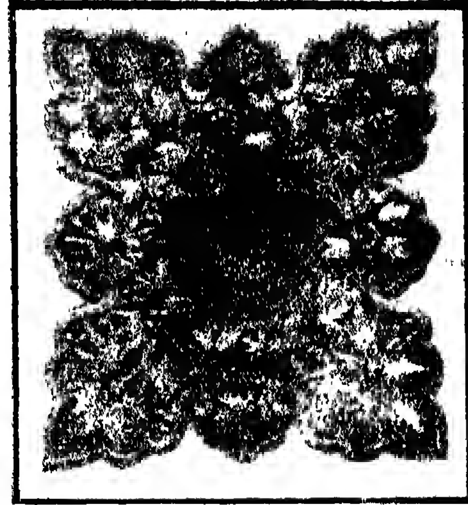

নাগিনার তৈয়ারী আবলুস কাঠের কাজ

ডাকাইয়া বলিলেন, "বাপসকল, আমার মঙ্গল প্রাসাদের স্তম্ভটি নড়িতেছে। একটি সারবান্ স্তম্ভ আনিয়া প্রাসাদ নিশ্চল কর।" তাহারা "যে আজ্ঞা"

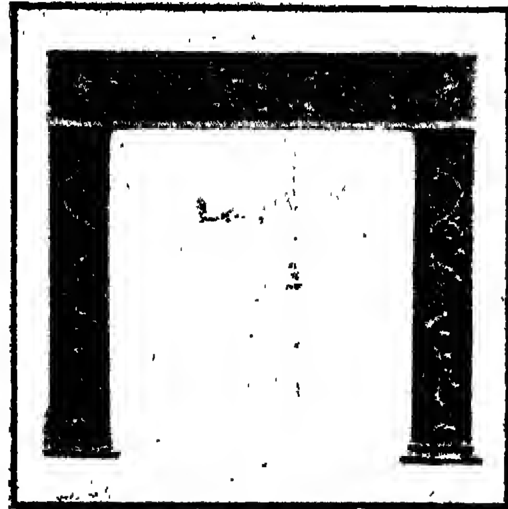

ব্রহ্মদেশের শেষ সম্রাট্ থিবো রাজার সিংহাসন

বলিয়া রাজার আদেশ গ্রহণ করিল এবং উপযুক্ত বৃক্ষের অনুসন্ধান করিতে লাগিল।

আমাদের দেশে ইউরোপীয় সভ্যতার আদর্শানুকরণের বহু পূর্ব্বে চেয়ার, টেবিলের চলন ছিল কি না, এবিষয়ে গবেষণা করিতে গেলে দেখিতে পাইবে, মোড়ক আকারের এবং সিংহাসনের মত আসন, খাট, পালঙ্ক অতি প্রাচীন ভরহুৎ, বুদ্ধগয়া, অজন্তা প্রভৃতি গিরি-মন্দিরের রেলিংয়ের গায়ে আঁকা ও গড়া চিত্রাবলীতেও অনেক আছে। কাঠের কাজের


কাশ্মীরের কাঠের কাজ

প্রাচীনতম নিদর্শন ভারতবর্ষের মোহন্-জো দাড়ো এবং হারাপ্পায় পাওয়া গিয়াছে। কাঠের খোদাই করা অতি প্রাচীন মূর্ত্তিও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়।


মাদ্রাজ শিল্পবিদ্যালয়ের কাঠের কাজ

বর্ত্তমান যুগ

কোনও গৃহস্থের ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেই যদি গৃহমধ্যস্থিত আসবাব পত্রের মধ্যে একটা শান্তির ও স্থৈর্য্যের ভাব পরিলক্ষিত না হয় এবং যদি ঐ

সমুদয় আসবাব-পত্রাদি বর্ণবাহুল্যে এবং কারুকার্য্যে ভারাক্রান্ত থাকে—সেখানে কলা-লক্ষ্মীর তিষ্ঠান অসম্ভব।

আসবাব-পত্র দেশের আবহাওয়া অনুসারেই হইয়া থাকে। আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশে মেঝের উপর

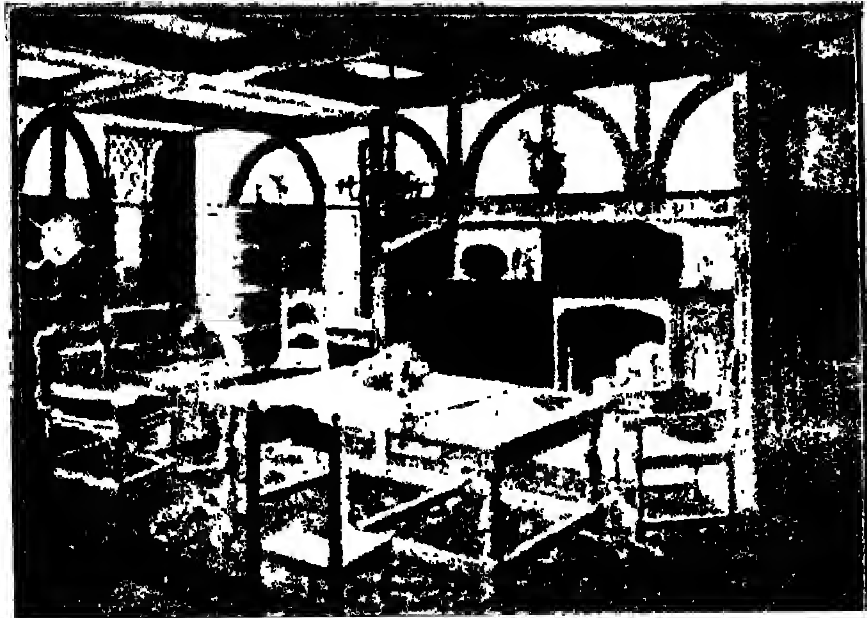


জাপানী গৃহস্থের সহজ সরল গৃহসজ্জা



জাপানী নকলের বিলাতী গৃহসজ্জা

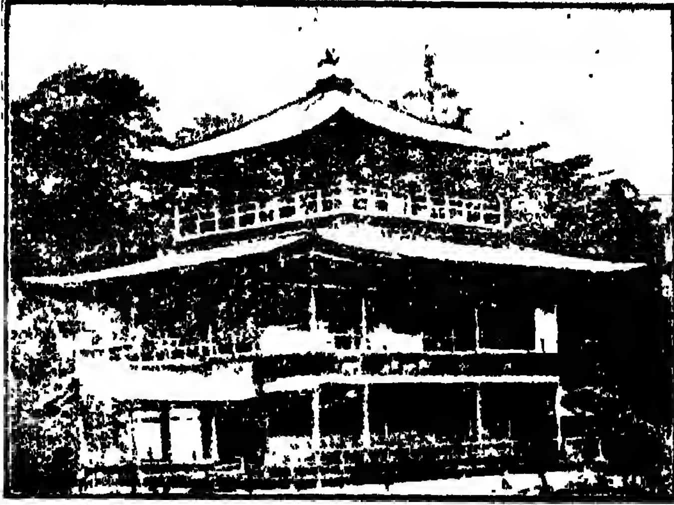
শেজ বিছানো সুখাসনেরই ব্যবস্থা পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। শীতপ্রধান দেশে ঐরূপ মাটির উপর পরিপাটিভাবে আসন করিয়া বসা কখনও সম্ভব হয় না। সেইজন্যই চেয়ার বা মঞ্চাসনের সে-দেশে প্রয়োজন হয়। আমাদের দেশে রাজন্যদের জন্যই সাধারণ মঞ্চাসনের বা সিংহাসনের ব্যবস্থা ছিল এবং তাহা আভিজাত্যের চিহ্নস্বরূপই ব্যবহৃত হইত। টেবিলের কাজ আমাদের দেশে গবাক্ষাধার অর্থাৎ কুলুঙ্গীতেই সুসম্পন্ন হইত। তাহাতে ঘর-জোড়া আসবাবের প্রয়োজন হইত না এবং ঘরের মধ্যে একটি সাধাসিধা অথচ শ্রীর ভাব ফুটিয়া উঠিত। বর্ত্তমান সময়ে তাহা আর কখনও সম্ভবপর নয়। ইউরোপীয় সভ্যতায় আসবাব-পত্রের বহুলতারই শিক্ষা আমরা পাইয়াছি, তার সুসামঞ্জস্যতার জ্ঞান লাভ করি নাই। এখন আবার ইউরোপে জর্জ্জিয়ান বা ভিক্টোরিয়ান ফ্যাসানের বদলে এশিয়ার—বিশেষ জাপানী ও চীনা সভ্যতার নকলে যে আসবাবপত্র তৈয়ারী হইতেছে তাহার ভিতর জাপানী ও চীনার সহজ সরল সংযমের ভাব অনেকটা



বিলাতী গৃহস্থের ঘরের ভিতরের আসবাবের প্রাচুর্য্য

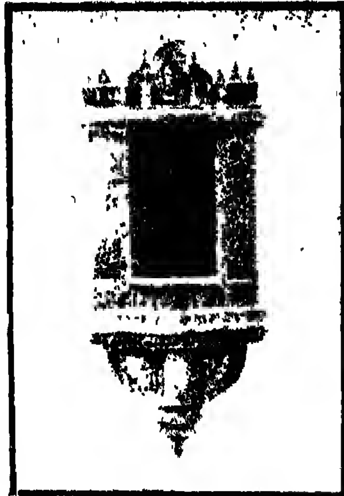
ফুটিয়া উঠিয়াছে। আমরা এই পৃষ্ঠায় জাপানী ঘরের আসবাব, প্রাচীন ধরণের বিলাতী ঘরে আসবাব ও

হাল ফ্যাসানের বিলাতী ঘরের আসবাবের চিত্র দিলাম। তোমরা চিত্রগুলি ভাল করিয়া দেখিলেই বুঝিবে যে, এ বিষয়ে এশিয়া, ইউরোপের গুরুর স্থান অধিকার করিয়াছে।



জাপানের কাঠের তৈয়ারী বাড়ী

কাঠের কাজের বিষয় বলিতে গেলে প্রথমেই তোমাদের নিকট প্রাচীনকালের দুর্গ ও বাসভবনের দরজার কথা বলিব। এই দুয়ারগুলি দুর্গ ও গৃহ-নির্ম্মাতার সৌন্দর্য্য বোধেরই পরিচয় দেয়। জয়পুরে অম্বর দুর্গ প্রাসাদের হাতীর দাঁতের কাজ করা দ্বারটি



বেঙ্গালোরের চন্দন কাঠের কাজ

এবং চিতোর দুর্গের পুরানো দুয়ারটি ইহার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। চিতোর দুর্গের পুরানো দুয়ারটি এখন আজমীরে খাজা সাহেবের মসজিদে রহিয়াছে। উহা দেখিলে সেকালের কাঠের কাজের যে কতদূর উন্নতি হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারিবে। এতদ্ব্যতীত কাঠের অলিন্দ (Balcony) তৈয়ারীর রীতিতে আজ পর্য্যন্তও



ব্রহ্মদেশের তৈয়ারী কাঠের নর্ত্তকীমূর্ত্তি

আমাদের দেশের শিল্পীরা প্রাচীন আদর্শেরই অনুসরণ করিয়াই চলিতেছে। কাঠিওয়ার, রাজপুতানা, পঞ্জাব ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের কোন কোন স্থানে কাঠের রেলিঙ, অলিন্দ, থাম প্রভৃতি নির্ম্মাণ-প্রথা এখনও প্রাচীন পদ্ধতি অনুরূপই হইয়া আসিতেছে। কাশ্মীরের সূক্ষ্ম কাঠের কাজগুলি দেখিলে চিত্রকলা ফেলিয়া উহা সংগ্রহ করিয়া ঘর সাজাইতে ইচ্ছা হয়। লঙ্কাদ্বীপে ও ব্রহ্মদেশেও কাঠের কাজের বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায়। লঙ্কাদ্বীপের প্রাচীন গ্রন্থ "মহাবংশ পুরাণে" কাষ্ঠনির্ম্মিত সেতুর উল্লেখ আছে। এইরূপ সেতু নির্ম্মাণের রীতি এখনও পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন স্থানে



ব্রহ্মদেশের টানা পাখার কাজ

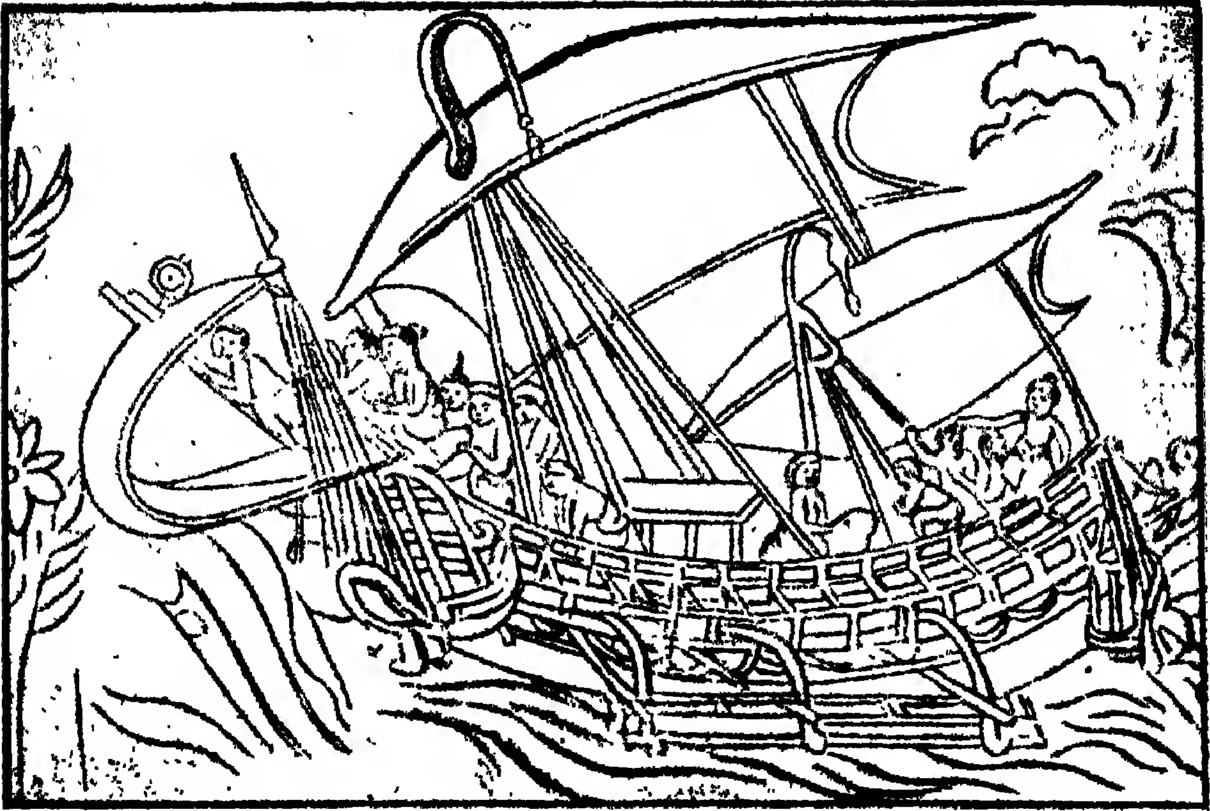
এবং কাশ্মীরে ঝিলাম নদীর উপর ও অন্যান্য নানা-স্থানে পরিলক্ষিত হয়।




কারু শিল্প।

কাঠের কাজের চূড়ান্ত নিদর্শন হইতেছে আমাদের দেশের অতি প্রাচীন অর্ণবপোত। এই সকল অর্ণব-পোতের চিত্র আমরা অজন্তায়, যবদ্বীপে ও বরবোদরের ভিত্তিগাত্রে অঙ্কিত দেখিতে পাই।

বোধহয়, এইরূপ একখানা জাহাজে চড়িয়াই মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা বৌদ্ধধর্ম্মের মহাবাণী ঘোষণা করিতে লঙ্কায় জয়যাত্রা করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজাদের রাজত্বকালে—বিশেষ করিয়া হর্ষবর্দ্ধনের সময় যবদ্বীপে, সুমাত্রায়, বোর্ণিওতে, পেগু, চীন আরব ও পারস্যে বাণিজ্য করিবার জন্য ভারতীয় বাণিজ্য-পোত ছিলেন বলিয়া জানা যায়। সেকালে কাঠের কাজের মধ্যে একটি আদরণীয় শিল্প ছিল রথ তৈয়ারী করা। সকল সময়ের রথের প্রয়োজন ছিল। যোগিমারা গুহায় খৃঃ পূঃ ২৫০।৩০০ বৎসরের চিত্রেও রথের ছবি আছে। তাছাড়া অজন্তা, ভরহুৎ সাঁচীতে ত কথাই নাই। নানান বিচিত্র গঠনে রথগুলি গঠিত হইত। সমসাময়িক গ্রীক রথের সহিত তুলনা করিলে গঠন পারিপাট্যে ভারতের রথ গ্রীক রথ অপেক্ষা ভালই বলিয়া মনে হয়। এখনও জয়পুর, আজমীর, চিতোর প্রভৃতি রাজপুতানার সহরগুলিতে কাঠের রথের উপর



ভারতবর্ষের প্রাচীন বাণিজ্য পোত

যাতায়াত করিত বলিয়া জানা যায়। এখনও লঙ্কা দ্বীপে, ব্রহ্মদেশে ও চট্টগ্রামে প্রাচীন ধরণের ছোট ছোট মাছ ধরার জন্য তৈয়ারী জাহাজের প্রচলন আছে। সেগুলির গঠন এবং তাহাদের উপরের কারি-গরি দেখিবার ও উপভোগ করিবার মত। তাছাড়া সেকালের সেই সব জাহাজের আকারে তখনকার কালে ইউরোপীয় কোন জাহাজই ছিল না। কাপ্তেন মরিস নামক একটি সাহেব তখনকার কালে ১২০০ টন ভারবাহী ভারতীয় জাহাজ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া-কারিগরির পরিচয় যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাঞ্জাম, পাল্কী প্রভৃতিও ঐ প্রাচীন যানবাহনেরই অন্তর্গত। এখন গোশকটের যুগ চলিয়া গিয়াছে কিন্তু তার প্রয়োজনীয়তা কমিয়াছে কি? মোটর যে পথে চলিতে পারে না, গোশকট সেই সব পথে এখনও অনায়াসে আমাদের বহন করিয়া লইয়া যায়।

কাঠের কাজ বলিতে কেবল আব্‌লুস্ চন্দন, তুন, দেবদারু, সেগুন, শিশুকাঠের তৈয়ারী আসবাবের কথা ভাবিলে চলিবে না। তার উপর প্রতিবপনের

সুন্দর (inlaying) কাজের বিবরণ বলিতে হয়। পিতল ও তামার পাত হাতীর দাঁত, প্রভৃতি বসাইয়াও

পাঞ্জাবের কাঠের জালীর কাজ

কাঠের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করার প্রথা এদেশে বহুকাল

উত্তর ভারতে মাইনপুরীর কাঠের [illegible] পিতলের পাতের কাজ

হইতে চলিত আছে। মাইনপুরীর তৈয়ারী "তারকাশীর" কাজ অর্থাৎ পিতলের সরু চ্যাপ্টা তার ঠুকিয়া ঠুকিয়া কাঠের উপর বসাইয়া নানারূপ

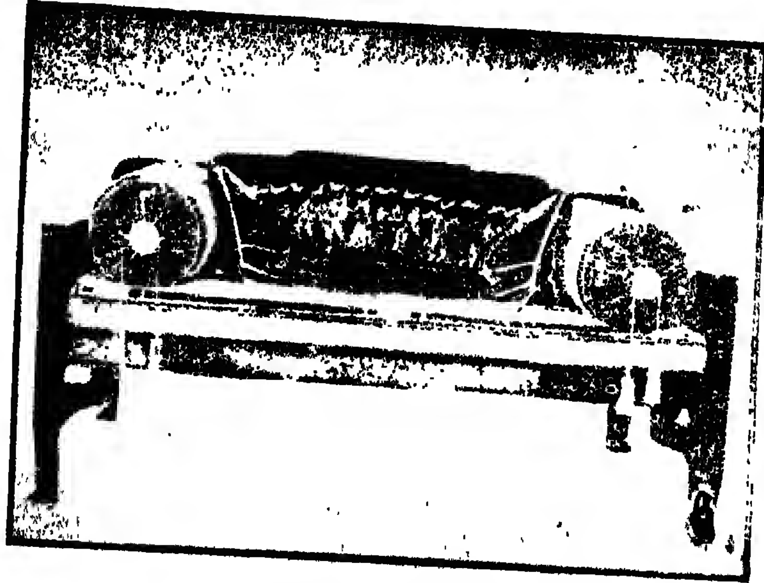
বেঙ্গালোরের আব্লুস কাঠের উপর হাতীর দাঁতের কাজ

নক্সা করার রীতি দেখিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়।

বেঙ্গালোরের কাঠের উপর হাতীর দাঁতের কাজ

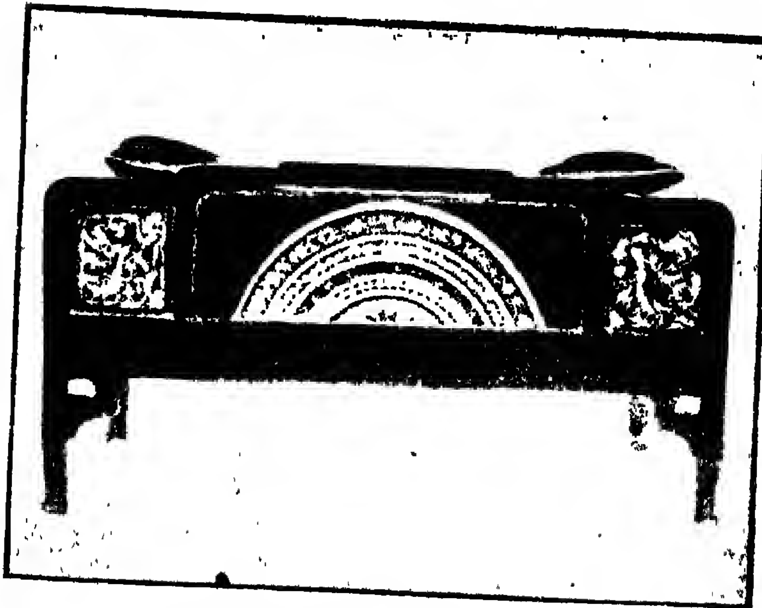
সাহারাণপুরের কাঠের উপর পিতলের পাত বসাইয়া আঙ্গুরপাতা ফুল প্রভৃতি নক্সা তোলার রীতি

প্রচলিত আছে। তাছাড়া মহীশূর ও মাদ্রাজ অঞ্চলের কাঠের উপর হাতীর দাঁতের কারুনৈপুণ্য খুবই প্রসিদ্ধ। অনেকে মনে করেন, এগুলি যুগে যুগে ভারতবর্ষের উপর বিদেশী আধিপত্যের ও আক্রমণের চিহ্নস্বরূপ বিরাজ করিতেছে। তাহা যদিও সত্য হয়, তথাপি এগুলি যে ভারতের শিল্পীর অস্থিমজ্জাগত হইয়া গিয়াছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। দেশের জাতীয় ইতিহাসের মূলে এগুলিই প্রধান ভিত্তিস্বরূপ। ভারত শিল্পের পুনরুত্থানের যুগে আবার আমাদের দেশের লোকের এই প্রাচীনকলার উপর দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং কলিকাতা, মাদ্রাজ, জয়পুর, লাহোর ও লক্ষ্ণৌ শিল্পবিদ্যালয়ে দেশীয় শিল্পাধ্যক্ষদের তত্ত্বাবধানে এই সব কারুকলার, ভারতীয় রীতিতে শিক্ষা দিবার পদ্ধতির প্রচলন হইতেছে। আমরা এখানে লক্ষ্ণৌ শিল্পবিদ্যালয়ের কাঠের কাজের কয়েকটি নমুনা দিলাম। একটি



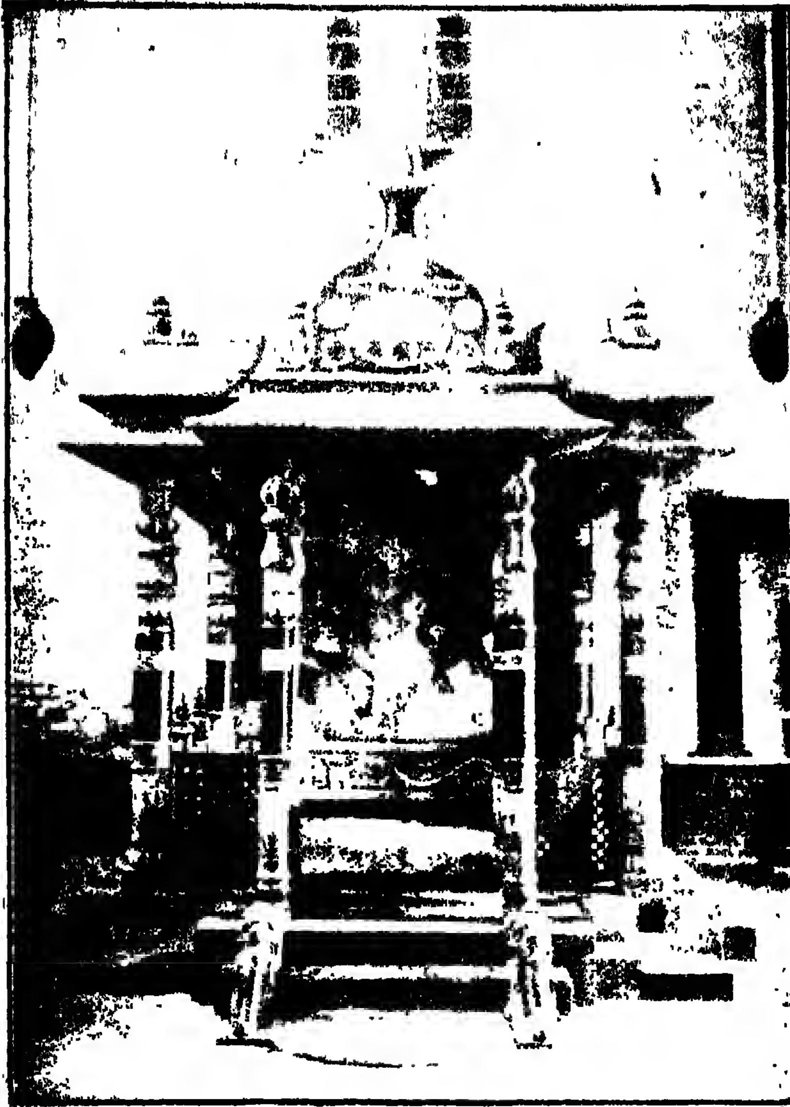
লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া হাউসে" রক্ষিত লাক্ষক লেপনের আসবাব
লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের তৈয়ারী

ইণ্ডিয়াহাউস, লণ্ডনে রক্ষিত লাক্ষক লেপনাঙ্কিত কাঠের চেয়ার। এই চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের রাস, মান ও দানলীলার ছবি সবুজের উপর সোনালী রঙে আঁকা হইয়াছিল। নানাপ্রকার ধাতু বসানো ছাড়া কাঠের উপর লাক্ষা রঙের কাজ আমাদের দেশে বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। খাটের খাটিয়ার পায়া, দোলনা, প্রভৃতির উপর লাক্ষক লেপনের কাজ কাশী, মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে হইয়া থাকে। কাঠিওয়াড়ের লাক্ষক লেপনের কাজ অপূর্ব্ব সুন্দর। সেখানে লাক্ষা রঙের দোলনার শয্যা ঘরে ঘরে বিরাজ করিতেছে। লাক্ষার কাজ এশিয়া মহাদেশের



লণ্ডনের "ইণ্ডিয়া হাউসে" রক্ষিত লাক্ষক লেপনের আসবাব
লক্ষ্ণৌ গভর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের তৈয়ারী

বিশেষ [শিল্প]। ভারত, চীন ও জাপান হইতে এই কাজ করিতে ইংরাজ বণিকেরা আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বণিকদের দ্বারা অনেক বিদেশে চালান হইত। চীনে, জাপানে ও ব্রহ্মদেশে যে সকল লাক্ষার কাজ আমরা দেখিতে পাই, তাহা



সাদা শিলাবলয়ে তৈয়ারী অতি প্রাচীন ভারতীয় প্রণালীতে তৈয়ারী প্রাসাদ-মন্দির (সাদা কাঠের নমুনা)

লাক্ষার কাজ নয়। সেগুলিকে জাপানে আসলে "উরসি" গাছের আটা এবং বর্মায় "থিসী" গাছের আটা বলে।

এই আটার প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া তাহার সহিত নানাপ্রকারের রঙ মিশ্রিত করিয়া এই লাক্ষা-চিত্র কাঠের উপর বা বাঁশের বা কাগজে গঠিত বাক্স বা ডিবা প্রভৃতির উপর অঙ্কিত হইয়া থাকে।

কাঠের কাজের মধ্যে আমরা ভারতবর্ষের সূক্ষ্ম বাদ্যযন্ত্রের কথা না বলিলে বিষয়টি অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। ভারতের 'রবাব', 'বীণা', প্রভৃতি অতি প্রাচীনকালের বাদ্যযন্ত্র বরাবর কাঠ দিয়াই তৈয়ারী হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত মুঘল যুগের প্রবর্ত্তিত দিলরুবা, এসরাজ, সেতার, সারেঙ্গী, সরোদ, তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র তৈয়ারীর কৌশল, কাঠের কারুকার্য্য প্রস্তুতের কৌশল অপেক্ষা কোন অংশেই ন্যূন নহে। শিল্পীদের হাতে এই সকল যন্ত্রের যে কত রূপ কত রঙ ধরিয়াছে তাহার আর ইয়ত্তা নাই। তোমরা যাদুঘর বা আজব ঘরে (Museum) রক্ষিত ঐরূপ অনেক বাদ্যযন্ত্র দেখিতে পাইবে—যার প্রচলন একেবারেই উঠিয়া গিয়াছে। তিব্বত এবং নেপালেও কাঠের কাজের ভিতর প্রাচীন বৌদ্ধযুগের কাঠের কাজের আদর্শানুকৃতি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। নানা-প্রকারের তান্ত্রিক ও বৌদ্ধমূর্ত্তির নিদর্শন এখনও নেপালের রাজধানী কাঠ-মুণ্ডু ও তিব্বতের রাজধানী লাসা সহরে দেখিতে পাইয়া থাকি।

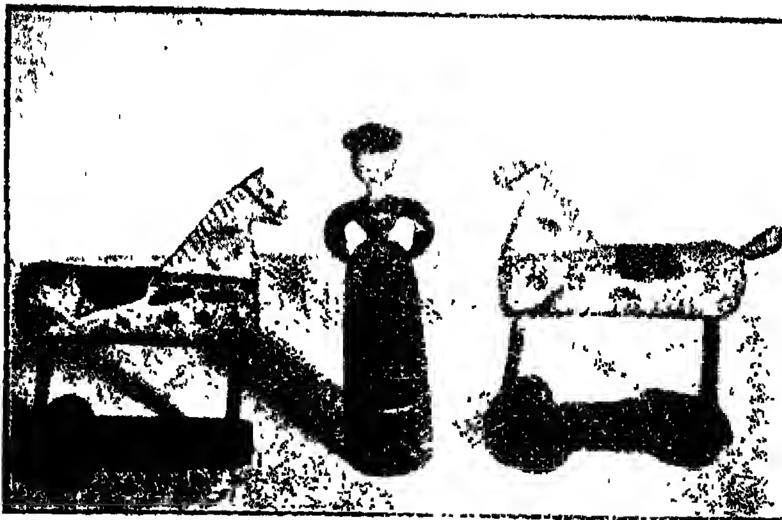
সবদেশের রূপকথা বা উপকথার কাহিনীর মূলে যেমন একটা ঐক্য বা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ পল্লী-শিল্পের (Folk art) মূলেও পৃথিবীর সর্ব্বত্র একই ভাব অনুপ্রাণিত হইতে দেখা যায়। কাঠের খেলনাগুলির ভিতরও তাই আমরা একটি সাদৃশ্য

পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দেখিতে পাই। ইউরোপে [illegible] কৌশল আবিষ্কার করেন, একটি কোন চিত্রে জ্যাকোস্লোভাকিয়ান প্রভৃতি দেশের কাঠের পুতুল [illegible] ছায়া (Colour shade) আর আমাদের দেশের সনাতন বেনেবৌ পুতুলের খুবই সাদৃশ্য আছে। কাঠের পুতুলের উপর নানাপ্রকারের রঙের বাহার ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়। শিশুদের নূতন চোখে নূতন আলোতে সেগুলি আরো বিচিত্র দেখায়।



[illegible]

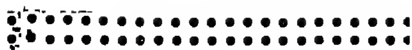
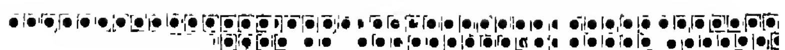
প্রথম যখন মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার হয়, তখন সীসার বদলে কাঠের হরফে বই ছাপা হইত। এই বিষয়ে "শিশু ভারতী"তে (৭৫২—৭৫৭ পৃষ্ঠা) মুদ্রাযন্ত্রের কথা বিস্তারিত বিবরণ আছে। অক্ষরের সঙ্গে সঙ্গে ছবিরও কাঠের তৈয়ারি ব্লক প্রচলিত হয়। [illegible] (Wood cut) ছবির উন্নতি জাপানে খুব [illegible] তৈয়ারী করেন—যাহাতে [illegible] প্রত্যেক রঙের উপর [illegible] ঠিক ভাবে ছবি ছাপিবার কালে পড়ে। ইউরোপের আধুনিক যুগে এই জাপানী ধরণের কাঠের খোদাই চিত্র প্রতিলিপি ছাপার [illegible] হইতেছে। তোমরা খুব পুরাতন বটতলার ছাপা ঠাকুর-দাদার মহাভারত বা রামায়ণ খানি দেখিলে ঐরূপ কাঠের ব্লক ছাপা ছবির পরিচয় পাইবে। এরূপ কাঠের কাজের উন্নতি সব দিক হইতে



কাঠের ঘোড়া দুটি [illegible]

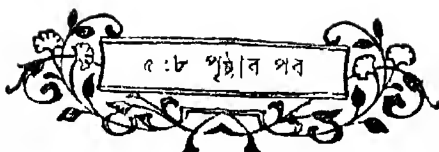
কাঠে খোদাই [illegible]

হইয়াছিল। সেখানে যে কোন চিত্রের যে কোন [illegible] অনেকগুলি ব্লক তৈয়ারী করিয়া ছাপিতে পারিবার [illegible] আমাদের দেশের হইবার চেষ্টা চলিতেছে। ইহাই উন্নতিশীল জাতির প্রাণের পরিচায়ক।



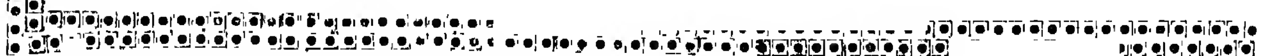
রঙ

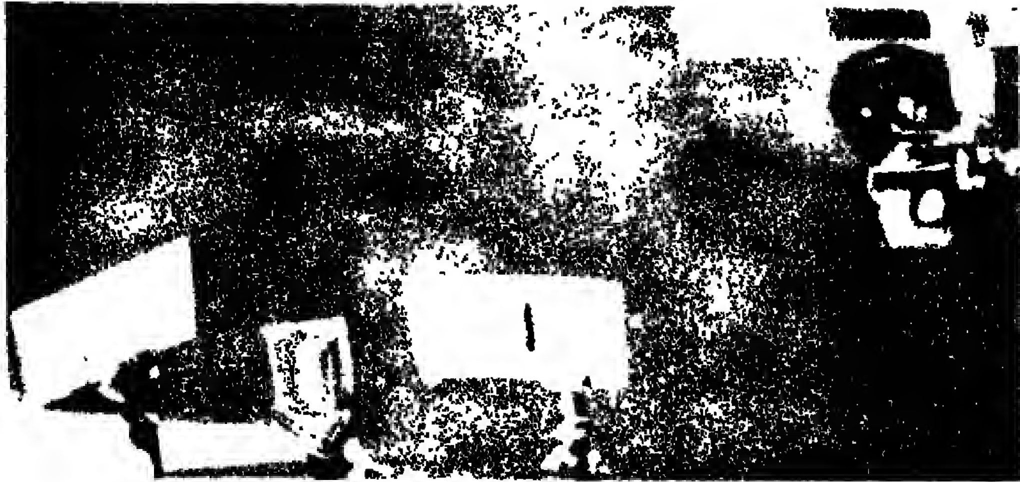


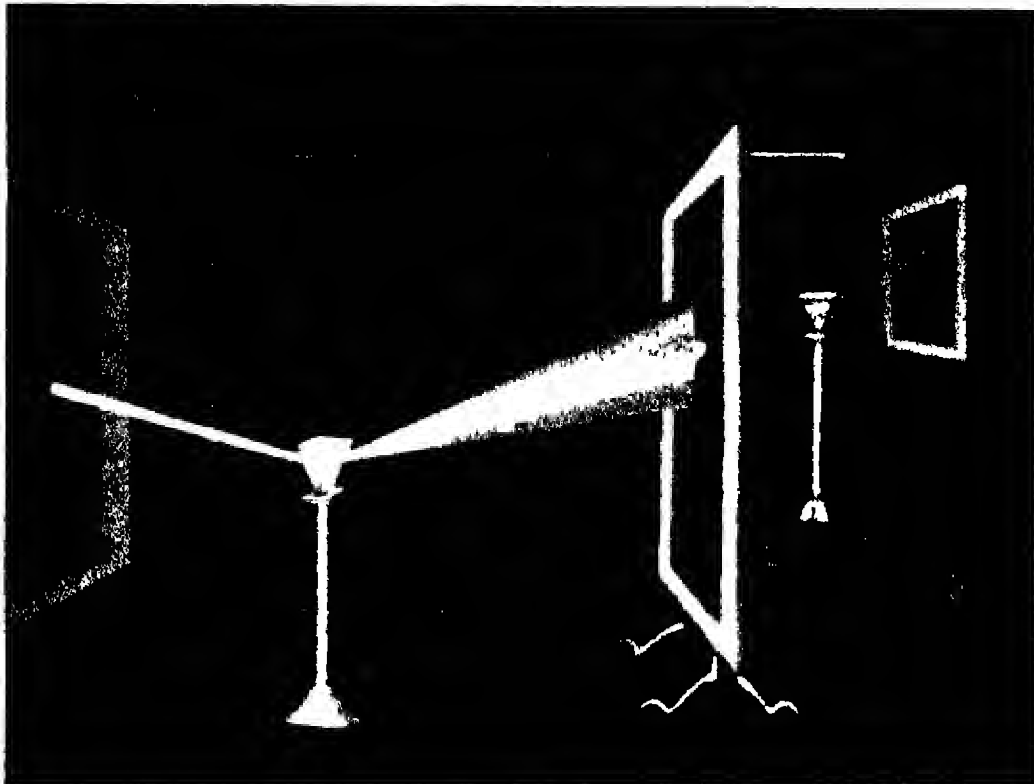
সৃষ্টির বৈচিত্র্য আমরা তাহার অপরূপ বর্ণ-সুষমার মধ্য দিয়া দেখিতে পাই। এজন্যই বোধ হয়, অবৈজ্ঞানিকদের মধ্যে কেহ একজন বলিয়াছিলেন যে, তিনি নীল আকাশ, ধূসর প্রান্তর, মেঘ ও সবুজ তৃণমণ্ডিত বসুন্ধরা ব্যতিরেকে প্রাণময়ী পৃথিবীর কল্পনাই করিতে পারেন না। তাঁহার কথা মানিয়া লইলে এই দাঁড়ায় যে, রঙ্ ছাড়া সৃষ্টি সম্ভব নয়। কেহ কেহ হয়ত এ-কথায় আপত্তি করিতে পারেন, কিন্তু সারা পৃথিবী খুঁজিয়াও এমন লোক একজনও পাওয়া যাইবে না, যিনি এই নীলাকাশের নীচে, এই সবুজ পাতা ও নানা বর্ণ-সুষমায় সুশোভিত ফুল-ফল-সজ্জিত এই সুন্দরী শ্যামলা ধরণীর বুকে বাঁচিয়া থাকিতে অনিচ্ছুক।

আমরা চোখ মেলিলেই পৃথিবীর নানা দিকে নানা ভাবে রঙের বিচিত্র লীলা দেখিতে পাই। সমুদ্রের বেলাভূমে যখন ফেনিল তরঙ্গ আসিয়া আছাড় খাইয়া পড়ে, তখন দেখিতে পাই তাহার প্রত্যেকটি জল-কণার মধ্যে কত বর্ণই না প্রতিফলিত হইয়া উঠিয়াছে। বর্ষণ-শেষে উন্মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যখন ইন্দ্রধনু প্রকাশ পায়, প্রভাতে ও সন্ধ্যায় সূর্য্যের উদয় এবং অস্তকালে মেঘে মেঘে যখন নানা রঙের বিচিত্র রূপ ফুটিয়া উঠে তখন এমন কে আছে—যাহার মন আনন্দে অভিষিক্ত না হয়। প্রকৃতির হাতে, যাদুকরের মন্ত্রপূত দণ্ডের স্পর্শের মত, সমস্ত সংসার মুগ্ধ ও আত্মবিস্মৃত হইয়া যায়। এই রঙটি হইতেছে সেই ইন্দ্রজাল!

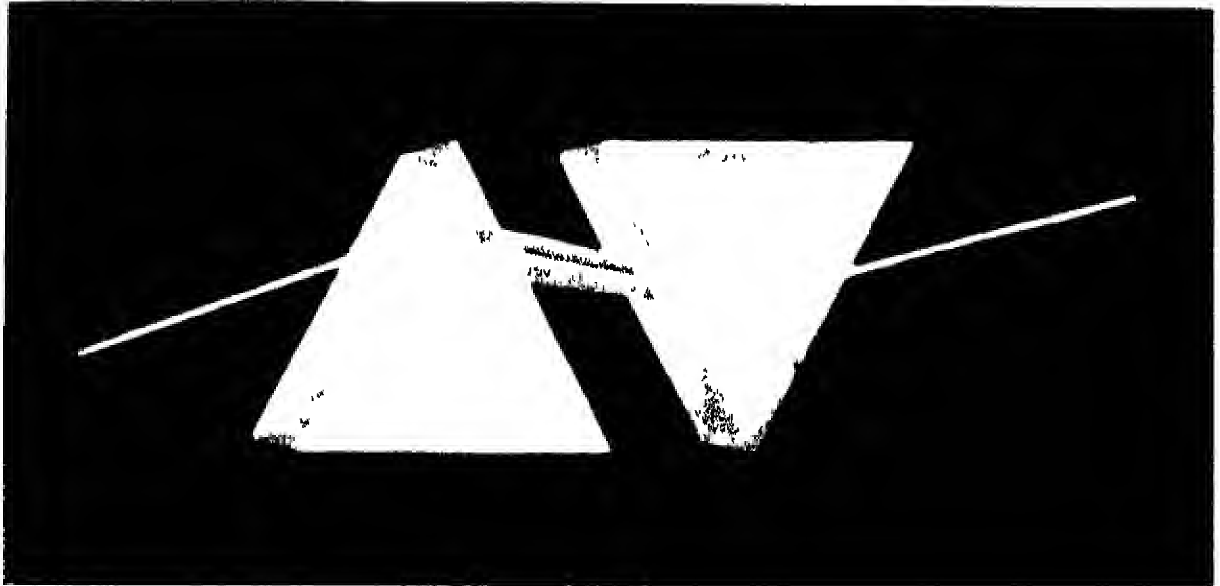
প্রাণিজগতের উপর রঙের প্রভাবের কথা শিশু-ভারতীতে যে-সব অংশে জীব বা প্রাণিবিজ্ঞানের কথা আছে, সেই সব অংশে তোমরা পাইবে। এই সব বিষয়ের গল্প খুবই চমৎকার ও কৌতূহলোদ্দীপক। আমি কিন্তু এ বিষয়ে তোমাদের কিছু বলিব না। রঙ্ বা বর্ণ বিজ্ঞানের যাহা আরও গোড়ার কথা—অর্থাৎ রঙের মূল কি, এক রঙের সহিত অন্য রঙের কি সম্পর্ক, সাদা ও কালো কি ব্যাপার, রঞ্জক পদার্থগুলির রঙ কোথা হইতে আসে ও তাহার প্রকৃতিই বা কি, এই সব নানান্ বিষয় তোমাদের গোচর করিব। রঙ বস্তুটি আমাদের অভিজ্ঞতার ভিতর এমন ব্যাপক-ভাবে বর্ত্তমান থাকে যে, ইহার স্বতন্ত্র তিন রকমের অর্থ ভাষার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ পদার্থবিৎ (Physicist) যাঁরা, তাঁরা রঙ্ অর্থে নানা প্রকারের আলো-রেই বুঝেন। রাসায়নিকগণের নিকট বস্তু বা দ্রব্য না থাকিলে তাঁহাদের সুবিধা হয় না—তাই তাঁহারা রঙ অর্থে কতকগুলি রঞ্জক পদার্থ (Dye Stuffs) বুঝিয়া থাকেন। অবশেষে যাঁরা

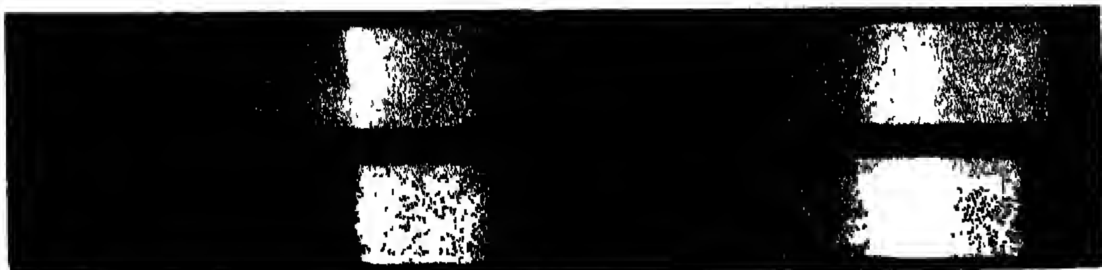







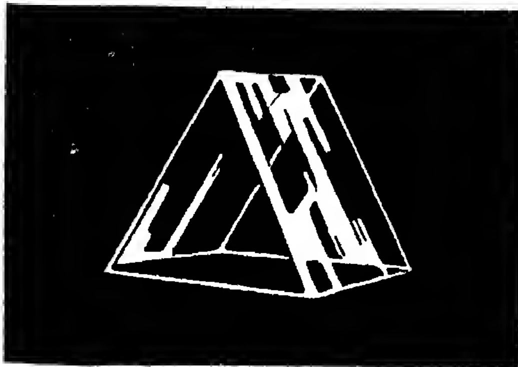
নিউটনের পরীক্ষা





মনস্তত্ত্ববিৎ (Psychologist) তাঁহাদের কাছে রঙ্ কোনও আলো বা পদার্থ বিশেষ নয়। তাহাদের মতে রঙটা কোনও বাহিরের জিনিসই নয়—উহা, যে দেখিতেছে তাহার ভিতরকার (Subjective) একটা ব্যাপার মাত্র। বাহির হইতে উত্তেজনা পাইয়া আমাদের চোখের স্নায়ুমণ্ডলী (Optic nerves) মগজে তাহার সংবাদ বহন করিয়া লইয়া গেলে মগজ তাহাতে যে সাড়া দিয়া উঠে, তাহাই হইল রঙ্। তোমরা রঙের এই শেষ অর্থটি শুধু জানিয়া রাখ।

এইবার তোমাদের কাছে একটি পরীক্ষার (Experiment) বর্ণনা করিব। তোমরা স্যর আইজাক নিউটনের (Sir Isaac Newton) নাম নিশ্চয় শুনিয়াছ। সত্যকথা বলিতে গেলে বিজ্ঞানের ভিত্তির উপর স্থাপিত করিয়া আলোক শাস্ত্রের গোড়াপত্তন তিনিই করিয়াছেন। তিনি যে বস্তুটি লইয়া তাহার পরীক্ষাগুলি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন তাহা তিনকোণযুক্ত একটি কাচের টুকরা মাত্র। ইহার ইংরাজী নাম Triangular prism। এই জিনিষটি খুবই সাধারণ, এজন্য তাহা সম্ভবতঃ তোমরাও দেখিয়া থাকিবে। না দেখিয়া থাকিলে ছবিতে দেখিলেই জিনিষটির স্বরূপ



প্রিজম্

বুঝিতে তোমাদের কষ্ট হইবে না। ইহাকে আমরা ইংরাজীর অনুকরণে প্রিজম্ই (Prism) বলিব। তোমরা নামটি মনে রাখিও। সূর্য্যের আলো প্রিজমের মধ্য দিয়া চলিবার সময় যে নানা রঙে ভাঙ্গিয়া যায়, তাহা অবশ্য নিউটন জানিতেন—কিন্তু এই ব্যাপারটি স্পষ্টভাবে নিজের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে আনিবার জন্য তিনি জানা বিষয়গুলিও নূতন করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়াছিলেন। বিজ্ঞানের মূল কথাই হইল এই যে-নিজে না দেখিয়া, নিজের হাতে কোনও জিনিষ পরীক্ষা না করিয়া কোনও কিছুর সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে নাই। তাই নিউটন সমস্ত পরীক্ষাটি নূতন ভাবে নিজে করিয়া দেখিলেন, এবং আমরা যেন নিউটনই বলিতেছেন, এরূপভাবে তোমাদের নিকটে বর্ণনা করিতেছি।

একটি খুব অন্ধকার ঘরের জানালায় একটি ছোট ছিদ্র করিলাম। এই ছিদ্রটি দিয়া সূর্য্যের আলো ঘরে প্রবেশ করিলে তাহার পথে একটি প্রিজম মাথা নীচু করিয়া রাখিলাম। সূর্য্যরশ্মি প্রিজমের ভিতর দিয়া যাইবার কালে, আলোর তির্য্যক প্রাপ্তির নিয়ম অনুসারে, বাঁকিয়া গিয়া প্রিজমের অন্য ধার দিয়া বাহির হইয়া উপর দিকে উঠিয়া গেল এবং পূর্ব্ব হইতেই রক্ষিত একটি পর্দার উপর পড়িয়া উপর হইতে নীচে একটি রঙীন আলোর রেখা হইয়া দেখা দিল। আলোর এই রঙীন রেখাটির নীচের প্রান্তে লাল রঙ্ এবং উপরের প্রান্তে বেগুনে রঙ্ ছিল, এবং এই দুই রঙের মধ্যে পীত, সবুজ, নীল ইত্যাদি নানান্ রঙ দিয়া সম্পূর্ণ রেখাটি গঠিত হইয়াছিল। এই রঙীন রেখাটির নাম আমরা কিরণ-চিত্র দিতেছি (Spectrism) এবং এখন হইতে এই নামেই ইহাকে আমরা অভিহিত করিব।

এইবার আমি উপরিউক্ত সাদা পর্দাটির যে জায়গায় কিরণ-চিত্রটি (Spectrism) পড়িয়াছিল, তাহার মাঝামাঝি একটি ছোট ছিদ্র করিয়া কিরণ চিত্রের সবুজ রঙের আলোটিকে পর্দা ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে দিলাম। এই পর্দাটির নিকটেই এবং সবুজ আলোটির চলিয়া যাইবার পথে আমি অন্য একটি প্রিজম্ পূর্ব্বের মত করিয়া বসাইয়া দিলাম। সবুজ আলো এই দ্বিতীয় প্রিজমটির ভিতর দিয়া যাইবার কালে অবশ্য বাঁকিয়া গেল। কিন্তু প্রিজম্ হইতে বাহির হইবার পর অন্য পর্দায় পড়িলে ইহাকে কোনও নূতন রঙে পরিবর্ত্তিত হইতে আর দেখা গেল না—সেই সবুজই রহিল। আমি প্রথম প্রিজমটিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া লাল হইতে বেগুনে পর্য্যন্ত যত রকমের রঙই কিরণ-চিত্রটিতে বর্ত্তমান ছিল একে একে ছিদ্রটি দিয়া দ্বিতীয় প্রিজমটির উপর পড়িতে দিলাম। কিন্তু সাদা আলো যেমন প্রথম প্রিজমটি দিয়া যাইবার কালে নানা রঙে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, ইহাদের কোনটিই প্রিজমের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইবার পর কোনও নূতন রঙে বিশ্লেষিত হইতে দেখা গেল না। প্রিজমের ভিতর যাইবার পূর্ব্বে যে রঙ্ ছিল, প্রিজম্ হইতে বাহির হইবার পরেও তাহাই বর্ত্তমান রহিল।

উপরি উক্ত পরীক্ষাটি নিউটন সাহেব খুব দক্ষতার সহিত নিষ্পন্ন করিলেও পূর্ব্বে যেমন বলিয়াছি বাস্তবিক

পক্ষে ইহা তাঁহার নিজের আবিষ্কার নহে। তাঁহার পূর্ব্বেই আমার্ন্ডি নামে জার্মাণীর একজন জেস্যুইট ইহার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। নিউটন দেখান যে, সাদা আলো ভাঙ্গিয়া গিয়া যে রঙগুলি নির্ম্মিত হইল তাহাদের পথ আবার অন্য একটি প্রিস্ম দিয়া উল্টাদিকে বাঁকাইয়া যদি পুনরায় তাহাদের এক স্থানে করা যায়, তাহা হইলে পূর্ব্বকার সাদা আলো আবার ফিরিয়া পাওয়া যায়। নিউটনের এই পরীক্ষাটির চিত্র দেখিলেই ব্যাপারটা বুঝিতে পারিবে।

এইখানে তোমরা আলোক বিজ্ঞানের একটি সিদ্ধান্ত জানিয়া রাখ। তোমরা পরে স্পষ্ট করিয়া জানিতে পারিবে যে আলো তরঙ্গধর্ম্মী। শব্দ যেমন বাতাসে তরঙ্গমাত্র, আলোও তেমনই আকাশে তরঙ্গমাত্র। এক এক রূপ তরঙ্গ এক এক রঙ হইয়া আমাদের চোখে ধরা পড়ে। সূর্য্যের রশ্মিতে সকল রকমের তরঙ্গই বর্ত্তমান থাকে —তাই সূর্য্যের সাদা আলো-কে মিশ্র বলা হয়। এইজন্যই নিউটনের পরীক্ষার Experiment-এ মিশ্র বলিয়া সাদা আলো প্রিস্মের মধ্য দিয়া যাইবার কালে নানা রঙে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। অপর পক্ষে একবার বিশ্লেষিত হইয়া যাইবার পর যখন তাহার মিশ্রভাব কাটিয়া গেল তখন তাহার আর নূতন রঙে ভাঙ্গিয়া যাইবার প্রয়োজন রহিল না। এই কারণেই দ্বিতীয় প্রিস্ম দিয়া একবার বিশ্লেষিত আলো চলিয়া গেলে তাহার রঙ অপরিবর্ত্তিতই রহিয়া গেল।

বিজ্ঞান এক এক যুগে এক সিদ্ধান্ত গঠন করে, পরে নূতন তথ্য প্রকাশ পাইলে তাহাকেই আবার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন করিয়া লয়। প্রিস্মের আলো বিশ্লেষণ করা ব্যাপারটির যে ব্যাখ্যা এইমাত্র তোমরা জানিতে পারিলে, তাহাও জ্ঞান-সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের আঘাত লাগিয়া কয়েকবার নিজের রূপ ও রঙ বদলাইয়া লইয়াছে। আলোক বিজ্ঞানের নূতনতম সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে পরিচিত হইতে হইলে ইহার অভিব্যক্তির বড় বড় ধাপগুলিতে পা ফেলা দরকার, এবং তাহা হইলেই তাহার সত্যকার স্বরূপ স্পষ্ট হইবার সম্ভাবনা। সে যাহা হউক, এইবার তোমরা ভাল করিয়া জানিতে পারিলে যে, সূর্য্যের সাদা আলোর মধ্যে অনেক রঙের আলো বর্ত্তমান। সাধারণতঃ এই বলা হয় যে, সূর্য্যের আলোতে শুধু সাতটা রঙ আছে। কিন্তু এই কথা ঠিক নয়। তোমরা সূর্য্যের আলোর যে কিরণ-চিত্র (spectrum) ছবিতে দেখিতেছ, তাহার এক পাশে লাল ও অন্য পাশে বেগুনে রঙ আছে। কিন্তু এই দুইএর মাঝে কত নানাবিধ রঙ বর্ত্তমান তাহার কি সংখ্যা আছে! ভাষাতে অতগুলো শব্দ নাই, ও নামও নাই, তাই ইহাতে যে রঙগুলো প্রধান, তাহারই নাম দিয়া সূর্য্যের আলো সাত রঙের সমষ্টি বলিয়া বর্ণনা করি। বস্তুতঃ সূর্য্যের সাদা আলো প্রিস্ম দিয়া বিশ্লেষণ করিয়া আমরা অগণ্য বিবিধ রঙের আলো পাইয়া থাকি। এই রঙগুলিকে আমরা বিশুদ্ধ রঙ বলিব। বিশুদ্ধ রঙের অর্থ কি? আলো প্রিস্মের দিয়া লইয়া গেলে যে সকলরঙ দেখা যায়, তাহাই বিশুদ্ধ রঙ। কোনও একটা বিশুদ্ধ রঙের আলো ঐভাবে আবার বিশ্লেষণ করিলে কোনও নূতন রঙ পাওয়া যায় না।

আমাদের চতুর্দ্দিকে যে সব রঙীন বস্তু সব সময় দেখিতে পাই, এইবার তাহাদের কথা বলা যাইতে পারে। মনে কর, নিউটন যে কিরণ চিত্র (spectrum) সূর্য্যের আলো দিয়া প্রিস্মের সাহায্যে তৈরী করিয়াছিলেন সেই রকম কিরণ চিত্র তোমরাও একটা সাদা পর্দ্দার উপর ফেলিয়াছ। এখন একটা লাল কাচের টুকরা লও এবং যে সাদা আলোর রেখাটা প্রিস্মের মধ্যে ঢুকিয়া নানারঙে বিভক্ত হইতেছে, তাহার পথে তাহাকে ধর। এইবার যদি কিরণ-চিত্রটার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাহা হইতে লাল রঙটা ছাড়া অন্য সব রঙই মুছিয়া গিয়াছে। অর্থাৎ লাল কাচের টুকরাটা অন্য সব রঙগুলিকে শুধু যে লাল রঙে রূপান্তরিত করিতে পারিল না, তাহাই নহে —ইহা লাল রঙ ছাড়া অন্য গুলিকে নষ্ট করিয়া ফেলিল। ইহাই হইল রঙীন বস্তুসমূহের রঙের মূল তত্ত্ব। রঙীন বস্তু সাদা আলো হইতে নিজের রঙটা ছাড়া অন্য সব রঙ শুষিয়া লইয়া নষ্ট করিয়া ফেলে বলিয়াই রঙীন দেখায়। তোমরা জলচিত্র বা ওয়াটার কলার (water colour) দিয়া ছবি আঁকিয়া থাক, কিংবা ছবি আঁকিতে দেখিয়াছ। যখন রঙ গুলিয়া তুলিতে দিয়া সাদা কাগজে লাগান হয়, তখন কোনও নূতন রঙ যে তৈয়ারী কর তা-নয় বরং কতকগুলি রঙ নষ্ট করিয়াই থাক। ছবি আঁকিবার সাদা কাগজটার উপর যে রঙই পড়ুক না কেন, তাহা তাহাদের সবই প্রতিফলিত করিয়া দেয়। আমরা আঁকিবার সময় তাহার উপর একটা স্বচ্ছ তরল পদার্থের আবরণ দিয়া দিই। সাদা আলো-কে এই আবরণটিকে একবার সাদা কাগজে পড়িবার সময় অন্যবার তাহা হইতে প্রতিফলিত

সাদা আলোতে কি ভাবে রং দেখিতে পাওয়া যায়?



[illegible] কারণ তাহা সাদা আলোর সব রংকেই



সাদা আলোতে টোমাটোর রং লাল। কারণ, তাহা সাদা আলোর লাল রঙের অংশটাই শুধু প্রতিফলিত করে।



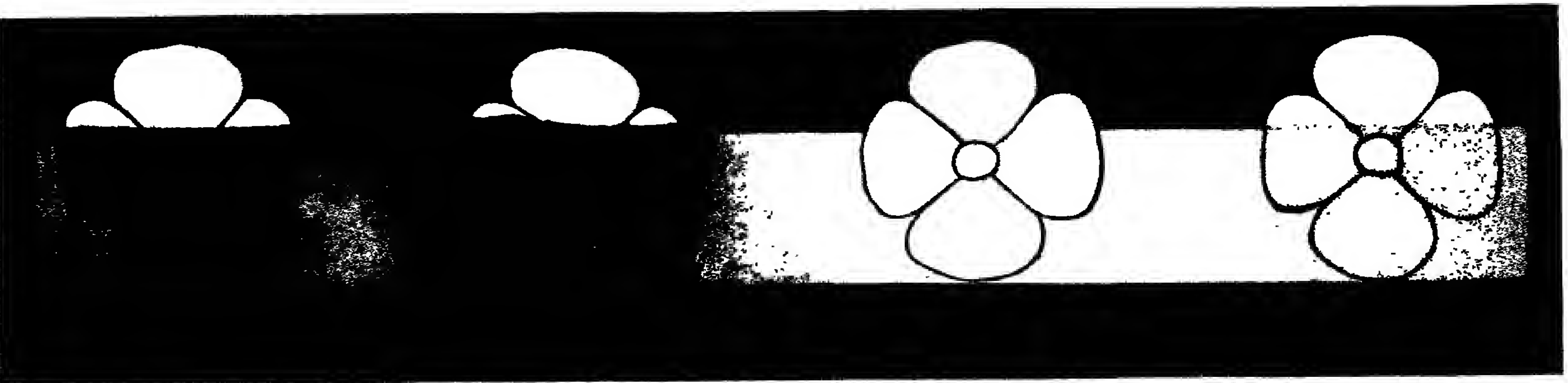
সাদা আলো হইতে পাতা সবুজ অংশ ছাড়া [illegible] টানিয়া রাখে, অবশিষ্ট অংশ প্রতিফলিত সবুজ বলিয়া পাতাকে সবুজ দেখায়।



কালো দ্রব্য রংকে নিজের মধ্যে টানিয়া লয়। সেজন্য কালীর বোতল হইতে আমাদের চোখে কোনো আলোই আসিতে পায় না। কাজে কাজেই, কালীর রং কালো।



বেগুন শুধু বেগুনী রংই প্রতিফলিত করে। তাই বেগুন, বেগুনী রঙের হয়।



হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় এই দুইবার ভেদ করিতে হয়। এখন এই আবরণটা তাহার ভিতর দিয়া আলো যাইবার সময় মনে কর ও লাল ছাড়া অন্য সব রঙই যদি নষ্ট করিয়া ফেলে তাহা হইলে আমাদের চোখে কাগজের ঐ জায়গাটা লালই বোধ হইবে। যদি ঐ আবরণটা শুধু বেগুনী রঙ শুষিয়া লইবার ক্ষমতা রাখে, তাহা হইলে কাগজটা পীতবর্ণের দেখাইবে। এবং তাহা যদি লাল রঙটাই শুধু নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারে, তবে কাগজের রঙটা নীল এবং হরিৎ রঙের মাঝামাঝি একটা রঙ হইয়া উঠিবে। তাই তোমরা যখন water colour দিয়া ছবি আঁকিতে যাইবে তখন এই কথাটা মনে রাখিও যে, যত বেশী রঙের পর রঙ কাগজের উপর লাগাইবে ততই সাদা আলো হইতে তাহার রঙ নষ্ট হইতে থাকিবে—এবং অবশেষে ছবির সৌন্দর্য্য যে ঔজ্জ্বল্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর নির্ভর করে তাহা আর পাওয়া যাইবে না। এই জন্যই water colour দিয়া আঁকা কঠিন বলা হয়।

তেলের রঙ দিয়া ছবি আঁকিলে (oil painting) কিন্তু ব্যাপার অন্য রকম হয়। ইহাতে রঙটা সাদা আলো হইতে যতটা তাহার দরকার রঙ টানিয়া লইয়া বাকিটা নিজেই চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দেয়। রঙ ভেদ করিয়া সাদা আলোকে ক্যানভাসের উপর পড়িয়া প্রতিফলিত হইতে হয় না। তাই একটা রঙ লাগাইয়া দরকার পড়িলে তাহার উপর অন্য একটা রঙ লাগান চলে এবং এইভাবে আগের রঙটাকে একেবারে অকেজো করিতে পারা যায়। ছবি আঁকিবার সময়ে যাহা তোমরা নিজেরাই করিয়া থাক, তোমার চতুর্দ্দিকে রঙীন বস্তুসমূহের বেলায় বিশ্বপ্রকৃতি নিজেই তাহা করিয়া থাকেন। রঙীন বস্তুগুলার গায়ে তিনি এমন সব বস্তু লাগাইয়া দেন যাহা সাদা আলো হইতে তাহার কয়েকটা রঙ সরাইয়া লইয়া বাকীটা ছাড়িয়া দেয়। যাহা ছাড়িয়া দেয় তাহা আর সাদা থাকে না, কাজে কাজেই রঙীন হইয়া পড়ে। অতএব তোমরা পাইলে, বস্তুমাত্রের বর্ণ তাহাদের বিশেষ বিশেষ রঙের আলো নিজেদের মধ্যে শুষিয়া লইবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।

কোনও জিনিসের রঙ যেমন তাহার নিজের আলো গ্রহণ করিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে, তেমনিই সঙ্গে সঙ্গে যে আলো দিয়া সেই বস্তুটি আলোকিত হইতেছে তাহার উপরেও নির্ভর করে। সাদা আলোর একটা বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে সব রঙই বর্ত্তমান কিন্তু রাত্রিকালে বা অন্ধকার ঘরের মধ্যে ত সাদা থাকে না, সেখানে প্রদীপ বা অন্য কোনও artificial আলো লইয়া কাজ চালাইতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় দেখিতে পাওয়া গিয়াছে যে, যে-সব জিনিস সাদা আলোতে এক রঙের দেখায়, কৃত্রিম (artificial) আলোতে সে বর্ণ পরিবর্ত্তন করিয়াছে। সবচেয়ে সহজ দৃষ্টান্ত তোমাদের নীলাম্বরী সাড়ী দিয়া দেওয়া যাইতে পারে। নীলাম্বরী সাড়ীতে যে রঙ বর্ত্তমান, তাহা সূর্য্যের সাদা আলোর সবটাই শুষিয়া লইয়া নীল রঙটা ছড়াইয়া দেয়। প্রদীপের আলোতে কিন্তু নীল রঙ একেবারে নাই। কাজে কাজেই, প্রদীপের আলোতে আনিলে উহা কালো রঙের দেখায়। কারণ, প্রদীপের আলোতে সেই রঙটারই অভাব যে রঙটা কাপড়টা বিচ্ছুরিত বা ছড়াইয়া দিতে পারিত।

আমার কথাটা আরও পরিষ্কার হইবে যদি তুমি নিম্নলিখিত পরীক্ষাটি (experiment) সম্পাদন করিতে পার। তুমি ত কিরণ-চিত্র তৈরী করিতে শিখিয়াছ। একটা রঙীন ফুল, এই মনে কর একটা পীত পুষ্প তুমি লইলে। ফুলের রঙ পীত বর্ণের। এখন এই ফুলটা লইয়া কিরণ চিত্রটার (spectrum) প্রত্যেক রঙের মধ্যে তুমি রাখ, তুমি দেখিতে পাইবে যে, ফুলটার রঙও তাহার স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। লাল রঙের স্থানটিতে উহা লাল দেখাইবে, পীত রঙে তাহা স্বাভাবিক ভাবেই থাকিবে। সবুজ রঙের মধ্যে সবুজ হইয়া যাইবে, কিন্তু গাঢ় নীল রঙে তাহা একেবারে কালো রঙের হইয়া পড়িবে। সেই জন্যই বস্তুমাত্রের রঙ তাহার নিজের রঙেরই উপর যে শুধু নির্ভর করে, তাহা নহে, যে আলো দিয়া উহা আলোকিত হইতেছে তাহারও উপর নির্ভর করে।

অতএব তোমাদের মধ্যে যাহাদের ছবি আঁকিবার অভ্যাস আছে তাহারা আর একটি কথা মনে রাখিও। যে ঘরে বা যে জায়গায় সেই ছবিটি থাকিবে সেই জায়গার আলোর অবস্থা কল্পনা করিয়া ছবিতে রঙ লাগাইতে হয়। হয়ত তুমি দিনের আলোতে বসিয়া একরূপ রঙ দিয়া ছবি আঁকিতেছ। অথচ সেই ছবিটি থাকিবে এমন ঘরে, যেখানে কৃত্রিম আলো (artificial light) দিয়া ছবি দেখা ছাড়া উপায় নাই। এক্ষেত্রে যদি তুমি যেমন দেখিতেছ তেমনই রঙ লাগাইতে থাক, তাহা হইলে ছবিটি যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইলে সে রঙ বদ্লাইয়া হয়ত এক কিম্ভূত-কিমাকার হইয়া দাঁড়াইবে।



ইউরোপের আদিমানব


৫৮০ পৃষ্ঠার পর

চীনের আদিমানবের কথা পূর্ব্বে তোমাদিগকে বলিয়াছি। এইবার ইউরোপের পুরাকালের মানুষের কথা বলিব।

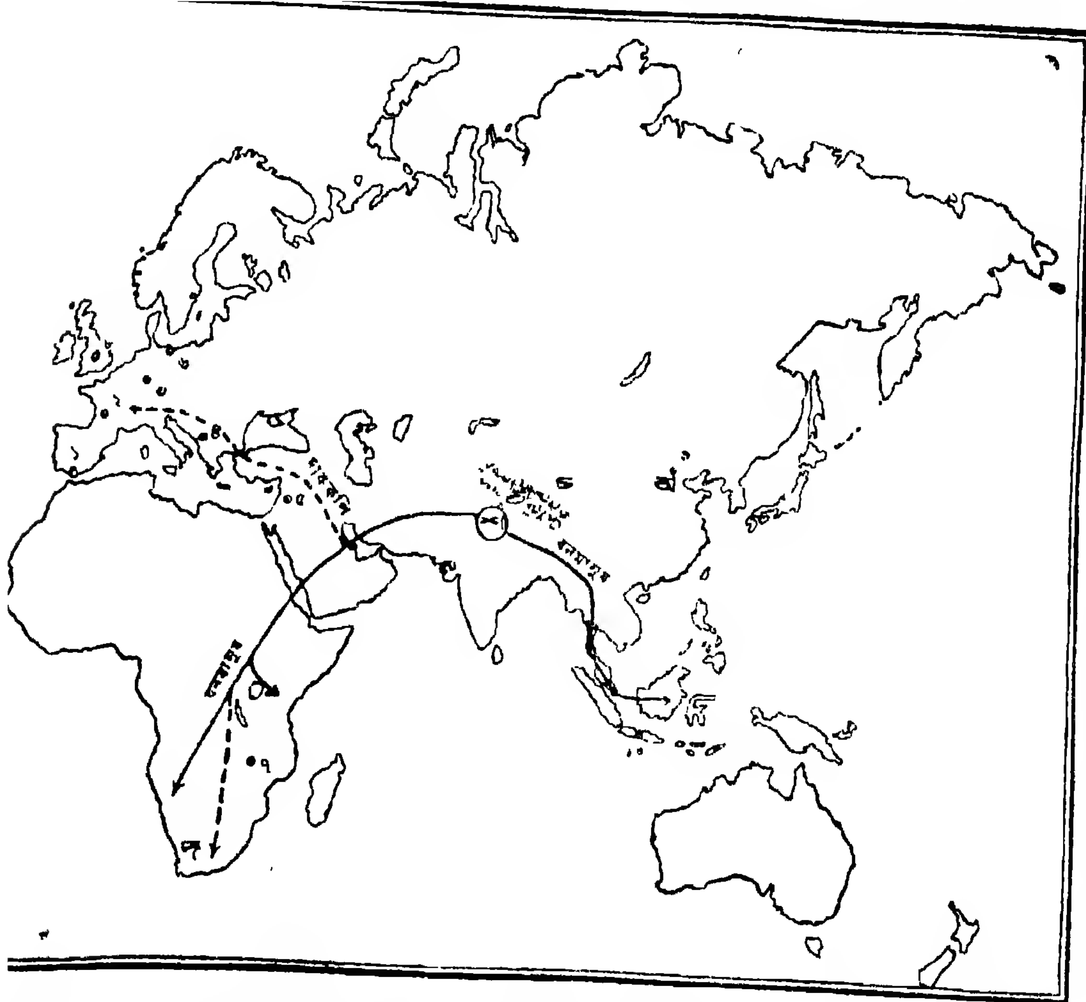
অনেক বৈজ্ঞানিকের মত এই যে, এশিয়াতেই মানুষের আদিপুরুষ সর্ব্বপ্রথম জগতের আলো দেখিয়াছিল। তাঁহাদের মতে যবদ্বীপের মানুষটিই সর্ব্বপুরাতন আর যবদ্বীপ ত এশিয়ারই অন্তর্ভুক্ত। সত্য কথা বলিতে কি, মানুষের পূর্ব্বপুরুষের উদ্ভব যে কোথায় হইয়াছিল, তাহা স্থিরভাবে এখনও নির্ণীত হয় নাই। একজন বৈজ্ঞানিক ইউজিন ডুবোয়া (Dr. Engine Dubois) বলেন, যবদ্বীপের মানুষটিই সকলের চেয়ে পুরাণো মানুষ, আর ডাঃ ডেভিড্‌সন ব্লেক (Dr. Davidson Black) বলেন, চীনের মানুষটিই সর্ব্ব পুরাতন। আবার আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ্ যোশেফ বারেল বলেন যে, হিমালয় পর্ব্বত যেমন তাহার শৃঙ্গরাজি লইয়া উচ্চ হইতে আরম্ভ করিল, সঙ্গে সঙ্গে মানুষের পূর্ব্বপুরুষেরও তেমনি আবির্ভাব হইল। ইলিয়ট স্মিথ (Prof. G. Elliot Smith) নামে আর একজন পণ্ডিতও এই বিষয়টিকে বেশ পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। মধ্য আধুনিক যুগের প্রারম্ভে ভারতবর্ষ ও মধ্য এশিয়া প্রায় সমতলভূমি ছিল। এই সময়েই হিমালয় পর্ব্বতের মত বিরাট পর্ব্বতের সৃষ্টি হইল এবং তাহারই ফলে মধ্য এশিয়ার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এই প্রবন্ধে যে মানচিত্রখানি দেওয়া হইল, (৯৮৪ পৃঃ) তাহা হইতে বেশ বুঝিতে পারিবে যে, কি ভাবে মানুষের পূর্ব্ব পুরুষ দারুকপি বা ড্রায়োপিথিকাস্ (Dryo-pithicus) জাতীয় জীব হইতে ভিন্ন ভিন্ন আকার পাইতেছিল। দারুকপি বা ড্রায়োপিথিকাসের বংশধরগণ (৮) চিহ্নিত স্থানে আসিয়া ভারতে ঐ জাতীয় জীবের সহিত পৃথক্ হইয়া পড়িতেছিল। হিমালয়ের পর্ব্বত-শৃঙ্গের উচ্চতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ইহারা দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। একদল গাছে চড়িয়া বেড়াইত, তাহারাই বর্ত্তমান কালের গরিলা, শিম্পাঞ্জী ইত্যাদি, আর একদল শিবকপি—তাহারা বৃক্ষবাস ছাড়িয়া দিয়া মাটিতে বসবাস করিতে আরম্ভ করিল এবং খাড়া হইয়া চলিবার ক্ষমতা প্রাপ্তির ও মগজের পরিমান বৃদ্ধির সহিত তাহারা ক্রমশঃ মানুষের পূর্ব্বপুরুষে পরিণত হইল। এই স্থান হইতেই মানুষের এই পূর্ব্বপুরুষেরা ইউরোপে আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ২০শে অক্টোবর জার্ম্মাণপ্রদেশে হাইডেলবার্গ সহরের ছয় মাইল দূরে মাউয়ার (Mauer) নামক স্থানে একটি কঙ্কাল পাওয়া যায়।

হাইডেলবার্গ মানুষ

তাহার দাঁতগুলি আধুনিক মানুষের মত। কিন্তু সেই কঙ্কালের চোয়ালটা ছিল খুবই বিশাল। কোন বনমানুষের চোয়ালের পাশে রাখিলে ইহাকে তাহাদেরই মত বোধ হয়। কিন্তু এই হাইডেলবার্গ মানুষের চোয়াল ছিল না। মানুষের চোয়ালের ভিতর যেমন জিহ্বা রাখিবার গর্ত্ত সামনের দিকে থাকে, এই প্রাচীন মানবের চোয়ালেও সেইরূপ আছে। কিন্তু উপর চোয়ালের সহিত সংযোজক স্থানে বর্ত্তমান মানুষের চোয়াল যেরূপ, এই হাইডেলবার্গ মানুষের অস্থিগঠন

সেইরূপ নহে। "শ্ব-দন্ত" canine tooth ধারালো বা উঁচু ছিল না। কাজেই দেখা গেল যে, মানুষের এই পূর্ব্বপুরুষেরা দন্তকে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার প্রয়োজন বোধ করিত না। বানর বা বনমানুষের মত ইহার শ্ব-দন্ত সম্মুখের ক্ষুদ্র দন্ত (Incisor) ঠিক সাধারণ মানুষের মত। কষের দাঁত (Molar) দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সমান। যদিও বনমানুষে তাহার দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত অধিক। আধুনিক মানবের সহিত তুলনায় এই কষের দাঁতগুলি যেন একটু বেশী মোটা ও বড় কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার আদিম নিবাসীদের সমান। দ্বিতীয় কষের দাঁত, মানুষে ও বনমানুষে যেরূপ হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপ হইলেও আকারে একটু বড়। তৃতীয় কষের দাঁত, যাহাকে সাধারণতঃ আক্কেল দাঁত বলে, স্থানের অভাবে যেমন মানুষের ঠিক্ উঠিতে পারে না, এই প্রাচীন মানবে কিন্তু বনমানুষের মত ঐ দন্তোদ্গমের যথেষ্ট স্থান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, আর একটা কষের দাঁতও উঠিতে পারে। বনমানুষে নীচের কষ দাঁতে পাঁচটি শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই আদিমানবের সব কষের দাঁতেই এইরূপ শৃঙ্গ আছে। এইভাবে চিবুক সন্ধিস্থলের বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য সাদৃশ্য দেখিয়া পণ্ডিতেরা হাইডেল্‌বার্গ মানুষকে বনমানুষ জাতীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। ইহার গঠন হইতে বেশ বুঝা যায় যে, জিহ্বা সঞ্চালনের স্থান আধুনিক মানুষ অপেক্ষা অনেক কম ছিল।



১। ২। ৩। ৪। ৫ = নিয়াণ্ডারথাল প্রায় মানব। ৬ = হাইডেলবার্গ প্রাও মানব। ৭ = রোডেশিয়া মানব। = পিল্ট্‌ডাউন মানব। ৯ = চীনের অর্দ্ধমানব। ১০ = যবদ্বীপের কপিমানব। অ = অর্দ্ধমানব। চ = চীন। দ = দারুকপি। শ = শিবালিক পর্ব্বতমালা। হি = হিমালয় পর্ব্বতমালা।

F. 4

সুতরাং হাইডেলবার্গ মানুষের বাক্যকথন বা কথা বলিবার ব্যাপারে জিহ্বার ব্যবহার করিবার ক্ষমতা ছিল না। এই ভাবে ইহাকে মানুষ ও ইতর জন্তুর মাঝামাঝি স্থানে সন্নিবেশিত করা যাইতে পারে।



মেনারের নিকট বালুকাস্তূপ

ইংল্যাণ্ডেও একটি প্রাচীন কালের মানুষের মাথার-খুলি পাওয়া গিয়াছে। সাসেক্সের অন্তঃপাতী পিল্ট-



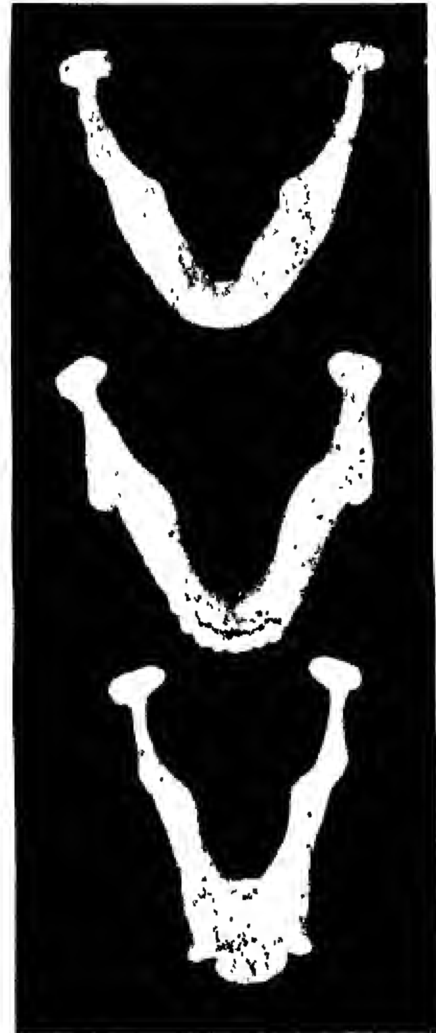
হাইডেলবার্গ মানুষের চোয়াল

ডাউন নামক স্থানে ইহা পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহা পিল্টডাউন মানব নামে পরিচিত। পিল্টডাউন মানবের মাথার খুলির আবিষ্কর্তা ডসন (Dawson) বলেন যে, এই মাথার খুলি ও চোয়াল দেখিয়া অনুমিত হয় যে, এই জাতীয় মানুষ ১০০,০০০ হইতে ৩০০,০০০ বৎসর পূর্ব্বে পৃথিবীর বুকে বিচরণ করিত।



হাইডেলবার্গ মানুষের চোয়ালের পার্শ্ব দৃশ্য

ইউরোপের আরও অনেক স্থানে আদিমানবের



দুটি চোয়ালের মিলিত দৃশ্য

কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। বেলজিয়াম, ফ্রান্স, স্পেন

এবং জার্ম্মেনীর অন্তর্গত নিয়াণ্ডারথাল নামক উপত্যকায় আর একজাতীয় মানুষের কঙ্কাল পাওয়া



পিল্টডাউন মানবের কঙ্কাল যেখানে পাওয়া গিয়াছিল

শিল্পী : [illegible]

গিয়াছে। নিয়াণ্ডারথাল উপত্যকায় এই নূতন জাতীয় মানুষের কঙ্কাল প্রথম পাওয়া গিয়াছিল



পিল্টডাউন মানবের মাথার খুলি

বলিয়া এই জাতীয় মানব নিয়াণ্ডারথাল মানব বলিয়া পরিচিত হইয়া আসিতেছে। নিয়াণ্ডারথাল মানুষেরা অনেক বিষয়েই উন্নত ছিল। তাহারা অস্ত্র-শস্ত্রের ব্যবহার জানিত। সে সকল অস্ত্র শস্ত্রের কিছু কিছু পোলাণ্ড, ক্রিমিয়া প্রভৃতি পশ্চিম ইউরোপের অনেক জায়গায় পাওয়া গিয়াছে। এশিয়া-মাইনরেরও কোন কোন স্থানেও নাকি তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্র শস্ত্র মিলিয়াছে। বৈজ্ঞানিকদের মতে,

নিয়াণ্ডারথাল মানব



পিল্টডাউন মানবের মুখের আনুমানিক আকৃতি

এই জাতীয় মানুষেরা বড় জোর দেড় লক্ষ বৎসর আগে, কিংবা আরও অনেক কম চল্লিশ হইতে ষাট হাজার বৎসর আগে পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল।

সে সময়ের প্রাকৃতিক অবস্থা ছিল সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকারের। তখন শীত ছিল খুবই বেশী। দারুণ শীতের দরুণ তাহারা গুহার মধ্যে বাস করিত; তাহাদের জীবন-যাত্রা একেবারেই আরামের ছিল না। বন্য জন্তুদের সহিত লড়াই করাই ছিল তাহাদের একমাত্র কাজ। তখন বনে বনে বিচরণ করিত অতিকায় হস্তী, লোমশ গণ্ডার এবং ঘোড়া, হরিণ,

বাইসন এই সব। এই নিয়্যাণ্ডারথাল মানুষেরা ছিল অসাধারণ সাহসী এবং দেখিতে শক্তিশালী। তাহারা দেখিতে কেমন ছিল? ছবি হইতেই তাহা



পিল্টডাউন মানবের মাথার পাশ দৃশ্য

বুঝিতে পারিতেছ। ইহারা লম্বায় হইত প্রায় পাঁচ ফুট তিন-চার ইঞ্চি। তাহাদের মোটা নাক, পুরু



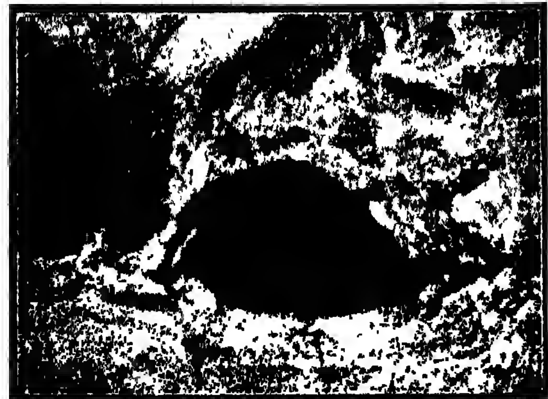
গ্রোট্টো গুহার সম্মুখ-দৃশ্য

ঠোঁট, আর ঠোঁটের নীচের হাড়টার খানিক অংশ সামনের দিকে যেন ঠেলিয়া আসিয়াছে। ধীরে ধীরে ক্রমবিকাশের ফলে এই জাতীয় মানুষের বংশধরেরা



নিয়াণ্ডারথাল মানবের আনুমানিক আকৃতি

নানা বিষয়ে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহারা ঈশ্বর ও পরকাল সম্বন্ধে চিন্তা করিতে শিখিল, দলবদ্ধ হইয়া বাস করিবার অভিজ্ঞতা লাভ করিল এবং মৃতদেহ



গ্রোট্টো গুহার প্রবেশ-পথ

সমাধিস্থ করিতে শিখিল। তাহারা মনে করিত, মানুষ পৃথিবীতে বাস করিবার সময় যেমন ক্ষুধা-তৃষ্ণায়

ব্যাকুল হয়, মৃত্যুর পর প্রেতাত্মারও তেমনি ক্ষুধা তৃষ্ণার ও বিলাস-উপকরণের আবশ্যক হয়। সেজন্য সেকালের এই মানুষেরা সমাধির মধ্যে খাদ্যদ্রব্যাদি এবং বিলাসের উপকরণ প্রভৃতি রাখিয়া দিত।

বৎসরের পর বৎসর যাইতে লাগিল— নিয়াণ্ডার-থাল মানবের পর আবার অরিগনেশিয়ান জাতির লোক পৃথিবীতে আসিয়া আবির্ভূত হইল। ফ্রান্স ও স্পেন দেশে তাহাদের চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। উহারাও গুহার ভিতরে বাস করিত এবং বন্য-জন্তু শিকার করিয়া জীবন ধারণ করিত।

মনে হয়, এই জাতির মানুষেরাই সর্ব্বপ্রথম ললিতকলার চর্চ্চা করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কেননা, ইহারা যে সকল গুহার ভিতরে বাস করিত তাহার গায়ে ইহাদের আঁকা জন্তু-জানোয়ারের অনেক ছবি রহিয়াছে। তাহাদের আঁকা কয়েকটি ছবি এখানে দেওয়া গেল। এই মানুষেরা শুধু পাথরের নয়, হাড় দিয়াও নানা প্রকারের যন্ত্রপাতি তৈয়ারী করিতে পারিত। ইহাদের আবির্ভাব কালে ইউরোপের বর্ত্তমান সময় হইতে শীত অনেক বেশী প্রবল ছিল। নানাদিক্ দিয়া এই মানুষেরা উন্নতি লাভ করিয়াছিল। তাহারা তীর-ধনুকের সৃষ্টি করিয়াছিল, পোষাক পরিতে শিখিয়াছিল, স্ত্রীলোকেরা পশুর চামড়া দিয়া তৈয়ারী-করা পোষাক পরিয়া গরু-মহিষ চরাইয়া বেড়াইত। পুরুষেরা



নিয়াণ্ডারথাল মানবের কঙ্কাল

শিকার করিত, আর অবসর সময়ে তাহাদের নিভৃত গুহা-গৃহে ফিরিয়া প্রথম প্রথম কয়লা দিয়া পরে নানা রংয়ের সৃষ্টি করিয়া রং দিয়া গুহার দেয়ালের গায়ে ছবি আঁকিত। জীবজন্তুর ছবি আঁকিয়া হাত পাকা করিয়া পরে তাহারা মানুষের ছবি পর্য্যন্ত আঁকিতে শিখিয়াছিল। এই সকল চিত্র হইতে আমরা সেকালের



[illegible] মানুষের বাইসন শিকার

মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাস জানিতে পারি। কেননা জীবনযাত্রার নানা বিষয়ই তাহারা দেয়ালের গায়ে আঁকিয়া গিয়াছে। লার্টেট (Lartet) সাহেব



পূর্ব্বকালের লোমশ হস্তী—ম্যামথ

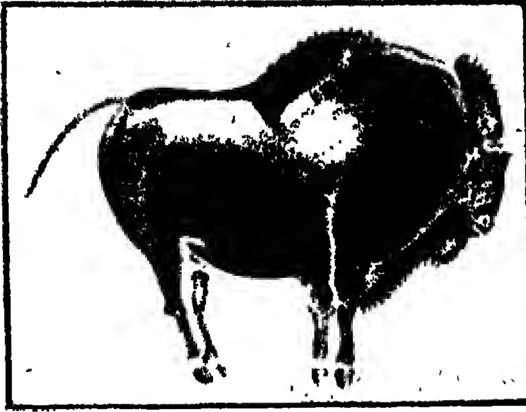
চিত্রগুলির প্রথম আবিষ্কার করেন। এই চিত্রগুলি বিভিন্ন কালে আঁকা হইয়াছিল। সেগুলির বয়স কত, কোন্ ছবিটির বয়স কত বৎসর, পণ্ডিতেরা সে-সব বিষয়ে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। অরিগনেশিয়ান মানুষেরা পৃথিবীর বুকে আনুমানিক বিশ হাজার বা সতের হাজার

বৎসর পূর্ব্বে কিংবা খুব বেশী প্রাচীন হইলে পঞ্চাশ হাজার বৎসর পূর্ব্বে আবির্ভূত হইয়াছিল।

অরিগ্নেশিয়ান মানবেরা পরে দুইটি জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এক দলের নাম ক্রোম্যাগনন্, অন্য দলের নাম গ্রিমল্ডি (Grimaldi)।

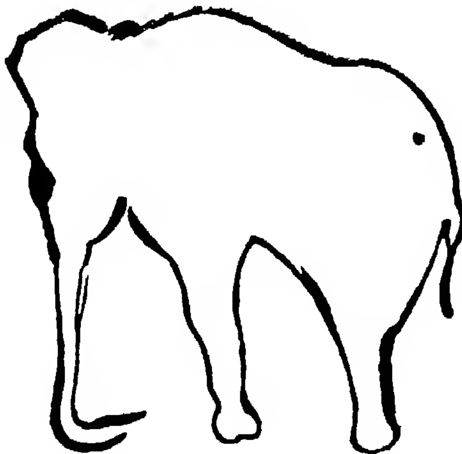
ক্রোম্যাগনন (Cromagnan)

ক্রোম্যাগনন মানবেরা প্রায় ৬ফিট লম্বা হইত এবং তাহাদের দেহের প্রসারও ছিল বেশ। মাথাটাও ছিল বড় এবং লম্বা



গুহাচিত্র—বাইসন

ধরণের। মাথার পরিমাণও ছিল, ৫২ হইতে ৫৬ আউন্স। আর গ্রিমল্ডি মানুষেরা লম্বায় ৫ ফিট ২ ইঞ্চি হইতে প্রায় ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি হইত। তাহারা দেখিতে ছিল অদ্ভুত ধরণের—পা দুইটি ধড়ের চেয়েও



গুহাচিত্র—ম্যামথের রেখাচিত্র

লম্বা ছিল এবং নাকটা ছিল চ্যাপ্টা। আফ্রিকা মহাদেশে বুশ্ম্যান (Bushman) নামে এক জাতীয় মানুষ দেখা যায়, ইহাদের সহিত গ্রিমল্ডি মানুষের সাদৃশ্য খুব বেশী রকমের দেখিতে পাওয়া যায়। অনেক পণ্ডিতের মতে এই গ্রিমল্ডি মানুষ হইতেই বুশ্ম্যানদের উৎপত্তি হইয়াছে।

পরে আবার দুইজাতীয় মানবের আবির্ভাব হইল। ইহারা সলুত্রিয়া এবং মডলেনিয়াঁ নামে পরিচিত। ইহাদের বয়স হইবে প্রায় দশ পনের হাজার বৎসর, অর্থাৎ প্রায় দশ-পনের হাজার বৎসর পূর্ব্বে ইহাদের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই জাতীয় মানুষেরা আরও

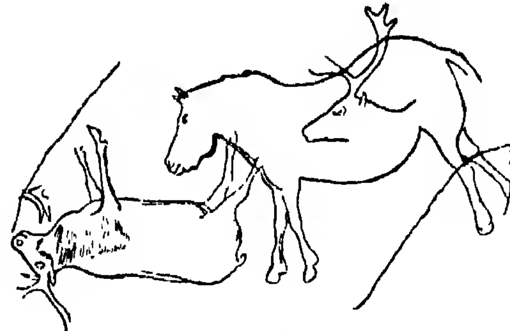


গুহাচিত্র—লোমশ গণ্ডার

অনেক দিক্ দিয়া সভ্যতার উন্নত স্তরের দিকে

সলুত্রিয়া (Solutrean) ও মডলেনিয়াঁ (Mogdalenian)

অগ্রসর হইয়াছিল। তাহাদের অস্ত্র-শস্ত্র, যন্ত্র-পাতি অনেকটা উন্নত ধরণের ছিল। ইহারাও শিকার করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। পশুপালন করিতে জানিত এবং গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতিকে পোষ মানাইয়া তাহাদের দ্বারা অনেক কাজ করাইয়া লইত। এ সময়েই



খোদিত অশ্ব প্রভৃতি

কৃষিকার্য্যের প্রথম সূত্রপাত হইয়াছিল ও এই সময় হইতেই মানুষ ক্রমশঃ বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির প্রভাবে নানারূপে উন্নতি লাভ করিয়া বর্ত্তমান

উচ্চ সভ্যতার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।

মানুষ জগতের আলো কবে কোন্ দেশে সর্ব্বপ্রথম দেখিয়াছিল, সে কথা বলা বড় কঠিন। আমরা তোমাদের কাছে পূর্ব্বে বলিয়াছি (শিশু-ভারতী —৩৩৩ পৃষ্ঠা) "যে, হিমালয় অঞ্চলে প্রকৃতিদেবী নানা পৃথক্ পৃথক্ গঠনের মধ্য দিয়া বনমানুষ ও আদি মানব গড়িয়া তুলিয়াছিলেন।" সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক



ক্রোম্যাগনন মানবের আনুমানিক আকৃতি

ইলিয়ট স্মিথ (G. Elliot Smith) বলেন—Interesting as these questions are for speculation, one is bound to admit in the end that we have no decisive information as to the place or the time of birth of the human family, but we have certain indications which suggest that the first step in the transformation of apes into men may have occurred north of the Himalayas. একথা সকলকেই মানিয়া লইতে হইবে যে, মানবের আদি জন্মভূমি কোথায়, তাহা কল্পনা

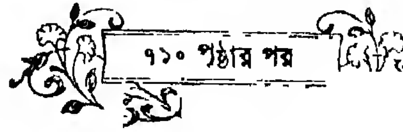


প্রাচীন ক্রোম্যাগনন মানবের আনুমানিক আকৃতি

ব্যতীত অনুমান করা কঠিন, তবে নানারূপ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, নানা পৃথক পৃথক্ গঠনের মধ্য দিয়া বনমানুষ ও আদি মানব উত্তর হিমালয় অঞ্চলেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। এইজন্যই আমরা ভারতবাসী ভারতবর্ষের গৌরব করিয়া বলিতে পারি—মানবের আদি জন্মভূমিও আমাদের দেশ ভারতবর্ষ।



ইংরাজী কবিতার প্রথম বিকাশ


৭১০ পৃষ্ঠার পর

যে সমস্ত উপকরণের সাহায্যে ইংরাজী ভাষা গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহাদের কথা তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ইংরাজী ভাষার প্রথম প্রভাতে যে কয়খানি বই লেখা হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে Beowolf নামক কাব্যখানিই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষার সঙ্গে Beowolf-এর ভাষার কোন মিল নাই। তার পর হইতে বহু বিদেশী ভাষার প্রভাবে ইংরাজী ভাষা এক নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে। এই সমস্ত ভাষার মধ্যে ফরাসী ভাষার নাম সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু ফরাসী ভাষা ল্যাটিন্ ভাষার অন্তর্গত বলিয়া বর্ত্তমান ইংরাজী ভাষাতে ল্যাটিন ও জার্ম্মান ভাষার সম্মিলিত প্রভাব দেখিতে পাই। Beowolf এর সময়ের ইংরাজী ভাষায় শুধু জার্ম্মান্ ভাষার প্রভাব দেখা যায়। তখনও ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম ছড়াইয়া পড়ে নাই। নরওয়েদেশীয় উপকথা হইতে এই কাব্যটির জন্ম, সুতরাং আমাদের মনে হয়, উত্তর সমুদ্রের ওপার হইতে কোন লোক অন্ততঃপক্ষে ইহার বিষয়-বস্তুটি আমদানী করিয়াছে। রামায়ণ ও মহাভারতে যেমন প্রাচীন ভারতবাসীদের চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, ইলিয়াড ও ওডিসীতে যেমন প্রাচীন গ্রীস্ দেশের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে, Beowolf-এও সেইরূপ ফুটিয়া প্রাচীন উত্তর দেশবাসীর চিত্র। ইহারাই একদিন ইংলাণ্ড জয় করিয়া সেখানে বসবাস করিতে থাকে। ইহারাই বর্ত্তমান ইংরাজ জাতির পূর্ব্বপুরুষ—জন্মদাতা। এই কাব্যখানির ছত্রে ছত্রে ফুটিয়া উঠিয়াছে সমুদ্রের প্রতি তাহাদের অসীম ভালবাসা। সমুদ্রের মনোরম ছবিগুলি কি সুনিপুণ হস্তেই না তাহারা অঙ্কিত করিয়াছে। ইহার ছন্দে ছন্দে ঝঙ্কৃত হইয়াছে এমন একটি সবল সজীবতা, যাহার সঙ্গে বিশ্বসাহিত্যের যে কোন প্রসিদ্ধ কাব্যের তুলনা করা যাইতে পারে। এংলো স্যাক্সন্ অথবা প্রাচীন ইংরাজী কবিতাতে যে ছন্দ প্রচলিত ছিল, বর্ত্তমানের প্রচলিত ছন্দের সঙ্গে তাহার কোন মিল দেখা যায় না। তাহাদের ছন্দ না ছিল মিত্রাক্ষর, না ছিল অমিত্রাক্ষর। কবিতার পংক্তিগুলির দৈর্ঘ্যও যে সমান হইবে, এমন কোন নিয়ম ছিল না। প্রত্যেক পংক্তির প্রথম তিনটি অক্ষরের শব্দ-গুলি এক হইলেই যথেষ্ট হইবে। বর্ত্তমানে

গ্রীক্ ল্যাটিন্ ভাষা হইতে ইংরাজীতে কত বিভিন্ন ছন্দের আমদানী হইয়াছে—এসব পড়িয়া সেই সহজ সরল লিখন প্রণালীর কথা যখন ভাবি, তখন আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই। ইংরাজী সাহিত্যের এই প্রাচীনতম কাব্যখানি সম্বন্ধে কিছু জানিতে নিশ্চয়ই তোমাদের ইচ্ছা হইতেছে। সেই গল্পটি আমি এখন তোমাদিগকে বলিব।

অতি প্রাচীন কালে ডেন্মার্ক দেশে রথ্গার (Hrothgar) নামে এক অতি পরাক্রমশালী রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজসভায় দেশ-বিদেশ হইতে কত প্রসিদ্ধ বীর-পুরুষের সমাগম হইত। তিনি সকলকে লইয়া উৎসব করিবার জন্য হেরট (Heorot) নামে একটি বিরাট প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইলেন। এই রথ্গার-এর সময় দেশে এক ভীষণ বিপদ আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রেণ্ডেল নামে এক ভীষণ দৈত্য তার জলা-ভূমির নিম্নস্থ বাসভূমি ত্যাগ করিয়া গভীর রাত্রিতে হেরটে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উৎসব শেষে নিদ্রিত যোদ্ধাদের মধ্য হইতে ত্রিশ জনকে তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। পরদিন প্রভাতে কান্নার রোলে দেশের আকাশ বাতাস সকরুণ হইয়া উঠিল কিন্তু সেদিন রাত্রিতেও গ্রেণ্ডেল আবার আসিল, আবার সে আরও যোদ্ধাদের লইয়া পলাইয়া গেল। দিনের পর দিন তাহার অত্যাচার সমভাবে চলিল কিন্তু রথ্গার নিরুপায়। এই ভীষণ দৈত্যকে সে কিছুতেই কিছু করিতে পারিল না। এক গভীর শোকের ছায়ায় সমস্ত দেশ মুহ্যমান হইয়া পড়িল। এমনি করিয়াই বারোটি বৎসর কাটিয়া গেল।

সেই সময়ে সমুদ্রের অপর তীরে বাস করিত এক জন অমিতসাহসী বীরপুরুষ—তাহার নাম বিওয়ুলফ্ (Beowolf)। গ্রেণ্ডেলের কথা শেষে তাহার কানেও পৌঁছিল। সে এই দৈত্যটিকে হত্যা করিতে মনস্থ করিল। তাই একদিন বহু লোকজনপরিপূর্ণ বিওয়ুলফ্-এর জাহাজ ডেন্মার্কের দিকে রওনা হইল।

বিওয়ুলফ্ ডেন্মার্কে আসিয়া উপস্থিত হইলে তীররক্ষক তাহার কথা শুনিয়া তাহাকে রথ্গার-এর কাছে লইয়া গেল। দেশময় আনন্দের ধুম পড়িয়া গেল। বিওয়ুলফের সম্বর্দ্ধনার জন্য এক মহোৎসবের আয়োজন করা হইল। বহুদিন পরে তাহাদের মুখে হাসি ফুটিল—সমস্ত দেশ আবার উৎসব আনন্দে মাতিয়া উঠিল। উৎসব শেষে রথ্গার তাঁর লোকজন লইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু বিওয়ুলফ্ তার লোকজন সঙ্গে করিয়া শুইয়া রহিল, এই বিপদসঙ্কুল হেরটে। সকলেই গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত, কিন্তু বিওয়ুলফের চোখে ঘুম নাই—সে প্রতি মুহূর্ত্তে এই ভীষণ দৈত্যের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল রাত্রি শেষে হেরটের সিংহদ্বার ভাঙ্গিয়া গ্রেণ্ডেল আসিয়া উপস্থিত হইল। একজন যোদ্ধাকে খাইয়া ফেলিতেই বিওয়ুলফ্ দৌড়িয়া গিয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিল। দুই জনের মধ্যে ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। বিওয়ুলফের যোদ্ধারা দৈত্যকে আক্রমণ করিতে গেল কিন্তু গ্রেণ্ডেলের যাদুবিদ্যা প্রভাবে তাহাদের তীক্ষ্ণধার তরবারি ব্যর্থ হইয়া গেল। বিওয়ুলফ্ আর গ্রেণ্ডেলের যুদ্ধ সমানভাবে চলিল। অবশেষে বিওয়ুলফ্ গ্রেণ্ডেলের একখানি বাহু ছিঁড়িয়া ফেলিল। গ্রেণ্ডেল তাহার হাতখানি রাখিয়াই তাহার জলাভূমির উদ্দেশ্যে ছুটিয়া পলাইল। পর দিন প্রভাতের অরুণ কিরণের স্নিগ্ধ হাসিতে সমস্ত দেশ আনন্দে ভরিয়া গেল। রথ্গারের লোকদের আজ আনন্দের সীমা নাই—তাহাদের পরম শত্রু আজ পরাজিত, বিধ্বস্ত। যে হ্রদের নীচে গ্রেণ্ডেল বাস করিত, তাহার ঢেউগুলি আজ তার রক্তে লালে-লাল হইয়া

উঠিয়াছে। রথ্গার, বিওয়লফ্ ও তাহার যোদ্ধাদিগকে বহু মূল্যবান্ উপহার দিল—চারণ কবিরা বিওয়লফের যশোগীতিতে সমস্ত দেশ মুখরিত করিয়া তুলিল। উৎসব-শেষে রথ্গারের লোকেরা হেরটে ঘুমাইয়া রহিল; আজ আর তাহাদের চিন্তা নাই, ভয় নাই—যে ভীষণ শত্রুর ভয়ে তাহারা বারোটি বৎসর প্রাণে মরিয়াছিল, সে আজ বাঁচিয়া নাই। কি ভুলই না তাহারা করিয়াছে? পুত্র-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য তাহার মা ত এখনো জীবিত। এবার সে নিজে আসিল এবং কয়েকজন নিদ্রিত যোদ্ধাকে তুলিয়া লইয়া তাহার আবাস-ভূমিতে চলিয়া গেল। পর দিন ভোরে আবার দেশময় কান্নার রোল উঠিল।

বিওয়লফ্ ও রথ্গার আর কালবিলম্ব না করিয়া জলাভূমির অপর তীরে যে পুকুরের নীচে গ্রেণ্ডেলের মা বহু জল-দৈত্যের সহিত বাস করিত, সেখানে গিয়া উপস্থিত হইল। রথ্গারের একজন সৈন্য যে তরবারি তাহাকে উপহার দিয়াছিল সেই যাদুগুণ-বিশিষ্ট তরবারি লইয়া ও বর্ম্ম পরিধান করিয়া বিওয়লফ্ জলের মধ্যে লাফাইয়া পড়িল। গ্রেণ্ডেলের মা তৎক্ষণাৎ তাহাকে সবলে ধরিয়া ফেলিল এবং টানিতে টানিতে তাহাকে গুহার ভিতর লইয়া গেল। বিওয়লফ্ সেই তরবারি দিয়া তাহাকে সজোরে আঘাত করিল কিন্তু তাহাতে তাহার কোন ক্ষতিই করিতে পারিল না। তখন বিওয়লফ্ সেই দানবীকে তাহার বজ্রমুষ্টিতে ধরিয়া ফেলিল। আবার এক ভীষণ মল্লযুদ্ধ আরম্ভ হইল। গ্রেণ্ডেলের মা বিওয়লফের বক্ষ লক্ষ্য করিয়া সজোরে এক ছুরিকাঘাত করিল কিন্তু তাহার বর্ম্ম এ যাত্রা তাহাকে রক্ষা করিল। এমন সময় হঠাৎ বিওয়লফ্ দেখিতে পাইল, প্রাচীর গাত্রে একখানি তরবারি ঝুলিতেছে। সে সাগ্রহে সেই তরবারিটি গ্রহণ করিল এবং বিদ্যুদ্গতিতে গ্রেণ্ডেলের মায়ের উপর লাফাইয়া পড়িয়া এক আঘাতে তাহাকে ধরাশায়িনী করিল। বিজয়ী বিওয়লফ্ দেখিতে পাইল, সেখানে গ্রেণ্ডেলের মৃত দেহ পড়িয়া রহিয়াছে। সে তাহার মাথাটি কাটিয়া সঙ্গে লইল এবং সাঁতরাইয়া উপরে উঠিয়া গেল। বিরাট্ আনন্দধ্বনিতে বিওয়লফ্কে সকলে অভ্যর্থনা করিল। তাহার অপূর্ব্ব পরাক্রম ও ডেন্মার্কবাসীদের মঙ্গল সাধনের জন্য আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাকে অজস্র ধন্যবাদ দিতে লাগিল।

সমস্ত দেশে আবার উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। ঘরে ঘরে আনন্দের আর সীমা নাই। তারপর একদিন বহুমূল্য উপহারাদি লইয়া বিওয়লফ্ তাহার নিজের দেশে ফিরিয়া গেল। তাহার দেশবাসিগণ পরম গর্ব্বভরে এই দৈত্যবিজয়ী মহাযোদ্ধাকে আপন দেশে বরণ করিয়া লইল।

তারপর বিওয়লফ্ তাহার নিজের দেশে রাজা হইয়া বসিল। বহুদিন সুখে রাজত্ব করিবার পর আর একজন দৈত্য তাহার দেশে উপদ্রব আরম্ভ করিল। সে এখন বৃদ্ধ—যৌবনের দৃপ্ত তেজ আর তাহার নাই। তবু সে এই দৈত্যকে হত্যা করিয়া তাহার প্রজাগনের ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এই যুদ্ধে সে যে আঘাত পাইয়াছিল, সেই আঘাতের ফলেই তাহাকে এই পৃথিবী হইতে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হইল। সমুদ্রের অনতিদূরে অবস্থিত এক অতি উচ্চ পর্ব্বত-শৃঙ্গে তাহার মৃতদেহ দাহ করা হইল। পরবর্ত্তিকালে বহুলোক তাহার পুণ্য সমাধিক্ষেত্রে নতজানু হইয়া বসিবে, তাহার কথা মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিবে, এই উদ্দেশ্যে সেই স্থানে একটি উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

বিওয়লফ্ ছাড়াও অনুরূপ ছন্দে বহু কবিতা রচিত হইয়াছে। Widsith অথবা

Traveller's Song চতুর্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল। The Battle of Finnsburgও এই সময়ে রচিত হয়। উত্তর ফ্রিজিয়ান্‌দের (Frisians) রাজা কি করিয়া ডেন্‌দের রাজা Hraef কে হত্যা করে, তাহার বিবরণ এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই দুইখানি বইএর পাণ্ডুলিপিতেই একাদশ শতাব্দীর তারিখ পাওয়া যায়। সুতরাং এই দুইটি কবিতাতে যে বহু প্রক্ষিপ্ত ঘটনার সমাবেশ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

তারপর ইংরাজ জাতি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিল—ল্যাটিন হইল তাহাদের সাহিত্যিক ভাষা। বিহার যেমন বৌদ্ধদের বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র হইয়াছিল, খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বীদেরও এবি ও মনাষ্টেরি (Monastery) বিদ্যাশিক্ষার একমাত্র কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল। তখনকার দিনে এক ধর্ম্মযাজক ছাড়া অন্য কেহ লেখাপড়া জানিত না। ৬৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬৮০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সেন্ট হিল্‌ডা প্রতিষ্ঠিত হুইটবির মঠে (Whitby Monastery তে) কেড্‌মন্ (Caedmon) সর্ব্বপ্রথম তাঁহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলখানিকে এংলো সাক্‌সন অথবা প্রাচীন ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ করেন। তখনকার দিনে এংলো স্যাক্‌সন অথবা প্রাচীন ইংরাজীই ছিল ঐ দেশের ভাষা। কোন কোন সমালোচকের মতে কেড্‌মনের আবির্ভাব আরো অনেক পরে হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন ঐতিহাসিক Bede-এর লেখাতে আমরা কেড্‌মনের উল্লেখ দেখিতে পাই নাই।

কেড্‌মনের লেখা সম্বন্ধে বেশ একটি উপাদেয় গল্প প্রচলিত আছে। কেড্‌মন্ হিল্‌ডার মঠে সামান্য গোপালকের কাজ করিতেন। একদিন রাত্রিতে তিনি আস্তাবলে শুইয়া আছেন, এমন সময়ে ভগবানের বাণী তিনি শুনিতে পাইলেন—"কেড্‌মন্, তুমি আমাকে একটি গান শুনাও।" কেড্‌মন্ তাঁহার অক্ষমতার কথা জানাইলেন কিন্তু তবু সেই বাণী অনুরোধ করিতে লাগিল। অবশেষে কেড্‌মন জিজ্ঞাসা করিলেন, কি গান তিনি গাহিবেন। উত্তর হইল, "এই পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব এবং ভগবান কেমন করিয়া ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই গান তুমি গাও।" কেড্‌মন গান করিতে লাগিলেন—অপূর্ব্ব সুন্দর ভাবরাশি মধুর শব্দের ঝঙ্কার তুলিয়া তাঁহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল। ঘুম তাঁহার ভাঙ্গিয়া গেল কিন্তু সে সুরের রেশ তখনো ভাঙ্গিল না, গানের কথাগুলিও তিনি ভুলিলেন না। মঠের প্রধান কর্ম্মচারীকে তিনি অবিকল গানের কথাগুলি বলিয়া গেলেন। কর্ম্মচারীটি তখন তাহাদের অধ্যক্ষ সেন্ট হিল্‌ডার কাছে তাঁহাকে লইয়া গেল।

তারপর কেড্‌মনের শিক্ষা আরম্ভ হইল। তিনি বাইবেল পড়িয়া ফেলিলেন এবং বাইবেলের গল্প লইয়া সুন্দর সুন্দর কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। এমনি একটি অত্যাশ্চর্য্য গল্প কেড্‌মনের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া আছে।

এংলো স্যাক্‌সন সাহিত্যের কথা বলিতে গেলে আর যাহার কথা স্বভাবতঃই মনে উদিত হয়, তাহার নাম Cynewulf। Exeter Book নামক প্রাচীন ইংরাজী কবিতার চয়নিকাতে আমরা যে-সব এংলো স্যাক্‌সন Riddles (হেঁয়ালী) দেখিতে পাই, সেগুলির অনেকগুলিই নাকি ইহারই রচিত। ইহা ছাড়া (১) Juliana (২) Christ (৩) The Fates of the Apostles এবং (৪) Elene এই চারিটি কবিতাতে তাঁহার নাম পাওয়া গিয়াছে।

১০৬৬ খৃষ্টাব্দে নর্ম্মাণগণ (Normans) ইংল্যাণ্ড জয় করে। এই নর্ম্মাণদের প্রভাবে ইংরাজী ভাষায় এক ঘোরতর পরিবর্ত্তন

উপস্থিত হয়। কিছু সময়ের জন্য ইংল্যাণ্ড দুই ভাষা-ভাষী হইয়া উঠে। এসম্বন্ধে একটি অতি মনোরম বিবরণ আমরা পাই স্কটের Ivanhoe-তে। Saxon Churl-এর মুখে স্কট আমাদিগকে তাহা শুনাইয়াছেন। এখন হইতে ইংরাজী সাহিত্যের যে নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইবে, তাহার নাম এংলো নর্ম্মাণ। এ যুগের সাহিত্যে আমরা দেখিতে পাই কবিতার ছন্দে রচিত ঐতিহাসিক বিবরণ এবং রোমান্স—কিন্তু সবই ফরাসী ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। ইহারই কিছু পরে পাই অর্দ্ধ স্যাক্সন কবিতা। তাহাদের বেশীর ভাগই ফরাসী হইতে অনূদিত। মৌলিক যে একেবারে কিছুই ছিল না, তা নয় কিন্তু তাহাদের সংখ্যা খুবই অল্প। এই সময়ে New Testament-এর উপদেশাবলী লইয়া কতকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক কবিতা রচিত হয়। তাহাদের নাম Ormulum। এই Ormulum ও Song of Canute ব্যতীত এযুগে অন্য কোন উল্লেখযোগ্য বই এর নাম পাওয়া যায় না। ১২৫০ খৃষ্টাব্দে এই যুগের শেষ হয়।

১২৫০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে প্রাচীন ইংরাজী সাহিত্যের যে নমুনা আমরা পাই, তাহার মধ্যে Chronicles of Robert of Gloucestor নামক কাব্যখানিই সবিশেষ প্রসিদ্ধ। সেই আদিম যুগের উপকথায় ব্রিটেন হইতে তৃতীয় হেন্‌রীর রাজত্বকাল অবধি যত প্রসিদ্ধ ঘটনা ঘটিয়াছে, তাহারই ঐতিহাসিক বিবরণ এই বইখানিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই রকম ধরণের আর একখানি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন Robert Mannyng or Robert Brunne। ইহা ছাড়া এই সময় আরও অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা রচিত হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের বেশীর ভাগই ফরাসী রোমাঞ্চকর গল্প প্রভৃতি হইতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। অনেক সুন্দর সুন্দর কবিতা (Ballads) এবং গান এই সময় রচিত হয়। কে ভাল গান করিতে পারে—পেচক না নাইটিঙ্গেল? তাহাদের এই বিবাদের বিষয়-বস্তু অবলম্বন করিয়া একটি অতি মনোরম কবিতা রচিত হইয়াছে—তাহার নাম "The Owl and the Nightingale"। সে যুগের কাব্য-সাহিত্যে এই কবিতাটি একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছে।

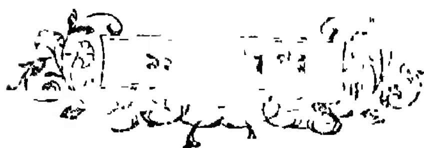
Havelock, Sir Tritram, Sir Gawayne, William of Palerne, Amis and Amiloren, King Horne, Richard Coeur de Lion প্রভৃতি গীতিকাগুলি (Ballads) সে যুগে সর্ব্বাপেক্ষা জনপ্রিয় এবং সুপরিচিত ছিল। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে প্রথমতঃ আমরা ইংরাজী ভাষায় Metrice Romance দেখিতে পাই।

পরবর্ত্তী সংখ্যায় আমি তোমাদিগকে চশারের (Chaucer) কথা বলিব। ইংরাজী ভাষায় তিনিই আদিযুগের শ্রেষ্ঠ কবি। যে ইংরাজী ভাষার সহিত আজ আমরা পরিচিত, তাহার সঙ্গে সব মিল না থাকিলেও চশারের ইংরাজীর সঙ্গে বর্ত্তমানের ইংরাজীর যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।






সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা



নিজের ব্যক্তিত্বের সহিত যখনই রাষ্ট্রের সংহত শক্তির সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছে, তখনই মানুষ তার নিজকে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে। এই ব্যগ্রতা খুবই তীব্রভাবে ফুটিয়া ওঠে তখন, যখন রাষ্ট্রের পরিচালনায় তার বিন্দুমাত্রও অধিকার থাকে না। রাষ্ট্রগঠন এবং শাসনের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যের খানিকটা অংশ দিবার জন্য সে ব্যাকুল হইয়া পড়ে, এবং সেখানে বাধা পাইলেই সে রুদ্রমূর্ত্তিতে তার নিজের অধিকার ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে। সে তখন বলে, মানুষে মানুষে কোন ভেদ নাই, এক দেশের মানুষের সহিত আর এক দেশের মানুষের মিত্রতা অবশ্যম্ভাবী, এবং নিজের স্বাতন্ত্র্য স্বাধীনভাবে প্রকাশ করায় মানুষের জন্মগত অধিকার। সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার বাণী সে উদাত্ত কণ্ঠে জগতের সম্মুখে ঘোষণা করিতে আরম্ভ করে।

আজকাল পৃথিবীতে খুব কম লোকই আছে—যাহারা সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার নাম শুনিয়াই শিহরিয়া উঠিবে। কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন স্বাধীনতার লীলাভূমি ইউরোপেও বড় বড় মনীষীরা মানুষের এই অধিকারের দাবীতে বিচলিত হইয়া পড়িতেন—তাঁহারা ইহার মধ্যে দেখিতেন, রাষ্ট্রের বিনাশের সূচনায় প্রলয়ের আগমনী। এই বিচলিত হওয়াটা যে একেবারে অহেতুক ছিল, এমন নয়; কারণ, মানুষের এই তিনটি অধিকারের দাবী সকলের আগে খুব স্পষ্টভাবে করা হয় একটি বিপ্লবের প্রারম্ভে—১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরাজ্যকে কেন্দ্র করিয়া যে দাবানল জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহারই সূচনায়।

ফরাসী বিপ্লবের বিপ্লবীরাই সর্ব্বপ্রথমে জোর গলায় সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার দাবী করেন এবং ইহার বাণী সারা পৃথিবীতে প্রচার করেন। এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার দাবী ত মানুষই করিতে পারে, তবে বিশেষ করিয়া ফরাসীদেশে ইহার প্রথম স্ফূর্ত্তি এবং বিকাশ হইল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে আমাদের পর্য্যালোচনা করা দরকার, বিপ্লবের পূর্ব্বে সে-দেশের ব্যক্তিগত, সমাজগত এবং রাষ্ট্রগত অবস্থাগুলি।

বিপ্লবের আগে ফরাসীদেশে সাম্য, মৈত্রী বা স্বাধীনতার অস্তিত্বমাত্র ছিল না, বলিলেও চলে। সমাজ ছিল বহুধাবিভক্ত এবং বড় বড় লর্ড মার্কুইস সমাজের ষোল আনা সুযোগ ও সুবিধা উপভোগ করিতেন, আর যাহারা নিম্নস্তরের, তাহারা কোনপ্রকারে তাহাদের দিনপাত করিত। বংশমর্য্যাদায় বা ধনগৌরবে যাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগকে কোনপ্রকার কর বা রাজস্ব দিতে হইত না। রাষ্ট্রের প্রায় সমস্ত অর্থ আসিত নিম্নস্তরের লোকদের নিকট হইতে। মৈত্রীর চিহ্নমাত্র ফরাসীদেশে ছিল না। সারা দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিভাগে বিভক্ত ছিল এবং তাহার এক অংশের সহিত আর এক অংশের সংযোগ এবং সম্বন্ধ ছিল খুবই ক্ষীণ। এক



বিভাগ হইতে অন্য বিভাগে যাইতে হইলে অন্ততঃ পক্ষে পঞ্চাশ রকমের বাধা সম্মুখে পড়িত এবং তাহার ফল হইয়াছিল এই যে, ফরাসীদেশের লোকেরা একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছিল যে, তাহারা একই জাতি—তাহাদের সুখ দুঃখ পরস্পরের সহিত নিবিড়ভাবে জড়িত। সাম্য এবং মৈত্রীর যেখানে এতখানি অভাব, সেখানে স্বাধীনতা যে ছিল না, তাহা বলা বাহুল্য। রাজা ছিলেন স্বেচ্ছাচারী—তাঁহার স্বৈরাচারিতায় বাধা দিবার শক্তি ছিল না কাহারও। পার্লামেণ্ট একটা ছিল ফরাসী-দেশে—তাহাকে বলিত ষ্টেট্‌স্‌-জেনারেল (States General) কিন্তু তাহার অস্তিত্ব ছিল শুধু নামে।



মণ্টেস্ক (Montesquieu)

এক শত বছরেরও বেশী হইয়া গিয়াছিল, তবু রাজা একবারটি তাহা আহ্বান করেন নাই, কারণ যদিও ষ্টেট্‌স জেনারেলের মধ্যে জনসাধারণের কোন প্রতিনিধি ছিলেন না, তবু সেখানে জমিদার ও লর্ডরা আসিয়া রাজার যথেচ্ছ শাসনের অন্তরায় হইতে পারেন, এই সম্ভাবনাটুকু ছিল। ফল হইয়াছিল এই যে, রাজার প্রিয় কয়েকজন অনুচরের হাতে শাসনবিভাগের সব কাজ ন্যস্ত থাকিত। তাহারা নানাভাবে দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিত, কিন্তু প্রতিকারের কোন উপায়ই ছিল না। কারণে অকারণে কারাবাস বরণ করা ফরাসীদেশের সাধারণ নিয়ম হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, প্রতিবাদ বা অভিযোগ করার কোন পন্থা ছিল না, কারণ শাসনযন্ত্র এবং বিচারবিভাগ সমস্তই ছিল স্বেচ্ছাচারী রাজার অনুগত।

এইপ্রকার অসাম্য এবং অত্যাচার ইউরোপের অন্যান্য দেশেও ছিল, কিন্তু বিপ্লবটা ফরাসীদেশে সুরু হইল প্রধানতঃ দুই কারণে। প্রথমতঃ, ফরাসীদেশের রাজা স্বেচ্ছাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু আসলে তাঁহার ব্যক্তিত্ব এবং সাহস ছিল খুবই কম। তাই দেশের লোকে যখন একবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল, তখন তাসের ঘরের মত স্বেচ্ছাচার রাষ্ট্রটি এক নিমেষে ধূলিসাৎ হইয়া গেল।…দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লবের আগে ফরাসীদেশে এমন কয়েকজন দার্শনিকের উদ্ভব হইয়াছিল, যাহাদের অগ্নিমন্ত্রে সেখানে কয়েকজন উৎসাহী নেতার সৃষ্টি হইয়াছিল এবং তাহাদের নেতৃত্বে বিপ্লবটি সম্পূর্ণতালাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

ষোড়শ লুই (Louis XVI) তখন ফরাসী দেশের সিংহাসনে। শতবর্ষব্যাপী অত্যাচার ও অসাম্যের বোঝায় দেশের লোক প্রপীড়িত হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে ফরাসীদেশের মধ্যেই কয়েকজন লেখক এবং মনীষীর অভ্যুদয় হইয়াছিল, দেশব্যাপী উৎপীড়ন এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে মতবাদের বাণী লইয়া। তাঁহাদের মধ্যে দুইজনের নামই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ, তাঁহাদের আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হইয়া ফরাসীদেশের জনসাধারণ সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়াছিল।

প্রথম মনীষীর নাম মণ্টেস্ক (Montesquieu)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (আনুমানিক ১৭৩০ খৃষ্টাব্দে) তিনি একবার গিয়াছিলেন ইংলণ্ডে। ফরাসীরাজতন্ত্রের একই অধিনায়কের করতলগত স্বেচ্ছাচারিতার পাশে ইংলণ্ডে রাজতন্ত্রের সংযমশীলতা এবং ক্ষমতা বিভাগ (Separation of Powers) তাঁহার কাছে এমন অভূতপূর্ব্ব বলিয়া বোধ হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার সুবিখ্যাত "Spirit of the Laws" (Esprit des Lois) গ্রন্থে ইংলণ্ডের রাষ্ট্রনীতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর এবং সুষ্ঠু বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। মানুষের স্বাধীনতা এবং সাম্য রক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হয় তখনই, যখন একই ব্যক্তি বা সমষ্টির মধ্যে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিবদ্ধ থাকে না, এই ছিল তাঁহার মূলনীতি।

মণ্টেস্কু ফরাসী রাষ্ট্রতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করিলেও মানুষের সাধারণ রাষ্ট্রিক দাবী (fundamental rights) সম্বন্ধে প্রায় কিছুই বলেন নাই, বলিলেও চলে। এবিষয়ে ফরাসী-বিপ্লবের ভাবধারার অগ্রগামী পুরোধা হইয়াছিলেন সুবিখ্যাত রুশো (Rousseau)। মণ্টেস্কু ছিলেন শান্ত এবং সমাহিতচিত্ত— ধীরে ধীরে শাসনযন্ত্রের পরিবর্ত্তন সাধন করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য। কিন্তু রুশো ছিলেন অগ্নিমন্ত্রের পূজারী তাঁহার স্বপ্ন ছিল সমাজ এবং রাষ্ট্রের তদানীন্তন ব্যবস্থার মূলোৎপাটন করিয়া নূতন ধরণের সমাজ এবং রাষ্ট্র স্থাপন, যাহার ভিত্তি গড়িয়া উঠিবে সাধারণ মানুষের অব্যাহত সম্মতিতে (free will), এবং যাহার শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রিত হইবে মানুষের স্বাভাবিক নিয়মানুবর্ত্তিতায়। রুশোর জীবন-কথা উপন্যাসের কাহিনীর চেয়েও বিচিত্র এবং বিস্ময়োৎপাদক, তাঁহার নিজের সারাটি জীবনের প্রায় সবটুকুই অতিবাহিত হইয়াছিল লাম্যমাণের মত দেশবিদেশ পর্য্যটনে। তাঁহার লিখিবার ভঙ্গী ছিল তীব্র অথচ উচ্ছ্বসিত, কল্পনাপূর্ণ অথচ সাধারণ মানুষের পক্ষে বোধগম্য। তাই তাঁহার নাম ফরাসী-বিপ্লবের বহুবৎসর পূর্ব্বেই দেশবিদেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের জন্ম হইতেছে স্বাধীনতায়, অথচ সমাজ বা রাষ্ট্রে সর্ব্বত্রই সে কোন না কোন প্রচণ্ড শক্তির সম্মুখে মাথা নত করিয়া থাকিতে বাধ্য হয়, এই ছিল তাঁহার প্রধান বক্তব্য। রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে মানুষ ছিল সুখে, স্বাধীনতায়, শান্তিতে, সেই থাকাটাই ছিল তাহার পক্ষে স্বাভাবিক। তবু তাহাকে সেই স্বাধীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য বিসর্জ্জন দিতে হইল, কারণ সে দেখিল, রাষ্ট্রের অভাবে তাহার ব্যক্তিত্ববিকাশের অনেকখানিই অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া সে রাষ্ট্রের কাছে নিজের জন্মগত স্বাতন্ত্র্য একেবারে বলি দিতে রাজী হইল না। সে বলিল, আমরা নিজেরাই রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিব—রাষ্ট্রের শক্তি হইবে আমাদের সম্মিলিত ইচ্ছার প্রতিভূ এবং প্রতীক। এইভাবে যে রাষ্ট্রের উদ্ভব হইল, তাহাতে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা এবং সাম্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রহিল, অথচ রাষ্ট্রের মধ্য দিয়া তাহার নিজের বিশিষ্ট বৃত্তিগুলি বিকাশের পথও রুদ্ধ হইল না।

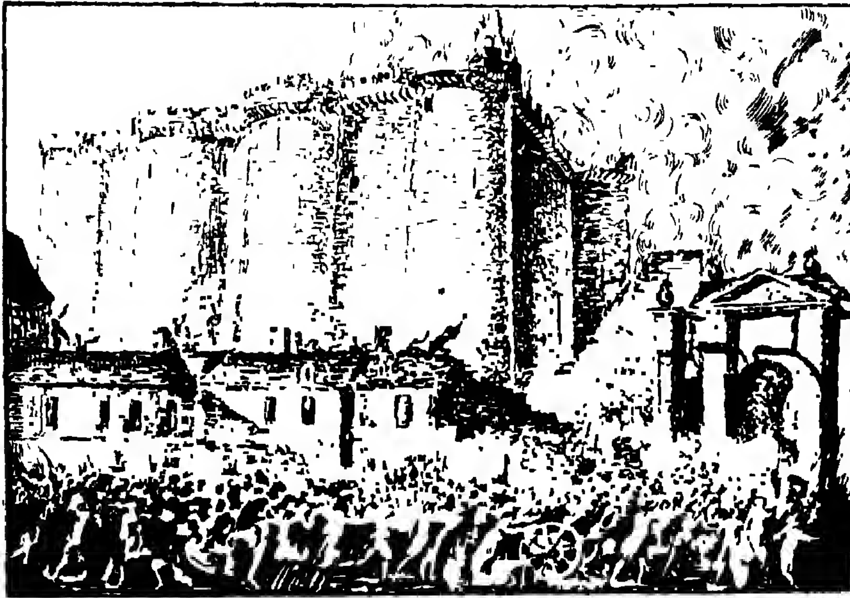
রুশোর এই আদর্শবাদের মধ্যে গলদ ছিল অনেকখানি, কিন্তু ইহার ছত্রে ছত্রে মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রতি শ্রদ্ধার যে ভাবটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহা অত্যাচার প্রপীড়িত জনসাধারণকে প্রচণ্ড এক শক্তিতে মুগ্ধ এবং উৎসাহিত করিয়া তুলিল। মণ্টেস্কু এবং রুশো দু'জনেই বিপ্লব শুরু হইবার পূর্ব্বেই পরলোকগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের আদর্শবাদের তীব্রতা অনেক পূর্ব্ব হইতেই জনসাধারণকে প্রচ্ছন্নবিপ্লবী করিয়া তুলিয়াছিল। মণ্টেস্কু-এর চিন্তাধারায় ফরাসী স্বেচ্ছাচারিতার রাষ্ট্রনৈতিক ভিত্তি গড়িয়া উঠিয়াছিল মাত্র, কিন্তু রুশোর



রুশো (Rousseau)

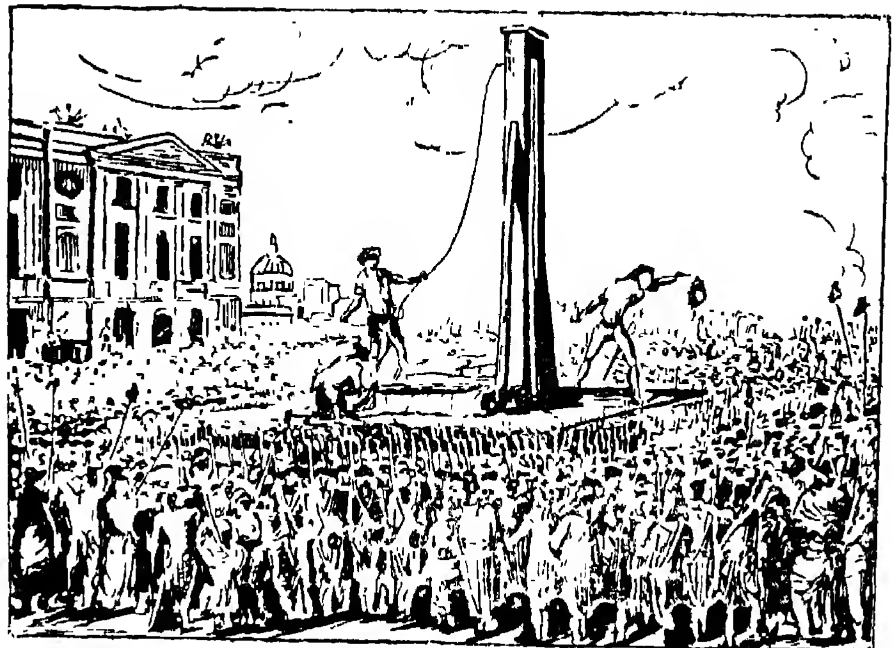
অগ্নিমন্ত্রে সেই স্বেচ্ছাতন্ত্রের নৈতিক এবং মানসিকযুক্তি একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ফরাসী-বিপ্লবের বহ্নি যখন জ্বলিয়া উঠিল, তখন রুশোর বাণী হইল জনসাধারণের মন্ত্র। মানুষের সাম্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় মানুষের জন্মগত অধিকার এবং রাজনীতি-

সাম্যের শ্রেষ্ঠতাই হইল বিপ্লবীদের প্রতিপাদ্য বিষয়।



ফরাসী বিপ্লবীদের দ্বারা বেস্‌টাইল দুর্গ আক্রমণ

কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, যে মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিপ্লবীরা স্বেচ্ছাতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করিল, নূতন রাষ্ট্র সংগঠনকালে তাহারা সেই আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। তাহারা যে নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থার সৃষ্টি করিল, তাহার মধ্যে সাম্য হয়ত খানিকটা ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা বা মৈত্রীর চিহ্ন তাহার মধ্যে ছিল না, বলিলেও চলে। রাজার স্বৈরাচারের স্থলে আসিল বিপ্লবীদের স্বৈরাচার—তাহার বিরুদ্ধে যাহারাই প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল, তাহারাই দেশ হইতে বিতাড়িত বা গিলোটিন যন্ত্রে (Guillotine) নিহত হইল। সারা ফরাসীদেশ ব্যাপিয়া এক বিভীষিকার যুগ আরম্ভ হইল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই বিপ্লবীরা যুদ্ধ ঘোষণা করিল সমস্ত ইউরোপের বিরুদ্ধে। যে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার দোহাই দিয়া তাহারা রাজা ষোড়শ লুই এবং রাণী মারী আঁতোয়ানেতকে (Marie Antoinette) গিলোটিনের মুখে পাঠাইয়াছিল, তাহার কথা সম্পূর্ণ ভাবে ভুলিয়া গিয়া তাহারা নিজেদের সমাজব্যবস্থা এবং রাষ্ট্রনীতি প্রয়োগ করিতে চাহিল অন্য দেশের লোকের উপর।



গিলোটিনে প্রাণদণ্ড

বিপ্লবীদের সহিত বাহিরের দেশ এবং রাষ্ট্রসমূহের সংঘর্ষ যখন শেষ হইয়া গেল, তখন কিন্তু সকলের মন চলিয়া গেল আবার সেই পুরাতন আদর্শবাদের দিকে। যে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার মন্ত্রে বিপ্লবীরা প্রথমে

উদ্বুদ্ধ হইয়াছিল, লোকে তাহার কথাই বেশী করিয়া ভাবিতে সুরু করিল, এবং সকলেরই লক্ষ্য হইল, কি করিয়া রাষ্ট্র এবং সমাজে সেই আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত করা যায়। ফরাসী বিপ্লবে আর কিছু ফল হউক না হউক, পুরাতনের প্রতি অন্ধ এবং অহেতুক শ্রদ্ধার ভাবটা কাটিয়া গিয়াছিল— লোকে সাহস করিয়া নূতন মন্ত্রে দীক্ষা লইতে সুরু করিয়াছিল—লোকে অবশ্য বুঝিয়াছিল যে, সাধারণের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠিত না হইলে মৈত্রী বা স্বাধীনতা আসিবে না এবং স্বাধীনতা না পাইলে প্রকৃত সাম্যের সৃষ্টি হইবে না। সারা উনবিংশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী ইতিহাস এই সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতাকে সর্বভাবে অর্জন করিবার প্রচেষ্টার এক বিচিত্র কাহিনী।

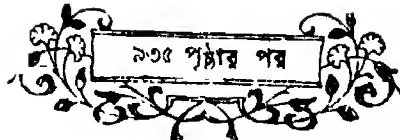
তাই ইহার পর যখনই কোন নূতন রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হইয়াছে, তখনই মনীষী এবং রাষ্ট্রবিদ্গণ চেষ্টা করিয়াছেন ফরাসী বিপ্লবীদের এই মন্ত্রগুলিকে নিজেদের রাষ্ট্রব্যবস্থার মধ্যে সংবদ্ধ করিতে। মানুষের যে কতকগুলি মৌলিক অধিকার আছে, তাহা ফরাসী-বিপ্লবীরাই প্রথমে জোর গলায় প্রচার করিয়াছিল। তাহাদেরই দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের স্থাপয়িতৃগণ তাঁহাদের রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় সেই অধিকারগুলি বিশেষভাবে নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে যখনই কোন দেশে কোন নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তখনই, এই সমস্ত অধিকারের একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা তাহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। আমাদের দেশে এখন নূতন রাষ্ট্র ব্যবস্থা তৈরী করার কথা হইতেছে, এবং এই আদর্শেই অনুপ্রাণিত হইয়া অনেক নেতা চাহিতেছেন, যেন এই সমস্ত মৌলিক অধিকারের উল্লেখ সেখানে থাকে। রাষ্ট্র-ব্যবস্থার মধ্যে এই উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা কতখানি, সে সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিতে পারে কিন্তু এই দাবীর পশ্চাতে যে ফরাসী-বিপ্লবীদের মন্ত্রের প্রেরণা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না।

সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় কোন রাষ্ট্রেই এ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় নাই—হয়ত সেটা সম্ভবপরও নয়। কিন্তু রাষ্ট্রিক অধিকারে (civil rights) যে সকল মানুষের সমান দাবী, ইহা আজ সর্ব্ববাদিসম্মত। ঠিক তেমনই, নানাদেশের লোকের মধ্যে আচার, ধর্ম্ম, রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ে অনেক তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে প্রধানতঃ মানুষ এবং তাহাদের মৈত্রীর সম্ভাবনা আকাশকুসুম নয়, একথাও সকল চিন্তাশীল ব্যক্তিই আজকাল স্বীকার করেন। আর স্বাধীনতা ব্যাপারে যে মানুষের চিরন্তন অধিকার, তাহাও সকলেই আজ মানিতে বাধ্য, কারণ রাষ্ট্র হইতেছে প্রধানতঃ মানুষের ব্যক্তিত্ববিকাশের জন্য, মানুষ রাষ্ট্রের জন্য নয়।

সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতার এই আদর্শ যে সর্ব্বতোভাবে সত্য এবং কাম্য এমন কথা বলা চলে না। এই আদর্শের পিছনে আছে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যের প্রতি একটি অহেতুক বিশ্বাস এবং শ্রদ্ধার ভাব, কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যই মানুষের সবটুকু নয়। মানুষের মৌলিক অধিকার যাহাই থাকুক না কেন, রাষ্ট্রের সহিত সংঘাতে সেই অধিকার খানিকটা খর্ব্ব হইতে বাধ্য, রাষ্ট্রের উন্নতিকল্পে অনেক সময় তাহাকে অসাম্য এবং অধীনতাও বরণ করিয়া লইতে হয়। শুধু তাই নয়—মানুষ দার্শনিকতাপূর্ণ দাবীগুলি অনেক সময়েই কার্য্যে পরিণত করিতে পারে না, কারণ মানসিক দুর্ব্বলতা তাহার রন্ধ্রে রন্ধ্রে। বাহিরের অসাম্য, পরাধীনতা এবং অমৈত্রীর বন্ধন হইতে মুক্তি-লাভ করিয়াও সে সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা পূর্ণভাবে উপভোগ করিতে পারে না, কারণ তাহার অন্তর্নিহিত বৈষম্য এবং বিভেদ অনেক সময়েই নূতন রকমের অসাম্যের সৃষ্টি করে। ধনি-নির্ধনের বিভেদ দূর হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ নির্ব্বুদ্ধির বিভেদ বাহিরের অস্ত্রোপচারে দূরীভূত হয় না। ফরাসীদেশের বিপ্লবীরা বাহিরের অসাম্য এবং পরাধীনতার মূলোচ্ছেদ করিয়াছিল, কিন্তু অচিরেই তাহার স্থলে নূতন ধরণের বিভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার বাণীর মধ্যে আগুন আছে অনেকখানি, কিন্তু মানুষের চিরাগত ভেদবুদ্ধি এবং ভেদব্যবহারের ফলে সেই আদর্শ কখনই স্থায়ীভাবে এবং সম্পূর্ণরূপে রাষ্ট্র এবং সমাজ ব্যবস্থায় প্রকাশিত হইতে পারে না।



ফিনিশীয়া


৯৩৫ পৃষ্ঠার পর

মানব সভ্যতার ইতিহাসে ফিনিশীয় জাতির স্থান অনেক উচ্চে। ইউরোপ তাহাদের নিকট বিশেষ ঋণী। প্রাচীন ইউরোপের বর্ণমালা ফিনীশিয়দের দান। তাহাদের



ফিনিশীয়দের খৃঃ পূঃ নবম শতাব্দীর বাণিজ্য-জাহাজ

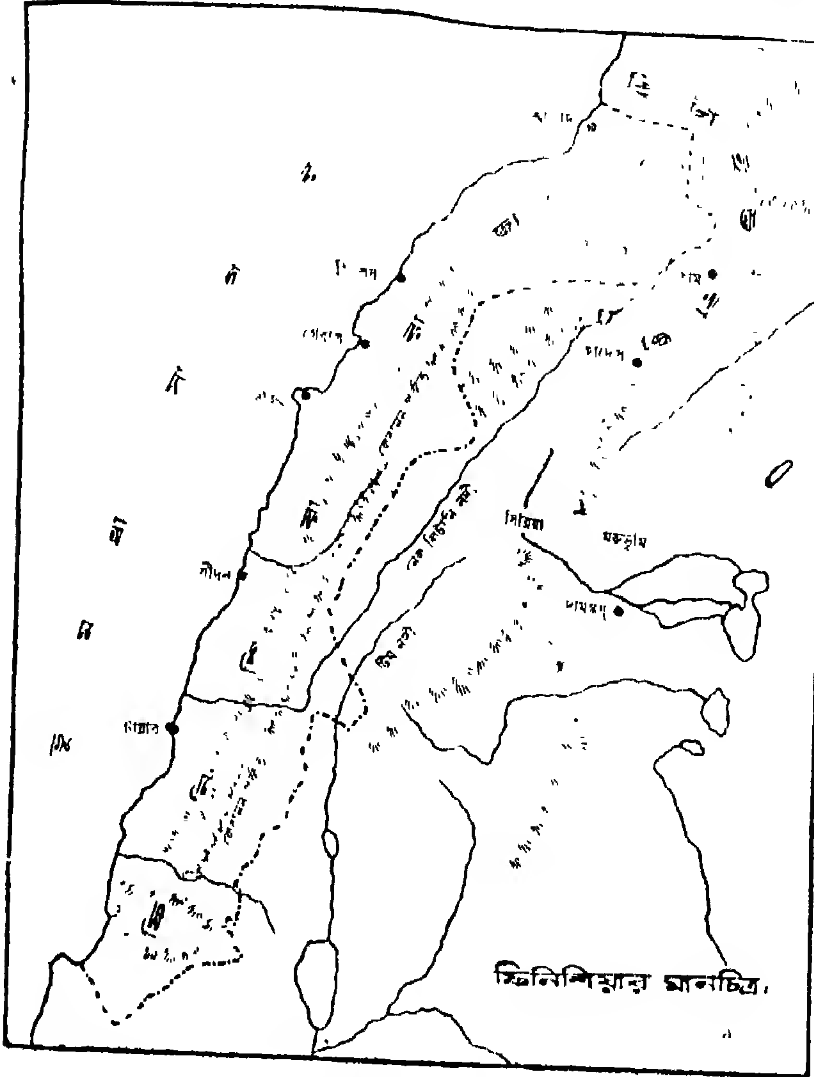
নিকট হইতেই গ্রীকেরা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছিল। এই হিসাবে ফিনিশীয়েরা গ্রীকদের ও বর্তমান ইউরোপীয়দের গুরু। কিন্তু ইহাই তাহাদের একমাত্র কৃতিত্বের পরিচয় নহে। প্রাচীন জগতে নাবিক ও সওদাগর বলিতে ফিনিশীয়দের বুঝাইত। বিভিন্ন মানব-সম্প্রদায়ের মধ্যে সভ্যতার আদান-প্রদানের ব্যবসায়ের প্রচলনে তাহারাই ছিল পথ-প্রদর্শক। এক কথায়, তাহাদিগকে আদিম বণিক সম্প্রদায় বলা যাইতে পারে। সেকালে ভূমধ্যসাগরের ব্যবসায় তাহাদেরই একচেটিয়া ছিল। মিশর, গ্রীস, ইটালী, স্পেন, এশিয়া মাইনর, প্যালেষ্টাইন্ প্রভৃতি দেশে তাহারাই বহির্বাণিজ্য চালাইত। ইহা ছাড়া তাহারা যে লাল রং তৈয়ারী করিত, তাহার আদর সর্ব্বত্রই ছিল। নৌবিদ্যায়ও তাহারা বিশেষ পারদর্শী ছিল। নৌবলে তাহাদের সমকক্ষ কেহই ছিল না। তাহাদের বাণিজ্যপোত ও সামরিক জাহাজগুলি সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ ছিল। নাবিক হিসাবেও তাহারা অদ্বিতীয় ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সাগরই ছিল তাহাদের বাসস্থান ও বিচরণ ক্ষেত্র।

এই যে জাতি সেকালে সমুদ্রের উপর এতটা আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ইহার কারণ বুঝিতে হইলে তাহাদের দেশের ভৌগোলিক অবস্থান



ফিনিশীয়দের অধিকৃত সার্দিনীয়া দ্বীপের মধ্যস্থ নোরার দৃশ্য। ফিনিশীয়দের সময়ে এই উপদ্বীপের চারিদিক প্রাচীরবেষ্টিত ছিল। মধ্যে পাহারা দিবার জন্য একটি উচ্চ স্তম্ভ ছিল। এখানে একটি মন্দির ও দুইটি সমাধি-স্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ও প্রাকৃতিক অবস্থা জানা দরকার। সিরিয়া মরুভূমির পশ্চিমে অবস্থিত লেবানন (Lebanon) পর্ব্বত শ্রেণী ও ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূলের মধ্যবর্ত্তী সঙ্কীর্ণ পার্ব্বত্য দেশকে ফিনিশীয়া বলা হইত। এই দেশটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১২৫ মাইল কিন্তু প্রস্থে সাধারণতঃ ১২ মাইলের অধিক নহে। সুতরাং, এদেশের লোকসংখ্যা যখন বাড়িতে আরম্ভ করিল, তখন আহার-সংস্থানের জন্য তাহাদের বিশেষ অসুবিধা উপস্থিত হইল। লেবানন্ পর্ব্বতের ওপারে সিরিয়া মরুভূমির দিকে অগ্রসর হইয়া কোন লাভ নাই, বোধ হয় তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। কাজেই, তাহারা নিরুপায় হইয়াই সাগরের বুকের উপরেই আশ্রয় লইল। জীবিকানির্ব্বাহের প্রধান উপায় হইল বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য। এক দেশের মাল লইয়া তাহারা অন্যদেশে বিক্রয় করিত, এবং সেখানকার স্থানীয় পণ্যদ্রব্য লইয়া আবার তাহারা ভিন্নদেশে উপস্থিত হইত। এইরূপে সমগ্র ভূমধ্যসাগর ও পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য তাহাদের হাতে আসিয়া পড়ে। জলপথে বাণিজ্য চালাইবার জন্য তাহাদের বাণিজ্যপোতের প্রয়োজন। প্রকৃতি কিন্তু এই বিষয়ে তাহাদের প্রতি সদয় ছিল। কারণ, লেবানন পর্ব্বতের গায়ে প্রচুর পরিমাণে সিডার (Ceder) বৃক্ষ জন্মায়; ইহার কাষ্ঠ জাহাজ নির্ম্মাণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী। সুতরাং জাহাজ নির্ম্মাণে ও নৌবিদ্যায় পারদর্শী হইতে তাহাদের বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। আর যাহারা শৈশবকাল হইতেই এক প্রকার সমুদ্রের ক্রোড়েই মানুষ হইয়াছে, তাহারা যে অসমসাহসী ও কৌশলী নাবিক হইবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

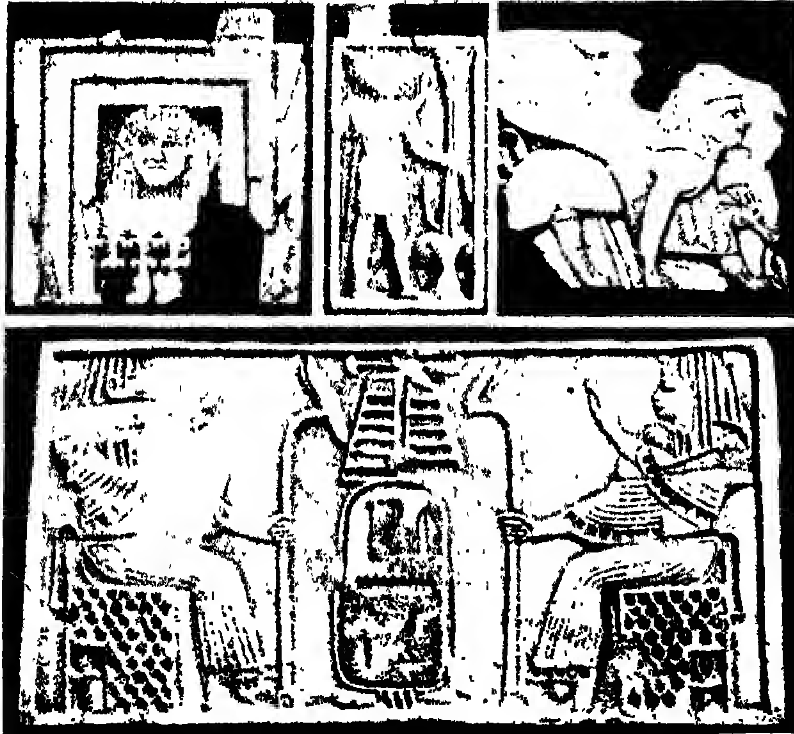


ফিনিশীয়ার মানচিত্র

এখন প্রশ্ন হইতেছে, ফিনিশীয়েরা কোন্ জাতীয় লোক? কোথা হইতে তাহারা আসিল? এই প্রশ্নের উত্তরে ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, তাহারা একটি মিশ্রজাতি, এবং তাহাদের শরীরে প্রচুর পরিমাণে সেমেটিক্ রক্ত ছিল। ভাষা ও আচার ব্যবহারে তাহাদের সঙ্গে অন্যান্য সেমিটিক্ জাতীয় লোকদের বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহাদের কিংবদন্তী অনুসারে তাহারা পারস্য উপসাগরের কোন কূলবর্ত্তী দেশ হইতে আগমন করে। বোধ হয়, তাহাদের উৎপত্তি স্থান দক্ষিণ-পূর্ব্ব আরবদেশের কোন প্রদেশ। খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ পক্ষে ২০০০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা ফিনিশীয়া দেশে আসিয়া বসবাস করিতে

করে। তাহারা এখানে আসিবার পূর্ব্বে এই দেশে কোন জাতীয় লোক বাস করিত, সে বিষয়ে সঠিক রূপে কিছুই বলা যায় না। তবে তাহারা যে সুমেরিয়ান নহে, তাহা নিঃসন্দেহ। অনেকে মনে করেন যে, ইহারা ছিল ভূমধ্যসাগরের কূলবর্ত্তী দেশের আদিম অধিবাসী।

সেমেটিক জাতীয় লোকেরা যখন ফিনিশীয়া দেশ অধিকার করে, তখন তাহারা সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া আসে নাই। তাহারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দলে (tribe) বিভক্ত। এক একটি দল একটি সহর ও নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এখানে বলা দরকার যে এই সহরগুলি তাহারা স্থাপন করে নাই—এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীদের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়াছে মাত্র। তবে এই আদিম অধিবাসীদের সভ্যতা তাহারা কতটা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা এক প্রকার অসম্ভব। যাহা হউক এই বিভিন্ন দলগুলি কিন্তু মিলিত হইয়া একটি রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হয় নাই। তবে প্রয়োজনমত তাহারা পরস্পরের সঙ্গে সাময়িক ভাবে মিলিত হইয়া বিভিন্ন ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল।



এসিরিয়ার ভূগর্ভ হইতে প্রাপ্ত মিশরীয় শিল্পের নিদর্শন

এই সমস্ত ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে আর্ভাদ্ (Arvad), গেবাল্ (Gebal), বীরুৎ (Beirut), সাইদন (Sidon), ও টায়ার, (Tyre) ছিল সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধ। ফিনিশীয়া দেশের উত্তর-প্রান্তে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর আর্ভাদ্ সহরটি অবস্থিত ছিল। ইহার দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলে গেবাল্ অথবা বীবলস্ (Byblos) সহরটি। এখানকার প্রধান দেবতা ছিল বালাৎ (Ba'alat)। মিশরীয়েরা এই সহরটিকে কাপুস্ বলিত। আরও দক্ষিণে ছিল বীরুৎরাজ্য ও সহর। পরবর্ত্তিকালে ইহা গেবাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। ইহার দক্ষিণে একটি দ্বীপের উপরে ছিল সাইদন সহরটি। এই রাজ্যের প্রধান দেবতা ছিলেন আস্টার্ত (Astarte), এবং এইখানেই ছিল ফিনিশীয় জাতির পীঠস্থান। আর দক্ষিণ প্রান্তে ছিল বিশ্ববিশ্রুত টায়ার রাজ্য। সহরটি ছিল একটি দ্বীপের উপর। এখানকার স্থানীয় দেবতা ছিলেন মেলকার্ট (Melkart)। এই রাজ্য সকলের মধ্যে আবার টায়ার ও সাইদন ছিল সর্ব্বপ্রধান। কাজেই তাহারা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এবং অনেক সময়ে এক রাজ্য আর এক রাজ্যের অধীন ছিল। ফিনিশীয় রাজ্যগুলি এক একজন রাজার অধীন ছিল। তবে যতদূর মনে হয়, রাজাদের ক্ষমতা বড় বেশী ছিল না। রাজ্যের প্রকৃত শাসনভার ছিল ধনী অভিজাতবংশীয়দের হাতে। রাজারা ছিলেন অনেকটা সাক্ষীগোপাল।

ফিনিশীয়ার প্রাচীনতম ইতিহাস বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। আগাদের রাজা সার্গন নাকি ফিনিশীয়ার উপকূল পর্য্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্য বিস্তৃত করিয়াছিলেন (আনুমানিক ২৮০০ খৃঃ পূঃ)। যতদূর মনে হয়, সেমিটিক্ লোকেরা এই সময়ে এই দেশে আগমন করে নাই।

ফিনিশীয়া দেশের পূর্ব্বদিকে ছিল ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়া রাজ্য, আর দক্ষিণ-পশ্চিমে ছিল মিশর দেশ। কাজেই প্রথম হইতেই যে এই দেশের উপর তাহাদের চোখ পড়িবে, তাহাতে বিচিত্র কি? বিদেশী হিক্‌সস্‌দিগকে বিতাড়িত করিবার পর যখন মিশর রাজ্যের সাম্রাজ্য লিপ্সা জাগিয়া উঠে, তখন ফ্যারাওরা সিরিয়া-প্যালেষ্টাইন তাহাদের অধিকারভুক্ত করেন। সুতরাং ফিনিশীয়া মিশর সাম্রাজ্যের অংশ হইল। টেল্ এল্ আমার্ণায় প্রাপ্ত তৃতীয় ও চতুর্থ আমেন-হোটেপের সময়ের চিঠি-পত্রাদি হইতে তৎকালীন ফিনিশীয়ার বিষয় অনেক কিছু জানা গিয়াছে। এই সময়ে সেখানকার ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি শাসন করিতেন দেশীয় সামন্ত রাজারা। তাঁহারা ফ্যারাওয়ের প্রধানতা স্বীকার করিতেন এবং মাঝে মাঝে কর ও উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন। কোন মিশরীয় শাসনকর্ত্তা সেখানে নিযুক্ত হইত না। এই ক্ষুদ্র রাজারা সদা সর্ব্বদা পরস্পরের সহিত যুদ্ধবিগ্রহে রত থাকিতেন। ইহাতে ফ্যারাওয়েরা বিশেষ কোন বাধা দিতেন বলিয়া মনে হয় না, যদিও তাহারা অনবরত পরস্পরের বিরুদ্ধে সম্রাটের কাছে অভিযোগ করিতেন।

এই সময়ে আর্ভাদের রাজা ছিলেন আজিরু (Aziru) নামে একজন আমোরাইট (Amorite)। তিনি দক্ষিণদিকে রাজ্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করেন। গেবালের রাজা রিব্-আদ্দা (Rib-Adda) ফ্যারাও-য়ের সাহায্য ভিক্ষা করেন। আজিরুর বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযোগ, তিনি নাকি বিশ্বাসঘাতক, গোপনভাবে খেতা, মিতান্নি ও ব্যাবিলনের রাজাদের সঙ্গে যোগ দিয়া মিশরের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিতেছেন। ফ্যারাও কোনরূপ সাহায্য করিলেন না। কাজেই, আজিরু গেবাল নগর অবরোধ করিলে রিব-আদ্দা বৈরুতে সাহায্য প্রাপ্তির আশায় যান। এই অবসরে তাঁহার ভ্রাতা গেবালের সিংহাসন অধিকার করেন। আজিরুকে অবশ্য অবশেষে মিশর দরবারে উপস্থিত হইতে হয়। ফ্যারাও তাঁহাকে বন্দী করেন।

এই সময় বৈরুতের রাজা ছিলেন আম্মুনিরা। তিনি শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কাজেই, গেবাল ও আর্ভাদের সংঘর্ষে তিনি কোন পক্ষ লইলেন না। সীদনের রাজা জিম্রিদা (Zimrida) কিন্তু আজিরুর সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন। তবে তিনি নিজ রাজ্য বিস্তারের জন্য টায়ার আক্রমণ করেন। টায়ার রাজ্যের রাজা ছিলেন আবিমেলেক্ (Abimelech)। তিনিও ফ্যারাওয়ের সাহায্য ভিক্ষা করেন। জিম্রিদা টায়ার নগর অবরোধ করেন।

ইখ্‌নাটনের নিশ্চেষ্টতার ফলে এশিয়ায় মিশর-সাম্রাজ্যের সাময়িক অবসান ঘটে। ফিনিশীয়া এখন খেতার রাজা সুব্বিলুলিউমার (Shubbiluliuma) অধীনতা স্বীকার করে। সুব্বিলুলিউমার পুত্র মুর্শিলের (Mursil) রাজত্বকালে মিশররাজ প্রথম সেটি খেতারাজকে পরাজিত করিয়া ফিনিশীয়ায় পুনর্বার মিশরের আধিপত্য বিস্তার করেন। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় রাম্‌সেস এশিয়ায় অভিযান করেন। তিনি ফিনিশীয়ার উপকূলে ঘাটি স্থাপন করিয়া উত্তরের দিকে অগ্রসর হন। খেতারাজ মুত্তালুর (Muttalu) সঙ্গে তাঁহার কাদেশের নিকট ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের পর তিনি মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পরে তিনি পুনরায়



মিশরীয় শিল্পের অনুকরণে ফিনিশীয়দের রচনা।
বাম দিকে মিশরীয় শিল্প

এশিয়ায় আগমন করেন এবং খেতার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। খেতরাজ খাটুশীলের সঙ্গে অবশেষে তাঁহার সন্ধি হয়। ফিনিশীয়া মিশর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ইহার কিছুকাল পরে মিশর সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইলে আর্ভাদ ও গেবাল, খেতার আধিপত্য স্বীকার করে, যদিও টায়ার সীদন আরও কিছুদিন মিশরের অনুরক্ত থাকে। একাদশ শতাব্দীতে অ্যাসারিয়ারাজ টিগলাথ পিলেসার যখন আর্ভাদ অধিকার করেন, তখন মিশররাজ বন্ধুত্বের নিদর্শনস্বরূপ নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণ করেন।

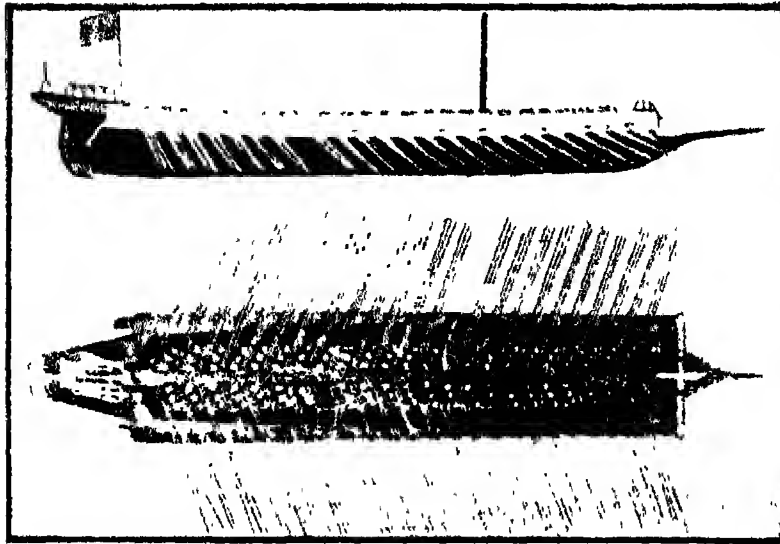
ইহার অব্যবহিত পরে টায়ারের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

টায়ারের রাজা অবিবাল ও তাঁহার পুত্র হিরম (Hiram) নিজকে সীদনীয়দের রাজা (King of the Sidonions) বলিয়া ঘোষণা করেন। সুতরাং তাঁহারা টায়ার, সীদন ও নিকটবর্তী স্থানসমূহে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। হিরম ছিলেন ইহুদীরাজ সোলোমনের বন্ধু। তাঁহার সময় টায়ার সাইপ্রাস দ্বীপে পর্যন্ত অধিকার বিস্তারে সমর্থ হয়। হিরমের মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরেরা রাজত্ব করিতে থাকেন। অবশেষে দশম শতাব্দীর শেষভাগে সীদনের আস্তার্ত দেবীর পুরোহিত ইথোবাল (Ithobal) টায়ার ও সীদনের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার বংশধর পীগমালিয়নের (Pygmalion) রাজত্বকালে কার্থেজে (Carthage) উপনিবেশ স্থাপিত হয়। এই বিষয়ে সুন্দর গল্প আছে। রাজা মাটনের পীগমালিয়ন নামে এক পুত্র ও এলিসা (Elissa) নামে একটি কন্যা ছিল। তিনি কন্যাকে নিজ ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহ দেন। পীগমালিয়ন কিন্তু অর্থলোভে নিজ খুল্লতাত ও ভগিনী-পতিকে হত্যা করেন। ইহাতে এলিসা, রাজ্যে নিজ দাবী পরিত্যাগ করিয়া দেশ হইতে পলায়ন করেন ও আফ্রিকার উপকূলে উপস্থিত হন। এখানে তিনি কার্থেজ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্যে এলিসা দিদো (Dido) নামে বিখ্যাত।



ফিনিশীয়দের অধিকৃত ইউটিকার সমাধি স্থান

এই সময়ে অ্যাসিরিয়ার আধিপত্য ফিনিশীয়ায় বিস্তৃত হয়। অ্যাসিরিয়ারাজ শালমানেসার, টায়ার ও সীদনকে করদরাজ্যে পরিণত করেন। বোধ হয় এই সময় এই দুইটি রাজ্য স্বতন্ত্র হয়। তবে বেশীদিন এই স্বাতন্ত্র্য বজায় থাকে না। কারণ, ৭৩৮ খৃঃ পূর্ব্বে চতুর্থ টিগলাথ পিলেসার যখন ফিনিশীয়া আক্রমণ করেন, তখন টায়ার রাজ্যের কথাই শোনা যায়—সীদনের নামোল্লেখ মাত্র নাই। কাজেই, বোধ হয়, সীদন আবার টায়ারের অন্তর্ভুক্ত হয়। অ্যাসিরিয়া-রাজ টায়ার রাজ্যের অধিকাংশ কাড়িয়া লইয়া টায়ারকে করদ রাজ্যে পরিণত করেন। ফিনিশীয়ার অবশিষ্ট অংশ লইয়া অ্যাসিরিয়ার একটি প্রদেশ গঠিত হয়।



প্রাচীন কার্থেজ ও গ্রীসের যুদ্ধ-জাহাজ

৭২৭ খৃঃ পূর্ব্বে টায়ার-রাজ লুলি অ্যাসিরিয়া-রাজকে কর দিতে অস্বীকার করিলে টিগলাথ

পিলোসারের পুত্র শালমানেসার টায়ার আক্রমণ করেন। পাঁচ বৎসর অবরোধের পর টায়ার বশ্যতা স্বীকার করে। রাজা লুলি পুনরায় কর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া সন্ধি করেন। কিন্তু বেশীদিন তিনি অ্যাসিরিয়ার অনুগত থাকেন না। সার্গনের মৃত্যুর পর ফিনিশীয়া ও প্যালেষ্টাইনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই বিদ্রোহের নেতা ছিলেন টায়াররাজ লুলি ও জুডার রাজা হেজ্‌কিয়া। সেনাকেরিব প্রথমে সীদন আক্রমণ করেন। সেখানকার রাজা পলায়ন করেন। অ্যাসিরিয়ারাজ ইথোবাল নামে একজন বিশ্বস্ত



উত্তর আফ্রিকার এক শাসনকর্তা

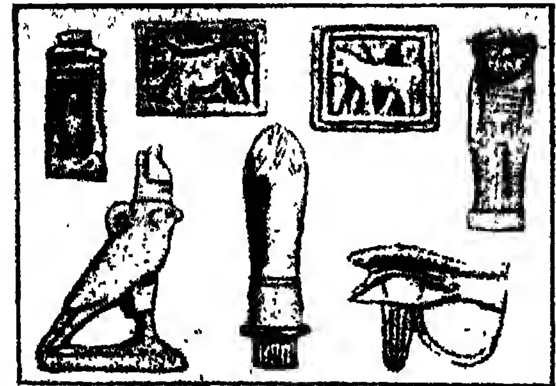
লোককে রাজা করেন। এইবার প্যালেষ্টাইনের অধিকাংশ রাজারা বশ্যতা স্বীকার করেন এবং প্রচুর উপঢৌকন প্রদান করেন। টায়ার কিন্তু কিছুতেই পদানত হয় না—যদিও রাজা লুলি সাইপ্রাস দ্বীপে পলাইয়া যান। তবে দ্বীপটি ছাড়া টায়ারের সমগ্র রাজ্য সীদনরাজের অধিকারভুক্ত করা হয়।

এসারহাড্ডেনের রাজত্বের প্রারম্ভে সীদনরাজ আব্দ-মিল্কট্ (Abd-milkot) বিদ্রোহ করেন। অ্যাসিরিয়ারাজ অতি সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করেন। আব্দ-মিল্কট্ রাজ্য ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। সীদন শহরটিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করা হয়। তবে



ফিনিশীয়দের তৈয়ারী কাচপাত্র—যাহা বিদেশে রপ্তানী হইত

দ্বীপের অপর পারে সীদন নামে একটি নূতন শহর স্থাপনা করা হয়। এই শহরকে অ্যাসিরিয়ার সীদন



ফিনিশীয়দের প্রাচীন খেলনা

প্রদেশের রাজধানী করা হয়। ইহাই হইল পরবর্তি-কালের সীদন নগর।

লুলির পরবর্তী রাজা বাল (Ba'al) প্রথমে অ্যাসিরিয়া রাজ এসারহাড্ডনের অনুরক্ত ছিলেন। কিন্তু শীঘ্রই তিনি তাঁহার আনুগত্য পরিত্যাগ করিয়া মিশররাজ তাহর্কের সঙ্গে যোগ দেন। ইহাতে এসারহাড্ডন তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেন। তাহারা টায়ার অবরোধ করে। তাহর্কের পলায়নের পরে টায়াররাজ অ্যাসিরিয়ার অধীনতা স্বীকার

করেন। কিন্তু তাহার্কের প্রত্যাগমনের পরে আবার তিনি বিদ্রোহ করেন। এবারও তাহকে পলায়ন করেন। অতঃপর, তাল পুনরায় অ্যাসিরিয়া-রাজের (অসুরবানিপালের) আনুগত্য স্বীকার করেন। কিন্তু শুধু দ্বীপের উপর স্থিত টায়ার নগরই তাঁহার শাসনাধীন থাকে। অবশিষ্টাংশ অ্যাসিরিয়ার টায়ার প্রদেশে পরিণত হয়।

অ্যাসিরিয়ার পতনের পর টায়ার তাহার স্বতন্ত্ররাজ্য অধিকার করিবার চেষ্টা করে। রাজা তৃতীয় ইথোবাল বিদ্রোহ করিলে ব্যাবিলনরাজ নেবুকাড্রেজার টায়ার অভিমুখে অভিযান করেন। তেরো বৎসর তিনি নগরটি অবরোধ করেন (৫৯৮-৫৮২)। অবশেষে টায়াররাজ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করেন। নেবুকাড্রেজার কিন্তু নগরটি অধিকার করিতে পারেন নাই। ইহার অল্পদিন পরেই নবীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য পারসিকেরা ধ্বংস করে। টায়ার পারসিকরাজ সাইরাসের অধীনতা স্বীকার করে। সাইরাস সীডনে একজন দেশীয় সামন্ত রাজা প্রতিষ্ঠা করেন। এইরূপ আর্ভাদ ও গেবালকেও সামন্তরাজ্য করা হয়। এই সমস্ত রাজ্য যদিও আভ্যন্তরিক শাসন ব্যাপারে অনেকটা স্বাধীনতা ভোগ করিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহারা ছিল পারস্য-সাম্রাজ্যভুক্ত। পারস্য-রাজ্যের প্রয়োজনমত তাহাদিগকে যুদ্ধজাহাজ দিয়া সাহায্য করিতে হইত।

পারস্যরাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ম্যাসিডনরাজ আলেকজান্দার গ্রীকসৈন্যবাহিনী লইয়া এশিয়া বিজয়ে বাহির হন। তিনি ফিনিশিয়ায় উপস্থিত হইলে সীদন প্রভৃতি সমুদয় ফিনিশীয় রাজ্য তাঁহার পদানত হয়। একমাত্র টায়ার তাঁহাকে প্রতিরোধ করে। ইহার ফল তাহাকে হাতে হাতে পাইতে হইল। আলেকজান্দার সাগর বাঁধিয়া টায়ার নগর আক্রমণ করিয়া অধিকার করিলেন। শাস্তিস্বরূপ তিনি এই প্রাচীন নগরটিকে ধ্বংস করেন।



ফিনিশীয়দের তৈয়ারী গলার হার

ফিনিশীয়রা জাহাজ তৈয়ারী করিতে ও বিবিধ চারু-শিল্পেরদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে পারিত, কিন্তু ঐ সকল দ্রব্যাদির মধ্যে তেমন মৌলিকতা ছিল না। নানা দেশ বিদেশে যাতায়াতের দরুণ নানা দেশের শিল্পের আদর্শ অনুকরণ করিতে তাহারা দক্ষ ছিল। ছবিতে ফিনিশীয়দের নানা প্রকার শিল্পদ্রব্যাদি প্রদর্শিত হইয়াছে।

হিটাইট্ রাজ্যের ইতিহাস

(খৃঃ পূঃ অনুমানিক ১৪০০—১২০০)

তৃতীয় আমেন-হোটেপ্ যখন মিশর সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, তখন বর্ত্তমান অনাটোরিয়ায় হিটাইট্ রাজ্যের অভ্যুত্থান হয়। মরুবাসী মিশরীগণ তুষারকিরীট টরাস পর্ব্বতমালার অভিনব সৌন্দর্য্য দেখিয়া সম্ভ্রমে মস্তক নত করিত। এই পর্ব্বতমালা অতিক্রম করা যাইতে পারে, ইহা কখনও তাহারা কল্পনা করিতে

পারে নাই। বর্ত্তমান আনাটোরিয়া সেই সময় খাটি দেশ নামে খ্যাত ছিল। হিটাইট রাজ্যের পত্তন হয় খাটিতে এবং খাটি ইহার রাজধানী। হিটাইট-ভাস্কর্যে ও স্থাপত্যে ব্যাবিলন ও এসিরিয়ার প্রভাব পরিস্ফুট হয়। হিটাইটগণ "মা'র (চন্দ্রমার) পূজা করিত। "এটিস" (Atys) ও তাহার মাতা "সাইবিলি"র (Cybele) পূজা মনে হয়, খাটি হইতেই গ্রীসে প্রবর্তিত হয়।

হিটাইট রাজ্যের ইতিহাস টেল্-এল-এমার্ণায় (Tel-el Amarna Tablet) প্রাপ্ত লিপি ও বোঘাজ্ কোইর (Boghaz koi Excavation) আবিষ্কার হইতে উদ্ধার হইয়াছে। হেলিস্ (Helis) নদীর পূর্ব্ব প্রান্তে এই রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট ছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে খাটির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কার্কেমিস, হামাথ, কাদেশ ও আলেপ্পো এই রাজ্যের প্রসিদ্ধ নগর ছিল।

আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৭৭০ অব্দে হিটাইটরা ব্যাবিলন আক্রমণ করে এবং প্রচুর স্বর্ণ, রৌপ্য, দেব-দেবী মূর্ত্তি ও প্রচুর বন্দী নিজ দেশে আনয়ন করে। মিশরের ইতিহাসে হিটাইট-রাজ প্রথম খাটুসিলের নাম পাওয়া যায়।

অসামান্য প্রতিভাবলে মিশরের ফ্যারাও তৃতীয় টুথমোসিস্ মেগিডোর যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মিশর-সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। প্যালেষ্টাইন, ফিনিশীয়, এবং এশিয়া মাইনরের তৎকালীন রাজ্যসমূহ তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করে, কিন্তু তাঁহার পরবর্ত্তী সম্রাট্ তৃতীয় এমেনহোটেফের সময় হইতেই সাম্রাজ্য মধ্যে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। চতুর্থ এমেনহোটেফ যখন চিরপ্রচলিত আমনের ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আটনের ধর্ম্ম স্থাপন করিলেন এবং অষ্টাদশ বৎসর কাল এই নব ধর্ম্মমতকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিলেন, সেই সময় সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে বিদ্রোহ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল এবং এই সুযোগে সুচতুর ও বুদ্ধিমান সুবিলিলুমা অসাধারণ প্রতিভাবলে হিটাইট রাজ্য সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করিলেন। তিনি নানা কৌশলে প্রবল মিশরীয় শক্তির সহিত সংঘর্ষ হইতে নিজেকে রক্ষা করিলেন; কারণ তাঁহার নিকট রাজ-নৈতিক কৌশল সম্মুখ যুদ্ধ অপেক্ষা শ্রেয়স্কর ছিল; তিনি কখনও অযথা শক্তিক্ষয় করেন নাই। সেই সময় ব্যাবিলন ও এশিয়া শক্তি দুর্ব্বল ছিল। মিটানি রাজ্য হীনবল, মিশর সাম্রাজ্যে ধর্ম্মবিপ্লব; এমোরাইটরাজ এমিজু মিশরীয় রাজকর্ম্মচারীদের চক্ষে ধূলি দিয়া স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন এবং সুবিলিলুমার সহিত যোগ দিলেন। নাহারিণ রাজ্য সুবিলিলুমার অধীনতা স্বীকার করিল। মিটানির রাজপুত্র পলাতক হইয়া হিটাইট রাজের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন, সুবিলিলুমা মিটানি রাজপুত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিয়া তাহাকে মিটানি রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এসিরিয়ারাজ আসার ইউবালিট্, সুবিলিলুমার জামাতা মেট্জাকে মিটানি রাজরূপে স্বীকার করিয়া লইলেন।

সুবিলিলুমা মিশর-সম্রাট হোরেমহেবের সহিত সন্ধি-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র এরাণ্ডা এবং পরে দ্বিতীয় পুত্র মুরসিল হিটাইট্ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজ্য ফ্রিজিয়ান পর্ব্বত ও কৃষ্ণসাগর হইতে দক্ষিণে কারমেল ও গালিলি পর্য্যন্ত এবং অ্যাসিরিয়ার উত্তর সীমান্ত ও পূর্ব্বে আর্ম্মেণিয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

মিশর-সম্রাট প্রথম সেটি সাম্রাজ্যের বিদ্রোহ দমন ও শান্তি স্থাপনের জন্য বদ্ধপরিকর হন, প্যালেষ্টাইন ও ফিনিশীয়ার বিদ্রোহ দমন করিয়া তিনি হিটাইট-রাজের সহিত যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন এবং কাদেশের নিকটে একটি হিটাইট-বাহিনীকে পরাজিত করিলেন।

প্রথম সেটির মৃত্যুর পর দ্বিতীয় রামেসিস মিশরের সম্রাট্ হইলেন এবং তিনি বিশৃঙ্খল সাম্রাজ্যের বিস্তার ও শান্তি স্থাপনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী তিনি কারনাক মন্দিরের প্রাচীর গাত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার আত্মম্ভরিতা ও অতিশয়োক্তির প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সে যুগের ইতিহাসে এমন সমসাময়িক বর্ণনা আর কোথাও পাওয়া যায় না। মিশরের ইতিহাসে দ্বিতীয় রামেসিসের রাজত্বকাল মিশরের চরম গৌরবের ইতিহাস। ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের যে নিদর্শন তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা দেখিলে আজিও বিস্ময়ে ও সম্ভ্রমে মস্তক নত করিতে হয়।

দ্বিতীয় রামেসিস যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। অরন্টিস্ নদীর তীরে কাদেশে মিশর সৈন্য ও হিটাইট সৈন্যে এক ভীষণ যুদ্ধ হয়। অতীতের ইতিহাসে মেগিডো ও এই কাদেশের যুদ্ধ চিরস্মরণীয়, এই যুদ্ধে হিটাইটরাজ মুরসিল পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন এবং কিছুদিন পরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধের পর হইতে হিটাইট রাজ্যের অধঃপতন হইতে থাকে।

দ্বিতীয় রামেসিস প্যালেষ্টাইন ও ফিনিশীয়ার বিদ্রোহ দমন করিলেন, আস্কেলন ও দাপুর নগর অধিকার করিলেন। খৃঃ পূঃ ১২৮০ অব্দে রামেসিস নাহারিন ও কাট্না অধিকার করেন। তাহার ফলে এমোরাইট্রা হিটাইটদের পক্ষ ত্যাগ করিয়া মিশরের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। মিশর-সৈন্য টুনিপ্‌ নগর অবরোধ করে, কিন্তু হিটাহিটরাজ মুটাল্লুর সৈন্যদের হস্তে তাহারা পরাজিত হইয়া পলায়ন করে। তাহার ফলে মুটাল্লু নাহারিন আমরু পুনরধিকার করেন।

দ্বিতীয় খাটুসিল মিশরের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। সেই সন্ধির সর্ত্তগুলি এখনও বিদ্যমান; এই সর্ত্তগুলি আলোচনা করিলে খৃষ্টপূর্ব্ব ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক নিয়মে (Internal law) যে বিদ্রোহিদের বহিষ্করণ (Extradition) সম্বন্ধে যে সব সর্ত্ত দেখিতে পাই, সেই যুগেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। হিটাইট রাজ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত মিশরের বিদ্রোহী এবং মিশর সাম্রাজ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত হিটাইট বিদ্রোহীদের ক্ষমা করা হইল এবং তাহাদের বাজেয়াপ্ত বিষয়-সম্পত্তি প্রত্যর্পণ করা হইল; ভবিষ্যতে এই বিদ্রোহী-দের সম্বন্ধে কি নিয়ম অবলম্বন করা হইবে, তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল।

খাটুসিল মিশরে উপস্থিত হইলেন এবং মিশর-সম্রাট্ রামেসিসের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। মিশরের সামাজিক ইতিহাসে ইহা এক নূতন অধ্যায়। কারণ, এ পর্য্যন্ত কোন রাজা মিশরে রাজধানীতে উপস্থিত হইয়া মিশর-সম্রাটকে কন্যা সম্প্রদান করেন নাই।

মিশর সম্রাট হিটাইট রাজ্যের রাজধানী খাটিতে উপস্থিত হইতে পারেন নাই, সেইজন্য তিনি প্রতিনিধি এবং মিশরীয় দেবদেবীর প্রতিমা খাটিতে পাঠাইয়া দিলেন। মিশরীয় প্রতিনিধি হিটাইট রাজ্যে বহুদিন ছিলেন, মিশর ও খাটির এই রাজনৈতিক বন্ধুত্বের ফলে এবং সামাজিক বন্ধনের পরিণামে মিশরীয় আচার-ব্যবহার হিটাইট রাজ্যে প্রবেশ করিল। সহোদর ও সহোদরার মধ্যে মিশরীয় প্রথামত বিবাহ আরম্ভ হইল এবং নৈতিক জীবনেও হিটাইটদের পতন আরম্ভ হইল।

মিশর-সম্রাট দ্বিতীয় রামেসিসের মৃত্যুর পর মিশরেও অধঃপতনের সূত্রপাত হইল। তৃতীয় রামেসিসের সময় স্পষ্ট প্রতীয়মান হইল, মিশর সমাজের অবসান আসন্ন। এদিকে ব্যাবিলন ও এসিরিয়ার রাজশক্তি দিন দিন প্রবল হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ধীরে ধীরে মিটানি, খাটি, প্যালেষ্টাইন, এমন কি মিশর পর্য্যন্ত গ্রাস করিয়া বিরাট এসিরিয়া সাম্রাজ্য স্থাপন করিল। এইরূপে সর্ব্বগ্রাসী এসিরিয়া সাম্রাজ্যের মধ্যে হিটাইট রাজ্য লোপ পাইল।

নিম্নে কয়েকজন হিটাইট রাজার কাল নির্দ্দিষ্ট হইল।

১।	সুবিলিলুমা	খৃঃ পূঃ	১৩৮৫—১৩৪৫
২।	আরাণ্ডা	„	১৩৪৫—১৩৪০
৩।	মুরসিল	„	১৩৪০—১২৯৫
৪।	মুটাল্লু	„	১২৯৫—১২৮২
	খাটুসিল (২য়)	„	১১৮২—১২৫৫
	দুধালিয়া	„	১২৫৫—১২৩০
	আরনোয়াণ্টা	„	১২৩০—১২০০

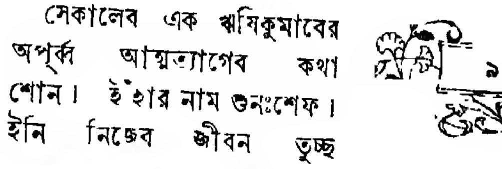
গল্প ও কাহিনী

শুনঃশেফ

সেকালের এক ঋষিকুমারের অপূর্ব্ব আত্মত্যাগের কথা শোন। ইঁহার নাম শুনঃশেফ। ইনি নিজের জীবন তুচ্ছ

৯০২ পৃষ্ঠার পর

করিয়া পিতার দুঃখ কষ্ট দূর করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অলৌকিক কার্য্যে দেশের রাজারও বিপদ্ দূর হইয়াছিল।



রাজা তোমার যজ্ঞের পশু চুরি গিয়াছে

অযোধ্যার রাজা অম্বরীষ এক যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছেন। এই যজ্ঞ পূর্ণ হইলে খুব অনিষ্ট হইতে পারে মনে করিয়া স্বর্গের রাজা ইন্দ্র অম্বরীষের যজ্ঞের পশু চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। রাজার পুরোহিত হঠাৎ যজ্ঞের পশু দেখিতে না পাইয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং রাজা অম্বরীষকে বলিলেন, রাজা তোমার যজ্ঞের পশু চুরি গিয়াছে। যদি যজ্ঞের পশু খুঁজিয়া আনিতে পার ভালই, না হইলে ঐ পশুর পরিবর্ত্তে একটি মানুষ কিনিয়া আনিয়া ঐ মানুষকে বলি দিতে হইবে। তাহা না হইলে তোমার মঙ্গল হইবে না; কিন্তু সাবধান যাহার নিকট হইতে সেই মানুষ কিনিয়া আনিবে, তাহাকে অনেক অর্থ ও এক লক্ষ গাভী দিয়া সন্তুষ্ট করিতে হইবে। তাহার অনিচ্ছায় আনিলে তোমার যজ্ঞও পূর্ণ হইবে না, তার উপর তোমার যথেষ্ট পাপ হইবে।

রাজা অম্বরীষ এই কথা শুনিয়া যজ্ঞের পশু খুঁজিবার জন্য বাহির হইলেন। কিন্তু কোথাও ঐ পশু পাইলেন না। দেবরাজ ইন্দ্র চুরি করিয়া কোথায় লুকাইয়া রাখিয়াছেন। তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করা কি মানুষের ক্ষমতা! রাজা নানা স্থানে খোঁজ করিয়া কোথাও না পাইয়া শেষে ভৃগুতুঙ্গ পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তথায় ঋচীক মুনি স্ত্রী-পুত্রাদি লইয়া তপস্যা করিতেছিলেন। এই ঋচীক মুনি মহাতপস্বী বিশ্বামিত্রের ভগিনীপতি। রাজা অম্বরীষ ঋচীক মুনির কাছে গিয়া প্রণাম করিয়া

নিজের দুঃখ জানাইলেন। পরে বলিলেন, হে মুনিবর! আমার যজ্ঞ যাহাতে পূর্ণ হয়, দয়া করিয়া আপনাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। আমি আপনাকে প্রচুর অর্থ ও এক লক্ষ গাভী দিব—আপনি আমাকে আপনার একটি পুত্র দান করুন। আমার যজ্ঞের পশু কত দেশে খুঁজিয়াছি—কিন্তু কোথাও পাই নাই। পুরোহিত বিধান দিয়াছেন, যজ্ঞের পশু পাওয়া না গেলে একটি মানুষ কিনিয়া আনিতে হইবে।

কত লোক কত ভাবে মরিতেছে—কেহ রোগে ভুগিয়া মরিতেছে! কেহ বা যুদ্ধে গিয়া জীবন দিতেছে। কিন্তু পিতার আদেশে দেবতার সন্তোষের জন্য—রাজার ও রাজ্যের উপকারের জন্য কয় জনের জীবন কাজে লাগে! আমার জীবন আজ ধন্য রাজা! চলুন, আমি পিতার জন্য, দেশের জন্য, দশের জন্য, দেবতার জন্য আমার এই তুচ্ছ জীবন দান করিব।



আমাকে আপনার একটি পুত্র দান করুন



বৎস! তুমি ভয় পাইও না

ইহা শুনিয়া ঋচীক মুনি বলিলেন, মহারাজ! বড় ছেলেটিকে আমি বেচিতে পারিব না। ঋচীকের স্ত্রী সত্যবতী বলিলেন, ছোট ছেলেটিকেও আমি বেচিতে পারিব না। যেহেতু বড় ছেলে পিতার ও ছোট ছেলে মাতার বেশী ভালবাসার পাত্র হয়। ইহা শুনিয়া ঋচীক মুনির মেজো ছেলে শুনঃশেফ বলিলেন, আমার এই সামান্য জীবনের পরিবর্তে এই রাজ্যের হাজার হাজার প্রজার জীবনরক্ষা হইবে, ইহা অপেক্ষা সুখের কথা কি হইতে পারে! আজ আমার এই মনুষ্য-জন্ম সার্থক হইল! জন্মিলেই মরিতে হইবে—সেই মরণকে ভয় কি? এই পৃথিবীতে প্রতিদিন

শুনঃশেফের কথা শুনিয়া রাজার চক্ষেও জল আসিল। রাজা ভাবিতে লাগিলেন, হায়, আমি স্বার্থের জন্য একটা এত-বড় জীবন নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছি! ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রাণ হাহাকার করিয়া উঠিল। তথাপি রাজা দেবতার কোপ মনে করিয়া ঋচীক মুনিকে এক লক্ষ গাভী, স্বর্ণ ও অসংখ্য বস্ত্র দিয়া সন্তুষ্ট করিলেন এবং তার পরে ঋচীক মুনি ও তার স্ত্রী সত্যবতীর অনুমতি লইয়া শুনঃশেফকে তাঁর রথে চড়াইলেন এবং নিজেও সেই রথে চড়িয়া তথা হইতে অযোধ্যার দিকে চলিয়া গেলেন।

রাজা অম্বরীষ যে সময়ে পুষ্কর তীর্থের নিকট

আসিলেন, তখন বেলা দ্বিপ্রহর হইয়া গিয়াছে। রাজা বিশ্রাম করিবার জন্য শুনঃশেফকে লইয়া রথ হইতে নামিলেন। রাজা অম্বরীষ ও শুনঃশেফ পিপাসায় বড় কাতর হইয়াছিলেন এই জন্য তাঁহারা জল পান করিবার ইচ্ছায় পুষ্কর সরোবরের দিকে যাইতে লাগিলেন। পুষ্কর সরোবরে গিয়া তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, সাদা লাল ইত্যাদি নানা রকম রঙের অসংখ্য পদ্ম ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে। অসংখ্য মধুকর সেই পদ্ম ফুলের উপর উড়িয়া বসিতেছে ও মধুর গুঞ্জন করিয়া মধু পান করিতেছে। রাজা অম্বরীষ ও শুনঃশেফ সরোবরের নিকট গিয়া দেখিলেন, বিশ্বামিত্র মুনি ঐ সরোবরের তীরে ঋষিগণকে লইয়া তপস্যা করিতেছেন। রাজা অম্বরীষ তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। শুনঃশেফও তাঁহার মামাকে চিনিতে পারিয়া প্রণাম করিলেন। মামাকে দেখিয়া তাঁহার প্রাণের মায়া জাগিয়া উঠিল। এত বড় মুনি তাঁহার মামা, সুতরাং বিশ্বমিত্র মুনি ইচ্ছা করিলে শুনঃশেফের প্রাণও রক্ষা হয় এবং রাজারও যজ্ঞ পূর্ণ হয়—এমন উপায় তিনি করিতে পারেন বলিয়া শুনঃশেফের মনে হইল। এইরূপ মনে করিয়া শুনঃশেফ মামার কাছে গিয়া সব ব্যাপার খুলিয়া বলিলেন এবং রাজা যথেষ্ট ধনরত্ন ও এক লক্ষ গাভী দিয়া তাঁহার পিতাকে সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহাকে যজ্ঞে বলি দিবার জন্য আনিয়াছেন, জানাইলেন। শুনঃশেফ বলিলেন এ বিষয়ে রাজার কোনো অপরাধ নাই। যাহাতে রাজার যজ্ঞ পূর্ণ হয় এবং আমারও প্রাণ রক্ষা হয়, আপনাকে তাহা করিতে হইবে। বিশ্বামিত্র বালক শুনঃশেফের কথা শুনিয়া তাঁহার ছেলেদিগকে বলিলেন, দেখ, শুনঃশেফ প্রাণের মায়ায় আমার শরণ লইয়াছে; অতএব তোমাদের মধ্যে একজন অম্বরীষের যজ্ঞের বলি হও।

বিশ্বমিত্রের এই কথা শুনিয়া তাঁহার ছেলেরা অতিশয় আশ্চর্য্য হইয়া বলিল, পিতা! এ আপনার কিরূপ বিচার? পরের ছেলের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য আপনার ছেলেকে যমের মুখে ঠেলে দেওয়া—এ ত কখনো শুনি নাই। আমরা আপনার এই অন্যায় কথা শুনিব না।

বিশ্বামিত্র এই কথা শুনিয়া খুব রাগিয়া গেলেন এবং ছেলেদিগকে অভিশাপ দিলেন। পরে শুনঃশেফকে বলিলেন বৎস! তুমি ভয় পাইয়ো না। যাহাতে তোমার প্রাণ রক্ষা হয় এবং অম্বরীষেরও যজ্ঞ পূর্ণ হয়- আমি তাহা করিতেছি। এই বলিয়া বিশ্বামিত্র শুনঃশেফকে কুশের তৈরী কাক্কা (গোটি) পরাইয়া দিলেন এবং লাল কাপড় পরাইয়া, লাল ফুলের মালায় ও লাল চন্দনে সাজাইয়া দিয়া দুইটি গাথা শিখাইয়া দিলেন, পরে বলিয়া দিলেন - যে সময়ে তোমাকে বলি দিবার হাড়িকাঠে বাঁধিবে, সেই সময়ে তুমি কিছুমাত্র ভয় না করিয়া এই গাথা দুইটি গান করিবে। এই গাথা দুইটি যাঁহাদের উদ্দেশ্যে লেখা হইয়াছে, তাঁহারা তাহা শুনিয়া খুসি হইয়া সেখানে উপস্থিত হইবেন ও তোমার প্রাণ রক্ষা করিবেন এবং অম্বরীষেরও যজ্ঞ পূর্ণ হইবে।

মামার কাছে এইরূপ উপদেশ পাইয়া শুনঃশেফ কিছুমাত্র ভয় না করিয়া রাজার সঙ্গে অযোধ্যায় আসিলেন।

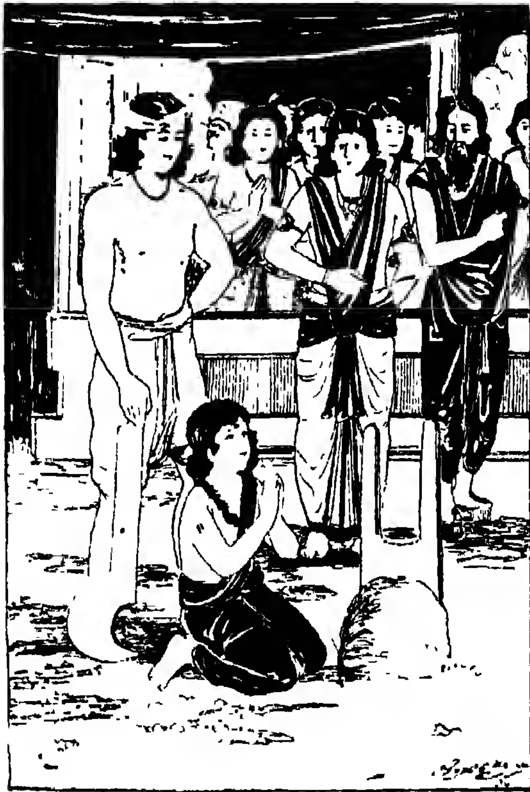
অম্বরীষের যে যজ্ঞ শেষ হয় নাই, তাহা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ হইল। যজ্ঞে নিমন্ত্রিত রাজারা আবার ফিরিয়া আসিলেন। নানা স্থানের আশ্রম হইতে মুনিঋষিগণ অনেক শিষ্য সঙ্গে লইয়া রাজার সেই অসমাপ্ত যজ্ঞ কেমন করিয়া পূর্ণ হয় দেখিবার জন্য আসিতে লাগিলেন। সকলেই রাজা অম্বরীষের কত সুখ্যাতি করিতেছেন। এমন যজ্ঞ কেহ কখনও দেখেন নাই।

যজ্ঞের সকল অনুষ্ঠান সুন্দররূপে সম্পন্ন হইল। দেবতাগণের পূজা হইল। সকল দেবতাকেই নানা রকম উপহার দেওয়া হইল। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, অগ্নি, ইন্দ্র, বরুণ প্রভৃতি দেবতাগণ আকাশে প্রকাশমান হইলেন। তাঁহাদের দিব্য জ্যোতিতে যজ্ঞভূমি আলোকিত হইয়া উঠিল।

যথাসময়ে রাজা অম্বরীষ বলির পশুর ন্যায় শুনঃশেফকে স্নান করাইয়া লাল ফুলের মালা পরাইয়া দিলেন—তাঁর সব গায়ে লাল চন্দন মাখাইয়া দিলেন। তার পর রাজা যথানিয়মে শুনঃশেফকে হাড়িকাঠে বাঁধিলেন। শুনঃশেফ যূপে আবদ্ধ হইয়া বিশ্বামিত্র যে দুইটি গাথা শিখাইয়া দিয়াছিলেন, সেই দুইটি গাথা দ্বারা অগ্নিদেব, ইন্দ্রদেব ও তাঁহার অনুজের (বিষ্ণুর) স্তব করিতে লাগিলেন। বালকের মধুর কণ্ঠের মধুর স্তুতিগান চারিদিকে মধু ছড়াইয়া দিল। আকাশে বাতাসে সেই বেদনার বাণী—ভক্তির বাণী ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল। সে গান শুনিয়া সকলে অবাক হইয়া গেল। এমন সুর, এমন ঝঙ্কার, এমন প্রাণের আবেদন কেহ কখনও শোনে নাই। বালক

শুনঃশেফ ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অগ্নিদেবকে সম্বোধন করিয়া গাহিলেন—

দেব বৈশ্বানর পূজিত বিশ্বনর
ত্রিভুবন-পালক-সাধক হে !
স্বাহা হৃদাকাশে পূর্ণশশী সম
বাঞ্ছিত মানসমোহন হে !
রক্ত-কমল-ছবি শান্ত যজ্ঞ-হবিঃ,
সুবনব-অপ্সন-পালক হে !
বক্ষ শুনঃশেফে করুণাকুল চেপে,
নবগতি-মানস-পূবক হে !
দেব শচীপতি স্বর্গ-অধিপতি,
অসুব-নাশক, শাসক হে !
বক্ষ প্রাণভীত যূপে আরোপিত
কোমল কুসুম-কোবকে এ !



শুনঃশেফ গাহিতে লাগিলেন—

গানের শেষে অগ্নিদেবকে অগ্রে করিয়া ইন্দ্র, রাজার যজ্ঞের পশু লইয়া আসিলেন ও শুনঃশেফের বন্ধন খুলিয়া দিয়া বলিলেন, যাও মহাপ্রাণ ঋষিকুমার! আজ তুমি মুক্ত। তোমার অনুগ্রহে আজ অশ্বমেধের যজ্ঞ পূর্ণ হইল। আজ হইতে তুমি নূতন জীবন পাইলে—তোমার নাম হইল দেবরাত। এই বলিয়া ইন্দ্র, রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, আপনি যাহাকে যজ্ঞের পশু মনে করিয়াছিলেন, তিনি পশু নহেন। তিনি মহা-প্রাণ এক ঋষিকুমার। পিতার দারিদ্র্য এবং আপনার বিপদ বুঝিয়া দেশের ও দশের উপকারের জন্য বলি-রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইঁহার এই অবদানে আপনারও পশুত্বের মুক্তি হোক।

এই সময়ে বিশ্বামিত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেবগণের আদেশে বিশ্বামিত্র দেবরাতকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া আপনার আশ্রমে চলিয়া গেলেন।

যজ্ঞ-সভায় সকলে বলিয়া উঠিলেন—জয়, দেবরাজ ইন্দ্রের জয়। দেবরাজ সকলের সঙ্গে কণ্ঠ মিলাইয়া বলিলেন—

জয়- ঋষিকুমার শুনঃশেফের জয়।

এই গল্পটি কিন্তু 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' নামক পুস্তকে একটু ভিন্নরূপে লেখা আছে।

অযোধ্যার রাজা হরিশ্চন্দ্রের একশত স্ত্রী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার একটিও পুত্র ছিল না। এই জন্য তিনি অতিশয় দুঃখিত হইয়া কাল কাটাইতেন। রাজা পুত্র লাভের জন্য কত যজ্ঞ করিলেন—কত দান-ধ্যান করিলেন—দেবতাদের কাছে কত মানৎ করিলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। পুত্র অভাবে বুঝি বা তাঁহার বংশ লোপ হইয়া যায়—এইরূপ দুশ্চিন্তায় রাজা অতিশয় কাতর হইয়া আছেন, এমন সময় পর্ব্বত ও নারদ মুনি আসিয়া তাঁহার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র তাঁহাদের যথোচিত সমাদর করিয়া বসিতে আসন দিলেন এবং তাঁহার মনের বাসনা জানাইলেন। পর্ব্বত ও নারদ মুনি বলিলেন, রাজা, যদি তুমি বরুণ দেবতার নিকট পুত্রমেধ রাজসূয় যজ্ঞের মানৎ করিয়া তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পার, তবে তোমার পুত্র হইতে পারে। রাজা হরিশ্চন্দ্র এই কথা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন, পুত্রের কাঙাল আমি! যদি দেবতার দয়ায় পুত্র কোলে পাই, তবে সে পুত্রকে বলি দিয়া কেমন করিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিব, সে পুত্রকে বলি দিয়া কেমন করিয়া যজ্ঞ পূর্ণ করিব, মুনিবর! এ যে বড় কঠিন কাজ, এ কাজ আমার দ্বারা হওয়া সম্ভব নয়।

তাঁহার কথা শুনিয়া পর্ব্বত ও নারদ মুনি বলিলেন, তোমার পুত্র মুখ দর্শনের ইহাই একমাত্র উপায়

রাজা! এই কঠিন পরীক্ষায় যদি তুমি উত্তীর্ণ হইতে না পার, তবে তোমার পুত্র লাভের অন্য কোন উপায় নাই। আর জান, পুত্র মুখ দর্শন না করিয়া স্বর্গে গমন করিলেও তোমাকে পুন্নামক নরক দর্শন করিতে হইবে।

হরিশ্চন্দ্র নরক দর্শনের কথা শুনিয়া ভয় পাইয়া সাত-পাঁচ কত কি ভাবিতেছেন দেখিয়া, পর্ব্বত ও নারদ মুনি বলিলেন, রাজা! বিধাতার বিধানে অবিশ্বাস করিয়ো না। নিশ্চয় জানিয়ো, কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়াই ভগবানের রাজ্যের সিংহদ্বার পার হইতে হয়। যদি তুমি এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার, তবে হয় ত তুমি পুত্রও ফিরিয়া পাইবে। অতএব তুমি মনে কোনো সন্দেহ না রাখিয়া বরুণ দেবতার কাছে পুত্রমেধ রাজসূয় যজ্ঞের মানৎ কর।

মুনিদের কথায় বিশ্বাস করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র বরুণ দেবতার পূজা করিয়া পুত্রমেধ রাজসূয় যজ্ঞের মানৎ করিলেন। যথাসময়ে তিনি একটি পুত্র সন্তানও লাভ করিলেন। রাজ্যে শতধারে আনন্দের স্রোত বহিতে লাগিল। কিন্তু রাজার প্রাণে শান্তি নাই। তিনি পুত্রটিকে দেখিলেই এমন সোনার পুতুলকে বলি দিতে হইবে মনে করিয়া কাতর হইয়া উঠিতেন। তিনি মনে করিতেন—এমন কঠিন পরীক্ষাকে সম্মুখে রাখিয়া এই পুত্রলাভ করা—যেন অভাবের আগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইয়াছে। এইরূপ মনে করিয়া রাজা অতিশয় বিমর্ষ হইয়া থাকিতেন।

ক্রমে রাজকুমারের বয়স ছয় মাস হইল। এইবার যে সেই কঠিন পরীক্ষার দিন আসিয়াছে! রাজা প্রমাদ গণিয়া বিধাতার নিকট হৃদয়ের বল প্রার্থনা করিতেন। কিন্তু সে প্রার্থনায় তিনি তাঁহার ধৈর্য্যই হারাইতেন। রাজা তাঁহার এই দুর্ব্বলতা বড় যত্নে গোপন করিবার চেষ্টা করিলেও চতুর বুদ্ধিমান মন্ত্রীর তাহা বুঝিতে বাকি রহিল না।

এমন সময়ে পর্ব্বত ও নারদ মুনি আসিয়া রাজাকে সেই যজ্ঞের কথা মনে করাইয়া দিলেন। যজ্ঞের কথা মনে করিয়া রাজা অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। মন্ত্রী রাজার কাতরতা বুঝিয়া বলিলেন, রাজকুমার এখনো বলির উপযুক্ত হন নাই। কারণ, দাঁত না উঠিলে কোনো পশু বা মানব বলির উপযুক্ত হয় না। শাস্ত্রে বলে, অদন্ত অমেধ্য। এই কথা শুনিয়া পর্ব্বত ও নারদ মুনি চলিয়া গেলেন।

ক্রমে রাজকুমারের দাঁত উঠিল। আবার পর্ব্বত ও নারদ মুনি আসিয়া রাজাকে বরুণ দেবতার মানৎ পরিশোধ করিবার কথা বলিলেন। শুনিয়া রাজা উদাস প্রাণে মন্ত্রীর মুখের দিকে তাকাইলেন। মন্ত্রীর মাথায় বুদ্ধি আসিল। মন্ত্রী বলিলেন, জ্ঞান না হইলে মানব সন্তান বলির উপযুক্ত হয় না। রাজকুমারের এখনো কেমন জ্ঞান সঞ্চার হয় নাই। অতএব এখনো তাঁহাকে বলি দেওয়া চলে না।

ক্রমে রাজকুমার জ্ঞান লাভ করিলেন। রাজার ছেলে লাল ঘোড়ায় চড়িয়া হাওয়ার মত ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন—ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া সমস্ত দিন খেলা করিয়া বেড়ান। ঘোড়ার পিঠেই শয়ন—ঘোড়ার পিঠেই ভোজন—ঘোড়ার পিঠেই বিশ্রাম। ইহা দেখিয়া সকলে রাজকুমারের নাম রাখিয়াছেন—রোহিতাশ্ব। আবার পর্ব্বত ও নারদ মুনি আসিয়া বরুণ দেবতার মানতের কথা মনে করাইয়া দিলেন। চতুর মন্ত্রী আবার বলিলেন, উপনয়ন সংস্কার না হইলে ক্ষত্রিয়-সন্তান শুদ্ধ হয় না, কাজেই, রাজকুমার এখনো বলির উপযুক্ত নন। শুনিয়া পর্ব্বত ও নারদ মুনি আবার চলিয়া গেলেন। যথাসময়ে রাজকুমারের উপনয়ন সংস্কারও হইয়া গেল। এখন ত আর কোনো ওজর চলে না। কিন্তু পুত্রকে বলি দিতে রাজার প্রাণ মোটেই চাহিতেছিল না। জলের রাজা বরুণ দেবতা এইবার রাগিয়া গেলেন। মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের রাজ্যে বৃষ্টি হইল না—শস্য জন্মিল না—লোকে খাইতে না পাইয়া ঘাস-পাতা খাইতে লাগিল। দেশে মড়ক দেখা দিল। গোরু বাছুর মরিল—মানুষ মরিল। দেশে হাহাকার!

এই দৃশ্য দেখিয়া রাজকুমার আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বরুণ দেবতাকে প্রসন্ন করিবার জন্য বনে চলিয়া গেলেন। রোহিতাশ্বের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া বরুণ দেবতা বর দিলেন, রাজকুমার! যদি উপযুক্ত অর্থ ও গাভী দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া একটি ঋষিকুমারকে কিনিয়া আনিতে পার, তবে সেই ঋষিকুমারকে যজ্ঞে বলি দিলে তোমার পিতা সত্যমুক্ত হইতে পারিবেন।

রাজকুমার রোহিতাশ্ব যে বনে তপস্যা করিতেন, সেই বনে অজীগর্ত্ত নামে এক মুনি বাস করিতেন। এই ঋষির অন্য আর একটি নাম ছিল ঋচীক। তাঁহার তিনটি ছেলে ছিল। বড় ছেলেটির নাম শুনঃপুচ্ছ,

মেজো ছেলেটির নাম শুনঃশেফ, ছোট ছেলেটির নাম শুনোলাঙ্গুল। রাজার বিপদ—দেশের বিপদের কথা শুনিয়া ঋষি-দম্পতী বড় ও ছোট ছেলেটিকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহিলেন না। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের মেজো ছেলে শুনঃশেফ বলিলেন, রাজকুমার! রাজার উপকারের জন্য—রাজ্যের মঙ্গলের জন্য—দেবতার



যাও মহাপাপ ঋষিকুমার! আজ তুমি মুক্ত

কোপ শান্তির জন্য আমি তোমার পিতার যজ্ঞের বলি হইতে প্রস্তুত আছি। ইহা শুনিয়া রাজকুমার রোহিতাশ্ব এক লক্ষ গাভী ও বহু ধনরত্ন দিয়া শুনঃশেফকে কিনিয়া আনিলেন।

যজ্ঞ আরম্ভ হইল। যজ্ঞ দেখিবার জন্য বরুণ দেবতা অন্যান্য দেবতাগণকে লইয়া আকাশে দেখা দিলেন।

এই যজ্ঞের পুরোহিত নিজে বিশ্বামিত্র মুনি—শুনঃশেফের মামা। তিনি শুনঃশেফকে স্নান করাইয়া লাল ফুলের মালা ও লাল চন্দন পরাইয়া দিলেন। যথাবিধানে বলি উৎসর্গ করা হইল। হাড়িকাঠের পূজা হইল। উৎসর্গ করা হাত-পা বাঁধা শুনঃশেফকে হাড়িকাঠে বাঁধা হইল।

যতই কেন শুভ উদ্দেশ্য থাকুক না, প্রাণের মত প্রিয়, জীবের আর কিছুই নাই। জীবনের শেষ মুহূর্ত্তে শুনঃশেফের প্রাণে মৃত্যুর বিভীষিকা জাগিয়া উঠিল। তিনি দেবতাগণকে প্রণাম করিবার জন্য উপস্থিত লোক-জনকে তাহার বাঁধা হাত দুটি একটিবার মাত্র খুলিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। কিন্তু কেহই তাহার সেই উপরোধ রক্ষা করিল না। শুনঃশেফ পুরোহিতের নিকট এই প্রার্থনা করিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই চিনিতে পারিলেন—পুরোহিত তাঁহার মামা বিশ্বামিত্র। বিশ্বামিত্রও তাঁহার ভাগিনেয় শুনঃশেফকে চিনিতে পারিলেন। শুনঃশেফের মুখে সব কথা শুনিয়া বিশ্বামিত্র মুনি শুনঃশেফকে অভয় দিয়া দুইটি গাথা শিখাইয়া দিলেন। শুনঃশেফ সেই গাথা দুইটি গান করিতেই বরুণ দেবতা প্রসন্ন হইয়া তথায় আবির্ভূত হইলেন ও শুনঃশেফের বন্ধন খুলিয়া দিয়া হরিশ্চন্দ্রের যজ্ঞ পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া সকলে সমস্বরে বলিয়া উঠিলেন—

জয়, বরুণ দেবতার জয়!

বরুণ দেবতা প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—এ জয় আমার নহে;—এ জয় পরদুঃখকাতর মহাত্মা শুনঃশেফের জয়।



সরু ঠ্যাঙে বুটিদার
গায়ে ছিট এঁটে
লাফ দিয়ে চলে চিতা
বাঘ বেঁটে সেঁটে।
বেঁধে তারে 'সাতমার'
হ'ল পালোয়ান,
দূরে থেকে দেখো তারে,
খোকা সাবধান !



গলাবাজি করতো যদি
জিরাফ মশাই তার,
গাইয়ে যত দেশ ছাড়িত,
হ'ত তাদের হার।
গলার রাজা জিরাফ যদি
দেখেন গণ্ডগোল,
গলা ভুলে পড়েন সরে'
ফিরে যায় তার বোল।



শেয়ালের চাল দেখে
দেশে দেশে রটে —
জানোয়ার মাঝে সেই
সুচতুর বটে।
বনের পাশে ঘরের কোণে
দেখা যায় তাকে,
ডুব দেয় ঝোপে-ঝাড়ে
হুয়া হুয়া ডাকে।



হাঁ,—করে আছে 'হিপো'
খোকা পায় ভয়,
ঘাস-পাতা খেয়ে দেখ
হ'ল তারি জয়।
জলো হাতী বলে তারে,
জল ভালবাসে,
বারকোষ মুখখানি
কাছে নিয়ে আসে।



কুম্ভীর গম্ভীর
মেজ মাথা সার,
গায়ে কাঁটা আঁটা সাঁটা,
মোটা তার ঘাড়।
ধীরে ধীরে চলে কভু
থাকে চুপ চাপ,
দাঁত যেন তরোয়াল,
বাপ বলে 'বাপ'!



দুটি পায়ে লেজে ভর্
মাটি খুঁড়ে করে ঘর
বিদেশী কাঙারু।
চলে যেন মনে হয়,
যেন সারা বনময়
দিয়ে চলে ঝাড়ু।
থলে তার বুকে থাকে,
শিশু তার বহে সুখে
আহা কি সুচারু!



উৎবেবালে খেলে মাছ
সবাই দেখে ভোঁদড় নাচ।
চাঁদ সদাগর ডিঙি বেয়ে
তাঁর যে গান গেল গেয়ে।
ভঁড়িং গাঁ • চলে ভোরে
বেরিয়ে পড়ে লোভে লোভে।



ডাঁ'ঃ সাঁচা বাঘ গায়ে
সেজে বণ সাজ,
সচকি সজাগ সদা
কেন কত কাজ!
চুপি চুপি ঝোপে ঝাড়ে,
চলা ফেরা করে ফিরে
ঝন্ ঝন বন্ বন্
বাঘের আওয়াজ।



হায়না চলে হুটর হুটর
বায়না করে কত,
পোষ কভু মানবে না সে
দাপন করে মত।
ভাগাড় খাবার খুঁজতে চলে,
উঁচু নিচু পায়,
খেঁকিয়ে হাসি হাসে সদা
বাঁদরা ডাবা গায়।



হুপ্ হাপ্ হুপ্ দাপ্
হেথা হোথা ধায়,
এই দাও খেতে তবু
এই ফিরে চায়!
মুখ পোড়া—কালো মুখো,
ভাল কেহ বাসে নাকো,
নাম তার "হনুমান"
গাছে গাছে যায়!



ভালুকের নাচ দেখ্‌ছে খোকা
আর দেখেছিল কংস,
লোকে বলে তাই তো তাহার
বংশ হ'ল ধ্বংস!
কথায় কথায় জ্বর আসে গায়,
শুয়ে পড়েন ঢলে,
উঠে আবার লোমশ ঋষি
নাচেন দুলে দুলে।

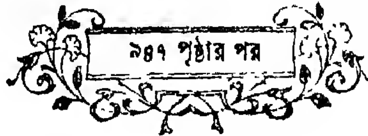


একগুঁয়ে বরাহের
খেয়াল গোঁয়ার,
ছুঁচলো মুখের কিবা
রূপের বাহার!
ঘোঁৎ ঘোৎ চলে সোজা
কোনো বাধা নাই,
দাঁত দিয়ে মাটি চিরে,—
ভয়েতে পালাই।

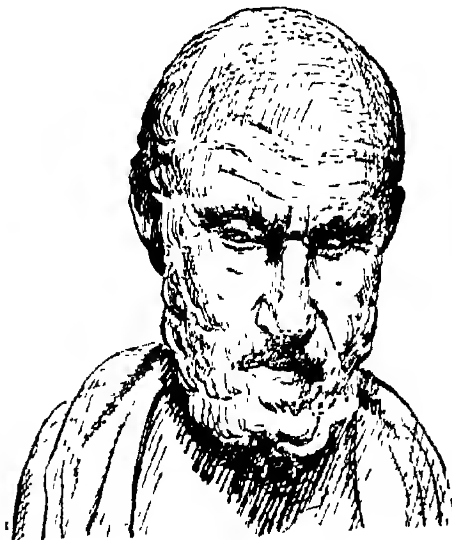


হিপোক্রেটিস্

(আনুমানিক ৪৬০—৩৫৯ বা ৩৭৭ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ)



পঞ্চম খৃষ্টপূর্ব্ব অব্দে গ্রীকেরা বিশ্বাস করিত যে, মানুষের রোগ ইত্যাদি বিধাতার অভিশাপ বশতঃই হইয়া থাকে। সে সময়ে গ্রীকেরা রোগাক্রান্ত হইলে রোগদেবতা এবং আরোগ্যদেবতা ঈস্‌কুলেপিয়াসের (Æsculapius) মন্দিরে পূজার অর্ঘ্য পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত থাকিত। মন্দিরের পুরোহিতকে ধনরত্ন ও স্বর্ণ উপঢৌকন দিয়া তাহারা চিকিৎসার ব্যবস্থা করিত। যাজক চিকিৎসকেরা নানারূপ যাদুমন্ত্র আওড়াইয়া ও রোগীর গলায় জন্তুবিশেষের যকৃৎ ভরিয়া মাদুলী তৈয়ারী করিয়া তাহা ব্যবহার করিতে দিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিতেন। রোগী যদি এরূপ অদ্ভুত চিকিৎসায় আরোগ্য লাভ করিত, তাহা হইলে পুরোহিতেরা বলিতেন, দেবতার কোপ হ্রাস পাইয়াছে, নতুবা বলিতেন যে, দেবতার ক্রোধ এখনও যায় নাই।



হিপোক্রেটিস্

হিপোক্রেটিস্ এই সব কুসংস্কারের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ঈস্‌কুলেপিয়াস দেবতার পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু তিনি পৌরোহিত্য অস্বীকার করিয়া মানবের কল্যাণব্রতে রোগের নিদান খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গ্রীসদেশে তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক। হিপোক্রেটিস্ বলিতেন, কোন কারণ ব্যতীত মানুষের দেহে রোগের প্রাদুর্ভাব হয় না। এই জন্য তিনি কোন পীড়িত ব্যক্তির রোগের মূল কারণ বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান

করিতেন। এইভাবে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক বিধানানুসারে চিকিৎসা শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন হইল।

ঈজিয়ান (Ægean) দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্ভূত কস্ (Cos) নামক দ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার শিক্ষা-সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে কিংবদন্তী এইরূপ যে, হিপোক্রেটিস নানা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। চিকিৎসা শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করাই ছিল এইরূপ ভ্রমণের উদ্দেশ্য। তিনি থ্রেস (Thrace), থেশালি (Thessaly), দেলোস্ (Delos), এথেন্স প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাদান এবং চিকিৎসা ব্যবসায় করিলেও

কাল, প্রভৃতি যে সব শব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন, তাহা হিপোক্রেটিস্ প্রথমে ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহৃত এই তিনটি শব্দ বর্ত্তমান সময়েও সেই অর্থেই ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

এই সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বিশ্বাস করিতেন যে, মানুষ নিজে শরীরের যন্ত্রগুলির প্রতি এবং স্বাস্থ্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়া চলিলে অনায়াসেই নীরোগ শরীরে দীর্ঘজীবন লাভ করিতে পারে। অনেক সময় তিনি অনেক পীড়িত ব্যক্তিকে কোনরূপ ঔষধ ব্যবহার করিতে না দিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিতে বলিতেন।





চারিশত খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দের গ্রীক্ চিকিৎসকের চিকিৎসালয়ের রোগীদের ঔষধ প্রয়োগ ও অস্ত্রোপচারের দৃশ্য

তাঁহার জীবনের বেশীর ভাগ সময় জন্মভূমি কসেই অতিবাহিত হইয়াছিল। এখানকার চিকিৎসা সমিতির তিনিই প্রধান অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ অনুযায়ী চিকিৎসকমণ্ডলী রোগ নির্ণয়ের জন্য যত্নপূর্ব্বক গবেষণা করিতেন। চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ ইত্যাদিও তিনি কসে থাকিয়াই রচনা করিয়াছিলেন।

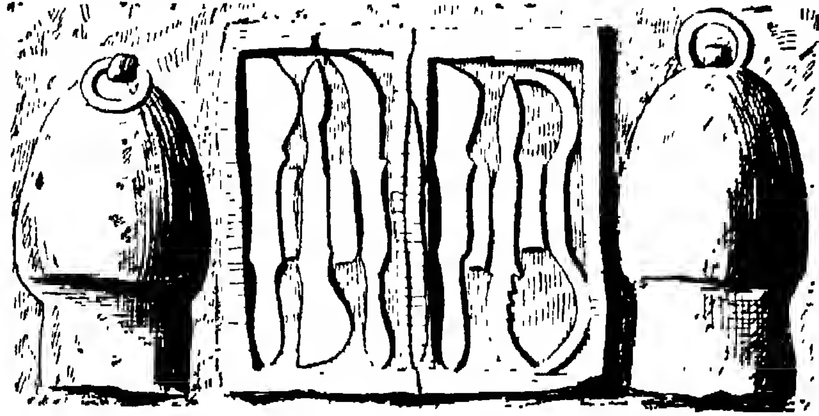
হিপোক্রেটিস্ প্রণীত চিকিৎসাশাস্ত্র বিষয়ক অনেক গ্রন্থ এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি। এই সকল গ্রন্থে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের বিষয়, পথ্যাদির বিষয় এবং বিশেষ করিয়া রুগ্ন ও সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে পথ্যাদির বিভিন্নতা সম্বন্ধে অনেক কথা লেখা আছে। আজকালকার বড় বড় চিকিৎসকেরা রোগের বিভিন্ন অবস্থার Chronic (পুরাতন বা দীর্ঘকাল স্থায়ী রোগ) Acute (তরুণ রোগ) এবং Crisis (রোগের সঙ্কট

জল, বায়ু ও স্থানের পরিবর্ত্তন করাইয়া তিনি বহু জটিল রোগীকেও সুস্থ এবং সবল করিয়াছিলেন। শরীরের ও রোগের অবস্থানুসারে শীতল জলে বা উষ্ণ জলে স্নান করিতেও তিনি বহু ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেন এবং ঐরূপ স্নান করাইয়া তিনি বহু রোগীকে রোগমুক্ত করিতেন।

প্রত্যেক সহরে যাহাতে বিশুদ্ধ পানীয় জলের সরবরাহ হয়, সেদিকে তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। তাঁহার রচিত বায়ু, জল ও স্থান (on airs, waters and place) সম্পর্কিত বহিখানি বহু ভাষায় অনূদিত হইয়াছে।

কসে অবস্থান কালে এই বিজ্ঞ চিকিৎসক শরীর সংস্থানবিদ্যা (Anatomy) সম্বন্ধে অনেক তথ্যানুসন্ধান করিয়াছিলেন। নর-কঙ্কালের সহিত অন্যান্য মেরুদণ্ডী জীবের কঙ্কালের তুলনামূলক আলোচনা করিয়া তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের এক নূতন পথ উন্মুক্ত

করিয়াছিলেন। এক কথায় তিনি তুলনামূলক শারীর বিজ্ঞান বিদ্যার (Comparative Anatomy) প্রথম পথ-নির্দ্দেশক। এই সব গবেষণার দ্বারা কোথায় তিনি সফলকাম হইয়াছেন, কোথায় বিফলমনোরথ হইয়াছেন, সব কথাই তাঁহার লিখিত গ্রন্থে সযত্নে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। হিপোক্রেটিস্ বলিতেন,—আমি যে সব পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই, তাহা লিখিয়া যাওয়ায় এই সুফল হইবে যে ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীরা আমার ভুলের সংশোধন করিয়া প্রকৃত পথে চলিতে পারিবেন। তাঁহার জ্ঞানগর্ভ বাণী—"Life is brief, but art is long, the emergency swift, the test deceptive, and judgment difficult".



প্রাচীন গ্রীকদের অস্ত্রোপচারের যন্ত্র।

চিকিৎসা ব্যবসায়কে সমাজে সম্মানজনক করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহার একান্ত আগ্রহ ছিল। সেজন্য কসের চিকিৎসা ব্যবসায়ীদিগকে তিনি অঙ্গীকারবদ্ধ করাইয়াছিলেন, সেখানকার চিকিৎসাবিদ্যালয় হইতে উত্তীর্ণ ছাত্রেরা যখন চিকিৎসা ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবে, তখন তাহাদিগকে তাঁহাদের আয়ের একাংশদ্বারা সাহায্য করিতে হইবে। এই রীতি হিপোক্রেটিসের প্রতিশ্রুতি (Oath of Hippocrates) নামে পরিচিত

তিনি আরও বলিতেন—আমি পবিত্রভাবে জীবন যাপন করিয়া আমার এই কল্যাণকর ব্যবসায়ের মঙ্গল সাধন করিব। আমি রোগীর বাড়ীতে তাহার রোগ দূর করিবার মঙ্গল উদ্দেশ্য লইয়াই অগ্রসর হইব। অর্থের প্রলোভনে নহে।

এই মহানুভব মহাপুরুষের সময় হইতেই চিকিৎসা ব্যবসায় প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিমূলক পথে অগ্রসর হইয়া মানবজাতির পরম মঙ্গলের কারণ হইয়াছে।

অ্যারিষ্টটল্

[আনুমানিক ৩৮৪-৩২২ খৃঃ পূঃ অব্দ]

দার্শনিক বলিয়া অ্যারিষ্টটলের নাম জগদ্বিখ্যাত প্রকৃত পক্ষে অ্যারিষ্টটলের ন্যায় নানা বিষয়ে সুপণ্ডিত ব্যক্তি প্রাচীন গ্রীসে বড় ছিল না। তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা কাব্য, পদার্থবিদ্যা, দর্শন, জীববিজ্ঞান, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। জীবিত প্রাণী বা জীববিজ্ঞানসম্বন্ধে তিনি যে গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে মনে হয় যে, ঐ বিষয়ে তাঁহার পূর্ব্বে কেহ ঐরূপ স্বাধীন চিন্তাও করেন নাই এবং উৎকৃষ্ট গ্রন্থও রচনা করেন নাই।

গ্রীক্ উপনিবেশ থ্রেসের অন্তর্গত ষ্টাগিরা (Stagira) নামক স্থানে অ্যারিষ্টটল জন্মগ্রহণ করেন। অ্যারিষ্টটলের পিতা ম্যাকিডোনের রাজা ফিলিপের একজন চিকিৎসক ছিলেন। শৈশবে নৃপতি ফিলিপ বালক অ্যারিষ্টটলের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিতেন। আঠারো বৎসর বয়সে অ্যারিষ্টটল এথেন্সের সুবিখ্যাত একাডেমি (Academy) তে সে সময়ের সুবিখ্যাত পণ্ডিত প্লেটোর নিকট শিক্ষালাভ করেন। একাডেমিতে তিনি অসাধারণ প্রতিভাশালী ছাত্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিলেন। একবার প্লেটো, অ্যারিষ্টটলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন—অ্যারিষ্টটল্ "একাডেমির মন।" প্রায় কুড়ি বৎসর কাল এই মেধাবী যুবক এথেন্সের বিদ্বৎসমাজে থাকিয়া নানা বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন। প্লেটোর মৃত্যুর পরে তিনি থ্রেসের নানাস্থানে ভ্রমণ করেন এবং কিছুকাল লেস্‌বস্‌ (Lesboss দ্বীপে থাকিয়া সামুদ্রিক জীব জন্তুর প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি ম্যাকিডোনিয়ায় যাইয়া রাজা ফিলিপের পুত্রের গৃহ-শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। এই বালকই

ভবিষ্যতে দিগ্বিজয়ী বীর আলেকসান্দের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। আলেকসান্দের যখন পারস্য বিজয়ে অগ্রসর হইলেন তখন অ্যারিষ্টটল্ এথেন্সে থাকিয়া সেখানে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিলেন এবং তাহার নাম দিলেন "লাইসিয়াম্" (Lyceum)।

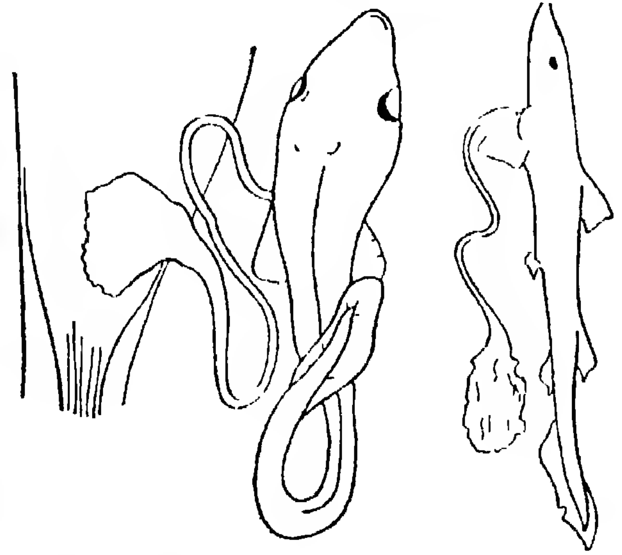
জীবতত্ত্ব সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে আলোচনা করিবার ফলেই ভবিষ্যতে তিনি একজন শ্রেষ্ঠ জীববিজ্ঞান বিশারদ পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইতে পারিয়াছিলেন। অ্যারিষ্টটলের পিতা চিকিৎসক ছিলেন বলিয়া শৈশবেই শারীরসংস্থান বিদ্যা সম্পর্কে তিনি



অ্যারিষ্টটল্

জ্ঞানলাভ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। এথেন্সে সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর অ্যারিষ্টটল্ তাঁহার শিষ্য আলেকসান্দেরকে বলিয়াছিলেন- "তুমি যখন যে দেশে যুদ্ধ করিতে যাইবে, সে দেশের দুর্লভ জীবজন্তু সংগ্রহ করিয়া আমাকে পাঠাইয়া দিও।' আলেকসান্দের গুরুর এই আদেশ পালন করিয়াছিলেন।

অ্যারিষ্টটল্ এইরূপে নানাদেশের জীবজন্তুর শরীর কাটিয়া তাহাদের মস্তিষ্কের গঠন-প্রণালী, দেহের গঠন-প্রণালী এবং অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্নরূপ আকৃতি ও সংস্থান পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। ডিম ফুটিবার আগে ডিমের পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, সকলের আগে হৃদ্‌পিণ্ডই বাড়িয়া থাকে। অনেক সময় দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, তাঁহার জীবিত প্রাণীদের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে অতিবাহিত হইত। কোন্ অস্থি'র কি দরকার, অন্য কোন্ অস্থি'র সহিত তাহার কি যোগ, কেমন তাহার গঠন ইত্যাদি অস্থি পরিচয় অ্যারিষ্টটল্ প্রথমে আবিষ্কার করেন। এইভাবে নানা জীবজন্তুর আকৃতি প্রকৃতি ও গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদের জাতি বিভাগ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডলফিন্, (ক্ষুদ্র জাতীয় তিমি মৎস্য, ইহার দৈর্ঘ্য পাঁচ ফিট হইয়া থাকে এবং মৃত্যুকালে ইহাদের দেহ নানা উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত হয়



অ্যারিষ্টটল্ জীবজন্তুর দেহ এইরূপে ব্যবচ্ছেদ করিয়া তাহাদের শরীরের গঠনের পরিচয় লাভ করিয়াছিলেন

হোয়েল (Whale) বৃহদাকার তিমির সহিত মৎস্য-জাতীয় প্রাণীর কি প্রভেদ, তাহা তিনি বিশদভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৃহপালিত কবুতরের সহিত বন্যকবুতর এবং পাহাড়িয়া কবুতরের সাহত শ্যামা-ঘুঘুর (Turtle dove) কি প্রভেদ, তাহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

অ্যারিষ্টটলের লিখিত 'প্রাণীদের ইতিহাস' (The History of Animals) এবং প্রাণীদেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শীর্ষক গ্রন্থ দুইখানিতে প্রায় পাঁচশত রকমের জীবিত প্রাণীর বিষয় লিখিত আছে। তাঁহার এই গ্রন্থ দুইখানিতে পূর্ব্বতন জীববিদ্যাবিশারদ পণ্ডিত-গণের লিখিত তথ্যসমূহের ভ্রমপ্রমাদও প্রদর্শিত হইয়াছিল। এই পুস্তক পড়িলে এখনও আমরা অনেক নূতন নূতন বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে পারি।

পশু-পক্ষী এবং বৃক্ষলতাদি বিষয়ে তাঁহার অতি প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল। তিনি সকল পশুপক্ষীর বাহ্য আচার ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করিতেন এবং অবশেষে তাহাদের উপর অস্ত্রোপচার করিয়া শরীরের ভিতর পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। শুধু কি তাই? জীবজন্তুর জীবনধারণের উপায়, তাহারা কি খায়, কেমন ভাবে খায় কেমন ভাবে সন্তান পালন করে, ইত্যাদি সব বিষয়েই পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এই সমুদয় পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তিনি জন্তুবিজ্ঞানকে বিশেষ বিশেষ ভাগে বিভক্ত করিয়া গিয়াছেন। এখনও আমরা জন্তুবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁহারই নির্দ্দিষ্ট পথের অনুসরণ করিয়া চলিতেছি।

অ্যারিষ্টটল্ আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া পৃথিবী যে গোলাকার, এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের পৃথিবীর আকার সম্বন্ধে তাঁহার সঠিক কোনও ধারণা ছিল না। তিনি পৃথিবীর প্রকৃত আকার অপেক্ষা ইহাকে অনেক ছোট বলিয়া মনে করিতেন। অ্যারিষ্টটল্ লিখিয়াছিলেন—"ইহা অসম্ভব নহে যে, হার্কিউলিসের স্তম্ভের (Pillars of Hercules) নিকটবর্ত্তী প্রদেশের (জিব্রাল্টার) সহিত ভারতবর্ষের সংযোগ আছে এবং একটি মাত্র মহাসাগর ব্যবধান রহিয়াছে।" অনেকে মনে করেন যে, কলম্বাস অ্যারিষ্টটলের এই লিখিত বিবরণী পাঠেই বরাবর পশ্চিমদিকে জাহাজ চালাইয়া ভারতবর্ষে পৌঁছিতে পারিবেন বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া তদনুরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

অ্যারিষ্টটলের লিখিত জ্যোতিষবিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থে, জীববিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থে নানাপ্রকার ভ্রমপ্রমাদ আছে স্বীকার করিলেও তাঁহার স্বাধীন গবেষণা এবং তথ্যানুসন্ধান পৃথিবীর ইতিহাসে চিরদিন তাঁহাকে স্মরণীয় করিয়া রাখিবে।

অ্যারিষ্টটল্ বলিতেন—"যে পর্য্যন্ত কোন বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া প্রত্যেকটি বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে না পারিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে বিষয়ে কোনরূপ অভিমত প্রকাশ করিও না।"

আর্কিমেডিস্

[আনুমানিক ২৮৭—২১২ খৃ পূর্ব্বাব্দ]

আনুমানিক বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বে গ্রীস্ সাম্রাজ্যের অধীন সাইরাকিউস্ নামক নগরে আর্কিমেডিসের জন্ম হয়। আর্কিমেডিসের ন্যায় পণ্ডিত সেকালে ইউরোপে দ্বিতীয় কেহ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তিনি দিন-রাত আপনার অধ্যয়ন ও গণিত বিজ্ঞানের গবেষণা লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন। সে সময়ে সাইরাকিউসের রাজা ছিলেন হীয়েরো। হীয়েরো আর্কিমেডিস্‌কে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহাকে আপনার বন্ধু জ্ঞানে সম্মানিত করিতেন। রাজা হীয়েরোর অনুরোধে আর্কিমেডিস্ বিজ্ঞানের বড় বড় জটিল তত্ত্ব এবং তাঁহার সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম হিসাব পরিত্যাগ করিয়া দেশের ও জনসমাজের কল্যাণকর কিছু কিছু "কেজো জিনিষ" অর্থাৎ কার্য্যকরী শিল্পদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সে সকলের মধ্যে নানা রকম স্ক্রু, জল তুলিবার জন্য প্যাঁচাল পাম্প ও জলে চালান এবং বাতাসে চালান অনেক রকম যন্ত্রপাতির সৃষ্টি করেন। তোমরা হয়ত অনেকে পাখা টানিবার জন্য দেয়ালে চাকার পুলি দেখিয়া থাক। এই পুলি জিনিষটাও আর্কিমেডিস্ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। সচরাচর ষ্টীমারে, জাহাজে, নৌকায়, রেলগাড়ীতে ও বড় বড় কারখানায় তোমরা দেখিতে পাও যে, মাল উঠানামা পুলির সাহায্যে অতি সহজে সম্পন্ন হইতেছে। পুলি না হইলে মাল উঠা-নামাই চলে না, এ সমুদয়ই আর্কিমেডিসের আবিষ্কারের দ্বারাই সম্পন্ন হইতেছে। দেশের লোকেরা তাঁহার এই সব আবিষ্কার দেখিয়া বুঝিতে পারিল যে, আর্কিমেডিস্ শুধু বসিয়া বসিয়া চিন্তা করেন না, সত্য সত্যই তিনি মহাপণ্ডিত ব্যক্তি।

আর্কিমেডিসের জীবনের একটি গল্প হয়ত তোমরা অনেকেই শুনিয়া থাকিবে। একবার তাঁহার বন্ধু সাইরাকিউসের রাজা হীয়েরো এক স্বর্ণকারের দ্বারা একটা মুকুট প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। স্বর্ণকার মুকুট প্রস্তুত করিয়া রাজার হস্তে প্রদান করিলে, নৃপতি আর্কিমেডিস্‌কে সেই মুকুট অকৃত্রিম স্বর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থ উহাতে মিশ্রিত হইয়াছে কি না, তাহা নির্ণয় করিতে দেন। আর্কিমেডিস্ সব শুনিয়া বলিলেন, "আমি একটু ভাবিয়া বলিব।" ভাবিতে ভাবিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। একদিন এই কথা চিন্তা করিতে করিতে একটি ঝরণার নিকট গমন করিলেন। তখন ঝরণার নিম্নে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার (চৌবাচ্চা) থাকিত। লোকেরা ঐ সব চৌবাচ্চায় বসিয়া স্নান করিত। একদিন স্নানের সময় কাপড় ছাড়িয়া সবে তিনি স্নানের টবে পা দিয়াছেন, এমন সময়

খানিকটা জল উছলিয়া পড়া মাত্র হঠাৎ সেই প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান তাঁহার মাথায় আসিল। আর্কিমেডিস্ তৎক্ষণাৎ সেই অবস্থায় "Eureka! Eureka!!" পাইয়াছি! পাইয়াছি! বলিয়া আনন্দে চীৎকার করিতে করিতে পথে বাহির হইলেন। রাজার নিকট যাইয়া যখন উৎফুল্ল চিত্তে কহিলেন—Eureka! Eureka! তখন রাজা বলিলেন, "কি পাইয়াছ?" আর্কিমেডিস্ তখন যে সত্য আবিষ্কার করিয়াছেন, রাজার নিকট তাহার বিবরণ প্রদান করিলেন।

আর্কিমেডিস যাহা পাইয়া আনন্দে উন্মত্তপ্রায় হইয়াছিলেন, বিজ্ঞানে তাহা "আর্কিমেডিসের তত্ত্ব" বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ভারি জিনিস জলে ছাড়িলে তাহার ওজন কমিয়া যায়। কি পরিমাণ কমিবে তাহা হিসাব করিয়া বলিতে পারা যায়। যদি



সাইরাকিউসের রাজা হীয়েরো

কোন হাল্কা জিনিস জলে ভাসান যায়, তাহা হইলে তাহার খানিকটা ডোবে, খানিকটা ভাসিয়া থাকে। ঠিক কতখানি ডুবিয়া যায়, তাহারও হিসাব আছে। আর্কিমেডিসের তত্ত্বে এই সব বিষয়ই আলোচনা করা হইয়াছে। আর্কিমেডিস্ রাজাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে ঐ স্বর্ণমুকুটের ওজন যতখানি, ঠিক সেই ওজনের সোণা লইয়া একটা জলভরা পাত্রে পরীক্ষা করিতে হইবে। জলপাত্রের মধ্যে মুকুট ডুবাইয়া দিলে কত খানি জল উছলিয়া পড়ে, তাহা মাপিয়া দেখুন, তাহার পর আবার জল ভরিয়া সেই ওজনের একতাল সোনা ডুবাইয়া দেখুন, কতটা জল পড়ে। মুকুট যদি খাটি সোনার হয়, তবে দুইবারই ঠিক একই পরিমাণ জল পড়িবে। যদি খাদ মেশান থাকে, তবে মুকুট সেই ওজনের সোনার অপেক্ষা আয়তনে কিছু বড় হইবে, সুতরাং তাহাতে বেশী জল ফেলিয়া দিবে। এইরূপ পরীক্ষার দ্বারা রাজমুকুটের মধ্যে কি পরিমাণ অন্য পদার্থ মিশ্রিত হইয়াছিল, তাহা ধরা গিয়াছিল।

আতসী কাচের কথা তোমরা জান। ঐ কাচে অনেকখানি সূর্য্যের আলোক অল্প জায়গার মধ্যে



আর্কিমেডিসের আবিষ্কৃত জল তুলিবার প্যাঁচাল পাম্প

ধরিয়া আনা যায়। এই রকম কাচ যদি খুব বড় রকম করিয়া তৈয়ারী করা যায়, তাহা হইলে তাহার মধ্যে রৌদ্র ধরিয়া আগুন জ্বালানও যায়। সরার মত ভিতরে গর্ত্তওয়ালা আরসি দিয়াও এইরূপ আগুন জ্বালান যাইতে পারে। আর্কিমেডিস্ আগুন জ্বালিবার মত এইরূপ অনেক আরসিও তৈয়ারী করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, রোমের যুদ্ধজাহাজ যখন সাইরাকিউস আক্রমণ করিতে আসে তখন তিনি এই রকম আরসি প্রখর রৌদ্রের মধ্যে রাখিয়া তাহা দিয়া রোমীয় জাহাজে আগুন ধরাইয়া দিয়াছিলেন। রোমীয় সেনাপতি মার্সেলাস যখন সৈন্যসামন্ত লইয়া সাইরাকিউস্

আক্রমণ করিতে আসেন, তখন আর্কিমেডিস্ নগর রক্ষার জন্য নানা প্রকারের অদ্ভুত অদ্ভুত নূতন নূতন যুদ্ধযন্ত্রের ব্যবহার করিয়াছিলেন। আর্কিমেডিসের এই সব আবিষ্কারের বিষয় জানিতে পারিয়া রোমীয় সৈন্যগণ বহুদিন পর্য্যন্ত সাইরাকিউস নগর আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই।

রোমীয় সৈন্যেরা সে সকল যুদ্ধাস্ত্রের বর্ণনা দিয়াছে, তাহা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক। তাহারা লিখিয়াছে, বড় বড় থামের মত চূড়া হঠাৎ দেয়ালের উপর মাথা তুলিয়া হুড় হুড় করিয়া শত্রুর উপর রাশি রাশি পাথর ছুঁড়িয়া মারে, আবার দেয়ালের পশ্চাতে লুকাইয়া যায়। বড় বড় কলের ধাক্কায় কড়ি বরগা ছুটিয়া শত্রুর জাহাজে গিয়া পড়ে, দূর হইতে প্রকাণ্ড নখাল সাঁড়াশি চালাইয়া শত্রুর জাহাজ উপড়াইয়া আনে। এই সকল দেখিয়া রোমীয় সৈন্যেরা জাহাজ লইয়া দূরে সরিয়া গেল। মার্সেলাস্ বুঝিতে পারিলেন যে, যুদ্ধ করিয়া সাইরাকিউস জয় করা সম্ভব নহে। এজন্য তিনি সৈন্যদিগকে বলিলেন, "তোমরা সাইরাকিউস নগরে প্রবেশ করিবার সমুদয় পথঘাট আটকাইয়া বসিয়া থাক, নগরের খাদ্য ফুরাইলে আপনা হইতেই নগরবাসীরা আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইবে।



আর্কিমেডিস্ স্বয়ং যন্ত্রাদির পরিচালনা করিয়া নগর করিতেছেন।

তিন বৎসর কাল পর্য্যন্ত রোমীয়েরা সাইরাকিউসের চারিদিক ঘেরিয়া রহিল। তারপর যখন নগরে খাদ্যাভাব হইল—লোকেরা না মরিবার উপক্রম হইল, তখন সাইরাকিউস অধিকার করা সহজ হইয়া উঠিল।

সে সময়ে মার্সেলাস সৈন্যদিগকে আদেশ দিলেন যে তোমরা যাইয়া নগর লুণ্ঠন কর; f সাবধান আর্কিমেডিসের কোন অনিষ্ট করিও না

আর্কিমেডিস্ এইরূপ সঙ্কট সময়েও তাঁহার গণিত-

। লইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া থাকিতেন। শত্রু-সৈন্য যখন সমস্ত বাধা অতিক্রম করিয়া নগরের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইল, তখনও তিনি বালুকারাশির উপর ক্ষেত্রতত্ত্বের চিত্র সকল অঙ্কিত করিতেছিলেন। নগরের কোথায় কি ঘটিতেছে, তাঁহার সে বিষয়ে কোন হুঁস্ ছিল না। রোমীয় সৈন্যেরা সেই ৭৫ বৎসরের বৃদ্ধকে আর্কিমেডিস বলিয়া চিনিতে পারিল না। তাহারা কোলাহল করিতে করিতে ঘরে ঢুকিয়া তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু তিনি গণিত চিন্তায় এমন তন্ময় হইয়াছিলেন যে, তাহাদের কোন কথাই তাঁহার কানে গেল না। শত্রু-সৈন্য যখন তাঁহাকে বধ করিবার জন্য তাঁহার কেশাকর্ষণ করিয়াছে, তখনও তিনি গণিত-তত্ত্বে মগ্ন। একবার মস্তক উত্তোলন পূর্ব্বক শত্রু-সৈন্যের প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া আবার আপনার চিন্তায় মগ্ন হইলেন। শত্রু-গণ যখন সজোরে আঘাত করিল, তখন কেবল একবার উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "সাবধান! আমার অঙ্কপাত যেন মুছিয়া যায় না!" মূর্খ সৈনিকের তরোয়ালের আঘাতে তাঁহার মস্তক দেহচ্যুত হইল—তাঁহার জীবনের শব হিসাব আর হইল না। তাঁহার শোণিত-ধারায় উহা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হইয়া গেল। ঐতিহাসিক প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন, আর্কিমেডিসকে রোমীয় সৈন্যগণ তাহাদের প্রধান সেনাপতির নিকট যাইতে বলিলে আর্কিমেডিস্ বলিয়াছিলেন, আমি আমার গণিতের এই সমস্যাটি পূরণ না করিয়া যাইব না। সৈন্যগণ তাঁহার এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তরবারির আঘাতে তাঁহাকে হত্যা করিয়া ফেলিল।

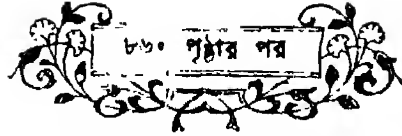


আর্কিমেডিসের হত্যা

রোম সেনাপতি মার্সেলাস যখন আর্কিমেডিসের মৃত্যুসংবাদ শুনিলেন, তখন তিনি সৈনিকদিগকে অত্যন্ত ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। তিনি মৃত মহাপুরুষ আর্কিমেডিসের সমাধির উপর একটি অতি সুন্দর কারুকার্য্য-শোভিত শ্বেতমর্ম্মরের সমাধি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। আর্কিমেডিসের আবিষ্কৃত কম্পাস্ বা দিগদর্শন যন্ত্র সেই কতকাল হইতে আজ পর্য্যন্তও সমুদ্র-পথে নাবিকদের সাহায্য করিতেছে। পদার্থবিদ্যা, ক্ষেত্র-তত্ত্ব এবং পূর্ত্তকার্য্য সম্বন্ধেও তিনি অনেক নূতন তথ্য আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এখনও আর্কিমেডিসের সমাধির ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া রহিয়াছে।

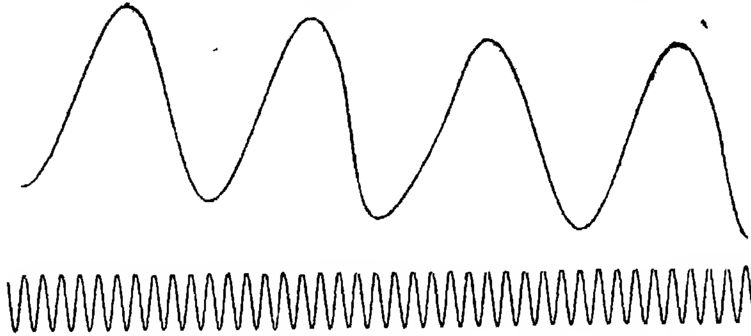


সুরের লহর

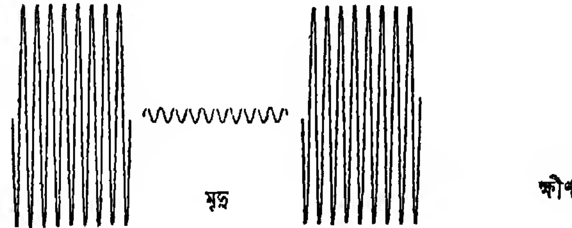

৮৬০ পৃষ্ঠার পর

আমরা এ পর্য্যন্ত কেবল শব্দ-তরঙ্গের বিস্তারের কথাই বলিয়াছি। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের সম্বন্ধে কোন কথা বলি নাই। বাদ্যযন্ত্র হইতে তোমরা মোটা, সরু নানারকমের সুর শুনিতে পাও কিন্তু বাদ্যযন্ত্রে কি প্রকারে শব্দ উত্থিত হয়, কেমন করিয়া সুর মোটা ও চড়া করা যায়, কি প্রকারে সুরের মধুরতা বাড়ে ও কমে, এ সব বিষয়ে আজ তোমাদের কাছে আলোচনা করিব।

সুর কেমন করিয়া মোটা ও চড়া হয়, সে-বিষয়ে পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে। সেখানে এই কথাই বুঝান হইয়াছে যে, কোনও যন্ত্র যদি নিয়মিতভাবে কাঁপিতে থাকে, তাহা হইলে বায়ুতে শব্দতরঙ্গ প্রবাহিত হয়। ঐ যন্ত্র এক সেকেণ্ডে যদি ৫১২ বার কাঁপে, তাহা হইলে কানের উপর ৫১২ বার শব্দ-তরঙ্গের চাপ বাড়িবে এবং কমিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরের মাত্রা এক প্রকার হইবে। এখন যদি সেই যন্ত্রটি ১০২৪ বার কম্পিত হয়, তাহা হইলে সুর এক সপ্তক চড়িবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, যন্ত্রের কম্পমান মাত্রার উপরেই সুর মোটা চওড়া হয়।



চিত্র—১। উপরে মোটা সুর এবং নীচে চড়া সুরের কম্পন রেখা।



চিত্র—২। সুরের মাত্রা একই, কিন্তু ক্ষীণ, মৃদু এবং উচ্চ শব্দের কম্পন রেখা

বৈজ্ঞানিক মতে তাহা হইলে দেখিতেছি যে, যন্ত্রের কম্পমান মাত্রার উপরেই সুর মোটা ও চড়া হয়। গায়কদের মতে সুরের কতকগুলি মাত্রা আছে। যেমন দ্বিগুণভাবে কম্পিত হইলে, দ্বিতীয় সুর প্রথম সুর অপেক্ষা এক সপ্তক চড়া হয়। সেইরূপ অনেকগুলি সুরের ধাপ আছে—যেমন—সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি—সা। সা হইতে র্সা পর্য্যন্ত মোটামুটি সাতটি সুর আছে। সা-এর কম্পমান মাত্রা যদি ১ ধরা হয়, তাহা হইলে রে'-র কম্পমান মাত্রা হইবে $\frac{৯}{৮}$,

"গা"-র কম্পমান মাত্রা হইবে $\frac{৫}{৪}$
"মা"-র ,, ,, ,, $\frac{৪}{৩}$
"পা"-র ,, ,, ,, $\frac{৩}{২}$
"ধা"-র ,, ,, ,, $\frac{৫}{৩}$
"নি"-র ,, ,, ,, $\frac{১৫}{৮}$
"সা"-র ,, ,, ,, ২

হারমোনিয়মে এই সাতটি সুর সাদা পরদায় দেখান হয়, এবং অন্যান্য মধ্যবর্ত্তী সুরগুলি কাল পরদা দ্বারা পরিচিত হয়। বাস্তবিক পক্ষে সাধারণ হারমোনিয়মে উক্ত নিয়মের একটু ব্যাতিক্রম আছে। গায়কদের সুবিধার জন্য এক সপ্তক সুরের মাত্রাকে সমানভাবে ১২ ভাগে বিভক্ত করা হইযাছে। যাহাতে প্রত্যেক পাশাপাশি পরদার কম্পমান মাত্রা $২^{\frac{১}{১২}}$ হয় অর্থাৎ ১'০৫৯৪৬। উপরে দেখিতেছি, পাশাপাশি পরদার কম্পমান মাত্রা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের। যেমন ধা এবং পা, "ধা"য়ের কম্পমান মাত্রা পা অপেক্ষা $\frac{১০}{৯}$ গুণ অধিক। আবার পা মা অপেক্ষা $\frac{৯}{৮}$ গুণ প্রত্যেক সেকেণ্ডে কম্পিত হইতেছে। কিন্তু গায়কদের একটু অসুবিধা হয় বলিয়া প্রত্যেক পাশাপাশি পরদার কম্পমান মাত্রা ১'০৫৯৪৬ রাখা হইয়াছে। এইরূপে সা-র পরবর্ত্তী সুরের নাম সা তীব্র, কাল পরদা; শুদ্ধ রে সাদা পরদা, রে তীব্র কাল পরদা, শুদ্ধ গা সাদা পরদা; নিম্নলিখিত তালিকা হইতে সমস্ত বিবরণ পাওয়া যাইবে। সব মিলাইয়া আমরা দেখিতেছি যে, হারমোনিয়মে ১২টি সুর আছে—৫টি কাল পরদা, আর ৭টি সাদা। কোমল পর্দ্দা ও তীব্র পর্দ্দা

কো তী
রে মা

এইরূপে চিহ্নিত হয়। হারমোনিয়মে এইরূপে ৩টি সপ্তক থাকে। প্রত্যেক সপ্তকে ১২টি করিয়া পর্দ্দা; এবং সপ্তকের কোন এক পর্দ্দার সুরের কম্পমান মাত্রা পূর্ব্বেকার সপ্তকের corresponding পর্দ্দা অপেক্ষা দ্বিগুণ হইবে। মনে কর, প্রথম গা-র কম্পমান মাত্রা ১৬০, দ্বিতীয় পর্দ্দার গা-র মাত্রা ৩২০, ৬৪০, এবং চতুর্থে ১২৮০ হইবে।*

হারমোনিয়ামের পর্দ্দার এক সপ্তক
সুরের মাত্রা

সুরের নাম	কম্পমান মাত্রা	পরদার বিবরণ
সা	১	সাদা
সা তীব্র	১'০৫৯৪৬	কাল
রে শুদ্ধ	,,	সাদা
রে তীব্র	,,	কাল
গা শুদ্ধ	,,	সাদা
মা শুদ্ধ	,,	,,
মা তীব্র	,,	কাল
পা শুদ্ধ	,,	সাদা
পা তীব্র	,,	কাল
ধা শুদ্ধ	,,	সাদা
ধা তীব্র	,,	কাল
নি শুদ্ধ	,,	সাদা
র্সা	,,	,,

এখন হয়ত তোমরা এই প্রশ্ন করিবে যে, কেমন করিয়া কম্পমান মাত্রা জানিতে পারা যায়। হারমোনিয়মের পাশাপাশি পর্দ্দাগুলি ১ সেকেণ্ডে

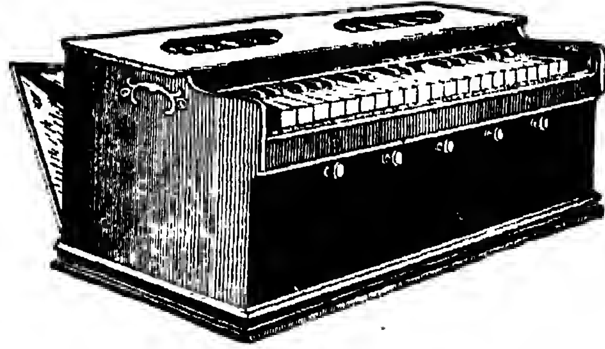
* সপ্তক নাম সাতটি পর্দ্দা বা সুর হইলে ঠিক হইবে, কিন্তু বারটি পর্দ্দা থাকায় নামটি ঠিক হইতেছে না। তথাপি এখনও ঐ নামেই চলিয়া আসিতেছে। শিশু-ভারতীর ২১১ পৃষ্ঠায় লিখিত 'সঙ্গীত ও শিল্প' বিষয়ক প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে ইহা সুবিধা হইবে।

কতবার কম্পিত হইতেছে, ইহা কিরূপে জানিতে পারা যায়? গায়কদের ইহা জানিবার দরকার হয় না। তাঁহারা প্রথম সুরটি বাজাইয়া দ্বিতীয়টি বাজাইতে থাকেন এবং কানে শুনিয়া তাহাদের সুরের মাত্রা বুঝিয়া লইয়া থাকেন। সুরের মাত্রা ঠিক্ না হইলে কানে কর্কশ বোধ হয়। অনেক সময়ে তাঁহারা Tuning fork বা সুর-মিলান যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকেন। ৪নং চিত্রে একটি Tuning fork দেখান হইল। ইহা সাধারণতঃ ভাল steel বা ইস্পাতের তৈরী হয়। চিমটার মতন আকার এবং নিম্নদেশে একটি গুঁড়ি (stem) আছে এবং ছোট ফাঁপা কাঠের এক ধার খোলা বাক্সের sound box-এর উপর গুঁড়িটি বসান থাকে রবারের হাতুড়ির দ্বারা উপরে আঘাত করিলে উপরকার অঙ্গ কম্পিত হইয়া গুঁড়ি হইতে বাক্সের মধ্যে বায়ুতে শব্দতরঙ্গ উৎপন্ন করে, এবং আমরা সেই শব্দই



চিত্র—৪। টিউনিং ফর্কের সাহায্যে সুর মিলান হইতেছে

শুনিতে পাই। এই সুর-মিলান যন্ত্রের সুর বদ্‌লাইয়া যায় না। আজকাল ইনভার ষ্টিলের টিউনিং ফর্ক হইয়াছে—যাহাতে তাপের মাত্রা কমিলে-বাড়িলেও তাহার সুর ঠিক থাকে। বৈজ্ঞানিকেরা সুর-মিলান যন্ত্রের বিষয়ে অনেক পরীক্ষা করিবার পর বিশুদ্ধ সুর-মিলান যন্ত্র তৈয়ার করিয়াছেন। ইহা গানের সময় সুর-মিলান ছাড়াও অনেক কাজে ব্যবহার হয়। ইহা দ্বারা সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাপ করিতে পারা যায়। আবার



চিত্র—৩। হারমোনিয়ম

কাহার কাহারও কোন্ কোন্ সুরে বধিরতা আছে, তাহা ভিন্ন ভিন্ন সুরের tuning fork বাজাইয়া নিরূপণ করিয়া ডাক্তারেরা তাহার সেইরূপ প্রতীকার করিয়া থাকেন।

অতি অল্প সময় মাপিবার জন্য কিরূপে সুর-মাপক যন্ত্রের ব্যবহার হইয়া থাকে, তাহার কথাই এখন বলিব। মনে কর, বেহালার একটি তার কম্পিত হইতেছে। একটি কম্পন সম্পূর্ণ করিতে, অর্থাৎ উপর হইতে নীচে আসিয়া পুনরায় উপরে আসিতে কতটুকু সময় লাগে, ইহা নিরূপণ করিতে হইলে, তারের পাশাপাশি সুর মাপক যন্ত্রটিকে আড়াআড়িভাবে রাখিয়া উত্তমরূপে আলোকিত করিতে হইবে; যাহাতে তার এবং সুর-মাপক যন্ত্রের অঙ্গ একই সমতল ক্ষেত্রে (plane) কম্পিত হইতে থাকে। আলোকিত করিলে দুইটি ছায়া উপরে নীচে পড়িলে তাহার ছবি অতি দ্রুত নিম্নগামী ফটোগ্রাফিক প্লেট দ্বারা লইলে, তাহার আকার ৫নং চিত্রের মত হইবে। পর পৃষ্ঠার ঢেউ খেলান রেখা তারে কম্পন দেখাইতেছে, এবং উপরে ঢেউখেলান রেখা সুরমাপক যন্ত্রের অঙ্গের কম্পন দেখাইতেছে। সরু রেখাযুক্ত ঢেউয়ের এক চূড়া হইতে অপর চূড়া পর্য্যন্ত সময়ে তার একটি কম্পন সম্পূর্ণ করিয়াছে। এইরূপ মোটা রেখাযুক্ত ঢেউয়ের এক চূড়া হইতে পরবর্ত্তী চূড়া পর্য্যন্ত সুর-মাপক যন্ত্রের কম্পন সময় জানাইতেছে। অতএব একটি জানা থাকিলে অন্যের কম্পন সময় নিরূপণ করা যাইতে পারে। যে সময়ে একটি কম্পন সম্পূর্ণ হইয়াছে, সেই

সময়ে ফোটোগ্রাফিক এক চূড়া হইতে পরবর্ত্তী চূড়া পর্য্যন্ত দ্রুত অগ্রসর হইয়াছে। এই সময় ১/১০০ সেকেণ্ডে বা চড়াসুরের tuning fork-এ আরও অল্প হইতে পারে।



চিত্র—৫

সুরের কথা ত বলিয়াছি। এখন ভিন্ন ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের সুরের মিষ্টতার প্রভেদ কেন হয়? যেমন সাপুড়ের





চিত্র—৬। তালপাতার বাঁশী সাপুড়ের বাঁশী

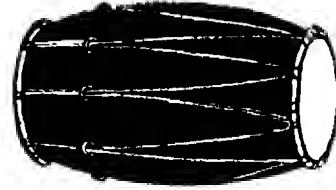
তালপাতার বাঁশী কর্কশ ও সাপুড়ের বাঁশী মিষ্ট শুনাইতেছে

খুব মিষ্টি শুনায় আর এক পয়সায় মেলার বাঁশী বড় কর্কশ বোধ হয়। সুর প্রত্যেক যন্ত্রেই একই বাজান হইতেছে, কিন্তু মিষ্টতার বিশেষত্ব আছেই। এইরূপে একই সুর যদি ভিন্ন ভিন্ন যন্ত্রে বাজান যায় তাহা হইলে সুরের মিষ্টতার তারতম্য পাওয়া যাইবে। যাঁহারা তব্‌লা এবং ঢোলের বাজনা শুনিয়াছেন তাঁহারা বলিতে পারিবেন তবলার চাঁটি কেমন গান ও অন্যান্য বাজনার সহিত খাপ খায়, আবার সেই সময় ঢোল বাজাইলে কেমন কর্কশ বোধ হয়।

এখন কথা হইতেছে এই যে, যন্ত্রের নিজস্ব মধুরতা (Quality) সেটির কারণ কি? যখনই কোনও উপায়ে যন্ত্রে সুরের সৃষ্টি করা হয়, সেই সঙ্গে আরও আনুষঙ্গিক সুরেরও সৃষ্টি হয়। কখনও তাহাদের loudness অতি অল্প হয় এবং



চিত্র—৭। তবলা বায়া

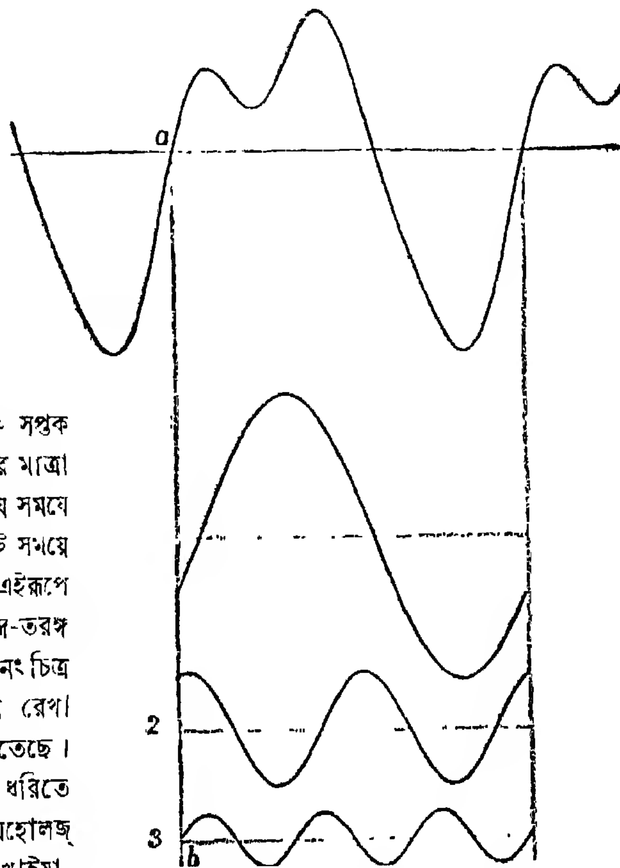


চিত্র—৮ ঢোল

শুধু-কানে শোনা যায় না। আবার কখনো এত জোরে আনুষঙ্গিক সুর বাহির হয় যে, প্রাথমিক সুরের মতনই শুনিতে পাওয়া যায়। গায়কেরা সামান্য মনোনিবেশ করিলেই আনুষঙ্গিক সুর শুনিতে পান।

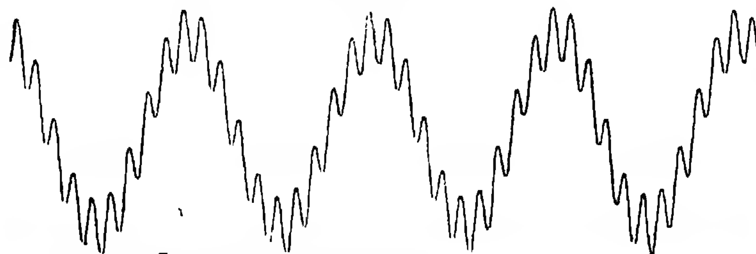
চিত্র—৯। টিউনিং ফর্কের কম্পন রেখা

টিউনিং ফর্ক সুর-মিলান যন্ত্রে আনুষঙ্গিক সুর থাকে না এবং কেবল মাত্র একটিই সুর বাহির হয়। সেই কারণে সুর মিলানর সুবিধা হয়। এইরূপ সুরকে আমরা বিশুদ্ধ সুর (Pure tone) বলিয়া থাকি। আনুষঙ্গিক সুরগুলিকে ইংরাজীতে upper partials বলা হয়। আমরা তাহাকে উপসুরও বলিতে পারি। ৯ম চিত্রে সুর মিলান যন্ত্রের কম্পন রেখা (vibration curve) দেখান হইল। দেখ কেমন ঢেউ-খেলান শুদ্ধ রেখা। ১০ম চিত্রে দেখ। ইহা বিশুদ্ধ ঢেউ খেলান রেখা নয়। এই কম্পন রেখা দ্বারা আমরা বুঝিতে পারিতেছি যে, উপসুরটির মাত্রা এক সপ্তক চড়া। আবার ১১শ চিত্রে দেখ। উপসুরটির মাত্রা প্রাথমিক সুরটির ১০ গুণ অধিক। কারণ, যে সময়ে প্রাথমিক সুর একটি কম্পন সম্পূর্ণ করে, সেই সময়ে উপসুরটি ১০টি কম্পন শেষ করিয়াছে। এইরূপে ১২শ চিত্রে বায়ুতে ক্লারিওনেট হইতে শব্দ-তরঙ্গ উত্থিত হইলে যে কম্পন হয় তাহারই ছবি। ২২ নং চিত্র পিয়ানোর কম্পন রেখা। এই সকল কম্পন রেখা প্রত্যেক বাদ্যযন্ত্রের নিজস্ব বিশেষত্ব দেখাইতেছে। গায়কেরা কানে শুনিয়া এত সূক্ষ্মভাবে বিশেষত্ব ধরিতে পারেন না। কিন্তু জার্মান বৈজ্ঞানিক হেল্মহোলজ্ পরীক্ষা দ্বারা ইহা প্রমাণ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে, যন্ত্রের বিশেষত্ব উপসুরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে উপসুরগুলির মাত্রা যদি প্রাথমিক সুর অপেক্ষা ১, ২, ৩, ৪, ৫ গুণ হয় তাহা হইলে

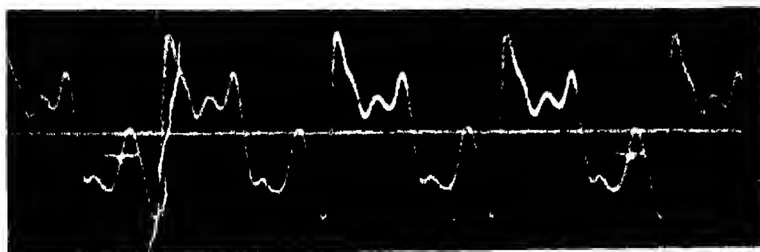


চিত্র—১০ বিশুদ্ধ কম্পন রেখা। উপসুরগুলি নিম্নে দেখ।

মোটামুটি সেই সমষ্টি সুর শুনিতে মিষ্ট হইবে; আবার যদি ১.৫, ২.৩, ৩.৩, ইত্যাদি হয়, তাহা হইলে, সেই সুরের সমষ্টি বড়ই কর্কশ বোধ হইবে। উপসুরের (magnitude) এবং তাহাদের মাত্রা যন্ত্র ও (mode of excitation) কিভাবে সুরের সৃষ্টি হয়, তাহারই উপর নির্ভর করে। বেহালার তারে, ঘোড়ার চুলের ছড়ি দ্বারা সুরের সৃষ্টি করা হয়। সেতারে তারের কাঁটা দ্বারা, পিয়ানোতে ফেল্ট



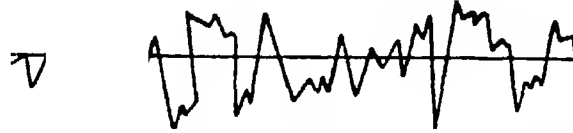
চিত্র—১১



চিত্র—১২। বায়ুতে ক্লারিওনেটের শব্দের কম্পন-রেখা

হাতুড়ির আঘাতে স্বর-লহরী উত্থিত হয়। তবলার চাঁটি মারিয়া, সানাই ক্লারিওনেটে ফুঁ দিয়া সুর উৎপন্ন করা হয়। একই যন্ত্রে দুই প্রকারে সুরের সৃষ্টি করিলে মিষ্টতার বিশেষত্ব বোধ হইবে। একটা কথা বলিয়া রাখি, বাদ্যযন্ত্র বলিতে যন্ত্রের সকল অঙ্গকেই বুঝিতে হইবে, কোনও প্রকারে একটু অঙ্গহীন করিলেই সুরের বিশেষত্বে প্রভেদ পাওয়া যাইবে।

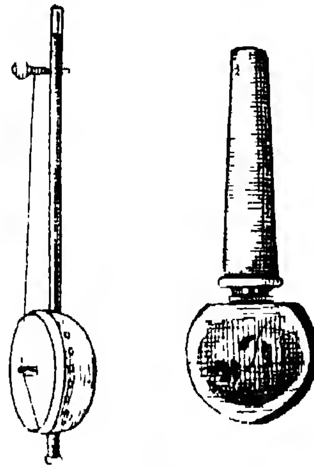
চিত্র—[illegible]। ক্লারিওনেট



চিত্র—১৪। কর্কশ সুরের কম্পন-রেখা মোটেই ঢেউ-খেলান নয় এবং আকারও অরূপ

তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র
(Stringed Instrument)

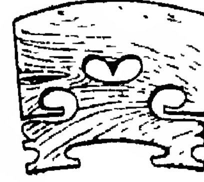
ভারতবর্ষে অনেকগুলি তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র বহুদিন হইতে প্রচলিত আছে। তাহাদের মধ্যে "একতারা" সর্বাপেক্ষা সরল এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে ইহা খুব সহজ। সাধারণতঃ একতারা তোমরা ভ্রমণকারী বাউলের নিকটে দেখিয়া থাকিবে। তাহারা একতারা বাজাইয়া গান করিয়া বেড়ায়।



চিত্র—১৫

একতারা কান

একটা শুষ্ক ফাঁকা অলাবুর আধখানা লইয়া তাহার উপর পাতলা চামড়া আঁটিয়া দেওয়া হয় এবং সেই খোলটা একটা কাঠের ডাণ্ডার উপর বসাইয়া দেওয়া হয়। তার অন্য সীমায় একটা 'কান' লাগান থাকে। সমতল চামড়ার উপর একটি কাঠের সওয়ারী (Bridge) বসাইয়া কেবলমাত্র একটি তার তাহার উপর দিয়া টানিয়া বাঁধা থাকে। সুর বাঁধিবার সময় 'কানে' মোচড় দিতে হয়।



চিত্র—১৬। সওয়ারী

এই যন্ত্রে আঙ্গুল দিয়া আঘাত করিয়া শব্দ উত্থিত করা হয়। যেমন করুণ গান, তেমনি তার করুণ সাথী—একতারা—

মন আসল ফাঁকিরে সারা জগৎ
ছায়াবাজীর ছায়া—
সাথ সাথ মন চল না
আর চল না বুনেছে মায়া॥

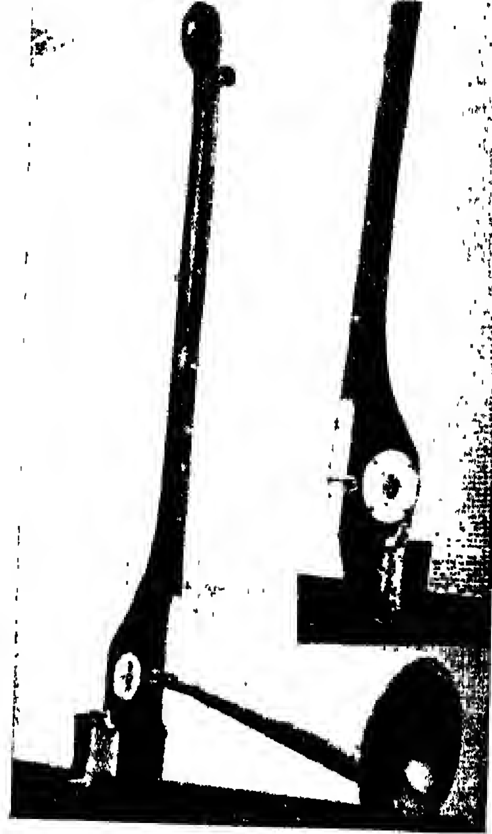
একতারার সুরে এবং বাউলের গানে হৃদয় যেন ফুঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠে।

আজকাল একপ্রকার নূতন একতারা তৈয়ার হইয়াছে। পর পৃষ্ঠায় তাহার ছবি দেওয়া হইল। ইহাকে ইংরাজীতে ষ্ট্রোহ ভাইওলিন বলে। দুইটির মধ্যে পার্থক্য এই যে, ষ্ট্রোহ ভাইওলিনে ছড়ি টানিয়া শব্দ উত্থিত করা হয় এবং ষ্ট্রোহ ভাইওলিনে চামড়ার আচ্ছাদন নাই। তাহার বদলে ভাইওলিনের সওয়ারীর সহিত একটি গোল পাতলা ষ্টিলের চাকতির সংযোগ থাকে। এই চাকতি দেখিতে ঠিক গ্রামোফোনের সাউণ্ড বক্সের চাকতির মত এবং চাকতিটি একটি হর্ণ বা চোঙের সরু সীমানায় অবস্থান করে। ছড়ি টানিয়া বা আঙ্গুলের আঘাতে তারে কম্পনের সৃষ্টি করিলে তাহার সহিত সংযুক্ত সওয়ারীও কম্পিত হয় এবং সওয়ারীর কম্পন একতারার চামড়ার আচ্ছাদনের উপর বা ষ্ট্রোহ ভাইওলিনের চাকতির উপর প্রেরণ করা হয়। চামড়া বা চাকতি কম্পিত হইলে তাহাদের নিকটস্থ বায়ুতে কম্পনের সৃষ্টি হইয়া সুরের বিস্তার হইয়া থাকে। চোঙ্গ থাকিলে প্রচুর পরিমাণে

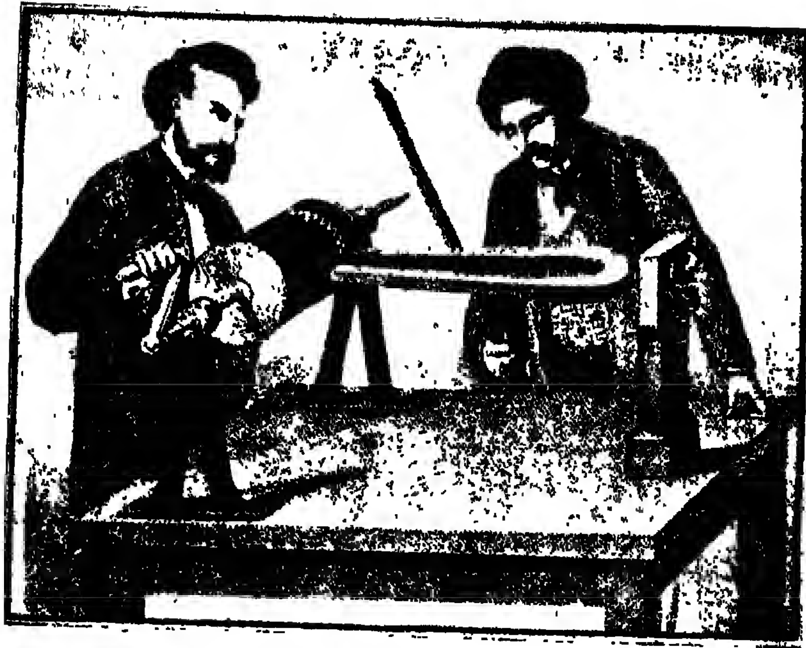
শব্দ হইয়া থাকে। চোঙের অবর্ত্তমানে গ্রামোফোনে যেমন শব্দ ক্ষীণ হয়, এখানেও সেইরূপ হর্ণ না থাকিলে বড় ক্ষীণ শব্দ হয়। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, তারের কম্পন ক্রমান্বয়ে তার হইতে সওয়ারীতে এবং পরে চাকিতে এবং সর্ব্বশেষে বায়ুতে প্রেরণ করা হয়। এখানে দুই একটি বৈজ্ঞানিক কথা বলিলে ভাল হয়। অর্থাৎ একটি কম্পন সম্পূর্ণ করিতে তারে যে সময় লাগিবে, বায়ুতেও ঠিক সেই সময়ই লাগিয়া থাকে। কিন্তু কম্পন রেখার আকার কিছু বদ্‌লাইয়া যাইতে পারে। সরল ভাষায় বলিতে গেলে আমরা বলিব যে, কোনও এক বাদ্য যন্ত্রের বিশেষত্ব, কতক এই সকল সংযুক্ত কম্পনকারী অঙ্গের উপর এবং কতক, কি উপায়ে প্রাথমিক কম্পনের সৃষ্টি হইল তাহার উপরেই নির্ভর করে। কর্কশ সুর বা মিঠা সুরের আসল কারণ এখন আমরা বুঝিতে পারিলাম।

তারে কম্পনের নিয়ম—

একটি তারকে দুইটি সওয়ারীর উপর রাখিয়া টানিয়া বাঁধিলে তাহার প্রত্যেক অংশ একই সময়ে একটি কম্পন সম্পূর্ণ করিবে। এই সময় কমিলে; সুর চড়িবে এব বাড়িলে সুর মোটা হইবে। সময় অর্দ্ধেক হইলে সুর এক সপ্তক চড়িবে, ⅔ গুণ হইলে "সা" হইতে "পা"তে সুর চড়িবে আবার সময় দ্বিগুণ হইলে সুর এক সপ্তক নামিয়া যাইবে। তারের কম্পনের



চিত্র—১৭। ব্রোঞ্জ ভাইওলিন



চিত্র—১৮। চিটনিং ফকের বিশুদ্ধ সুরের রেখা টানা হইতেছে

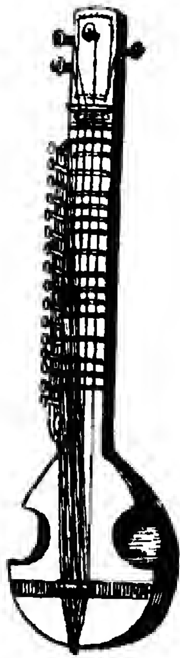
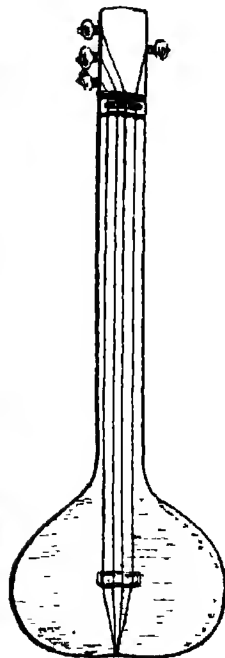
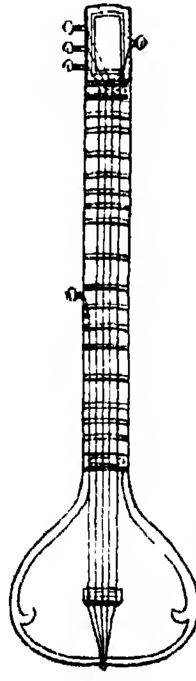
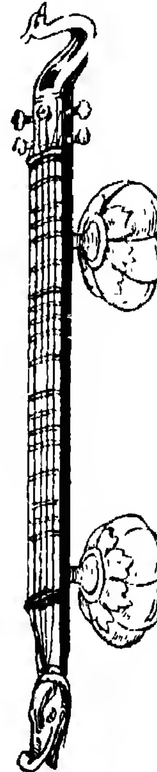
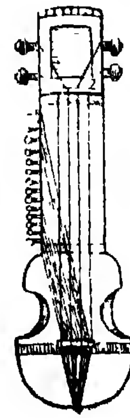
সময় কিরূপে কমাইতে বাড়াইতে পারা যায়, এখন তাহাই বলিব।

১। তার ঢিলে করিলে সময় বাড়িবে, কিন্তু কানে মোচড় দিয়া আরও একটু টান দিলে কম্পনের সময় কমিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে সুরও চড়িবে।

২। সাধারণতঃ যন্ত্রে একবার সুর মিলাইয়া তারকে টানিয়া বাঁধা হয় এবং প্রথম সওয়ারী হইতে দ্বিতীয় সওয়ারী পর্য্যন্ত তারের যে দৈর্ঘ্য—এই দৈর্ঘ্য কমিলে কম্পনের সময় কমিবে এবং বাড়াইলে

সময় বাড়িবে। যে অনুপাতে দৈর্ঘ্য কমিবে, ঠিক সেই অনুপাতে সময় কমিবে এবং সুর চড়িবে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে, তাড়াতাড়ি সুর চড়া-মোটা করিতে হইলে, একটি সওয়ারাকে এক স্থানে স্থির রাখিয়া অন্যটিকে সরাইলেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে। সুর চড়াইতে হইলে স্থির সওয়ারার নিকটে যাইতে হইবে, আর সুর মোটা করিতে হইলে স্থির সওয়ারী হইতে দ্বিতীয়টির ব্যবধান বাড়াইতে হইবে।

নীচে-উপর করিয়া ইচ্ছা অনুযায়ী সুর চড়ান-নামান হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাম হস্তের আঙ্গুলে এই-রূপে সুর বদ্‌লান হয়। এখন তোমাদের মনে একটি কথা উঠিতে পারে। ঘোড়ার চুলের ছড়ি (bow) দ্বারা কিংবা দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি দ্বারা তারে আঘাত করিয়া কম্পনের সৃষ্টি করিলে তাহার কম্পনের সময় কি ঠিক পূর্ব্বমতই থাকে? উত্তরে, আমরা বলিব যে, যে কোনও উপায়ে সুরের সৃষ্টি হউক না কেন, তারের এক দৈর্ঘ্যে এক সুর বাহির হইবে।


চিত্র—১৯

এসরাজ তানপুরা সেতার বীণা সারেঙ্গী ছড়ি

৩। যে প্রকারেই কম্পনের সৃষ্টি হউক না কেন, কোনও একটি সুর বাজাইলে তাহার আনুষঙ্গিক বা উপস্বরগুলির (upper partials) অর্থাৎ কম্পনের সময় প্রাথমিক কম্পনের ½, ⅓, ¼, ⅕, ⅙ অংশ হইবে। এই নিয়মটি যথাসাধ্য রক্ষা করা উচিত। কোন কারণে ইহার বিকৃতি হইলে সুরের মিষ্টতা নষ্ট হয়। ইংরাজীতে এই নিয়মকে Harmonic relation বলে। আমরা বাংলায় মিষ্টতার নিয়ম বলিব। তার মোটা হইলে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়।

সকল প্রকার তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্রে দ্বিতীয় সওয়ারী থাকে না, কিন্তু তারের নীচেই একটা সমতল লম্বা কাঠের পাটরী বা অঙ্গুলিস্পর্শক থাকে। তাহার উপর আঙ্গুল চাপিয়া দিলেই অতি সহজে আঙ্গুল

এইবার আমরা এসরাজ এবং তানপুরার বিষয় আলোচনা করিব। এসরাজ আধুনিক তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র। ইহাতেও কাঠের নৌকার আকারের ফাঁকা একটি ধ্বনি-কোষের খোলের (Resonance Chamber) উপর চামড়ার আচ্ছাদন দেওয়া হয় এবং খোলটি আর একটি লম্বা ফাঁপা কাষ্ঠখণ্ডের নিম্নে বসান থাকে এবং উক্ত ডাণ্ডার উপরের সীমায় যন্ত্রের চারিটি কান লাগানো থাকে। দণ্ডের একধারে সারি সারি আরও ১৩টি কান ও তার আছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৭টি তার, কিন্তু ১৬টি পিত্তলের তার কেবল ঝঙ্কার বা অনুরণনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুরে বাঁধা থাকে। ইহা-দিগকে পার্শ্বতন্ত্রিকা বা চিকারীও বলে। প্রধান তারটি কেবল ষ্টিলের, ইহাতেই ছড়ি চালাইয়া কম্পনের

সৃষ্টি করা হয়। এই যন্ত্রে হারমোনিয়ামের মত সুরের সারিকা বা ধাপ আছে। বাম হস্তের আঙ্গুল দিয়া কোন এক ধাপে চাপিয়া দিলে তারের দৈর্ঘ্য সওয়ারী হইতে সেই স্থান পর্য্যন্ত হইবে এবং উক্ত দৈর্ঘ্য অনুযায়ী সুর বাহির হইবে। এসরাজে ১৭টি ধাপ আছে এবং প্রত্যেক ধাপেই প্রচুর শব্দ উত্থিত হয় ও একই সুরে বাঁধা তারের অনুরণনে একপ্রকার গুঞ্জনযুক্ত মোলায়েম সুর বাহির হয়।

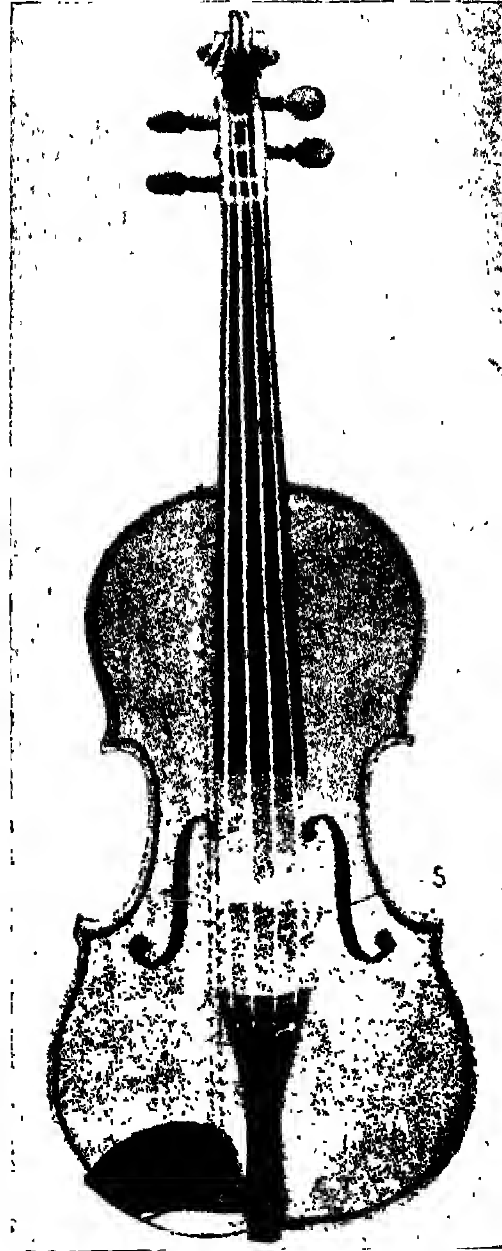
তানপুরা

তানপুরার ধ্বনিকোষ বা খোলও প্রকাণ্ড একটি লাউয়ের অর্দ্ধেক। তাহার উপর পাতলা কাঠের আচ্ছাদন দিয়া তদুপরি সওয়ারী বসান থাকে। এই যন্ত্রে চারিটি তার থাকে এবং কেবল সঙ্গত দিবার জন্য ইহার ব্যবহার। দক্ষিণ হস্তের তর্জনী অঙ্গুলীতে তারের কাঁটা বা মিজরাপ লাগাইয়া চারটি তারকেই (rhythmically) আঘাত করিয়া বাজান হয়। এই যন্ত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে একপ্রকার ঝঙ্কারযুক্ত নাকি সুর বাহির হয়। তাহার কারণ আমরা আলোচনা করিব।

সাধারণতঃ যে সকল সওয়ারীর কথা আমরা বলিয়াছি, তাহারা চামড়ার আচ্ছাদনের উপর বা কাঠের আচ্ছাদনের (Violin) উপর অবস্থান করে এবং তারে কম্পনের সৃষ্টি হইলে সওয়ারীর এক ধার উঠে ও নামে। কিন্তু অন্য ধারটি স্থির থাকে। কিন্তু তানপুরার সওয়ারী চাপ্টা এবং চওড়া হয় এবং তারের অনেকটা অংশ তাহার সহিত ছুঁইয়া থাকে। যে অংশটুকু সওয়ারীর গায়ে লাগিয়া থাকে তাহার নীচে এক স্থানে এক টুকরা সূতা রাখিয়া দেওয়া হয়। আঙ্গুলে কাঁটা (plectrum) লাগাইয়া বাজাইলে নাকি সুর বাহির হয়। সূতা বাহির করিয়া লও। সহজ সুর ক্ষীণ হইয়া বাহির হইবে। কথিত আছে, মহর্ষি নারদ এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করিয়াছিলেন।—

ভাইওলিন

বিলাতী ভাইওলিন-এর চিত্র দেওয়া হইল। ইহার ধ্বনিকোষ ফাঁপা এবং পাতলা কাঠের তৈয়ারী, সওয়ারীও কাঠের। চারটি কানে চারটি তার ভিন্ন ভিন্ন চারটি সুরে বাঁধা থাকে। [পা, রে, ধা, গা] মোটা সুরের (পা) জন্য চর্ম্ম-সূত্র রূপার তারে মোড়া হয়। কারণ, মোটা তার ব্যবহার করিলে উপস্বর-গুলি বিকৃত হইয়া সুরের মিষ্টতা বিনষ্ট করে "গা" সুরে বাঁধা তার ষ্টীলের। অন্যান্য দুইটি চর্ম্মসূত্র। বাম হস্তের অঙ্গুলী তারের উপর চাপিয়া তারের দৈর্ঘ্য কমাইয়া বাড়াইয়া, চড়া মোটা সুর বাজান হয়। ইহাতে বেশ সুর খেলান যায়।



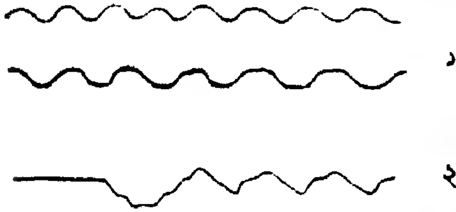
চিত্র—২০। ভাইওলিন

বৈজ্ঞানিক হিসাবে আমরা এই যন্ত্রটির বিষয় অনেক-কিছু জানিতে পারিয়াছি। তার হইতে আরম্ভ করিয়া

ইহার প্রত্যেক অঙ্গ কি প্রকার, সুরের মধুরতার উপর তাহার কি প্রভাব, আমরা তাহার আভাস পাইয়াছি। অন্য যন্ত্রগুলি এই ভাবে বিজ্ঞানাগারে পরীক্ষিত হয় নাই, এবং এই যন্ত্রগুলির ভালরূপ ইতিহাসও পাওয়া যায় না। তবে প্রাচীন চিত্র এবং অজন্তা গুহা বা সাঞ্চি গুহায় পাথরে খোদা ছবি হইতে কতকগুলি বাদ্যযন্ত্রের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছু কিছু আভাষ পাওয়া যায়। ভারতের প্রাচীন অজন্তা গুহায় বহু খোদা হইয়াছিল। ইহাতে বীণা, ডমরু ঢোলের খবর পাওয়া যায়। আনন্দকুমার



চিত্র—২১। ডমরু



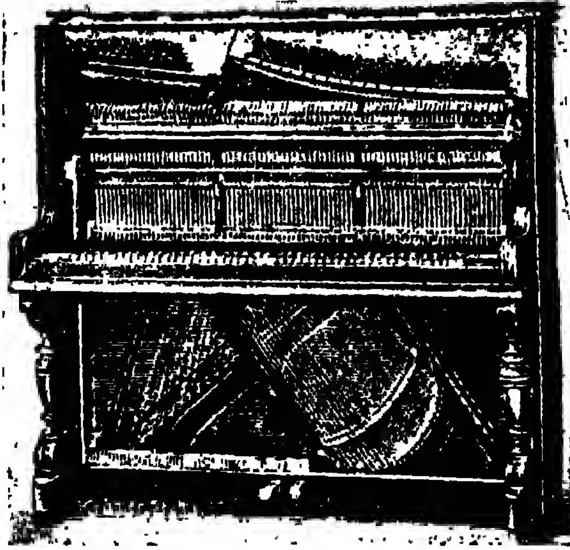
চিত্র—২২

১। একতারার তারের কম্পন রেখা
২। পিয়ানোর তারের কম্পন রেখা
৩। ভাইওলিনের তারের কম্পন রেখা

স্বামীর সংগ্রহ ছবি হইতে বীণা, সারঙ্গির ব্যবহার ১৭০০ খৃষ্টাব্দেও পাওয়া যায়। তানপুরা অতি প্রাচীন তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র যাহাতে ঘনপদার্থে আঘাত করিয়া সুর বাহির করা হয় এমন যন্ত্র, কেবল পিয়ানো। তাহা অন্যান্য প্রদেশে ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হয়। কিরূপে ইহার উৎপত্তি এবং উন্নতি হইয়াছে, তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ পাঠ করিলে যান্ত্রিক বিদ্যার অপূর্ব্ব কৌশলের পরিচয় পাইবে। পিয়ানোতে অনেকগুলি তার আছে এবং ফেল্টের হাতুড়ি দ্বারা আঘাত করিয়া তারে কম্পনের সৃষ্টি করা হয়। হারমোনিয়মে যেমন পর্দ্দা টিপিলে শব্দ হয়, সেইরূপ এখানে পর্দ্দা টিপিলেই আঘাতকারী হাতুড়ি (Felt hammer) তারে আঘাত করিয়া ফিরিয়া আসে। পর্দ্দা টিপিলে কিরূপে হাতুড়িটি অগ্রগামী হইয়া বেগে তারে আঘাত করিয়া আসে, তাহা পর পৃষ্ঠার ২৪ নং চিত্র দেখিলেই বুঝিতে পারিবে।

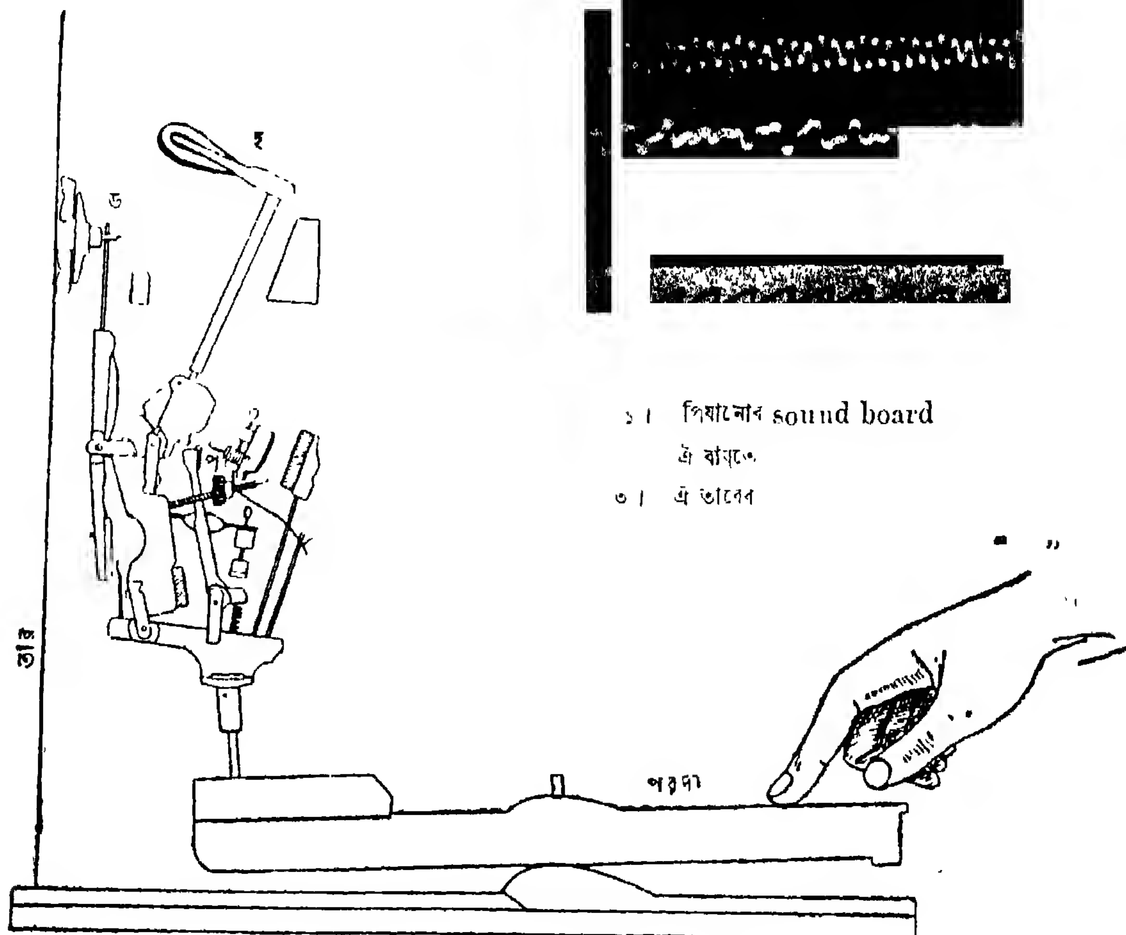
তোমরা হয়ত মনে করিবে, দুই এক বৎসরে এইরূপ যান্ত্রিক উন্নতি ও তাহার সুব্যবস্থা হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে, বৎসরের পর বৎসর ক্রমান্বয়ে ইহার উন্নতি হইয়া এখন এই অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে।



চিত্র—২৩। খোলা পিয়ানো

পিয়ানোর সওয়ারী চ্যাপ্টা এবং একই সওয়ারীতে অনেকগুলি তার সংযোজিত থাকে। ইহা Sound board এর উপর বসান থাকে। তার কম্পিত হইলে, সুর সওয়ারী বাহিয়া Sound board এ পৌঁছিয়া বায়ুতে বিস্তৃত হইয়া থাকে। শব্দকারী বোর্ড হাল্কা কাঠের তৈয়ারী করা হয় এবং চওড়া হওয়ায় বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ শব্দের ঢেউয়ের বিস্তার হয়। পিয়ানোতে প্রত্যেক সুরের জন্য দুইটি করিয়া তার থাকে। কাজেই, ৮ সপ্তক পর্য্যন্ত পর্দ্দা থাকায় অনেকগুলি তারের প্রয়োজন হয়। আঘাত করিয়া কম্পনের সৃষ্টি করা হয় বলিয়া, পিয়ানোর সুরের মিষ্টতা অন্যান্য তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের তুলনায় বিভিন্ন প্রকারের। এমন কি, ফেল্ট (felt)-এর বদলে কেবল ঘনকাষ্ঠখণ্ডে আঘাত করিলেই কর্কশ সুর উৎপন্ন হইয়া শ্রুতিকঠোর হয়। শ্রুতিমধুর করিতে হইলে, তারের কোন স্থানে আঘাত করিতে হইবে। সুর ক্রমশঃ চড়িলে ফেল্ট ক্রমশঃ শক্ত করিতে হইবে। ফেল্ট হাতুড়ির ওজন প্রত্যেক সুর হিসাবে কত হইবে, সাউণ্ড বোর্ড-এর সাইজ (size) এবং আকার কিরূপ হইবে এই সকল বিষয়ে গবেষণা করিয়া এবং তাহাদের প্রত্যেকের সুরের মিষ্টতার

উপর কি প্রভাব, বিশেষভাবে পরীক্ষা করিয়াই পিয়ানোর সৃষ্টি হইয়াছে। সকলের সামঞ্জস্য হইলে মধুর সুর বাহির হইবে। কোথাও একটু ত্রুটি থাকিলে সুরের মিষ্টতা নষ্ট হইয়া যায়। আমার বিশ্বাস, পিয়ানোর বাজনায় সুর খেলান যায় না এবং বাংলা

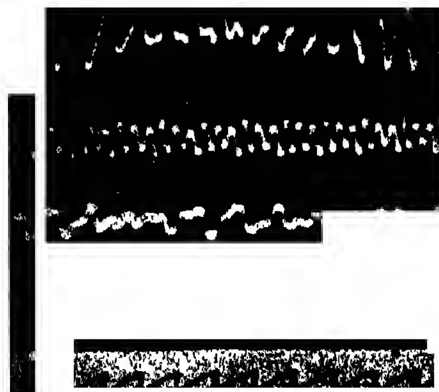


চিত্র— পিয়ানোর ফেল্ট হাতুড়ী এবং কলকব্জা

বৈঠকী গানের সহিত সঙ্গত দিবার পক্ষে সুবিধাজনক নহে। তবে তাড়াতাড়ি গান "জলদ সঙ্গীত" বা নৃত্য-গীতে ইহার ব্যবহারে সুবিধা আছে।

তন্ত্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্রের অবয়বের নাম

বাংলা	ইংরাজী
খোল, ধ্বনিকোষ	Belly. Resonating air chamber.
দাণ্ডা	Stand.
টরি	Flat piece of wood for fingering.
মিজরাপ	Plecrum
কালক, কান	Ear. Peg
তন্ত্র, তার	String.



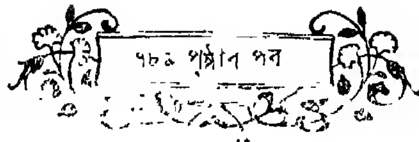
১। পিয়ানোর sound board
ঐ বাহ্যে
৩। ঐ ভাবের

বাংলা	ইংরাজী
সওয়ারী, তন্ত্রাসন	Bridge.
পর্দ্দা, সারিকা	Scale (musical)
ঘন পদার্থ	Solid piece.
সংযোজিত	Coupled.
বিন্যাস	Arrangement.
তান্তব সূত্র ও চর্ম্মসূত্র	Cat Gut.
চিকারী বা পার্শ্বতন্ত্রিকা	Resonating side wires.

স, গ, প, ধ, নি,
ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ
এইগুলি শুদ্ধস্বর।

কি ও কেন

উজ্জ্বল জিনিষের দিকে দৃষ্টি দিলে অন্য সব জিনিষ ঝাপ্‌সা হয়ে যায় কেন?



রাত্রিবেলা দীপশিখা বা বিজলী বাতির (Electric light) দিকে চেয়ে ঘরের অন্য সব জায়গার প্রতি মনোযোগ দেও। তারপর ঠিক সেই অবস্থায় চোখকে রেখে আলোর শিখাটা বা বিজলী বাতির উজ্জ্বল ভাগটা হাত দিয়ে আড়াল কর। তৎক্ষণাৎ ঘরের সব জিনিষগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠবে, মনে হ'বে যেন চোখ থেকে একটা পর্দ্দা সরে গেল। আলোটা যত বেশী উজ্জ্বল হবে, এই ব্যাপারটা ততই ভাল ক'রে দেখতে পাওয়া যাবে।

এমন কেন হয়? খুব দূরের পাহাড়ের উপর গাছ প্রভৃতি যে সব বস্তু আছে, তাদের খুব স্পষ্ট দেখায় না। ইহার কারণ, তাদের দূরত্ব শুধু নয়। তোমরা দূরবীন দিয়ে ঐ দৃশ্যটাকে বড় করে কাছে নিয়ে এসে দেখ। তখনও তোমার দেখার ঘোলাটে ভাব ঘুচবে না—মনে হবে যেন পাতলা কুয়াসায় সমস্ত গাছটা আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে।

তোমার চোখ আর দূরের পাহাড়টার মাঝে সমস্ত ব্যবধানটা পূর্ণ ক'রে বাতাসের অসংখ্য কণা বর্ত্তমান। সূর্য্যের আলোকে তাই পৃথিবীর উপর আসতে হ'লে এই কণাগুলোকে ভেদ করে আসা ছাড়া অন্য উপায় নেই। আমাদের চোখ যে আলোতে সাড়া দেয়, বাতাসের কণাগুলি সূর্য্যের সে আলো অবশ্য নিজের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না, কিন্তু তারা অন্য একটা কিছু করে। তাদের গায়ে যে আলো এসে লাগে তাকে তারা চতুর্দ্দিকে ছড়িয়ে দেয়। ফলে দাঁড়ায় এই যে সমস্ত বাতাসের স্তর থেকেও একটা খুব হাল্‌কা আলো আমাদের চোখে এসে পড়তে থাকে। তাই দূরের জিনিষ দেখবার সঙ্গে সঙ্গে এই আলোটাকেও আমরা দেখতে পাই ব'লে আমাদের মনে হয়, যেন খুব একটা পাতলা কুয়াসার ভিতর দিয়ে সব কিছু দেখা যাচ্ছে।

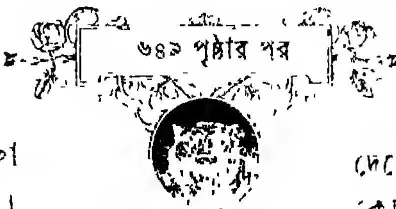
তোমাদের দৃশ্য বস্তু আর তোমাদের মধ্যে বাতাসের এই কণাগুলি ছাড়া আর একটি জিনিষ বর্ত্তমান। উজ্জ্বল জিনিষের দিকে দৃষ্টি দিলে অন্য সব জিনিষ ঝাপ্‌সা হয়ে যাবার মূলে এই অপর বস্তুটিরই হাত রয়েছে। এই অপর বস্তুটি হ'ল তোমাদের চোখ নিজে। তোমরা জান যে, আমাদের চোখের তারা Lens আর Sclerotica সব tissue দিয়ে তৈরী। সূর্য্যের আলোর পথে বাতাসের কণাগুলির কাজের মত এই টিসুগুলির গায়ে উজ্জ্বল আলো এসে পড়লেই তারা আলোটার কিছু অংশ চতুর্দ্দিকে বিচ্ছুরিত করে দেয়। তাই কোনও উজ্জ্বল আলোর দিকে চোখ রেখে অন্য সব জিনিষ দেখবার সময় চোখের উপর একটা পাতলা আলোর পর্দ্দা যেন রয়েছে, এমন মনে হয়। উজ্জ্বল আলোটাকে হাত দিয়ে আড়াল ক'রে দিলে টিসুগুলির গায়ে আর আলো না পড়াতে তারা আর তেমন করে আলো ছড়িয়ে দিতে পারে না, আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের ঘোলাটে ভাবটাও অন্তর্দ্ধান করে।



বলয়ধারী শনি



বলয়ধারী শনি


৬৪৯ পৃষ্ঠার পর

এইবার তোমাদিগকে শনির কথা বলিব। কথিত আছে যে, শনির দৃষ্টি যাহার উপর পড়ে, তাহা তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়। তোমরা কিন্তু শনির নামে ভয় পাইও না। শনি-বেচারার মিথ্যাই এ অপবাদ—সে কেবলমাত্র গ্রহরূপেই আকাশে রহিয়াছে।

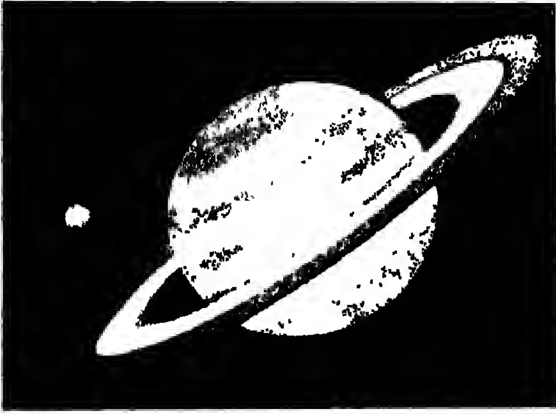


শনি

দূরবীণ দিয়া দেখিলে শনির মত অপূর্ব্ব আকারের আর কোনও গ্রহ বা তারা আকাশে দেখিতে পাওয়া যায় না। মধ্যস্থানে গোলাকার শনিগ্রহ বিরাজ করিতেছে এবং চাকার মত তিনটি বলয় ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। শনির গোলাকার দেহের সহিত এই বলয়গুলির কোনও যোগ নাই। ইহার বলয়ের কথা পরে বলিব। খালি চোখে শনিকে একটি উজ্জ্বল তারার মতই দেখায়। সূর্য্যের চারিপাশে একবার ঘুরিয়া আসিতে শনির প্রায় সাড়ে উনত্রিশ বৎসর লাগে। শনির কক্ষটি ঠিক গোল নয়, বরঞ্চ ইহার আকার অনেকটা ডিম্বের ন্যায়। গড়ে সূর্য্য হইতে শনি ৮৮৫,৯০০,০০০ মাইল দূরে

আছে। কখনও কখনও ইহা আরও ৫০,০০০,০০০ মাইল কাছে আসিয়া পড়ে, আবার কখনও বা ইহা আরও ৫০,০০০,০০০ মাইল দূরে সরিয়া যায়।

পৃথিবীর ন্যায় শনিও নিজের মেরুদণ্ডের চারিধারে ঘুরপাক খাইতেছে। ইহার এক-দিন আমাদের প্রায় সাড়ে দশঘণ্টার সমান। এই ঘূর্ণনের মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে। শনির দেহের সমস্তটাই সমানভাবে ঘুর-পাক খায় না। ইহার মধ্যস্থল মেরুর নিকটের স্থানগুলির চেয়ে কিছু বেশী জোরে



শনি ও পৃথিবীর আপেক্ষিক আয়তন

ঘুরিতেছে। তোমরা বোধ হয় জান যে, সূর্য্য নিজের মেরুদণ্ডের চারিপাশে ঘুরিতেছে। সূর্য্যের ঘূর্ণনেরও এই বিশেষত্বটুকু দেখা যায়।

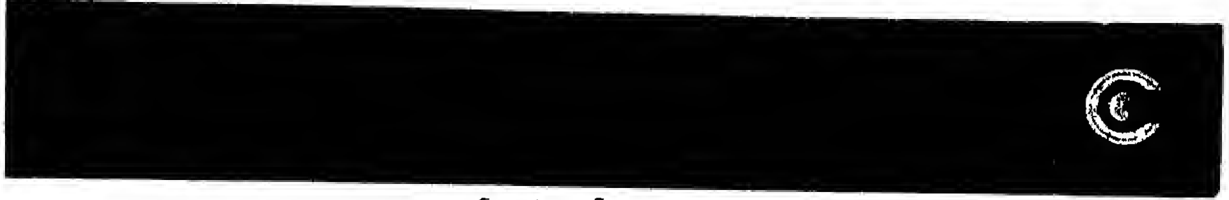
শনির মেরুদেশ দুইটি অন্যান্য গ্রহ গুলির তুলনায় কিছু বেশী চ্যাপ্টা। শনির মধ্যভাগের ব্যাস ৭৪,১০০ মাইল এবং মেরু-দণ্ডের দৈর্ঘ্য ৬৬,৩০০ মাইল। শনি আয়তনে নিতান্ত ছোট নয়। গ্রহদের মধ্যে বৃহস্পতি সবচেয়ে বড়, তাহার পরেই শনির স্থান। শনির পৃষ্ঠের পরিমাণ পৃথিবীর পৃষ্ঠের ৮১গুণ এবং ইহার দেহের আয়তন পৃথিবীর দেহের ৭৩৪ গুণ। শনি কিন্তু খুবই হাল্‌কা বস্তু দিয়া তৈয়ারী; কারণ, ইহার ওজন পৃথিবীর ওজনের ৯৫ গুণ মাত্র। শনির ঘনত্ব খুবই কম এবং পৃথিবীর ঘনত্বের এক-সপ্তমাংশ মাত্র কব্লেণ্ট্‌স্ (Coblentz) সাহেব রেডিয়ো-মিটর (Radiometer) যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, শনির গায়ের তাপ মোটামুটি ভাবে—১৫০° সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী ধরা যাইতে পারে। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, সূর্য্যকিরণই যদি শনির পৃষ্ঠটি গরম হইবার একমাত্র কারণ হইত, তাহা হইলে ইহার তাপ মোটে —১৭৯° সেন্টিগ্রেড ডিগ্রী হইত। তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ যে, শনির ভিতর হইতে অল্প পরিমাণ তাপ অনবরত উপরি-ভাগে আসিতেছে। শনির ঘনত্ব খুবই কম, তাহা আগেই বলিয়াছি। খুব সম্ভব, শনির ভিতরকার অংশটি বায়বীয় পদার্থে পূর্ণ, এবং ইহার উপরে একটি কঠিন আব-রণ আছে ও সবচেয়ে উপরে আবার বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে। এই কঠিন আবরণটির দরুণ শনির ভিতরকার তাপ অতি অল্পই উপরিভাগে আসিতে পারে।



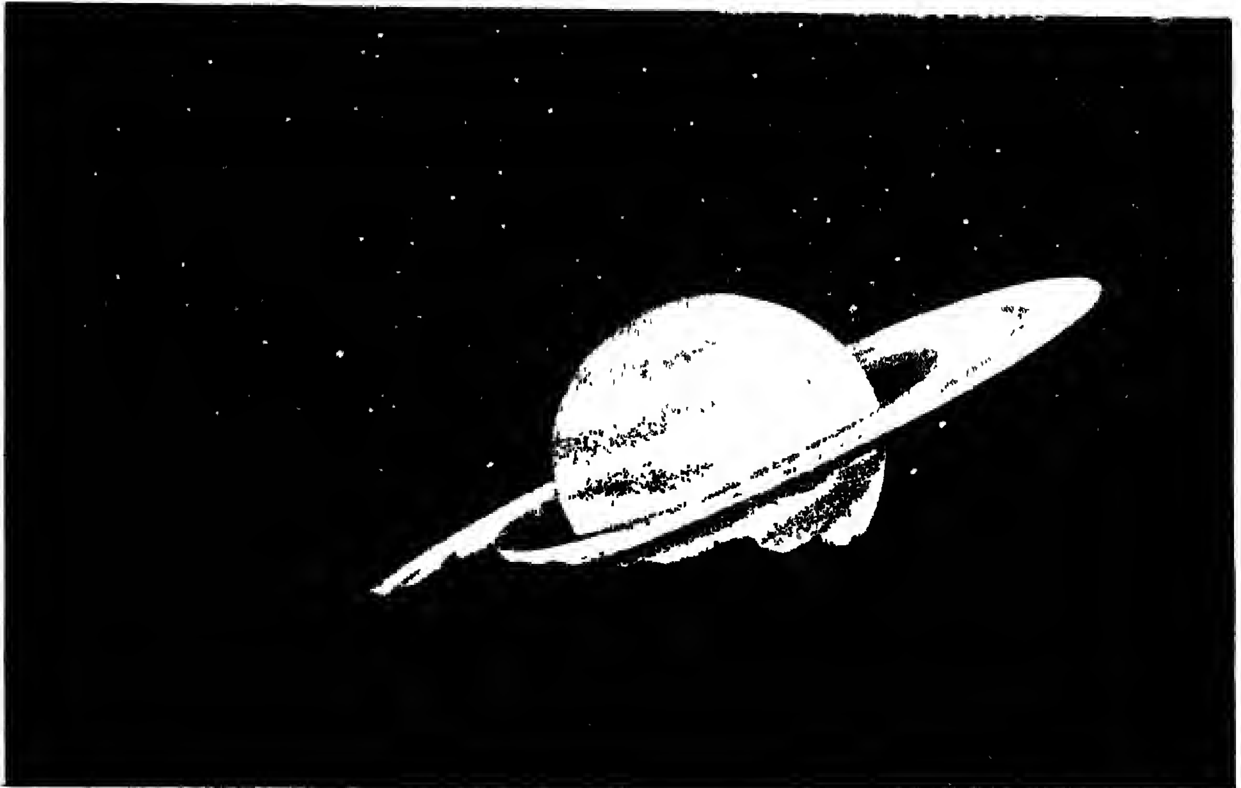
শনির পৃষ্ঠের উপর সাদা দাগ

মাঝে মাঝে শনির পৃষ্ঠের উপর সাদা দাগ দেখিতে পাওয়া যায়। ১৯৩৩ খৃঃ আগষ্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে শনির গায়ের উপর বেশ বড় একটি দাগ দেখা গিয়াছিল।

কোনও কোনও বৈজ্ঞানিক বলেন যে, ইহা জমাট-বাঁধা কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ ছাড়া আর কিছুই নহে। কার্ব্বন-ডাই-অক্সাইড্ও জমিয়া গেলে দেখিতে সাদা হয়।



শনির চাঁদগুলির কক্ষ



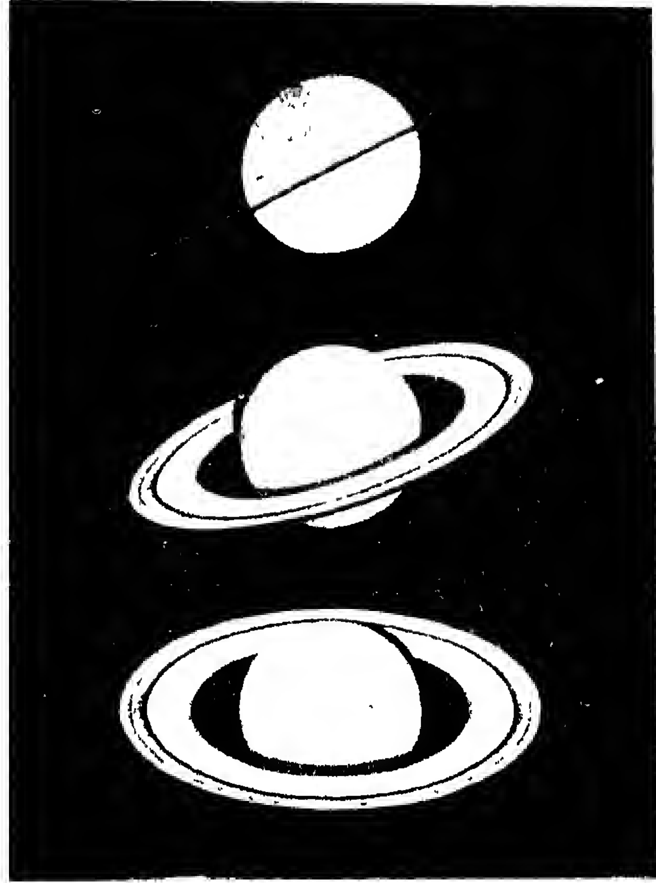
মাইমস্ হইতে শনির দৃশ্য। আবে মোরোর কল্পিত

শনির নয়টি চাঁদ আছে—ইহাদের মধ্যে টাইটান (Titan) সবচেয়ে বড় এবং মাইমস্ (Mimos) সকলের চেয়ে কাছে। টাইটান আয়তনে ও ওজনে পৃথিবীর প্রায় দুইটি চাঁদের সমান। মাইমস্ শনির কেন্দ্র হইতে ১১৫,৩০০ মাইল দূরে আছে। সবচেয়ে দূরের চাঁদ ফিব (Phoebe) শনির কেন্দ্র হইতে ৮,০৯৬,৫০০ মাইল দূরে আছে। ১৯০৫খৃষ্টাব্দে পিকারিং (Pickering) সাহেব বলিয়া গিয়াছেন যে, তিনি শনির দশম চাঁদ আবিষ্কার করিয়াছেন। দশম চাঁদ সত্য সত্যই—আছে কি-না, তাহার এখনও কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় নাই।

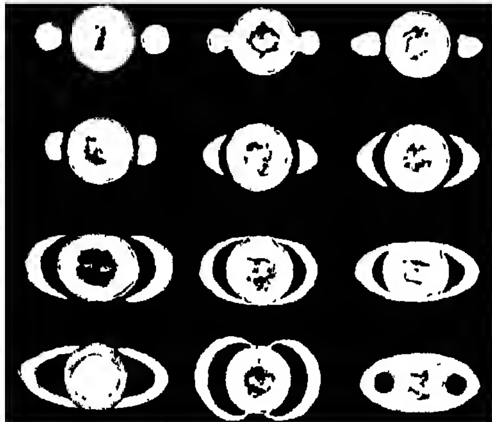
সূর্য্যের চারিদিকে পৃথিবীও শনি উভয়েই ঘুরিতেছে। জ্যোতির্ব্বিদেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে, যদি আজ শনি সূর্য্যের ঠিক পিছনে অবস্থান করে, তাহা হইলে

৩৭৮ দিন পরে শনি আবার আসিয়া সূর্য্যের ঠিক্ পিছনে উপস্থিত হইবে।

এখন তোমাদিগকে শনির বলয়-গুলির কথা বলিব। তোমরা অনেকে বোধ হয় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও'র নাম শুনিয়াছ। ১৬১০খৃঃ সর্ব্বপ্রথমে তিনি দূরবীণের সাহায্যে বলয়ধারী শনিকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার যন্ত্রটি এখনকার বড় বড় দূরবীণের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র ছিল। এই ক্ষুদ্র দূরবীণ দিয়া দেখিয়া গ্যালিলিও শনির বলয়গুলির আকার ঠিক্ বুঝিতে পারেন নাই। প্রথমে তিনি শনির দুই পার্শ্বে দুই উজ্জ্বল চাক্তি মাত্র দেখিতে পাইলেন। কয়েক মাস পরে তিনি চাক্তি দুইটি আর দেখিতে না পাইয় অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়াঃ বলিয়া উঠিলেন, "তবে কি পৌরাণিক আখ্যানই সত্য—শনি কি সত্য সত্যই নিজের সন্তান দুইটিকে গ্রাস করিয়াছে?" আবার কিছুদিন পরে তিনি এই চাক্তি দুইটিকে দেখিতে পাইলেন।



শনির তিনটি দৃশ্য



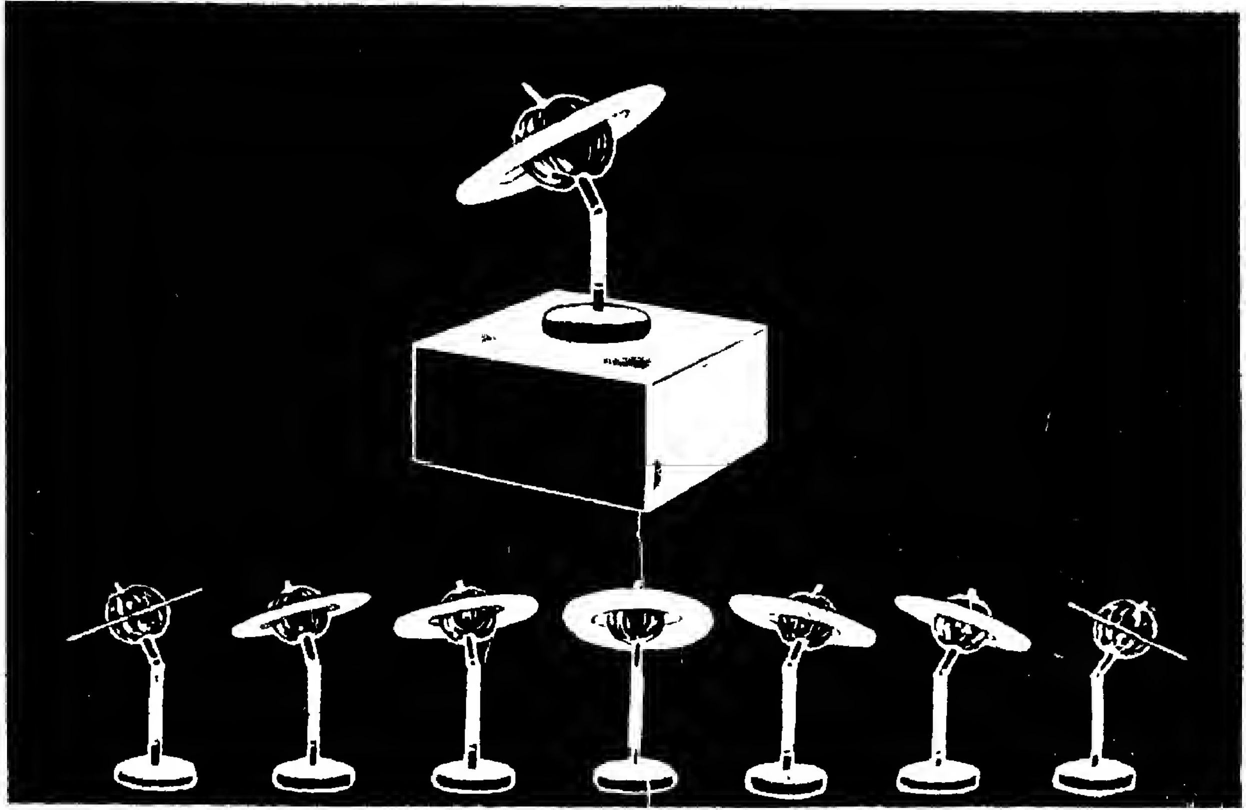


শনির নানারকমের ছবি
সপ্তদশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদের অঙ্কিত

গ্যালিলিও এই চাক্তি দুইটি বিলীন হইয়া পুনরায় উদয় হইবার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দূরবীণ যন্ত্রের যেমন যেমন উন্নতি হইতে লাগিল, বলয়ের আকার ততই স্পষ্ট করিয়া দেখা যাইতে লাগিল। হাইগেন্স্ (Huyghens) সাহেবই সর্ব্বপ্রথমে বলয়ের যথার্থ আকার আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে, বলয় একটি নয়, তিনটি এবং ইহাদের আকার সত্য সত্যই আংটির মত।

মাসের পর মাস দূরবীণ দিয়া পরীক্ষা করিলে শনির বলয়গুলির নানারূপ কলা দেখা যায়। কখনও বলয়গুলি একটি সরু

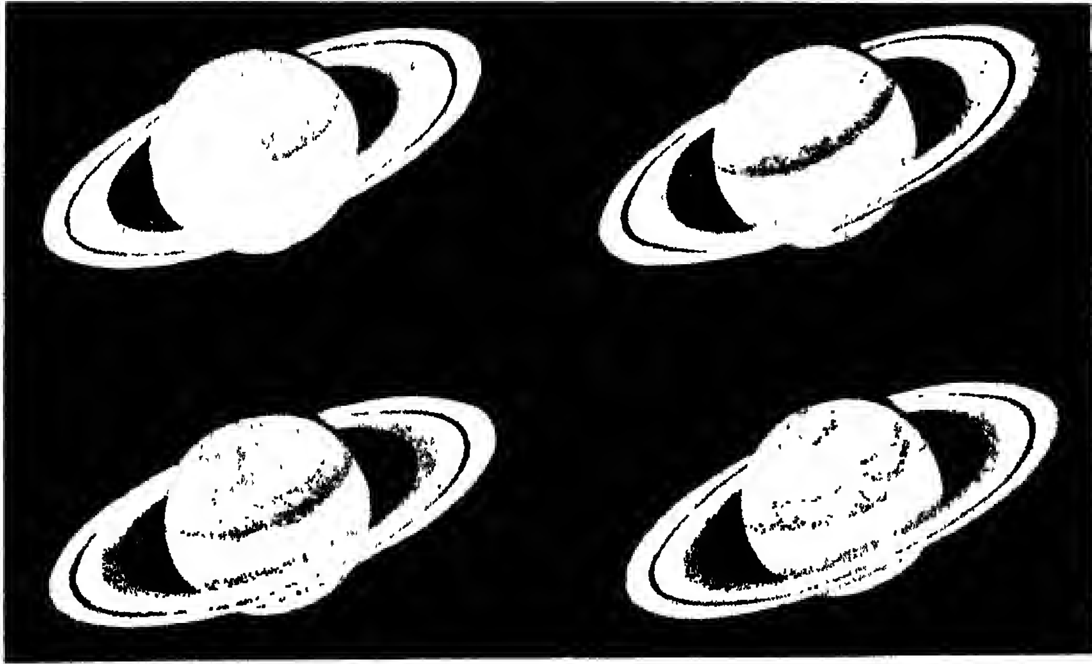
সরল রেখার মত দেখায়, কখনও বা আংটির মত দেখায় এবং কখনও বা চাকার মত দেখায়। গ্যালিলিও যে সময়ে তাঁহার ক্ষুদ্র দূরবীণ দিয়া বলয়গুলি দেখিতে পান নাই, সেই সময়ে এইগুলি সরু রেখার আকার ধারণ করিয়াছিল। বলয়গুলির ভিন্ন ভিন্ন আকার কিরূপে হয় তাহা তোমাদিগকে এখন বুঝাইতে চেষ্টা করিব। একটি চারকোণা কাঠখণ্ডের উপর একটুকরা পুরু কাক্ রাখ। অন্ততঃ যাহার দুইটি ফলা আছে এমন একটি ছুরি লইয়া আইস। একটি ফলা সোজা-সুজি খাড়া কাকের মধ্যে ঢুকাইয়া দাও। অন্য ফলাটি উপরদিকে বাঁকাইয়া একটি আপেল ফলের মধ্যে বিঁধাইয়া দাও। কার্ড-বোর্ডের একটি গোলাকার চাক্তি লও এবং ইহার মাঝখান হইতে গোলভাবে খানিকটা কাটিয়া বাহির কর—যাহাতে ইহা আংটির মত আপেলকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে পারে। এই চাক্তির মধ্যে আপেলটি ঢুকাইয়া দাও। কাক, ছুরি ও আপেল-সমেত কাঠের টুকরাটি এখন একটি টেবিলের উপর রাখ। কাঠের টুকরাটি এত পুরু হওয়া উচিত, যাহাতে আপেলের মধ্য-অংশ তোমার চোখের সমান উচ্চ হয়। তুমি এখন টেবিলের



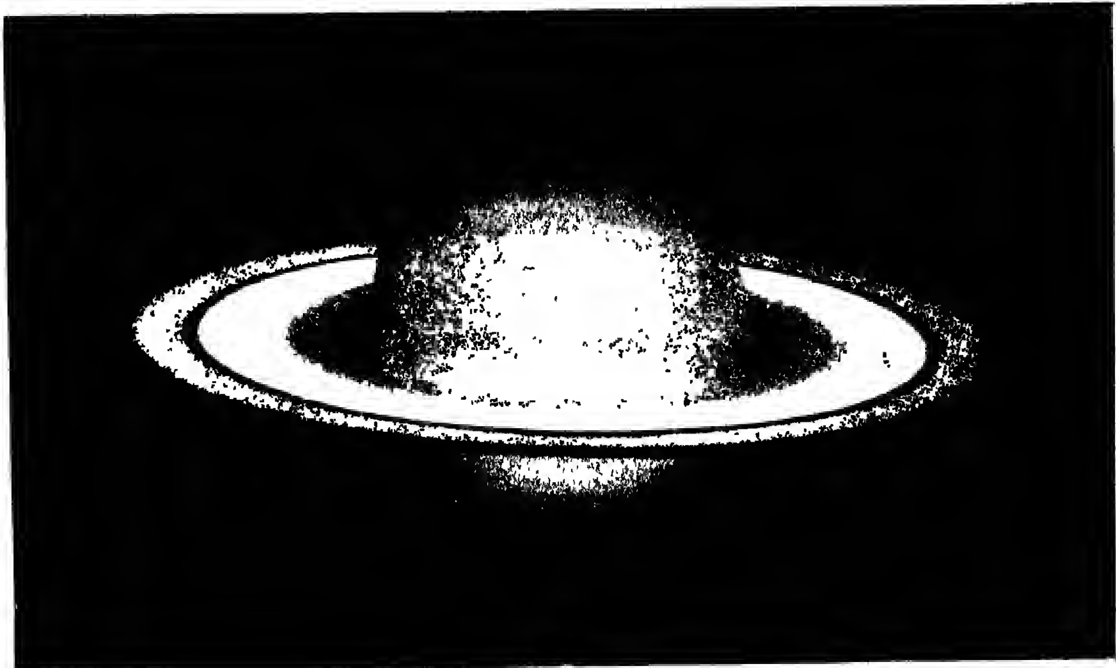
শনির বিবিধ কলা।
হেপবার্ণ সাহেবের অঙ্কিত

চারিপাশে ঘুরিতে থাক। কখনও তুমি চাক্তির উপর দিকটা দেখিতে পাইবে, আর কখনও বা ইহার নীচের দিকটা দেখিতে পাইবে, এবং কখনও কখনও চাক্তিকে সরু সরল রেখার মত দেখিতে পাইবে। এইরূপে তুমি আপেলটির বলয়ের নানারূপ কলা দেখিতে পাইবে। তুমি যদি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাক এবং কার্ডবোর্ড সমেত

আপেলটি যদি তোমার চারিধারে ঘুরিতে থাকে, তাহা হইলেও তুমি এইরূপ বলয়ের কলা দেখিতে পাইবে।



শনির চারিটি ছবি ডেনিঙ্গ্ সাহেবের অঙ্কিত



শনি, জুন ১৯২৪—মিউডন্ মানমন্দিরে অ্যান্টোনিয়াদি সাহেবের দৃষ্ট

লাউয়েল (Lowell) সাহেব মাপিয়া দেখিয়াছেন যে, সবচেয়ে বড় বলয়টির বাহিরকার ব্যাস ১৭১,০০ মাইল এবং

প্রস্থে ইহা ১০,০০০ মাইল। কিন্তু ইহার বেধ আন্দাজ ১০ মাইল হইবে। বাহিরকার ও মাঝখানের বলয় দুইটির মধ্যে একটি কালো রেখা দেখা যায়। ইহা ফাঁকা জায়গা এবং ইহাকে "ক্যাসিনির বিভাগ" (Cassini's division) বলা হয়। ইহা প্রস্থে ৩,০০০ মাইল। মাঝখানের বলয়টির বাহিরের ব্যাস ১৪৫,০০০ মাইল এবং ইহা প্রস্থে প্রায় ১৬,০০০ মাইল। মধ্যকার ও ভিতরকার বলয় দুইটির মধ্যে ১০০০ মাইল-



শনির মেরু হইতে বলয়গুলির দৃশ্য—শনির ছায়াও দেখা যাইতেছে

ব্যাপী মুক্ত আকাশ দেখা যায়। সবচেয়ে ভিতরকার কঙ্কণটি তত উজ্জ্বল নয়। ইহা প্রস্থে ১১,৫০০ মাইল। সবচেয়ে ছোট বলয়টির ভিতরকার পরিধি এবং শনির গাত্রের মধ্যে ৭,০০০ মাইল-ব্যাপী মুক্ত আকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। সবচেয়ে বড় বলয়টিকেও গোল সরু কালো দাগ দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহাকে "এনকের বিভাগ" (Enckes division) বলে। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে কীলার (Keeler) সাহেব শনির বলয়গুলির কিরণচিত্র (Spectrum) পরীক্ষা করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তিনটি বলয়ই শনির মেরুদণ্ডের চারিধারে ঘুরপাক খাইতেছে। তিনি আর একটি বিশেষ জিনিষ লক্ষ্য করিলেন যে, প্রত্যেক বলয়টির ভিতরের অংশ বাহিরের অংশের চেয়ে দ্রুতবেগে ঘুরিতেছে। ইহা হইতে স্পষ্টই তোমরা বুঝিতে পারিবে যে, বলয়গুলি অবিচ্ছিন্ন জমাট পদার্থ নয়। খুব সম্ভবতঃ বলয়গুলি পৃথক্ পৃথক্ ছোট ছোট কণাসমষ্টি মাত্র। প্রত্যেক টুকরা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র চাঁদের মত শনির চারিধারে পরিভ্রমণ করিতেছে। প্রত্যেক টুকরা পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অবস্থিত বলিয়াই সে-গুলির মধ্যে ব্যবধান আছে। যদি কোনও উজ্জ্বল তারা বলয়গুলির পিছনে গিয়া পড়ে, তাহা হইলে বলয়গুলির ভিতর দিয়া তারাটিকে দেখিতে পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া ইহাও জানা গিয়াছে যে এই বলয়গুলি বায়বীয় পদার্থে তৈয়ারী নহে। রাশিয়ান জ্যোতির্বিদ্ ষ্ট্রুভ (Struve) সাহেবের মতে বলয়গুলির ওজন শনির ওজনের [illegible] র বেশি হইবে না এবং সম্প্রতি লুই বেল (Louis Bell) সাহেব গণনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, বলয়গুলির ওজন [illegible] অংশ মাত্র হইবে।

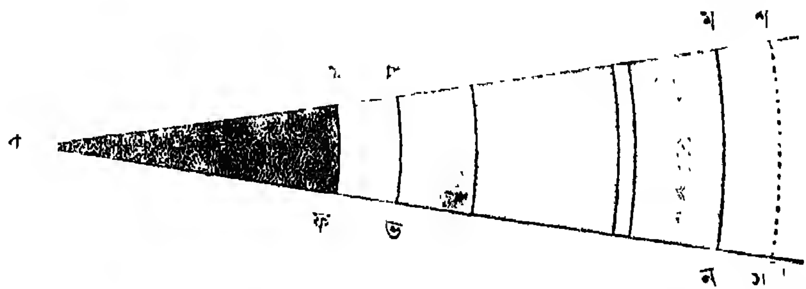
এখন দেখা যাউক, বলয়গুলির জন্ম কি করিয়া হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত গণিতজ্ঞ লাপলাস (Laplace) সাহেব এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন। তোমরা সকলে বোধ হয় নিউটনের (Newton) নাম শুনিয়া থাকিবে। তাঁহার আবিষ্কৃত মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির কথা বোধ হয় জান। প্রত্যেক অণুর বা পরমাণুর পরস্পরকে টানিবার শক্তি আছে। অন্য কোন আলোড়নের কারণ যদি না থাকে, তাহা হইলে কেবলমাত্র মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে চারিদিকে প্রসারিত ও বিক্ষিপ্ত যে কোনও

বাষ্পময় পদার্থ অবশেষে গোলকের আকার ধারণ করে। এই বাষ্পের পিণ্ড যতই ঠাণ্ডা হইতে থাকে, ততই আকারে ছোট হইয়া জমাট বাঁধিয়া এক একটি উপপিণ্ডে পরিণত হয়। লাপ্লাস সাহেবের মতে সূর্য্য হইতে গ্রহগুলি এবং গ্রহ উপগ্রহগুলি



বলয়ের উৎপত্তি সম্বন্ধে লাপ্লাসের কল্পনা

যায়। যদি কোনও রকমে এই গোলক-পিণ্ডটি নিজের মেরুদণ্ডের চারিদিকে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তাহা হইলে যতই এই পিণ্ডটি আকারে ছোট হইতে থাকে, ততই ইহার ঘুরপাক খাইবার বেগ বাড়িতে থাকে। এদিকে মেরুপ্রদেশ দুইটি ক্রমশঃ বেশি চাপ্টা হইতে থাকে। লাপ্লাসের মতে যখন ঘূর্ণনের বেগ অধিকমাত্রায় বাড়িয়া যায় তখন খানিকটা বাষ্পীয় পদার্থ পৃথক্ হইয়া বলয়ের আকার ধারণ করে। অবশেষে এক একটি বলয় এইরূপেই জন্মিয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, শনির বলয় তিনটি অবশেষে জমাট বাঁধিয়া আরও তিনটি চাঁদ হইয়া শনির চারিধারে ঘুরিতে থাকিবে।



ক শনির কেন্দ্র, পফ—শনির পরিধির অংশ, বভ, মন— বলয়গুলির পরিধির অংশ, শস—"রস"-এরসীমা

১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ক্লার্ক্ ম্যাক্সওয়েল (Clerk maxwell) সাহেব গণনার দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণ

করিয়া দেখাইলেন যে, এই প্রকার গ্রহ বা উপগ্রহের সৃষ্টি হইতে পারে না, এবং শনির বলয়গুলি শেষকালে চাঁদে পরিবর্তিত হইতে পারে না। এদিকে রশ (Roche) সাহেব একটি মজার ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাইয়া দিলেন। ধর, দুইটি জড়পিণ্ড আছে, একটি ছোট আর একটি বড়, এবং ছোটটি বড়টির চারিধারে ঘুরিতেছে। ঘুরিতে ঘুরিতে যদি ছোটটির



এডওয়ার্ড রশ (১৮২০ - ১৮৮৩)

কক্ষের ব্যাস কমিতে থাকে এবং কমিতে কমিতে যখন কক্ষের ব্যাস বড় পিণ্ডটির ব্যাসের ২·৪৫ গুণের কম হইয়া যাইবে তখন ছোট পিণ্ডটি ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বহুল অতিক্ষুদ্র কণায় পরিণত হইবে এবং বলয়ের আকার পাইবে। পণ্ডিতেরা এই অনুপাতকে "রশ-এর সীমা" (Roche's Limit) বলিয়া থাকেন। শনির বড় বলয়টির বাহিরকার ব্যাস শনির ব্যাসের ২·৩ গুণ মাত্র। এককালে তিনটি বলয় শনির একটি চাঁদ ছিল। তোমাদের মনে হইতে পারে যে তিনটি চাঁদ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তিনটি বলয় হইবার কথা। কিন্তু তাহা নহে, সম্প্রতি গোল্ড্‌স্‌বরো (Goldsborough) সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন যে, তিনটি বলয়ই একটি চাঁদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। শনির সবচেয়ে নিকটের চাঁদ মাইমস এখন "রশ"-এর সীমার ভিতরে আসিয়া পড়ে নাই। ইহার কক্ষের ব্যাস শনির ব্যাসের ৩·১১ গুণ।

আর একটি মজার কথা তোমাদিগকে বলিব। আমাদের পৃথিবীর চাঁদও অবশেষে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলয়ের আকার লইবে। জেফ্‌রেস (Jeffreys) সাহেব অঙ্ক কষিয়া দেখাইয়াছেন যে, জোয়ার ভাঁটার সংঘর্ষে নিজের মেরুদণ্ডের চারিধারে পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতি কমিয়া যাইতেছে এবং সেই জন্য দিন বড় হইতেছে ও চাঁদ পৃথিবী হইতে দূরে চলিয়া যাইতেছে। ক্রমশঃ দিন বড় হইতে হইতে এখনকার দিনের ৪৭ গুণ হইবে এবং চান্দ্রমাসও বড় হইতে হইতে এখনকার ৪৭ দিনের সমান হইবে। যখন এইরূপ হইবে তখন কেবলমাত্র পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ হইতে চাঁদ দেখা যাইবে ও অপরাংশ হইতে চাঁদ একেবারেই দেখা যাইবে না। এই ঘটনা বোধ হয় ৫০,০০০,০০০,০০০ বৎসর পরে ঘটিবে। শেষকালে চাঁদ আবার পৃথিবীর কাছে আসিতে থাকিবে এবং পৃথিবী হইতে যখন ১২,০০০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িবে, তখন ইহা ভাঙ্গিয়া চুরিয়া বলয়ের আকার পাইবে।



কুহক-জাতক বা জটার কুটা

। বৌ।

১০১৬ পৃষ্ঠার পর

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় মগধদেশের একটি গ্রামের জমিদার সাধু সন্ন্যাসীদের বড় ভক্তি করিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, সাধুসন্ন্যাসীদিগের সেবা করিলে পরম পুণ্য হয়। একবার এক জটাধারী সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। জমিদার বিধিমত তাঁহার পরিচর্য্যা করিলেন। সন্ন্যাসী সেবাযত্নের পারিপাট্য দেখিয়া আর বাড়ী ছাড়িতে চান না—জমিদারের ঠাকুরবাড়ীর নাট-মন্দিরেই ডেরা বাঁধিলেন। তখন জমিদার অগত্যা বাগানে তাঁহার জন্য এক কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। সন্ন্যাসী ঐ কুটীরে বাস করিতেন এবং দুবেলা জমিদারের ঠাকুর বাড়ীতে, একবেলা জমিদারের গৃহেই পরিতোষের সহিত আহার করিতেন। ক্রমে সন্ন্যাসীর শীর্ণ দেহ বেশ পুষ্ট ও চিক্কণ হইয়া উঠিল।

এক বৎসর এইভাবে অতীত হইল। এই সময়ে দেশে বড় চোর-ডাকাতের উপদ্রব হইল। জমিদার সঞ্চিত অর্থ লইয়া বড়ই বিব্রত হইয়া উঠিলেন। শেষে ঠিক করিলেন— ঐ সন্ন্যাসী কেবল বসিয়া থান উঁহাকেই ধনরক্ষার ভার দেওয়া যাউক। সন্ন্যাসীরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া আসেন, পরধনে তাঁহাদের লোভ থাকে না। এই ভাবিয়া সন্ন্যাসী যে কুটীরে বাস করিতেন সেই কুটীরের মেঝেতে গর্ত্ত খুঁড়িয়া সমস্ত ধনসম্পদ পুঁতিয়া রাখিয়া আসিলেন। ভাবিলেন, এমন জায়গায় ধন রাখা হইল যেখানে চোর-ডাকাতেরা সন্দেহ করিয়া খোঁজও করিবে না। তাহা ছাড়া সন্ন্যাসী ঠাকুর মেঝের উপরই বাঘছাল পাতিয়া শুইয়া থাকেন। এমন নিরাপদ স্থান আর হয় না।

এদিকে সন্ন্যাসী ক্রমে ভোজনের পারিপাট্য ত্যাগ করিতে লাগিলেন—দুগ্ধ, মিষ্টান্ন, ক্ষীর, ঘৃত, লুচি ইত্যাদি খাওয়া ছাড়িয়া দিলেন। জমিদার জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুর আপনি পিষ্টক-পায়সাদি না খেলে আমরাই বা কি করে খাই? কেন এসব ত্যাগ করলেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন—"বৎস, তোমার তুষ্টির জন্য এতদিন নানাবিধ সুখাদ্য ভোজন করেছি। এসকল খাদ্য ভক্ষণ সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য নয়—ক্রমে ভোগী হয়ে পড়েছি। একে ত সন্ন্যাসীর পক্ষে গৃহবাস নিষিদ্ধ। কেবল তোমার আত্মার উন্নতি সাধনের জন্যই তোমার গৃহে বাস কচ্ছি। তুমি আর সুখাদ্যাদির আয়োজন ক'রে আমার ব্রতভঙ্গ করোনা।" সন্ন্যাসী অতঃপর সমস্ত দিন উপবাস করিয়া কেবল জপতপ করিতেন, কোন কোন দিন হোম করিতেন। কোন কোন দিন গীতা পাঠ করিতেন। সন্ধ্যার সময় সামান্য ফলমূল ও শুষ্ক রুটী খাইতেন। পরিচর্য্যার জন্য যে ভৃত্য নিযুক্ত ছিল, সন্ন্যাসী তাহাকেও বিদায় দিলেন। সন্ন্যাসীর দেহ ক্রমে শীর্ণ হইতে

লাগিল। শীতনিবারণের জন্য জমিদার সন্ন্যাসীকে একখানি উৎকৃষ্ট শীতবস্ত্র দিয়াছিলেন; সন্ন্যাসী তাহাও ফেরত দিলেন। ক্রমেই সন্ন্যাসীর প্রতি জমিদারের ভক্তি বাড়িতে লাগিল। জমিদার ও জমিদার পত্নী সন্ন্যাসীর নিকট দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। সন্ন্যাসী দীক্ষাদান করিতে চাহিলেন না। জমিদার সন্ন্যাসীর পদতলে পড়িয়া কাতর প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসী তাহাতে বিগলিত



সন্ন্যাসী···শুধু একটি হরিতকী গ্রহণ করিলেন

হইয়া শেষে জমিদার ও জমিদার-গৃহিণীকে দীক্ষাদান করিলেন। দীক্ষার দক্ষিণাস্বরূপ জমিদার অনেক কিছু দিয়াছিলেন--তাহার মধ্যে একটি সোনার কমণ্ডলুও ছিল। সন্ন্যাসী সমস্ত ফিরাইয়া দিয়া শুধু একটি হরিতকী গ্রহণ করিলেন।

এইভাবে কিছুদিন গত হইলে সন্ন্যাসী একদিন বলিলেন—"বৎস, সন্ন্যাসীর পক্ষে এক স্থানে বাস করা উচিত নয়। আমি তোমার গুণে বশীভূত হয়ে কেবল এখানে এতদিন থাকলাম। আমার এখনও বহু তীর্থ দর্শন বাকী আছে। অতএব তুমি আমাকে



তাঁর ঝোলাঝুলিগুলো খুঁজে পেতে দেখেছেন ত ?

ব্যাকুল হইয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন কত সাধ্য-সাধনা করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী অচল অটল। সন্ন্যাসী বহু যুক্তি দেখাইলেন। অগত্যা জমিদার সম্মত হইলেন সন্ন্যাসীর যাত্রাকালে জমিদার পাথেয় বলিয়া

কিছু দিতে চাহিলেন। সন্ন্যাসী তাহা গ্রহণ করিলেন না। কেবল বলিলেন, "আমি আবার ফিরে আসব, তুমি ক্ষুব্ধ হয়ো না। বৎসরান্তে আবার আমার দেখা পাবে।" জমিদার সন্ন্যাসীর সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম-প্রান্ত পর্যন্ত গেলেন। গ্রামান্তে একটি পুষ্করিণীর তীরে জমিদার দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী কিছু দূর অগ্রসর হইয়া হঠাৎ ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসী জটার মধ্য হইতে একটি খড় বাহির করিয়া বলিলেন—

"বৎস আসবার সময় তোমার কুটীরের চালের একটি খড় আমার জটায় বেধে গিয়েছিল—সেই খড়টা তোমাকে ফেরত দিতে এলাম। একটা সামান্য খড় হলেও সন্ন্যাসীর পক্ষে তা নিয়ে যাওয়া পাপ।"

জমিদার খড়টি লইয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিলেন এবং সন্ন্যাসীর অনাসক্তিতে অবাক হইয়া গেলেন। সন্ন্যাসীর কথা ভাবিতে ভাবিতে জমিদার গৃহের দিকে ফিরিলেন। একজন শেঠির বিপণির নিকট উপস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠী জমিদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এ ভাবে খালি পায়ে কোথা গিয়েছিলেন?"

জমিদার সকল বৃত্তান্ত বলিলেন এবং জটার খড়ের কথাও এই প্রসঙ্গে বলিয়া ভক্তির আবেগে অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। শ্রেষ্ঠীও সন্ন্যাসীর অনাসক্তির কথায় ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। বোধিসত্ত্ব এই জন্মে ছিলেন একজন বণিক। তিনি কতকগুলি পণ্য বিক্রয়ের জন্য ঐ শেঠীর কাছে আসিয়াছিলেন। তিনি বসিয়া বসিয়া সব শুনিলেন এবং তারপর বলিলেন—মহাশয়, সন্ন্যাসী ত চলে গেলেন তাঁর ঝোলাঝুলিগুলো খুঁজে পেতে দেখেছেন কি?"

এই কথা শুনিয়া জমিদার ক্রোধে অগ্নিশর্মা হইয়া উঠিলেন। বোধিসত্ত্ব হাসিতে লাগিলেন।

বোধিসত্ত্ব আবার বলিলেন—"সন্ন্যাসী যেখানে ছিলেন—সেখানে সব জিনিসপত্র ঠিক আছে কি না,—চলুন দেখা যাক।"

জমিদার বলিলেন—আপনি মুখ সামলে কথা বলবেন। জানেন, তিনি আমার গুরু।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন—তা হতে পারেন! কিন্তু যে ঘরে তিনি ছিলেন—সে ঘরটা একবার ভাল করে দেখা উচিত। আপনি যে নিঃস্পৃহতার দৃষ্টান্ত দেখালেন, তাতে ত আমার মশায় ঘোরতর সন্দেহ হয়েছে।'

জমিদার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া ক্রোধভরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু তিনি বাড়ী ফিরিয়া প্রথমেই বাগানের সেই কুটীরে প্রবেশ করিলেন এবং কোদাল দিয়া ঘরের মেঝে খুঁড়িলেন। অতি সহজেই আলগা মাটি উঠিয়া পড়িতে লাগিল। মাটি আলগা দেখিয়া জমিদারের বুক ঢিপ ঢিপ্ করিতে



দুইটি অশ্বে আরোহণ করিয়া দুজনে ছুটিলেন

লাগিল। দুই হাত খোঁড়ার পর একটি তামার কলসী পাইলেন। তাড়াতাড়ি কলসীতে হাত পুরিয়া দেখেন—তাহা শূন্য। আর একটি তামার কলসী পাইলেন—তাহার মধ্যেও কিছুই নাই—স্বর্ণমুদ্রা

ও স্বর্ণালঙ্কার সবই সরিয়াছে। জমিদার মাটি-মাখা হাতে গলদঘর্ম হইয়া ছুটিতে ছুটিতে শেঠের কুটীরে আসিয়া হাজির হইয়া সব কথা বলিলেন। তৎক্ষণাৎ বোধিসত্ত্ব ও জমিদার দুইটি অশ্বে আরোহণ করিয়া ছুটিলেন। দেড় ক্রোশ অতিক্রম করার পরও সন্ন্যাসীর দেখা পাওয়া গেল না। কিছুদূরে মাঠের মধ্যে একটি ভাঙ্গা বাড়ী সেখান হইতে একদল শিয়ালের চীৎকার শুনা যাইতেছে। বোধিসত্ত্ব ঐ ভাঙ্গা বাড়ী লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। সেখানে গিয়া দেখেন সন্ন্যাসী একটি কোদাল লইয়া গর্ত খুঁড়িতেছে। বলা বাহুল্য সন্ন্যাসী একদিন রাত্রিকালে ধনসম্পদ সেখানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছিল। আজ যাইবার সময় তুলিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে। সন্ন্যাসীর অনাসক্তির অভিনয় বোধিসত্ত্বের হাতে ধরা পড়িয়া গেল। তখন বোধিসত্ত্ব তাহাকে বলিলেন—

জটার কুটীর কি দাম আছে, কেবল দেখায় সোজা।
কেন তুমি আর-পাটি? যাও এখন গোল বোকা॥

কুসংস্কারী ব্রাহ্মণ

বৌদ্ধজাতক হইতে

বুদ্ধদেব যখন রাজগৃহের বিহারে বাস করিতেছিলেন, তখন রাজগৃহের সকলেই ... তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার শ্রীমুখের বাণী ... প্রকৃত ধর্মের মর্ম উপলব্ধি করিতে লাগিল। ... একজন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবকে এড়াইয়া চলিতেন, তাঁহার প্রচারিত ধর্মের বিরুদ্ধে নানা কথা বলিতেন। এ ব্যক্তির অগাধ ধন-সম্পত্তি ছিল। যত প্রকারের কুসংস্কার সে যুগের হিন্দুসমাজে প্রচলিত ছিল, ব্রাহ্মণ সেগুলিকে কাটায় কাটায় মানিয়া চলিতেন। ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয়ের জন্য অনেকদিন বুদ্ধদেব সুযোগ খুঁজিতেছিলেন।

ব্রাহ্মণ একদিন স্নানান্তে বস্ত্র পরিবর্তনের সময় জানিতে পারিলেন—তাহার বহুমূল্য এক জোড়া চাদর ইঁদুরে কাটিয়াছে। শুনিয়া ব্রাহ্মণ চমকিয়া উঠিলেন। ব্রাহ্মণের বিশ্বাস, ঐ বস্ত্র যে পরিধান করিবে, তাহার এবং তাহার পরিবারস্থ সকলের মৃত্যু হইবে। যে স্পর্শ করিবে তাহারও অমঙ্গল হইতে পারে। ব্রাহ্মণ ঐ পরিচ্ছদ শ্মশানে ত্যাগ করিয়া আসিতে আদেশ দিল। ভৃত্যদিগকে এ ভার দিতে পারিল না—ভয়, পাছে তাহারা লোভবশে আপন গৃহে লইয়া যায়। আপন পুত্রকে বলিল :

"একটা লাঠির ডগায় ঐ কাপড় দুখানাকে জড়িয়ে শ্মশানে ফেলে দিয়ে স্নান করে বাড়ী এস। দেখ যেন কিছুতে ছুঁয়ো না।'

পুত্র পিতার আদেশমত মড়া সাপকে যেমন লোকে লাঠির ডগায় করিয়া লইয়া যায়, সেই ভাবে উহাকে লইয়া শ্মশানে ফেলিতে গেল। পথে বুদ্ধদেব এই দৃশ্য দেখিলেন ... ছেলেটির সঙ্গে সঙ্গে



কাপড়গুলি লইয়া শ্মশানে ফেলিতে গেল

শ্মশানে গেলেন। তারপর ছেলেটি যেমন ঐ কাপড়

চাদর ফেলিয়া দিল অমনি তিনি কুড়াইয়া লইয়া কোমরে জড়াইতে লাগিলেন। ছেলেটি হাহাকার করিয়া উঠিল। বুদ্ধদেব হাসিতে হাসিতে বেণুবনের দিকে চলিয়া গেলেন।

পুত্র আসিয়া পিতাকে এ সংবাদ জানাইল। পিতা দেখিলেন—সর্বনাশ! এই বস্ত্র পরিধান করিয়া গৌতম ও সেই সঙ্গে তাঁহার শিষ্য সেবক সকলেরই মৃত্যু হইবে। মনে মনে ভাবিলেন, তাঁর, বিশেষ নিজের গৌরব, ইহার যে কুফল তাহা ও জানে না। ব্রাহ্মণ ভাবিলেন এতগুলি লোকের মৃত্যুর জন্য আমিই দায়ী হইব ও চলিলেন। তিনি নিজের বহু বস্ত্র ছিল সমস্ত গাড়ীতে বোঝাই করিয়া এবং পাচক বান্ধব সঙ্গে লইয়া বেণুবন বিহারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বুদ্ধদেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "গৌতম, তুমি জান না ইঁদুরে কাটা কাপড় পরিধান করিলে ভীষণ অমঙ্গল হয়, তুমি এখন ঐ বস্ত্র ত্যাগ কর—দেখ তোমার ও তোমার শিষ্যগণের জন্য আমি কত বস্ত্র এনেছি। তোমাদের বস্ত্র ক্রয়ের জন্য আমি সহস্র মুদ্রা দান করছি।"

গৌতম বলিলেন—"ব্রাহ্মণ, তোমার বস্ত্র নিয়ে আমরা কি করব? আমরা পথে ঘাটে শ্মশানে আবর্জনার মধ্যে যেখানে যে চীবর, ছিন্ন বস্ত্র পাই, তাই পরি। আমাদের অন্য বস্ত্র পরতে নেই, যে কাপড় ইঁদুরে কাটা এবং শ্মশানে নিক্ষেপ করা সেই কাপড় আমাদের পরিধেয়। ব্রাহ্মণ, তুমি কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছ, অলীক কাহিনীর ভয়ে তুমি বেঁচে থেকেও মরে আছ। আমরা জগতের সকল ভয় জয় করেছি। যদি নিজে বাঁচতে চাও তবে আমার কথা শোন, তাও বলি। কুসংস্কারগুলো তোমার মনে দানা বেঁধে বিভীষিকা রচনা করছে, তুমি সাপের ফেনায় বাস করছ। সারারাত তুমি দুঃস্বপ্ন দেখ, সারাদিন তোমার সেই দুশ্চিন্তায় কাটে, স্বপ্নগুলোকে সত্য ব'লে বিশ্বাস ক'রে তুমি কি যাতনাই না পাচ্ছ। প্রত্যেক জীবজন্তুর চলাফেরায় তুমি মঙ্গল অমঙ্গল খুঁজে অস্থির হচ্ছ—কাক ডাকলে তুমি চমকে ওঠ—পেঁচা ডাকলে তুমি ভাব মৃত্যু স্বয়ং ডাকছে—টিকটিকি পড়লে তোমার শান্তি নষ্ট হয়—রাত্রিকালে আকাশের দিকে তোমার চাইবার উপায় নাই, কখন উল্কাপাত দেখে ফেলবে। ভেবে দেখ দেখি, কি ভীষণ জীবন তুমি যাপন করছ।"

ব্রাহ্মণ, তুমি কুসংস্কারে আবদ্ধ

এই ভাবে বুদ্ধদেব তাহাকে উপদেশ দিতে লাগিলেন। এই উপদেশে ব্রাহ্মণের চৈতন্যোদয় হইল।

চরিত্র পরীক্ষা

চরিত্র পরীক্ষা

(বৌদ্ধ জাতক হইতে)

কোশলরাজ একজন মহাপ্রাজ্ঞ চরিত্রবান সুদর্শন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে নিজের গৃহে প্রতিপালন করিতেন। ক্রমে তাঁহার বিদ্যাবত্তা ও ধর্মপরায়ণতায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। রাজা তাঁহার গুরুকে এতই ভক্তি করিতেন যে, ব্রাহ্মণ মনে মনে বড় লজ্জা পাইতেন। ব্রাহ্মণ মনে মনে ভাবিতেন তিনি এতদূর ভক্তি পাইবার পাত্র নহেন। তাঁহার যত জ্ঞানই থাকুক, আর তিনি যত চরিত্রবান্ হউন না কেন, তিনি যখন রাজপ্রাসাদে রাজগুরুর জীবন যাপন করিতেছেন তখন তিনি অন্যান্য সকলের মতই একজন ভোগী গৃহস্থের সাংসারিক পথখানি ধরিয়াছেন, অথচ সকলের চেয়ে আদর কদর অত্যধিক হইতেছে।

তিনি একদিন ভাবিলেন রাজা যে আমাকে এত ভক্তি করেন—এটা কিসের জন্য পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক। আমার জ্ঞানের জন্য না বংশ জাতের জন্য—না সাধুশীলতার জন্য না চরিত্রের জন্য?' এই সংকল্প করিয়া তিনি একদিন ধনপালের ফলক হইতে একটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিলেন। ধনপাল রাজগুরুকে ভক্তি করিতেন দেখিয়াও কিছু বলিলেন না। দ্বিতীয় দিন দুইটি স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ করিলেন। ধনপাল সেদিনও কিছু বলিলেন না। তৃতীয় দিন ব্রাহ্মণ এক মুঠা স্বর্ণমুদ্রা লইয়া চলিয়া যাইতেছিলেন ধনপাল সেদিন ধরিয়া ফেলিলেন। ব্রাহ্মণ পলাইতে চেষ্টা করিলেন না—ধনপালের নিকট মুক্তির জন্য প্রার্থনাও করিলেন না, স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফেরত ও দিলেন না। ধনপাল রাজাকে জানাইলেন। রাজা বিশ্বাস করিলেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণ স্বয়ং দোষ স্বীকার করিলেন, এবং মুদ্রাগুলি রাজার হাতে দিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। রাজা বড়ই দুঃখিত হইলেন—তাঁহার এত বড় মধুর স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি বলিলেন—ব্রাহ্মণ, আপনি এমন কাজ কেন করলেন! আপনাকে আমি গুরুর পদে বরণ করে আপনার দাসানুদাস হয়ে সেবা করছি। আপনাকে কত ধন উপহার দিয়েছি, আপনি তা গ্রহণ করেন নি। অথচ আপনি সামান্য দশটি স্বর্ণমুদ্রার লোভ সামলাতে পারলেন না। আপনি প্রকাশ্যে ধরা পড়েছেন, এখন আপনাকে দণ্ড গ্রহণ করতে হবে। আপনাকে দণ্ড দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে অথচ রাজধর্ম আমাকে পালন করতেই হবে। নতুবা লোকে আমাকে অবিচারক বলবে।"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"মহারাজ, আমি চাইলেই এখনি শত শত স্বর্ণমুদ্রা পেতে পারি। তা ছাড়া আমার কোন অভাব নেই। কোন অভাবই তুমি আমার রাখনি। তবু এ কাজ কেন করলাম একবার ভেবে দেখুন। তারপর দণ্ড ভোগ করব।'



আপনি স্বর্ণমুদ্রার লোভ সামলাতে পারলেন না

রাজা বলিলেন—"আমি ত কিছু বুঝতে পারছি না, ঠাকুর। সব আমার প্রহেলিকা বলে মনে হচ্ছে!"

ব্রাহ্মণ বলিলেন—"তবে শোন মহারাজ, আমি কেবল পরীক্ষা ক'রে দেখছিলাম, আমি যে তোমার এত বেশি ভক্তির পাত্র, তা কিসের জন্য? আমার গভীর জ্ঞানের জন্য, না জাতি কুলের জন্য,

না চরিত্রের জন্য ? এখন দেখলাম, চরিত্রের জন্যই আমি এতদিন ভক্তিভাজন হয়ে ছিলাম। চরিত্র যদি যায়, তবে ব্রহ্মজ্ঞতা, বেদজ্ঞত, বা জাতিধর্ম কেউ বাঁচাতে পারে না। জাতি, কুল বা বিদ্যা জ্ঞান ইত্যাদি চরিত্রহীনকে একদিন, দুইদিন পর্যন্ত বাঁচাতে পারে, তৃতীয় দিনে তাহারাও অক্ষম হ'য়ে পড়ে। এখন বুঝতে পেরেছি, এই চরিত্রই মানুষের সব চেয়ে বড় বল ও সম্বল। সমাজ সংসারের মধ্যে থাকলে বিশেষতঃ রাজ ঐশ্বর্যের মধ্যে গুরুর পদে বসে থাকলে ঐ চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ নির্মল রাখা কঠিন। তাই আমি আজই তেজবনে গিয়ে গৌতম বুদ্ধের শরণ নিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব। রাজা কৃতাঞ্জলি হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন "রাজন্! তোমার কোনো দোষ নেই ; তুমি আপন রাজধর্ম্মই পালন করেছ। তুমি যদি দণ্ড দিতে না চাইতে, তা হ'লে চরিত্রের মর্য্যাদার প্রকৃত পরীক্ষাই হ'ত না।"

ব্রাহ্মণের স্ত্রী-পুত্র ও রাজা সকলেই তাঁহাকে সংসার ত্যাগের সংকল্প হইতে নিবৃত্ত করিতে যথেষ্টই চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ কোন নিষেধ না শুনিয়া জেতবনের বিহারে চলিয়া গেলেন।

নামের মূল্য

বৌদ্ধ জাতক হইতে

বোধিসত্ত্ব এক জন্মে তক্ষশিলার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার পাপক নামে এক ছাত্র ছিল। ছাত্রটি নিজের নামের জন্য বড় লজ্জিত থাকিত। সহপাঠীরাও এজন্য তাহাকে গঞ্জনা দিত। পাপক গুরুর নিকটে গিয়া প্রার্থনা করিল, "আর্য্য, আমার নামটা বদলিয়ে দিন এ নামে আমি বড় লজ্জা পাচ্ছি।"

গুরু বলিলেন "তুমি জনপদ ভ্রমণ ক'রে যে সকল নাম শুনতে পাবে, তাদের মধ্যে যেটা পছন্দ হয় সেটা আমাকে জানাও আমি তোমার সেই নাম করণ করে দেব। পাপক জনপদ ভ্রমণে বাহির হইল ; যাহাকে দেখে তাহারই নাম জিজ্ঞাসা করে : কেহ বলে, কেহ বলে না।

কতকগুলি লোক একটি বালকের মৃতদেহ দাহ স্থানে লইয়া যাইতেছে। পাপক মৃত বালকটির নাম জিজ্ঞাসা করিল। তাহার নাম জীবক। পাপক নাম শুনিয়া ভাবিল "এ কি, জীবকও মরে।"

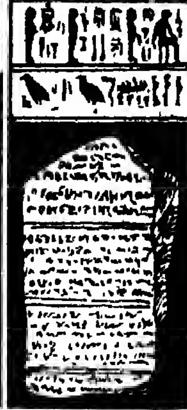
পাপক কিছু দূর গিয়া দেখিল, একটি দাসীকে তাহার প্রতিপালক প্রহার করিতেছে, অপরাধ, সে হাটে পণ্যদ্রব্য লইয়া গিয়া কিছুই লাভ করিয়া আসিতে পারে নাই। পাপক তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল তাহার নাম লক্ষ্মী। পাপক ভাবিল, যাহার নাম লক্ষ্মী, তাহারও এই দশা। কিয়দ্দূর গিয়া একটি লোকের সঙ্গে পাপকের দেখা হইল। সে পাপককে পথের হদিশ জিজ্ঞাসা করিল এবং বলিল, "আমি পথ হারিয়েছি। পাপক তাহাকে পথের সন্ধান দিয়া নাম জিজ্ঞাসা করিল। সে বলিল, আমার নাম 'পন্থক'। প[illegible] ভাবিতে ভাবিতে চলিল ; যার নাম পন্থক সে ও পথ হারায়! ঘুরিতে ঘুরিতে ক্লান্ত হইয়া পাপক একটি গৃহস্থের কুটীরে উপস্থিত হইয়া পানের জন্য জল চাহিল। সে একটি কালো কুচকুচে ছেলেকে ডাকিয়া বলিল, হেমাঙ্গ, এর পাত্রে জল আনো।" পাপক বলিল, এত কালো ছেলের নাম হেমাঙ্গ ? গৃহস্থ বলিলেন "বলেন কেন মহাশয় ছেলেটির বর্ণ গৌরই ছিল রোগে কালো হয়ে গেছে আর দেখুন, না এই ছেলেটির সাধ করে নাম রেখেছিলাম 'কমলাক্ষ', বসন্ত রোগে ও হয়ে গেল কাণা। আর ঐ দুর্ব্বল ছেলেটি দেখছেন, ওর নাম রেখেছিলাম বলভদ্র ও বেচারা চিররুগ্ন হ'য়ে থাকল। আমি যখন ছেলেদের নাম রাখি তখন বিধাতা অন্তরালে থেকে ক্রুর হাসি হাসেন।

পাপকের জনপদ ভ্রমণ শেষ হইল। সে গুরুর কাছে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"আমার নাম বদলানোর দরকার নাই। আর্য্য, যে জগতে জীবক মরে, লক্ষ্মী পেটের দায়ে মার খায়, পন্থক পথ হারায়, বলভদ্রের চলতে ফিরতে কষ্ট হয়, কমলাক্ষ চোখে দেখতে পায় না এবং হেমাঙ্গের গায়ের রঙ কালো কুচকুচে, সে জগতে পাপক যে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে উঠতে পারে, সেবিষয়ে সন্দেহ নাই।"

বোধিসত্ত্ব বলিলেন বৎস, নাম কেবল পদার্থ চিনবার সঙ্কেত মাত্র, নামে কেউ বড় হয় না, সাধনা বড়। বিনা সাধনায় উৎকৃষ্ট নাম হয় বিড়ম্বনা বা উপহাস। সাধনা থাকলে অপকৃষ্ট নামও প্রাতঃস্মরণীয়।



বিশ্বসাহিত্য



বেদের কথা

ঋগ্বেদ সংহিতার মন্ত্র

(৫) ইন্দ্রের স্তুতি (২মঃ। ১২ সূঃ)

(১) যে জ্ঞানী দেবতা জন্ম পাইবামাত্র নিজ জ্ঞানের দ্বারা অন্য দেবতাদের হারাইয়া দিলেন, যাঁহার ভীষণ বলের তেজে স্বর্গ ও পৃথিবী কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(২) যিনি কম্পমান পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি বিচলিত পর্বতদিগকে স্থির করিয়াছেন, যিনি স্বর্গ ও পৃথিবীর মাঝের বিশাল স্থান মাপিয়া ফেলিয়াছেন, যিনি স্বর্গকে খোঁটা দিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(৩) যিনি ভীষণ সর্পের মত বৃত্রাসুরকে মারিয়া সকল নদীকে ছাড়িয়া দিয়াছেন, যিনি গুহার দ্বার খুলিয়া গরুর মত জলগুলিকে বাহিরে আনিয়াছেন, যিনি মেঘের মধ্যে অগ্নি (বিদ্যুৎ) উৎপন্ন করিয়াছেন, যুদ্ধে যিনি সকলকে হারাইয়া দেন, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(৪) যিনি এই সকল জগৎকে নিজের স্থান হইতে বিচলিত করিয়াছেন, যিনি দানবদিগকে ভূমির নীচে অন্ধকারে ফেলিয়া দিয়াছেন, বিজয়ী খেলোয়াড় যেমন খেলায় জিতিয়া অনেক ধন উপার্জ্জন করে, সেই ভাবে যিনি শত্রুদের ধন কাড়িয়া লন, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

৬৩৭ পৃষ্ঠার পর



(৫) যে ভয়ঙ্কর দেবতার বিষয়ে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? কেহ বা বলে "তিনি নাই," অথচ যিনি জোরের সহিত শত্রুর ধন কাড়িয়া লন, হে মানবগণ, তাঁহাকে বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।

(৬) যিনি দীন, দুঃখী, কৃপাপ্রার্থী ও তাঁর স্তুতিকারী পূজারীকে সাহায্য করেন, যে সুন্দর দেবতা সোমযজ্ঞকারীর রক্ষা করেন, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(৭) যাঁহার আদেশে সকল ঘোড়া, সকল গরু, সকল মানুষ, সকল রথ চলিয়া থাকে, যিনি সূর্য্য ও উষার জন্ম দিয়াছিলেন, যিনি বৃষ্টির জলকে নিজের পথে লইয়া যান, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(৮) উভয় পক্ষের যুদ্ধকারী সেনা যাঁহাকে সাহায্যের জন্য ডাকিয়া থাকে, একই রূপ রথে চড়া দুই পক্ষের সেনাপতিই

নিজের পক্ষের বিজয়ের জন্য যাঁহাকে ডাকে, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(৯) যাঁহার কৃপা না পাইলে কেহ বিজয়ী হয় না যোদ্ধৃগণ সাহায্যের জন্য যাঁহাকে ডাকিয়া থাকে, যিনি একা বলে সমস্ত জগতের সমান, খুব স্থির বস্তুকেও যিনি নিজের স্থান হইতে সরাইয়া দেন, হে মানবগণ তিনিই ইন্দ্র।

(১০) যিনি পূজাহীন বহু পাপীকে নিজের বজ্র দিয়া মারিয়াছেন, যিনি অহঙ্কারী লোকের দর্প চূর্ণ করিয়া দেন, যিনি দানবদের হন্তা, হে মানব-গণ, তিনিই ইন্দ্র।

(১১) শম্বর নামে যে অসুর মেঘে মেঘে বাস করে, তাহাকে যিনি শরৎকালে চল্লিশ দিনের দিন খুঁজিয়া বাহির করিলেন এবং বলশালী সর্পের মত সেই দানব যখন শুইয়াছিল, তখন তাহাকে যিনি মারিয়া ফেলিলেন, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(১২) সাতটা দাড়ি দিলে তবে যে বৃষকে বাঁধা যায়, তাহার মত বলবান্ যে দেবতা সকল নদীদের বহিয়া যাইবার পথ করিয়া দিয়াছেন, বজ্রধারী যে দেবতা স্বর্গে চড়িবার চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া রৌহিণ অসুরকে দূর করিয়া দিয়াছিলেন, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(১৩) পৃথিবী এবং আকাশ যাঁহার কাছে নত হয়, যাঁহার ভীষণ বলের জন্য পাহাড়গুলি কাঁপিতে থাকে, যে বজ্রধারী দেবতা খুব সোম পান করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, হে মানবগণ তিনিই ইন্দ্র।



পুণার নিকটবর্ত্তী ভাজা নামক স্থানের প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের গাত্রে উৎকীর্ণ মূর্ত্তি অবলম্বনে শিল্পী শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ সাহা কর্ত্তৃক অঙ্কিত প্রকাণ্ড ঐরাবত হস্তীর উপরে দেবরাজ ইন্দ্র বসিয়া আছেন। তাঁহার পশ্চাতে বজ্র ও ইন্দ্রের ধ্বজ লইয়া ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উপেন্দ্র বিষ্ণু (অর্থাৎ সূর্য্যদেব) বসিয়া আছেন। সম্মুখে মরুদ্‌গণ আকাশে ঘুরিতে ঘুরিতে চলিয়াছেন। চিত্রের অর্থ—পূর্ব্বে ঘূর্ণি বাতাস, পরে ঝড় বৃষ্টি এবং শেষে মেঘ কাটিয়া গেলে সূর্য্যের উদয়। নিম্নে ইন্দ্রসভার দৃশ্য—ইন্দ্র বসিয়া আছেন এবং তাঁহার সম্মুখে গন্ধর্ব্ব, কিন্নর ও অপ্সরাগণ নৃত্য গীত করিতেছে।

(১৪) যে যজ্ঞের জন্য সোম ছেঁচিতেছে, পিঠে প্রভৃতি রাঁধিতেছে, স্তুতি করিতেছে, এবং যজ্ঞের আর সব কাজ করিতেছে, সেই যজ্ঞকারীর যিনি মঙ্গল করেন এই স্তোত্র যাঁহার মহিমা ছড়াইতেছে, যাঁহার জন্য এই পূজা, হে মানবগণ, তিনিই ইন্দ্র।

(১৫) হে ইন্দ্র, আপনি খুব বলশালী; যে আপনার জন্য সোম ছেঁচে ও পিঠে প্রভৃতি রাঁধে, আপনি তাহাকে ধন আনিয়া দেন। আপনিই সত্য। হে ইন্দ্র, আমরা যেন আপনার সকল সময়ে প্রিয় হইয়া ভাল পুত্র লইয়া যজ্ঞে আপনার স্তুতি করি।

(৬) রুদ্রের স্তুতি (২মঃ। ৩৩ সূঃ)

(১) হে মরুৎদের পিতা (রুদ্র), আপনার কৃপা আমাদের নিকটে আসুক। সূর্য্যের আলোকযুক্ত এই জগৎ হইতে আমাদের সরাইবেন না। আমাদের বীরগণ অশ্বপৃষ্ঠে যুদ্ধে করিয়া বিজয়ী হউক। হে রুদ্র, আমাদের যেন সন্তান-সন্ততিতে বৃদ্ধি হয়।

(২) হে রুদ্র, আপনি যে সব উত্তম ঔষধ দিয়া থাকেন, তাহার ব্যবহার করিয়া আমরা যেন শত বৎসর জীবিত থাকি। শত্রুরা শত্রুতা, আপদ্ বিপদ্ ও রোগের জ্বালা আমাদের নিকট হইতে দূরে সরাইয়া দিন্।

(৩) হে রুদ্র, আপনি আপন দীপ্তিতে সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রধারী, সকল বলশালীর চেয়ে আপনি বলবান্। আমাদের নিরাপদে বিপদের পারে লইয়া যান, আপদের সব তাড়না দূর করিয়া দিন্।

(৪) হে রুদ্র, আমাদের প্রণামের কোন ত্রুটিতে বা স্তুতির দোষে বা অন্য দেবতার সহিত এক সঙ্গে আপনাকে ডাকার অপরাধে যেন আপনাকে চটাইয়া না ফেলি। আপনার ঔষধ দিয়া আমাদের বীরগুলিকে সতেজ করিয়া দিন্, শুনিয়াছি, আপনি বৈদ্যদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৈদ্য।

(৫) যে রুদ্রদেবকে আহ্বান ও আহুতির দ্বারা ডাকা হয়, স্তুতি করিয়া আমি তাঁহার রাগ দূর করিব। এই রক্তবর্ণ, সুন্দর চোয়ালযুক্ত রুদ্রদেব অতি দয়ালু এবং সহজে লোকের ডাক শোনেন। তিনি যেন আমাদের উপর তাঁহার সেই ভয়ঙ্কর রাগ কখনও না দেখান।

(৬) এই বলবান্ রুদ্রদেব মরুৎদের দলপতি। তাঁহার নিকটে আমি দীনভাবে প্রার্থনা করিতেছি। তাঁহার সেই সকলের চেয়ে শক্তিযুক্ত বলে তিনি আমার দুঃখ দূর করিয়া আমাকে আনন্দ দিয়াছেন। মানুষ যেমন রৌদ্রের তাপে কাতর হইয়া ছায়ায় গিয়া শান্তি খোঁজে, আমিও তেমনি রুদ্রদেবের কৃপার শীতল ছায়ায় গিয়া নিজের তাপ দূর করিতে চাই।

(৭) হে রুদ্র, আপনার সেই ক্ষমাশীল, ঔষধের মত কল্যাণকর, জলের মত শীতল, সেই হাতটি কই? হে বীর, দেবতাদের নিকট হইতে যে বিপদ আসে আপনি তাহা দূর করিয়া থাকেন; এখন আপনি আমাকে ক্ষমা করিয়া আপনার সেই করুণা দেখান।

(৮) এই রক্তবর্ণ কিন্তু সাদা রঙের ছিটা যুক্ত বৃষের মত বলশালী মহান্ রুদ্রদেবের উপযুক্ত স্তোত্র পাঠ করিতেছি। এই জ্যোতিযুক্ত দেবতার কাছে আমরা নমস্কারে নত হই, রুদ্রদেবের ভয়ঙ্কর নাম আমরা সকলে লই।

(৯) এই রক্তবর্ণ ভয়ঙ্কর রুদ্রদেবের খুব দৃঢ় শরীর, তিনি উজ্জ্বল সোনার গহনায় নিজেকে সাজাইয়াছেন। এই বিশাল জগতের স্বামী রুদ্রদেবের প্রাধান্য যেন কখনও না যায়।

(১০) হে রুদ্র, আপনি শ্রেষ্ঠ গুণী, আপনি ধনুর্ব্বাণ ধরিয়া আছেন ও আদরের উপযুক্ত নানারূপের সুন্দর হার পরিয়া আছেন। গুণী আপনি, এই সকল শক্তি

আপনারই আছে। রুদ্রদেব, আপনার চেয়ে বলবান আর কেহই নাই।

(১১) হত্যাশালী ভীষণ বাঘের মত তেজস্বী রথে-বসা প্রসিদ্ধ যুবা বীর রুদ্র-দেবের স্তুতি কর। হে রুদ্র, আপনার স্তব করা হইতেছে, আপনি স্তবকারীর প্রতি দয়া করুন। আপনার তীরগুলি আমাদের বাদ দিয়া অন্যকে ভূমিসাৎ করুক।

(১২) পিতা যেমন পুত্রকে দেখিয়া তাহাকে নিকটে ডাকেন, হে রুদ্র, আপনিও আমার নিকটে আসিতেছেন, আপনার কাছে প্রণামে নত হইতেছি। আপনি অনেক ধন দিয়া থাকেন এবং আপনি খুব সুন্দর রাজা। আপনার আমি স্তুতি করি। স্তুতি পাইয়া আপনি আমাদের রোগ দূর করিবার ঔষধ দিন।

(১৩) হে বীর মরুদ্‌গণ, আপনাদের যে কল্যাণকারী উজ্জ্বল সুখকর ঔষধগুলি আছে, যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু আপনাদের নিকট হইতে চাহিয়া লইয়াছিলেন, উন্নতির জন্য ও আপদ দূর করিবার জন্য মরুৎদের পিতা রুদ্রের নিকট হইতে সেই সম্পদ্ আমরা চাহিতেছি।

(১৪) রুদ্রের তীর আমাদের বাদ দিয়া নিজের লক্ষ্যে যাক্, এই শঙ্কর দেবতার ভীষণ রাগ আমাদের হইতে দূরে চলিয়া যাক্। হে রুদ্র, আপনার দৃঢ় অস্ত্রের আঘাত হইতে তাঁহাদের রক্ষা করুন—যাঁহাদের ধন আমরা দক্ষিণারূপে পাইতেছি। হে দয়ালু, আমাদের সন্তান-সন্ততির প্রতি দয়া করুন।

(১৫) হে বক্রবর্ণ জ্ঞানী বীর, হে দেব, যাহাতে আপনি আমাদের উপর রাগ না করেন, আমাদের না মারিয়া ফেলেন, হে রুদ্র, যাহাতে আপনি আমাদের ডাক শুনিয়া এখানে আসেন, সেই জন্য ভাল পুত্র সন্তান লইয়া আমরা যেন যজ্ঞে খুব উচ্চস্বরে আপনার স্তুতি করিতে পারি।

(৭) বিশ্বামিত্র ও নদীদের আলাপ*
(৩ মঃ। ৩৩ সূঃ)

(১) বিশ্বামিত্র—

ছুটি ছাড়া পাওয়া চক্‌চকে ঘোড়ার মত, বাছুরের গা-চাটা দুটি সুন্দর গরুর মত, বিপাশ্ ও শুতুদ্রী নদী দুধের মত জলের স্রোত লইয়া পাহাড়ের কোল হইতে ছুটিয়া চলিয়াছে।

(২) ইন্দ্র তোমাদের চালনা করিয়াছেন, কারণ, তাঁহার চালনাই তোমরা চাহিয়াছ। রথের দুটি ঘোড়ার মত তোমরা সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া চলিয়াছ। ঢেউ ফুলাইয়া তোমরা এক সঙ্গে চলিতেছ। হে শ্বেতবর্ণা নদী, তোমাদের যেন পরস্পরের মধ্যে অন্যকে ছাড়াইয়া যাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

(৩) সকল মায়ের সেরা মায়ের মত নদীর (শুতুদ্রীর) কাছে আমি আসিয়াছি, খুব বিশাল ও খুব সুন্দর বিপাশের কাছে আমরা পৌঁছিয়াছি। গরুরা যেমন আনন্দের সহিত

* পঞ্জাবদেশে ভরতবংশের সুদাস্ নামে এক রাজা ছিলেন। বসিষ্ঠ মুনি এক সময়ে তাঁহার পুরোহিত ছিলেন। রাজা পরে বিশ্বামিত্রকে পুরোহিত করেন। এই কারণে বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের মধ্যে কলহ হয়। এই কারণেই হউক বা অন্য কোন কারণেই হউক, বিশ্বামিত্র সুদাস রাজাকে ও ভরতবংশীয় অন্যান্য লোকেদের লইয়া পঞ্জাব হইতে কুরুক্ষেত্রের দিকে আসেন। পথে বিপাশ্ ও শুতুদ্রী নদী পড়িল। এখন বিপাশের নাম বিয়াস এবং শুতুদ্রীর নাম সৎলজ্। বিশ্বামিত্র মুনি নদী দুটির স্তুতি করিলেন, যাহাতে সকলে নিরাপদে নদী পার হইতে পারে। এই সূক্তে বিশ্বামিত্র ও নদীদের আলাপের ছলে সেই ঘটনার বর্ণনা করা হইয়াছে। নূতন দেশে আসার উদ্দেশ্য নূতন দেশ জয় করিয়া সেখানকার ধনসম্পত্তি উপভোগ করা। গরুই ছিল সেকালের প্রধান ধন। এই নূতন দেশের গরুগুলির উপর ভরতদের লোভ হইয়াছিল। পরে ভরতবংশীয় রাজারাএই কুরুক্ষেত্র দেশেই বাস করিতে লাগিলেন। এই ভাবে আর্য্যেরা ধীরে ধীরে ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়িলেন।

বাছুরের গা চাটিতে থাকে, সেইরূপে নিজের স্রোত দিয়া দুই কূল চাটিতে চাটিতে এই নদী দুইটি এক লক্ষ্যেই ছুটিযাছে।

(৪) নদীরা—

আমরা এই জলের স্রোত লইয়া ফুলিতে ফুলিতে দেবতার দেওয়া লক্ষ্যে (সমুদ্রের দিকে) চলিয়াছি। যে স্রোত সম্মুখে চলিয়াছে, তাহাকে আর ফেরান যায় না। ব্রাহ্মণ, তুমি যে নদীদের ডাকিতেছ, কি চাও তুমি?

(৫) বিশ্বামিত্র—

আমি তোমাদের সোম দিয়া স্তুতি করিতেছি; যদিও তোমরা বাঁধা নিয়মে বহিয়া চলিয়াছ, আমার কথায় মুহূর্তের জন্য থাম। আমি কুশিকের ছেলে, নদীদের সাহায্য পাইবার আশায় এই বিশাল স্তোত্র দিয়া তাহাদের ডাকিতেছি।

(৬) নদীরা—

বৃত্রাসুর নদীদের জল আটক করিয়া রাখিয়াছিল, বজ্রধারী ইন্দ্র তাহাকে মারিয়া আমাদের পথ খুঁড়িয়া দিয়াছেন। সবিতা দেবতা তাঁহার সুন্দর হাত দিয়া পথ দেখাইয়া আমাদের লইয়া আসিয়াছেন, আমরা তাঁহারই চালনায় বিশাল হইয়া চলিয়াছি।

(৭) বিশ্বামিত্র—

ইন্দ্র যে সেই ভীষণ সাপের মত বৃত্রকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া ফেলিলেন, তাঁহার সেই বীরত্বের কথা আমরা চিরদিন ধরিয়া গাহিব। যে অসুরগণ জল আটক করিয়াছিল, তাহাদের তিনি বজ্র দিয়া মারিলেন, আর জলগুলি ছাড়া পাইয়া নিজের লক্ষ্যে ছুটিতে লাগিল।

(৮) নদীরা—

স্তোত্রকারী ব্রাহ্মণ, তুমি যে আমাদের এখন এই ভাবে ডাকিতেছ, একথা ভবিষ্যতে ভুলিও না। হে কবি, তোমার স্তোত্রে এই কথা গাঁথিয়া লইও; আমাদের মানুষের কাছে ছোট করিও না, তোমাকে আমাদের এই অনুরোধ।

(৯) বিশ্বামিত্র—

হে ভগিনীগণ, এই কবির কথা শোন, অনেক দূর হইতে রথ ও শকট লইয়া আসিয়াছি। হে নদীগণ, তোমরা নত হও; তোমাদের জল আমাদের রথের অক্ষের * নীচে নামিয়া যাক্—আমরা যাহাতে বিনা কষ্টে পার হইয়া যাইতে পারি।

(১০) নদীরা—

হে কবি, তোমার কথা আমরা শুনিব। অনেক দূর হইতে রথ ও শকট লইয়া আসিয়াছ। মা যেমন সন্তানকে দুধ দিবার জন্য ঝুঁকিয়া পড়েন, বধূ যেমন স্বামীর পায়ে নত হয়, সেই ভাবে তোমার কাছে আমরা নত হইতেছি।

(১১) বিশ্বামিত্র—

ভরতগণ ইন্দ্রের চালনায় যুদ্ধ করিয়া গরু পাইবার জন্য চলিয়াছে, তাহারা যখন তোমাদের পার করিয়া চলিয়া যাইবে, তখন যেন তোমাদের স্রোত আবার বহিতে থাকে। তোমরা লোকের পূজার যোগ্য, তোমাদের নিকট এই প্রার্থনা করিতেছি।

(১২) গরুর লোভে অগ্রসর ভরতগণ নদী পার হইয়া গেল, কারণ নদীরা ব্রাহ্মণের স্তবে প্রসন্ন হইলেন। নদীগণ, এখন তোমরা পূর্ব্বের মত ফুলিয়া ওঠ, তোমাদের মূল্যবান্ জল বিলাইয়া শীঘ্র নিজ পথে চল।

(১) যতক্ষণ না আমরা নদী পার হই, তোমাদের স্রোতের জল যেন আমাদের রথের গোঁজার† ও দড়ীর নীচে থাকে। আমাদের শকটের নির্দ্দোষ বৃষগুলি যেন গভীর জলে বিপদে না পড়ে।

---

* দুই চাকার মাঝের লম্বা কাঠকে 'অক্ষ' বলে। এই অক্ষের উপর চাকা দুটি ঘোরে।

† ঘোড়ার বা গরুর কাঁধে জোয়াল দিয়া তাহাকে আটকাইবার জন্য গোজা লাগান হইত; যেমন আজকাল কেবল গরুর গাড়ীতে দেখা যায়।

নরওয়ে-পুরাণ

বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসে নরওয়ে পুরাণের কাহিনীগুলি উল্লেখযোগ্য। সাধারণ মানবচরিত্র ও মানবজীবনে সে যে দেশেরই হউক না কেন, বেশ একটি সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশের দেব-দেবীর সহিত প্রাচীন গ্রীস ও রোমে যে সকল দেব-দেবীর কথা চলিত ছিল, তাহাদের সহিত ঐক্য রহিয়াছে। আমাদের হিন্দুপুরাণের ইন্দ্রের সহিত জিউস বা জোভের, শচীর সহিত হীরো বা জুনোর, সরস্বতীর সহিত আথিনী বা মিনার্ভার, রতিদেবীর সহিত আফ্রোডিটি বা ভিনাসের তুলনা করিতে পারি। তোমরা 'শিশু-ভারতী'তে রামায়ণের গল্প পড়িয়াছ এবং ইলিয়াডের গল্পও পড়িয়াছ। এই দুইটি গল্পের আলোচনা কর। রামায়ণের গল্পে যেমন সীতাহরণ ও সীতা উদ্ধার, ইলিয়াডেও তেমন হেলেনের হরণ ও হেলেনের উদ্ধার এবং পরিশেষে হরণকারীর সর্বনাশ। এই ভাবে আমরা যদি পৌরাণিক (Myth) কাহিনীগুলির তুলনা-মূলক (Comparative Mythology) ভাবে আলোচনা করি, তাহা হইলে দেখিতে পাই যে মানুষের কল্পনা ও চিন্তার ধারা পৃথিবীর সব দেশে একই প্রকারের। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশের রূপ-কথা বা উপকথার মধ্যেও এইরূপ সাদৃশ্য আছে। একই ধরণের গল্প অনেক প্রদেশে সামান্য একটু রূপান্তরিত হইয়া প্রচলিত। বিশ্ব সাহিত্যের গল্প, কাহিনী ও উপন্যাস প্রভৃতির মধ্যেও যে এইরূপ সাম-ঞ্জস্য রহিয়াছে তাহা তোমরা এই সব গল্প, কাহিনী প্রভৃতি পড়িবার সময় লক্ষ্য করিতে ভুলিও না।

রামায়ণ মহাভারত এবং আমাদের ভারতবর্ষের নানাপুরাণে দেবতা, অসুর, রাক্ষস, গন্ধর্ব, কিন্নর প্রভৃতির গল্প তোমরা পড়িয়াছ। নরওয়ে সুইডেন দেশের পুরাণেও ঐরূপ নানা দেবতা ও অসুরের কথা লিখিত আছে।

সৃষ্টির কথা

পৃথিবী কেমন করিয়া প্রথমে সৃষ্টি হইল আমাদের দেশের পুরাণে সে সম্বন্ধে যেরূপ গল্প আছে নরওয়ে দেশের পুরাণেও সেইরূপ গল্প আছে এখানে সেই গল্পই বলিতেছি। সকলের আগে যখন পৃথিবী আকাশ, সাগর কিছুই ছিল না তখন ছিলেন একমাত্র বিশ্ব পিতা (All father)। তাঁহাকে কেহ সৃষ্টি করে নাই, তিনি আছেন অথচ তাঁহাকে কেহই দেখিতে পায় না। বিশ্বপিতা যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই হয়। সৃষ্টির আগে কিছুই ছিল না—ছিল ভীষণ অন্ধকারের রাজ্য সারা শূন্য ব্যাপিয়া, আর সেই শূন্যের মাঝখানে ছিল গিনুঙ্গা গহ্বর (Ginnunga-gap)। সেই গহ্বরের শেষ কোথায়, কে জানে? সেই গহ্বরের উত্তরে কুয়াসার দেশ, সেই কুয়াসার দেশে বরফজমা শীত, আর তাহার মাঝখানে হবার গেলমি (Hver Gelmer) নামে ঝরণা। সেই ঝরণার গরম জল দিন-রাত্রি টগবগ্ করিয়া ফুটিত।

সেই গহ্বরের দক্ষিণে মাস্‌পেল হাইম্ (Muspel heim) নামে আগুনের দেশ। সেই আগুনের দেশে সুর্ৎর নামে একজন দৈত্য জলন্ত তরবারি হাতে করিয়া পাহারা দিত। গিনুঙ্গা গহ্বরের ভিতরটা ছিল খুবই ঠাণ্ডা। হবার গেলমির ঝরণার জল তাহাতে পড়িয়া একেবারে বরফ হইয়া যাইত। সুর্ৎরের তলোয়ারের আগুনের ফিন্‌কী পড়িয়া সেই বরফ গলিয়া যাইত। আগুন ও বরফের এই যে অনবরত লড়াই হইতেছিল, তাহার ফলে গিনুঙ্গা গহ্বরের ভিতর য়ীমির (Ymer) নামক অতি ভীষণা-কার এক দৈত্য আর আধম্‌লা (Audhumla) নামে এক গাভীর জন্ম হইয়াছিল। য়ীমির দেখিল যে, আধমলার বুকে খুব দুধ, সে সেই দুধ খুব খাইতে লাগিল আর আধমলা চারদিকের বরফের মধ্যে লবণের গন্ধ পাইয়া তাহা চাটিতে লাগিল। চাটিতে চাটিতে সেই বরফের ভিতর হইতে আর এক দেব-তার সৃষ্টি হইল—তাহার নাম বুরি (Bure) এই য়ীমির হইতে অসুরদের এবং বুরি হইতে হইল দেবতাদের জন্ম।

দেবতা ও অসুরের

দেবতা ও অসুরের মধ্যে উভয়ের জন্মের দিন হইতেই বিবাদ আরম্ভ হইল। যুদ্ধের পর যুদ্ধ চলিতে লাগিল—অবশেষে অনেক যুদ্ধের পর দেবতাদের হাতে য়ীমিরের মৃত্যু হইল। য়ীমিরের বংশের সব অসুরের মৃত্যু হইল—য়ীমিরের দেহের রক্তের বন্যায় ডুবিয়া দৈত্যদের বংশে বাতি দিতে রহিল শুধু বার্গেলমির (Bergelmer) এবং তাহার স্ত্রী। তাহারা একখানা নৌকায় করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের শেষ কিনারায় যাইয়া বাস করিতে লাগিল। তাহাদের সেই বাসস্থানের নাম

হইল জোতন্ হাইম (Jotun heim) বা দৈত্যপুরী। এই দূর দৈত্যপুরীতে আবার দৈত্যদের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আবার দেবতা ও অসুরের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল।

এদিকে য়ীমিরের মৃত্যুর পর দেবতারা দেখিলেন যে, চারিদিকে অনন্ত শূন্য আর অন্ধকার কুয়াসা—কেবল আগুন আর বরফের লড়াই। সর্ব্বদা কি কাহারও একই রকমের দৃশ্য দেখিতে ভাল লাগে? তখন দেবতারা স্থির করিলেন, য়ীমিরের দেহ হইতে নূতন করিয়া এক সুন্দর জগৎ সৃষ্টি করিবেন। য়ীমিরের বিশাল দেহ হইতে তাঁহারা গাছপালা, নদ-নদী পাহাড়-পর্ব্বত সৃষ্টি করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া দেবতারা সকলে মিলিয়া য়ীমিরের বিশাল দেহটাকে গড়াইয়া গিনুঙ্গা গহ্বরে আনিয়া ফেলিলেন তাহাতে গহ্বরটা বুজিয়া গেল এবং সৃষ্টিরক্ষারও ব্যবস্থা হইল। য়ীমিরের রক্তে সমুদ্রের সৃষ্টি হইয়াছিল, উহার মাংসে হইল মাটি হাড়ে আর দাঁতে হইল পাহাড়-পর্ব্বত, চুল-দাড়ি হইল গাছপালা মাথার

পৃথিবীর জন্ম

খোলটা হইতে হইল বিরাট আকাশ, মগজ হইতে হইল মেঘের উদ্ভব। আগুনের দেশের কথা তোমাদের মনে আছে, সেখানে সেই যে সুর্ত্তর নামে দৈত্য থাকিত, সেইখানকার আগুনের ফিনকী দিয়া চন্দ্র, সূর্য্য ও তারকার ভুবন মোহন রূপের প্রকাশ হইল। য়ীমিরের মাংস পচিয়া যে পোকা ধরিয়াছিল, সেই পোকা হইতে দেবতারা ভূত, প্রেত, পরী, বামন এ সকলের সৃষ্টি করিলেন। পরীরা হইল সৃষ্টির অপরূপ প্রতীক; তাহারা আকাশে বাতাসে উড়িয়া বেড়ায়, চাঁদের জ্যোছনায় খেলা করে. প্রজাপতির পাখায় ভর করিয়া ফুলের কলি ফুটাইয়া দিয়া ফুলের হাসির মত মুখখানি দেখিয়া উড়িয়া পালায়. আর মানুষের উপকার করে। ভূত, বামন, প্রেত ইহারা থাকে মাটির নীচে পাতালপুরীতে সেখানে তাহারা ধনরত্ন, মণি-মাণিক্যের সন্ধান রাখে আর রাত্রিকালে লোকের অনিষ্ট করিবার জন্য বাহিরে আসে। দিনে তাহারা যদি পাতাল পুরী হইতে মাটির উপর আসে, তাহা হইলে তাহারা পাষাণ হইয়া যাইবে, দেবতাদের এইরূপ অভিশাপ আছে।

দেবতারা এশ (Ash) নামক রজত ধূসর বন্ধনবিশিষ্ট অরণ্যতরুর এক খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া পুরুষ সৃষ্টি করিলেন এবং আল্‌ডার (Alder) গাছের এক খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া সৃষ্টি করিলেন নারী-মূর্ত্তি। পুরুষের নাম দিলেন আস্‌ক (Ask) এবং নারীর নাম দিলেন এম্‌ব্লা (Embla)। এই প্রথম নর ও নারী হইতেই পৃথিবীর সমুদয় নর-নারীর উৎপত্তি হইয়াছে। মানবজাতির বাসস্থানের নাম হইল মিড্‌গার্ড (Midgard) বা মানা-হাইম (Mana heim)। মানা-হাইমের চারিদিক্ বেড়িয়া অসীম অনন্ত সাগর। এই সাগরের সুদূর দূরে জোতন হাইম বা দৈত্যপুরী। দৈত্যরা যাহাতে মানুষের উপর কোনও অত্যাচার করিতে না পারে, সেই জন্য দেবতারা য়ীমিরের ভ্রূ দিয়া প্রকাণ্ড বড় বেড় প্রাচীর তৈয়ারী করিয়া বাঁধিয়াছেন।

প্রথম পুরুষ ও নারী



ওডিন

দেবতারা এই সমুদয় সৃষ্টির আগে নিজেদের থাকিবার জায়গা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। সেই স্থানের নাম ছিল আস্‌গার্ড (Asgard) বা স্বর্গ পুরী। এই দেশকে তাঁহারা সৃষ্টির নানা বৈচিত্র্য দিয়া যেমন করিয়াছিলেন সুন্দর, তেমনি করিয়াছিলেন সুরক্ষিত। আস্‌গার্ডের রাজা ছিলেন বিশ্বপিতা। তাঁহারা

নাম ওডিন (Odin) বা উওডেন (woden)। এই

বিশ্বপিতা ওডিন

ওডিন বা উওডেন্ হইতেই বুধবারের নাম হইয়াছে Wednesday (ওয়েড্নেজ্ বা ওয়েনজ্ ডে)। ওডিন্ স্বর্গরাজ্যে তাঁহার রাণী ফ্রিগা (Frigga)-র সহিত সোনার সিংহাসনে বসিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের সমুদয় সংবাদ রাখিতেন। তাঁহার ছিল একটি মাত্র চক্ষু। আর একটি চক্ষু তিনি মিমির (Mimer) নামে এক বৃদ্ধকে দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কেন বাধ্য হইয়াছিলেন, শোন। ঐ মিমির বৃদ্ধের অধিকারে একটি ঝরণা ছিল, ঐ ঝরণার রূপার মত শুভ্র নির্ম্মল জল পান করিলে ভূত, ভবিষ্যৎ সকল বিষয় জানা যাইত। ওডিন্ সেই জন্য ঐ ঝরণার জল যখন পান করিতে গেলেন, তখন বৃদ্ধ মিমির বলিল,—"তুমি যদি জল খাইতে চাও, তাহা হইলে তোমার একটি চক্ষু দিতে হইবে।" বাধ্য হইয়া ওডিন্কে তাঁহার একটি চক্ষু খুলিয়া দিতে হইল। মিমির সেই চক্ষুটি ঝরণার জলে ডুবাইয়া রাখিল, সেই জলের মধ্যে সেই চক্ষুটি দিনরাত্রি ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিত। ওডিন্ এই ঝরণার জল খাইয়া সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হইলেন। এই ঘটনা স্মরণীয় রাখিবার জন্য ঝরণার ধারের গাছের ডাল দিয়া একটি বল্লম তৈয়ারী করিয়া লইলেন, এই বল্লম এমনি হইল যে, ইহার গতিবেগ কেহই রোধ করিতে পারিত না।

ওডিনের ও ফ্রিগার পুত্রদের মধ্যে টিউ (Tiu), থর (Thor) বল্ডার (Balder), হোর্ডার (Hodur) এই সব। বল্ডারের কাহিনীই আমরা বিশেষ করিয়া এখানে বলিব। তোমরা তাহার আগে টিউ ও থরের পরিচয় জানিয়া লও। টিউর নাম হইতে মঙ্গলবারের নাম হইয়াছে টিউজ ডে (Tuesday)। টিউ যুদ্ধের দেবতা। ইহার বীরত্বের খ্যাতি

ওডিনের পুত্রদের কথা

অসাধারণ। ওডিনের যেমন বল্লম, তেমনি টিউর ছিল একখানি তরবারি। এই তরোয়ালখানিকে সকলেই ভক্তি করিত এবং উহা সযত্নে একটি মন্দির মধ্যে রাখিয়া দিয়াছিল। লোকে বিশ্বাস করিত যে, তরোয়াল যাহার কাছে থাকিবে, সে কখনও যুদ্ধে পরাজিত হইবে না। এক

টিউ

দিন কিন্তু এই তরোয়াল চুরি হইয়া গেল! তরোয়াল যখন যাহার হাতে পড়িল, সেই যুদ্ধের জন্য মাতিয়া উঠিল, পৃথিবীতে যত যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে তাহা টিউর এই তরোয়ালের জন্য! তোমরা যদি টিউর তরোয়াল খানা টিউর হাতে ফিরাইয়া দিতে পার, তাহা হইলে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়া আসিবে।

ওডিনের পুত্র থর হইতে ইংরাজী থার্স্ ডে (Thursday) নাম হইয়াছে। থর বলবান দেবতা। তাঁহার দেহও যেমন বিশাল,

থর

ক্ষমতাও ছিল তেমনি অসাধারণ। হাতের হাতুড়ির আঘাতে মানুষ দৈত্য ত দূরের কথা— বিরাটকায় পর্ব্বত দেহ পর্যন্ত চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া



থর

যাইত। স্বর্গে বিফ্রোষ্ট্ (Bifrost) নামে যে সেতু আছে সেই রঙীন সেতুর উপর দিয়া থর কখনও যাইতে পারিতেন না; তাহা হইলে উহা ভাঙ্গিয়া পড়িত। তোমরা প্রায়ই আকাশে বিফ্রোষ্ট সেতুকে রামধনুকের আকারে দেখিতে পাও।

ফ্রিয়া (Freya) ছিলেন সৌন্দর্য্যের দেবতা। ইঁহাকে কেহ কেহ ওডিনের রাণী ফ্রিগা বলেন। পৃথিবীতে

সম্মুখ সমরে যে সকল বীর প্রাণ হারাইত, তাহাদের অর্দ্ধেক ফ্রিয়ার নিকট আসিত; ফ্রিয়া তাঁহার সঙ্গিনী ভ্যাল্‌কিরদিগকে (Valkyr) লইয়া রণক্ষেত্রে যাইতেন এবং তাহাদিগকে তাঁহার সভায় আনিতেন। এখানে তাহাদের সুখের পরিসীমা থাকিত না। সেখানে ছিল হাইড্রন নামে এক ছাগল, সেই ছাগ-

সৌন্দর্য্য দেবতা

সংপিহনক্ষি



ফ্রিয়া

লের দুধ ছিল যেন অমৃত, সে অমৃতের ধারার নিঃশেষ ছিল না যত দোহন করা যাইত ততই তাহা হইতে সুধার ধারা বাহির হইত। ফ্রিয়ার সেহ্রিমণি নামে একটি শূকর ছিল, সেই শূকরের মাংসও ছিল অতি উৎকৃষ্ট। এলুধ্রিম্‌নি নামে এক পাচক সেই মাংস রাঁধিয়া বীরদিগের ক্ষুধা নিবৃত্তি করিত। এই শূকরটির মাংস কখনও ফুরাইত না। বীরদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলেই আবার সে বাঁচিয়া উঠিয়া ঘোঁৎ ঘোঁৎ করিয়া স্বর্গের সবুজ শ্যামল মাঠে ও বনে বনে ক্ষুধা নিবৃত্তি করিতে ছুটিয়া বেড়াইত। তোমাদের কাছে নরওয়ে পুরাণের সৃষ্টি-রহস্যের কথা বলিলাম, এইবার তাহার শ্রেষ্ঠ কাহিনী বল্‌ডারের কথা বলিতেছি।

হাইড্রন ও সেহ্রিমণি

বল্‌ডারের কাহিনী

বল্‌ডার ও হোডার, ওডিনের দুই যমজ পুত্র। বল্‌ডার ছিলেন আলোকের, সৌন্দর্য্যের ও পবিত্রতার দেবতা। তাঁহার দেহও যেমন ছিল তুষারের মত শুভ্র, তেমনি তাঁহার তুষার-শুভ্র কেশ ও ভ্রূ-যুগল হইতে সর্ব্বদা সূর্য্যকিরণের ন্যায় জ্যোতিরশ্মি নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইত। বল্‌ডার ছিলেন আনন্দের প্রতিমূর্ত্তি, সমস্ত ত্রিভুবন তাঁহার রূপে প্রভাবান্বিত হইত। এই দেবতাটি ছিলেন সর্ব্বজনপ্রিয়। সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিত। তাঁহার অপরূপ সৌন্দর্য্যের জন্য তাঁহাকে সকলে নাম দিয়াছিল সৌন্দর্য্য দেবতা (Balder the Beautiful)।

বল্‌ডার ও হোডার

বল্‌ডার যেমন ছিলেন আলোর রাজ্যের আলোকোজ্জ্বল দেবতা, তেমনি হোডার ছিলেন অন্ধকার রাজ্যের দেবতা এবং পাপের প্রতিরূপ, অন্ধ এবং অল্পভাষী। সৌন্দর্য্য-দেবতা বল্‌ডার অল্প বয়সেই ওডিন বা বিশ্বপিতার মন্ত্রণাসভায় স্থান লাভ করিলেন।

আলোক-দেবতা বল্‌ডারের নিকট জ্ঞানের দীপ্তি আপনা হইতেই প্রকাশিত হইত। বিশ্বজগতের সমুদয় সংবাদ তাঁহার অজ্ঞাত না থাকিলেও নিজের ভবিষ্যতের বিষয় কিন্তু তিনি জানিতেন না, হাসি যাঁহার সঙ্গী, আনন্দ যাঁহার মূর্ত্তি, সেই বল্‌ডার হঠাৎ বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বদনে চিন্তার রেখা। কেন এমন হইল। দেবতাদের রাজ্যে আনন্দ-মগ্ন মূর্ত্তির দেবতার এ কি পরিবর্ত্তন। দেবতারা এবং ওডিন ও ফ্রিগা পুত্রের এইরূপ পরিবর্ত্তনে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস। তোমার এইরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি বল। বল্‌ডার বলিলেন, নিদ্রা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে। যদিই বা একটু তন্দ্রার আবেশ হয়, তখন নানারূপ দুঃস্বপ্ন দেখিতে পাই, মনে হয়, কি যেন একটা বিপদ আমার পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। ওডিন্ ও ফ্রিগা চিন্তিত হইলেন এবং উভয়ে প্রিয় পুত্রের বিপদ দূর করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন।

বল্‌ডারের অশান্তি

ফ্রিগা দেবী তাঁহার অনুচরদিগকে চারিদিকে পাঠাইয়া বলিলেন, তোমরা পৃথিবীর সমুদয় জীব-জন্তু অর্থাৎ চেতন, অচেতন, উদ্ভিদ সকলকে এইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ করিবে, যেন কেহই তাহারা বলডারের কোন অনিষ্ট না করে। বলডার ছিলেন সকলেরই প্রিয়, এজন্য সকলেই প্রতিজ্ঞা করিল; করিল না কেবল ভলহল্লার ধারে যে ওক-বৃক্ষ আছে তাহার উপরের মিস্‌লটো (Mistletoe)নামে ক্ষুদ্র ও নগণ্য একটি পরগাছা। এই ক্ষুদ্র পরগাছার কি সাধ্য আছে যে, বলডারের কোনও অনিষ্ট করিতে পারে? ফ্রিগার প্রাণে শান্তি আসিল--তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন, পুত্রের বিপদের আশঙ্কা মন হইতে দূর হইল।

ওডিন কিন্তু নিশ্চিন্ত হইলেন না। তিনি তাঁহার অষ্টপদ অশ্ব স্লিপ্‌নীরের (Slei'ner)পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নিফল্‌হাইমের (Nifel-heim)অন্ধকার পুরীতে যেখানে অদৃষ্টদেবী ভলা (Vala) বাস করেন সেখানে চলিলেন। সেখানে যাইতে তাঁহার ব্রিস্রো-ষ্টের সেতু পার হইতে হইয়াছিল। অবশেষে ভলা যেখানে বাস করেন সেখানে আসিয়া স্লাইপনীর হইতে নামিয়া ভলা দেবীর আবাসস্থানে আসিলেন। সে নিরানন্দ নির্জন পুরীতে ভলা দেবী ধ্যানমগ্না। মন্ত্রোচ্চারণ করিতে লাগিলেন সেই মন্ত্রপ্রভাবে ওডিন সমাধি কক্ষ মুক্ত হইল এবং ভলা দেবী প্রেতের ন্যায় বিকট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে তুমি অজ্ঞাত মানব। আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত করিতে আসিয়াছ। কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, কত তুহিন-শীতল দিবস নিশি আমার দেহকে পীড়ন করিয়া গিয়াছে—আমি কোন দিকে লক্ষ্য না করিয়া এখানে সমাধিস্থ হইয়া আছি বল, কে তুমি দুঃসাহসী?

ওডিন আত্মগোপন করিয়া বলিলেন -আমার নাম ভেগটম (Vegtam) আমার পিতার নাম ভেলটাম (Valtam)। আমি শুধু এইটুকু জানিতে চাই, আমি আসিবার সময় মৃত্যু রাজ্যের এই অন্ধকার-নিকেতনে এত উৎসবের আয়োজন, এত সাজ সজ্জা কেন হইতেছে? এই নিরানন্দ পুরীতে কে আসিবে?' ভলা দেবী বলিলেন--ওডিনের পুত্র আলোক দেবতা সৌন্দর্য্যের জীবন্ত আদর্শ এই মৃত্যুপুরীতে আসিতেছেন; তাঁহার জন্যই এ সমুদয় আয়োজন। এইবার আমি সমাধিস্থ হই—কেমন?

ওডিনের ভলার নিকট গমন

ওডিন ব্যগ্র কণ্ঠে কহিলেন, না না, আপনি আমার আর একটি প্রশ্নের উত্তর দিয়া নীরব হউন। বলুন কে বলডারকে নিহত করিবে?

দেবী কহিলেন, "তাঁহার আপন সহোদর হোডার তাহাকে নিহত করিবে। ইহাই বলডারের নিয়তি।"

কিন্তু এই হত্যার পরিশোধ কে লইবে?

পৃথিবীর দেবী রিণ্ডার (Rhind) গর্ভে ওডিনের ভলী (Vale)নামে এমন পুত্র জন্মিবে যে বলডারের এই হত্যার প্রতিশোধ না লইয়া তাহার হাতও ধুইবে না, মাথার চুলও আঁচড়াইবে না। ওডিন পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, বলুন আমাকে, বলডারের মৃত্যুর পর কে তাহার জন্য শোকাশ্রু ফেলিবে না? এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবামাত্র ভলাদেবী ওডিনকে চিনিয়া ফেলিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন,—ওডিন, ওডিন, তুমি আস্‌গার্ডে প্রত্যাবর্ত্তন কর-যতদিন পর্য্যন্ত না প্রলয়ে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস হইবে, তাহার পূর্ব্বে আর কেহ আমার এই গভীর সমাধি ভগ্ন করিতে পারিবে না।

ওডিন্ আসগর্ডে ফিরিয়া আসিলেন। আসিয়া দেখিলেন, স্বর্গপুরীতে বলডার সম্বন্ধে সমুদয় আশঙ্কা দূর হইয়াছে। ফ্রিগা ওডিনকে বলিলেন, চেতন, অচেতন উদ্ভিদ সকলে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে বলডারের কোনও অনিষ্ট করিবে না। ফ্রিগার কথায় ওডিন আশ্বস্ত হইলেন। দেবতাদের রাজ্যে আনন্দের মেলা আরম্ভ হইল।

দেবতারা এক অদ্ভুত আমোদের সৃষ্টি করিলেন। স্বর্গরাজ্যের ক্রীড়াভূমির নাম ইডাভোল (Idavol) বা সংক্ষেপে ইডা। তাঁহারা বলডারকে ক্রীড়াভূমির মধ্যস্থানে দণ্ডায়মান রাখিয়া চারিদিক হইতে নানা প্রকারের অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কেহ মারিলেন পাথর, কেহ মারিলেন তীক্ষ্ণ অস্ত্র। সব অস্ত্র-শস্ত্র বলডারের গায়ে লাগিয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িল দেবতারা বলডারকে এইরূপ ভাবে সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ দেখিয়া আনন্দ-রবে ক্রীড়া-প্রাঙ্গণ প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতে লাগিলেন।

ইডার ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ

ফ্রিগা আপনার মনে রাজপ্রাসাদে বসিয়া বয়ন কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানেও আনন্দরব যাইয়া প্রবেশ করিয়াছিল। দুষ্ট দেবতা লোকি (Loke) এক বৃদ্ধার ছদ্মবেশে রাজপ্রাসাদের নিকটবর্ত্তী পথ দিয়া যাইতেছিলেন। ফ্রিগা তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি বলিতে পার, দেবতাদের

হঠাৎ এত আনন্দের কারণ কি?"—ছদ্মবেশিনী বৃদ্ধ বলিল—দেবতারা বল্‌ডারকে ইডার মধ্যস্থানে দাঁড় করাইয়া চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতি অস্ত্র-শস্ত্র নিক্ষেপ করিতেছে; তাহাতে তাহার কোনও ক্ষতি হইতেছে না, এজন্য বল্‌ডার ও দেবতারা হাসিতেছেন এবং আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে নানারূপে উল্লাস প্রকাশ করিতেছেন।

ফ্রিগা কহিলেন,—খনিজ দ্রব্য কাঠ-পাথর কিছুতেই বল্‌ডারের কোনও ক্ষতি হইবে না, কেননা সমুদয় বিশ্বজগতের সকলে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে বল্‌ডারের কোনও অনিষ্ট করিবে না। বৃদ্ধা কহিল—পৃথিবীর সকলেই কি এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছে? ফ্রিগা বলিলেন—সকলেই এইরূপ অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে, হয় নাই কেবল ক্ষুদ্র এক পরগাছা—"মিসল্‌টো।"

লোকি এই সংবাদ পাইয়া আনন্দিত হইলেন। লোকি ত ইহাই চাহিতেছিলেন। লোকি অগ্নির দেবতা, বল্‌ডার সূর্য্যের প্রতিরূপ; কাজেই বল্‌ডারের প্রতি ছিল তাঁহার হিংসা। এইবার হিংসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ মিলিল, দেখিতে পাইয়া সে পুলকিত হইল এবং নিজের মূর্ত্তি ধরিয়া ভগ্‌হল্লাতে যাইয়া সেখান হইতে মিসলটো লইয়া আসিল এবং স্বীয় মন্ত্রপ্রভাবে তাহাকে অতি কঠিন পদার্থে পরিণত করিয়া তাহা দিয়া একটি তীর তৈয়ারী করিয়া ইডাতে যাইয়া হোডারের পার্শ্বে দাঁড়াইল। তখনও বল্‌ডারকে লইয়া দেবতাদের তেমনি আমোদ প্রমোদ চলিতেছিল।

লোকি জিজ্ঞাসা করিলেন, হোডার, তুমি যে এক পাশে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া আছ? কেন এই ক্রীড়া-কৌতুকে যোগদান করিতেছ না?

হোডার করুণস্বরে কহিলেন,—আমি যে ভাই অন্ধ, আমি ত বল্‌ডারকে দেখিতে পাইতেছি না, আমি কেমন করিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্রশস্ত্র নিক্ষেপ করিব।

হোডার কর্ত্তৃক তীর নিক্ষেপ

লোকি বলিলেন—আমি তোমার সাহায্য করিব। এইরূপ বলিয়া তাঁহাকে যথাস্থানে লইয়া যাইয়া বল্‌ডারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়া—হোডারের ধনুতে তাহার মন্ত্রপূত তীরটি যোজনা করিয়া দিলেন। লোকি যেভাবে হোডারের হাত ধরিয়া বল্‌ডারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন—হোডার তেমনিভাবে তীর নিক্ষেপ করিল। হোডার ভাবিয়াছিল যে, দেবতাদের ন্যায় তাহার নিক্ষিপ্ত তীরও ব্যর্থ হইবে এবং চারিদিক পূর্ব্বের ন্যায় আনন্দধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠিবে। কিন্তু তাহা ত হইল না, বরং হাস্য রবের পরিবর্ত্তে করুণ হাহাকার জাগিয়া উঠিল। মিসল্‌টোর তীরের আঘাতে বিদ্ধ হইয়া বল্‌ডার পড়িয়া গেলেন। দেবতারা হায়, হায়, করিতে

বল্‌ডারের মৃত্যু



করিতে সকলে ছুটিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহারা বল্‌ডারের নিকটে আসিয়া দেখিলেন,—তাঁহার প্রাণবায়ু নির্গত হইয়াছে। দেবতারা সকলে হোডারের প্রতি বিরূপ হইলেন। কিন্তু সে যে স্বর্গরাজ্য। কেহ ত কাহারও উপর কোনও অত্যাচার করিতে পারে না,—কাজেই হোডার রক্ষা পাইলেন। চারিদিকে তখন হাহাকার পড়িয়া গিয়াছে, বল্‌ডার বাঁচিয়া নাই—বল্‌ডার বাঁচিয়া নাই

ফ্রিগা নীরবে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ওডিনের প্রাণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল। বল্ডারের পবিত্র আত্মা ধীরে ধীরে মৃত্যুপুরীতে অন্তর্হিত হইল।

হোডার ভ্রাতা বল্ডারকে হত্যা করিয়া শোকে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। সে জননী ফ্রিগাদেবীর ফেন্সালির (Fensalir) প্রাসাদে আসিয়া কহিল,—"মা, আমি কেমন করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি? যদি মৃত্যুরাজ্যে যাইয়া সেখানকার দেবী হেলাকে আমার প্রাণ দান করি, তাহা হইলে কি আমার প্রাণের বিনিময়ে আমি বল্ডারের প্রাণ ফিরিয়া পাইব না?

হোডারের অনুতাপ

ফ্রিগাদেবী পুত্রকে সান্ত্বনা দান করিয়া বলিলেন, বৎস। ইহাতে তোমার কোনও অপরাধ নাই—নিয়তির গতি কেহই রোধ করিতে পারে না। তুমি যাও, পুত্র—আমিই বল্ডারকে হেলার রাজ্য হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারি কি না, সে বিষয়ে চেষ্টা করিব।

পুত্র-শোক কাতর ফ্রিগা যেখানে দেবতারা সকলে মিলিত হইয়া বল্ডারের জন্য হায়, হায়, করিতে-ছিলেন—সেখানে যাইয়া তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—'কে দেবতাদের মধ্যে এমন এক-জন আছ, যে, আমার স্নেহ, দয়া ও কৃতজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য মৃত্যুদেবী হেলার নিকট যাইয়া বল্-ডারের প্রাণ ভিক্ষা করিবে? আমার বুকের ধন, আমার প্রিয় সন্তান বল্ডারকে যে আমি চাই—তাহাকে আমি চাই—সে যে স্বর্গের আনন্দপুরীকে নিরানন্দের ঘোর অন্ধকারে ঢাকিয়া চলিয়া গিয়াছে।

তরুণ হারমড্ (Hermad) রাণী ফ্রিগার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তিনি হইতেছেন দেবদূত। ওডিনের অপর এক পুত্র। হারমড্ কহিলেন,—দেবি! আমি আপনার আদেশ পালন করিব। আমি যাইব মৃত্যুর দেশে মৃত্যুদেবী হেলার নিকট অনুনয়-বিনয় করিয়া বল্ডারকে ফিরাইয়া অনিতে।

হারমডের মৃত্যুপুরীতে গমন

হারমড্ ওডিনের অশ্ব স্লাইপনীরের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চলিলেন মৃত্যুর রাজ্যে। মৃত্যু-রাজ্যের পথ—বিফ্রোষ্ট সেতুর সুগম মিডগার্ডের পথ নয়, এ বিভিন্ন পথ। এ পথ ভীষণ বন্ধুর, পর্ব্বত ও গভীর উপত্যকা পূর্ণ—কোথাও বরফের দেশ—কোথাও মরুভূমির দেশ কোথাও তরঙ্গসঙ্কুল ভীষণ প্রান্তর। এই পথে ক্রমাগত নয় দিন নয় রাত্রি হারমড্ অশ্বারোহণে যাইতে লাগিলেন এবং অবশেষে দশম দিবসে নিফল্‌হাইমের সীমান্ত প্রদেশে গিয়ল (Gioll) নদীর কাচ-নির্ম্মিত সেতু পার হইলেন। এই সেতুটি ছিল এক গাছি চুলের উপর বিলম্বিত। সেতুর প্রহরায় ছিল মোড্গাড (Modgud) নামে কঙ্কাল মূর্ত্তি। সে মৃত্যুদেশ-যাত্রীদের নিকট হইতে শোণিতের কর আদায় করিত। হারমড্ যখন এই সেতু পার হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার পদভরে সেতু কাঁপিয়া উঠিতেছিল। মোড্গাড ইহাতে আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কে তুমি? শত সহস্র যাত্রী প্রতি দিন এই সেতু পার হইতেছে তাহাতে সেতু এতটুকু আন্দোলিত হয় না, আর তোমার অশ্বের পদভরে কেন আন্দোলিত হইতেছে? আর তুমি জীবিতে ব্যক্তি কেমন করিয়া হেলাদেবীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে যাইতেছ?

হারমড্ তাহার পরিচয় দিলেন। তখন মোড্-গাড আর তাহাকে কোন কথা বলিল না, হারমড যে পথে বল্ডার গিয়াছেন সেই পথে যাইতে যাইতে অবশেষে হেলা দেবীর সিংহাসনের নিকট যাইয়া পৌছিলেন।

হেলা দেবী তাঁহাকে দেখিয়া ক্রুদ্ধ স্বরে কহিলেন "তুমি স্বর্গরাজ্য ছাড়িয়া এখানে আসিয়াছ কেন?" হারমড্ তখন দেবীর চরণতলে পড়িয়া বল্ডারের জন্যই যে তাঁহার নিকট আসিয়াছেন সেই কথা বলিলেন। বলিলেন, দেবী হেলা, এই অন্ধকার নিরা-নন্দ পুরীতে কি বল্ডারের স্থান হইতে পারে? তিনি যে আনন্দের দেবতা,—আলোকের দেবতা!

হেলা কহিলেন,—"হারমড্! তোমার এই অসম্ভব প্রস্তাব আমি কেমন করিয়া পূর্ণ করিব? জান না কি দেবতারা আমাদের প্রতি কি অবিচার করিয়াছেন! আমার পিতা লোকি স্বর্গে থাকিয়াও হতমান হইয়া আছেন। আর তাঁহার সন্তানেরা কেহ নেকড়ে বাঘ ফেনরিস (Fenris) হইয়া পর্ব্বত-শৃঙ্খলে আবদ্ধ আর কেহ ইওর মাঙ্গাণ্ডর (Ior mun gandr) রূপে অনন্তনাগরূপে সমুদ্রে রহিয়াছেন। আর আমি এই অন্ধকার প্রদেশে মৃত্যু-রাজ্যে রাজত্ব করি-তেছি। হাঁ আমি তোমাদের সাহায্য করিব, কিন্তু তুমি যে বলিতেছ এবং দেবতারা যে বলিতেছেন বল্ডারের জগৎজোড়া খ্যাতি সে কথা সত্য কি না তাহা আমাকে প্রমাণ

হেলার প্রস্তাব

করিয়া দেখাইতে হইবে। যদি বিশ্বজগতের চেতন অচেতন, উদ্ভিদ্ দেব, দানব, মানুষ, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গ—সৃষ্টির সকল পদার্থ বল্‌ডারের জন্য শোক প্রকাশ করে এবং তাহার জন্য অশ্রু মোচন করে, তবে বল্‌ডারকে আমি ছাড়িয়া দিব। কিন্তু যদি একটি প্রাণীও অশ্রু বিসর্জ্জন না করে, তবে বল্‌ডারকে আমি ছাড়িয়া দিব না।

হার্‌মড্ হেলা দেবীর কথায় মনে মনে ভাবিলেন যে বল্‌ডারকে স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া পাওয়া এখন আর তেমন কঠিন হইবে না কেননা, সর্ব্বজনপ্রিয় বল্‌ডারের জন্য ত সকলেই অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে? হার্‌মড্ ফিরিবার সময় বল্‌ডার ও তাঁহার স্ত্রী নান্নার নিকট হইতে গালিচা পাইলেন। ফ্রিগা দেবীর জন্য আর বল্‌ডার ওডিন্‌কে দিলেন মন্ত্রপূত অঙ্গুরী। একদিন তিনি ওডিনের নিকট হইতেই উপহার পাইয়াছিলেন। বল্‌ডার সমুদয় দেবতাদের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন

হার্‌মডের আস্‌গার্ডে প্রত্যাগমন

হার্‌মড্ ভাবিলেন—কেন এ সব? আবার ত বল্‌ডার আস্‌গার্ডেই ফিরিয়া আসিতেছেন। এইবার ফিরিবার পথে তাঁহার কোনও কষ্ট হইল না। দ্বাদশ দিবসে তিনি স্বর্গরাজ্যে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

এদিকে দেবতাদের কথা শোন। হার্‌মড্ যখন হেলা দেবীর মৃত্যু-রাজ্যে রওয়ানা হইয়াছিলেন, সে সময়ে বল্‌ডারের মৃতদেহ সমুদ্রের তীরে জাহাজে রিং হর্‌নের উপর চিতাসজ্জায় তুলিয়া দেওয়া হইল। বলডারের স্ত্রী নান্না (Nanna) স্বামীর নিকট শেষ বিদায় লইতে আসিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। সে মূর্চ্ছা আর তাঁহার ভাঙ্গিল না—তাঁহারও মৃত্যু হইল। নান্নার মৃত্যুর পর তাঁহার মৃত দেহও বল্‌ডারের পাশে দেবতারা শোয়াইয়া দিলেন। বল্‌ডারের অশ্ব, বল্‌ডারের কুকুর প্রভৃতিকে বধ করিয়া তাহাদিগকেও বল্‌ডারের চিতার উপর স্থাপন করিলেন। দেবতারা সকলে বল্‌ডারের প্রতি তাঁহাদের স্নেহনিদর্শনস্বরূপ নানা প্রকার বহুমূল্য দ্রব্যাদি চিতার উপর সজ্জিত করিয়া দিলেন। সকলের শেষ ওডিন্ চিতার উপর আসিলেন এবং তাঁহার মন্ত্রপূত অঙ্গুরী ড্রাউপ্‌নির (Draupnir) চিতার উপর দিলেন। সে সময়ে মাথা নত করিয়া তিনি বল্‌ডারের কাণে কাণে কি বলিলেন, সে কথা কেহই জানিতে পারিল না। এ বিষয়ে একটি সুন্দর ছড়া আছে—

When Odin whispered
In Balder's ear
Nor God nor man
Was nigh to hear.
What Odin whispered,
Bending low
No man knoweth
Or e'er shall know.

নীরবে ওডিন্ চিতার উপর হইতে নামিয়া আসিলেন। পর বল্‌ডারের চিতাতে অগ্নি সংযোগ করিলেন। আকাশ স্পর্শ করিয়া অগ্নিশিখা লক্ লক্

দেবকন্যা ভ্যালকির

করিয়া জ্বলিতে লাগিল। চিতাসজ্জিত জাহাজখানি জ্বলিতে জ্বলিতে সাগরের বুকে ভাসিতে ভাসিতে পশ্চিম দিকে চলিতে লাগিল এবং সূর্য্যাস্তের রক্তিমাভার সহিত দিনের চিতার শিখাও যেমন সন্ধ্যার অন্ধকারে ডুবিয়া যায়, তেমনি ভাবে বল্‌ডারের চিতাগ্নির শেষ শিখাও সমুদ্রের গভীর অতল জলে নিমজ্জিত হইল।

দেবতারা বল্‌ডারকে এই ভাবে চিতার বুকে বিসর্জ্জন দিয়া স্বর্গে ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন হার্‌মড্ আসিয়াছেন। হার্‌মড হেলাদেবীর কথা দেবতাদের নিকট বলিলেন। তখন ফ্রিগা পৃথিবীর সর্ব্বত্র দূত পাঠাইলেন। দেবতারা; দেবকন্যারা সকলে অশ্বারোহণে চারিদিকে বাহির হইলেন। দেবকন্যা ভ্যালকিরগণ

বিশ্বজগতে শুধু এই একটি কথা প্রচার করিতে লাগিলেন—শোন, তোমরা সকলে "বল্‌ডারের মৃত্যু হইয়াছে।" এই বাণী প্রচারিত হইবামাত্র বিশ্ব নিখিলে শোকের করুণ ক্রন্দন-ধ্বনি গুঞ্জরিত হইতে লাগিল। মানুষ কাঁদিল, পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলে বল্‌ডারের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিল। পাষাণ কাঁদিয়া গলিয়া গেল, তরুলতার পাতায় পাতায় বেদনার অশ্রু পুঞ্জীভূত হইয়া উঠিল। সবুজ-সুন্দর তৃণের বুকে শিশিরবিন্দুরূপে বল্‌ডারের জন্য বেদনার অশ্রু জ্বল্ জ্বল্ করিতে লাগিল। এই ভাবে দেব-কন্যারা পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত বল্‌ডারের মৃত্যু সংবাদ প্রচার করিয়া বেড়াইলেন। সকলেই কাঁদিল। সর্ব্বত্র একই বাণী ধ্বনিয়া উঠিল—হায়! হায়! বল্‌ডার নাই!!

ফ্রিগার দূতেরা যখন আসগাড়ে ফিরিয়া আসিতে-ছিল, সে সময়ে এক বনভূমির অন্তর্গত গুহামুখে দানবী থক্-এর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ হইল। তাহাকে দেখিয়া

থকের হাস্য

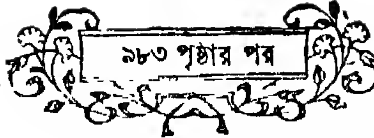
দেবকন্যারা বলডারের শোকে কাঁদিতে বসিলেন। দানবী থক্ কহিল,—"বলডারের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাতে আমার কি? তোমাদের শোক করিতে হয়, তোমরা শোক কর। বলডারের মৃত্যুতে আমি কেন অশ্রু বিসর্জন করিব।" একথা বলিতে বলিতে থক্ উচ্চ হাস্যধ্বনি করিয়া গুহার মধ্যে যাইয়া প্রবেশ করিল। এই থক্ আর কেহই নহে,—লোকি। লোকিই ছদ্মবেশে গুহার সম্মুখে বসিয়াছিল। দেব-কন্যারা স্বর্গে ফিরিয়া আসিয়া যখন বলিলেন যে, থক্ বলডারের জন্য অশ্রু বিসর্জ্জন করিবে না, তখন দেবতারা বুঝিতে পারিলেন যে, নিয়তির বিধানকে লঙ্ঘন করিবার সাধ্য মানুষের নাই।

তোমাদের মনে আছে ওডিন্‌কে ভলা দেবী বলিয়াছিলেন যে, পৃথিবীদেবী রিণ্ডার গর্ভে তাঁহার যে পুত্র জন্মিবে সে বলডারের হত্যার প্রতিশোধ লইবে। প্রকৃত পক্ষেও তাহাই ঘটিল—রিণ্ডার পুত্র ভালি জন্ম গ্রহণ করিয়া একদিনের মধ্যেই পূর্ণাবয়বপ্রাপ্ত হইলেন এবং মুখ হাত না ধুইয়া, চুল না আচড়াইয়া ধনুর্ব্বাণ হস্তে আসগড়ে আসিয়া হোডারকে হত্যা করিয়া—বলডারকে নিহত করিবার প্রতিশোধ লইলেন। বলডারের এই কাহিনী লইয়া লংফেলো (Long-fellow) ম্যাথু আরনল্ড (Mathew Arnold) গ্রে (Grey) প্রভৃতি ইংরাজ কবিরা অনেক কবিতা রচনা করিয়াছেন।

বলডারের এই কাহিনীটিকে অনেকে রূপক মনে করেন। বলডার সূর্য্য—আলোর দেবতা—হোডার রাত্রি, অন্ধকারের দেবতা, তাই সে অন্ধ। বলডার আলোকের দেবতা বলিয়াই সকলের প্রিয় আলোকে, কে না ভালবাসে? আলোর সহিতই ত কোলাহল জাগিয়া উঠে। সূর্য্যাস্তের সহিতই পৃথিবী অন্ধকার হয়, কাজেই, হোডারের হাতে আলোর দেবতা বলডারের মৃত্যু ত স্বাভাবিকই। অনেকে আবার এই কাহিনীটির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও করেন, তাহা এই যে, বলডার পবিত্রতার দেবতা, হোডার পাপের দেবতা, লোকি মায়া, সে সকলকে ভুলাইয়া পাপের প্রলোভনে আকর্ষণ করিয়া ধ্বংসের পথ দেখাইয়া দেয়। সে যাহাই হউক না কেন, বলডারের কাহিনীটি বড় করুণ, বড় মর্ম্মস্পর্শী।

আলো

রঙ্



দেখা কার্য্যটির মধ্যে তিনটি ব্যাপার রহিয়াছে। একটি হইল যাহা দেখিতেছি, দ্বিতীয় হইল যে আলোতে দেখিতেছি এবং তৃতীয় যাহার দ্বারা দেখিতেছি। এই তিনটির যোগাযোগ হইলেই আমাদের রূপের অভিজ্ঞতা জন্মে—নচেৎ নয়। রঙ্ দেখার ব্যাপারেও এই তিনটিরই প্রভাব বর্ত্তমান। প্রথম দুইটি আমাদের দেখা কার্য্যকে কি ভাবে নিয়ন্ত্রিত করে সে বিষয়ে তোমাদিগকে বলা হইয়াছে। প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব একটি রঙ্ আছে—এই রঙ্‌টি বস্তুর উপর সাদা আলো ফেলিলেই তবে ধরা পড়ে সাদা আলো দিয়া না দেখিয়া বিভিন্ন রঙের আলো ফেলিয়া যদি বস্তুটি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে বস্তুটিও রঙ্ বদলাইতে থাকে। এইবার রঙ্‌দেখা ব্যাপারটির উপর চক্ষুর কি প্রভাব রহিয়াছে, তাহাই জানিতে চেষ্টা করিব।

দুইটা ম্যাজিক লণ্ঠন (Magic Lantern) লইয়া দুই দিক হইতে একটা পর্দ্দার উপর আলোক রশ্মি নিক্ষেপ কর। লণ্ঠন দুইটিকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে পর্দ্দার আলোকিত স্থান দুইটি কতকটা পরস্পরের উপর পড়ে। এইবার একটি লণ্ঠনের সামনে একটি পীত রঙের কাচ রাখিয়া এবং অপরটির সামনে একটি নীল রঙের কাচ রাখিয়া নীল ও পীত রঙের আলো এক সঙ্গে পর্দ্দার উপর ফেল। এইরূপ করিলে একটি অদ্ভুত ব্যাপার দেখিতে পাওয়া যাইবে। পর্দ্দার যে অংশটিতে শুধু নীল রঙের আলো পড়িয়াছে, সে স্থান নীল দেখাইবে এবং যে অংশে শুধু পীত আলো পড়িয়াছে সে স্থানেও পীতই পাওয়া যাইবে। ইহাতে অবশ্য নূতনত্ব কিছুই নাই। কিন্তু আলোকিত স্থান দুইটি যে অংশে পরস্পরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ নীল ও পীত দুইটি আলোই যে স্থানটিতে একসঙ্গে পড়িয়াছে সেই স্থানটি বর্ণহীন অর্থাৎ সাদা দেখাইবে। দুইটি রঙ্ মিশিয়া সাদা দেখান ব্যাপারটি বাস্তবিকই অদ্ভুত বটে। তোমরা তোমাদের রঙের বাক্স (colour box) হইতে নীল ও পীত রঙ্ লইয়া একটা সাদা কাগজের উপর মিশাইবার চেষ্টা কর। সাদা হয় কি? ঐ রঙ্ দুটি মিশাইলে সবুজ রঙের মত একটা রঙ্ তৈরী হয় মাত্র।

এখানে ইহার সমাধানের একটা ইঙ্গিত করিতেছি। ম্যাজিক লণ্ঠন দুইটির একটি নিবাইয়া অপরটির সামনে নীল ও পীত দুইটা কাচই ধর। পর্দ্দার উপর যে আলো পড়িবে, তাহা নীলও নহে; পীতও নহে; সাদাও নহে—সবুজ। এইবার বোধ হয় ব্যাপারটির ঠিক কারণ কি, বলিলে তাহা বোঝা কঠিন হইবে না।

তোমরা জান যে, চোখ যাহাকে সাদা দেখে, তাহার মধ্যে লাল হইতে বেগুনি পর্য্যন্ত সব রঙ্ই বর্ত্তমান। এই আলো নীল কাচের ভিতর দিয়া যাইবার সময় উহার লাল অংশ নীল কাচটা নিজের মধ্যে ধরিয়া লয়। সাদা আলো হইতে লাল অংশ চলিয়া গেলে অবশিষ্ট যাহা থাকে, তাহা নীল দেখায়। অপর পক্ষে, পীত কাচটির কাজ হইল সাদা আলোর নীল অংশটি নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখা। এখন একসঙ্গে একটি লণ্ঠনের সামনে দুইটি কাচই রাখিলে লণ্ঠনের সাদা আলো হইতে লাল ও নীল অংশ কাচ দুইটির মধ্যে শোষিত হইয়া যায় এবং বাকী অংশটি সবুজ প্রধান বলিয়া সবুজই দেখায়। কিন্তু যখন দুইটি লণ্ঠন হইতে নীল ও পীত আলো একসঙ্গে পদার্থটির উপর আসিয়া পড়ে তখন ব্যাপার হয় সম্পূর্ণ অন্যরূপ। এক্ষেত্রে আমরা সাদা আলো হইতে তাহার বর্ণকিরণের (spectrum) দুই প্রান্তের রঙ্ (অর্থাৎ লাল ও নীল রঙ্) সরাইয়া লইনা। বরং একটা কাচ (নীল) যে অংশটা (লাল) সরাইয়া লইয়াছিল, অপর ম্যাজিক লণ্ঠনের আলোর সেই অংশটাই (লাল) প্রথম আলোটার সহিত মিশিতে দেওয়া হইল। এই জন্যই মিশ্রিত অংশ হইতে চোখে যে আলো আসিয়া পড়িল, তাহাতে সাদা আলোর সব রঙ্ই বর্ত্তমান বলিয়া চোখ তাহাকে বর্ণহীন বা সাদাই দেখিল।

এখন ঐ কাচ দুইটির পরিবর্ত্তে লাল ও সবুজ কাচ লইয়া আমাদের উপরিউক্ত পরীক্ষাটি নিষ্পন্ন করি। তখনও পূর্ব্বোক্ত পরীক্ষার অনুরূপ হইলেও সামান্য বিভিন্ন রূপ ফল আমারা পাইব। এক্ষেত্রে দুইটি রঙ্ যে স্থানটিতে একসঙ্গে আসিয়া সংমিশ্রিত হইতেছে, সেই স্থানটি আমাদের নিকট পীত দেখাইবে। অপর পক্ষে দুইটি রঙীন কাচই (লাল ও সবুজ) যদি একটি লণ্ঠনের সামনে ধরা যায় তাহা হইলে লণ্ঠনের আলো ইহাদের ভেদ করিয়া আর অগ্রসর হইতে দেখা যাইবে না, এবং ফলে দাঁড়াইবে যে পর্দ্দাটির উপর কোনও আলোই পড়িবে না। ইহার কারণ এই যে লাল কাচ বর্ণকিরণের লাল অংশ ছাড়া অপর সব রঙ্ই নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখে; অপর পক্ষে সবুজ কাচ লাল ও নীল অংশ তাহাকে ভেদ করিতে দেয় না! যখন দুইটা কাচই একটা লণ্ঠন-নিঃসৃত আলোর সামনে ধরা হইল' তখন লাল কাচটা সাদা আলোর লাল অংশটাই শুধু তাহাকে ভেদ করিয়া চলিয়া যাইতে দিল, এবং এই লাল আলো নিজে সবুজ কাচের দরজায় আটকাইয়া যাওয়াতে পর্দ্দা কোন আলোই পাইল না। অপর পক্ষে, দুইটা লণ্ঠন হইতে আগত লাল ও সবুজ আলোর সংমিশ্রণের স্থানটিতে বর্ণ-কিরণের নীল অংশ ছাড়া সব রঙ্ই বর্ত্তমান, আমরা এই মাত্র দেখাইয়াছি। যে, বর্ণ কিরণ হইতে তাহার নীল অংশ সরাইয়া লইলে অবশিষ্ট ছয়টা রঙের যোগাযোগ হইলে যে আলো পাওয়া যায়, চোখে তাহাকে পীত দেখে। কাজে কাজেই, লাল ও সবুজ আলোর সংমিশ্রিত স্থানটিকেও চোখ পীত রূপেই দেখিতে পায়।

উপরে বর্ণিত পরীক্ষাগুলি হইতে এই কথা বুঝিতে পারা গেল যে, চোখ যে সব রঙকে বিশুদ্ধ রঙ দেখে, বাস্তবিক পক্ষে সব সময়ে তাহার যে বিশুদ্ধ থাকে তাহা নহে। তোমরা জান যে, প্রিস্ম দিয়া সাদা আলো-কে ভাঙ্গিয়া দিলে নানা রঙের আলোর সঙ্গে সবুজ রঙটাও তৈয়ারী হয়। এই যে সবুজ রঙ হইল ইহা বিশুদ্ধ, কারণ, ইহাকে আবার নূতন করিয়া ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিলে অকৃতকার্য্য হইতে হয়। কিন্তু এই মাত্র তোমাদিগকে যে পরীক্ষাগুলির কথা বলিলাম তাহাদের একটিতে যে বর্ণ-কিরণ পাইলে, ইহার রঙগুলি হইতে তাহার লাল নীল অংশ সারাইলে যে রঙগুলি বর্ত্তমান থাকে, সেগুলি এক সঙ্গে চোখে আসিয়া লাগিলে সবুজ দেখায়। ঠিক এই কারণেই গাছের পাতাকে আমরা সবুজ দেখি। পাতার মধ্যে এক রকমের পদার্থ আছে—যাহাকে বৈজ্ঞানিকেরা ক্লোরোফিল (Chlorofil) বা পত্রহরিৎ নাম দিয়াছেন এই(Chlorofil)অণুগুলির উপর সূর্য্যের সাদা আলো আসিয়া পড়িলে তাহারা সাদা আলোর প্রায় সমস্ত লাল ও নীল অংশ নিজের মধ্যে টানিয়া লয়। কাজে কাজেই পাতা হইতে যে আলো তোমার চোখে ফিরিয়া আসে, তাহাতে সাদা আলোর নীল ও লাল অংশ থাকে না। যে গুলি বর্ত্তমান থাকে, চোখকে সবুজ রঙ যে ভাবে উত্তেজিত করে, সেগুলিও প্রায় তেমনই ভাবে তাহাকে উত্তেজিত করে বলিয়া চোখ ভুল করিয়া মনে করে যেন সবুজই দেখিতেছি। তাহার পর তোমরা অনেকেই জান যে সবুজ রঙ তৈয়ার করিতে হইলে তোমাদের রঙের বাক্সের নীল ও পীত রঙকে একসঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়। বাস্তবিক পক্ষে চোখ যাহাকে সবুজ দেখে, সেই রঙকে পাইবার সংখ্যার কোন শেষ নাই। বর্ণ-কিরণের যে কোন ও রঙের পক্ষেও ঐ কথাটাই খাটে। মিশ্র রঙ ধরিবার ক্ষমতা আমাদের চোখে নাই।

চিত্র ১—রঙ মিশ্রণ [illegible] পর্দাটির উপর পীত ও [illegible] আলো [illegible] হইয়াছে, [illegible] এই দুইটি [illegible] আলো একত্র হইয়া পড়িয়াছে [illegible] আমাদের চোখে বর্ণহীন অর্থাৎ সাদা দেখাইতেছে।

চিত্র ২—রঙ মিলন—ম্যাজিক লণ্ঠনের সাদা আলোকে প্রথমে পীত কাচের ছাকনি দিয়া যাইতে দেওয়া হইল পরে আবার তাহা হইতে নীল কাচের ছাকনি দিয়া আরও অন্য রঙ ছাঁকিয়া লওয়া হইল। 'অবশিষ্ট রঙ সবুজ প্রধান বলিয়া' পর্দাটির উপর সবুজ রঙ পড়িয়াছে

আমাদের অপর একটা ইন্দ্রিয় কানের সঙ্গে চোখের এই ক্ষমতার তুলনা করিলে বোধ হয় তোমরা ব্যাপারটা আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে। আলো—যাহা আমরা চোখ দিয়া দেখি এবং শব্দ—যাহা আমরা কানে শুনি, উভয়ই তরঙ্গ ধর্ম্মী। শব্দের বেলা এই তরঙ্গ যে বস্তুকে আশ্রয় করিয়া নিজেকে প্রকাশ করে তাহা অবশ্য জড় পদার্থ—যেমন বাতাস। আলোর তরঙ্গ যে বস্তুর আলোড়নে তৈয়ারী হয়, সে সম্বন্ধে আমরা অবশ্য বিশেষ কিছুই জানি না—তবে এই মাত্র বলা চলে যে, তাহা কোন ওরূপ জড় পদার্থ নহে। শব্দের বেলা আমরা জানি যে, তরঙ্গের বড় বা ছোট হওয়ার উপরে শব্দ শোনার পার্থক্য পাওয়া যায়। হারমোনিয়ামের বাঁ দিকের চাবি টিপিয়া বাজাইলে যে মোটা গম্ভীর শব্দ বাহির হয়, তাহার শব্দ-তরঙ্গের দীর্ঘতা ডান দিককার চাবি টিপিলে যে সব শব্দ বাহির হয় তাহা হইতে অনেক বড়। আলোর ক্ষেত্রেও সেইরূপ ব্যাপারই ঘটিয়া থাকে। তোমরা দেখিয়াছ যে, সাদা আলোর বর্ণ কিরণের এক প্রান্তের রঙ্ লাল। ইহা হারমোনিয়ামের বাঁ-দিকের চাবি টিপিয়া যে শব্দ পাওয়া যায়, তাহার অনুরূপ। কারণ, ইহার তরঙ্গের দীর্ঘতা বর্ণ কিরণের অপর প্রান্তে অবস্থিত নীল রঙের তরঙ্গের দীর্ঘতা হইতে বড়। মাঝের রঙ্-গুলির তরঙ্গের দীর্ঘতা সেই অনুযায়ী বড় হইতে ছোট হইয়া গিয়াছে। শব্দের বেলাতেও তরঙ্গের দৈর্ঘ্য যেমন যেমন ছোট হইতে থাকে, শব্দও তেমনি ভাবেই মোটা হইতে সরু হইতে, শুনিতে পাওয়া যায়। চোখ ও কানের ক্রিয়া এই পর্য্যন্ত অবশ্য পরস্পরের সঙ্গে তুলনায় এক রকমের। কিন্তু যখন দুই বা ততোধিক তরঙ্গ মিশ্রিত হইয়া এই দুইটি ইন্দ্রিয়ের উপর আসিয়া পড়ে, তখন ইহারা উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ভাবে আচরণ করে।

হারমোনিয়ামের এক সঙ্গে দুইটা চাবি টিপিয়া বাজাও। তুমি স্পষ্ট দুইটা স্বর শুনিবে। চাবি দুইটা যদি দূরে দূরে থাকে তাহা হইলে মনোযোগ দিলে উহাদের যে কোনও একটাকে তুমি বাছিয়া শুনিতেও পার। তখন অন্যটা তোমার কাছে অস্পষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু আলোর বেলা চোখের এমন-কোনও ক্ষমতা নাই, যাহাতে সে মিশ্র রঙ্‌কে মিশ্র বলিয়া ধরিয়া ফেলিতে পারে। দুই রঙের দুইটা আলো এক সঙ্গে করিলে আমাদের চোখ তাহাকে বিশুদ্ধ বলিয়াই ভুল করে। লাল ও সবুজ মিশাইলে তাহাকে আমরা পীত দেখি—অথচ পীত নিজে একটা বিশুদ্ধ রঙ। কান প্রত্যেক শব্দ আলাদা আলাদা করিয়া শোনে, চোখের এই বাছিয়া লইবার ক্ষমতা নাই, সে সব-কিছুকে মিলাইয়া মিশাইয়া নিজের মনোমত একটা কিছু বানাইয়া দেখে।

চোখ কেমন করিয়া যে রঙ্ দেখে, সে সম্বন্ধে বহু গবেষণা হইয়াছে, অথচ কোন সত্যকারের সিদ্ধান্ত এখন পর্য্যন্ত পরিষ্কার ভাবে পাওয়া যায় নাই। চোখের মত এমন একটা জটিল ইন্দ্রিয়ের সব বিষয়ই নির্ভুল ভাবে জানা যাইবে এমন কথা বলা বাতুলতা মাত্র। তাছাড়া, সত্যকথা বলিতে কি, যত সরল, যত সাধারণ অকিঞ্চিৎকর বিষয়ই হোক না কেন, বিজ্ঞান কখনও এ কথা বলিতে পারে না যে, তাহার শেষ জানিয়াছে। আজ যাহার সম্বন্ধে এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, সামান্য আর একটু জানিলেই সে-সম্বন্ধে আমাদের সব জানার শেষ হইয়া যাইবে, হয়ত কালই দেখিব যে, তাহাই সকল হইতে জটিল সমস্যা হইয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহা হউক, চোখের রঙ্ দেখা ব্যাপারটি সম্বন্ধে মোটামুটি যে সিদ্ধান্তগুলি পাওয়া গিয়াছে, তাহাই তোমাদের বলিতেছি।

মানুষের চোখের ভিতর রঙ্ গ্রহণ করিবার তিনটি যন্ত্র আছে। চোখ কাটিয়া এই যন্ত্রগুলির একটাকেও অবশ্য এখনও নিশ্চিত ভাবে বাহির করিতে না পারিলেও তাহাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নানান্ ভাবে প্রামাণ পাওয়া যায়। এই যন্ত্র তিনটির প্রত্যেকেরই বর্ণ-কিরণের সব রঙ্‌গুলিতেই অল্প বিস্তর সাড়া দিবার ক্ষমতা থাকিলে ও ইহাদের দুইটা তাহার প্রান্তভাগের রঙ্ দুইটাতে (অর্থাৎ একটা লালচে এবং অপরটা নীলচে) খুব বেশী করিয়া সাড়া দিয়া উঠে এবং অবশিষ্ট তৃতীয়টি বর্ণ-কিরণের মাঝামাঝি একটা রঙে (প্রায় সবুজ) সবচেয়ে বেশী করিয়া সাড়া দিয়া থাকে। আমাদের চোখে কোনও রঙ্ আসিয়া পড়িলে ইহাদের তিনটিই একসঙ্গে উত্তেজিত হয়—তবে তিনটি সমান ভাবে হয় না, কোনওটা হয় বেশী এবং কোনওটা কম। এই তিনটি উত্তেজনার সমষ্টি আমাদের কাছে একটা বিশেষ রঙ্‌রূপে প্রকাশ পায়। এই তিনটির মধ্যে একটি যদি কোনও কারণে অকেজো হইয়া যায়, ধর, লালের যন্ত্রটি যদি আর কাজ না করে, তাহা হইলে চোখ আর লাল রঙ্ ভাল করিয়া দেখিতে পায় না। যাহাদের এই রূপ লাল রঙের যন্ত্রটি নষ্ট হইয়াছে বা

একেবারেই নাই, তাহারা পদ্মফুলের লাল রঙ্ ও তাহার পাতার সবুজ রঙ্এর মধ্যে পার্থক্য ধরিতে পারে না। তোমরা রঙ্ কাণা লোকের কথা বোধ হয় শুনিয়াছ। রঙ্ কাণা যাহারা তাহাদের ইহাদের কোনও একটা নষ্ট হইয়াছে। সাধারণতঃ লাল রঙ্ ধরিবার যন্ত্রটাই বিকল হইয়াছে এইরূপ লোকই বেশী দেখা যায়— তবে অন্য রঙের যন্ত্র বিকল হওয়া রঙ্ কাণা লোকও যে নাই তাহা নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রঙ্ রঙ্ কাণা লোক নিজে কিন্তু তাহার এইরূপ অন্ধতা সম্বন্ধে কোনও খোঁজ পায় না। এই সব রঙ্ কাণা লোকদের লইয়া পরীক্ষা করিয়া আমাদের চোখের রঙ্ ধরিবার ঐ তিনটি যন্ত্রের বিষয় বৈজ্ঞানিকেরা জানিতে পারিয়াছেন।

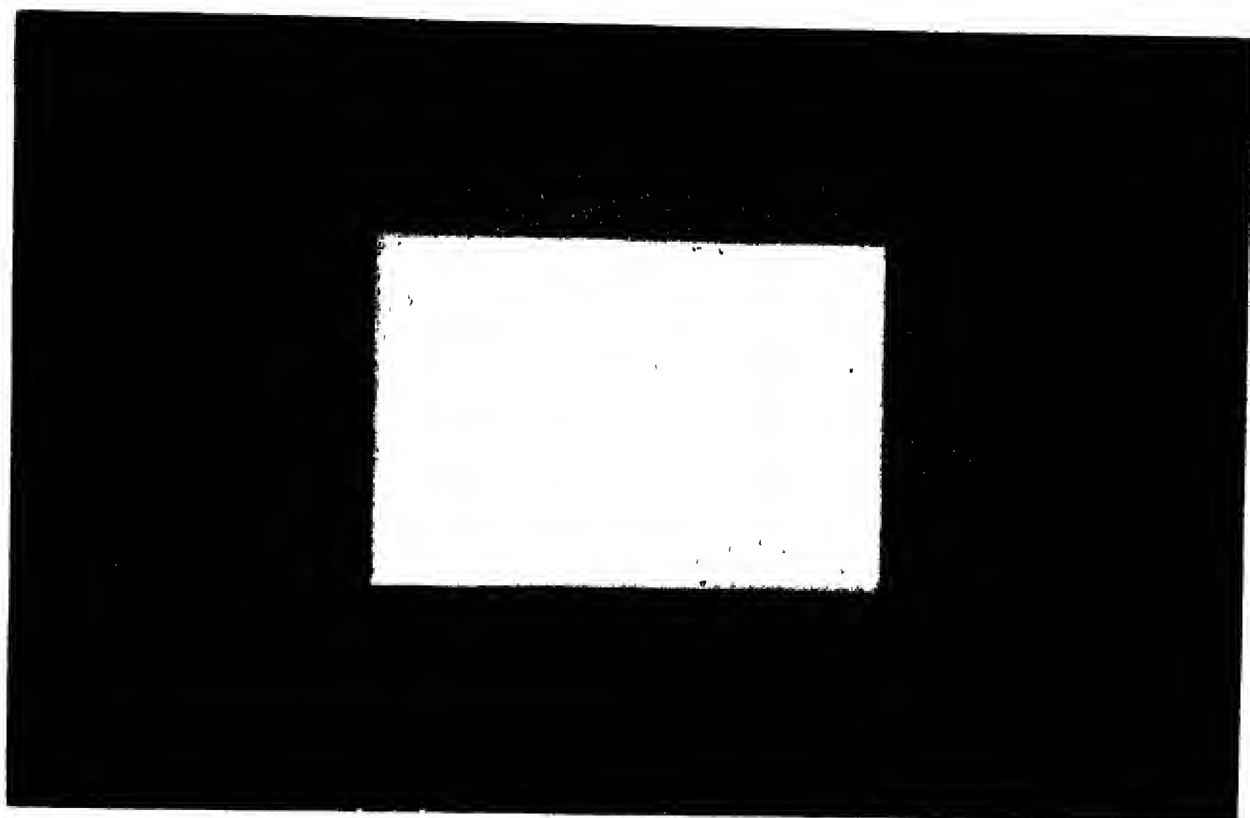
তোমরা এইবার বোধ হয় কতকটা বুঝিতে পারিয়াছ যে,কেমন করিয়া নানা দৈর্ঘ্যের আলোক-তরঙ্গ নানা ভাবে একত্র করিয়া চোখ একই রকম রঙ্ উদ্ভাবন করিয়া থাকে। আমাদের চোখের তিনটা রঙ্ ধরিবার যন্ত্রের একসঙ্গে উত্তেজনার ফলে রঙের অনুভূতি জন্মে। ব্যাপার হয় যে, কোনও আলোক-তরঙ্গ এই যন্ত্রগুলির তিনটিকেই অথবা অন্ততঃ পক্ষে দুইটিকে একসঙ্গে অথচ বিভিন্ন অনুপাতে উত্তেজিত করে। এই ব্যাপারটিকেই একটু অন্যভাবে ঘুরাইয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাই যে,যে-কোনও তিনটি বিভিন্ন আলোক-তরঙ্গকে তাহাদের ঔজ্জ্বল্যের অনুপাত ঠিক করিয়া লইয়া একসঙ্গে মিশাইলেও আমরা যে কোনও রঙ্ দেখিতে পাইব।

যে কোনও তিনটি রঙ্ লইয়া তাহার পরিমাণ ঠিক করিয়া একসঙ্গে করিলে যে কোনও রঙ্ যে দেখিতে পাওয়া সম্ভব, এই তত্ত্বটিকে আশ্রয় করিয়াই রঙীন ছবি ছাপা সম্ভব হইয়াছে। রঙীন ছবিতে ত কত রকমের রঙ্ থাকে, সে সব রঙের আলাদা আলাদা ব্লক তৈয়ারী করিয়া ঠিক জায়গা মত বসাইয়া ছাপা যে অসম্ভব, তাহা বোঝা শক্ত নহে। তাই রঙীন ছবি ছাপা একটা সমস্যাই ছিল। এই তত্ত্বটি আবিষ্কৃত হইবার পর দেখা গেল যে, কেবল মাত্র তিনটি রঙ লইলেই কাজ চলিয়া যাইবে। নানারূপ পরীক্ষার ভিতর দিয়া অবশেষে ইহা স্থির হইল যে, লাল, পীত ও নীল রঙ্ হইলেই সব দিক দিয়া সুবিধা হয়। রঙীন ছবি ছাপিবার জন্য আজকাল তাই শুধু মাত্র তিনটি রঙ্ দিয়াই সব রঙের কাজ পাওয়া যায়। কিন্তু রঙীন ছবি ছাপার কথা বলিবার পূর্ব্বে সাদা-কালো অর্থাৎ সাধারণ ছবি কেমন করিয়া ছাপা হয়, তাহা বলিতেছি।

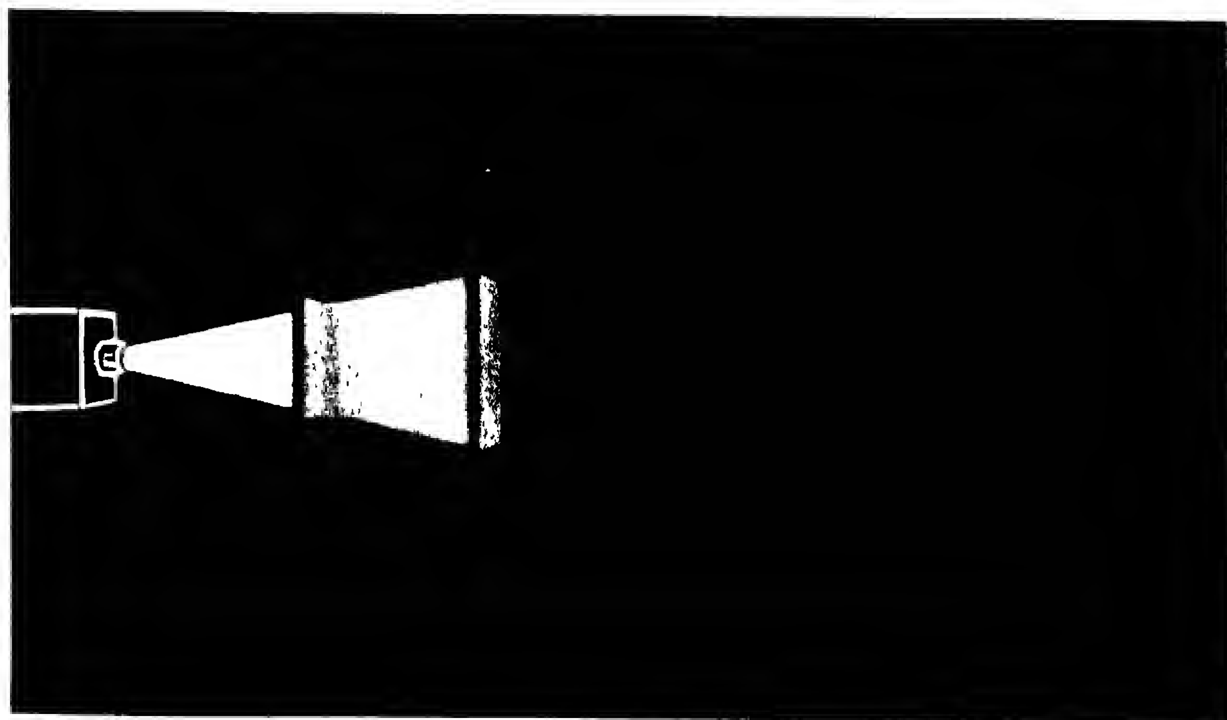
তোমরা একটা পড়িবার কাচ (reading glass) লইয়া যে কোনও একটা ছবি পরীক্ষা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, ছবিটি অসংখ্য কাল কাল বিন্দু দিয়া তৈয়ারী। যে স্থানে কালো করা বেশী দরকার বা যেখানটা অন্ধকার,সেখানে কালো বিন্দুর ঘনত্বও বেশী। কালো বিন্দুগুলির ঘনত্বের পরিমাণের তারতম্য করিয়াই সমস্ত ছবিটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। এখন একটা রঙীন ছবির উপর তোমরা reading lensটি ধর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে, রঙীন ছবিটিও বিন্দু দিয়াই তৈয়ারী। এই বিন্দুগুলি অবশ্য কাল নহে— ভাল করিয়া দেখিলে ইহাতে শুধু তিনটি রঙ্ই দেখিবে। এই তিনটি রঙ্ হইল, উপরে যেরূপ বলিয়াছি লাল, পীত ও নীল। রঙীন ছবিটি লাল, পীত ও নীল রঙ্গের বিন্দুর পরস্পর ঘনত্বের পরিমাণের অল্পতা বা বহুত্ব দিয়াই তৈয়ারী।

রঙীন ছবি তৈয়ার করিবার সময় এইরূপ করা হয়। প্রথমে ছবিটির তিনটি ফোটোগ্রাফ তোলা হয়। —একটি লাল কাচের ছাকনীর মধ্য দিয়া, একটি পীত কাচের ছাঁকনীর মধ্য দিয়া এবং তৃতীয়টি নীল কাচের ছাঁকনীর মধ্য দিয়া। ছবিগুলি এমন ভাবে একটি জালের ভিতর দিয়া তোলা হয় যাহাতে সাদা-কালো ছবিতে যে বিন্দুগুলি দেখিতে পাও, সেইরূপ বিন্দু ইহাতেও থাকে। এখন এই তিন রঙের ছাঁকনীর ভিতর দিয়া তোলা তিনটী ছবিকে তাঁবার পাতের উপর ফুটাইয়া তোলা হয়। তাহার পর যে ছবিটি পীত রঙের ছাঁকনীর মধ্য দিয়া তোলা হইয়াছে, তাহাকে পীত রঙ্ দিয়া, যেটিকে লাল রঙ্গের ছাঁকনী দিয়া তাহকে লাল রঙ্ দিয়া এবং যেটিকে নীল কাচের ছাঁকনী দিয়া তাহাকে নীল রঙ্ দিয়া প্রথমে পীত তাহার পর লাল এবং অবশেষে নীল এই ক্রমে একটা সাদা ভাল কাগজের উপর ছাপিবামাত্রই সম্পূর্ণ রঙীন ছবিটি ফুটিয়া ওঠে।

বর্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে তোমরা 'শিশুভারতীর' দুই সংখ্যা মিলাইয়া অনেক কথাই জানিতে পারিয়াছ, কিন্তু যদি তোমরা এই বিষয়টির বিশেষচর্চ্চা কর, তাহা হইলে দেখিবে যে, যতটুকু শিখিয়াছ—যাহা এখনও শিখিতে বাকী আছে—তাহার তুলনায় অকিঞ্চিৎকর। বাস্তবিকই বর্ণতত্ত্ব একটি বিরাট বিষয়। রঙের কথা বলিতে বলিতে মধ্যে মধ্যে ছবি আঁকিবার সময় রঙ্গের



চিত্র ৩ — [illegible]



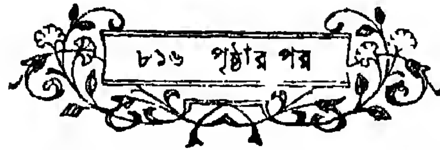
চিত্র ৪—সাদা আলো প্রথমে লাল কাচের ভিতর দিয়া যাইতে দিয়া পরে আবার সবুজ কাচের ভিতর দিয়া যাইতে দিলে সব আলোই রোধ হইয়া যায়। পর্দাটির উপর কোন রঙের আলোই পাওয়া যায় না।

ব্যবহার সম্বন্ধে সামান্য সামান্য ইঙ্গিত দিয়াছি। সে সম্বন্ধে এখানে আর একটি কথা বলিয়া এই রঙের কথা শেষ করিব। ছবিতে যে রঙ্ দেওয়া হয় তাহা সব সময় নিরর্থক বা প্রকৃতির হুবহু অনুকরণের জন্য নহে। যাঁহারা বড় বড় শিল্পী, তাঁহারা এক একটা রঙের মধ্য দিয়া এক একটা ভাবের ইঙ্গিত দিয়া থাকেন। তোমরা একটু নিবিষ্ট মনে ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মনে এক একটা ভাবের সঙ্গে এক একটা রঙ্ জড়িত আছে। ভোরের আকাশের রক্তিম আভার যে নির্মল প্রসন্নতা পূর্ব দিকে দেখা দেয়, তাহার সঙ্গে সমস্ত দিনটি ভাল করিয়া কাটুক এই আশা জড়িত থাকে নাকি? বিস্তীর্ণ প্রান্তরের দিগন্তব্যাপী সবুজ সুষমার মধ্যে চিরনবীনতার আভাস গোপন নাই কি? অন্ধকারের সঙ্গে অজ্ঞেয়তার সম্বন্ধ যে কত প্রাচীনকাল হইতে পিতৃপুরুষেরা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহার ইতিহাস আজ বিলুপ্ত। অতএব যে রঙের সঙ্গে যে ভাব জড়িত তাহার একটা তালিকা নীচে দিতেছি। মতভেদ থাকিলেও ইহা মোটামুটি ভাবে ঠিকই। রঙ্ যদি উজ্জ্বল বা স্বচ্ছ হয় তবে তাহা সর্বদাই কোনও না কোনও উচ্চ বা ভাল ভাবেই দ্যোতনা দিয়া থাকে। অপর পক্ষে যদি তাহা মলিন (dirty) বা কাল রঙ্ মিশ্র হয়, তবে তাহা কোনও নীচ ভাবে প্রকাশ করিয়া থাকে।

রঙ	ভাব
শ্বেত বা শুভ্র	পবিত্রতা, পূর্ণতা
অন্ধকারের রঙ্	অজ্ঞেয়তা
কাল (মলিন)	শোক, হতাশা, পাপ, অনিষ্ট
পিঙ্গল (গেরুয়া)	বৈরাগ্য, শুষ্কতা, কঠোরতা
ধূসর (মলিন)	দুঃখ, অনুতকার্যতা
মেটে (মলিন)	অবসাদ, অনুশোচনা
রক্তিম (ভোরের আকাশের মত)	আশা, প্রসন্নতা
রক্তিম ঈষৎ হরিৎ আভাযুক্ত)	উৎসাহ
লাল (উজ্জ্বল)	বীরত্ব
সিন্দুর (সন্ধ্যার আকাশের রঙ্)	ভালবাসা
লাল (মলিন)	অহঙ্কার
পীত (উজ্জ্বল)	জ্ঞান
পীত (মলিন)	বিশ্বাসঘাতকতা
হরিৎ (ঘাসের রঙ্)	সাফল্য, চিরনবীনতা
গাঢ় নীল (উজ্জ্বল)	গভীরতা
নীল (উজ্জ্বল)	সত্য, ন্যায়
নীল (মলিন)	নিরুৎসাহ
সবুজ (মলিন)	পরশ্রীকাতরতা, ঈর্ষা লোলুপতা
বেগুনী (violet)	স্থৈর্য



হিব্রুজাতি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট্


৮১৬ পৃষ্ঠার পর

ভগবান্ মোসেস্কে (Moses) পর্ব্বতের শিখরদেশে আরোহণ করিতে বলিলেন। মোসেস্ নেবোপর্ব্বতের উঠিতে লাগিলেন। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই। পথে নানারকম ফুল ফুটিয়াছিল, সেদিকে দৃষ্টিপাত নাই। দূরে পর্ব্বতগহ্বরে কোকিল ডাকিতেছিল, সেদিকেও কর্ণপাত নাই। তাঁহার দৃষ্টি শুদ্ধ সম্মুখ দিকে। অবশেষে তিনি পিজ্গার (Pisgah) শিখরদেশে পৌছিলেন। এখান হইতে ভগবান তাঁহাকে উত্তরে হার্মান (Hermon) ও লেবানন্ (Lebanon), পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণে আরবের রুক্ষ পর্ব্বতমালা পর্য্যন্ত সমগ্র দেশে দেখাইয়া বলিলেন—"বৎস, ঐ দেখ আমি আব্রাহাম, আইজক ও জেকবের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, এই দেশ তাহাদের সন্তান-দিগকে দিব। তুমি স্বচক্ষে ইহা দেখিলে কিন্তু এখানে তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এখানে মোসেসের মৃত্যু হয়। ভগবান্ তাঁহাকে বেথ্পিওরের (Beth-peor) নিকটে সমাধিস্থ করেন। তাঁহার কবর কোথায়, আজ পর্য্যন্ত তাহা অজ্ঞাত রহিয়াছে।

এই যে ভগবান্ যিহোবা, (Jehovah) হিব্রুজাতির ত্রাণকর্ত্তা, মোসেসকে বর্ত্তমান প্যালেষ্টাইন দেশ সেকালে এই দেশকে ক্যানান্—(Canaan) বলা হইত দেখাইয়া বলিলেন যে, তিনি আব্রাহাম, আইজাক ও জেকবের কাছে প্রতিশ্রুত আছেন যে, তাহাদের সন্তান-সন্ততিদিগকে এই দেশের অধিকার দিবেন, তাহা হইলে তাহারা কোথা হইতে আসিল, এতদিন তাহারা কোথায় ছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে এইটুকু বলা যাইতে পারে যে, তাহারা জাতিতে সেমেটিক এবং তাহাদের আদি উৎপত্তি-স্থান আরব দেশে। ইহার বেশী কিছু নিশ্চিত করিয়া বলা দুরূহ। হিব্রুজাতির শৈশবের ইতিহাস অতীতের কুহেলিকাচ্ছন্ন। এই অন্ধকার যবনিকা ভেদ করিয়া যেটুকু আলো পৌছিয়াছে, তাহা তাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ "ওল্ড্ টেষ্টামেণ্টের" (Old Testament) সাহায্যে এই পুরাণকাহিনীর কতখানি আবার ঐতিহাসিক সত্যের উপর স্থাপিত, তাহাও নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। তথাপি ওল্ড টেষ্টামেণ্টের উপরই আমাদিগকে নির্ভর করিতে হইবে।

ওল্ড টেষ্টামেণ্টের গল্প

প্রথমে ভগবান্ স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেন। আদিতে পৃথিবী ছিল আকারহীন জনশূন্য—ছিল কেবল ভীষণ অন্ধকার ও উত্তালবারিরাশি। ভগবান্ বলিয়া উঠিলেন, "আলো চাই—আলো।" দেখিতে দেখিতে আলোকের উদ্ভব হইল। এই অন্ধকার ও আলোকের সাহায্যে তিনি দিবারাত্রি, সকাল সন্ধ্যা সৃষ্টি করিলেন। ইহাই হইল জগতের প্রথম দিন।

দ্বিতীয় দিন তিনি অনন্ত আকাশ সৃষ্টি করেন। তৃতীয় দিন বিভিন্ন সাগর সৃষ্টি করিয়া তাহাদের স্থায়ী সীমা নির্দ্দেশ করেন। এইবার শুষ্ক ভূমি ও পাহাড়-পর্ব্বতের সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের আদেশমত ইহাদের

উপর তৃণ-শস্য-লতা গুল্ম-বৃক্ষাদির জন্ম হয়। চতুর্থ দিবস তিনি চন্দ্র সূর্য্য-নক্ষত্রাদির সৃষ্টি করেন। সাগরের জীবজন্তু ও আকাশে বিচরণশীল পক্ষী ইত্যাদির জন্ম পঞ্চম দিন হয়। ষষ্ঠ দিবস পৃথিবীর জীবজন্তুর উদ্ভব হয়।

তারপর ভগবানের মানুষ সৃষ্টির ইচ্ছা হয়। লাল-মাটির কণা লইয়া নিজের আদর্শ মত তিনি প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেন। এইবার প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয় তিনি মানুষকে সমগ্র চরাচরের উপর প্রভুত্ব করিতে নির্দ্দেশ করেন। এইরূপে ভগবানের সৃষ্টি শেষ হইল। সপ্তম দিন তিনি বিশ্রাম করিলেন—তাঁহার বিধানমত এইদিন পুণ্যতিথি।

এইবার ভগবান্ একটি সুন্দর জায়গায় একটি রামণীয় উদ্যান স্থাপনা করেন। এই স্থানের নাম ইডেন্ (Eden)। ইডেনের এই উদ্যানের মধ্যস্থলে তিনি একটি জীবনতরু (Tree of Life) ও একটি জ্ঞানতরু (Tree of Knowledge) রোপণ করেন। উদ্যান রক্ষার ভার দেন তাঁহার প্রিয় সৃষ্ট প্রথম মানুষ আদমের (Adam) উপর। যে কোন গাছের ফলমূল ইচ্ছা মত সে খাইতে পারে—কিন্তু সে যেন কখন জ্ঞানতরুর ফল না খায়—কারণ, এই ফল খাইলেই তাহার মৃত্যু অনিবার্য্য। ভগবান্ এই বিষয়ে তাহাকে বিশেষ সাবধান করেন।



মোসেস্

সমস্ত জীব-জন্তুর উপর মানুষের আধিপত্য। কিন্তু তবু যেন কোথায় ফাঁক রহিয়াছে। তার যে কোন সঙ্গী নাই, সে যে একা। কাজেই ভগবান্ তাহাকে গাঢ় নিদ্রাভিভূত করিয়া তাহার একটি বক্ষপঞ্জর লইয়া তাহারই মত আর একটি মানুষ সৃষ্টি করিলেন—তাহার জীবন-সঙ্গিনী হইবার জন্য। নিদ্রোত্থিত হইয়া আদম তাহারনিকট ছুটিয়া গিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিল। এখন হইতে তাহারা অনন্ত যৌবনের আনন্দে অমরাবতীতে(Paradise বাস করিতে লাগিল।

এত সুখ কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে সহিল না। ভগবানের সৃষ্টজীব জন্তুর মধ্যে সাপের মত খল আর নাই। আবার তাহার উপর সয়তান ভর করিল। একদিন সে নারীকে চুপি চুপি বলিল, "ভগবান্ কি তোমাদের সব গাছের ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন?" রমণী উত্তর করিল "জ্ঞান-তরুর ফল খাইতে নিষেধ করিয়াছেন, কারণ উহা খাইলেই মৃত্যু হইবে।" সাপ বলিল, "বাজে কথা! তোমরা মরিবে না। উহা খাইলে তোমাদের চোখ ফুটিবে। তোমরা ভগবানের মত ভাল মন্দ জ্ঞান-সম্পন্ন হইবে। এইরূপে প্রলোভিত হইয়া নারী আদমকে জ্ঞান-তরুর নিকটে লইয়া গেল। ফল দেখিয়া খাইতে ইচ্ছা হইল। একটি ফল ছিঁড়িয়া নিজে খাইল এবং আদমকে খাইতে দিল। খাইবামাত্র তাহাদের-জ্ঞান চক্ষু উন্মীলিত হইল। তাহারা দেখিয়া লজ্জা পাইল যে, তাহারা সম্পূর্ণ উলঙ্গ তাড়াতাড়ি ডুমুর গাছের পাতা ছিঁড়িয়া কটিদেশে

পরিধান করিল। সন্ধ্যাবেলা ভগবানের চরণশব্দ শুনিয়া তাহারা গাছের অন্তরালে লুকাইল। ভগবান্ আদমকে ডাকিলে সে কাঁপিতে কাঁপিতে উপস্থিত হইয়া বলিল, "আপনার চরণধ্বনি শুনিয়া লজ্জায় লুকাইয়াছিলাম।" ভগবান্ বলিলেন, "কে শিখাইয়াছে যে, তোমরা বিবস্ত্র? আমার নিষেধ অমান্য করিয়া জ্ঞানতরুর ফল খাইয়াছ,বুঝি?" আদম বলিল "নারী আমাকে ফল খাইতে দিয়াছিল, তাই আমি খাইয়াছি।" নারীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, সাপের প্ররোচনায় সে এই কাজ করিয়াছে।

এইবার ভগবান্ সাপকে অভিশাপ দিলেন যে সে ঘৃণ্য হইবে; মানুষের সঙ্গে চিরদিন তাহার শত্রুতা থাকিবে। নারীকে অভিশাপ দিলেন যে, তাহাকে গর্ভ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে ও পুরুষের দাসী হইতে হইবে। আর আদমের অবাধ্যতার শাস্তি হইল এই যে যতদিন মাটির দেহ মাটিতে না মিশিবে, ততদিন কাঁটা-ভরা পৃথিবীতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া তাহাকে আহার সংস্থান করিতে হইবে। এই অভিশাপ প্রদান করিয়া ভগবান্ তাহাদিগকে অমরাবতী হইতে বাহির করিয়া দিলেন। চোখের জল ফেলিয়া তাহারা পূর্ব্বদিকে রওনা হইল। পিছনে পড়িয়া রহিল অতীতের আনন্দ সঙ্গীত।

ইহার পর তাহাদের কেইন (Cain) ও আবেল্ (Abel) নামে দুই পুত্র সন্তান জন্মে। এখন হইতে আদম তাহার স্ত্রীর নাম রাখিল ঈভ্ (Eve)। পর পর আরও সন্তান জন্মিল। ইহারাই হইল তাহাদের নয়নের মণি। দিন দিন তাহারা বড় হইতে লাগিল। কেইন ছিল ভীমকান্তি ও শক্তিশালী কিন্তু হইলে কি হইবে? মন ছিল তার বড়ই ছোট, অন্যের ভালো সে সহ্য করিতে পারিত না। আবেল্ ছিল শান্ত ও নম্র প্রকৃতির। একদিন কেইন নূতন শস্য ও আবেল্ প্রথম মেষশাবক আনিয়া ভগবানের প্রতি নিবেদন করিল। ভগবান্ আবেলের উপহার গ্রহণ করিলেন; কেইনের নিবেদন প্রত্যাখ্যান করিয়া তিরস্কার করিলেন। হিংসায় তাহার সর্ব্বশরীর পুড়িতে লাগিল। তখন হইতে আবেলের উপর প্রতিশোধ লইবার সুযোগ সে খুঁজিতে লাগিল। অবশেষে একদিন একা পাইয়া তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার দেহ মাটি চাপা দিল। ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন ও এক-ঘরে (outcast) করিলেন। সুতরাং কেইন্ তাহার স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দেশ ছাড়া হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। যতদিন যাইতে লাগিল তাহাদের বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল; তাহারা পুত্র পৌত্র, বৃদ্ধপৌত্রাদির মুখদর্শন করিল। কিন্তু জীবনে কেইনের আর শান্তি ছিল না। কক্ষচ্যুত গ্রহের মত সে দেশ হইতে দেশান্তরে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। অবশেষে একদিন তাহার আর কোনই খোঁজ পাওয়া গেল না।

কেইনের এক বংশধরের নাম ছিল লামেক (Lamech)। লামেকের তিন পুত্র ছিল—জাবাল (Jabal), জুবাল (Jubal), আর টুবাল-কেইন (Tubal-Cain)। লামেকের দুই স্ত্রী —আদা (Adah ও জিল্লা (Zillah)। জিল্লার পুত্র টুবাল-কেইন। তাহার কন্যার নাম নামা (Naamah)।

ঈশ্বরের দয়ায় ঈভের আর একটি পুত্র জন্মে—নাম তার সেথ্ (Seth)। এইরূপে আদমের বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

মনুষ্যকন্যাদের রূপে কিন্তু দেবপুত্রদের মন টলিল। তাঁহারা মানবী বিবাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। ফলে জন্ম হইল দৈত্যদের। এইবার পৃথিবীতে পাপ প্রবেশ করিল। ইহাতে আদমের দুঃখের আর সীমা রহিল না। তাহার এক বংশধর এনক্ (Enoch) ভবিষ্যদ্বাণী করিল যে, এই পাপে জগৎ ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। তাহার কথা সবাই হাসিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু বৃদ্ধ আদম আর সহ্য করিতে পারিলেন না। ৯০০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইল। ইহার পর হঠাৎ এনক্ অন্তর্দ্ধান করিল। এইবার একে একে বৃদ্ধেরা মরিতে লাগিলেন। এনকের পুত্রের নাম মেথুসেলা (Methuselah) ও তাহার পুত্র লামেক, লামেকের পুত্রের নাম রাখা হইয়াছিল নোয়া (Noah)।

এদিকে পৃথিবীতে পাপের মাত্রা পূর্ণ হইয়াছিল। একমাত্র নোয়াই ছিলেন সাধু। ভগবান্ নোয়াকে জানাইলেন যে,তিনি মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তু ধ্বংস করিবেন। নোয়া যেন একটি জাহাজ (ark) তৈয়ারী করিয়া সপরিবারে তাহাতে আশ্রয় লয়।

ভগবানের আদেশমত নোয়া একটি জাহাজ তৈয়ারী করিলেন।তাহাতে নানা রকম পশুপক্ষী ও খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ করা হইল। নোয়া সপরিবারে জাহাজে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার তিন পুত্র—সেম (Shem) হাম (Ham) ও জাফেথ (Japheth) ও তাঁহাদের



ভার্য্যারাও তাঁহারই সঙ্গে ছিল। এইবার ভীষণ দুর্য্যোগ আরম্ভ হইল। চারিদিক হইতে কাতারে কাতারে মেঘ আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। ইহাতেও কিন্তু পাপীদের চোখ ফুটিল না। গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে সমান ভাবেই স্ফুর্ত্তির হর্‌রা চলিতে লাগিল। সাতদিন পরে বৃষ্টি আরম্ভ হইল—উঃ, সে কি বর্ষণ! যেন আকাশের ছিদ্র দিয়া দুনিয়ার সমস্ত সাগরের জল ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। এইবার সবার মনে ত্রাস উপস্থিত হইল! যে যেখানে পারিল, ছুটিয়া পলাইতে লাগিল। বৃষ্টি কিন্তু সমানভাবেই চলিতে লাগিল। চল্লিশ দিন মুষলধারে বারিপতনের ফলে সমগ্র পৃথিবী (এমন কি অভ্রভেদি পর্ব্বতশৃঙ্গ পর্য্যন্ত) জলে ডুবিয়া গেল। যেখানে যে প্রাণী ছিল সব মৃত্যুমুখে পতিত হইল। এই বিরাট্ মহাসমুদ্রে একখানি মোচর খোলার ন্যায় নোয়ার জাহাজখানি ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল।

১৫০ দিন পরে প্রবল বেগে বায়ু বহিতে লাগিল। সব মেঘ উড়িয়া চলিয়া যাওয়াতে আবার আকাশ পরিষ্কার হইল। এইবার জল কমিতে আরম্ভ করিল। স্থানে স্থানে পাহাড়ের চূড়াগুলি এতদিন পরে আবার মাথা ঠেলিয়া উঠিতে লাগিল। সপ্তম মাসে নোয়ার জাহাজ আরারাত (Arart) পর্ব্বতেগিয়া ঠেকিল। চল্লিশদিন পরে জানলা খুলিয়া নোয়া একটি দাঁড়কাক ছাড়িয়া দিলেন। উহা এদিক সেদিক উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। তিনি একটি ঘুঘুও ছাড়িয়া দিলেন—কিন্তু ডাঙ্গা দেখিতে না পাইয়া সে আবার ফিরিয়া আসিল। সাতদিন পরে নোয়া আবার তাহাকে উড়াইয়া দিলেন। এইবারে সে একটি জলপাই গাছের পাতা মুখে করিয়া আনিল। আবার সাতদিন পরে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া হইল। এবার আর সে ফিরিল না। এইবার ভগবানের আদেশমত নোয়া ও তাঁহার আশ্রিত প্রাণীরা জাহাজ হইতে বাহির হইল। যে পাহাড়ে নোয়া অবতীর্ণ হইলেন, সেখানে একটি বেদী স্থাপন করিয়া ভগবানের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করা হইল। পূর্ব্বদিকের আকাশে একটি রামধনু প্রকাশ পাইল। অন্তরীক্ষ হইতে ভগবান্ নোয়া ও তাঁহার পুত্রদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ, আমি তোমাদের ও তোমাদের বংশধরদের কাছে প্রতিশ্রুতি দিতেছি যে, আর কখনও প্লাবন হইয়া জগতের সমুদায় প্রাণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে না। আমার প্রতিশ্রুতির চিহ্ন ঐ রামধনু।" ইহার পর তিনি নোয়া ও তাঁহার পুত্রদের আশীর্ব্বাদ করিয়া সমগ্র প্রাণিজগতের আধিপত্য তাহাদের দিলেন।



নোয়া জাহাজ হইতে ঘুঘু ছাড়িয়া দিলেন

দিন দিন নোয়ার বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এইবার খাদ্যের অনটনের জন্য তাহাদিগকে নানাদিকে ছড়াইয়া পড়িতে হইল। ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা টাইগ্রিস্ ও ইউফ্রেটিস্ নদীর মধ্যবর্ত্তী দেশ হইয়া সিনারে (Shinar) উপস্থিত হইল। এখানে তাহারা একটি সহর ও গগনস্পর্শী স্তম্ভ (Tower) নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিল। উদ্দেশ্য, যেখানেই কেন তাহারা যাউক না, পুনরায় এই চিহ্ন দেখিয়া এক জায়গায় জড় হইতে পারিবে। ভগবান্ তাহাদের দম্ভ দেখিয়া বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন,

এবং যাহাতে সকলে মিলিয়া আর কাজ না করিতে পারে, সেইজন্য তিনি তাহাদের ভাষা বিভিন্ন করিয়া দিলেন। ফলে, কেহ আর কাহারও কথা বুঝিতে না পারাতে কাজ বন্ধ হইল এবং যে যেদিকে পারিল, ছত্রভঙ্গ হইল। এই স্থানের নাম ব্যাবেল্ (Babel)।

নোয়া ৯৫০ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র জাফেথের বংশধরেরা পূর্ব্বদিকে অভিযান করিয়াছিল। তাহাদের বংশধরেরাই পরে মীদ্ (Medes) ও শক (Scythians) নামে খ্যাত হয়। জ্যাফেথের পুত্র গোমেরের (Gomer) বংশধরেরাই কাইমেরিয়ান্ (Kimmerians) নামে পরিচিত। তাহারা ক্রিমিয়া (Crimea) হইতে জার্ম্মানী, গল্ প্রভৃতি দেশে ছড়াইয়া পড়ে। জাফেথের অন্যান্য বংশধরেরা গ্রীসের আইওনীয় জাতীয় লোক, ও সাইপ্রাস রোডস্ প্রভৃতি দ্বীপের অধিবাসী। তাহাদেরই একদল ইতালীর এট্রুস্কান্ (Etrucan) জাতি ও স্পেনদেশের টার্শিস্-(Tarshish) সহরের অধিবাসী। হামের বংশধরেরা মিশর, ইথিওপিয়া, লাইবিয়া প্রভৃতি দেশের অধিবাসী। ফিনিশীয়েরা, ফিলিষ্টিয়েরা (Philistine) ক্যানানের পার্ব্বত্য অধিবাসীরাও তাহারই বংশোদ্ভূত। আরব-দেশের বেদুইনরা এবং ব্যাবিলন ও সিনারের অন্যান্য সহরের স্থাপয়িতা নিম্‌রদ্‌ও (Nimrod) তাহারই বংশধর। নিম্‌রদ্ খুব পরাক্রমশালী রাজা ছিলেন। তিনি অ্যাসিরিয়া অধিকার করিয়া নিনেভে সহর পত্তন করেন।

সেমের বংশধরেরা এলামে যাইয়া সুসানগর প্রতিষ্ঠা করে। তাহারাই আসিরিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। পরে তাহারা উরুমিয়া ও ভ্যানহ্রদের মধ্যবর্ত্তী মালভূমি অধিকার করে। এখানে সেমের প্রপৌত্র হিবার (Hebar) জন্মগ্রহণ করে। তাহাদের বংশধরেরাই লেবানন পর্ব্বতের উত্তরস্থিত আরামের লোক। সেবা (Sheba), ওফির (Ophir) প্রভৃতি স্থানের অধিবাসীরাও সেমের বংশধর।*

অনেক দিন পরে টেরা (Terah) নামে হিবারের এক বংশধর দক্ষিণদিকে রওনা হন। তিনি শেষে কাল্‌ডীয়-দের উর সহরে (Ur of the Chaldees) উপস্থিত হন। সেকালে উর খুব বিখ্যাত সহর ছিল। এইখানেই টেরা স্থায়িভাবে আস্তানা গড়েন।

* নিউ টেষ্টামেণ্টের বর্ণিত মানবজাতির উৎপত্তির এই বর্ণনা সম্পূর্ণ মনগড়া। ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক ভিত্তি কিছুমাত্র নাই।

হারান্ (Haran), নাহোর (Nahor) ও আব্রাম (Abram) নামে তাঁহার তিনটি পুত্র জন্মে। অনেক-দিন পরে হারান মারা যায়। এখানকার অধিবাসীরা ছিল পৌত্তলিক। তাহাদের দেখাদেখি টেরাও পৌত্তলিক হইয়া পড়েন এবং দেবদেবীর নানারকম মূর্ত্তি গড়িয়া পূজা করিতে আরম্ভ করেন। এমন সময় আব্রাম একদিন ভগবানের বাণী শুনিতে পান—"আব্রাম্, আব্রাম্ এ দেশ ছাড়িয়া আমি তোমাকে যে দেশে লইয়া যাইব, সেখানে চল। তোমার বংশ-ধরেরা আমার প্রভাবে একটি মহৎ জাতিতে পরিণত হইবে। আমি তোমায় এবং তোমার মধ্য দিয়া পৃথিবীর সমস্ত-মানব পরিবারকে আশীর্ব্বাদ করিব।"

ভগবানের নির্দেশমত আব্রাম তাঁহার স্ত্রী সারাই (Sarai) ও ভ্রাতুষ্পুত্র লটকে (Lot) সঙ্গে লইয়া বাহির হইলেন। টেরাও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া হারান্ (Haran) নগরে উপস্থিত হইলেন। অল্পদিন পরে নাহোরও আসিয়া জুটিল। টেরার মৃত্যুর পর আব্রাম্ ও লট ক্যানানের অভিমুখে রওনা হইলেন—নাহোর থাকিয়া গেল। নানা জায়গা ঘুরিয়া তাঁহারা ক্যানানের সিশেমে (Sichem) উপস্থিত হইলেন। এখানে ভগবান্ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলিলেন, "তোমার বংশধরদের এই দেশ আমি দিব।" এখানে আব্রাম্ জিহোবার একটি বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। পরে পশুপাল লইয়া তাঁহারা বেথেলের (Bethel) পূর্ব্বদিকের পাহাড়ে গেলেন। সেখানেও একটি বেদী নির্ম্মাণ করিলেন। ইহার পরে দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। এইবার তাঁহারা মিশর অভিমুখে চলিলেন।

মিশরের প্রাচীরের নিকট উপস্থিত হইলে আব্রামের ভয় হইল পাছে সারাইয়ের রূপে মুগ্ধ হইয়া ফ্যারাও তাঁহাকে হত্যা করেন। কাজেই স্ত্রীকে ভগিনীরূপে পরিচয় দিবেন, ঠিক করিলেন। ফ্যারাওয়ের কর্ম্মচারীরা তাঁহার রূপ দেখিয়া রাজার হারেমে লইয়া গেল। রাজা খুসী হইয়া আব্রামকে নানাবিধ ধনরত্ন, দাসদাসী, গাধা বলদ উপহার দিলেন। এই পাপে ফ্যারাওয়ের পরিবারে নানারকম আপদবিপদ উপস্থিত হইল। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া সারাইয়ের মুখে প্রকৃত ব্যাপার শুনিতে পাইয়া রাজা আব্রামকে তিরস্কার করিলেন এবং সারাইকে প্রত্যর্পণ করিয়া দেশ হইতে চলিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। আব্রাম সপরিবারে বেথেলে ফিরিয়া আসিলেন। এখানে তিনি

লট্‌কে তাহার ইচ্ছামত ভূমি পছন্দ করিয়া লইতে বলিলেন। লট্ জর্দন (Jordan) নদীর উপত্যকায় চলিয়া গেল এবং সোডম (Sodom) সহরের নিকট আড্ডা গাড়িল। আবার ভগবান আব্রামের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বৎস, দেখ যতদুর দৃষ্টি চলে, সমুদয় দেশ আমি তোমাকে ও তোমার বংশধরদের দিলাম।" ইহার পর আব্রাম হিব্রন (Hebron) গিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে লাগিলেন। ভগবানের উদ্দেশ্যে এখানেও তিনি একটি বেদী রচনা করেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে এলামের অধিপতি কেদোরলাওমার (Chedorlaomer) আম্রাফেল (Amraphel) প্রভৃতি সামন্তরাজাদের সঙ্গে মিলিত হইয়া ক্যানান আক্রমণ করেন। প্রথমে তিনি রিফেম্ (Rephaim), জুজিম (Zuzim), এমিম্ (Emim) প্রভৃতি দৈত্যাদের পরাভূত করেন। তারপর তিনি আমেলাকাইট্ (Amalekites) ও আমোরীয়দের (Amorites) আক্রমণ করেন। এখানকার পাঁচজন রাজাকে পরাজিত করিয়া তাহাদের নগর লুটপাট করিয়া অনেক ধনরত্ন ও বন্দী লইয়া প্রত্যাগমন করেন। একজন লোক পলাইয়া আসিয়া আব্রামকে খবর দেয় যে, বন্দীদের মধ্যে লুটও আছে। এই সংবাদে আব্রাম নিজের লোকজন লইয়া বিদেশীদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া তাহাদিগকে বিধ্বস্ত করেন এবং লট্ ও অন্যান্য বন্দী এবং তাহাদের ধনরত্ন লইয়া প্রত্যাগমন করেন। *

ইহার পর ভগবান একদিন আব্রামকে দেখা দেন। নিজের কোন সন্তান নাই বলিয়া আব্রাম খুব দুঃখ করিতে লাগিলেন। ভগবান্ তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, আকাশে যত নক্ষত্র দেখিতেছ, তোমার বংশধরেরা সংখ্যায় তত হইবে।" ইহার পর ভগবান্ আব্রামের কাছে অঙ্গীকার করিলেন (Covenant) যে, তাঁহার ও তাঁহার বংশধরদের ক্যানান দেশ দিলেন। সন্ধ্যার সময় আব্রাম গাঢ় নিদ্রাভিভূত হইলে ভগবান্ বলিলেন, তোমার বংশধরেরা ৪০০ বৎসর বিদেশে দাসরূপে অনেক অত্যাচার সহ্য করিবে। তারপর আমি অত্যাচারীদের দণ্ড দিব ও তোমার বংশধরেরা এখানে অনেক ধনরত্ন লইয়া ফিরিয়া আসিবে।"

অনেক দিন যায়—অথচ কোন সন্তান হইতেছে না দেখিয়া সারাই তার দাসী হাগারকে (Hagar) স্ত্রীরূপে আব্রামকে দিলেন। হাগারের ইস্‌মাইল (Ishmael) নামে একটি পুত্র হইল। ১৩ বৎসর পরে ভগবান্ পুনরায় আব্রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। তিনি আব্রামের নাম আব্রাহাম (Adraham) ও সারাইর নাম সারা (Sarah) রাখিলেন। তারপর আগামী বৎসর সারার একটী পুত্র সন্তান জন্মিবে, এই ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন।

ভগবানের কথামত সারার একটি পুত্র সন্তান জন্মিল—তাহার নাম রাখা হইল আইজাক্ (Isaac) দিন দিন আইজাক বড় হইতে লাগিল। ইসমাইল তাহাকে নানাভাবে বিরক্ত করিত। ইহাতে সারার খুব রাগ হইল। তিনি আব্রাহামকে ধরিয়া ইসমাইল্ ও তাহার মাতাকে নির্ব্বাসিত করিলেন। আব্রাহাম যখন বীর সেবাতে (Beer-Sheba) ছিলেন, তখন ভগবান,তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য বলিলেন, "তোমার পুত্রকে আমার উদ্দেশ্যে অগ্নিতে উৎসর্গ কর।" আব্রাহাম যিহোভার আদেশমত পুত্রকে সঙ্গে লইয়া পাহাড়ে গেলেন। সেখানে তিনি পাথরের বেদী তৈয়ারী করিয়া তাহার উপর কাঠ সাজাইলেন। পরে আইজাককে বাঁধিয়া কাঠের উপর শোওয়াইয়া হত্যা করিবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন করিলেন। এমন সময় তিনি ভগবানের বাণী শুনিতে পাইলেন, "আব্রাহাম, তোমার পুত্রকে হত্যা করিও না। আমি তোমার ঈশ্বরভক্তি দেখিয়া বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি।" তখন আব্রাহাম দেখিতে পাইলেন যে, নিকটে একটী ভেড়া ঝোপে আট্‌কাইয়া রহিয়াছে। তিনি ভগবানের উদ্দেশ্যে এই ভেড়াটাকে উৎসর্গ করিলেন ও পুত্র আইজাককে লইয়া বীর-সেবায় ফিরিয়া গেলেন।

এই ঘটনার অনেক বৎসর পর সারার মৃত্যু হয়। আব্রাহাম তাহাকে ম্যাক্‌পেলায় (Machpelah) সমাধিস্থ করেন। পুত্র আইজাকের বিবাহ দিতে আব্রাহামের সাধ হইল। তিনি তাঁহার ভৃত্য এলিজারকে পুত্রের জন্য পাত্রী সংগ্রহ করিতে তাহার ভাই নাহোরের দেশ হারানে পাঠাইলেন। সেখানে নাহোরের পুত্র বেথুয়েলের কন্যা রেবেকাকে কূপের

* অনেকে মনে করেন, আম্রাফেল হইলেন ব্যাবিলন-রাজ হাম্মুরাবি। এই অনুমান সত্য হইলে আব্রাম হাম্মুরাবির সমসাময়িক। (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ২২০০]

নিকট দেখিয়া তাহার বিশেষ পছন্দ হইল এবং তাহাদের বাড়ীতে সে অতিথি হইয়া রেবেকার পিতা, ভ্রাতা লাবান্ ও মাতার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাঁহারা সানন্দে অনুমতি দিলেন। এলিজা



ইজাককে বাঁধিয়া কাঠের উপর শোওয়াইয়া হত্যার জন্য ছুরি উত্তোলন করিলেন

রেবেকাকে লইয়া প্রত্যাগমন করিল এবং আইজাকের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল।

ইহার ২০ বৎসর পরে তাঁহাদের এসাউ (Esau) ও জেকব (Jacob) নামে দুইটী যমজ পুত্র জন্মে। তাহাদের ১৫ বৎসর বয়সের সময় আব্রাহামের মৃত্যু হয়। এসাউ ছিল বীর, শিকারপ্রিয়; আর জেকব ছিল ধূর্ত্ত, ফন্দিবাজ।

বৃদ্ধ বয়সে আইজাক অন্ধ হন। একদিন মৃত্যু সন্নিকট বুঝিয়া পুত্র এসাউকে বলিলেন, "বৎস, শিকার করিয়া কিছু মাংস আনিয়া আমাকে তৃপ্তি সহকারে খাইতে দেও, আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব।" এসাউ শিকারে বাহির হইল। এদিকে রেবেকা জেকবকে অধিক ভাল-বাসিতেন। কাজেই, সে যাহাতে পিতার আশির্ব্বাদ পায়, সেই-জন্য ব্যস্ত হইলেন। জেকবকে বলিয়া পালের দুইটী ভাল ছাগলছানা কাটিয়া রান্না করিলেন। পরে জেকবকে এসাউর মত সাজাইয়া তাহাকে দিয়া স্বামীকে মাংস পাঠাইলেন। জেকব পিতাকে বলিল, 'পিতা, আমি আপনার আদেশ পালন করিয়াছি। এই মাংস তৃপ্তিসহকারে ভোজন করিয়া আমাকে আশীর্ব্বাদ করুন"। আইজাক বলিলেন, "কে তুমি?" জেকব উত্তর করিল, "আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসাউ।" সন্দিগ্ধভাবে আইজাক বলিলেন, "এত শীঘ্র তুমি মাংস কি করিয়া আনিলে?" জেকব পুনরায় উত্তর করিল, "ভগবানের কৃপায় পথেই শিকার মিলিয়াছিল।" তথাপি আইজাকের সন্দেহ মিটিল না। কিছুক্ষণ ভাবিয়া তিনি বলিলেন, "আচ্ছা নিকটে আইস। আমি স্পর্শ করিয়া দেখিব, তুমি

এসাউ কি না।" তারপর তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "স্বর কিন্তু জেকবের যদিও হাত এসাউর।" তারপর তিনি মাংস আহার করিয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, "ভগবান তোমাকে যেন সকল সম্পদ্ দেন। তুমি তোমার ভাইদের প্রভু হও।"

ইহার অল্প পরেই এসাউ মাংস লইয়া পিতার নিকট উপস্থিত হইল এবং আহার করিতে বলিল। আইজাক জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে তুমি?" উত্তর হইল, "আমি আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্র এসাউ। এবার কাঁপিতে কাঁপিতে আর্ত্তস্বরে আইজাক বলিলেন, "তোমার ভাই ছলনা করিয়া তোমার প্রাপ্য আশীর্ব্বাদ লইয়াছে। হায়, আমি তাহাকে তোমাদের প্রভু করিয়াছি—যথাসর্ব্বস্ব দিয়াছি।" কাঁদিতে কাঁদিতে এসাউ বলিল, "পিতঃ, আমাকেও আশীর্ব্বাদ করুন।" তখন আইজাক তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। পিতার তাম্বু হইতে বাহির হইবার সময় ক্রুদ্ধ এসাউ বলিল, "কালাশৌচ গত হইলে আমি জেকবকে নিশ্চয় হত্যা করিব।" রেবেকা একথা শুনিতে পাইয়া পুত্রকে ভ্রাতা লাবনের গৃহে পাঠাইতে মনস্থ করিলেন। তাঁহার পরামর্শমত আইজাক জেবককে হারানে লাবানের গৃহে তাহার জন্য পাত্রীসংগ্রহের জন্য পাঠাইলেন। এদিকে এসাউ ইসমাইলের কন্যার পাণিগ্রহণ করিল।

হারানে যাইবার পথে জেকব পাহাড়ে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন দেখেন যে, যিহোভা তাহাকে বলিতেছেন যে, বৎস, আমি তোমার পিতা আইজাক ও আব্রাহামের ভগবান। তুমি যেখানে শুইয়া আছ, সেই দেশ আমি তোমাকেও তোমার সন্তানদের দিব; তোমার বংশধরেরা সংখ্যায় অগণ্য হইবে। যেখানেই তুমি যাও না, আমি তোমার সাথেই থাকিব। আর এইদেশেই তোমাকে ফিরাইয়া আনিব।" নিদ্রাভঙ্গে জেকব কাহাকেও দেখিতে পাইল না। কিন্তু এখানে যে ভগবান আছেন, সে বিষয়ে তাহার দৃঢ় প্রত্যয় হইল। প্রত্যুষে সে যে পাথরের উপর শুইয়াছিল, তাহা স্মৃতিস্তম্ভরূপে স্থাপিত করিয়া শপথ করিল যে, ভগবান যদি তাহার সাথে সাথে থাকেন, তাহার অন্নবস্ত্র যোগান এবং এখানে ফিরাইয়া আনেন, তবে তাঁহার প্রতি চিরদিন তাহার অচলা ভক্তি থাকিবে। এই পাথরটির জায়গায় সে একটি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিবে এবং তাহার ধনসম্পত্তির দশমাংশ তাঁহাকে উৎসর্গ করিবে। এই স্থানের নাম সে বেথেল (Beth-el)

অবশেষে সে হারানে পৌছিল এবং চৌদ্দ বৎসর লাবানের কর্ম্ম করিয়া তাঁহার দুই কন্যা লিয়া(Leah) ও রাশেলকে (Rachel) বিবাহ করিল। আরও ছয় বৎসর সে শ্বশুরগৃহে রহিল। কিন্তু এই সময়ে ঈশ্বর তাহাকে দেশে ফিরিতে আদেশ দিলে সে স্ত্রী পুত্রদের লইয়া লুকাইয়া হারান পরিত্যাগ করিল। লাবান পশ্চাদ্ধাবন করিয়া গিলিয়াডে (Gilead) তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিলেন। কিন্তু সেখানে তাহাদের মধ্যে সখ্য স্থাপিত হইল।



জেকব রাশেলের নিকট বিদায় লইতে আসিয়া কাঁদিয়া ফেলিল

যতই সে দেশের নিকটবর্ত্তী হইতেছিল, ততই তাহার এসাউয়ের প্রতিহিংসার কথা মনে পড়িয়া ভয় হইতেছিল। ভ্রাতার ক্রোধ নিবারণের জন্য সে তাহার নিজের ধনসম্পত্তি প্রেরণ করিল এবং আনুগত্য স্বীকার করিয়া পাঠাইল। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে হঠাৎ এক ব্যক্তি তাহাকে জাপ্টাইয়া ধরিল। তখন দুইজনে সারারাত্রি মল্লযুদ্ধ চলিল। যখন

ভোর হয় হয়, তখন অজ্ঞাত যোদ্ধা বলিল, "ভোর হয়, আমাকে ছাড়িয়া দাও। আমার যাইবার সময় হইয়াছে।' জেকব বলিল, "আমাকে আশীর্ব্বাদ না করিলে আমি তোমাকে যাইতে দিব না।" যোদ্ধা জিজ্ঞাসা করিল, তোমার নাম কি?" উত্তর হইল "জেকব।" তখন যোদ্ধা বলিল, "এখন হইতে তোমার নাম আর জেকব নহে—তোমার নাম হইল ইস্রেল (Israel)—ঈশ্বরের মল্লযোদ্ধা।" জেকব তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, তাহা দিয়া তোমার দরকার কি?" তারপর তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্তর্দ্ধান করিল। এই স্থানের নাম জেকব রাখিল পেনুয়েল (Penuel)—ঈশ্বরের মুখ, কারণ এইখানে সে মুখোমুখি ঈশ্বরকে দেখিয়াও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই।

সে যাহা হউক, ইতিমধ্যে মহৎ অন্তঃকরণ এসাউয়ের রাগ পড়িয়া গিয়াছিল। সে ভ্রাতার অপরাধ ক্ষমা করিয়া তাহার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিল।

অনেক দিন পরে জেকব ইস্রেল বেথেলে ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের এক বেদী নির্ম্মাণ করে। সেখান হইতে সে বেথেলেমে গেলে রাশেল একটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পুত্রের নাম রাখা হয় বেঞ্জামিন (Benjamin) এইবার সে তাহার শৈশবের ক্রীড়াভূমি হিব্রনের অভিমুখে রওনা হয়। আইজাকের কাছে পৌঁছিলে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। এই থানেই (ইস্রেল এখন থেকে সে নূতন নামে পরিচিত হয়) বাস করিতে থাকে। তাহার দ্বাদশটি পুত্রসন্তান ছিল—রিউবেন (Reuben), সিমিয়ন (Simeon), লেভি(Levi), জুদা (Judah), ইসাকর(Issachar) জেবুলুন (Zebulun), ড্যান্ (Dan), নাফ্তালি (Naphtali) গাদ (Gad), আসের (Asher), (Joseph) ও জোসেফ বেঞ্জামিন (Benjamin)।

জোসেফকে ইস্রেল খুব ভালবাসিতেন। কিন্তু ভাইয়েরা তাহাকে মোটেই দেখিতে পারিত না। সে সর্ব্বদাই বলিত যে, সে অন্যান্য ভাইদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একদিন যখন অন্যান্য ভাইয়েরা পশুচারণের জন্য সেশেমে গিয়াছিল, ইস্রেল জোসেফকে ভাইদের খবর আনিবার জন্য পাঠাইলেন। সেশেমে আসিয়া সে শুনিল, ভায়েরা ডোথানে গিয়াছে। সে তখন ডোথান অভিমুখে রওনা হইল। দূরে তাহাকে দেখিতে পাইয়া ভাইরা নিজেদের মধ্যে পরামর্শ করিল যে, জোসেফকে হত্যা করিয়া একটি কূপে নিক্ষেপ করিবে এবং পিতাকে জানাইবে যে, কোন বন্যজন্তু তাহাকে খাইয়াছে। রিউবেন তাহাকে বাঁচাইবার জন্য বলিল, রক্তপাত করিয়া দরকার নাই, এই বনের মধ্যে কূপের মধ্যে ফেলিলেই কাজ হইবে।" জোসেফ কাছে আসিলে তাহার জামা খুলিয়া লইয়া তাহাকে কূপে ফেলিয়া দিল। ভাগ্যক্রমে উহাতে জল ছিল না। এই সময়েএকদল বণিক সেইস্থানে উপস্থিত হইল। তাহাদের দেখিয়া জুদা বলিল, "জোসেফকে হত্যা করার কি দরকার? এই বণিকেদের কাছে



জোসেফকে গর্ত হইতে বাহির করিয়া বণিক্‌দের নিক বিক্রয় করা হইল

বিক্রয় করাই ভাল।" তখন তাহাকে কূপ হইতে তোলা হইল এবং বণিকদের নিকট বিক্রয় করা হইল বণিকেরা তাহাকে মিশর দেশে লইয়া গেল।

এদিকে জোসেফের ভাইরা একটা ছাগল মারিয়া তাহার রক্তে জোসেফের জামা সিক্ত করিয়া পিতার নিকট পাঠাইল। প্রিয় পুত্রের রক্তমাখা জামা দেখিয়া ইস্রেল চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন, এ যে আমার পুত্রের জামা! ওহো, জোসেফকে কোন বন্য পশু টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া খাইয়াছে।" তাঁহার পুত্রকন্যারা সান্ত্বনা দিতে আসিল। কিন্তু তিনি প্রবোধ মানিলেন না।

এদিকে বণিকেরা জোসেফকে পোতিফার (Potiphar) নামে ফ্যারাওয়ের এক কর্ম্মচারীর নিকট বিক্রয় করিল। জোসেফ দেখিতে ছিল সুন্দর—বুদ্ধিও তার বেশ ছিল। কাজেই, পোতিফার তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতে লাগিলেন এবং নিজের কার্য্যপরিদর্শক পদে নিযুক্ত করিলেন। পোতিফারের

স্ত্রী কোন কারণে তাহাকে দেখিতে পারিত না। সে জোসেফকে তাড়াইবার জন্য তাহার স্বামীর নিকট জোসেফের বিরুদ্ধে অনেক মিথ্যা নালিশ করিল। পোতিফার তাহাকে রাজ কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন। এখানে জোসেফের সঙ্গে দুইজন ভূতপূর্ব্ব রাজকর্ম্মচারীর আলাপ হইল। একদিন জোসেফ তাহাদের স্বপ্নের ব্যাখ্যা করিল। জোসেফের ব্যাখ্যা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল এবং একজন কর্ম্মচারী মুক্তি পাইয়া পূর্ব্বপদে অধিষ্ঠিত হইলেন।

এই ঘটনার দুই বৎসর পরে একদিন ফ্যারাও স্বপ্ন দেখিয়া বিশেষ চিন্তাকুল হইলেন। মিশরের বড় বড় যাদুকর ও স্বপ্নব্যাখ্যাকারীদের তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইল। কেহই কিন্তু রাজার স্বপ্নের অর্থ বাহির করিতে সক্ষম হইল না। তখন পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীর পরামর্শ মত জোসেফকে কারাগার হইতে রাজসমক্ষে আনা হইল ফ্যারাও তখন তাহার স্বপ্নবৃত্তান্ত বলিলেন—"আমি স্বপ্নে দেখিলাম যে, আমি নীল নদের তীরে দাঁড়াইয়া আছি। এমন সময়ে সাতটি বলিষ্ঠ ও সুন্দর গরু নদীর মধ্য হইতে উঠিয়া আসিয়া ঘাসপালা খাইতে লাগিল। তারপরে আরও সাতটী গরু উঠিয়া আসিল—ইহারা কিন্তু রোগা, কুৎসিত ও অনাহারী। ইহারা আসিয়াই আগের সাতটি গরুকে খাইয়া ফেলিল। আমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। আবার খানিক পরে ঘুমাইয়া পড়িলে পুনরায় স্বপ্ন দেখিলাম যে, একটী ডালের উপর সাতটী সুন্দর শস্যশীর্ষ জন্মিয়াছে। তারপর আরও সাতটী শীর্ষ জন্মিল—ইহারা ছিল সরু ও ফাঁপা। পরের গুলি আগের গুলিকে খাইয়া ফেলিল।" জোসেফ বলিল; "এই স্বপ্নের অর্থ হইতেছে এই যে; মিশরে সাত বৎসর খুব ভাল ফসল হইবে। তারপর সাতবৎসর অজন্মা হইয়া দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইবে। কাজেই, ফ্যারাওয়ের উচিত একজন দক্ষ কার্য্য পরিদর্শক নিযুক্ত করা। সে সহরে সহরে ফসলাদি সংগ্রহ করিয়া রাখিবে। প্রথম সাত বৎসরের ৫ অংশ মজুত করিয়া রাখিলে মিশর দুর্ভিক্ষের হাত হইতে রক্ষা পাইবে।" একথা ফ্যারাওয়ের মনঃপূত হইল। তিনি জোসেফকে মিশরের প্রধান কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিলেন। তাহার নাম রাখিলেন, জাফনাথপানিয়া(Zaphnathpaaneah) এবং পোতায়ারের কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন।

জোসেফের ভবিষ্যদ্বাণী ফলিল। সাত বৎসর খুব ভাল ফসল হইল। জোসেফ নগরে নগরে শস্যাগার স্থাপন করিয়া প্রচুর পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য সঞ্চয় করিয়া রাখিল। এই সময় তাহার দুইটি পুত্র জন্মিল—মানসেহ (Manasseh) ও ইফ্রেম (Ephraim)। তারপর সাত বৎসর অজন্মা উপস্থিত হইল—দেশে দেশে খাদ্যের জন্য হাহাকার উপস্থিত হইল—শুধু মিশরেই শস্য সঞ্চিত ছিল। নানা দেশ হইতে লোকে এখানে খাদ্য ক্রয় করিতে আসিতে লাগিল। হিব্রনে জোসেফের পিতা জেকব তাঁহার দশপুত্রকে মিশরে খাদ্য সংগ্রহ করিতে পাঠাইলেন—কেবল বেঞ্জামিন পিতার নিকট রহিল।



ফ্যারাও রাত্রিতে বিছানা হইতে উঠিয়া মিশরে খুব কান্নার শব্দ শুনিতে পাইলেন

জোসেফের ভাইয়েরা তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে ভাই বলিয়া চিনিতে পারিল না। জোসেফ কিন্তু তাঁহাদের দেখিবামাত্রই চিনিতে পারিল। জোসেফ ভাইদের ভয় দেখাইয়া বলিল যে, নিশ্চয়ই তাঁহারা গুপ্তচর। তাহারা বলিল যে, তাহারা গুপ্তচর নয়...

সংলোক, খাদ্য সংগ্রহের জন্য মিশরে আসিয়াছে। তাহারা বারো ভাই—দশজন মিশরে আসিয়াছে, সর্বকনিষ্ঠ পিতার নিকটে রহিয়াছে—আর একজন বাঁচিয়া নাই। তখন জোসেফ বলিল, "বেশ তোমরা যদি সত্য কথা বলিয়া থাক, তবে নয়জন খাদ্য লইয়া দেশে গিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়া ফিরিয়া আইস— একজন জামিনস্বরূপ এখানে থাকিবে।" সিমিওকে বাঁধিয়া রাখা হইল, অন্য ভাইদের শস্য দিয়া পাঠান হইল। রাস্তায় দেখা গেল যে, শস্যের থলের মধ্যে শস্যের মূল্য ফেরত দেওয়া হইয়াছে। অজ্ঞাত অমঙ্গলের আশঙ্কায় তাহাদের বুক কাঁপিতে লাগিল।

পিতার নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি সব শুনিয়া বেঞ্জামিনকে তাহাদের সঙ্গে মিশরে পাঠাইতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু পুনরায় শস্যের প্রয়োজন হইলে নিরুপায় হইয়া তিনি অন্য পুত্রদের সঙ্গে বেঞ্জামিনকে মিশরে পাঠাইলেন। বেঞ্জামিনকে দেখিয়া জোসেফের খুব আনন্দ হইল। সে তখন তাহার কর্মচারীকে আগন্তুকদিগকে তাহার প্রাসাদে লইয়া যাইতে আদেশ করিল—এবং জানাইল যে দ্বিপ্রহরে সে তাহাদের সঙ্গে আহার করিবে। জোসেফ যখন আহারের জন্য উপস্থিত হইল তখন তাহার ভ্রাতারা তাহার পদতলে শুইয়া পড়িয়া নানারূপ উপঢৌকন প্রদান করিল। জোসেফ তখন তাহাদের স্বাস্থ্য ও পিতার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিল। বেঞ্জামিনকে দেখিয়া আনন্দে তাহার কান্না পাইতে লাগিল। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া সে খানিকক্ষণ মনের আবেগে কাঁদিল। তারপর ভাইদের কাছে ফিরিয়া আসিয়া আহারে বসিল।

ইহার পর জোসেফ তাহার কর্মচারীকে আগন্তুকদের শস্যের থলিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে বলিল। আরও বলিল যে, প্রত্যেকে শস্যের যে মূল্য দিয়াছে তাহাও তাহাদের থলিয়াতে ভরিয়া দিবে—অধিকন্তু কনিষ্ঠের থলিয়াতে তাহার রৌপ্য-পানপাত্রটিও যেন ভরিয়া দেওয়া হয়। তাহার ভায়েরা যখন সহর ছাড়িয়া খানিকটা দূরে গিয়াছে, সে তাহার কর্মচারীকে ভাইদের চৌর্য্য অপরাধে ধরিয়া আনিতে পাঠাইল। তাহার আদেশমত কর্মচারী তাহাদের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার প্রভুর রৌপ্য পানপাত্র চৌর্য্যের অভিযোগ করিল। তাহারা বিস্মিত হইয়া নিজেদের নিরপরাধ প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু থলিয়া তল্লাস করা হইলে কনিষ্ঠের নিকট হইতে পানপাত্র বাহির হইল। তখন তাহারা পুনরায় সহরে প্রত্যাগমন করিয়া জোসেফের পদতলে পতিত হইল। জুদা বলিল, "ভগবান আমাদের অপরাধ ধরাইয়া দিয়াছেন আমরা আপনার ক্রীতদাস হইলাম।" তখন জোসেফ বলিল, "তাহা কেন? তোমরা সবাই ফিরিয়া যাও—শুধু যাহার কাছে পাত্রটী পাওয়া গিয়াছে সেই আমার ক্রীতদাস হইল।" তখন জুদা অশেষ কাকুতি মিনতি করিয়া বলিল, "আমাদের পিতা বেঞ্জামিনকে কিছুতেই ছাড়িতে চাহেন নাই। শুদ্ধ আপনার কথা শুনিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন যদি তাহাকে ছাড়া পিতার নিকট উপস্থিত হই, তবে হতভাগ্য বৃদ্ধ শোকে আকুল হইয়া মারা যাইবেন। বরং দয়া করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া তাহার বদলে আমাকে দাস করা হউক। পিতার শোক আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

জোসেফ আর নিজেকে দমন করিতে পারিল না। সবাইকে বাহির হইতে বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। তারপর ভাইদের কাছে নিজের পরিচয় দিল। তাহারা ভয়ে অস্থির হইল। তখন জোসেফ তাহাদিগকে অভয় দিয়া বলিল, "তোমরা আমায় বিক্রয় করিয়াছিলে। কিন্তু সেজন্য ভয় করিও না; কারণ, তোমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ভগবান আমাকে সর্ব্বাগ্রে এই দেশে পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহারই অনুগ্রহে আমি ফ্যারাওয়ের দক্ষিণ হস্ত হইয়াছি। যাও, দেশে ফিরিয়া পিতাকে এখানে লইয়া আইস। তোমরা গোসেন প্রদেশে (Land of Goshen) থাকিবে। আমি তোমাদের ভরণ-পোষণের বন্দোবস্ত করিব।"



জোসেফ কাঁদিতে কাঁদিতে তাহার ভাইদের নিকট নিজের পরিচয় দিল

তাহারা দেশে ফিরিয়া জেকবকে জোসেফের সংবাদ দিলে প্রথমে তাঁহার বিশ্বাস হইল না। কিন্তু তাঁহাকে লইয়া আসিবার জন্য জোসেফ যে গাড়ী পাঠাইয়াছিল, তাহা দেখিয়া তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। তখন সপরিবারে তিনি মিশর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভগবান স্বপ্নে তাহাকে বলিলেন, "জেকব, কোন ভয় নাই। মিশরে তোমার বংশধরদের একটি শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করিব। আমি তোমার সঙ্গেই থাকিব আবার তোমাকে এই দেশে ফিরাইয়া আনিব।"

জোসেফের সঙ্গে জেকবের গোসেনে দেখা হইল। সে এক অপূর্ব্ব মিলনদৃশ্য। বৃদ্ধপিতা প্রিয় পুত্রকে জড়াইয়া আনন্দাশ্রু ফেলিতে লাগিলেন। জোসেফ পিতাকে ফ্যারাওয়ের সহিত সাক্ষাৎ করাইল জেকব ফ্যারাওকে বারংবার আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং ফ্যারাও তাঁহাকে সপরিবারে শস্যশ্যামল গোসেন প্রদেশে বসবাস করিতে অনুমতি দিলেন। ইহার পর বৃদ্ধ জেকব মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। অন্তিমকালে তিনি পুত্রদের আশীর্ব্বাদ করিয়া জোসেফকে অনুরোধ করিলেন, তাঁহাকে যেন দেশে পিতৃপিতামহের কবরের নিকট সমাধিস্থ করা হয়। জোসেফ অঙ্গীকার করিলে বৃদ্ধ নিশ্চিন্তমনে চির নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। পিতৃভক্ত পুত্র পিতার শেষ অনুরোধ পালন করিলেন। মহা সমারোহে জেকবকে ক্যানান দেশে ম্যাক্‌পেলার শৈল গহ্বরে কবর দেওয়া হইল। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ১৩০ বৎসর হইয়াছিল।

ইহার অনেক দিন পরে ১১০ বৎসর বয়সে জোসেফের মৃত্যু হয়। জোসেফ মৃত্যুকালে ভাইদের সাহস দিয়া বলিল, "ভয় নাই, ভগবান তোমাদিগকে এই দেশ হইতে স্বদেশে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন। প্রত্যাগমন কালে আমার দেহ-অস্থি দেশে লইয়া যাইও।" জোসেফের মৃত্যুর পর একে একে তাহার ভাইদেরও মৃত্যু হইল। যত দিন যাইতে লাগিল তাহাদের বংশধরেরা সংখ্যায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। গোসেন প্রদেশ তাহারা ছাইয়া ফেলিল। মিশরীয়দের কাছ হইতে তাহারা নানারূপ শিল্প শিক্ষা করিল। তবে তাহাদের সংস্রবে আসিয়া অবনতিও যে না হইয়াছিল, তাহা নহে। মিশরীয়েরা নানা পশুপক্ষী পবিত্র বলিয়া মনে করিত, তাহাদের মূর্ত্তির পূজা করিত। ইস্রেলের বংশধরেরাও তাহাদের দেখাদেখি এই সব মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ করিল।

মিশরের ফারাওদের মধ্যে একজন বিখ্যাত যোদ্ধার আবির্ভাব হইল তিনি ইস্রেলের বংশধরদের সংখ্যা ও শক্তি দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। কাজেই তাহাদিগকে পরিদর্শকের অধীনে বেগার খাটিতে আরম্ভ করিলেন। ইহারা তাঁহার জন্য রামসেস্ (Raamses) ও পিথোম (Pithom) সহর নির্ম্মাণ করিল। কিন্তু এত উৎপীড়ন সত্ত্বেও দিন দিন তাহাদের সংখ্যা ও শক্তি বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। শেষে ফারাও হুকুম দিলেন যে, এখন হইতে পুরুষ সন্তান জন্মিলেই তাহাকে হয় হত্যা করিতে হইবে, না হয় নদীতে ভাসাইয়া দিতে হইবে।



জোসেফের সঙ্গে জেকবের দেখা হইল। জোসেফ পিতাকে ফ্যারাওএর সহিত সাক্ষাৎ করাইল

ঐতিহাসিকেরা অনুমান করেন যে, ঐ ফ্যারাও হইলেন বিজয়ী বীর দ্বিতীয় রামসেস্।

একদিন রাজকন্যা নদীতে স্নান করিতে আসিয়া জলে প্যাপাইরাস বনে একটি ছোট প্যাপাইরাস থোলে একটী শিশুকে দেখিতে পান। তিনি তখনই বুঝিলেন যে, এ কোন হিব্রুর সন্তান। অসহায় শিশুকে দেখিয়া রাজকুমারীর দয়া হইল। তিনি ঐ শিশুর মাতাকেই উহার ধাত্রীরূপে নিযুক্ত করিলেন। শিশুটী বড় হইলে ধাত্রী তাহাকে রাজকন্যার নিকট লইয়া আসিল। তিনি তাহাকে পোষ্যপুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন এবং নাম রাখিলেন মোসেস্ (মুসা)। বিদ্বান্ পুরোহিতের শিক্ষকতায় তাঁহাকে নানা শাস্ত্রে পারদর্শী করা হইল কিন্তু স্বজাতীয়দের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার



ফ্যারাওয়ের কন্যা নদীতে স্নান করিতে আসিয়া প্যাপারাইস থোলে একটী শিশুকে দেখিতে পাইলেন

করা হইতেছিল তাহাতে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইল তিনি তাহাদের পরিত্রাণের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। একদিন তিনি অত্যাচারী এক মিশরীয়কে হত্যা করিলেন। পরদিন দুইজন হিব্রুকে ঝগড়া করিতে দেখিয়া বলিলেন, "তোমরা পরস্পরের ভাই, নিজেদের মধ্যে বিবাদ করিতেছ কেন?"

এই সব ঘটনা ফ্যারাওয়ের কানে গেলে তিনি বুঝিলেন যে, মোসেস সহজ লোক নয়। কাজেই তিনি তাহাকে মারিয়া ফেলিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। মোসেস কিন্তু মিশর হইতে পলাইয়া মিডিয়ান(Land of Median) দেশে পলাইয়া গেলেন। সেখানে তিনি জেথ্রো (Jethero)নামে এক মিদীয় সেখের কন্যা জিপ্পোরাকে (Zipporah)বিবাহ করিলেন। তাঁহাদের পুত্র হইলে নাম রাখিলেন গারসম(Gershom)। তিনি এই দেশে চল্লিশ বৎসর রহিলেন।

এদিকে ফ্যারাওর মৃত্যু হইলে হিব্রুরা অত্যাচার হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ব্যাকুল হইল। এতদিনে



মোসেস জ্বলন্ত ঝোঁপের মধ্যে অগ্রসর হইতেছেন

ভগবানের কানে তাহাদের ক্রন্দন পৌঁছিল। মোসেস তাহার পশুপাল লইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সিনাই পর্ব্বতে (Sinai) উপস্থিত হইলেন। তিনি দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলেন যে, একটা ঝোঁপে আগুন জ্বলিতেছে কিন্তু ডালপালা কিছুই নড়িতেছে না। তখন তিনি আগুনের মধ্য হইতে এই বাণী শুনিলেন, "মোসেস, পাদুকা খুলিয়া ফেল, কারণ এ স্থান পবিত্র। আমি তোমার পিতা, আব্রাহাম, আইজাক ও জেকবের

ভগবান্! আমি আমার সন্তানদের উপর মিশরে যে অত্যাচার করা হইতেছে তাহা দেখিয়াছি। তাহাদের কাতর ক্রন্দন আমার কর্ণে পশিয়াছে। তাই আমি তাহাদের পরিত্রাণের জন্য আসিয়াছি—তাহাদিগকে দুধ ও মধুর দেশে Land of milk and honey লইয়া যাইব। যাও তুমি মিশর হইতে আমার সন্তানদের লইয়া আইস।" মোসেস্ বলিলেন, "আমি কে যে ফ্যারাওয়ের নিকট যাইয়া ইস্রেলের সন্তানদের ফিরাইয়া আনিব?" ভগবান বলিলেন, "আমি তোমার সঙ্গে থাকিব। তুমি তাহাদের নেতাদের লইয়া ফ্যারাওকে বলিবে যে, ভগবান তোমাদের কাছে দেখা দিয়া তোমাদিগকে তিনদিনের জন্য অরণ্যে গিয়া যজ্ঞ করিতে বলিয়াছেন। ফ্যারাও অবশ্য রাজী হইবে না—কিন্তু আমি মিশর এমন ভাবে বিধ্বস্ত করিব যে, শেষে ফ্যারাও রাজী হইবে।" মোসেস্ বলিলেন, "নেতারা আমাকে বিশ্বাস করিবে না।" ভগবান তখন তাঁহাকে হস্তস্থিত দণ্ড নিক্ষেপ করিতে বলিলেন। নিক্ষেপ করা মাত্রই দণ্ডটি একটি সর্পে পরিণত হইল। মোসেস্ ভয় পাইলে, তাহাকে সাপের লেজ ধরিয়া তুলিতে বলিলেন। এইরূপ করা মাত্রই আবার যে দণ্ড সে দণ্ড হইল। ভগবান্ বলিলেন, "ইহা হইতে লোকে বুঝিবে, আমি তোমাকে দেখা দিয়াছি।" ইহার পরও মোসেস্ বলিলেন, "আমি ত বাক্‌কৌশল জানি না।" ভগবান বলিলেন, "ভাবনা করিও না, আমি তোমাকে শিখাইব, কি বলিতে হইবে।" মোসেস্ হতাশভাবে বলিলেন, "দেব, আমার পরিবর্ত্তে আর কাহাকেও পাঠান।" এবার ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "তোমার ভাই আরন (Aaron) তোমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছে। তুমি তোমার কর্ত্তব্য তাহাকে বলিবে, সে লোকদের বুঝাইয়া বলিবে। আমি তোমাদের জিহ্বাতে ভর করিব। আর এই দণ্ড দিয়া তুমি অনেক আশ্চর্য্য জিনিষ করিতে সক্ষম হইবে।"

এবার মোসেস্ মিশরাভিমুখে রওনা হইলেন। পথে আরনের সঙ্গে দেখা হইল। তাহারা হিব্রু নেতাদের কাছে ঈশ্বরের বাণী শুনাইল। তাহারা তাঁহাদের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া তাহাদের কথা বিশ্বাস করিল। কিন্তু ফ্যারাওকে যখন বলা হইল, তখন তিনি বলিলেন, "আমি তোমাদের ভগবানকে জানি না। আমি ইস্রেল সন্তানদের যাইতে দিব না। যাও, তোমরা কাজে যাও।" তারপর তিনি হিব্রুদের উপর অধিকতর কঠিন কার্য্যভার দিতে আদেশ করিলেন। এবার তাহারা মোসেস্ ও আরনকে ভৎর্সনা করিতে আরম্ভ করিল।

তখন মোসেস ভগবান্‌কে বলিল, "ভগবান্, এ কি করিলে? ফল যে বিপরীত হইল।" যিহোভা আবার তাহাদিগকে ফারাওয়ের নিকট যাইতে বলিলেন। এবার ফ্যারাও বলিলেন, "বেশ তোমরা যে ভগবানের প্রত্যাদেশ পাইয়াছ, কোন আশ্চর্য্য কাজ করিয়া তাহার প্রমাণ দাও।" তখন আরন মন্ত্রপূত দণ্ডটি নিক্ষেপ করিলেন। ক্ষেপণ মাত্রই উহা সর্পে পরিণত হইল। তখন ফারাও তাঁহার যাদুকরদের ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাহারাও নিজেদের যষ্টিকে সর্পে পরিণত করিল। কিন্তু আরনের সাপ অন্য সাপদের খাইয়া ফেলিল। ফারাও কঠিন হইয়া হিব্রুদের অনুমতি দিলেন না।

পরদিন প্রভাতে ফ্যারাও নদীতে স্নান করিতে গেলে মোসেস ও আরন তাঁহার সম্মুখে আসিলেন। আরন দণ্ড দ্বারা নদীকে আঘাত করিল। অমনি সমস্ত জল রক্তে পরিণত হইল। মৎস্য সকল মারা গেল। যেখানে যত জল ছিল সব রক্ত হইয়া গেল। যাদুকরেরাও উহাও করিল। এবারও ফ্যারাও অনুমতি দিলেন না।

মোসেস্ পুনরায় ফ্যারাওকে ঈশ্বরের বাণী শুনাইলেন। ফ্যারাও কিন্তু রাজী হইলেন না। তখন আরন দণ্ড উত্তোলন করিলেন। অমনি খাল বিল হইতে অসংখ্য ব্যাং উঠিয়া মিশর ছাইয়া ফেলিল। মিশরীয়দের ঘর বাড়ী ভেকে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। তাহাদের জ্বালায় সবাই অতিষ্ঠ হইল। যাদুকরেরাও অবশ্য মায়াবলে ইহা করিতে সমর্থ হইল, কিন্তু ভেকের উপদ্রব নিবারণ করিতে পারিল না। ফারাও নিরুপায় হইয়া মোসেস্‌কে বলিলেন, "এই ব্যাংদের দূর করিয়া দাও। আমি তোমাদের যাইতে দিব।" পরদিন সব ভেক মরিয়া গেল। কিন্তু তাহাদের হাত হইতে রক্ষা পাইয়া ফারাও তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইলেন। তখন দণ্ড দ্বারা ভূমি স্পর্শ করিলেন। ধূলা হইতে অসংখ্য পোকা-মাকড়ের সৃষ্টি হইল। এবারও যাদুকরেরা কোন প্রতিকার করিতে অসমর্থ হইল। তারপর গোসেন প্রদেশ ব্যতীত সমস্ত মিশর দেশ মশা-মাছিতে ভরিয়া গেল। তখন ফ্যারাও বলিলেন, রক্ষা কর, আমি তোমাদের যজ্ঞ করিতে যাইতে দিব। তবে আমিও তোমাদের সঙ্গে যাইব।"

আবার ফারাও শপথ ভুলিয়া গেলেন। এবার ভগবান পঙ্গপাল-মড়ক পাঠাইলেন। গোসেন ব্যতীত সমস্ত দেশের পশু মরিয়া গেল। ইহাতেও কোন ফল না হওয়াতে মোসেস উনান হইতে কিছু ছাই লইয়া শূন্যে ছুড়িয়া মারিলেন। এই ছাই নানা দিকে ছড়াইয়া গেল—আর লোকজন পশুপ্রাণীর শরীর ফোটকে ভরিয়া গেল। এবারও ফারাও পূর্বের মতনই ব্যবহার করিলেন।

এবার মোসেস আবার দণ্ড উর্দ্ধদিকে উত্তোলন করিলেন। অমনি ভগবান বজ্র, শিল, অগ্নিগোলক বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ... সেখানে ছিল মারা

পড়িয়া পড়িল। কেবলমাত্র গোসেন

তখন ফারাও মোসেসকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিতে বলিলেন এবং হিব্রুদের যাইতে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। কিন্তু বিপদ কাটিয়া গেলে তিনি শুধু বয়স্ক পুরুষদের যাইতে অনুমতি দিলেন। স্ত্রী-শিশুদের যাইতে দিবেন না বলিলেন। তখন মোসেস দণ্ড উত্তোলন করিলে পূর্ব দিক হইতে দক্ষিণ বায়ু উঠিল এবং তাহাতে ... পঙ্গপাল মিশর ছাইয়া ফেলিল। ফলমূল যেখানে যাহা ছিল সব খাইয়া ফেলিল। আবার ফারাও প্রতিশ্রুতি দিলেন। এবার পশ্চিম দিক হইতে বায়ু আসিয়া পঙ্গপাল উড়াইয়া লইয়া লোহিত সাগরে ফেলিল। তখন যথাপূর্বং তথাপরং। আবার মোসেস দণ্ড উত্তোলন করিলেন—কোথা হইতে গাঢ় অন্ধকার আসিয়া গোসেন ব্যতীত সমগ্র দেশ আচ্ছন্ন করিল। তিন দিন পরে ফারাও মোসেসকে শিশুদের সঙ্গে লইতে অনুমতি দিলেন। তবে পশুপাল রাখিয়া যাইতে বলিলেন। মোসেস্ কিন্তু তাহাতে রাজী হইলেন না। তখন ফারাও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহার সম্মুখ হইতে দূর হইতে বলিলেন। মোসেস্ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "আচ্ছা আমি দূর হইতেছি, কিন্তু যাইবার পূর্ব্বে ভগবানের প্রত্যাদেশ শুনাইয়া যাইতেছি। একদিন মধ্যরাত্রে তিনি মিশরের উপর দিয়া চলিয়া যাইবেন। তাহার ফলে ফারাও হইতে আরম্ভ করিয়া নগণ্য ক্রীতদাসী—এমন কি, জীবজন্তু পর্য্যন্ত প্রত্যেকের জ্যেষ্ঠ সন্তানের মৃত্যু হইবে। মিশরে ঘরে ঘরে এমন ক্রন্দনরোল উঠিবে যাহা কখনও কেহ শোনে নাই—শুনিবে না। তখন পদপ্রান্তে পড়িয়া সবাই আমাকে সদলবলে চলিয়া যাইতে মিনতি করিবে।" এই বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে মোসেস্ ফারাওয়ের সম্মুখ হইতে চলিয়া আসিলেন।

এবার হিব্রুদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়িয়া গেল। তাহারা তীর্থ করিতে যাইবার জন্য মিশরীয় প্রতিবাসীদের নিকট হইতে অলঙ্কার-পত্র ধার করিয়া আনিল। আবিব মাসের (month of Abib) দশ তারিখে প্রত্যেকে পাল হইতে একটি কচি মেষশাবক সংগ্রহ করিল। ১৪ তারিখে তাহাদিগকে বধ করিয়া আগুনে পোড়াইয়া খাবার তৈয়ারী করা হইল। তাহাদের রক্ত দরজার চৌকাঠে ছিটাইয়া দেওয়া হইল। রাত্রি হইলে তাহারা নিজের নিজের বাড়ীতে ... ... হইল। মধ্যরাত্রে ভগবান মিশরের উপর দিয়া চলিয়া গেলেন। প্রতি ঘরে জ্যেষ্ঠ সন্তান মারা গেল। এমন কি ফারাওয়ের প্রথম পুত্রও রক্ষা পাইল না। তখন সমস্ত দেশে এক বিরাট হাহাকার পড়িয়া গেল। শুধু হিব্রুদের কিছুই হইল না। কারণ যাইবার সময় ভগবান তাহাদের গৃহদ্বারে রক্তের চিহ্ন দেখিয়া তাহাদিগকে রেহাই দিয়াছিলেন। এই ঘটনাকে হিব্রুজাতি আজও ... পারিকর্ম (Pass over) বলিয়া থাকে।

মোসেস ও আরনকে ফারাওয়ের কাছে আনা হইল। তিনি তাহাদিগকে সদলবলে চলিয়া যাইতে বলিলেন। এতদিনে তাহাদের মিশরবাস শেষ হইল। ৪৩০ বৎসর পূর্ব্বে তাহারা এই দেশে আসিয়াছিল। আজ রাত্রিতে তাহারা স্বদেশ অভিমুখে রওনা হইল। এখন হইতে তাহাদের পরিত্রাণ চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইহুদীরা তাহাদের প্রথম সন্তান ও প্রথম-শিশু ভগবানকে উৎসর্গ করিতে আরম্ভ করিল। তবে তাহাদের পুত্রদের উচিত মূল্যে ভগবানের নিকট হইতে ক্রয় করা হইত।

রামসেস্ হইতে সদলবলে তাহারা পূর্ব্বদিকে রওনা হইল—সঙ্গে জোসেফের দেহ অস্থিও লওয়া হইল। ভগবান্ তাহাদিগকে পথ দেখাইয়া চলিলেন। দিনের বেলা মেঘস্তম্ভরূপে, রাত্রিকালে অগ্নিস্তম্ভের আকারে, অবশেষে তাহারা লোহিত সাগরের প্রান্তে আসিয়া বিশ্রামের জন্য শিবির স্থাপন

এদিকে ফারাওয়ের মত পরিবর্ত্তিত হইল। তিনি দেখিলেন যে, হিব্রুদের আর বেগার খাটানর জন্য পাওয়া যাইবে না। কাজেই ৬০০ যুদ্ধরথ প্রস্তুত করিয়া সসৈন্যে তিনি হিব্রুদের অনুসরণ করিয়া

লোহিত সাগরের তীরে উপস্থিত হইলেন। ইস্রেল-সন্তানদের প্রাণে সন্ত্রাসের সৃষ্টি হইল। তাহারা মোসেস্‌কে এই বিপদের জন্য তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। তখন দেবদূত তাহাদের পশ্চাতে আসিয়া মেঘের আড়ালে তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলিল। এবার ভগবান মোসেস্‌কে বলিলেন, "তোমার দণ্ড উত্তোলন করিলে সাগরের জল সরিয়া গিয়া তোমাদের যাইবার জন্য রাস্তা করিয়া দিবে। তোমরা তাহা দিয়া অপর পারে পৌছিবে।" মোসেস্ তাহাই করিলেন এবং অমনি [illegible] সাগরের জল সরিয়া গিয়া শুষ্ক রাস্তা বাহির হইল। সমস্ত রাত্রি ধরিয়া হিব্রুরা দলবলে সাগর পার হইল। যখন শেষ দল অন্য পারের নিকট পৌছিয়াছে, তখন মেঘ সরিয়া গেল। চাঁদের আলোতে ফ্যারাও দেখিলেন যে, হিব্রুরা পলাইয়া যাইতেছে। তিনি সসৈন্যে সেই রাস্তায় ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। ভোরের বেলা ভগবান ফ্যারাওয়ের সৈন্যবাহিনীর উপর ক্রোধ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। অমনি তাহাদের রথচক্র বালিতে বসিয়া গেল। ইহাতে তাহাদের মধ্যে আতঙ্ক উপস্থিত হইল। তখন ভগবানের আদেশ মত মোসেস্ সমুদ্রের দিকে হস্ত প্রসারিত করিলে, দুইধারে আবদ্ধ সাগরের জল ফিরিয়া আসিয়া পথ ভরিয়া ফেলিল। ফ্যারাও সসৈন্যে সলিল সমাধি লাভ করিলেন। একজনও রক্ষা পাইল না। ভগবান এইরূপে ইস্রেল সন্তানদের রক্ষা করিলেন। তৎ-



মিশরে [illegible]

পরে মনের আনন্দে [illegible] গানের [illegible] আরম্ভ করিল।

* ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে, এই ফ্যারাওয়ের নাম মার্নেপ্তা। তবে মিশরের ইতিহাসে এই ঘটনার কোন উল্লেখ নাই। এমন কি, মোসেসের নামের পর্যন্ত কোথাও উল্লেখ নাই। তা ছাড়া আরও অনেক কারণে এই ঘটনার সত্যতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মনে বিশেষ সন্দেহ আছে।



ভারতীয় দর্শন ও দার্শনিক

৫৭ পৃষ্ঠার পর

একটা কথা প্রায় শোনা যায় যে, দার্শনিকরা একেবারে অকর্মণ্য, জগতের কোন কাজ তাঁদের দ্বারা হয় না, অনাবশ্যক তর্কে সময় ক্ষেপণ করাই তাঁদের একমাত্র

দার্শনিক কি অকর্মণ্য ?

কাজ। এই সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। আগেকার দিনে যাঁরা দার্শনিক হইতেন, তাঁরা জগতের সব জিনিষই প্রায় জানিতে চাহিতেন—এবং জ্যোতির্বিদ্যাও জানিতেন। তাঁদের অনেক সময় আকাশের নক্ষত্রের দিকে চাহিয়া চাহিয়া কাটিয়া যাইত। কথিত আছে, এইরূপ একজন দার্শনিক একবার রাত্রে পথ চলিতে চলিতে আকাশের নক্ষত্র সকল নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ক্রমে তিনি চিন্তায় এমনই নিমগ্ন হইলেন যে, পায়ের তলায় পথের দিকে আর তাঁর মোটেই মন রহিল না। এইরূপ অন্যমনস্ক-ভাবে পথ চলিতে চলিতে হঠাৎ তিনি পথের ধারে এক কূয়ায় পড়িয়া গেলেন। যখন তাঁহার হুঁস হইল। কিন্তু কূয়ার ভিতর হইতে তিনি আর উঠিতে পারিলেন না। সাহায্যের জন্য চীৎকার করিতে লাগিলেন। এক ব্যক্তি কাছে আসিয়া জানিতে চাহিল, রাস্তা ছাড়িয়া তিনি কূয়ায় পড়িতে গেলেন কেন? দার্শনিক উত্তর করিলেন, "আকাশের নক্ষত্র-গুলির দিকে চাহিয়া আসিতেছিলাম, কূয়াটা দেখিতে পাই নাই।" আগন্তুক উত্তর করিল, "যে পায়ের নীচে মাটীর কথা ভাবিতে জানে না, অথচ আকাশের নক্ষত্র ... ঐ খানে থাকে ... কোন ... না করিয়াও ... বাড়ি চলে ...।"

সত্য হউক, মিথ্যা হউক,—এই গল্প যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁর বক্তব্য এই দার্শনিকেরা আবশ্যক ও অনাবশ্যক জ্ঞানের পার্থক্য জানেন না, এবং অনেক সময়েই অপ্রয়োজনীয় জ্ঞানের তল্লাসে তাঁদের শক্তি অপব্যয়িত হয়। পথ-ভোলা পথিক যেমন আলেয়ার আলোর পিছনে ছুটে, দার্শনিকও তেমনি বৃথা সত্যের অনুসন্ধানে জীবন ক্ষয় করেন।

দার্শনিক যে শুধু অনাবশ্যক বিষয়ের গবেষণা করেন, শুধু কথার জাল বুনেন, এবং সত্যকে মিথ্যা এবং মিথ্যাকে সত্য প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন—এর বেশী বড় কিছু করেন না—এরূপ একটা অভিযোগ

কথার জাল বুনেন

সক্রেটিসের বিরুদ্ধে তাঁর দেশবাসী এবং সমসাময়িক নাট্যকার এরিষ্টফানিস (Aristophanes) করিয়া-ছিলেন। এরিষ্টফানিস একখানি নাটকে সক্রেটিসকে উপহাস করিয়াছিলেন এই বলিয়া যে, তিনি সাধারণ লোকে যাকে সত্য বলে, তাকে অসত্য প্রমাণ করিতে পারিতেন এবং তদ্বিপরীতটিও তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। এই নাটকে ঋণে জর্জ্জরিত এক ব্যক্তিকে উপদেশ করা হইতেছে যে, যদি সে সহজে ঋণমুক্ত হইতে চায়, তবে তার সক্রেটিসের শরণাপন্ন হওয়া উচিত; কেন

না, সক্রেটিস অতি সহজেই যুক্তি দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতে পারিবেন যে, তাঁহার ঋণ নাই।

এইরূপ উপহাস দার্শনিকদিগকেও এখনও অনেক সময় শুনিতে হয়। এখনও অনেকে বলেন, দার্শনিক গবেষণার কোন উপকারিতা নাই—ইহা নিতান্তই অসার। এই উপহাসের কোন সারবত্তা আছে কি না, জানিতে হইলে, দর্শন-শাস্ত্র কি আলোচনা করে, তাহা জানিতে হয়। কোন শাস্ত্র কি আলোচনা করে না জানিয়া তাহাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করা চলে না।

মানুষের জীবন ধারা ইতর প্রাণীর জীবন ধারা হইতে এইখানে পৃথক যে, ইতর প্রাণী যেখানে শুধু প্রেরণার অনুসরণ করিয়া চলিয়া যায়, মানুষ সেখানে ভাবিয়া চিন্তিয়া কাজ করে। মানুষ অতীত এবং ভবিষ্যতের কথাই ভাবে, শুধু বর্তমানের দাস নহে। সুতরাং মানুষকে অনেক কথাই ভাবিতে হয়। সব সকল গবেষণারই বর্তমানের প্রয়োজন হয়ত না জানিতে পারে, কিন্তু কোন চিন্তাই তাই একেবারে নিষ্প্রয়োজন নহে। তা ছাড়া, যদি নিষ্প্রয়োজন চিন্তা মানুষ করে, তবে সেটা দর্শনের ভিতরই সীমাবদ্ধ নহে। তথাকথিত কার্যকরী বিজ্ঞান বিজ্ঞানও অনেক সময় এমন সব গবেষণায় মত্ত হয়, যদ্বারা জগতের কোন উপকার আপাততঃ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আরও একটা কথা—বিজ্ঞানে যেমন দর্শনেও তেমনই এমন অনেক আলোচনা আছে যাহার বর্তমান প্রয়োজনীয়তা স্পষ্ট। রাষ্ট্রে এবং সমাজে ব্যক্তির জীবনে করণীয় অকরণীয় কি, এ কথা না ভাবিয়া উপায় নাই, আর এই কথা দর্শনই ভাবে, সুতরাং দর্শন শাস্ত্র কেবলই অনাবশ্যক গবেষণায় আত্ম-রত করে, একথা সত্য নহে।

দার্শনিক কেবলই গবেষণা করেন, আর কিছুই করেন না, এমনও নয়। রাষ্ট্রে এবং সমাজে অনেক সময়ই তাঁহাকে অন্য অনেক কাজ সমাজে দার্শনিকের করিতে দেখা যায়। আজকাল অবশ্যই স্থান দেখা যায়, যিনি দার্শনিক, তিনি সমাজে হয়ত আর বিশেষ কিছুই করেন না—দার্শনিক চর্চা দ্বারাই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হইয়া যায়। কিন্তু সব সময়ই তাহা হয় না। দর্শনের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা বহু লোকই বর্তমানে জীবিকা অর্জন করিয়া থাকেন সত্য, কিন্তু এখনও অনেক স্থলে দর্শন-চর্চা জীবিকার পথ নয়। আর সব দেশে সব সময়ে এ ব্যবস্থা ছিল না।

প্রাচীন ইউরোপীয় দর্শনের প্রতিষ্ঠাতারা দার্শনিক গবেষণার দ্বারাই উদর-পূর্তির ব্যবস্থাও করিতে পারিতেন না—সেজন্য তাঁদের অন্য উপায় খুঁজিতে হইত। থেলিস নামক একজন অতি-প্রাচীন গ্রীক বা সর্বপ্রাচীন দার্শনিকের সম্বন্ধে শোনা যায় যে, তিনি নাকি খুব ভাল ব্যবসায়িক ছিলেন এবং ব্যবসায়ে প্রচুর লাভবান হইয়াছিলেন। সক্রেটিস প্লেটো প্রভৃতি অনেকেই দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন, কিন্তু তার বদলে কোন দক্ষিণা গ্রহণ করিতেন না। তাদের কাহারও কাহারও অবস্থা বেশ ভালই ছিল। অন্যেরা জীবিকার জন্য অন্য কাজ করিত। কিন্তু সক্রেটিসের সমসাময়িক কালেই এক শ্রেণীর দার্শনিকের আবির্ভাব হয়—যারা বিদ্যা বিক্রয় করিতেন—শিক্ষা দিয়া পারিশ্রমিক লইতেন। তারপর হইতে অনেক দার্শনিকই দর্শনের চর্চা দ্বারা জীবিকা অর্জনও করিয়াছেন।

সমাজে যতদিন দার্শনিক চর্চা জীবনোপায়ের পথ না হইয়াছিল, ততদিন দার্শনিককে অন্যান্যের মত একটা না একটা কিছু করিয়া থাকিতে হইয়াছে। সুতরাং তিনি নিতান্ত অকেজো লোক ছিলেন না। আর এখন যদি এমনই হইয়া থাকে, যে, দর্শনের চর্চায়ই একজনের জীবিকা নির্বাহ হইতে পারে, তাহা হইলে ইহাতেও কি প্রমাণিত হয় না যে, দর্শন অপ্রয়োজনীয় বস্তু নহে? সমাজে দার্শনিক গবেষণার প্রয়োজন না থাকিলে ইহার স্থান আদরও থাকিত না।

এ সম্বন্ধে আরও একটা কথা উল্লেখযোগ্য। ইউরোপের বিভিন্ন যুগের দার্শনিকদের জীবন আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সব সময় ঠিক একই শ্রেণীর লোকের হাতে দর্শনের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে নাই। প্রাচীন যুগে দার্শনিকেরা সবাই প্রায় গৃহী ছিলেন, শুধু তাই নয়, সমাজে ও রাষ্ট্রে তারা সব প্রকার কার্যেই যোগ দিতেন। বড় বড় কয়েকজন দার্শনিকের নাম করিলেই কথাটা স্পষ্ট হইবে। সক্রেটিস একজন গৃহী ছিলেন—তাঁর স্ত্রীপুত্রের অনেক বিবরণ আমরা পাইয়াছি এবং তিনি দেশের জন্য যুদ্ধও করিয়াছিলেন। দরিদ্র হইলেও জীবিকার জন্য তিনি বিশেষ কিছু করিতেন বলিয়া মনে হয় না—বন্ধুবান্ধবের সাহায্যে এক রকম চলিয়া যাইত।

অবস্থা সচ্ছল ছিল না বলিয়া মুখরা স্ত্রী অনেক সময়েই তাঁকে গঞ্জনা করিতেন। প্লেটো ধনীর সন্তান ছিলেন। আর, তাঁর প্রধান শিষ্য আরিষ্টটল দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডারের শিক্ষক ছিলেন।

কিন্তু মধ্যযুগে ইউরোপে দার্শনিক চিন্তা সাধারণতঃ অবিবাহিত, সংসার বিরাগী ধর্মযাজকদের আশ্রয়েই বাঁচিয়া ছিল। ইঁহাদের জীবন ধারা প্রাচীন গ্রীকদের জীবন ধারা হইতে অনেক বিষয়েই ভিন্ন ছিল।

আধুনিক যুগের দার্শনিকদের মধ্যেও বিবাহ করেন নাই, এরূপ অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁরা ঠিক সংসারত্যাগী ছিলেন না। যেমন কাণ্ট, শোপেনহর, ইত্যাদি। অনেকে আবার এমনও ছিলেন যে, দর্শন চর্চাটা তাঁদের অবসর বিনোদনের উপায় মাত্র ছিল, জীবিকার উপায় নহে। যেমন, ডিউম প্রভৃতি।

এই যে নানা যুগে নানা প্রকার লোকের হাতে দার্শনিক গবেষণা পড়িয়াছে, তার সঙ্গে দর্শনের ইতিহাসে একটা বিরাট বৈচিত্র্য আসিয়াছে। সাধারণ ভাবে দেখিতে গেলে দর্শনের মূল আলোচ্য যদিও এক, তথাপি বিভিন্ন যুগে দার্শনিকের জীবন বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের হাতে, উহা ও তাহার দর্শন বিবিধ আকার ধারণ করিয়াছে। সকলের মনোরথ এক নয়, সকলের কাম্য এবং শ্রেয়ঃও এক নয়। অতএব, শ্রেয়োবস্তুর অনুসন্ধানও সব সময় একরূপ হয় না। দর্শনের এই বৈচিত্র্য বুঝিতে হইলে, দার্শনিকদের জীবনের প্রতিও আমাদের দৃষ্টি দিতে হইবে।

কবির জীবনী জানা থাকিলে তাঁর কাব্য বুঝিতে সুবিধা হয়, সেইজন্য কাব্য-সমালোচনায় কবি জীবনীও যথাসম্ভব আলোচিত হইয়া থাকে। দর্শনের আলোচনায় ঠিক তেমনি দার্শনিকের জীবনীও বড় একটা বিবেচিত হয় না, তার কারণ, দর্শন বিজ্ঞান ও অঙ্ক শাস্ত্রের ন্যায় এমন সব সাধারণ সত্যের চর্চা করে, যাদের স্বরূপ আলোচকের জীবন ধারা অনুসারে পরিবর্তিত হয় না। ইহাই সাধারণ বিশ্বাস। কাব্যের রূপ কবির জীবন ও অভিজ্ঞতা অনুসারে ভিন্ন হয়—ইহা স্বীকৃত। কিন্তু দর্শনেরও রূপ দার্শনিকের জীবন-ধারা অনুসারে বিভিন্ন হয়—ইহা তেমন স্বীকৃত নয়। অঙ্ক শাস্ত্র কিংবা বিজ্ঞানের সত্যাসত্য গাণিতিক কিংবা বৈজ্ঞানিকের চরিত্রের উপর নির্ভর করে না। নিউটন অসচ্চরিত্র হইলেও মাধ্যাকর্ষণ সত্য হইত, এবং গ্যালিলও ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিলেও পৃথিবী সূর্যের চারিদিকেই ঘুরিত। অনেকে মনে করেন, দার্শনিক সত্যও তেমনই দার্শনিকের জীবন-ধারার সহিত অসম্পৃক্ত।

কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন যুগের দার্শনিক চিন্তার ভিতর যে একটা বৈচিত্র্য আমরা দেখিতে পাই তার কারণ তত্তদ্দেশের এবং তত্তদ্যুগের জীবন-ধারার বৈচিত্র্য। সক্রেটিস যদি খৃষ্টান হইতেন কিংবা কাণ্ট যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিতেন, অথবা প্লেটো যদি বর্তমানে আবির্ভূত হইতেন, তবে এদের চিন্তাধারা যে অন্য রকম হইত, তাহা জোর করিয়াই বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষেও দর্শনের আলোচনা সব সময় একই শ্রেণীর লোকের হাতে থাকে নাই। এবং সেই জন্য ইহারও ভিতর একটা উপভোগ্য বৈচিত্র্য রহিয়াছে। হিন্দু অহিন্দু আস্তিক নাস্তিক, গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের দার্শনিকের সাক্ষাৎ ভারতের ইতিহাসে মিলে। এবং সেই অনুসারে ভারতীয় দর্শনে একটা বিশালতা এবং বৈচিত্র্য আছে, যাহা সমগ্র ইউরোপের দর্শন বাদ দিলে আর কোথাও মিলে না, ইউরোপের যে কোন দেশকে আলাদা ভাবে ধরিলে এরূপ বৈচিত্র্য আর কোথাও পাওয়া যাইবে না। এই বিশাল ভারতীয় দর্শনের যে আলোচনা আমরা করিব, তাহা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হইবে। কিন্তু মোটামুটি ভাবে ইহার স্বরূপ বুঝিতে হইলে, বিভিন্ন যুগের দার্শনিকদের জীবন ধারার প্রতিও আমাদের যথাসম্ভব দৃষ্টি দিতে হইবে।



অশোকের উত্তরাধিকারিগণ ও মৌর্য্যবংশের পতন

৮৪২ পৃষ্ঠার পর

মহারাজ অশোকের মৃত্যু আনুমানিক ২৩৩-২৫ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে হইয়াছিল। 'অশোক—যাহার কীর্ত্তি গাইল গান্ধার অবধি জলধি শেষ' কথা অতি সত্য; সে পরিচয় তোমরা আগেই পাইয়াছ। কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি আর কোন যুদ্ধ করেন নাই। তবুও তাঁর সাম্রাজ্য হিন্দুকুশ পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে তামিল দেশের প্রান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর মৌর্য্যবংশ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না।

ধীরে ধীরে সীমান্ত প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। দেখিতে দেখিতে অশোকের এত বড় একটা সাম্রাজ্য যেন ভোজবাজির মত ভাঙ্গিয়া গেল। দেশ-বাসীর মনে একটু স্মৃতির ছাপ রাখিয়া গেল এই যে, ছেলেদের তাসের ঘরের মত মৌর্য্য সাম্রাজ্য মাটির সঙ্গে মিশিয়া গেল,—তাহার কারণ ভাবিয়া দেখিবার মত নহে কি?

তোমরা জান যে, চন্দ্রগুপ্ত স্বীয় বাহুবলে ও মন্ত্রী চাণক্যের প্রতিভাবলে মৌর্য্য সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। চাণক্যের মত কূট-নীতিজ্ঞ মন্ত্রী ইতিহাসে বড় একটা পাওয়া যায় না। রাজ্য পরিচালন কার্য্যে তিনি ধর্ম্মের বড় একটা ধার ধারিতেন না। তাঁহার শিষ্য চন্দ্রগুপ্ত গুরুর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া বলে ও কৌশলে শত্রু নিপাত করাই ক্ষত্রিয়ের পরম ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। তিনি শস্ত্র-বিজয়কে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন না। তিনি যবন পরাক্রমের সম্মুখীন হইতে ভীত হন নাই। চন্দ্রগুপ্তের পুত্র বিম্বিসারের বিষয় যদিও আমরা বিশেষ কিছু জানি না, তথাপি তিনি যে চাণক্যনীতির মূল সূত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন, এ কথা মনে করিবার কোনও হেতু নাই।

বিম্বিসারের পুত্র অশোকের রাজনীতির ধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। তোমরা জান যে, কলিঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই অশোক শস্ত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন। কলিঙ্গের যুদ্ধক্ষেত্রে হত, আহত ও কারারুদ্ধ সৈন্যের সংখ্যা দেখিয়া ও তাহাদের আত্মীয় স্বজনের হাহাকার শুনিয়া, রাজা অশোকের মনে জীবের প্রতি করুণা উপস্থিত হইল। তাহার ফলে তিনি নিজে ত যুদ্ধ বর্জ্জন করিলেনই,

অধিকন্তু নিজের পুত্র-পৌত্রদিগকে উপদেশ দিলেন, তাহারা যেন ভবিষ্যতে দেশ-জয়ের প্রতি মন না দেয় ধর্ম্ম বিজয়কেই যেন প্রকৃত বিজয় মনে করে। তোমরা তাঁহার ত্রয়োদশ শিলালিপি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার মনে এক বিরাট ধর্ম্মভাব উপস্থিত হইয়াছিল ও সেই ভাবের প্রেরণায় তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের প্রজাবর্গকে নিজের ধর্ম্মভাবে অনুপ্রাণিত করিতে তিনি অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এইজন্য তিনি অনেক স্তম্ভ ও স্তূপ প্রতিষ্ঠা করেন। সারনাথ, সাঁচী, ভরহুত প্রভৃতি স্তূপ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার ধর্ম্মাচরণের ফলে ভেরীঘোষ ধর্ম্মঘোষে পরিণত হইল (চতুর্থ শিলালিপি)। অর্থাৎ সৈন্যেরা আর ভেরীঘোষ শুনিয়া যুদ্ধ-যাত্রায় অগ্রসর হইত না। যুদ্ধ করিতে না পারিয়া মৌর্য্য-সেনা বলহীন হইয়া পড়িয়াছিল ও রাজ্য-রক্ষার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার পর আরও ভাবিয়া দেখার বিষয় অহিংসা ও ক্ষমার বাণী প্রচার করিলে শত্রু-দমন হয় না। অনেকে মনে করেন যে, অতিশয় "ধর্ম্মাচরণ, ধর্ম্মবিধান ও ধর্ম্মানুশাসনের" বলে অশোকের পরবর্ত্তী রাজারা হীনবীর্য্য হইয়া পড়েন ও ফলে মৌর্য্য-সাম্রাজ্য ধ্বংসমুখে পতিত হয়।



ভিক্ষুবেশী সম্রাট অশোক

আরও কয়েকটি কারণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। মৌর্য্য রাজাদের অমাত্যেরা প্রায়ই অত্যাচারী হইতেন। অশোকের অনুশাসন হইতেও আমরা ইহার কতক কতক আভাষ পাই।—মনে হয় তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশের অত্যাচার-পীড়িত প্রজাগণ বিদ্রোহ করিয়া মৌর্য্য রাজাদের শাসন হইতে আপনাদিগকে মুক্ত করেন।

গৃহ-বিবাদ, মৌর্য্য সাম্রাজ্য ধ্বংসের আর একটি কারণ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কারণ, মনে হয় যে, অশোকের পরবর্ত্তী রাজাদের মধ্যে সিংহাসন লইয়া প্রায়ই ঝগড়া বাধিত। ইহার প্রমাণ, আমরা প্রাচীন সাহিত্যে আভাষ পাই।

সর্ব্বশেষে, যবনদের আক্রমণ সাম্রাজ্য পতনের একটা মস্ত কারণ ছিল। আমরা একটু পরেই তোমাদিগকে যবন আক্রমণের বিষয় বলিব। প্রায় ২০৬ খৃঃ পূর্ব্বে যবনদের আক্রমণ আরম্ভ হয়। মৌর্য্যেরা ধর্ম্ম-বিজয় করিতে ব্যস্ত থাকায় যবনদের বিরুদ্ধে শস্ত্র-

বিজয় করিতে বোধ হয় কেহই অগ্রসর হইলেন না। তোমরা ভারতে মুসলমান আক্রমণের বিষয় পড়িয়াছ, নিশ্চয়। মামুদ গজনী ১৭ বার ভার আক্রমণ করিলেন। ভারতে তখন একমাত্র রাজা কেহই ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন প্রান্তের ভিন্ন ভিন্ন রাজাদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। তাহারা পরস্পরের সাহায্য করিতেন না। কিন্তু তা ছাড়া রাজাদের মনে এমন একটা তামসিক বিশী ধর্ম্মভাব আসিয়াছিল যে, তাঁহারা কর্ম্ম করিবার শক্তি হারাইয়া ফেলিয়া অলস হইয়া পড়িয়া ছিলেন। মৌর্য্যদেরও একজন রাজা শালিশূককে "ধর্ম্মবাদী, অধার্ম্মিক" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি ধর্ম্ম ধর্ম্ম করিতেন, তাঁহার ধর্ম্মের



সারনাথ স্তূপ

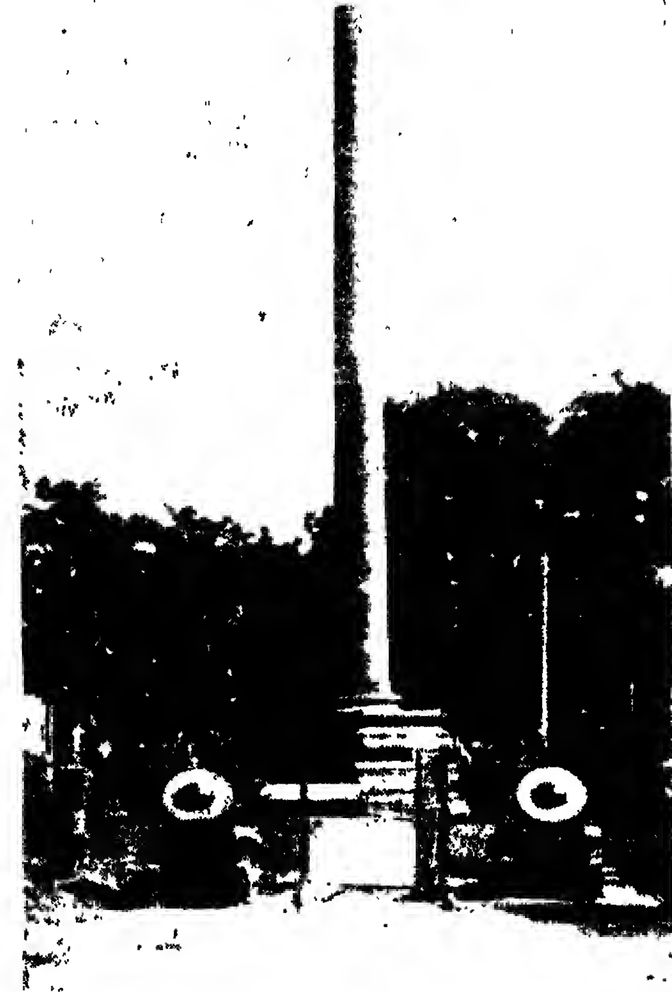
অভিমান ছিল বা ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক মতামত ছিল, কিন্তু আসলে তিনি ধার্ম্মিক ছিলেন না। মোটের উপর বলা যাইতে পারে যে, ধর্ম্মের একটা গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল। শেষের দিকে রাজারা স্বধর্ম্মপরাঙ্মুখ হইয়াছিলেন। স্বদেশ-প্রীতিরও বোধ হয় অভাব ঘটিয়াছিল। এই সব নানা কারণে মৌর্য্য রাজাদের পতন হইল।



ভরহুত স্তূপের প্রাচীর গাত্রের দৃশ্য

অনেকে মনে করেন যে, অশোক ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন। বেদের কর্ম্মকাণ্ডে অশোকের

কোনও আস্থা ছিল না—তিনি যজ্ঞে পশু-হিংসা নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি দণ্ড-সমতা ও ব্যবহার সমতা স্থাপন করিয়া ব্রাহ্মণদের বিশেষ বিশেষ অধিকার কাড়িয়া



এলাহাবাদের অশোকস্তম্ভ

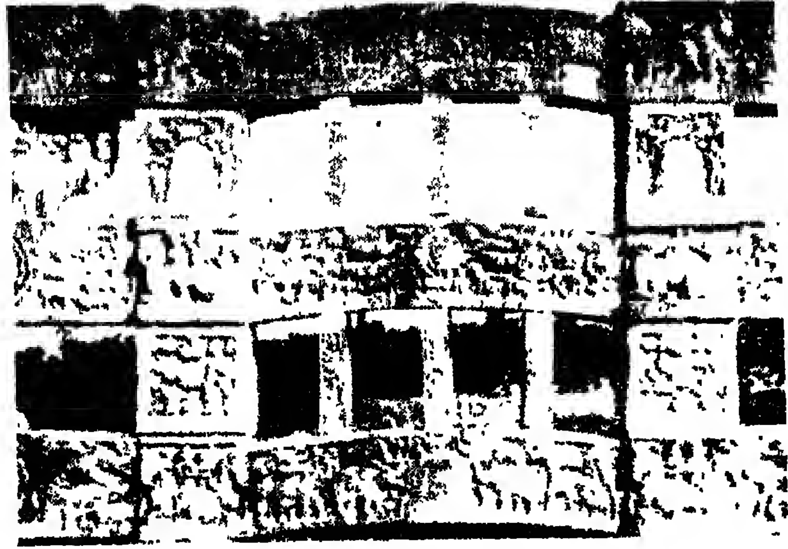
লইয়াছিলেন। ধর্ম্ম-মহামাত্র নিযুক্ত করিয়া ব্রাহ্মণদের ধর্ম্মকেও রাজকীয় শাসনের পরিচালনার বিষয়ীভূত করিয়া, তাঁহাদের ধর্ম্মস্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। এই সব কারণে ব্রাহ্মণদের মধ্যে অশান্তি উপস্থিত হইলে তাঁহারা মৌর্য্য-রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন উপস্থিত করিলেন ও তাহারই ফলে মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ভিত্তির দৃঢ়তা নষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু ইহা মনে করিবার কোনও সঙ্গত কারণ নাই—অশোকের অনুশাসন হইতেই আমরা জানিতে পারি যে, পরধর্ম্মের প্রতি তাঁহার ঔদার্য্যের অভাব ছিল না। বিরুদ্ধ মত বা ধর্ম্মের প্রতি দ্বেষভাব তাঁহার রাজ্যশাসনের মূলনীতি ছিল। তোমরা তাঁহার দ্বাদশ শিলালিপি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে যে, তাঁহার পরধর্ম্মের প্রতি কি মহান্ ঔদার্য্য ছিল। তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মণদিগকে মুক্তহস্তে দান করিতেন, ব্রাহ্মণদিগকে সম্মান করিতে তিনি বার বার করিয়া (শিলা-লিপি ও স্তম্ভলিপিতে) বলিয়া দিয়াছেন। ব্রাহ্মণদের প্রতি গর্হিত বা অনুচিত আচরণের নিন্দা করিয়াছেন। তিনি ব্রাহ্মণদেরও শুভচিন্তক ছিলেন ও ধর্ম্ম-মহামাত্রদিগকে তাঁহাদেরও কল্যাণ ও সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে বলিয়াছেন। (ষষ্ঠ স্তম্ভলিপি)

অশোকের পরবর্ত্তী মৌর্য্য রাজাদের বিষয় আমরা প্রায় কিছুই জানি না। বোধ হয়, তাঁহার পরেই তাঁহার পুত্র কুণাল রাজা হইয়াছিলেন। কুণাল ২৩২ খৃঃ পূঃ হইতে ২২৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের অনুসারে তিনি অন্ধ ছিলেন; রাজকার্য্যের ভার তাঁহার পুত্র সম্প্রতির উপর ন্যস্ত ছিল। কুণালের রাজত্বকালে তাঁহার পুত্র জালৌক

কাশ্মীরে স্বতন্ত্র রাজ্যের স্থাপনা করিয়াছিলেন। এইরূপে বিশাল মৌর্য্য সাম্রাজ্যের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড হইতে আরম্ভ হইল। বোধ হয়, অন্ধ্র দেশও এই সময়ে স্বাধীন হইয়াছিল।

খৃঃ পূঃ ২২৪ অব্দের কাছাকাছি কুণালের মৃত্যু হইয়াছিল ও তাঁহার অন্যতম পুত্র দশরথ রাজা হইয়াছিলেন। দশরথ যে প্রকৃতপক্ষে রাজা ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তিনি গয়ার নিকট নাগার্জ্জুনী পর্ব্বতে তিনটি কৃত্রিম গুহা খনন করাইয়া আজীবকদিগকে দান করিয়াছিলেন। গুহাগুলির ভিত্তিগাত্রে উৎকীর্ণ লিপিতে এই দানের উল্লেখ আছে।

সম্রাট দশরথের সময় বোধ হয় কলিঙ্গদেশ, মৌর্য্য সাম্রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া গিয়াছিল। তিনি প্রায় খৃঃ পূঃ ২২৪ হইতে খৃঃ পূঃ ২১৬ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।



সাঁচী স্তূপের তোরণদ্বারে ক্ষোদিত চিত্র

দশরথের মৃত্যুর পর সম্প্রতি রাজা হইয়া হইয়াছিলেন। তিনি দশরথের ছোট ভাই ছিলেন। অশোকের সময় হইতেই তিনি রাজ্য পরিচালন কার্য্যে ঘনিষ্ঠ ভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। কুণাল ও দশরথের সময় শাসন-সূত্র তাঁহারই হাতে ছিল, এরকম মনে করিবার কারণ আছে। জৈন-সাহিত্যে অশোকের পরই সম্প্রতিকে রাজা বলা হইয়াছে। কিন্তু বাস্তবিক তিনি অশোকের ষোল বৎসর পরে রাজ্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

বৌদ্ধ সাহিত্যে অশোকের যে স্থান, জৈন সাহিত্যে সম্প্রতি ও সেই স্থান অধিকার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও উন্নতি কল্পে অশোক যে প্রকার অক্লান্ত চেষ্টা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জৈনধর্ম্মের জন্যও সেই প্রকার করিয়াছিলেন। এমন কি, অনার্য্য দেশেও তিনি জৈন শ্রমণদের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার আত্মপর জ্ঞান ছিল না। তিনি অশেষ প্রকারে প্রজাদের কল্যাণের নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি অনেক স্থানে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে অন্নদানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

বোধ হয় তাঁহার অপর এক নাম চন্দ্রগুপ্ত ছিল। ইঁহাকে চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় বলা যাইতে পারে। তাঁহার সময়ে দ্বাদশ বৎসরব্যাপী দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে, দুর্ভিক্ষের প্রারম্ভেই তিনি জৈন সাধু আচার্য্য ভদ্রবাহুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া তাঁহার সহিত দক্ষিণ দেশে গমন করিয়াছিলেন ও তথায় মহীশূর প্রদেশের শ্রবণ বেলগোলা নামক স্থানে গুরুর সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি

খৃঃ পূঃ ২০৭ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন।

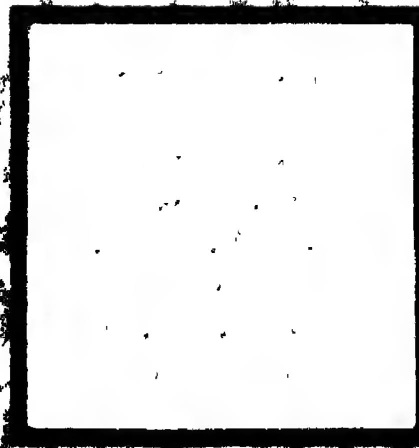
সম্প্রতির পর শালিশূক রাজা হইলেন। দুর্ভিক্ষের ফলে রাজ্যে নিশ্চয়ই নানারূপ বিশৃঙ্খলা ঘটিয়াছিল। তাহার উপর আবার সিংহাসনের নিমিত্ত গৃহবিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। মৌর্য সাম্রাজ্যের যা কিছু জীবনী শক্তি অবশিষ্ট ছিল, তাহাও এইবার নষ্ট হইল। বোধ হয় এই গৃহকলহের ফলে সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম ভাগ পৃথক হইয়া গিয়াছিল। সুভাগসেন নামক রাজবংশের কোনও ব্যক্তি আফগানিস্থান ও পাঞ্জাবের অংশ বিশেষে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন।

শালিশূক অতি অল্প কালই রাজ্য করিয়াছিলেন। তিনি অত্যাচারী ছিলেন ও ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম করিতেন। গার্গী-সংহিতা নামক একটি প্রাচীন পুস্তকে তাহাকে "ধর্ম্মবাদী অধার্ম্মিক" বলা হইয়াছে। অর্থাৎ তিনি প্রকৃত ধার্ম্মিক ছিলেন না। ধর্ম্মের ভাণ মাত্র করিতেন বা তাহার ধর্ম্মের বাহ্যাড়ম্বর মাত্র ছিল। এই সময়ে জাতীয় ইতিহাসে আর এক বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। আলেকজাণ্ডারের অভিযানের পর কিছুদিন ভারত বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে মুক্ত ছিল। এবার পুনরায় বিদেশী আক্রমণ আরম্ভ হইয়াছিল। ২০৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে সিরিয়ার রাজা Antiochus the Great হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছিলেন ও সুভাগসেনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাহার সহিত সখ্যতা স্থাপন করিয়াছিলেন ও দেড়শত হস্তী উপহার লইয়া নিজের দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু বাহ্লীক প্রদেশের স্বাধীন রাজারা Antiochus এর অভিযানের কিছুদিন পরেই ভারত আক্রমণ করিয়া, সাকেত, পাঞ্চাল ও মথুরা জয় করিয়া অবশেষে পাটলিপুত্রে পৌঁছিয়াছিল। অবশ্য এই বিদেশীরা মধ্যদেশে বেশীদিন স্থায়ী হইতে পারে নাই। তাহাদের নিজেদেরই মধ্যে গৃহ-বিবাদ উপস্থিত হওয়ায়, তাহারা ফিরিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু তাহা হইলেও মৌর্য সাম্রাজ্য এই আক্রমণের পর আর বেশী দিন টিকিয়া থাকিতে পারে নাই।

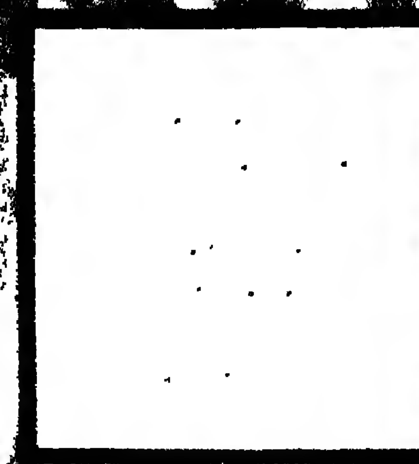
শালিশূকের পর দেববর্ম্মা খৃঃ পূর্ব্ব ১০৬ অব্দে রাজা হইয়াছিলেন। গ্রীকেরা এখনও ভারত আক্রমণ হইতে বিরত হয় নাই। বাহ্লীক দেশের গ্রীক রাজা ইউথিডেমসের পুত্র ডেমেট্রিয়স আন্দাজ ১০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দেই ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন ও পশ্চিমোত্তর ভারতের কোনও কোনও অংশ জয় করিয়াছিলেন। বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের আর প্রায় কিছুই অবশিষ্ট রহিল না।

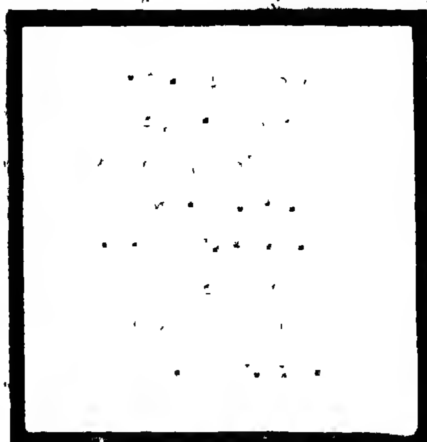
শালিশূকের পুত্র শতধন্বা ১৯৯ খৃঃ পূর্ব্ব হইতে ১৯১ খৃষ্ট পূর্ব্ব পর্যন্ত নামমাত্র রাজা ছিলেন। তাহার সময় গ্রীকেরা বেশ ভাল করিয়া পাঞ্জাবে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল। ডেমেট্রিয়স তাহারি সমকালীন ছিলেন। গ্রীক লেখকেরা তাহাকে ভারতের রাজা বলিয়াছিলেন। তাহারই সময়ে বোধ হয় বিদর্ভ স্বাধীন হইয়াছিল।

শতধন্বুর ছোট ভাই বৃহদ্রথ (১৯১ খৃঃ পূর্ব্ব—১৮৪ খৃঃ পূর্ব্ব) মৌর্য্য বংশের অন্তিম সম্রাট—ইনি নিজের সেনাপতি ব্রাহ্মণ, শুঙ্গবংশীয় পুষ্যমিত্রের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

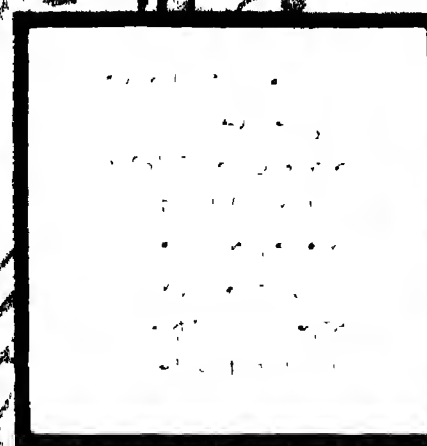



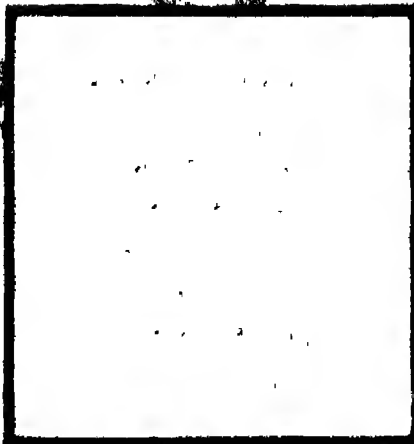


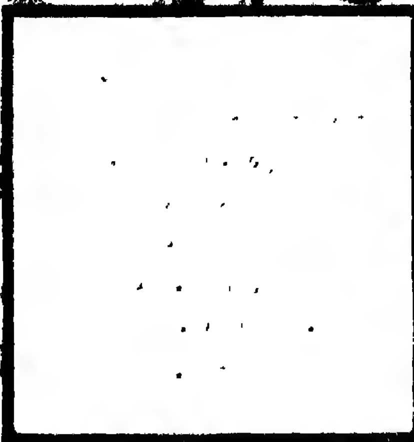


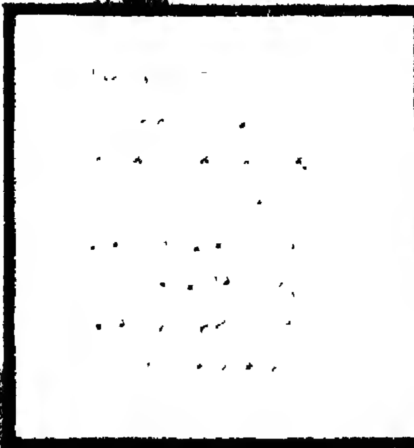





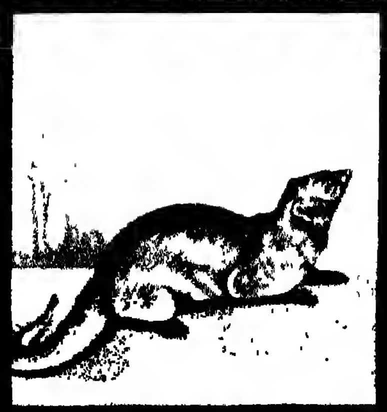






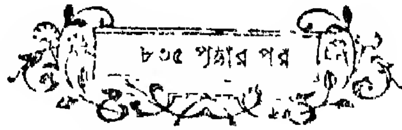








বৌদ্ধ-নারী


৮৩৫ পৃষ্ঠার পর

[illegible] কি ধনী, দরিদ্র, নির্বিশেষে [illegible] রমণীর উপর অদ্ভুত [illegible] বিস্তার করিয়াছিলেন। ধর্মের দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া নির্বাণ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সংসার ত্যাগ করিয়া পবিত্র জীবন যাপন করিতেন। বুদ্ধের বাণী অনেক নর্তকীর জীবনধারা পরিবর্তিত করিয়া দিয়াছিল। শাক্য পরিবারের মহিলাগণ সর্ব্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্মে আসক্ত হইয়াছিলেন। বুদ্ধের জ্ঞান, ধর্ম ও বৌদ্ধ-সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের আচার ব্যবহারের পদ্ধতির কথা, শাক্যবংশের বহু রমণী, গৃহকর্ত্রী, বধূ এবং কন্যা শ্রবণ করিতেন। এই সমস্ত রীতিনীতি তাহাদের চিত্তে গভীর শ্রদ্ধার উদ্রেক করে। সংসার ত্যাগ করিয়া ভগবান্



গৌতম বুদ্ধ

বুদ্ধদেবের এবং শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ [illegible] কঠোর সংযম ও সাধনার দ্বারা তাঁহারা অন্ত অর্হত্ব অর্থাৎ নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব স্ত্রীলোকদিগকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তাঁহার মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমী অনেকবার অনুনয়, আকুতি ও মিনতি করায় তিনি স্ত্রীলোকদিগকে বৌদ্ধ-ধর্মে প্রবেশ করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতি গোতমী পাঁচ শত শাক্য-রমণী সঙ্গে লইয়া বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। এইরূপে দীক্ষিত হইয়া তিনি ভগবান বুদ্ধের সম্মুখে গমন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ধর্ম সম্বন্ধে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং আরও কতকগুলি

শাক্য মহিলা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষালাভ করিবার পর বৌদ্ধধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। যদিও তাহার মাসী অনেক বার জিদ করায় স্ত্রীলোকদিগকে সঙ্ঘে প্রবেশ করিতে দিয়াছিলেন, তথাপি তিনি স্ত্রীলোকদিগকে ভাল চক্ষে দেখিতেন না, ইহা বেশ বুঝা যায়।



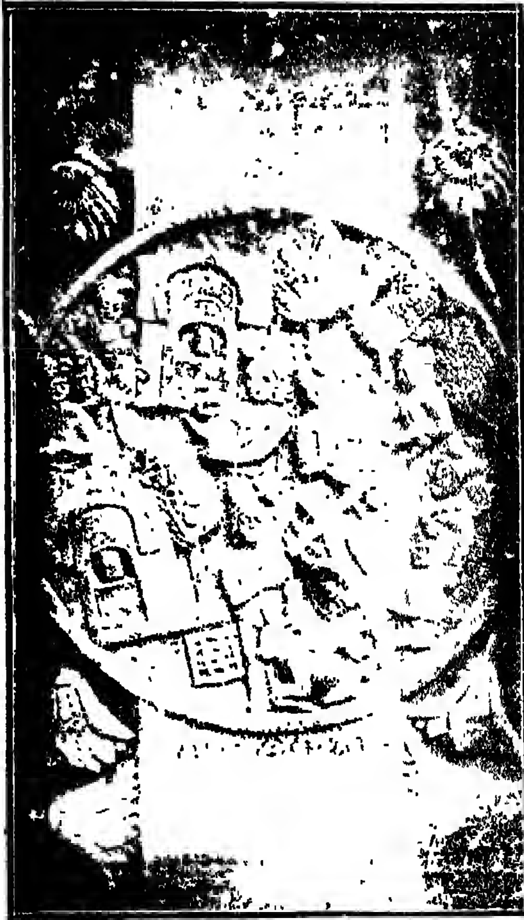
মহাপ্রজাপতি গৌতমী

বৌদ্ধযুগে ক্রীতদাসী রাখার প্রথা ছিল। দাসীর উপর প্রভুর সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। প্রভুর অনুমতি ব্যতীত তাহারা বিবাহ করিতে পারিত না। কোশলের রাজা পসেনজিৎ যখন মহানামের দাসীকন্যা মল্লিকা বিবাহ করেন তখন তাঁহাকেও মহানামের অনুমতি লইতে হইয়াছিল। যোগ্যতার প্রমাণ দিতে পারিলে দাসী রমণীকে স্বাধীনতা দেওয়া হইত। যেমন দেখা যায়, অনাথপিণ্ডিকের ক্রীতদাসী-কন্যা একজন ব্রাহ্মণকে তর্কবিচারে পরাজিত করিয়া ধর্মানুরাগী মনের পরিচয় দিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করিয়াছিল। দাসীরা অশিক্ষিত থাকায় এবং নীচ-বংশে জন্মগ্রহণ করায় চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে দ্বিধা করিত না। কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের মহিষী শ্যামাবতীর একটি দাসী ছিল। মহিষী শ্যামাবতী দাসীকে রোজ ফুল কিনিতে দিতেন। সে অর্দ্ধেক দামে ফুল কিনিয়া বাকী অর্দ্ধেক চুরি করিত। কিন্তু একদিন বুদ্ধদেব চারিদিক ... উপদেশ দিতেছিলেন। সেই উপদেশ শুনিয়া দাসীর মন ফিরিয়া গেল। সেদিন সে পুরা দাম দিয়া অনেক ফুল আনিল। রাণী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ তুমি এত ফুল আনিলে কি করিয়া?" সে বলিল, "এতদিন আমি চুরি করিয়াছি। বুদ্ধদেবের উপদেশ শুনিয়া আমি চুরি ত্যাগ করিয়াছি, তাই পুরা দাম দিয়া এত ফুল আনিয়াছি।" রাণী তাহাকে বকিলেন না, বরং বুদ্ধদেব যাহা উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে বলিলেন। বুদ্ধদেব যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সে আগাগোড়া বলিল। এই শুনিয়া রাণী খুব খুসী হইলেন। সেই অবধি রাণী তাহাকে মায়ের মত দেখিতে লাগিলেন ও উপদেশ শুনিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, "তুমি প্রত্যহ বুদ্ধের কাছে যাইবে এবং



শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত বুদ্ধদেব

তিনি যে উপদেশ দিবেন, তাহা আমাকে বলিবে।" ক্রমে ক্রমে সেই দাসী সমুদয় ত্রিপিটক (পালি সাহিত্য তিনটি ভাগে বিভক্ত এবং ঐ তিনটি ভাগকে ত্রিপিটক বলা হয়) আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বৌদ্ধযুগে ক্রীতদাসীর অবস্থা বাস্তবিকই শোচনীয় ছিল। দাসীদের প্রতি প্রভুরা অত্যন্ত অত্যাচার করিত এবং এমন কি লাথি ঘুসি পর্যন্ত ব্যবহার করিতে ছাড়িত না। এই যুগে



শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডক

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া সঙ্গত। গৃহকর্ত্রী দাসীকন্যার চুল ধরিয়া প্রহার করিতেন বলিয়া সে একদিন নাপিতের দ্বারা মস্তক মুণ্ডন করিয়া আসিল। অতঃপর রজ্জুর দ্বারা তাহার মস্তক বাধিয়া গৃহকর্ত্রী তাহাকে শাস্তিদান করিতেন। গৃহকর্ত্রীর অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যার জন্য সে বনে গমন করিয়াছিল। রোমের ক্রীতদাসীরা ভারতের ক্রীতদাসীদের মত প্রভুর সম্পত্তিরূপে পরিগণিত হইত।

সংযুক্তস্থ বধ যাঁহারা, তাঁহারা বিশেষভাবে পতির অনুরাগিণী হন। নিজেদের ব্যক্তিগত সুখ শান্তি

পতিভক্তি

পতির জন্য বিসর্জন দিতে তাঁহারা কখনও দ্বিধা বোধ করেন না এবং শিশুদের সেবার জন্য তাঁহারা সর্বদাই ব্যস্ত। নারীর পাতিব্রত্যের একটি জাজ্বল্যমান উদাহরণ পাওয়া যায়। একদা কয়েকজন দস্যু শ্রাবস্তী নগরের কোনও ভূম্যধিকারীকে এবং তাহার পত্নীকে আক্রমণ করে।

স্ত্রীলোকটি অত্যন্ত সৎ, ধর্মশীলা এবং পতিগতপ্রাণা ছিলেন। তিনি স্বামীর প্রাণরক্ষার জন্য দস্যু সর্দারের পদতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন, "হে প্রভু, আপনি যদি আমার স্বামীকে বধ করেন, তবে আমি বিষ পান করিয়া অথবা নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করিব। আমি কিছুতেই আপনার সঙ্গে থাকিব না। সুতরাং আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচান।" এইরূপে সেই মহিলাটি স্বামীর ও নিজের প্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ধর্মপ্রাণা রমণীর দৃষ্টান্ত প্রচুর পাওয়া যায়। **সুজাতার** উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। সুজাতা অত্যন্ত ধর্মপ্রাণা, কর্তব্যপরায়ণা ও দয়াশীলা রমণী ছিলেন। তিনি তাহার স্বামী ও শ্বশুরের প্রতি কর্তব্য অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। **অসিতাভূর** কথাও আমরা উল্লেখ করিতে পারি। তিনি যেমন সুন্দরী ছিলেন, ধর্মের প্রতি তাঁহার আসক্তিও তেমনি প্রবল ছিল। তাহার স্বামী তাহার প্রতি অশ্রদ্ধা বা অবহেলা করিতেন। স্বামীর এই অবহেলা তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে নাই। একদা তিনি বুদ্ধের দুইজন প্রধান শিষ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়া নানাপ্রকারের উপহার প্রদান করেন। অবশেষে তাঁহাদের উপদেশে তিনি সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হন এবং বুঝিতে পারিলেন যে স্বামীর তাঁহাকে প্রয়োজন নাই, তখন তিনি সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। কালে তিনি ঋষিত্ব লাভ করেন। এইরূপ দৃষ্টান্ত বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক আছে।

বৌদ্ধযুগে স্বামীর নামে স্ত্রীলোকের পরিচয় দিবার রীতি ছিল। গৌতম বুদ্ধের সময়ে ভাই, ভগিনী,

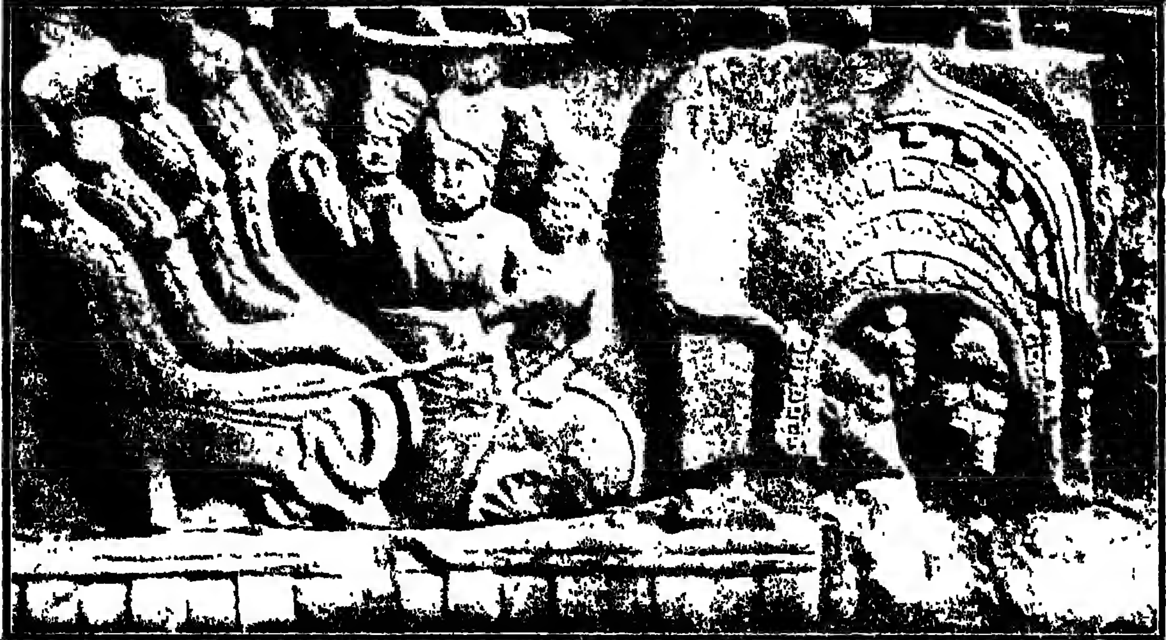
স্বামীর নামে স্ত্রী লোকের পরিচয়

খুড়তুত ও মাসতুত ভাই বোন এ সকলের বিবাহ প্রচলিত ছিল।

বিবাহ রীতি

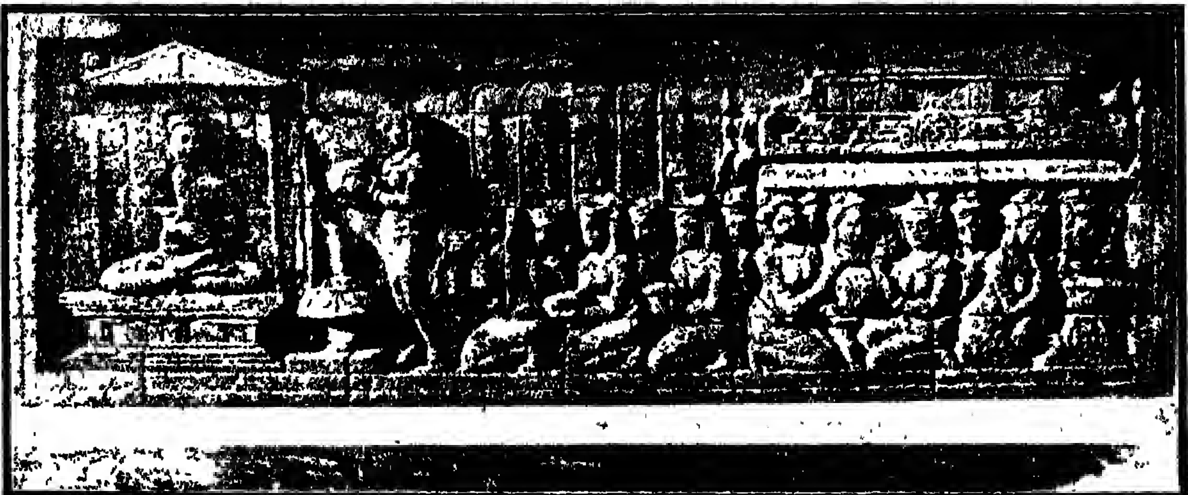
যে বংশে গৌতম বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন সেই বংশেই ভগিনী বিবাহের প্রচলন ছিল কিন্তু বেশীর ভাগ সময়েই

বাপ মা পছন্দ করিয়া দিত। মেয়ে একটু বড় হইয়া উঠিলে সে স্বয়ংবরা হইত। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম যে না দেখা যাইত, তাহা নহে। মেয়ে পছন্দ করিলেও বাবা বিবাহ দিতেন না। গান্ধর্ব বিবাহ



কোশলরাজ প্রসেনজিৎ

সেকালে ছিল। বাবাকে কিছু না বলিয়া যুবক যুবতী বিবাহ করিত; শেষে সমাজ সে বিবাহ মঞ্জুর করিয়া লইত।



পায়সান্ন হস্তে সুজাতার বুদ্ধদেবের নিকট আগমন

সে সময়ে তিন প্রকারের বিবাহ-রীতি প্রচলিত ছিল:--(১) উভয় পক্ষের অভিভাবকের দ্বারা স্থিরীকৃত বিবাহ, (২) স্বয়ংবর বিবাহ এবং (৩) গান্ধর্ব বিবাহ।

প্রথম বিবাহটিকে আমরা প্রজাপত্য বিবাহের অনুরূপ বলিতে পারি। অর্থের নহে, বর্ণের সমতা এ বিবাহের প্রধান বিবেচ্য বিষয়। প্রমাণ স্বরূপ শ্রাবস্তীর কোষাধ্যক্ষ মিগারের উল্লেখ করা যায়। সাকেতের কোষাধ্যক্ষ ধনঞ্জয় যখন মিগারের পুত্রের সহিত তাহার কন্যা বিশাখার বিবাহের কথা আনিয়াছিল, তখন মিগার সে প্রস্তাবে সম্মত হইবার পূর্ব্বে কুল-

শীলের সমতাই বিশেষভাবে যাচাই করিয়া লইয়াছিল, বিবাহে জাতি বা বংশ-মর্যাদার বিচার করা হয় নাই। কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ,শাক্য মহানামের দাসী-কন্যাকে বিবাহ করিয়া মহাসমারোহে শ্রাবস্তীতে লইয়া গিয়াছিলেন। এই বালিকার নাম ছিল মল্লিকা এবং সে অপূর্ব রূপের জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। প্রসেনজিৎ শাক্যদের দ্বারা বুদ্ধ পরিবারের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ইচ্ছায়, শাক্য-কুমারীর পাণিপ্রার্থী হইলে, তিনি শাক্যদেব দ্বারা প্রতারিত হন।

তাহারা শাক্যপ্রধান মহানামের দাসী কন্যা বাসবখত্তিয়াকে তাঁহার কাছে প্রেরণ করে। প্রসেনজিৎ এবং বাসবখত্তিয়ার পুত্র বিরূঢ়ক এই প্রতারণার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। অশোক কোনও বণিকের দেবী নাম্নী কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কালে এই পত্নীর গর্ভে অশোকের মহিন্দ নামে একটি পুত্র এবং সঙ্ঘমিত্তা নামে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। দরিদ্র গৃহের কন্যা কিসা গোতমীর যখন ধনী বণিকের পুত্রের সহিত বিবাহ হইয়াছিল, তখন সে বিবাহে জাতি বা পদমর্যাদার দিকে লক্ষ্য রাখা হয় নাই।

দ্বিতীয় রকমের বিবাহের নাম স্বয়ংবর। এই বিবাহে সমবেত পাণিপ্রার্থীদের ভিতর হইতে বাছিয়া, কন্যা মনোমত বর গ্রহণ করে। কোনও রাজকুমারী তাহার পিতার নিকট বর প্রার্থনা করেন যে, তাঁহাকে যেন তাঁহার নিজের মনোমত স্বামী বাছিয়া লইতে দেওয়া হয়। তাঁহার প্রার্থনামত সমস্ত দেশের নৃপতিগণকে নিমন্ত্রণ করা হইল। নৃপতিরা সমবেত হইলে রাজা কন্যাকে ডাকিয়া বলিলেন, "তুমি তোমার মনোমত পতি বাছিয়া লও"। রাজকুমারীর মনোনয়নও হইয়া গেল। কিন্তু এই মনোনীত পাত্রের চরিত্রে ভদ্রতা ও সৌজন্যের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় রাজা তাহার সহিত বিবাহ দিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, শেষ মনোনয়নের ভার পিতা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দু সাহিত্যে সাধারণত দেখা যায় যে, স্বয়ংবর সভায় কন্যার নির্বাচনই চরম। মনোনীত পাত্রের কোন দোষ থাকিলেও সে মনোনয়নের কোন পরিবর্তন করিতে পারা যায় না।

তৃতীয় রকম বিবাহের নাম গান্ধর্ব বিবাহ। এ বিবাহে অভিভাবকদের অজ্ঞাতসারে পাত্র এবং পাত্রী পরস্পর পরস্পরকে বাছিয়া লয়। এই বিবাহে কোন রীতিনীতি বা অনুষ্ঠান প্রতিফলিত হয় না। সাধারণতঃ রাজারাই বেশীর ভাগ গান্ধর্ব বিধানে বিবাহ করিতেন। এ বিষয়ে বৌদ্ধ সাহিত্যে অনেক গল্প আছে। সেকালে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল এবং এই নিয়মের ব্যতিক্রমও দেখিতে পাওয়া যাইত। বিবাহের জন্য শুভদিন ধার্য করা হইত।

পণ প্রথা

বিবাহ সম্পর্কে যৌতুক দিবার প্রথা উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু ধনীর কন্যা বিশাখার বিবাহে বিশাখার পিতা পাত্রপক্ষকে বহু যৌতুক দান করিয়াছিল। বিশাখার বিবাহের সময় তাহার পিতা শ্রাবস্তীর কোষাধ্যক্ষ মিগার, যৌতুক স্বরূপ ৫০০ শকট পরিপূর্ণ অর্থ, ৫০০ শকট-পরিপূর্ণ স্বর্ণপাত্র, ৫০০ শকট পরিপূর্ণ রৌপ্যপাত্র, ৫০০ শকট পরিপূর্ণ

বিবাহে যৌতুক

তাম্রপাত্র, ৫০০ শকট-পরিপূর্ণ রেশম নির্মিত নানারকমের পরিচ্ছদ, ৫০০ শকট-পরিপূর্ণ ঘৃত, ৫০০ শকট-পরিপূর্ণ ঝাড়াবাছা চাউল, ৫০০



মগধরাজ অজাতশত্রু

শকট-পরিপূর্ণ লাঙ্গল, লাঙ্গলের ফাল এবং চাষের উপযোগী অন্যান্য যন্ত্রপাতি দান করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত ৬০হাজার বলিষ্ঠ বলীবর্দ, ৬০হাজার গাভী এবং কতকগুলি এঁড়ে বাছুর দান করিয়াছিলেন। ইহাও দেখিতে পাওয়া যায় যে, পিতা কন্যাকে স্নানের জন্য অর্থদান করিতেন। কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের

পিতা মহাকোশল তাঁহার কন্যা কোশলদেবীকে মগধ রাজ বিম্বিসারের সহিত বিবাহ দেন। এই বিবাহে তিনি কন্যাকে স্নান ও গন্ধদ্রব্যের যৌতুকস্বরূপ কাশী-রাজ্যের একখানি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। কোশল-রাজ প্রসেনজিতের কন্যার নাম ছিল বাজিরা মগধরাজ অজাতশত্রুর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। তাঁহাকে স্নান ও গন্ধদ্রব্যের জন্য কাশীগ্রাম উপঢৌকনস্বরূপ দান করা হইয়াছিল। আরও দেখিতে পাওয়া যায় যে, শাবস্তীর কোষাধ্যক্ষ তাহার কন্যার বিবাহের সময়ে ৫৪ কোটী মুদ্রা দান করিয়াছিলেন।

বিবাহের সময়ে উপঢৌকন আদানের প্রথা ছিল। যখন মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্রের সহিত ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা বিশাখার বিবাহ হয়, তখন এক শত গ্রাম হইতে এক শত বৎসরের উপঢৌকন সংগ্রহ করা হইয়াছিল। বিবাহের পর শ্বশুর গৃহে যাইবার সময়ে বালিকা-দিগকে নিম্নলিখিত উপদেশ দেওয়া হইত :—

(১) যদি শাশুড়ী বা পরিবারস্থ অন্য কোন মহিলা গোপনে গৃহাভ্যন্তরে কোন কথার আলোচনা করেন, সে আলোচনা দাসদাসীর কাছে ব্যক্ত করিও না।

(২) দাস বা দাসীরা যে সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করে, তাহা পরিবারস্থ কোন লোকের কাছে ব্যক্ত করিবে না।

(৩) যাহারা ধন লইয়া পরিশোধ করিতে পারিবে, কেবল তাহাদিগকে ধার দিবে।

(৪) যাহারা ধার লইয়া পরিশোধ করে না, তাহাদিগকে দান করিবে না।

(৫) দরিদ্র আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধব যখন সাহায্যপ্রার্থী হয়, তখন তাহাদের পরিশোধ করিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহা চিন্তা না করিয়াই তাহাদিগকে সাহায্য করা উচিত।

(৬) শ্বশুর শাশুড়ীকে দেখিয়া বধূ বসিয়া থাকিবে না, উঠিয়া দাঁড়াইবে।

(৮) শ্বশুর, শাশুড়ী ও স্বামীর পূর্ব্বে স্ত্রী কখনও শয়ন করিবে না।

নারীর বহু স্বামী গ্রহণের দৃষ্টান্ত যে পাওয়া যায় না, তাহা নহে। স্বয়ংবর সভায় একজন রাজকুমারী পাঁচজন স্বামী মনোনীত করিয়াছিলেন এবং একই সময়ে তাঁহার পাঁচজনের সহিত বিবাহ হইয়াছিল। সপত্নী থাকা স্ত্রীলোকের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় দুঃখ। সপত্নীরা প্রায়ই পরস্পরের সহিত বিবাদ করে। ফলে, গৃহে শান্তি থাকে না, অশান্তির আবাস-ভূমি হইয়া থাকে। তবে নিঃসন্তানা পত্নী নিজে ইচ্ছা করিয়া দ্বিতীয় বার স্বামীর বিবাহ দিতেছেন এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। বৌদ্ধযুগে বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় এবং পত্নী দানের উল্লেখ আছে। গৌতম বুদ্ধের সময়ে অবিবাহিতা বালিকার বিবাহের কোন নির্দ্ধারিত বয়স ছিল না। তবে ষোল বৎসর বয়সে কোন কোন বালিকার যে বিবাহ দেওয়া হইত, তাহার উদাহরণ পাওয়া যায়।

বৌদ্ধ নারীর জীবন ও বাণী

এখানে আমরা কতকগুলি বৌদ্ধ নারীর জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করিব। তাহা বাস্তবিকই শিখিবার বস্তু। তাহাদের জীবন-চরিত পড়িলে বর্ত্তমান ভারত-মহিলারাও উদ্বুদ্ধ হইবেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

অভিরূপানন্দা

শাক্য ক্ষেমকের কন্যা **অভিরূপানন্দা**কে তাহার অপরূপ সৌন্দর্য্য ও অসাধারণ গুণের জন্য নন্দা বলা হইত। তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে সংসার ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। সঙ্ঘে প্রবেশ করিয়া সে যে সুন্দরী, সে কথা সে ভুলিতে পারিল না। বুদ্ধদেব তাহাকে তিরস্কার করিবেন এই আশঙ্কা করিয়া সে তাঁহার সঙ্গ বর্জ্জন করিয়া চলিত। যখন বুদ্ধদেব জানিতে পারিলেন যে, নন্দার জ্ঞানলাভের সময় হইয়াছে, তখন তিনি সমস্ত বৌদ্ধ ভিক্ষুণীগণকে সমবেত করিতে মহাপ্রজাপতি গৌতমীকে আদেশ দিলেন। নন্দা নিজে না আসিয়া প্রতিনিধি পাঠাইল। বুদ্ধ বলিলেন, "কেহ যেন প্রতিনিধি প্রেরণ না করে।" বাধ্য হইয়া নন্দাকে বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইতে হইল। বুদ্ধদেব তাঁহার দৈবশক্তির বলে, একজন সুন্দরী রমণীর দেহকে কুৎসিত, জরাগ্রস্ত রমণীর আকারে পরিণত করিলেন। এই দৃশ্য দর্শনের ফলে নন্দা অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিল।

জেন্তা

বৈশালীর লিচ্ছবী বংশে **জেন্তা**র জন্ম হয়। তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম শ্রবণ করিয়া অর্হত্ত্ব লাভ করিলেন।

চিত্রা

রাজগৃহের কোন বিখ্যাত পরিবারে **চিত্রা**র জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে একদিন বুদ্ধের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া চিত্রার প্রগাঢ় ভক্তি জন্মিল। মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁহাকে দীক্ষা দেন। বৃদ্ধ বয়সে গৃধ্রকূটে আরোহণ করিয়া

একান্তবাসিনীর জীবন যাপন করিতে থাকেন। পরে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া অর্হত্ব অর্জন করিয়াছিলেন।

আটবীরাজ্যের রাজকুমারীরূপে **সেলা**র জন্ম হয়। একদিন রাজার সহিত ভগবান বুদ্ধদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্যা

সেলা

রূপে পরিগণিতা হন, পরে সঙ্ঘে প্রবেশ করেন এবং অন্তর্দৃষ্টি লাভের জন্য সাধনা করিতে থাকেন। শীঘ্রই তিনি অর্হত্ব লাভ করেন।

মাগধের রাজবংশে **ক্ষেমা**র জন্ম হয়। ক্ষেমা অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন এবং তাঁহার দেহের বর্ণ স্বর্ণের মত ছিল। তিনি বিম্বিসারের মহিষী হন।

ক্ষেমা

একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বুদ্ধদেব সৌন্দর্যের নিন্দা করেন। সেই অবধি তিনি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতেন না। রাজা বিম্বিসার তাঁহার একজন পরম ভক্ত এবং তাঁহার ধর্মমতের প্রধান সমর্থক। তিনি রাণীর মনোভাব পরিবর্তনের জন্য সভাকবিকে বেণুবন আশ্রমের গৌরব সম্বন্ধে



গৃধ্রকূট পর্বত

শাক্যরাজবংশে সুন্দরী **নন্দা**র জন্ম হয়। তিনি অপরূপ সুন্দরী ছিলেন। মাতা, ভ্রাতা, ভগিনী, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে সংসার ত্যাগ করিতে

নন্দা

দেখিয়া তিনিও সংসার ত্যাগ করেন। কিন্তু ত্যাগ করিয়াও মন হইতে সৌন্দর্যের গর্ব দূর হয় নাই, অভিরূপ নন্দাকে বুদ্ধ যেরূপভাবে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেইরূপভাবে নন্দাকেও শিক্ষা দিয়াছিলেন। বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করিয়া নন্দা নির্বাণের প্রথম সোপানে আরোহণ করেন। নন্দাকে উপদেশ দিবার সময় বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "নন্দা, এই দেহের ভিতর কোন সার পদার্থ নাই। ইহা মাংসে ঢাকা এবং রক্তমাখা কতকগুলি হাড়ের সমষ্টিমাত্র। ইহা মৃত্যু এবং ধ্বংসের অধীন।" পরে নন্দা অর্হত্ব লাভ করিয়াছিলেন।

গান রচনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে গাহিতে আদেশ দেন। আদেশ প্রতিপালিত হইল। আশ্রমের সৌন্দর্য বর্ণনা শ্রবণ করিয়া রাজার অনুমতি গ্রহণ পূর্বক রাণী বেণুবন-বিহার দর্শন করিলেন। তখন বুদ্ধদেব বেণুবনেই বাস করিতেছিলেন। যখন তিনি বুদ্ধদেবের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, তখন বুদ্ধদেব একটি সুন্দরী রমণীকে স্বর্গের অপ্সরীতে রূপান্তরিত করিলেন। ক্ষেমাকে শিক্ষা দিবার জন্য বুদ্ধদেব এই রমণীটিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। আপনার অপেক্ষা অধিকতর সুন্দরী এই রমণীটিকে দেখিয়া ক্ষেমা মাথা নত করেন। কিছুক্ষণ পরে রমণীটির দেহ যৌবন হইতে প্রৌঢ়ে এবং প্রৌঢ় হইতে বার্দ্ধক্যে পরিণত হইল। তারপর চুল পাকিল, দাঁত পড়িল, দেহে বলীরেখা দেখা দিল, তাহার পর সে দেহ তালবৃন্তসম মাটির

উপর লুটাইয়া পড়িল। ক্ষেমা মনে মনে ভাবিলেন যে, এই অপ্সরাটির দেহের যে দশা হইল তাহার দেহেরও সেই দশা হইবে। বুদ্ধদেব তাঁহার মনোভাব জানিতে পারিয়া বলিলেন, "যে সব লোক কামনার দাস, তাহারা কামের ফল ভোগ করে, সেই জন্য যাহারা বন্ধন হইতে মুক্ত, তাহারা সংসার ত্যাগ করে।" বুদ্ধের কথা শেষ হইলে ক্ষেমা অর্হত্ব লাভ করিলেন।

বৈশালীর একটি ব্রাহ্মণ পরিবারে **রোহিণীর** জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি [illegible] [illegible] বৃক্ষের অপর [illegible] [illegible] [illegible] শ্রবণ করেন এবং [illegible] শীঘ্রই [illegible] করিয়াছিলেন।

তিষ্যা

কপিলবাস্তুর শাক্যদিগের মধ্যে **তিষ্যার** জন্ম হয়। মহাপ্রজাপতির সহিত সে সংসার ত্যাগ করিয়াছিল। তাহার ভিতরে আধ্যাত্মিক ভাব এতটা উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল যে, সে শীঘ্রই অর্হত্ব লাভে সমর্থ হইয়াছিল।

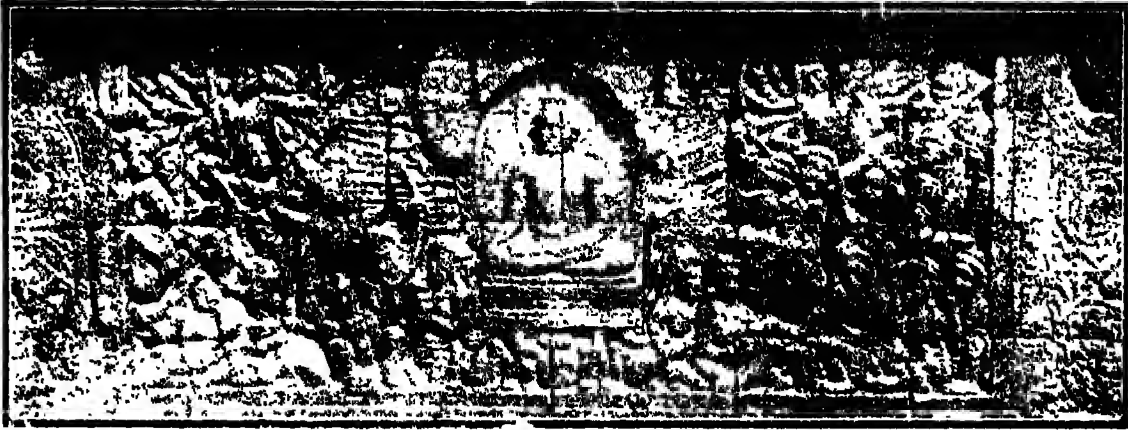
বিশাখা

বিশাখা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর পত্নী সুমনাদেবীর কন্যা। তাঁহার পিত্রালয় ছিল অঙ্গরাজ্যের ভদ্দিয় নগরে, যখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর, তখন বুদ্ধদেব ভিক্ষুণী সঙ্ঘের সহিত ঐ নগরে গমন করেন। ৫০০ সহচরী এবং ৫০০ রথ লইয়া বুদ্ধদেবকে অভ্যর্থনার জন্য বিশাখা গমন করেন। বুদ্ধদেব বিশাখাকে তাঁহার স্বভাবানুযায়ী উপদেশ প্রদান করায় তিনি পবিত্রতার শ্রেষ্ঠ আদর্শে উপনীত হইয়াছিলেন। তাহার পর বুদ্ধদেব বিশাখার গৃহে নিমন্ত্রিত হন। শ্রাবস্তীর পূর্ণবদ্ধনের সহিত পঞ্চগুণালঙ্কৃতা বিশাখার বিবাহ হয়। শ্রাবস্তীর নাগরিকেরা তাঁহাকে যে উপহার প্রদান করিয়াছিলেন, সে সকল উপহার তিনি অত্যন্ত সৌজন্যের সহিত নাগরিকদিগের ভিতরেই বিতরণ করেন। বিশাখার শ্বশুর নগ্ন বিধর্মীদের অর্চনা করিতেন। পরে বিশাখার চেষ্টাতেই তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। একদা তিনি ভিক্ষুদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের উপদেশ শ্রবণ করিয়া তাঁহার শ্বশুর পবিত্রতার প্রথম সোপানে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বিশাখা তাঁহার পৌত্রকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। এই পৌত্রটি মারা যাইবার পর সিক্ত বস্ত্রে, সিক্ত কেশে তিনি বুদ্ধদেবের কাছে গমন করেন। বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রাবস্তীর সমস্ত লোক যদি তাহার পুত্র এবং পৌত্র হয়, তবে তিনি সন্তুষ্ট হন, কি না? তিনি উত্তর দিলেন "হ্যাঁ। হই।" ভগবান তথাগত জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্রাবস্তীর কতজন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে?" বিশাখা উত্তর দিলেন, "এক হইতে দশ জন।" বুদ্ধদেব বলিলেন "এইবার তুমি চিন্তা করিয়া দেখ, সিক্ত বস্ত্র এবং সিক্ত কেশ হইতে তোমার কখনও মুক্তি লাভের সম্ভাবনা আছে কি না? বেশী পুত্র এবং পৌত্র দুঃখ আনয়ন করে।" একদিন বুদ্ধদেব বিশাখাকে বুদ্ধ, ধর্ম, সঙ্ঘ ও শীল সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। একদা বিশাখা বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া ভিক্ষুদের সহিত পরদিন প্রাতঃকালে তাঁহার গৃহে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। প্রাতঃকালে ভীষণ বারি বর্ষণ হয়। ভিক্ষুদের বস্ত্র ছিল না বলিয়া তাহারা নগ্ন হইয়া স্নান করে। বিশাখার পরিচারিকা ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করিতে আসিয়া এই ব্যাপার অবগত হয় এবং সে প্রভুপত্নীর নিকট এই ঘটনার উল্লেখ করে। বুদ্ধদেব এবং ভিক্ষুরা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে পরিতোষ পূর্বক ভোজন করাইলেন এবং ভোজন শেষ হইলে, বুদ্ধের নিকট কয়েকটি বর যাচ্ঞা করেন। যতদিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকিবেন, তিনি ভিক্ষুদিগকে বর্ষার পরিচ্ছদ দান করিবেন; অতিথি এবং যাহারা দূরদেশে গমন করিবেন, তাঁহাদিগকে খাদ্য দান করিবেন। পীড়িত ভিক্ষুদিগকে এবং পীড়িত শুশ্রূষাকারিণীদিগকে পথ্য এবং ব্যাধিগ্রস্ত ভিক্ষুদিগকে ঔষধ ও অন্নমণ্ড প্রত্যহ দান করিবেন।" বিশাখা বুদ্ধদেবের জন্য একটি সোণার জলপাত্র প্রস্তুত করেন। একদিন বুদ্ধদেবের নিকট গমন করিয়া তিনি জলপাত্র দান করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব সাদরে গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেবের এবং ভিক্ষুদিগের বাসের জন্য একটি প্রাসাদ প্রস্তুত করেন। বিশাখার অনুপস্থিতিতে তাঁহার দত্তনামে পৌত্রের উপর ভিক্ষু-সঙ্ঘের সেবার ভার ন্যস্ত ছিল। কিন্তু সে মৃত্যুমুখে পড়ে। বুদ্ধদেব নিজে তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। বিশাখার অলঙ্কারগুলি বিক্রয় করিয়া নয়ক্রোড় এক লক্ষ মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল। বিহার নির্মাণের জন্য সমস্ত মুদ্রা বিশাখা তাঁহার পরিচারিকাকে অর্পণ করিয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীর এক শ্রেষ্ঠী পরিবারে **উৎপল-বর্ণার** জন্ম হয়। বহু রাজপুত্র, এবং শ্রেষ্ঠীপুত্র তাহার পাণিপ্রার্থী ছিলেন। কারণ তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন এবং দেহের বর্ণ নীলপদ্মের বর্ণের ন্যায় ছিল। সংসার ত্যাগ করিয়া তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে গমন

করেন এবং বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন ও পরে অর্হত্ব লাভ করেন।

উৎপলবর্ণা একটি শাল বৃক্ষের পাদদেশে উপবিষ্ট হইয়া যখন তিনি ধ্যানমগ্না ছিলেন, মার (কামদেব) তাঁহার নিকট আসিয়া বলে "তুমি একটি পূর্ণ বিকশিত শালতরুর মূলে বসিয়া আছ, তুমি কি দুর্জনের আশঙ্কা কর



বুদ্ধদেবকে মারের প্রলোভন

না?" উৎপলবর্ণা বলিলেন "আমি দুর্জনকেও ভয় করি না এবং তোমাকেও গ্রাহ্য করি না।" এই কথা শুনিয়া মার তাঁহাকে পরিত্যাগ করে।

বৈশালী নগরের কোনও গৃহে **বিমলা** জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধদেবের একজন প্রধান শিষ্য মহামৌদ্গল্যায়নের উপদেশ শ্রবণ করিয়া, ইনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্টা হন এবং বুদ্ধদেবের গৃহী শিষ্যা হইয়াছিলেন।



বোধিসত্ত্ব

শ্রাবস্তীর এক দরিদ্র গৃহস্থ পরিবারে **কিসা গোতমীর** জন্ম হয়। একজন ধনী বণিক পুত্র তাঁহার পাণি গ্রহণ করে। বোধিসত্ত্ব কিসা গোতমীর মাতুল-পুত্র ছিলেন। রাহুলের সংবাদ শুনিয়া যখন বোধিসত্ত্ব গৃহে ফিরিতেছিলেন তখন কিসা গোতমী তাঁহার প্রাসাদ হইতে বুদ্ধকে দেখিতে পান। বুদ্ধের সৌন্দর্য দেখিয়া তিনি এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি একটি শ্লোক উচ্চারণ করিয়াছিলেন। শ্লোকটির অর্থ এই, "যে মাতার এরূপ সন্তান, যে পিতার এরূপ পুত্র, যে নারীর এরূপ স্বামী, তাঁহারা নিশ্চয়ই সুখী"।

কিসা গোতমী কিসা গোতমীর একমাত্র পুত্র যখন মারা যান তখন তিনি সেই মৃত দেহটি লইয়া বুদ্ধদেবের নিকট গমন করেন এবং তাহার প্রাণ ফিরাইয়া আনিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। বুদ্ধদেব বলেন যে, তুমি যদি এরূপ গৃহ হইতে একটি সরিষা আনিতে পার, যে গৃহে

কখনও মৃত্যু হয় নাই, তবে আমি তোমার পুত্রের প্রাণ দান করিব। কিন্তু গোতমী দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া ব্যর্থ মনোরথ হইয়া বুদ্ধের নিকট ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর তিনি তাহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহার ফলে তিনি ভিক্ষুণীসংঘে প্রবেশ করেন। অল্প সময়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ত্ব অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

শ্রাবস্তীর এক শেঠের পরিবারে **পটাচারার** জন্ম হয়। তাঁহার বিবাহিত জীবন সুখের ছিল না।

পটাচারা

স্বামী এবং পুত্রদের মৃত্যুতে তিনি পাগল হইয়া যান। ভগবান বুদ্ধদেব তাঁহাকে নিম্নলিখিত উপদেশ প্রদান করেন। "পুত্র, পিতা, মাতা আত্মীয় স্বজন প্রকৃত আশ্রয় নহে। মুক্তির পথ সত্বর পরিষ্কার করিবার জন্য সত্যকে উপলব্ধি কর।" তিনি ক্রমে অর্হত্ত্ব লাভ করিয়াছিলেন। তার পর তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। তাঁহার ৫০০ শত শিষ্যা ছিল। তাহারা নানা পরিবার এবং নানা স্থান হইতে আগমন করিয়াছিল। ইহাদের সকলেই বিবাহিত, প্রত্যেক জননী এবং শোকাবেগে অভিভূত, সন্তানের মৃত্যুতে বিহ্বল হইয়া তাহারা পটাচারার নিকট উপস্থিত হয়। পটাচারা এই বলিয়া উপদেশ দিতেন যে, জন্ম এবং মৃত্যুর রীতি যখন অপরিজ্ঞাত হইল, শোক করা সঙ্গত নহে। তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া তাহারা সংসার পরিত্যাগ করে।

মল্লিকা শাক্য মহানামের একজন প্রধান শেঠীর কন্যা। প্রথমে তাহার নাম ছিল চন্দ্রা। তাহার

মল্লিকা

রচিত এক গাছি মালা দেখিয়া মহানাম এত আনন্দিত হন যে, তাহার চন্দ্রা নাম পরিত্যাগ করিয়া মল্লিকা নাম দেন। একদা তাহার আহার্য লইয়া যখন উদ্যানে গিয়াছিল, তখন সেই পথে বুদ্ধদেব ভিক্ষা সংগ্রহ করিয়া ফিরিতেছিলেন। মল্লিকার মনে খাদ্য দানের বাসনা জাগিয়া উঠে। তাহার মনোগত ভাব জানিতে পারিয়া ভগবান্ বুদ্ধদেব তাহার সম্মুখে ভিক্ষাপাত্র প্রসারিত করিয়াছিলেন। মল্লিকা খাদ্যদ্রব্যগুলি সেই পাত্রে রাখিয়া মনে মনে কামনা করে যে, একদিন সে দাসত্ব ও দারিদ্র্য যন্ত্রণা হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে। একদিন শিকারের উত্তেজনায় রাজা প্রসেনজিৎ অশ্ববাহিত হইয়া মহানামের উদ্যানে আসিয়া উপস্থিত হন। এইখানে মল্লিকার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। রাজার দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া পরিচারিকার দ্বারা তাঁহার পদতল মার্জনা করিয়া দেয়। ইহার পরে রাজা ঘুমাইয়া পড়েন। নিদ্রাভঙ্গে তিনি মল্লিকার পরিচয় জানিতে পারিয়া মহানামের অনুমতি গ্রহণ পূর্বক তাহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তৎপর মল্লিকা পাটরাণীর পদ লাভ করে এবং যথাসময়ে বিরূঢ়ক নামে একটি পুত্র ও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

এই পুত্রটি প্রসেনজিৎ ও বাসবক্ষত্রিয়া নাম্নী তৃতীয় রাণীর অনুকরণ মাত্র। মল্লিকা একদিন বুদ্ধের নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করে যে, স্ত্রীলোকদের কুৎসিত চেহারা, কুস্বভাব, দুর্দশা এবং দারিদ্র্য হয় কেন? এবং অপর কতক নারীর ধনী ও প্রতিপত্তিশালী হয় কেন? যে সব নারী সুন্দরী এবং সুদর্শনা, তাহারা দরিদ্র এবং প্রতিপত্তিহীনা হয় কেন? বুদ্ধদেব উত্তর দিলেন "যে নারী কোপন স্বভাব, সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, সে যদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণদিগকে দান না করে, তবে সে দরিদ্র ও কুৎসিত হয়। কিন্তু সে যদি ব্রাহ্মণ বা শ্রমণকে দান করে তবে সে উগ্র প্রকৃতি সত্ত্বেও ধনবতী ও প্রতিপত্তিশালিনী হয়।" বুদ্ধদেব আরও বলেন, যে নারী উগ্র প্রকৃতির নয় কিন্তু দান করে না, সেও যদি শ্রমণ বা ব্রাহ্মণদিগকে দান না করে, তাহা হইলে সে দরিদ্র বা প্রতিপত্তিহীনা হয়। মল্লিকা স্বীকার করেন যে, উগ্র স্বভাবের জন্য সে কুৎসিত স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল এবং দানদানের জন্য রাণীর সম্মান লাভ করিয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে সব ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য গৃহস্থদের কন্যা তাহার অধীনে বাস করে, তিনি তাহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবেন। বুদ্ধদেবের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার অনুরাগিণী হইয়াছিলেন। মল্লিকার সম্বন্ধে আরও একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা আছে। একদিন কোশলরাজ প্রসেনজিৎ তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন "তাহার নিজের আত্মার অপেক্ষা আর কেহ তাহার অধিকতর প্রিয় আছে কি না?" মল্লিকা উত্তর দেন "না, নেই।" ইহার পর প্রসেনজিৎ ব্যাপারটি ভগবান বুদ্ধদেবের নিকট বিবৃত করেন। বুদ্ধদেব তাহাতে বলিয়াছিলেন, "নিজের আত্মার অপেক্ষা কোন বস্তু যে অধিক প্রিয় নহে, এ বিশ্বাস পোষণ করিয়া তাহারা সত্যকে আশ্রয় করিয়াছে।" রাণী মল্লিকা এবং বাসবক্ষত্রিয়া ধর্মসম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করিতে ইচ্ছুক হওয়ায় প্রসেনজিৎ তাহাদের শিক্ষা দানের নিমিত্ত বুদ্ধদেবকে অনুরোধ করিয়াছিলেন।



এই কার্যের জন্য ভগবান বুদ্ধদেব আনন্দকে নিযুক্ত করিতে উপদেশ দেন। [illegible] সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু বাস্তবজ্ঞানের শিক্ষার প্রতি তত মনোযোগ ছিল না। [illegible] ছিল মালিক। [illegible] বিবাহ করেন। দীর্ঘকাল তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। এই জন্য [illegible] তাঁহার [illegible] পরবর্তী [illegible] তিনি [illegible] সেই সময় [illegible] সন্তান [illegible] তাঁহাকে [illegible] দেখা দেন। [illegible] আসিলেন এবং [illegible] পুত্রবতী হইলেন।

অভিজ্ঞা। একজন [illegible] ছিলেন। তিনি [illegible] জনসাধারণে [illegible] জন্মগ্রহণ করেন, তখন মার বালিকাকে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করে। মার [illegible] নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করে "এই জীবজগৎ কে সৃষ্টি করিয়াছে এবং কোথা হইতে আসিয়াছে এবং কোথায় গমন করিবে?" বালিকা উত্তর দেন, "পঞ্চস্কন্ধ" * সংস্থিত দ্বারা সত্ত্ব সৃষ্টি।" উত্তর শুনিয়া মার [illegible] পরিত্যাগ করে।

আনন্দ

শ্রাবস্তীর একজন মহাজনের দাসীর নাম ছিল **পুন্না**। [illegible] ধান ভানিবার আদেশ তাহাকে দেওয়া হয়। [illegible]

পুন্না

সারাদিন [illegible] পরিশ্রান্ত হইয়াছিলেন [illegible] পুন্না যখন বিশ্রামের জন্য বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল, [illegible] অনুসন্ধান করিবা [illegible] পারিল। [illegible] পুন্না [illegible] বুদ্ধদেব সেই স্থান দিয়া ভিক্ষার্থে গমন করিতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া নিজের জন্য কিছু না রাখিয়া সে সমস্ত পিষ্টক দান করে এবং বুদ্ধদেব [illegible] গ্রহণ করেন। কিন্তু বুদ্ধদেব [illegible] পিষ্টকগুলি ভোজন করিবেন কি না, এ বিষয়ে পুন্নার মনে সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায় বুদ্ধদেব তাহার [illegible] পিষ্টকগুলি ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার ফলে পুন্না যে স্থানে পিষ্টকগুলি দান করিয়াছিল, সেই স্থানে [illegible] উপনীত হইয়াছিল।

সুপ্রবাসা নাম্নী একজন মহিলার বুদ্ধদেবের অনুগ্রহে নিরাপদে সন্তান জন্মগ্রহণ করে। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর সুপ্রবাসা, বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিয়া [illegible] আনিবার জন্য স্বামীকে [illegible]

সুপ্রবাসা

[illegible] বুদ্ধদেব [illegible] নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং [illegible] তাঁহার [illegible] স্বামী-স্ত্রী [illegible] দীক্ষিত হন। [illegible] শিষ্যকে শিক্ষা দান দিতেন। [illegible] সকল উপাসিকা বুদ্ধদেবকে খাদ্যদ্রব্যাদি দান করিয়াছিলেন, সুপ্রবাসা তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। [illegible] দান করিলে [illegible] তাঁহার কাছে [illegible] এবং আরও বলেন যে, "অন্নদানের দ্বারা দাতা গ্রহীতার জন্য জীবন, সৌন্দর্য, সুখ, [illegible] বাড়াইয়া দেন এবং ইহার বিনিময়ে দাতা নিজে লাভ করেন দীর্ঘ জীবন, সৌন্দর্য, আনন্দ ও ক্ষমতা।

নকুলমাতা একজন প্রতিপালনশীলা রমণী। পীড়িত স্বামীর এবং [illegible]

নকুলমাতা

পরিবারের সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইয়া মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হন। কারণ, তিনি সূতা কাটিতে

---

* রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার এবং বিজ্ঞান এই পাঁচটিকে বৌদ্ধেরা পঞ্চস্কন্ধ বলে।

জানিতেন। সংসারের বিধি ব্যবস্থা এবং ভরণপোষণ তিনি সমর্থ ছিলেন। বুদ্ধদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া তিনি ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করেন। তিনি স্বামীর নিকট ধর্মের অনুশাসনগুলি পালনের প্রতিশ্রুতিও দান করেন এবং বলেন যে, তিনি যেই সব উপাসিকাদের মধ্যে একজন যাহাদের বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা আছে, যাহারা নির্ভীক এবং যাহারা বুদ্ধদেব ব্যতীত আর কাহারও শরণ লয় না।

বেণুকণ্টকী নন্দমাতা বুদ্ধের আর একজন উপাসিকা। সারিপুত্ত এবং মোদগল্যায়নকে তিনি উপহার দান করিয়াছিলেন। এই দানের উল্লেখ করিয়া বুদ্ধদেব বলেন দানের পূর্বে, দানের সময়ে

বেণুকণ্টকী নন্দমাতা

দানের পরে, দাতার মনে সন্তোষ থাকা চাই। যিনি দান গ্রহণ করিবেন তাঁহার মনও রাগ, দ্বেষ ও মোহ হইতে মুক্ত থাকিবে। এরূপ দানের ফল অপরিমেয়। সারিপুত্ত এবং মোদগল্যায়নকে নন্দমাতা এরূপ দান করিয়াছিলেন এবং এ দানের উপযুক্ত ফল লাভ করিয়াছিলেন।

মিগশালা বুদ্ধদেবের আর একজন শিষ্যা। বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য আনন্দের নিকট গমন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বুদ্ধদেবের উপদেশ অনুসারে একজন ব্রহ্মচারী এবং একজন অব্রহ্মচারী, মৃত্যুর পর একই স্থানে গমন করে এবং সমভাবে

মিগশালা

আনন্দ উপভোগ করে।" আনন্দ এই সমস্যা সমাধানের জন্য বুদ্ধের নিকট গমন করেন এবং বলেন "এই উপাসিকাটি অশিক্ষিতা এবং জ্ঞানহীনা, তাই উপলব্ধি করিতে পারে নাই।" তিনি আরও বলেন, "ব্রহ্মচারী যদি তাঁহার কর্তব্য যথাযথ ভাবে পালন না করে, তবে একজন গৃহস্থের পক্ষেও তাহার অনুরূপ পুণ্য অর্জন করা অসম্ভব নহে।

সামাবতী কৌশাম্বীর রাজা উদয়নের পত্নী। উদয়ন যখন বাহিরে ছিলেন, তখন রাজ অন্তঃপুরে

সামাবতী

আগুন লাগিয়া সামাবতী তাঁহার পরিচারিকা সহ দগ্ধ হন। বুদ্ধদেব এই ঘটনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "প্রত্যেক উপাসিকা তাহার কর্মফল লাভ করিয়াছে"

সুজাতা একজন সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধ উপাসিকা। তিনি তিন প্রকার সংসার বন্ধন ধ্বংস করিয়া পবিত্রতার প্রথম সোপানে উপনীত হন।

রূপনন্দা—বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভগিনী। রূপনন্দা একদিন ভাবিয়া দেখিলেন যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সংসার ত্যাগী, রাহুলকুমার ভিক্ষুসঙ্ঘে যোগদান করিয়াছে, এবং তাঁহার মাতা প্রজাপতি গোতমীও

রূপনন্দা

ভিক্ষুণী হইয়াছেন। এতগুলি আত্মীয়কে সংসার পরিত্যাগ করিতে দেখিয়া তিনিও সংসার পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি রূপ গর্বে গর্বিতা ছিলেন। বুদ্ধদেব রূপের নশ্বরতা এবং অযথার্থতা প্রচার করিতেন বলিয়া তিনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না।

বারাণসীর একজন গৃহস্থের কন্যার নাম ছিল **রেবতী**। বুদ্ধের প্রতি তাহার কোনরূপ

রেবতী

অনুরাগ ছিল না। সে অতি অনুদার প্রকৃতির রমণী ছিল। প্রতিবেশী-পুত্র নন্দীয়ের সহিত তাহার বিবাহ দিবার জন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে কিছু দিনের জন্য ধর্ম কর্মের অনুষ্ঠান করান। বিবাহের পরেও রেবতীকে ধর্ম কার্যে রত হইতে হইয়াছিল। ইহার পর একবার নন্দীয়কে কার্য উপলক্ষে দূরদেশে গমন করিতে হয়। যাইবার সময়ে তিনি তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্মসমূহ পালনের জন্য রেবতীকে উপদেশ দিয়া যান। রেবতী সাতদিন ধরিয়া উপদেশ পালন করিয়াছিল। তাহার পর সমস্ত বন্ধ করিয়া দেয় এবং ভিক্ষুরা দ্বারে উপস্থিত হইলে তাঁহাদের অপমান করিতে দ্বিধা করে না। নন্দীয় ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পান যে, সমস্ত পুণ্যকার্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মৃত্যুর পর রেবতী প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয় এবং নন্দীয় স্বর্গে যান। দেবতার দিব্যদৃষ্টিতে রেবতীর দুর্দশা দেখিয়া তিনি বলেন, "আমি যে পুণ্যকর্ম করিয়াছি তাহা তুমি অনুমোদন করিলে এই দুর্দশা হইতে মুক্তি-লাভ করিবে।" রেবতী তাহা অনুমোদন করিবামাত্র দেবদেহ পরিগ্রহ করে। পরে নন্দীয়ের সহিত রেবতী স্বর্গে বাস করিবার অধিকার লাভ করে।

বিম্বিসারের পুরোহিত কন্যা **সোমা** রাজগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া তিনি বুদ্ধের গৃহী শিষ্যা হন। পরে তিনি ভিক্ষুণী সঙ্ঘে যোগদান করেন। তিনি খুব অল্প সময়ের মধ্যেই অর্হত্ত্ব লাভ করেন। মার তাঁহাকে পথভ্রষ্ট করিবার জন্য বহু চেষ্টা করে কিন্তু সে চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল। একদিন মার তাঁহার কাছে আসিয়া বলিতেছে যে, "ঋষিরা যাহা লাভ করিবার উপযুক্ত মনে করেন, সামান্য জ্ঞান





লইয়া তাহাই অর্জ্জন করিতে তুমি চেষ্টা করিতেছ, যাহা মহাজ্ঞানীদের পক্ষেও অর্জন করা কঠিন, নির্বোধ স্ত্রীলোক হইয়া তাহাই তুমি পাইতে চাও।"

সোমা

তিনি উত্তর দিয়াছিলেন, "আমার মন যদি দৃঢ় হয় আমি উহা লাভ করিব, কোনরূপ প্রলোভনই আমার সাফল্যের পথে বাধার সৃষ্টি করিতে পারিবে না।" ইহার পর মার তাহাকে ত্যাগ করে।

সাগলের কোশিয় সম্প্রদায়ের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে **ভদ্দাকপিলানীর** জন্ম হয়। পিপ্পলি নামক এক সম্রান্ত যুবককে ইনি বিবাহ করেন। স্বামী সংসার ত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার সমস্ত ধন সম্পদ আত্মীয় স্বজনকে বিলাইয়া দেন। সংসার ত্যাগ করিয়া ভদ্দা কপিলানী পাঁচ বৎসর বিধর্ম্মীদের সঙ্গে বাস করেন। পরে মহাপজাপতি গোতমী তাঁহাকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। দিব্যদৃষ্টি লাভ করিয়া তিনি অর্হত্ব প্রাপ্ত হন। পূর্ব জন্মের কথা, যে সকল ভিক্ষুণীর স্মরণে ছিল ভদ্দা কপিলানী তাঁহাদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

অনুরুদ্ধের ভগিনী **রোহিণী**। তিনি শ্বেত কুষ্ঠগ্রস্ত হন। অনুরুদ্ধের পাপ হইতে মুক্তি লাভের জন্য তাঁহাকে ভিক্ষুদের বিশ্রামের নিমিত্ত এক বিশ্রাম গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দিবার উপদেশ দেন। এই বিশ্রাম গৃহটি যখন নির্ম্মিত হইয়াছিল তখন রোহিণী উহাকে পরিষ্কার রাখিতেন। এই কার্যে তাহার দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হয়। ইহার ফলে রোহিণী রোগমুক্ত হন এবং তাঁহার দেহের বর্ণ স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল হইয়াছিল।

রোহিণী

সিংহলের রাজার পত্নী **অনুলা** পাঁচশত রমণী-পরিবৃতা হইয়া থেরদিগকে প্রণাম ও অর্ঘ্যের দ্বারা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। থের মহিন্দ তাঁহাদের ভিতর ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহারা সেই উপদেশগুলি শ্রবণ করিয়া রাণী অনুলা এবং তাঁহার পাঁচশত সহচরী সেই জ্ঞান লাভ করিয়া সোতাপত্তি লাভ করেন।

অনুলা

বাড়-শাকের কোন সম্রাট পরে ক্ষেমা নিজে উহার জন্য ... হন। নিজের রূপ ক্ষেমার গর্ব ছিল। ... তিনি জানিতে পারিলেন যে, রাজমহিষী ক্ষেমা, সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, তখন তিনি ক্ষেমার নিকট গমন করেন। ক্ষেমা তাঁহাকে ধর্মসম্বন্ধে উপদেশ দিয়া ভিক্ষুণীর সঙ্ঘে দীক্ষা দেন। শীঘ্র তিনি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন।

বিমল

মগধরাজ বিম্বিসার ও **আম্রপালীর** এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাহার নাম ছিল অভয়। একদিন আম্রপালী জানিতে পারেন যে ... তাঁহার বেশালীর ... আগমন করিয়াছেন। তিনি বুদ্ধদেবকে ভোজনের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। বুদ্ধ তাহার নিকট ধর্ম প্রচার করিলেন। নগরের ধনী ... সমস্ত বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করিল। আম্রপালীর গৃহে বুদ্ধদেব নানা উপচারে ভোজন করিয়াছিলেন। ইহার পর আম্রপালী নিবাসস্থান অর্পণ করিতে আদেশ করেন। পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের নশ্বরতা সে উপলব্ধি করিল। ... নিজ দেহের কমনীয় কান্তি প্রভৃতি তাহার দৃষ্টি পথে পতিত হইল, অবশেষে সে অর্হত্ব লাভ করিল।

আম্রপালী

বৌদ্ধনারীদিগের মধ্যে ... বুদ্ধদেবের বাণী শ্রবণ করিয়া জীবনকে পবিত্র ও মহৎ করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে **অভয়া, সুজাতা, ভদ্দা** প্রভৃতির নামও উল্লেখযোগ্য।

* যে বৌদ্ধ ভিক্ষু পাপ ও তাপ সম্যকরূপে নাশে উৎসাহী হইয়াছে তাহাকে থের বা স্থবির বলা হয়।

এই প্রবন্ধের অনেকগুলি ছবির জন্য Director General of Archaeology র নিকট ঋণী এবং তাঁহার অনুমতি লইয়া এখানে প্রকাশ করা হইয়াছে।



দুঃখের কথা

আহাহাহা! শুনবে যদি [illegible] শুনাব আজ—
শুনে তোর চক্ষু বেয়ে, ঝরবে [illegible]
[illegible] নন্দ গোঁসাই, আমাদের নন্দ খুড়ো,
স্বভাবেতে সরল সোজা অমায়িক শান্ত বুড়ো।

ছিল সে যে গোঁফের বালাই [illegible] মনের মধ্যে,
দেখা যেত সদাই তারে হুঁকো হাতে হাস্যমুখে।
ছিল না তার অসুখ কিছু, ছিল না তার ভাবনা কোনো
ছিল নাকো [illegible] বিস্ময় [illegible]

[illegible] আর, [illegible] বাড়ি আসে,
[illegible] কি দুর্গতি, আহা হা [illegible]
[illegible] দেখেছ—[illegible]—
[illegible] সব, ঠকঠক বাজিছে [illegible]।

মুখে আর নাই সে হাসি, [illegible] পড়ে।
[illegible] তার কপাল বেয়ে ঝরে ঘাম দরদর [illegible]।
কাঁদে সে বসে না কথা, আকাশে [illegible] চেয়ে,
[illegible] পড়ে [illegible] চোখ বেয়ে।

বলে লোকে দৌড়ে এসে, ছুটে এলো বাড়ি [illegible]
বলে তারা "কাঁদছ কেন, কি হয়েছে নন্দ গোঁসাই?"
বুড়ো বলে "বছর বছর ভুগে মরি ব্যারাম হয়ে
এতদিন কেউ বলেনি, না জেনেই আসছি সয়ে।

[illegible]



সাগর

[illegible]



[illegible] পুব আকাশের [illegible],

[illegible]

দেখে, আপন ছায়া [illegible] জলের মাঝে,

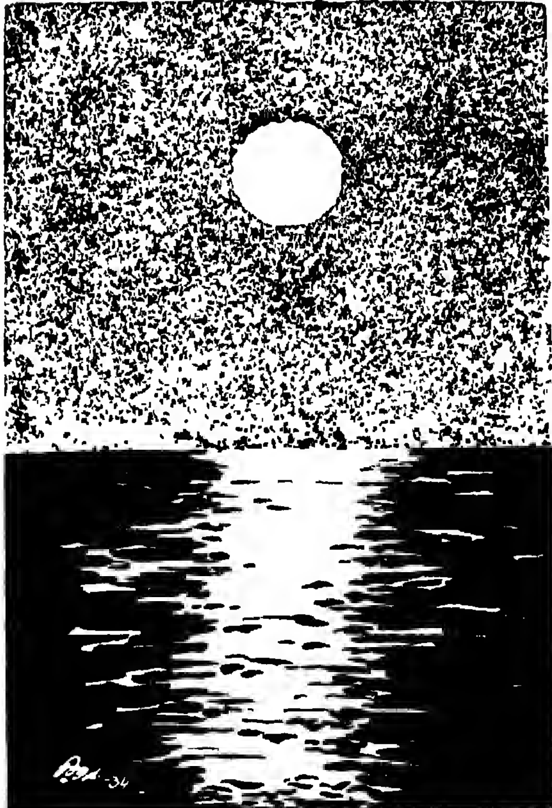
[illegible] বাড়ল বেগ [illegible]

[illegible] দিক।

শাদা, ফেনার মাথায়, বালির পরে

রোদ্দুর ঝিকিমিক।

তোমার, নীল আঁচলের ফেনিল পাড়ে
দেয় সে গেঁথে মণি,
হেসে, গলায় তোমার দেয় দুলিয়ে
হীরার মালাখানি।
নাচে, আলোর সাথে, হাওয়ার সাথে,
লক্ষ কোটি ঢেউ।
ফেনা, লাফিয়ে পড়ে, গড়িয়ে পড়ে
রাখ্‌তে পারে কেউ?
বালি, যোজন জুড়ে রয় সে প'ড়ে
বাহু দুটি মেলে।
তুমি, দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে এসে
পড়ছ তাহার কোলে।
যখন, চাঁদনী রাতে জোছনা ফোটে
তোমার কালো জলে,
যখন ছড়িয়ে পড়া জলের কণা
মুক্তা হ'য়ে দোলে।





তখন, জল ত তোমার জল নাহি আর!
যেন রূপার ধারা,
কোথা চাঁদের আলোর পথটি ধ'রে
চলছে আপন হারা।
যেথা, আকাশ মেশে তোমার সাথে,
ঐ যে তোমার শেষ।
বল, ঐ খানেতে আছে কি গো
রূপ কাহিনীর দেশ?
শুনি, তোমার জলে অতল তলে,
মুক্তা ভরা খনি;
শুনি, আঁধার ঢাকা বুকের নীচে
লুকিয়ে থাকে মণি।
যেদিন, সীমা তোমার মুছিয়ে ফেলে
অন্ধ আঁধার কালো,
সেদিন, ঢেউয়ের মাথায় ঢেউয়ের মাথায়
জ্বলে যে তার আলো।

শ্রীসুখলতা রাও



প্রশান্ত উপকূল



পৃথিবী পরিক্রমণে পর্ত্তুগীজ জাতির উদ্যম

[নাবিক রাজকুমার হেন্‌রী]



তোমরা সকলেই ভূগোলক (Globe) দেখিয়াছ। ভূগোলকের উপর পাঁচটি মহাদেশ আছে। এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া। তন্মধ্যে সব চেয়ে ছোট হইতেছে, ইউরোপ। কিন্তু ইউরোপ আকারে ছোট হইলে কি হয়। সভ্যতায়, পরাক্রমে ও শিল্প-বিজ্ঞানের চর্চ্চায় ইউরোপ সকল মহাদেশের অগ্রণী। ইউরোপের লোকেরা শিক্ষায়, দীক্ষায়, ক্ষমতায় অন্যান্য দেশের লোক হইতে শ্রেষ্ঠ, সেইজন্য তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রভুত্ব করিতেছে এবং অন্যান্য দেশের লোকে তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিতেছে। আমাদের দেশ হইতে লোকে শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য শিখিতে ইউরোপে যায়। ইউরোপ বর্ত্তমান জগতের গুরু ও আদর্শ স্থানীয়।

ইউরোপ মহাদেশ আবার নানা দেশে বিভক্ত। যেমন ইংলণ্ড, জার্ম্মেনী, ফ্রান্স, রুশিয়া ইত্যাদি। এই সমস্ত দেশের ভাষা এক নয় এবং সভ্যতাও এক নয়। অনেক দেশ খুবই সভ্য এবং সমৃদ্ধ, আবার অনেক দেশ খুব দরিদ্র এবং সভ্যতায় খুব উচ্চ স্তরে আরোহণ করিতে পারে নাই। ইউরোপের মানচিত্রে দৃষ্টিপাত করিলে পশ্চিম ভাগে একটি উপদ্বীপ দেখিতে পাইবে। উহা দুইটি দেশে বিভক্ত—স্পেন ও পর্ত্তুগাল। বর্ত্তমান স্পেন ও পর্ত্তুগাল ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় অতি নগণ্য ও দরিদ্র দেশ। এমন কি, ভারতবর্ষ অথবা চীন হইতে সভ্যতায় ও সমৃদ্ধিতে এই দুই দেশ বেশী শ্রেষ্ঠ নয় কিন্তু এক সময় ছিল যখন স্পেন ও পর্ত্তুগাল সাহিত্য, বিজ্ঞান, পরাক্রম ও সভ্যতায় ইউরোপে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল এবং তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়াই ইউরোপের অন্যান্য দেশ এত বড় হইয়াছে। স্পেন ও পর্ত্তুগালের সেই গৌরবময় যুগের কথাই এখন বলিতেছি।

অতি প্রাচীন কালে স্পেন-পর্ত্তুগালে (সম্মিলিত দেশের নাম আইবিরীয় উপ-দ্বীপ) আইবিরীয় নামে এক জাতি বাস করিত। তাহারা তেমন সভ্য ছিল না। ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্ব উপকূল হইতে সুসভ্য

ফিনিসীয় নাবিকেরা আসিয়া বাণিজ্য উপলক্ষে এই উপদ্বীপের নানাস্থানে আইবিরীয় জাতীয় লোকদের মধ্যে উপনিবেশ স্থাপন করে। ফিনিসীয়ানরা ছিল বড় সাহেব, আর আইবিরীয়গণ মুটে-মজুর হইয়া তাহাদের কারখানায় বা জাহাজে কাজ করিত। পরে এই সমস্ত উপনিবেশ প্রসিদ্ধ কার্থেজ নগরের দখলে আসে। কার্থেজীয়গণ স্পেন দেশে কেডিজ্, সেভিল প্রভৃতি বিখ্যাত বন্দর স্থাপন করেন। পরে খৃষ্টের তিন শতাব্দী পূর্ব্বে রোমানগণ কার্থেজীয়গণকে প্রায় শত বৎসর-ব্যাপী যুদ্ধে হারাইয়া দিয়া সমস্ত স্পেন দেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। রোমান্ শাসন এই উপদ্বীপে এত বদ্ধমূল হয় যে, ক্রমে ক্রমে এই দেশের লোকেরা রোমানদের ভাষা, ধর্ম্ম ইত্যাদি গ্রহণ করে। এখনও পর্ত্তুগাল ও স্পেনের ভাষা প্রাচীন রোমান্দের ভাষা যাহাকে লাতিন ভাষা বলা হয়, তাহা হইতে উদ্ভূত। যেমন সংস্কৃত ভাষা হইতে বাঙ্গলা, হিন্দী প্রভৃতি ভাষার উৎপত্তি হইয়াছে। খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে রোমান্ সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে, জার্ম্মান-জাতীয় লোকেরা স্পেন ও পর্ত্তুগাল জয় করে, কিন্তু তাহারাও ক্রমে ক্রমে খৃষ্টান ধর্ম্ম ও রোমক সভ্যতা গ্রহণ করিয়া দেশের লোকের সহিত মিলিয়া যায়। এই রাজবংশ ৭১২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করে, তৎপরে মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বী আরবেরা কি করিয়া সেনাপতি তারিকের (Tarik) অধীনে স্পেন দেশ জয় করে, তাহা পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে।

মুসলমানেরা স্পেন দেশ কখনও সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের পূর্ণ প্রভুত্বের সময় খৃষ্টানেরা স্পেন ও পর্ত্তুগালের উত্তর-পশ্চিম অংশে পলাইয়া পর্ব্বত-বহুল স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সমস্ত গিরি-দুর্গ হইতে মুসলমান সম্রাটগণ কখনও খৃষ্টানদিগকে স্থানচ্যুত করিতে পারেন নাই। অবশেষে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হইল। মুসলমান বিজেতারা সহরে বাস করিয়া ক্রমে বিলাসী ও যুদ্ধপরাঙ্মুখ হইলে পর্ব্বতবাসী খৃষ্টানেরা ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগকে দক্ষিণদিকে হটাইতে আরম্ভ করিল। ক্রমে এই উপদ্বীপে অনেক খৃষ্টান রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইল এবং মুরগণ শুধু রাজ্যের দক্ষিণভাগে 'গ্রানাড়া' নগরকে কেন্দ্র করিয়া একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে আবদ্ধ রহিল।

যখন পর্ত্তুগালে বিদেশীয় মুরদিগকে তাড়াইবার জন্য এইরূপ স্বদেশী আন্দোলন চলিতেছিল, তখন সেই দেশে এক দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞের আবির্ভাব হয়। ইনি এই সময়ে না জন্মিলে কলম্বসের আমেরিকা আবিষ্কার, ভাস্কোডিগামার ভারতবর্ষে যাওয়ার জলপথ আবিষ্কার ইত্যাদি বোধ হয় বহুদিন পিছাইয়া যাইত। ইনি পর্ত্তুগালের রাজা প্রথম জনের তৃতীয় পুত্র হেন্‌রী। ইঁহার মাতা ছিলেন ইংলণ্ডের পরাক্রমী রাজা তৃতীয় এডোয়ার্ডের পৌত্রী। হেন্‌রী বাল্যকাল হইতে অত্যন্ত মেধাবী, তেজস্বী এবং বিদ্বান্ ছিলেন। অন্যান্য খৃষ্টান রাজপুত্রের মত তিনিও বাল্যকাল হইতে আশা পোষণ করিতেন যে, মুসলমানদিগকে খৃষ্টানদের পবিত্র তীর্থ জেরুজালেম হইতে তাড়াইয়া দিয়া তিনি খৃষ্টান-জগতে নিজের নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবেন।

কথিত আছে, হেন্‌রীর মাতা ইংরেজ রাজকুমারী ফিলিপার শিক্ষাতেই, হেন্‌রী ও তাঁহার ভ্রাতারা শিক্ষায় ও বীরত্বে ইউরোপের রাজপুত্রদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেন। তখন আফ্রিকার মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করা সমস্ত খৃষ্টান রাজপুত্রই কর্ত্তব্য ও গৌরবের বিষয় মনে করিতেন। ফিলিপার তিন পুত্র প্রাপ্তবয়স্ক হইলে তাঁহারা

আফ্রিকার যুদ্ধে যাইতে উৎসুক হইলেন। তাঁহাদিগের জন্য জাহাজও তৈয়ারী হইল। কিন্তু তখন রাণী ফিলিপা বিষম পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। রাজপুত্রেরা মৃত্যুশয্যাশায়ী মাতাকে ফেলিয়া বিদেশে যাইতে অনিচ্ছুক হইলেন। কিন্তু রাণী ফিলিপা দমিবার পাত্রী ছিলেন না। তিনি মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও পুত্রদিগকে উৎসাহ দিতে লাগিলেন। কথিত আছে, মৃত্যুর অল্পক্ষণ পূর্ব্বে তিনি হঠাৎ বিছানায় উঠিয়া বসেন এবং চীৎকার করিয়া বলেন "কোন দিক হইতে এত প্রবল বাতাস বহিতেছে?" অনুচরেরা বলিল, "উত্তর দিক হইতে।" তখন রাণী বলিলেন "প্রিয় পুত্রগণ! এই বায়ুই তোমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইবে।" এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল। মাতার মৃত্যুর পর হেনরী ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ মুরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া আফ্রিকার সাগরকূলবর্ত্তী কিউটা (Ceuta) বন্দর দখল করিলেন, কিন্তু



নাবিক রাজকুমার হেনরী



প্রিয় পুত্রগণ! এই বায়ুই তোমাদিগকে কর্ত্তব্যের পথে লইয়া যাইবে

এই সকল হইতে দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে যাইয়া তাঁহারা মুরদের হস্তে পরাজিত হইলেন। হেনরী দেখিলেন যে, স্থলপথে আফ্রিকা মহাদেশের পর্ব্বত ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া মুরদিগকে পরাস্ত করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার, সুতরাং তিনি অপর কোনো উপায়ের কথা ভাবিতে লাগিলেন।

এই সময়ে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পর্ত্তুগালের তদানীন্তন রাজা তাঁহাকে দক্ষিণ পর্ত্তুগালের আলগার্ভস্ (Algarves) প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। সেই প্রদেশে সেণ্ট ভিনসেণ্ট অন্তরীপে সাগ্রেস্ নামক ক্ষুদ্র নগরে, হেনরী তাঁহার বাসস্থান ঠিক করিলেন। কিন্তু হেনরী চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, স্থলপথে মুরদিগকে আক্রমণ করা অতি দুরূহ ব্যাপার, কারণ অনেক বড় বড় রাজা এইরূপ প্রয়াস করিয়া ব্যর্থ হইয়াছিলেন এবং এই জন্য অন্য উপায়ে মুরদিগকে আক্রমণ করিবার উপায়ের কথাই ভাবিতে লাগিলেন। এই সময়ে মার্কোপোলোর পূর্ব্বদেশের কথা প্রকাশিত হয়, এবং তাহা পাঠ করিয়া তিনি জানিতে পারেন যে, মুসলমান জগতের পূর্ব্বদেশেও এক বড় খৃষ্টান রাজা আছে এবং সেই দেশে প্রেষ্টার জন্ উপাধিধারী রাজকুল মহাপরাক্রমে রাজত্ব করেন। তিনি মনে করিলেন যে, যদি পূর্ব্বদেশে যাওয়ার নূতন পথ আবিষ্কার করা যায়, তাহা হইলে উক্ত পূর্ব্বদেশীয় খৃষ্টান রাজার সহিত যোগদান করিয়া তিনি পশ্চাৎ দিক হইতে তুর্কীদিগকে আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিতে পারিবেন। কিন্তু পর্ত্তুগাল হইতে পূর্ব্বদেশে যাওয়ার তখন একমাত্র পথ ছিল, ভূমধ্যসাগরের ভিতর দিয়া, বা ইউরোপ বা আফ্রিকার ভিতর দিয়া। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে মুসলমানেরা প্রবল এবং আফ্রিকা মরুভূমিময়। সুতরাং পূর্ব্বদেশে যাইতে হইলে আফ্রিকা ঘুরিয়া যাইতে হইবে, অথবা আটলাণ্টিক মহাসাগর অতিক্রম করিতে হইবে। কি করিয়া এ সমস্ত করা যাইতে পারে?

হেনরী প্রাচীন পুস্তকাদি পাঠ করিয়া জানিতে পারিলেন যে, সমুদ্র অতিক্রম না করিলে পূর্ব্বদেশে যাওয়ার নূতন পন্থা বাহির করা যাইবে না। তখন পর্ত্তুগালে সাধারণ শ্রেণীর জেলে ব্যতীত ভাল নাবিক মোটেই ছিল না এবং লোকেরা সমুদ্রযাত্রার কিছুই জানিত না। জেলেরা শুধু মাছ ধরিবার জন্য ছোট ছোট নৌকা করিয়া উপকূল হইতে দুই চার মাইল দূরে যাইত। কিন্তু মুসলমানদের তখন বড় বড় জাহাজ সমস্ত ভূমধ্যসাগরে মাল লইয়া ফিরিত এবং তাহারা খৃষ্টানদিগকে মোটেই আমল দিত না। খৃষ্টানেরা সমুদ্রযাত্রা করিলে হয় মুসলমানেরা সেই সমস্ত জাহাজ ডুবাইয়া দিত, অথবা অন্য নানারূপ উৎপীড়ন করিত। শুধু জেনোয়া ও ভেনিসের লোকেরা তাহাদের সহিত সমান লড়াই করিতে পারিত কিন্তু তাহারাও অন্য খৃষ্টান জাতিদিগকে আমল দিত না। কিন্তু হেনরী হটিবার লোক ছিলেন না। তিনি দেখিলেন যে, প্রথমতঃ তাহার দেশের লোকদিগকে জাহাজ তৈয়ারী এবং সমুদ্রে জাহাজ চালাইবার কলাকৌশল শিখাইতে হইবে। এইজন্য তিনি ১৪৩১ খৃঃ অব্দে রাজধানী লিসবন সহরে একটি নৌবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিলেন, এবং ইটালী, সিসিলী জার্ম্মেণী প্রভৃতি দেশ হইতে দক্ষ নাবিক ও পণ্ডিত লোকদিগকে বহু বেতন দিয়া আনয়ন করিয়া দেশের লোকদিগকে নৌবিদ্যা শিখাইতে লাগিলেন। পর্ত্তুগালের ও স্পেনের বহু সম্ভ্রান্তবংশের ছেলেরা নূতন উৎসাহে মাতিয়া এই বিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইলেন। ক্রমে যথেষ্ট লোক তৈয়ারী হইলে তিনি এক একটি নৌদল গঠন করিয়া তাহাদিগকে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল ভাগ পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইতে আরম্ভ করিলেন। সাগ্রেস্ সহরে তাঁহার সভায় বহু সুদক্ষ নাবিক, জাহাজ-নির্ম্মাতা, এবং মানচিত্র তৈয়ারী করিতে সুদক্ষ লোক সমবেত হইল।



নৌবিদ্যা-

অন্যান্য বিদ্যার নৌবিদ্যাও একটি প্রকাণ্ড ব্যাপার। বিলাতে ও অন্যান্য সভ্য-দেশে নৌবিদ্যা শিখাইবার জন্য রীতিমত স্কুল, কলেজ আছে। আমাদের বিদেশগামী জাহাজ বা নৌকা নাই। কাজেই, আমাদের মধ্যে নৌবিদ্যারও আলোচনা নাই। যাহা হউক, নৌবিদ্যা জিনিষটা কি, তাহার সামান্য পরিচয় এখানে দিব।

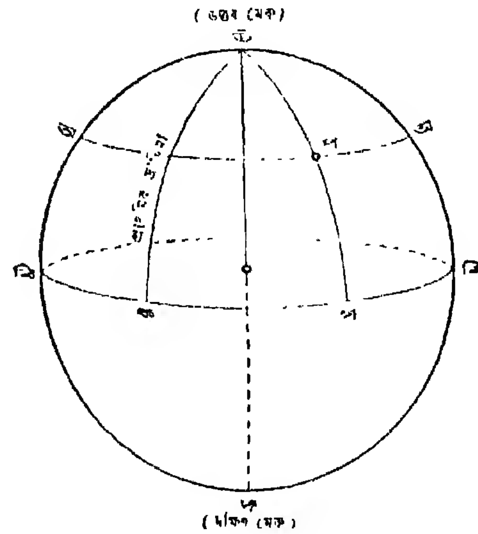
তোমরা নিশ্চয়ই বুঝিতে পার যে, মহা-সমুদ্রে নৌকা বা জাহাজ চালান অতি দুরূহ ও বিপজ্জনক ব্যাপার। নির্বিঘ্নে নৌচালনা করিতে হইলে প্রথমতঃ, ভূগোল ভাল করিয়া জানা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, বৎসরের কোন সময় হাওয়া কোন দিক্ হইতে বহিবে, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি কিরূপ হইবে, তৎসম্বন্ধে খুব ভাল ধারণা থাকা দরকার। তৃতীয়তঃ, মহা-সমুদ্রে কোন্ স্থানে জাহাজ বর্ত্তমান আছে, তাহার অবস্থান নির্ণয় করা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজনীয়। এই বিষয় জানিতে হইলে জ্যোতিষ শাস্ত্র (astronomy) খুব ভাল জানা দরকার। কারণ, সমুদ্রে চারিদিকেই জল ; শুধু সূর্য্য বা তারকা দেখিয়াই নিজের অবস্থান নির্ণয় করা যায়। প্রথমে যে সমস্ত জাতি সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে যাইত, তাহারা কতকটা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বা আন্দাজের উপর জাহাজ চালাইত। প্রায় খৃষ্টের পঞ্চম শতাব্দীতে চীন-দেশীয় নাবিকেরা প্রথম আবিষ্কার করেন যে, চুম্বক লোহাকে ঝুলাইয়া রাখিলে উহা উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান থাকে। তাঁহারা চুম্বক লোহা দিয়া সমুদ্রে দিক্ নির্ণয় করে এবং তাঁহাদের নিকট হইতে প্রথমে



দিগদর্শন যন্ত্র

আরবেরা, পরে ইউরোপীয়েরা দিক্ নির্ণয়ের জন্য চুম্বক লোহার ব্যবহার শিখে।

কিন্তু চুম্বক লোহাতে শুধু মোটামুটি উত্তর দিক ছাড়া আর কিছু জানা যায় না। পৃথিবীর ঠিক কোন্ অংশে জাহাজ আছে, তাহা জানিতে হইলে গোলকের ত্রিকোণমিতি জানা দরকার। মনে কর, চিত্রের গোলক দিয়া পৃথিবীকে বোঝান হইতেছে। 'উ' উত্তর মেরু, 'দ' দক্ষিণ মেরু এবং 'ব ব' বিষুব রেখা। 'প' কোনও স্থানের অবস্থান। এই অবস্থান বাহির করিতে হইলে প্রথমতঃ জানিতে হইবে যে, উহা বিষুবনের উত্তরে বা দক্ষিণে। 'উ' হইতে 'উপ'



এই রেখা গোলকের উপর টানিলে উহা বিষুবনকে 'গ' বিন্দুতে ছেদ করিবে। এখন 'পগ' কোণকে 'অক্ষাংশ' বলে। 'প' যদি বিষুবনের উপর হয়, তাহা হইলে অক্ষাংশ শূন্য, যদি 'উ' বা উত্তর মেরুর সহিত মিলিয়া যায় তাহা হইলে অক্ষাংশ ৯০ ডিগ্রি। যতই উত্তরে যাওয়া যায় 'অক্ষাংশ' ততই বাড়িতে থাকে। 'শিশু-ভারতী' তৃতীয় সংখ্যায় "পৃথিবীর আকার ও অবস্থান' শীর্ষক প্রবন্ধে বোঝান হইয়াছে যে, কি করিয়া 'ধ্রুবতারার উন্নতি' হইতে অক্ষাংশ নিরূপণ করা যায়।

কিন্তু শুধু অক্ষাংশ জানিলেই অক্ষাংশ নিরূপণ হয় না। কারণ 'প'র ভিতর দিয়া যদি বিষুবনের সমান্তরাল ভাবে 'অঅ' এই বৃত্তাকার রেখা টানা যায়, তাহা হইলে উহার সকল বিন্দুই বিষুবন হইতে সমান দূরে

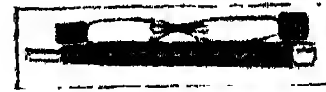
থাকে। সুতরাং 'প' বিন্দুকে জানার জন্য উহা কতটা পূর্ব্বে বা পশ্চিমে আছে জানা দরকার। এই জন্য বিষুবরেখার উপর একটি আদি বিন্দু 'ক' কল্পিত হয় এবং 'উক' এই বৃত্তাকার রেখা টানা হয়। 'উক' প্রাথমিক রেখাকে দ্রাঘিমা রেখা বলা হয়। এখন 'কগ' রেখা মাপিলেই 'প' বিন্দু 'ক' হইতে কতটা পূর্ব্বে বা পশ্চিমে তাহা জানা যায়। 'উ' বিন্দু একটা নির্দ্দিষ্ট বিন্দু (উত্তর মেরু) কিন্তু 'ক' সম্পূর্ণ কল্পিত। ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকেরা নিজেদের সুবিধামত প্রাথমিক দ্রাঘিমা কল্পনা করিয়াছে। যেমন হিন্দুদের প্রাথমিক দ্রাঘিমা ছিল লঙ্কার ভিতর দিয়া, আরবদের বাগদাদের ভিতর দিয়া, ইংরেজদের গ্রীণউইচের ভিতর দিয়া, এবং অপরাপর ইউরোপীয় জাতির ফেরো দ্বীপের মধ্য দিয়া।

এখন সমুদ্রে কি করিয়া দ্রাঘিমা নিরূপণ করা যায়? তোমরা বোধ হয় জান যে, পৃথিবীর সমস্ত স্থানে এক সময়ে সূর্য্যোদয় হয় না। পৃথিবীর নিজের অক্ষের উপর আবর্ত্তনের জন্য দিনরাত্রি হইতেছে। সেই জন্য পূর্ব্বদিকে যখন কোনস্থানে প্রথম সূর্য্য উঠে, তখন উহার পশ্চিমদিকে সমস্ত স্থানে রাত্রি ও পূর্ব্বদিকে সমস্ত স্থানে দিন থাকে। ক্রমে পৃথিবী যেমন ঘুরিয়া আসিতে থাকে, তেমনি ক্রমান্বয়ে পশ্চিমদিকে সূর্য্য উঠিতে থাকে, এবং পূর্ব্বদিকে রাত্রি হইতে থাকে। এখন প্রত্যেক স্থানেই মধ্য রাত্রি হইতে দিনের আরম্ভ গণনা করা হয়। সুতরাং পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক সময়ে দিন আরম্ভ হয় না। জাপানে যখন শেষ রাত্রি ৮টা, কলিকাতায় তখন মধ্যরাত্রি, এবং লণ্ডনে তখন দিন আরম্ভ হইয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের সময় কিরূপ তফাৎ তাহা চিত্রে বোঝান গেল।

আধুনিক কালে নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রা করিতে হইলে গ্রীনউইচের ঘড়ীর সঙ্গে মেলান একটি বা দুইটি খুব ভাল ঘড়ী সঙ্গে রাখেন। সঙ্গে আর একটি সমতুল্য ঘড়ী থাকে। দ্বিতীয় ঘড়ীর কাঁটাকে প্রতিদিন মধ্য রাত্রে ঠিক শূন্য অঙ্কে রাখিয়া দেওয়া হয়। অথবা মধ্যাহ্নে ঠিক ১২টায় রাখা হয়। মধ্যাহ্ন পর্য্যবেক্ষণ করা খুবই সোজা, কারণ তখন সূর্য্য ঠিক মাথার উপর থাকে। সূর্য্য দেখা অসম্ভব হইলে কোন চিহ্নিত তারকা পর্য্যবেক্ষণ করিলেও চলে। দুই ঘড়ীর সময়ের তফাৎ হইতে অনায়াসে দ্রাঘিমা নিরূপণ করা যায়।

জাহাজ ঠিক মত চালাইতে হইলে প্রত্যেক নাবিকের ঘরে নিম্নলিখিত যন্ত্রাদি চাই।

তারকার উন্নতি মাপিবার জন্য .Sextant বা (কোণমাপক যন্ত্র)



নৌ-দূরবীক্ষণ যন্ত্র



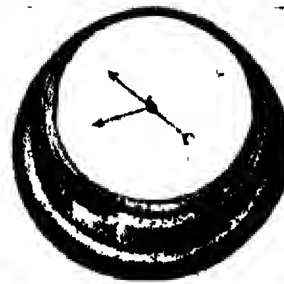
নাড়ীমান
সূক্ষ্মকালদর্শন ঘটিকা যন্ত্র



বায়ুর গতিমাপক

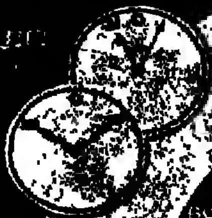
দ্রাঘিমা মাপার জন্য (Chronometer) খুব ভাল ঘড়ী

তারকা বা সূর্য্য যখন আকাশের মধ্যরেখা অতিক্রম করে, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য } (Transit Instrument) (সংক্রমণ দর্শক)



চাপমান যন্ত্র











ক্রোনোমিটার
মধ্যরাত্রি
মহাসাগর
অস্ট্রেলিয়া

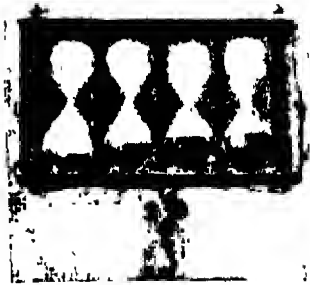


নৌ-বিদ্যার বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি

(১) সেক্সটেন্ট (Sextant) যন্ত্রের ব্যবহার। (২) জাহাজের হাল ঘর। (৩) রেডিও যন্ত্র। (৪) জাহাজ চালনার ঘর।
(৫) উচ্চস্বর যন্ত্র (loud speaker)। (৬) ঘাড ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি।

দূরস্থ জিনিষ পর্য্যবেক্ষণের জন্য ... . Telescope (দূরবীক্ষণ)
দিক্ নির্ণয়ের জন্য . . ..Mariner's Compass (সামুদ্রিক দিক্ নির্ণয় যন্ত্র)
তাপ মাপার জন্য ... ...Thermometer বা (তাপমান যন্ত্র)
বায়ুর চাপ মাপার জন্য . Barometer বা (চাপমান যন্ত্র)
বাতাসের গতি মাপার জন্য ... . Anemometer (বায়ুগতিমাপক যন্ত্র)
দূরে সংবাদ প্রেরণের জন্য......বেতার বার্ত্তাবহ যন্ত্র।

কিন্তু যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন অধিকাংশ যন্ত্র শুধু কল্পনার বিষয় ছিল। তখন সূর্য্যের উন্নতি মাপা হইত Astrolabe যন্ত্র দিয়া। সময় ঠিক করার জন্য আজকাল যেরূপ নানাবিধ ঘড়ীর ব্যবহার হয়, সেরূপ ঘড়ী তখনও আবিষ্কৃত হয় নাই। তাহারা Hour-glass দিয়া সময় নিরূপণ করিত। অন্যান্য যন্ত্র ত আরও আধুনিক।



ঘটিকা যন্ত্র (Hour-glass)

সাদার্ণ ক্রশ. (Southern-cross)

তখন জাহাজগুলি ছিল খুব বড় বড় নৌকার উন্নত সংস্করণ। তাহারা বাষ্পের জোরে চলিত না—চলিত দাঁড় বা বাতাসের জোরে।

যাহা হউক, হেনরীর চেষ্টায় অতি শীঘ্রই পর্ত্তুগাল দেশে এক সুদক্ষ নাবিকদলের সৃষ্টি হইল এবং ভাল ভাল জাহাজ তৈয়ারী হইল। তিনি তখন এক একটি নৌবহর গঠন করিয়া এক এক জন দক্ষ নাবিকের অধীনে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে প্রেরণ করিতেন। এক দল ফিরিয়া আসিলে তাহাদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত অভিজ্ঞতা সমস্ত লিখিয়া রাখা হইত এবং অন্য দল পুনরায় প্রেরিত হইত। তাঁহার প্রেরিত নাবিকদের সমুদ্র-যাত্রার ও আবিষ্কারের বিবরণ পর পৃষ্ঠার মানচিত্রে প্রদর্শিত হইল।

জার্কো (Zarco) নামক নাবিক প্রথমে মেডেরিয়া দ্বীপ আবিষ্কার করেন। যখন এই দ্বীপ আবিষ্কৃত হয়, তখন ইহা জঙ্গলময় ছিল এবং সেখানে লোকজনের বসতি ছিল না। মানুষের আবাসযোগ্য করার জন্য জার্কো এই দ্বীপে আগুন ধরাইয়া দেন। সাত বৎসর পর্য্যন্ত এই দ্বীপ জ্বলিতেথাকে এবং হেনরীর নাবিকেরা যখন দক্ষিণ দিকে যাইতেন, তখন এই দ্বীপ তাহাদের আলোকস্তম্ভের কাজ করিত। সাত বৎসরে সমস্ত দ্বীপ পুড়িয়া ছাই হইয়া গেলে, জমী পরিষ্কার করিয়া লোক বসান হয় এবং দ্রাক্ষা, ইক্ষু প্রভৃতির চাষ বাস আরম্ভ হয়। এখন মেডেরিয়া দ্বীপ হইতে ইউরোপে প্রচুর ফল রপ্তানী হয়।

1434—Gil Eannes—বহুদিন পর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজেরা Bojador অন্তরীপের দক্ষিণে যাইতে পারে নাই, কারণ পথ হারাইবার ভয়ে তাহারা শুধু উপকূল ধরিয়া ধরিয়া যাইত। এই স্থানের সমুদ্রোপকূল চড়ায় পূর্ণ ছিল। এই চড়াতে জাহাজ প্রায়ই আটকাইয়া যাইত। অবশেষে Gil Eannes নামক একজন সাহসী নাবিক উপকূল কিছু দূরে রাখিয়া খোলা সমুদ্রে জাহাজ চালান। তিনি দেখিলেন যে, কিছুদূর গেলেই আর চড়ার ভয় থাকে না, এবং সমুদ্রে বেশ স্বচ্ছন্দে জাহাজ চালান যায়। এইরূপে পর্ত্তুগীজদের বহিঃসমুদ্রে নৌচালনার ভয় ভাঙ্গিয়া গেল।

1441 Nuno Tristram—এই নাবিক প্রথমবারে Blanco অন্তরীপ, দ্বিতীয়বারে

(1445) Verd অন্তরীপ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন। এই স্থানে নিগ্রোদের সহিত যুদ্ধে জাহাজের প্রায় সমস্ত লোকই নিহত হয়, এবং সাতজন লোক কোন মতে পলায়ন করিয়া পর্ত্তুগালে ফিরিয়া আসেন।

1445 Cadamoto—Cadamosto নামক ভেনিস্ দেশীয় নাবিক হেন্‌রীর অনুমতি লইয়া গাম্বিয়া নদীর মুখ পর্য্যন্ত অগ্রসর হন এবং এখানকার নিগ্রোদের সহিত বাণিজ্য আরম্ভ করেন।

Cadamosto দেখেন যে, এইস্থানে 'ধ্রুবতারা' ক্ষিতিজ-তল হইতে মাত্র এক বর্শা (Lance) উপরে অবস্থিত। তিনি দক্ষিণ দিকে নানারূপ নূতন তারকাপুঞ্জ দেখিতে পান। তন্মধ্যে ছয়টি উজ্জ্বল তারা ক্রুশের আকারে বিন্যস্ত, এই বৃত্তান্ত পাঠে পর্ত্তুগীজদের সাহস বাড়িয়া যায়। তাঁহারা মনে করেন যে, যীশুখৃষ্ট স্বয়ং তাঁহাদের সুবিধার জন্য দক্ষিণ দিকে ক্রুশাকারে বিন্যস্ত তারকা-পুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন। ১৪৬০ খৃঃ অব্দে হেন্‌রীর মৃত্যু হয়। পর্ত্তুগালের ইতিহাসে ইহার চেয়ে বড়লোকের জন্ম হয় নাই।

Pedrode Cintra—হেন্‌রীর মৃত্যুর বৎসরেই এই নাবিক পূর্ব্বের সীমা হইতে আরও ছয় শত মাইল অগ্রসর হন। এপর্য্যন্ত পর্ত্তুগীজগণ শুধু দক্ষিণেই যাইতেছিলেন। এইবার তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে, উপকূলভাগ পূর্ব্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদের সাহস হইল যে, ক্রমে তাঁহারা পূর্ব্বদিকে যাইতে যাইতে ভারতবর্ষে পৌছিতে পারিবেন।

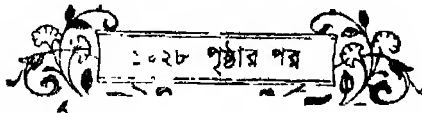
হেন্‌রীর নাবিকদের সমুদ্র-যাত্রার পথ

১৪৭১...Fernando Po—কিন্তু ১৪৭১ খৃঃ অব্দে এই নাবিক আরও পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন যে, আফ্রিকা মহাদেশের উপকূল-রেখা আবার দক্ষিণে বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাতে পুনরায় পর্ত্তুগীজদের মনে নৈরাশ্যের সঞ্চার হয়। ১৪৭৫ খৃঃ অব্দে তাঁহারা ঠিক বিষুবরেখায় পৌঁছেন। অতঃপর আর 'ধ্রুবতারা' দৃষ্টিগোচর হইল না।



থেল্‌স্

(অনুমানিক ৬৪০—৫৪৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ)



গ্রীসদেশে -এথেন্স নগরের সোলন (Solon), মিটিলিন্ নগরের পিটাকস্ (Pittacus), করিন্থ নগরের পেরিয়াণ্ডার (Periander), প্রিনিনগরের বায়াস (Bias), লাসি-ডিমন্ নগরের চিলো (Chilo) লণ্ডস নগরের ক্লিব-বিউলস্ (Cleobulus) এবং মিলিটাস্ নগরের থেল্‌স্ গ্রীসের সপ্তজ্ঞানী Seven wise men বলিয়া পরিচিত

থেল্‌সকে ইউরোপের প্রথম বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত বলিলে কোনও রূপ অত্যুক্তি করা হয় না। তিনি অঙ্কশাস্ত্রে জ্যোতির্ব্বিজ্ঞানে (Astronomy) ও রাজনীতিতে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তার ধারাই তাঁহাকে বৈজ্ঞানিক জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছে।


থেল্‌স্

সে যুগের মানুষ কোন বিষয়েই গভীর ভাবে চিন্তা করিতে জানিত না। সূর্য্য উঠিতেছে—সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। তারারা আকাশে হাসিতেছে। চন্দ্র ষোল কলায় পূর্ণ হইয়া পূর্ণচন্দ্র রূপে দেখা দিয়া আবার ধীরে ধীরে একদিন কোথায় লুকাইয়া যায়, অমাবস্যার অন্ধকার আকাশও পৃথিবীকে ঢাকিয়া ফেলে, কেন এসব হয়! এ সমুদয় চিন্তা সেকালের মানুষেরা করিত না, তাহারা সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াই দিন অতিবাহিত করিত। প্রকৃতির গোপন-রহস্য জানিবার জন্য তাহাদের মধ্যে কোনও আগ্রহ বা ব্যাকুলতা ছিল না। কিন্তু থেল্‌সের মন সেই গতানুগতিক পথ অতিক্রম করিয়া জ্ঞানের সন্ধানে ছুটিয়াছিল। তাঁহার বাসস্থান মিলিটাস্ নগর লাটমিয়ান (Latmian) উপসাগরের দক্ষিণ তীরে অবস্থিত ছিল। নীল সাগরের জলে—সহরের সাদা সাদা বাড়ীগুলির ছায়া প্রতিফলিত হইত, তিনি অনিমেষ নয়নে সেই দিকে চাহিয়া থাকিতেন। মনে হইত সাগর বুঝি অতল তলের কথা। তাহার মনে জাগিত পৃথিবী সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন ! এই পৃথিবীর কোথায় শেষ ? কেমন করিয়া এই পৃথিবী গড়িয়া উঠিল। লাটমিয়ান উপসাগরের পারে সে কোন্ দেশ? এই যে মিলিটাস্ নগরের চারিদিকে সবুজ-সুন্দর শ্যামল তরু-সুশোভিত পাহাড়গুলি দাঁড়াইয়া আছে, এই সব পাহাড়ের নীচে কি আছে? আকাশ, সাগর ও পৃথিবীর পরস্পরের সহিত কি সম্বন্ধ রহিয়াছে ? এ সকল কথা লইয়া তিনি যে শুধু চিন্তা করিয়াই নিবৃত্ত থাকিতেন

তাহা নহে, সে সমুদয় বিষয় লইয়া গভীর ভাবে চিন্তা করিতেন এবং তাহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইতেন।

এইরূপ চিন্তা করিয়া থেলসের মনে হইয়াছিল যে পৃথিবী, জল নামক মূল পদার্থ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। চারিদিকে জল দেখিতে পাইয়াই তাঁহার মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে জল হইতেই পৃথিবীর উৎপত্তি হইয়াছে। এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। তিনি দেখিতেন সাগর দিনরাত্রি আকুল আবেগে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মালা লইয়া বেলা ভূমিতে আছড়াইয়া পড়িতেছে। তিনি দেখিতেন—আকাশের বৃষ্টিধারা নামিয়া আসিয়া পৃথিবীকে সুজলা সুফলা ও শস্য-শ্যামলা করিয়া তুলিতেছে। জলের এইরূপ বৈচিত্র্য ও প্রভাব দেখিয়া তাঁহার মনে বোধ হয় এইরূপ ধারণা দৃঢ়ীভূত হইয়াছিল যে জল হইতেই পৃথিবী গড়িয়া উঠিয়াছে। এ ধারণা তাঁহার যেমন ছিল, সে কালের আরও অনেক পণ্ডিতেরও সেই রকম ছিল। সকল জীবের দেহে, সকল তরু-লতা-গুল্মের দেহেই জল কোন না কোন আকারে বিদ্যমান রহিয়াছে। ফলের জলীয় অংশ, নিজ দেহের তরল শোণিতধারাও জল ব্যতীত আর কি? এইজন্যই থেলসের মনে হইয়াছিল যে জল ব্যতীত জীবনের অস্তিত্ব থাকিতে পারে না।

এইরূপ অনুমান করিয়া লইবার পক্ষে তাঁহার মনে কতকগুলি অনুকূল যুক্তিরও উদয় হইয়াছিল। আকাশ হইতে শিশিরবিন্দু নবতৃণদলে ঝলমল করিয়া জ্বলিতে থাকে, কোথা হইতে এই শিশিরবিন্দু আসে? পৃথিবীর বুক হইতে উৎসরূপে জলের ধারা উৎসারিত হয়, কোথা হইতে এ জল আসে? রৌদ্র-তপ্ত দিনে শিশির-বিন্দু শুকাইয়া যায়—কোথায় তাহারা যায়? এই সব দেখিতে দেখিতে তাঁহার মনে হইত জলই মূল উপাদান, জল কখনো নদী, হ্রদ ও সমুদ্রের বুকে খেলা করে, কখনও বা নির্ঝর ও উৎসরূপে উৎসারিত হয়, কখনও বৃষ্টির ধারা রূপে ধরণীকে শীতল করে কখনও বা শিশির বিন্দুরূপে দেখা দেয় আবার লুপ্ত হয়, জলের এই যে নানারূপ পরিবর্ত্তন ইহা হইতেই তাঁহার মনে হইয়াছিল যে পৃথিবী জলের উপর ভাসিতেছে।

একথা যে প্রকৃত নহে তাহা তোমরা জান। কিন্তু সে সময়ে পৃথিবীর উৎপত্তির এই সিদ্ধান্তের মূলে অনুসন্ধিৎসার যে সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ শক্তি ছিল তাহা ত উপেক্ষণীয় নহে। এজন্যই থেলস্‌কে আজও সকলে প্রথম বৈজ্ঞানিক বলিয়া সম্মানিত করিয়া থাকেন।

থেলস্ লবণের ব্যবসায় করিতেন। এই ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি নানা দেশ-বিদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে, ব্যবসায় উপলক্ষে থেলস্ মেসোপটামিয়া এবং মিশরে গমন করিয়াছিলেন। বেবিলনের দেব-মন্দিরের জ্যোতির্ব্বিদগণের নিকট তিনি গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধির পর্য্যবেক্ষণ পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিয়া জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানলাভ করেন।

থেলস্ সেকালে জনগণের নিকট কেন এত শ্রদ্ধা পাইয়াছিলেন জান?—তিনি একবার প্রচার করিলেন যে—৫৮৫ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের ২৮শে মে তারিখে সূর্য্যগ্রহণ হইবে। সত্য সত্যই সে দিন সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণ হইল। এই ঘটনার পর তাঁহার নাম ও যশঃ আরও বিস্তৃত হইয়া পড়িল।

সে কালের মিলিটাস্ নগরী ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। মিলিটাস্ নগরের বণিকেরা বাণিজ্য-তরী সাজাইয়া দেশে দেশে বাণিজ্য করিতে যাইত। নাবিকরা দিক্ নির্ণয় করিতে না পারিয়া সময় সময় বিপন্ন হইয়া পড়িত। এজন্য থেলস্ কি ভাবে কোন্ লক্ষ্য নির্দ্দেশে বাণিজ্য-তরণী পরিচালনা করিলে বণিকেরা বিপদে পড়িবে না—তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন। ধ্রুবতারার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া চলিলে দিক্ ভ্রষ্ট হইবার সম্ভাবনা রহিবে না, বণিক্‌দিগকে তিনিই এবিষয়ে প্রথম উপদেশ দিয়াছিলেন। থেলস্ আকাশের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া গ্রহনক্ষত্রাদির অবস্থানও নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই আকাশের মানচিত্র অঙ্কিত করেন নাই।

মিশরের লোকেরা নীলনদের বন্যাপ্লাবিত ভূমির পরিমাপ ঠিক করিতে যাইয়া ক্ষেত্রতত্ত্বের (Geometry) প্রাথমিক জ্ঞানলাভ করিতে পারিয়াছিল। থেলস্ মিশরের জ্ঞানভাণ্ডারের এই অমূল্য দান সকলের আগে গ্রীসদেশে প্রবর্ত্তন করেন। কোনও উঁচু জিনিষের উচ্চতা মাপিতে হইলে তাহার ছায়া মাপিয়া উচ্চতা নির্দ্দেশ করিবার কৌশল থেলসেরই আবিষ্কার। (শিশু-ভারতী—৭৯৮—৯৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

রাজনীতির দিকে তাঁহার দৃষ্টি কেমন করিয়া আকর্ষিত হইয়াছিল সেবিষয়ে একটি অতি ছোট ইতিহাস আছে। সে সময়ে এসিয়ামাইনরের 'আইয়োনিয়া' (Ionia) গ্রীক্‌দের কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্য

ছিল, এই ছোট ছোট দেশের রাজারা সদাসর্ব্বদা কলহ করিতেন ও যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন। তিনি তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন যে তোমরা যুদ্ধ করিয়া শক্তি ক্ষয় না করিয়া মৈত্রীতন্ত্র শাসন (Federal State) রীতিতে মিলনসূত্রে বদ্ধ হইয়া রাজ্য শাসন কর, তাহা হইলে তোমাদের শক্তি ও বল বৃদ্ধি পাইবে এবং তোমাদের পরস্পরের স্বাধীনতাও অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু থেলসের এই সদুপদেশ গ্রহণ না করার ফলে তাহারা একে একে পারসিক জাতির পদানত হইয়াছিল।

থেল্‌স্‌কে জনসাধারণ কিরূপ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত নিম্নলিখিত গল্পটি হইতেই তাহা বুঝিতে পারিবে। তিনি মিলিটাস্ নগরের যে অংশে থাকিতেন—সেখানে একটি ধীবর-পল্লী ছিল। ধীবরেরা একবার জালে একটি সোনার ত্রিপদ আসন পাইল। লোকে বলিতে লাগিল যে এই সুবর্ণ-নির্ম্মিত ত্রিপদটি ট্রয়ের হেলেন্ কর্তৃক সমুদ্রের বুকে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এই ত্রিপদটি লইয়া শহরের মধ্যে একটা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল। কে এই ত্রিপদটি পাইবে তাহা লইয়া সহরের বিভিন্ন দলের লোকদের মধ্যে কলহেরও সৃষ্টি হইল। আপোলোদেবের মন্দির হইতে এইরূপ দৈববাণী হইল যিনি গ্রীসের সর্ব্বপ্রধান জ্ঞানী ব্যক্তি তিনিই ত্রিপদটি গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন। ত্রিপদটি যখন থেল্‌সের কাছে আসিল, তখন তিনি আপনাকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া মনে করিলেন না, কাজেই তাহা আর গ্রহণ করিলেন না, উহা ফিরাইয়া দিলেন। উহা একে একে বিয়াস্ (Bias), সোলন (Solon) প্রভৃতি পণ্ডিতদের নিকটও প্রেরিত হইল। তাঁহারাও থেল্‌সের ন্যায় আপনাদিগকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী মনে করিলেন না। অবশেষে ঐ ত্রিপদটি থিব্‌সের (Thebes) আপোলোদেবের মন্দিরে রক্ষিত হইল।

থেল্‌সের সময় হইতেই ইউরোপে মানুষের মনে স্বাধীন চিন্তার ধারা এবং প্রত্যেকটি বিষয়ের কারণ বা তথ্যানুসন্ধানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। তাঁহার প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াই যুগে যুগে চিন্তার ধারা প্রবাহিত হইতেছে। এই সব নানা কারণেই থেল্‌স গ্রীসদেশের সপ্ত জ্ঞানীর একজন শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী বলিয়া শ্রদ্ধা পাইয়া আসিতেছেন।

ডেমোক্রিটাস্

(আনুমানিক—৪৬০–৩৬২ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)

থেস্ এবং ম্যাকিডোনিয়ার সীমান্তবর্ত্তী আব্‌দেরা (Abdera) নামক স্থানে ডেমোক্রিটাস্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আব্‌দেরা, বানিজ্য-প্রধান স্থান ছিল। নানা দেশ-বিদেশের বণিকেরা ব্যবসায় উপলক্ষে সেখানে যাতায়াত করিত। ডেমোক্রিটাস্ ধনীর সন্তান ছিলেন—প্রচুর ধন-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়া তিনি নানা দেশ পর্য্যটন করিয়াছিলেন। ডেমোক্রিটাস্ মিশরে প্রায় সাত বৎসর কাল অতিবাহিত করেন। সেখানে গণিত-শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। পর্য্যটক হিসাবে ডেমোক্রিটাসের খুব খ্যাতি ছিল। তিনি নিজে লিখিয়া গিয়াছেন—'আমার সমসাময়িক লোকদের মধ্যে আমার ন্যায় কেহই দেশ পর্য্যটন করেন নাই। আমি নানা দেশের বিদ্বান্ ও সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের সহিত পরিচিত হইয়াছি—তাঁহাদের উপদেশ শুনিয়াছি এবং তাঁহাদিগের নিকট আমার মনে যে সকল বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছে তাহার মীমাংসা করিয়া লইয়াছি।"

ডেমোক্রিটাস্

ডেমোক্রিটাসের এই উক্তির মধ্যে গর্ব্বের ভাব প্রকাশিত হইলেও ইহা অত্যুক্তি নহে। সেকালের গ্রীকেরা এইরূপ আত্মপ্রশংসা করিতে লজ্জিত হইতেন না। সে যাহাই হউক না কেন, ডেমোক্রিটাস্ প্রকৃত পক্ষে কিন্তু বিনয়ী এবং নিরহঙ্কারী লোক ছিলেন। বিদ্যার গর্ব্ব তাঁহার একেবারেই ছিল না।

থেল্‌সের ন্যায় ডেমোক্রিটাস্‌ও সৃষ্টি-রহস্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক কিছু গবেষণা করেন। তাঁহার মতে বিশ্বজগৎ অণু ও পরমাণুর সমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে—এজগতে এমন এতটুকু ক্ষুদ্র স্থানও নাই যেখানে অণু পরমাণু বিদ্যমান না আছে। পৃথিবী ও বিশ্বজগত অণু-পরমাণুর সমষ্টি মাত্র। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, অনন্ত আকাশের অনন্ত বুকে সৌরজগৎ বিদ্যমান রহিয়াছে। সেই অনন্ত অপরিসীম বিশ্বজগতের বিরাট কল্পনা মানুষের অতি ক্ষুদ্র জ্ঞান ও বুদ্ধির আয়ত্তাধীন

নহে। তাঁহার এই যে সিদ্ধান্ত, তাঁহাকে মূল ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিকগণ জগৎ সৃষ্টি সম্বন্ধে নানারূপ গবেষণা করিতেছেন।

ডেমোক্রিটাস্ যে যুগে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে যুগে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের কথা দূরে থাকুক তাহার কল্পনাও কাহারও মনে ছিল না। সে সময়ে তিনি গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া এবং পৃথিবীর গঠন রীতি এবং সৃষ্ট জীব ও জন্তুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যে সব বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা বাস্তবিকই প্রশংসার্হ। তাঁহার দুই হাজার বৎসর পরে সুপণ্ডিত গ্যালিলিও তাঁহারই প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া জ্যোতির্বিদ্যা এবং পদার্থ-বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক নূতন কথা বলিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন। ডেমোক্রিটসকে এই জন্য ইয়োরোপীয়েরা "পদার্থ-বিজ্ঞানের পিতা" (The father of physics) বলিয়া থাকেন।

বৈজ্ঞানিক ডেমোক্রিটাস্ জনপ্রিয় ছিলেন। আবদেরার লোকেরা তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। তাহারা তাঁহার নাম দিয়াছিল "খোস্‌মেজাজী পণ্ডিত।" তাঁহার মুখের মিষ্ট হাসি ও মধুর সম্ভাষণে সকলেই প্রীতিলাভ করিত। এই হাস্যময় সদা-প্রফুল্ল দার্শনিক মানুষের ত্রুটি-বিচ্যুতি সর্ব্বদা তাহারা ক্ষমার চক্ষে দেখিত। নানা দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করিয়া নানা জাতীয় লোকের সহিত মেলা-মেশার দরুণ তিনি সকল মানুষকেই ভালবাসিতে শিখিয়াছিলেন। ডেমোক্রিটাস্ বলিতেন—"মানব! তোমার জীবনকে সুন্দর কর, চরিত্রবান্ হও এবং বিধাতার শ্রেষ্ঠ দান এই জীবনের প্রকৃত মর্য্যাদা দান কর। সংযম ও শিক্ষা দ্বারা তাহাকে মহৎ করিয়া তোল। প্রত্যেক বিষয়েই পরিমিত ভাবে সংযমের ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত কর, তাহা হইলে সুখী হইবে এবং দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারিবে।" ডেমোক্রিটাস্ নিজেও চরিত্রবান্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। আবদেরার লোকেরা তাঁহাকে কিরূপ ভালবাসিত নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে তাহা বেশ বুঝিতে পারিবে। একবার ডেমোক্রিটাস্ দেশ-ভ্রমণের পর কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া আবদেরাতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। দেশের লোকেরা তাঁহার এইরূপ দুরবস্থার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে পাঁচশত টেলেণ্ট (গ্রীসদেশীয় স্বর্ণমুদ্রা) দান করিলেন। ডেমোক্রিটাসের এইরূপ অবস্থায় তাহাদের মনে হইল যে হয়ত বা তাঁহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া থাকিবে নতুবা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির এইরূপ শোচনীয় অবস্থা হইবে কেন? এইজন্য তাঁহারা সেকালের প্রধান চিকিৎসক হিপোক্রেটিস্‌কে আহ্বান করিলেন। হিপোক্রেটিস তাহাকে পরীক্ষা করিয়া নগরবাসীদিগকে বলিলেন যে ডেমোক্রিটাসের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই—তিনি শারীরিক ও মানসিক কুশলেই আছেন। তাঁহার বিষয়ে চিন্তার কোন কারণ নাই।

হিপোক্রেটিস্ ডেমোক্রিটাসের সহিত আলাপ ও পরিচয়ে একেবারে মুগ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিছুদিন আবদেরাতে থাকিয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ের আলোচনা করিয়া তবে হিপোক্রেটিস্ দেশে ফিরিয়া যান।

হিপোক্রেটিস ও ডেমোক্রিটাসের মধ্যে যে সকল পত্র ব্যবহার চলিয়াছিল—সে সমুদয় পত্রাবলি আজও সুরক্ষিত আছে। ঐ সব পত্রাবলি পাঠ করিলে বুঝিতে পারা যায় যে এই দুইজন মহাপুরুষ কিরূপ মহানুভব, জ্ঞানী এবং সুপণ্ডিত ছিলেন।

সেকালে আবদেরা একদিকে যেমন বিদ্যা-কেন্দ্র ছিল অন্যদিকে তেমন ছিল শিল্প ও বাণিজ্যের শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র স্থান। এই জন্য সেকালে ইহার খুবই প্রসিদ্ধি ছিল, কিন্তু ডেমোক্রিটাস্ এই স্থানে জন্মগ্রহণ করায় নানা দেশ-বিদেশের পণ্ডিত-সমাজে সেকালে আবদেরার নাম বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

ইউক্লিড

(আনুমানিক ৩২০—২৭৫ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ)

আলেক্‌জেন্দ্রিয়া (Alexandria) নগরের রাজা প্রথম টলেমি (Ptolemy I) ইউক্লিডকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—'মহাশয়! ক্ষেত্রতত্ত্ব শিখিবার কি কোনও সহজ পথ আছে?' তখন জ্যামিতি-বিদ্যার জন্মদাতা ইউক্লিড বলিয়াছিলেন—জ্যামিতি-বিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন রাজপথ (সহজ পথ) নাই There is no Royal Road to geometry)।

সেই হতে ইউক্লিড রাজাকে এই কথা বলিয়াছিলেন,

সেই কথাটি আজও স্কুলের ছেলেমেয়েরা যখন জ্যামিতি পড়িতে আরম্ভ করে তখন উহা বার বার স্মরণ করিয়া থাকে। কবে ইউক্লিড জ্যামিতি-বিদ্যার অনুশীলন ও প্রচলন করেন তারপর প্রায় আড়াই হাজার বৎসর চলিয়া গিয়াছে—এখনও ইউক্লিডের প্রদর্শিত পথানুসরণ করিয়াই এবং তাঁহার নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত সমূহকেই সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া পৃথিবীর সবদেশের লোকেরাই ক্ষেত্রতত্ত্ব অধ্যয়ন করিতেছে এবং তাহার আলোচনা করিয়া আসিতেছে।

ইহাই প্রতিভার প্রকৃত পরিচয়। প্রতিভার উজ্জ্বল প্রভা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হ্রাস না পাইয়া বরং আরও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠে—ইউক্লিডের জীবনী তাহার অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন। আজও কোন গণিতজ্ঞ পণ্ডিত তাঁহাকে জ্যামিতি-বিদ্যায় অতিক্রম করিতে পারেন নাই।


ইউক্লিড

ইউক্লিডের জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তিনি জাতিতে গ্রীক্ ছিলেন এবং সম্ভবতঃ এথেন্স নগরীতে শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় আলেকজেন্দ্রিয়া নগরীতেই তিনি জ্যামিতি রচনা করেন। ৩০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে আলেকজেন্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইউক্লিড সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে অধ্যাপনা করিবার সময়ই তিনি জ্যামিতি রচনা করিয়াছিলেন। সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা কার্য্যেই তাঁহার সমগ্র জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল।

ইউক্লিড নিরহঙ্কার প্রকৃতির লোক ছিলেন। বিনয় ছিল তাঁহার চরিত্রের ভূষণ। মিশরের রাজা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন—তাঁহার সুখ ও সুবিধার জন্য অর্থ ব্যয় করিতে কোনরূপ কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। ইউক্লিডের নিকট অধ্যয়ন করিবার জন্য পৃথিবীর নানা দেশ হইতে ছাত্র আসিত। তিনি গ্রীক্ ভাষায় অধ্যাপনা করিতেন বলিয়া সে সময়ে গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিবার জন্য মিশরের সর্ব্বত্র বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। এই সব বিদ্যালয়ে—মিশরী, হিন্দু, পারসিক, আরব ও অন্যান্য নানাজাতির ছাত্রেরা গ্রীক্ ভাষা শিক্ষা করিয়া ইউক্লিডের নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিত।

ইউক্লিডের শিক্ষাদান সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। এখানে তাহার একটি গল্প বলিতেছি। একবার একটি বালক তাহার নিকট হইতে জ্যামিতির প্রথম প্রতিজ্ঞাটি শিক্ষা করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মহাশয়, আমার ইহা শিক্ষা করিয়া কি লাভ হইল।" ইউক্লিড তাঁহার ক্রীতদাসকে ডাকিয়া বলিলেন—এই বালককে তিন আনার পয়সা দেও,—তাহা হইলেই সে বুঝিতে পারিবে যে আমার নিকট জ্যামিতির প্রথম প্রতিজ্ঞাটি শিক্ষা করিয়া সে কি লাভ করিল।

ইউক্লিডের পূর্ব্বেও অনেক খ্যাতনামা গণিতজ্ঞ পণ্ডিত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, কিন্তু তাহার ন্যায় বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রণালী অনুসারে জ্যামিতি-বিদ্যার আলোচনা কেহই করিতে পারেন নাই। প্রত্যেকটি সমাধানের মধ্যে তর্কযুক্তি এবং যে অপূর্ব্ব দূরদৃষ্টি এবং সঠিক্ সিদ্ধান্তের পরিচয় পাওয়া যায়—তাহা আজিও দুর্লভ। ইউক্লিড তাহার জ্যামিতির দ্বারা পৃথিবীতে অমর হইয়া রহিয়াছেন।



অচিনপুরী

(গ্রীসদেশের উপকথা)

১০৫৬ পৃষ্ঠার পর

এক ছিলেন রাজা। তাঁর একটি মাত্র ছেলে ছিল। শিকার করতে রাজপুত্র বড় ভালবাসতেন। রাজত্ব করতে করতে রাজা বুড়ো হ'য়ে গেলেন, দেখ্‌তে দেখ্‌তে তাঁর দিন ফুরিয়ে এল। তখন একদিন ছেলেকে কাছে ডেকে তার হাতে একটি ছোট বাক্স দিয়ে বল্লেন,—শিকার করতে যেদিন তুমি পূব দিকে যাবে, সেদিন এটিকে সঙ্গে নিও। কিন্তু ভয়ানক বিপদে না পড়লে কখনো এটিকে খুলো না।

তারপরেই তাঁর মৃত্যু হ'ল।

শোকে-দুঃখে রাজপুত্র অধীর হ'য়ে পড়লেন। রাজ-কার্য্য তিনি আর দেখেন না। বুড়ো মন্ত্রী দেখ্‌লে মহা বিপদ! সব যেতে বসেছে। তখন অনেক ভেবে বুদ্ধি ক'রে একদিন এসে বল্লে—মহারাজ, পূব দিকের বনে বাঘের বড় উপদ্রব হ'য়েছে, চলুন শিকারে যাওয়া যাক্‌। শিকারের নাম শুনে রাজপুত্র আর 'না' বল্‌তে পারলেন না, রাজী হ'য়ে গেলেন। তখন অনুচরবর্গ নিয়ে নূতন রাজা শিকারে বেরিয়ে পড়লেন।

অনেক জন্তু-জানোয়ার মেরে বনের পথ ধরে সবাই ফিরে আসছেন, এমন সময় দেখতে পেলেন সামনে পথের একধারে একটি প্রকাণ্ড দুর্গ রয়েছে। তার ভিতরে কি আছে জানতে রাজপুত্র উৎসুক হ'লেন। অনুচরদের মধ্যে একজনকে তিনি তখনই পাঠিয়ে দিলেন। যাবার সময় সে বলে গেল তিনদিনের মধ্যে যদি না আসি তবে বুঝতে পারবেন যে আমি আর বেঁচে নেই। তিন দিন যায়—চার দিন যায়—সে আর ফিরে আসে না। তখন আরো একজন অনুচর পাঠালেন। কিন্তু সেও ফিরল না। এবার গেলেন মন্ত্রী; কিন্তু তিনিও যখন ফিরে এলেন না, তখন রাজা নিজে চললেন সেই অজানা পুরীর



পথের ধারে এক প্রকাণ্ড দুর্গ

উদ্দেশ্যে, দুর্গের দ্বারের কাছে এসে দেখলেন তাতে লেখা রয়েছে,—এ পুরীতে প্রবেশ করলেও অনুতাপ করতে হ'বে, না করলেও অনুতাপ করতে হ'বে।—

রাজপুত্র মনে মনে ভাবলেন,—তা' হলে একবার ভেতরে প্রবেশ ক'রে দেখেই নেওয়া যাক্। এই ভেবে



সোনার পালঙ্কে একটি ছেলে শুয়ে আছে

আর মুহূর্তমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ-পথেই দেখতে পেলেন বারোজন সশস্ত্র যোদ্ধা মুক্ত তরবারি হস্তে দাঁড়িয়ে আছে। তারা রাজাকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে চল্‌ল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে এগারোটি ঘর অতিক্রম ক'রে রাজা অন্য একটি ঘরে এসে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে যা দেখলেন তাতে তিনি অবাক্ হ'য়ে গেলেন। সেখানে সোনার পালঙ্কে, সোনায় মোড়া বিছানায় একটি ছেলে শুয়ে আছে। সে চোখও খুল্‌ছে না, কথাও বল্‌ছে না। তখন সেই যোদ্ধাদের মধ্যে একজন রাজাকে বল্লে,—আপনি একে তিনটি প্রশ্ন করুন। কিন্তু ছেলেটি যদি সেই তিনটি প্রশ্ন বুঝে নিয়ে উত্তর দিতে না পারে তবে আপনি প্রাণ হারাবেন।

রাজা দেখলেন 'মহাবিপদ'। কি করবেন ঠিক করতে না পেরে তিনি নীরবে ভাবতে লাগলেন। হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল সেই বাক্সটির কথা। তিনি মনে মনে ভাবলেন—তাইতো, প্রাণ হারানোর চেয়ে বড় বিপদ আর আমার কি হ'তে পারে? তবে এখনই তো ঠিক সময় হয়েছে! এই বলে বাক্স খুলে



দু'জনের মধ্যে কে মেয়েটির স্বামী

ফেললেন। অমনি তার থেকে একটি আপেল মাটিতে পড়ে গড়িয়ে পালঙ্কের কাছে গিয়ে থামল। রাজা অবাক হ'য়ে ভাবলেন—এর থেকে আমার প্রাণ-রক্ষার কি সাহায্য হবে? কিন্তু তখনই তাঁর সব সন্দেহ দূর ক'রে দিয়ে সেই অদ্ভুত আপেলটি কথা বলতে আরম্ভ করলে। আপেল বলতে লাগল,—একটি লোক তার স্ত্রী এবং ভাইকে নিয়ে পথ চলছিল। যেতে যেতে পথেই তাদের রাত হ'ল। সঙ্গে খাবার কিছুই ছিল না। ভাইটি তখন খাবারের সন্ধানে পাশের গ্রামে চলল। কিন্তু পথে ডাকাতরা তাকে মেরে ফেললে। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে বড় ভাইটিও ছোট ভাইকে খুঁজতে যেয়ে ডাকাতের হাতে প্রাণ হারাল। তার স্ত্রী সারারাত একা বসে প্রতীক্ষা ক'রে ভোরের আলো ফুটে উঠার সঙ্গে সঙ্গে স্বামীর সন্ধানে চলিল। কিছুদূর এসেই দেখলে দুই ভাই পড়ে আছে—দুজনারই মাথা দেহ থেকে

বিচ্ছিন্ন। তাই না দেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সে কাঁদতে লাগল। ঠিক এমনি সময় একটা ছোট ইঁদুর গর্ত থেকে খাবার খুঁজতে বেরিয়ে এসে সেই মৃতদেহ দুটির পাশে দাঁড়াল। মেয়েটি তাই দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসে একটা পাথর ছুড়ে ইঁদুরটিকে মেরে ফেলল। তারপর আবার কাঁদতে আরম্ভ করল। কিছুক্ষণ যায়। তারপর সেই ছোট ইঁদুরটির মা তাকে খুঁজতে বেরিয়ে এল। এসে যখন দেখলে যে ইঁদুরটি মরে পড়ে আছে তখন ছোট একটি শিকড় কোথা থেকে নিয়ে এসে তার নাকের কাছে ধরলে। দেখতে দেখতে ছোট ইঁদুরটি উঠে বসল, তারপর তার মায়ের সাথে গর্তে ঢুকে গেল। মেয়েটি অবাক হ'য়ে চুপ ক'রে বসে এতক্ষণ সব দেখছিল। এবার তাড়াতাড়ি উঠে মৃতদেহ দু'টির সঙ্গে মাথা জোড়া দিয়ে সেই



কে মানুষটি সৃষ্টি করিল

শিকড়টি ছুঁইয়ে দিলে। দেখতে দেখতে দু'জনেই বেঁচে উঠল। কিন্তু দেখা গেল যে মাথা দুটি উল্টো ক'রে লাগান হ'য়েছে। এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এই দুজনের মধ্যে কে মেয়েটির স্বামী হ'বে?

ছেলেটি চোখ মেললে বললে,—যার দেহে স্বামীর মাথা লাগান হ'য়েছে সেই হবে মেয়েটির স্বামী।"

উত্তর শুনে রাজা খুব খুশী হ'লেন।

তখন আপেলটি আবার বলতে লাগল,—

এক ছুতোর, এক দর্জ্জি, আর এক পুরোহিত একসঙ্গে দেশ ভ্রমণে চললো। সারাদিন চলে তারা এক মহাবনে প্রবেশ করলো। কিন্তু বন অতিক্রম করার আগেই রাত হ'য়ে গেল। তখন এক জায়গায় আগুন জ্বেলে রাতের মত তারই চার পাশে শুয়ে পড়ল। স্থির হ'ল এক এক প্রহর এক এক জন প্রহরীর কাজ করবে। প্রথম প্রহর তো তিন জনই জেগে কাটালে। দ্বিতীয় প্রহরে ছুতোর জেগে রইল। খানিকক্ষণ একা চুপচাপ বসে বসে বিরক্ত হ'য়ে সে শেষকালে একটা গাছের ডাল কেটে নিয়ে মানুষ তৈরী ক'রে রেখে দিল। তৃতীয় প্রহরে দরজির জাগবার কথা। সে বসে বসে কাপড় তৈরী ক'রে কাঠের মানুষটিকে পরিয়ে দিলে। চতুর্থ প্রহরে পুরোহিত জেগে দেখে, বাঃ বেশতো একটি কাঠের মানুষ। তখন সে তপস্যার বলে মানুষটিকে প্রাণ দিলে। এখন বলতে পার কি মানুষটিকে সৃষ্টি করলে কে?

ছেলেটি আবার চোখ মেলে বল্লে,—যে তাকে প্রাণ দিয়েছে, সেই তার সৃষ্টিকর্ত্তা। বলেই আবার আগের মত ঘুমিয়ে পড়ল।

তখন আবার আপেলটি বলতে লাগল--তিন বন্ধু ছিল। একজন জ্যোতিষী, একজন চিকিৎসক। তৃতীয় জন খুব দ্রুত ছুটতে পারত। জ্যোতিষী একদিন বল্লে--এক দেশের রাজার একমাত্র ছেলে অত্যন্ত পীড়িত। তাই শুনে চিকিৎসক একটি চমৎকার ওষুধ তৈরী করে দিলে। তখন তৃতীয় বন্ধু ছুটে গিয়ে ওষুধটি দিয়ে এল। এখন আমার প্রশ্ন হ'চ্ছে এই--কে ছেলেটিকে বাঁচিয়ে তুল্লে?

ছেলেটি বল্লে—যে ওষুধ তৈরী ক'রে দিয়েছে, সেই বাঁচিয়েছে। এই উত্তর আসবার সঙ্গে সঙ্গেই আপেলটি গড়িয়ে এসে বাক্সে ঢুকে গেল। ছেলেটিও উঠে চোখ মেলে বস্‌লে। তারপর রাজাকে অনেক আদর যত্ন ক'রে বল্লে—অনেক লোকই এখানে এসেছে কিন্তু কেউ আমার প্রাণ দিতে পারেনি। আপনি আজ আমার যে উপকার করলেন তার পরিবর্ত্তে কি চান বলুন। রাজা তাঁর অনুচরদের বাঁচিয়ে দিবার প্রার্থনা জানালেন। অমনি তারা সবাই বেঁচে উঠল। খুসী হ'য়ে রাজা ছেলেটির দেওয়া অনেক ধনরত্ন উপহার নিয়ে নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

সাহ্‌মের ছেলে

(পারস্য দেশের উপকথা)

পারস্যের সম্রাটের প্রধান সেনাপতি ছিলেন সাহম্। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। এজন্য দুঃখের আর তাঁর শেষ ছিল না। অনেক বছর এমনি ক'রে কেটে যাবার পর তাঁর একটি ছেলে হ'ল। কিন্তু দুঃখ তাঁর তাতেও ঘুচ্‌ল না। দেখ্‌তে ছেলেটি হ'ল পরম সুন্দর। কিন্তু হ'লে কি হ'বে—চুলগুলি যে তার একেবারেই ধবধবে সাদা। সবাই ভয় পেয়ে বলতে লাগল,—এ ছেলে নিশ্চয়ই রাজ্যে ঘোর অমঙ্গল ডেকে আন্‌বে। একে মেরে ফেলাই ভাল। এই একই কথা সকলের কাছে শুন্‌তে শুন্‌তে সাহমের মনও যেন কি রকম হ'য়ে গেল। লোকজনদের ডেকে তিনি আদেশ দিলেন,—এল্‌বুর্জ পর্ব্বতের গায়ে যে নিবিড় বন আছে, সেইখানে একে রেখে এস। তারাও সেই নিষ্ঠুর আদেশ পালন করলে। ছোট অসহায় শিশু একা সেই নিবিড় বনে পড়ে রইল—বুঝি বা বাঘ সিংহের মুখের গ্রাস হ'বার জন্য।

তারায়-ভরা আকাশকে ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে—এমনি উঁচু এল্‌বুর্জ পর্ব্বতের চূড়ো। সিমুর্গ বলে এক আশ্চর্য্য পাখী সেখানে বাসা বেঁধে রয়েছে। আবলুস্ আর চন্দনের কাঠে তৈরী তার সে বাসা। ছোট্ট তার ছানা দুইটির জন্য সে খাবার খুঁজতে বেরিয়েছে। তারই চোখে পড়ল নিবিড় বনের অন্ধকারে শুয়ে রয়েছে সেই অসহায় ক্ষুধা কাতর শিশুটী। শিশুটিকে ঠোঁটে তুলে সে নিয়ে আসছে এমন সময় কে অদৃশ্য কণ্ঠের আদেশ বাণী তার কাণে এল, এ ছেলেটিকে তুমি যত্ন ক'রে পালন ক'রো, কারণ তোমার এ ছেলে হ'বে সেই সন্তান হ'বে জগতের বীর।

তখন সেই এলবুর্জ পর্ব্বতের চূড়োয় সিমুর্গ পাখীর যত্নে ছেলেটি বড় হ'য়ে ক্রমে দশ বছরের হ'ল। পাখী তাকে মানুষের ভাষা শিখিয়ে দিলে, কিন্তু জন্মের কথা কিছুই জানালে না।



চোখে পড়ল অসহায় শিশুটি



নিরাশ হয়ে সাহম সেখানে দেবতাকে ডাকতে লাগলেন

—২—

এদিকে সেই পরিত্যক্ত শিশুটির জন্য শোকে-দুঃখে সাহমের দীর্ঘ দিনগুলি কেটে যাচ্ছে। এমন সময়

এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখতে পেলেন, দেবতা তাঁকে তাঁর নিষ্ঠুরতার জন্য তিরস্কার করছেন। তারপর দিনই রাজ্যের সব জ্যোতিষী ডেকে তাদের কাছ থেকে সাহম্ জানতে পেলেন যে এল্‌বুর্জ পাহাড়ের চূড়োয় সিমুর্গ পাখীর কাছে তাঁর ছেলেটি যত্নে পালিত হ'চ্ছে। লোকজন নিয়ে তার সন্ধানে তিনি এল্‌বর্জ পর্ব্বতের নীচে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু কাচের মত মসৃণ পাহাড়ের সেই বরফ-ঢাকা গা বেয়ে চূড়োতে ওঠা কি মানুষের পক্ষে সম্ভব? নিরাশ হ'য়ে সাহম্ সেখানে দেবতাকে ডাকতে লাগলেন। দেবতার দয়া হ'ল। সিমুর্গ নীচের দিকে তাকালে। দেখে বুঝলে যে, এবার তার এতদিনের যত্নে পালিত ছেলে-টিকে দিয়ে দিতে হ'বে। ছেলেটিকে ডেকে তখন সে সব কাহিনী বল্লে।

বিদায়ের সময় এল। সিমুর্গ মাকে ছেড়ে যেতে হ'বে ব'লে ছেলেটি কাঁদতে লাগল। নিজের দুঃখ চেপে রেখে পাখী তাকে কত সান্ত্বনা দিলে। তারপর বুক থেকে তিনটি পালক খুলে নিয়ে তার হাতে দিয়ে বল্লে,—"এ তিনটিকে যত্ন ক'রে রেখে দিও, তা হ'লেই পাহাড়ের চূড়োয় সিমুর্গ-মাকে তোমার মনে পড়বে। যদি কখনও বিপদে পড়, তবে এর একটিকে আগুনে ফেলে দিও। যেখানেই থাকি আমি তখনই তোমার কাছে চলে আসব।" এই ব'লে পাখী তাকে সাহমের কাছে দিয়ে এল। আদর ক'রে সাহম্ তাঁর হারানো ছেলেকে বুকে তুলে নিলেন, আর তাঁর নাম রাখলেন 'জাল'।

ক্রমে জাল অস্ত্র বিদ্যায় পরম পণ্ডিত হয়ে উঠলেন। বিদ্যায় বুদ্ধিতেও তাঁর জোড়া আর রইল না। পারস্যের সম্রাটের পরম স্নেহের পাত্র হ'য়ে তিনি পরম সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

এমনি ক'রে দিন যায়। এ রকম অলস জীবন কাটাতে কিন্তু আর জালের ভাল লাগল না। পিতার এবং সম্রাটের অনুমতি পেয়ে অনুচরবর্গ নিয়ে তিনি দেশ-ভ্রমণে চল্‌লেন। ক্রমে চল্‌তে চল্‌তে তিনি কাবুলে এসে উপস্থিত হ'লেন। সেই দেশের রাজার মেয়ে রুদাবে ছিলেন অপূর্ব্ব সুন্দরী। ডালিম ফুলের মত টুকটুকে তাঁর গালের লাল রঙ্। পদ্মের পাপড়ির মত সুন্দর দু'টি চোখের উপর নেমে এসেছে কাক পক্ষের মত কালো আঁখি পাতার ছায়া। হাসিটি তার ভোর বেলার ফুলের হাসিটির মতই কোমল মধুর—স্বভাবটিও তেমনি মিষ্টি। সবার মুখে তাঁর রূপ এবং গুণের প্রশংসা শুনে জাল মুগ্ধ হ'য়ে গেলেন। রুদাবেও জালের বীরত্বের, জ্ঞানের এবং সৌন্দর্য্যের কথা শুনে মুগ্ধ হ'লেন।

কিন্তু তাঁদের দু'জনের মিলনের পথে এসে দাঁড়াল প্রকাণ্ড এক বাধা—পারস্যের সম্রাটের সঙ্গে কাবুলের সম্রাটের শত্রুতা।

যাই হোক, দূত পাঠান হ'ল পারস্যে—সম্রাটের অনুমতি নেবার জন্য। কিন্তু এ সংবাদ শুনেই তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'য়ে সম্রাট সৈন্য সজ্জিত করতে আদেশ দিলেন। সব প্রস্তুত, কিন্তু এমন সময় রাজ জ্যোতিষী তাঁকে একান্তে ডেকে বল্‌লেন, সম্রাট এই বিয়েতে আপনি বাধা দেবেন না। এদের যে ছেলে হবে তার বীরত্বের খ্যাতি হ'বে জগৎ জোড়া। তার গৌরবে সমস্ত পারস্য গৌরবান্বিত হ'বে। এ কথা শুনে তখনই সম্রাট সৈন্যদের ডেকে সজ্জা খুলে ফেল্‌তে বল্‌লেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে হ'ল জালের বুদ্ধির পরীক্ষা নেবার। কাজেই, সম্রাট দৈবজ্ঞের গণনা গোপন রেখে প্রচার করলেন যে জাল যদি তাঁর সভা-পণ্ডিত-দের চারটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে পারেন, তবেই তিনি এ বিয়েতে অনুমতি দিবেন।

তখন নির্দ্দিষ্ট দিনে সভা আহ্বান করা হ'ল। জাল তাঁদের মাঝে উপবিষ্ট হ'লেন। উৎসুক সব রাজ সভাসদ্ শুনলে, প্রথম প্রশ্ন—পারস্য দেশে কোন সে বারোটি গাছ আছে—যার প্রত্যেকটির ত্রিশটি শাখা—কিন্তু তাদের কোন ক্ষয় বা বৃদ্ধি কিছুই নেই।

জাল কিছুক্ষণ ভেবে বল্লেন, পারস্যের বৎসরে বারোটি মাস, সেই মাসের প্রত্যেকটিতে ত্রিশটি দিন—তার ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই।

তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন করা হ'ল যে কোন্ দু'টি ঘোড়া—একটি সাদা, একটি কাল—অবিরাম দ্রুত গতিতে যারা লক্ষ্যের পানে ছুটে চলেছে, কিন্তু লক্ষ্য যাদের কাছ হ'তে চিরদিন সমান দূরে রয়েছে?

উত্তর হ'ল—রাত্রি এবং দিন একে অন্যের পিছনে ছুটে চলেছে, কিন্তু তাদের সেই চলার গতির আর বিরাম নেই। গন্তব্য স্থল তাদের চিরদিনই তেমনি দূরেই রইল।

বিরাট সভা স্তব্ধ হ'য়ে এই প্রশ্নোত্তর শুনতে লাগল। এবার তৃতীয় প্রশ্ন—বসন্তের ছোঁয়ায় যে কানন হেসে উঠেছে তারই মাঝে বসে শ্রান্তিহীন

কে সে দিবারাত্রি শুকনো এবং কচি ঘাস নীরবে কেটে চলেছে?

উত্তর এল—সময় নীরবে আমাদের এই সংসার-কাননের মাঝখান হ'তে বালক-বৃদ্ধ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করেছে। তার দয়া নেই, মায়া নেই—শ্রান্তিহীন নির্ব্বিকার সে।

চতুর্থ প্রশ্ন হ'ল সবচেয়ে কঠিন—পাহাড়ের উপর রয়েছে প্রকাণ্ড এক পুরী দৃঢ় সুগঠিত,—কিন্তু একদল যাত্রী সেই দুর্গম পুরীর কথা ভুলে গিয়ে পাহাড়ের নীচে মাটির উপর বাসা বেঁধে রইল। অবশেষে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গৃহহীন হ'য়ে তখন তারা সেই দুর্গম পুরীর কথা স্মরণ করলে। এবার তারা সবাই মিলে সেখানে যাবার চেষ্টা করতে লাগল।

কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না ক'রে জাল প্রশ্ন হ'বার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিলেন—অসীমের কোল হচ্ছে সেই দুর্গম পুরী। পৃথিবীতে মানুষ যখন বাসা বাঁধে, তখন আপনার তুচ্ছ জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি কান্না আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙীন স্বপ্নে বিভোর হ'য়ে সে অনন্তের কথা ভুলে যায়। অবশেষে যখন চরম দুর্দ্দিন এসে তার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়ে যায়, তখনই মানুষ অসীমের কোলে ফিরে যেতে চায়।

এইবার সমস্ত সভা জয়ধ্বনি ক'রে উঠল। সম্রাট্ও অত্যন্ত সন্তুষ্ট হ'য়ে বিবাহে অনুমতি দিলেন। তখন মহাসমারোহে জাল এবং রুদাবের বিবাহোৎসব সম্পন্ন হ'ল, পরম সুখে তাঁরা দিনপাত ক'রতে লাগলেন। এঁদেরই ছেলে ছিলেন মহাবীর রুস্তম্—যাঁর খ্যাতি সমস্ত পৃথিবীতে পরে ছড়িয়ে পড়েছিল।

জীবনে একবার শুধু জাল তাঁর সিমুর্গ মাকে ডেকেছিলেন। ভীষণ রোগের আক্রমণে রুদাবে যখন মৃতপ্রায়, সেই সময় তিনি একটি পালক আগুনে ধরলেন। সিমুর্গ এসে রুদাবেকে সুস্থ করে দিয়ে গেল।

কিন্তু চিরজীবন জাল তাঁর সিমুর্গ মা আর পাখী ভাইদের কথা মনে রেখেছিলেন। এলবুর্জ পর্ব্বতের চূড়োয় মুক্ত আকাশের নীচে সেই আনন্দময় জীবনের স্মৃতি তিনি কখনও ভুলে যান নি।

সময়ের নাম

সময়ের ইচ্ছা হ'ল সে একবার পৃথিবীটা ঘুরে আসে—তাই সে বেরিয়ে পড়লো দেশ বেড়াতে। খানিক দূর যেতে না যেতেই একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতের সঙ্গে তার দেখা হ'ল। সময় তাকে জিজ্ঞাসা করলে—বল দেখি আমি কে? আমার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে আমি নানা জনের কাছ থেকে নানা রকমের উত্তর পেয়েছি।

পণ্ডিত উত্তরে বললেন—তোমাকে কে কি বলেছে বল ত?

সময় বল্লে—বণিকেরা বলে, আমি সোণা, ছাত্রেরা বলে, আমি জ্ঞান, শ্রমিকেরা বলে, আমি হচ্ছি শ্রম; রোগী বলে, আমার চলন অতি ধীর, বিলাসী লোকেরা বলে, আমি চলি বড় দৌড়ে, দার্শনিক বলে, আমার কোন দামই নেই। বল দেখি এদের কার কথা সত্য?

জ্ঞানী বললেন—এদের সকলের কথাই ঠিক্। যে তোমাকে যে ভাবে দেখে থাকে, সে ঠিক্ সেই কথাই বলেছে। যে মানুষ যা চায় বা যে ভাবে চলে, সে তোমাকে ঠিক্ সেই ভাবেই শত্রু বা মিত্র বলে মনে করে আর সেই নামে ডাকে।

পথিকের ভৃত্য

এক ধনী যুবক খুব বেড়াতে ভালবাসতেন। তিনি একবার খুব দূরদেশে একজন ধনীর বাড়ী গিয়ে অতিথি হলেন। বাড়ীর কর্ত্তা আগন্তুক যুবককে খুব সমাদর করে অভ্যর্থনা করলেন এবং যুবকের সেবা করবার জন্য চাকরদের ডাকছিলেন।

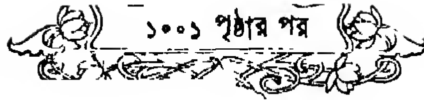
যুবক বল্লে,—আমার সেবার জন্য কোন চাকরের দরকার নেই। আমি যখন যেখানে বেড়াতে যাই আমার সঙ্গে দু'জন ভৃত্য থাকে—তারা যমজ ভাই। দিন রাত তারা আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে—এবং যখন যে কাজের দরকার হয় অমনি তা করে দেয়।

বাড়ীর কর্ত্তা বললেন—আপনার চাকর দু'জনের মত দু'টি চাকর পেলে আমার খুব উপকার হ'ত।

যুবক বল্লেন—হাঁ, অতি সহজেই তাদের পেতে পারেন। তাদের একজনের নাম 'সন্তোষ' আর একজনের নাম হচ্ছে 'সংযম'। এদের যখন ডাকবেন তখনই পাবেন।



ব্যক্তিত্ববাদ



জন্মগ্রহণ করার পর হইতেই মানুষ নানা উপায়ে তাহার জীবনের উৎকর্ষ সাধন করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। সমষ্টিবদ্ধ জীবন তাহার ব্যক্তিত্ব বিকাশের অভূতপূর্ব্ব এক সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। কাজেই, সর্ব্বদা তাহার চিন্তা গিয়াছে কি করিয়া এই সমষ্টিবদ্ধ জীবনকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যাহাতে তাহার মধ্য দিয়া সে নিজেকে বিশদ এবং বিশালভাবে ব্যক্ত করিতে পারে। এই চিন্তা এবং চেষ্টার মধ্যে দুইটি নীতির সঙ্গেই তাহার প্রধান সংঘর্ষ বাধিয়াছে। একটি নীতি তাহাকে বলিয়াছে যে নিজের বিকাশ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় তখনই, যখন সমষ্টির দাবী থাকে সবচেয়ে কম। আর অন্য নীতিটি বলিয়াছে, সমষ্টির কাছে যখন সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিয়া দেওয়া যায় তখনই নিজের বৈশিষ্ট্য এবং উৎকর্ষ ফুটিয়া ওঠে সবচেয়ে সুন্দররূপে। এই প্রথম নীতিটির নাম হইতেছে ব্যক্তিত্ববাদ (Individualism)।

ব্যক্তিত্ববাদের আদর্শের প্রথম প্রচার হয় ইংলণ্ডে। এই আদর্শকে বুঝিতে হইলে সেদেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস আলোচনা করা দরকার। তখন ইংলণ্ডে শিল্পবিপ্লবের (Industrial Revolution) সূচনা এবং প্রথম পরিণতি হইয়াছিল। কয়েকজন বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনিয়ার ও ব্যবসায়ীর অভূতপূর্ব্ব আবিষ্কারের ফলে সেখানে নানা শিল্প এবং ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে নূতন রকমের যন্ত্র ও কলকব্জার প্রবর্ত্তন আরম্ভ হয়, এবং তাহাতে ইংলণ্ডের উৎপাদন ক্ষমতা অনেকখানি বাড়িয়া ওঠে। কয়েক বৎসরের মধ্যেই ইংলণ্ডের সমস্ত শিল্প ও ব্যবসায়ের নূতন এক সাড়া পড়িয়া যায় এবং ধীরে অথচ সুনিশ্চিতভাবে আবহমান কাল হইতে প্রচলিত নির্ম্মাণপ্রণালী এবং রীতিনীতির গভীর পরিবর্ত্তন সাধিত হয়।

ব্যবসায় এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এই যে নূতন জাগরণ ইহার একটা বিশেষত্ব ছিল এই যে, ইহার পরিস্ফুটন হইয়াছিল সমাজ বা রাষ্ট্রের কোন প্রকার সহায়তা ছাড়া। সমস্ত উন্নতির মূলে ছিল মাত্র কয়েকজন লোকের অধ্যবসায়, প্রতিভা ও পরিশ্রম। রাষ্ট্র বা সমাজের সংহত প্রতিভায় এই শিল্পবিপ্লবের কোনই সাহায্য হয় নাই, বরং তাহার অনেক অন্ধ এবং বুদ্ধিহীন বাধা দেওয়াতে এই শিল্প জাগরণের ক্ষতিই হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বহু বৎসর ধরিয়া যে সমস্ত আইনকানুন এবং বিধিব্যবস্থা দেশের বাণিজ্য, ব্যবসায় এবং শিল্প নিয়ন্ত্রণ করিতেছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সে সব পুরাতন এবং ক্ষতিকর হইয়া পড়িয়াছিল, তবু সনাতন প্রথা বলিয়া সে সব তখনও বিদ্যমান ছিল এবং জগদ্দল পাথরের মত তাহা এই নূতন শিল্প বিপ্লবকে দাবাইয়া রাখিবার উপক্রম করিতেছিল।

এই যখন অবস্থা তখন ব্যবসায় এবং শিল্পকে নূতন এক আদর্শে অনুপ্রাণিত করিবার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর মনীষীর আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith)-এর নাম সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য। অ্যাডাম স্মিথ অর্থনীতির নূতন এক বার্ত্তা লইয়া আসিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, মানুষের ব্যক্তিত্বের স্বাধীন প্রকাশের সুযোগ দিলে সে স্বভাবতঃই নিজেকে সকলের কল্যাণে নিয়োজিত করিবে, কাজেই প্রত্যেক ব্যবসায়ী শিল্পী এবং বণিককে সর্ব্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা দেওয়াই হইতেছে রাষ্ট্রের, সমাজের এবং দেশের কর্ত্তব্য। সংসার হইতেছে উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র, এখানে বাধা যতই কম হইবে, মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা ততই স্বচ্ছন্দ এবং স্বাভাবিক হইবে এবং ফলে তাহারা সকলের মহত্তর উন্নতি সাধন করিতে পারিবে। তাই স্মিথ বলিয়াছিলেন—"যুক্তিহীন বাধার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ব্যবসায়ী, শিল্পী ও বণিকদিগকে পূর্ণ স্বাধীনতা দাও, দেশ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে।"

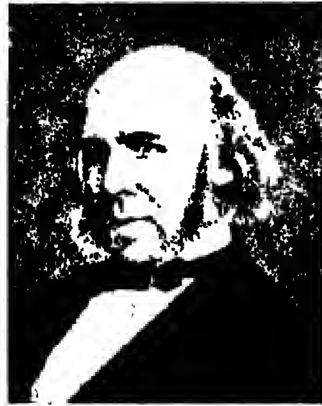
এই স্বাধীনতার নীতি শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যবস্থায়ই নিবদ্ধ হইয়া রহিল না। দেশের নূতন অর্থনৈতিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য রাজনীতিক্ষেত্রেও এই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব প্রকাশের মন্ত্র ছড়াইয়া পড়িল। সারা উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া এই মন্ত্র ইংলণ্ডের চিন্তাধারাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছিল। ইহার প্রভাব আজও সেখানকার জনসাধারণের ব্যবহারে, কাজে এবং শিক্ষায় পরিলক্ষিত হয়। এখন আমরা এই মন্ত্রের মোটা কথাগুলি আলোচনা করিব।

ব্যক্তিত্ববাদের প্রধান দাবীই হইতেছে এই যে, প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্যের সম্যক্ বিকাশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা ও ক্ষমতা দেওয়া দরকার। প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই কতকগুলি বিশেষ গুণের অঙ্কুর আছে, সেগুলি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে ফুটিয়া উঠিতে পারে তখনই, যখন সেই প্রস্ফুটনের পথে কোন বাধা না থাকে, যখন বাহিরের সব প্রতিকূল প্রভাব দূরে সরাইয়া রাখা হয়। তাই ব্যক্তিত্ববাদীরা বলেন যে যাহাদের মধ্যে অসাধারণ প্রতিভা আছে তাহাদিগকে সকল রকমের সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া সমগ্র মানবজাতির পক্ষে কল্যাণকর, কারণ জনসাধারণের সহিত তাহাদিগকে চলিতে বাধ্য করিলে তাহাদের বিশিষ্ট গুণগুলির পূর্ণ পরিণতি হইতে পারে না। অবশ্য, ব্যক্তিত্ববাদীরা এমন কথা বলেন না যে, যাহারা সাধারণ, তাহারা অবহেলিত হইয়া থাকিবে। তাঁহারা বলেন যে, সাধারণ যাহারা, তাহারা স্বাধীনতা এবং সুযোগ পাইবেই, সঙ্গে সঙ্গে অসাধারণদেরও কিছু বেশী সুবিধা দেওয়া উচিত, কারণ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পূর্ণবিকাশে সমষ্টির কল্যাণ ছাড়া অকল্যাণ কখনই হয় না।

ব্যক্তিত্ববাদের ইতিহাস আলোচনা করিলে প্রথমেই মনে হয় জেরেমি বেন্থাম (Jeremy Bentham) এর কথা। যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন সারা ইউরোপের শিল্প এবং ব্যবসায়ের ধারা নানা যুক্তিহীন বাধায় প্রতিহত হইতেছিল এবং বিবেচনাহীন রাজশক্তি সমূহের আইনকানুন পদে পদে অসংখ্য অসুবিধার সৃষ্টি করিতেছিল। ইহা ছাড়া, শিল্প ও ব্যবসায়কে নিয়ন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্যে মধ্যযুগে যে সমস্ত শিল্পী ও বণিকসংঘের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই সমস্ত প্রতিষ্ঠান নূতন শিল্পবিপ্লবের পর ও তাহাদের পুরাতন রীতিনীতি এবং শৃঙ্খলা প্রণালী দ্বারা নিরর্থক অনেক বিঘ্নের সৃষ্টি করিতেছিল। এই যখন ইউরোপের অবস্থা, তখন জেরেমি বেন্থাম উচ্চকণ্ঠে প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন অখণ্ড এবং অবাধ স্বাধীনতার মন্ত্র। তাঁহার আদর্শ হইল সবচেয়ে বেশী সংখ্যক লোকের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কল্যাণ (Greatest good of the greatest number) এবং এই আদর্শলাভের একমাত্র উপায় তিনি দেখিতে পাইলেন পূর্ণ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ। যাহাতে মানুষের স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণ স্ফূর্ত্তির পথে কথঞ্চিৎ বাধা হইতে পারে তাহাই অকল্যাণকর এবং বিষময় ফলপ্রসূ, এই হইল তাঁহার একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। সমাজ এবং রাষ্ট্রের স্বভাবই হইতেছে মানুষের স্বাধীন ব্যবহারে অযথা হস্তক্ষেপ করা। অতএব, বেন্থাম্ বলিলেন, সমাজ এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতা যত কমাইয়া দেওয়া যায় মানুষের পক্ষে ততই মঙ্গল।

ব্যক্তিত্ববাদের প্রথম পরিস্ফুটন যদিও হইয়াছিল জেরেমি বেন্থাম্‌এর লেখায়, তবু তাহার সুসমঞ্জস প্রকাশ তাহার চিন্তাধারায় পরিলক্ষিত নাই। প্রথম সুসমঞ্জস প্রকাশ হয় বেশ কয়েক বছর পরে—উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হার্বার্ট স্পেন্সার (Herbert Spencer) নামে একজন মনীষীর লেখায়। স্পেন্সারের লেখার প্রধান বিশেষত্ব এই যে তিনি মানুষের ব্যবহার, অনুভূতি এবং চিন্তাধারার ব্যাখ্যা করিয়াছেন বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই সারা ইউরোপে বিজ্ঞানের এত দ্রুত উন্নতি হইতেছিল যে, তাহার প্রভাব

এড়ানো স্পেন্সারের মত অনুভূতিপ্রবণ লোকের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। তাহা ছাড়া, ছেলেবেলা হইতেই পদার্থ বিজ্ঞানে তাঁহার অনুরাগ ছিল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ও কলকব্জার গোলকধাঁধার মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে তিনি ভয়ানক ভাবে ভালবাসিতেন। সমাজ-ব্যবস্থার ক্রমোন্নতির সহিত জীবজগতের ক্রমবিকাশের (Evolution) তুলনা তাঁহার লেখায় খুবই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহার মতে মানুষের সমাজের প্রগতির মধ্যে একটা নিবিড় ঐক্য আছে যাহার প্রতিরূপ দেখা যায় প্রকৃতির প্রগতির মধ্যে। কিন্তু প্রকৃতির বিবর্তনে যেমন স্তরগুলি কখনই একই রকমের হইতে পারে না, তেমনই সমাজের প্রগতির ইতিহাসের ভিন্ন ভিন্ন পর্য্যায়গুলি একই স্বভাবের হইতে পারে না। ইতিহাসের সূত্রপাতে সমাজ ছিল জড়, ব্যক্তিত্ববিহীন, ব্যষ্টিবোধ-শূন্য, কিন্তু ধীরে ধীরে সেই জড়তা ভেদ করিয়া মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে লাগিল এবং সমাজ চলিতে লাগিল প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব পূর্ণ-রূপে ফুটিয়া ওঠে এমন একটা আদর্শের দিকে।



হার্বার্ট স্পেন্সার

স্পেন্সারের মতে রাষ্ট্রের শাসকমণ্ডলীর ক্ষমতা খুবই সঙ্কীর্ণ হওয়া দরকার। রাষ্ট্র যেন একটা বীমা-কোম্পানী মাত্র—পরস্পরের সুবিধা এবং সাহায্যের জন্য যেমন তেমন একটা সংগঠনের দরকার, তাই যেন মানুষে মিলিয়া একটা রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তাই স্পেন্সার খুবই জোর গলায় বলিয়াছেন যে, শিল্প এবং বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ বিষয়ে রাষ্ট্রের কখনও হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়, ধর্ম্ম বিষয়ে রাষ্ট্রের আগাগোড়া দূরে থাকা দরকার, এবং সাধারণ দরিদ্র প্রতিপালন বা স্বাস্থ্যরক্ষা ব্যবস্থাও রাষ্ট্রের পক্ষে অমার্জ্জনীয় অপরাধ। শুধু গোটা কয়েক নির্দ্দিষ্ট বিষয় লইয়া রাষ্ট্র ব্যাপৃত থাকিবে এবং এই নির্দ্দিষ্ট সীমা-রেখার বাহিরে তাহাকে কিছুতেই আসিতে দেওয়া সঙ্গত নয়। দিলেই রাষ্ট্র মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার পরিমণ্ডলে আসিয়া পড়িবে এবং তখন তাহার জন্মগত অধিকারের প্রকাশ ব্যাপৃত হইবার সম্ভাবনা থাকিবে। তাই স্পেন্সার বলিয়াছেন যে, মানুষের স্বাতন্ত্র্যের সর্ব্বতো-মুখী অভিব্যক্তি যখন সমাজের আদর্শ, তখন রাষ্ট্রের ক্ষমতাসংকোচ যত বেশী এবং দ্রুত হয় ততই ভাল।

ব্যক্তিত্ববাদের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে যদি আমরা আর একজন মনীষীর নাম না করি। তাঁহার নাম হইতেছে জন্ ষ্টুয়ার্ট মিল্ (John Stuart Mill)। মিল ব্যক্তিত্ববাদের সনাতন চিন্তাধারার মধ্যে খানিকটা নূতনত্ব আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। জন্মগ্রহণের সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ কতকগুলি বিশিষ্ট অধিকার লইয়া আসে। এই সমস্ত অধিকার প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথমতঃ হইতেছে সেই শ্রেণীর অধিকার—যাহার প্রকাশ বা অভিব্যক্তিতে অন্য কোন মানুষের ব্যবহার বা অনুভূতির পথে বিশেষ কোন বাধার সৃষ্টি হয় না। দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকার হইতেছে সেই সমস্ত—যাহার প্রকাশে অন্যান্য মানুষের ব্যবহার বা অনুভূতি ব্যাহত বা পরিবর্ত্তিত হইতে পারে। প্রথম শ্রেণীর মধ্যে নাম করা যাইতে পারে চিন্তা করিবার এবং মনোভাব প্রকাশ করিবার স্বাধীনতা, এবং নিজের ইচ্ছামত নিজের ইষ্ট-অনিষ্ট বিচার করিবার অধিকার। আর দ্বিতীয় শ্রেণীর মধ্যে বলা যাইতে পারে সংঘবদ্ধ হইবার অধিকার এবং কোন সংঘের (association) মধ্যে নিজের ইচ্ছামত কাজ করিবার স্বাধীনতা। মিল্-এর মতে প্রথম শ্রেণীর অধিকারের ক্ষেত্রে মানুষ একাই প্রধান এবং শেষ বিচারক—বাহিরের অন্য কোন শক্তির সেখানে হস্তক্ষেপ করা অনুচিত। কিন্তু দ্বিতীয় শ্রেণীর অধিকারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজ কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিতে পারে, যদি তাহাতে ব্যক্তিত্বের পরিস্ফুটনে কোন অসুবিধা না হয় এবং যদি সেই হস্তক্ষেপ করাটুকু শুধু নিয়ন্ত্রণেই নিবদ্ধ থাকে ও অযথা অনধিকারচর্চ্চায় পর্য্যবসিত না হয়।

ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে, মিল্-এর ব্যক্তিত্ববাদের নীতির মধ্যে বেন্থাম্ বা স্পেন্সারের সঙ্কীর্ণতা ছিল না। মিল্-এর নীতি ছিল অনেকটা উদার রকমের। ব্যক্তিকে স্বাধীনতা দিলে পরিশেষে রাষ্ট্রেরই কল্যাণ হইবে, এই ছিল তাহার প্রতিপাদ্য বিষয়। মানুষ নিজের কল্যাণ-অকল্যাণ নিজে

যতটা ভালভাবে বুঝিতে পারে বাইরের রাষ্ট্র বা সমাজ-শক্তি কিছুতেই তাহা পারে না। কাজেই, মানুষকে সকল রকমের অব্যাহত ক্ষমতা দেওয়াই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। যে শাসনতন্ত্রে প্রত্যেক মানুষ তাহার স্বাতন্ত্র্যটুকু সম্পূর্ণভাবে ব্যক্ত করিতে না পারে তাহা আদর্শ শাসনতন্ত্রই নয়, এই ছিল মিল্-এর বিশ্বাস। তাই যে গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের (majority) অপ্রতিহত ক্ষমতা সংখ্যালঘিষ্ঠকে (minority) দাবাইয়া রাখে, তাহা তিনি সুষ্ঠ এবং কল্যাণকর বলিয়া কখনই স্বীকার করিতে পারেন নাই। সংখ্যাগরিষ্ঠের ক্ষমতা যদি কথঞ্চিৎ খর্ব্বও হয় তবু পরিণামে তাহাতে দেশের এবং রাষ্ট্রের কল্যাণই হইবে, এই ছিল তাহার দৃঢ় অভিমত।

ব্যক্তিত্ববাদীদের চিন্তাধারা ভালভাবে আলোচনা করিলে দেখা যায়, মানুষের ক্ষমতার উপর তাঁহাদের সকলেরই অখণ্ড এবং গভীর বিশ্বাস ছিল। অপ্রতিহত সুযোগ পাইলে মানুষ অসাধ্যসাধন করিতে পারে, এই ছিল তাঁহাদের সকলের ধারণা। তাই রাষ্ট্রের যে সব প্রতিষ্ঠানের মানুষের স্বাধীন অধিকারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করিবার সম্ভাবনা আছে সে সমস্তকে তাঁহারা গভীর সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন। রাষ্ট্র ছিল তাঁহাদের কাছে নিতান্ত না হইলেও নয় এমন একটা কৃত্রিম সৃষ্টি। শাসকরা শুধু গোলমালের সৃষ্টি করিতে পটু, মানুষের যথার্থ কল্যাণ করিবার শক্তি তাঁহাদের খুবই কম, এই ধারণাটি তাঁহাদের লেখার ছত্রে ছত্রে লক্ষিত হয়।

ব্যক্তিত্ববাদীদের মতে চিরন্তন কোন সত্য ছিল কি? তাঁহাদের একটি ভুল প্রথমেই আমাদের চোখে পড়ে। মানুষ যে শুধু পরমাণুসর্ব্বস্ব (atomic) পৃথগাত্মা নহে, তাহার জীবনের অনেকখানিই যে রাষ্ট্র, সমাজ এবং অন্যান্য অনুষঙ্গে মূর্ত্ত হইয়া উঠে, তাহা ব্যক্তিত্ববাদীরা মোটেই লক্ষ্য করেন নাই। তাঁহাদের সমস্ত দৃষ্টি ছিল পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিদের দিকে, মানুষকে সমষ্টিভাবে দেখিবার প্রয়াস তাঁহারা করেন নাই, বলিলেই চলে। তাহা ছাড়া, মানুষের ব্যক্তিত্বের শক্তির উপর তাঁহারা একটু অস্বাভাবিক রকমের আস্থা স্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। মানুষ অনেক কিছু করিতে পারে সন্দেহ নাই, কিন্তু ব্যাবহারিক জগতে তাহার শক্তিরও সীমা আছে। এমন অনেক অবস্থায় সে পড়ে যখন তাহার সমস্ত ব্যক্তিত্ব ব্যবহার করিয়াও সে পথ বাহির করিতে পারে না এবং তখন সে সংহত কোন শক্তির (যথা, রাষ্ট্র বা সমাজ) সাহায্যের জন্য আকুল হয়। সব শেষে ব্যক্তিত্ববাদ সম্বন্ধে বলা যায় এই যে, নীতির প্রচারকগণ এটা লক্ষ্য করিয়াই দেখেন নাই যে, শিল্প, ব্যবসায় এবং বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক মানুষের পূর্ণ স্বাধীনতার নীতি অনুসরণ করিয়া চলা যায় তবে যাহারা দুর্ব্বল তাহারা সকলের শক্তি এবং অত্যাচারের সম্মুখে ধ্বংস হইয়া যাইবে। শ্রমিকেরা তাহা হইলে ধনিকদের ক্রীতদাসেরও অধম হইয়া পড়িবে এবং মহাজন ও জমীদারেরা সানন্দে তাহাদের যথেচ্ছ অত্যাচার সুরু করিবে। সংসারের জীবনসংগ্রামে সকলের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতার নীতি অনুসরণ করিলে যাহারা অক্ষম ও অশক্ত তাহারাই প্রপীড়িত হইবে বেশী।

তাই বলিয়া ব্যক্তিত্ববাদীদের আদর্শ যে অসার এমন নয়। তাঁহারা যে গভীর সত্যটি তীব্রভাবে অনুভব করিয়াছিলেন এবং উদাত্তকণ্ঠে প্রচার করিয়াছিলেন সেই সত্যটি চিরন্তন, শাশ্বত, অবিনশ্বর। এই সত্যটি হইতেছে এই :—আমরা যতই সমাজ, রাষ্ট্র বা সংঘের ব্যবস্থা করি না কেন শাসনতন্ত্রের যতই পরিবর্ত্তন সাধন করি না কেন, ব্যক্তিত্বকে উপেক্ষা করিলে সমস্তই বৃথা হইবে। তাই সমাজ, রাষ্ট্র বা অন্য কোন সংঘের ব্যবহার বা কার্য্য-প্রণালী লইয়া যখনই দ্বন্দ্ব বা মতভেদের সূত্রপাত হয় তখনই সে সব ব্যক্তিত্ববাদের কষ্টিপাথরে ফেলিয়া বিচার করা উচিত—তখনই দেখা উচিত যে, সে সব বিবাদিত ব্যবহার বা কার্য্য-প্রণালীতে মানুষের কতটুকু কল্যাণ হইবার সম্ভাবনা আছে, তাহাতে সুষ্ঠভাবে সকলের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়া উঠিতে পারে কি না এবং তাহাতে জনসাধারণের আনন্দ, শান্তি ও সুখ বর্দ্ধিত হয় কি না। সমাজ বল, রাষ্ট্র বল, যে কোন সংঘ বল, সমস্তই ব্যক্তি সাধারণের জন্য, ব্যক্তি সাধারণ তাহাদের জন্য নয়, এই গভীর সত্যটি রাজনৈতিক আদর্শবাদের স্রোতে ব্যক্তিত্ববাদীদের অমূল্য দান এবং এটি তাঁহাদিগকে চিরকাল অমর করিয়া রাখিবে।



রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন্

[১১২০ পৃষ্ঠার পর]

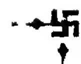
রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন্ (Robert Louis Stevenson), স্কটল্যাণ্ডের রাজধানী এডিনবরা নগরে জন্মগ্রহণ করেন। (১৮৫০—১৮৯৪)। ছেলেবেলা হইতেই তিনি রুগ্ন ও দুর্ব্বল ছিলেন। ঘরের মধ্যে বিছানার উপর



রবার্ট লুই ষ্টিভেনসন

বসিয়াই নানারূপ কল্পনায় বিভোর থাকিতেন। মনে করিতেন, সে যেন কোন অজানা দেশে বেড়াইতে গিয়াছেন। বিছানাকে কল্পনা করিতেন অকূল সমুদ্র, কোন বালিশ হইত তাঁহার জাহাজ, কোনটি দ্বীপ, কোনটি পাহাড়, এইরূপ কত কি ?

ষ্টিভেন্সনের শুশ্রূষাকারিণী (Nurse) তাঁহার কাছে নানা দেশ-বিদেশের গল্পের বই পড়িয়া শুনাইতেন। ঐ সকল গল্পের ভিতর তাঁহার ভাল লাগিত নাবিকদের কাহিনী, তাহাদের সেই সিন্ধু-যাত্রার বিপদ-সঙ্কুল



অভিযান তাঁহার চিত্তকে প্রমোদিত করিত। কত সিন্দবাদ নাবিকের বিচিত্র কাহিনী তাঁহার রোগজীর্ণ ক্লান্ত দেহে নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনা আনিয়া দিত।

কতদিন সবুজ গাছের পাতা জড় করিয়া খেলার নৌকা তৈয়ারী করিয়া নদীর বুকে ভাসাইয়া দিয়া অপলকে চাহিয়া থাকিতেন।—নদীর জলে সে নৌকা ভাসিয়া চলিত, ভাবিতেন, না জানি সে কোন্ স্বপ্নলোকের দেশে যাইয়া ঐ তরী পৌঁছিবে!

রাত্রিকালে যখন চারিদিক নীরব হইত, তখন লুই মনে করিতেন, তাঁহার শয্যাখানিই যেন জাহাজ! ভাসিয়া চলিয়াছে অনন্ত সাগরের বুক দিয়া কোন্ অজানা দেশে, কোথায় যাইয়া তাঁহার এই জাহাজখানি ভিড়িবে, সে ত তাহা জানে না।

জানালার ভিতর দিয়া যখন দেখিতে পাইতেন, আকাশের বুকে পাখীরা পাখা মেলিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে, তখন তাঁহার মনে হইত যদি অমনি উড়িতে পারিতাম, তাহা হইলে চাঁদের দেশটা একবার বেড়াইয়া আসিতে পারিতাম।

শীতের রাত্রি। বাহিরে বরফ পড়িতেছে। সাঁই সাঁই রবে ঝড়ের হাওয়া বহিতেছে। ঐ শব্দ শুনিয়া ষ্টিভেন্‌সনের মনে হইত কাহারা যেন সারা রাত্রি সোঁ সোঁ করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া চলিয়াছে। এতটুকু বিশ্রাম নাই তাহাদের। এই অজানা অশ্বারোহীদের অশ্রান্ত গতির জন্য তিনি অন্তরে বেদনা অনুভব করিতেন, উঃ কি ক্লেশ এদের।



রবার্ট লুই ষ্টিভেন্‌সন

রুগ্ন, জীর্ণ ষ্টিভেন্‌সন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক কবিতা ও গল্প লিখিয়া গিয়াছেন, সেগুলি অতুলনীয় কবিত্ব-সম্পদে পূর্ণ। তাঁহার লিখিত 'রত্নদ্বীপ' (Treasure Island) বালক,বালিকাদিগের মনে কত আনন্দ, কত কৌতুহলের না সৃষ্টি করে। ষ্টিভেন্‌সনের নিকট এই 'সুন্দর ভুবনের' তুলনা মিলিত না। তিনি প্রথম জীবনে কিছুদিন এঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করেন, পরে আইন পড়িয়া কিছুদিন ব্যবহারজীবীর কাজ করেন—এসকল কিছুই তাঁহার ভাল লাগিল না। পরিশেষে সাহিত্য-চর্চ্চা করিয়া জীবন অতিবাহিত করেন। শেষ জীবনে দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপপুঞ্জে (South Sea Island) তাঁহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছিল। সামোয়া (Samoa) দ্বীপে তাঁহার মৃত্যু হয়। মাউণ্ট ভেয়িয়ার (Mount Vaea) উপর তাঁহার সমাধি আছে। এখানে ষ্টিভেন্‌সনের রচিত একটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইল।

যে কবিতাটির অনুবাদ প্রকাশিত হইল তাহার নাম 'Travel'। আমরা কবিতাটির নাম দিয়াছি 'জয়যাত্রা।' তোমরা এই কবিতাটির মূল ও অনুবাদ মুখস্থ করিয়া ফেলিও।

ইংরাজী এই শ্রেণীর কবিতাকে বলে The Poetry of Action. এই সকল কবিতার মধ্যে দেশ-প্রীতি, বীরত্ব, আত্মোৎসর্গ, ভ্রমণ ও কাল্পনিক বিবরণ থাকে। বীরত্ব ও আত্মোৎসর্গের নিদর্শন তোমরা রবীন্দ্রনাথের বন্দীবীর নামক কবিতায়—'সেই পঞ্চনদীর তীরে, বেণী পাকাইয়া শিরে' এবং 'কথা ও কাহিনীর' অন্যান্য কবিতার মধ্যে দেখিতে পাইবে মানুষের মনের উপর কবিতার প্রভাব অসাধারণ। তোমরা ভাল কবিতা পড়িতে ও উহা মুখস্থ করিতে ভালবাস, এইরূপ গান ও কবিতার প্রতি অনুরাগ মানুষ মাত্রের পক্ষে স্বাভাবিক। প্রত্যেক দেশেই বড় বড় কবি ও সঙ্গীতরচয়িতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের রচিত কবিতা পড়িলে আমাদের মনে আনন্দ, উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারিত হয়। 'জয়যাত্রা' পড়িতে পড়িতে তোমাদের মনে দেশ-ভ্রমণের কৌতুহল উদ্দীপ্ত হইবে বলিয়া বিশ্বাস করি। এই শ্রেণীর কবিতার অনুবাদ আরও দেখিতে পাইবে।



জয়যাত্রা

উঠ্‌ব আমি গা ঝেড়ে ভাই, ছুট্‌ব আমি দেশান্তরে—
সোণার বরণ আপেল যেথায় ফলে,
ময়না-দ্বীপের গয়ণা-পরা সাগর যেথায় নৃত্য করে
আরেক রকম নীল আকাশের তলে।
কাকাতুয়া হরিণভরা মনুষ্যহীন চরে
জাহাজ-ডোবা ঘর-হারারা নৌকা যেথায় গড়ে
যাব আমি পূর্ব্ব মুখে সূর্য্যিমামার উজল দেশে—।
যোজন-জোড়া শহর যেথায় রাজে,
ইদ্‌গা এবং মীনার চূড়া নীল গগনে যেথায় মেশে,
বালু-মাটির গুল্‌-বাগিচার মাঝে।
খোলে যেথায় বাজার ভ'রে খরিদদারের তরে,
দেশ বিদেশের দামী দামী জিনিষ থরে থরে।
যাব যেথায় লোহার পাঁচির চীনদেশেরে ঘিরে রাখে,
একধারে তার মরুর বায়ু জলে,
আর ধারে তার ঘণ্টা বাজে, কণ্ঠ মাতে ঢোলে ঢাকে
চীনা শহর পূর্ণ কোলাহলে।
যাব যেথায় বিশাল বনে গা পুড়ে যায় আগুন-আঁচে,
গাছগুলো সব গির্জ্জাচূড়ার মত,
ফলে যেথায় তাল নারিকেল, গাছে গাছে বাঁদর নাচে,
কাফ্রিরা সব বাঘ শিকারে রত।

জন্মযাত্রা



যাব যেথায় নাইল নদে কুমীরে রোদ পোহায় শুয়ে,
মাছরাঙারা মাছ ধরে যায় উড়ে,
মানুষ-খেগো বাঘ শুয়ে রয় কাণ-জোড়াটি খাড়া থুয়ে
গহন বনে কাছে এবং দূরে ;
দোলায় দুলে পাশ দিয়ে কেউ পালিয়ে যায় পাছে,
খোঁজ রাখে বেশ বাঘ শিকারী আস্‌ছে কি না কাছে।
প'ড়ো বাড়ার শহর যেথায় মরুভূমির মধ্যভাগে
জন-মানব-শূন্য জীবন-হারা,
হুজুর মজুর সবাই যাহার কত শত বছর আগে
বিদায় নেছে, লুপ্ত কুলের ধারা,
পায়ের আওয়াজ যায় না শোনা কোন বাড়ী কিংবা পথে
ইঁদুর ছানাও কোথাও নাহি নড়ে,
তাপ-জুড়ানো রাত্রি যখন নেমে আসে তারার রথে,
একটি দীপও জ্বলে না তার ঘরে,
বড় হ'লে যাব সেথায় উটের ফৌজ সঙ্গে নিয়ে,
সেই পুরীতে ঢুক্‌ব বীরের সাজে,
ধুলোয়-ভরা একটা কোন খানাঘরের মধ্যে গিয়ে
জ্বাল্‌ব মশাল অন্ধকারের মাঝে।
দেখ্‌ব তাহার ভিতে আঁকা বীরের ছবি নূতনতর
নক্‌সা কত উৎসব-যাত্রার,
দেখ্‌ব তাহার একটি কোণে প্রাচীন-কালের খেলনা জোড়
মিশর বালক মিশর বালিকার।





তালগাছ



তালগাছ   এক পায়ে দাঁড়িয়ে
           সব গাছ ছাড়িয়ে
               উঁকি মারে আকাশে।

মনে সাধ,   কালো মেঘ ফুঁড়ে যায়,
           একেবারে উড়ে যায়,
               কোথা পাবে পাখা সে॥

তাই তো সে ঠিক তা'র মাথাতে
           গোল গোল পাতাতে
               ইচ্ছাটি মেলে তা'র,

মনে মনে   ভাবে, বুঝি ডানা এই,
           উড়ে যেতে মানা নেই
               বাসাখানি ফেলে তা'র

সারাদিন   ঝরঝর থথর
           কাঁপে পাতা-পত্তর,
               ওড়ে যেন ভাবে

মনে মনে   আকাশেতে বেড়িয়ে
               যেন কোথা যাবে ও,

তারপরে   হাওয়া যেই নেমে যায়,
           পাতা-কাঁপা থেমে যায়,
               ফেরে তার মনটি

যেই ভাবে, মা যে হয় মাটি তা'র
           ভালো লাগে আরবার
               পৃথিবীর কোণটি।











"নী[illegible] গাই চাই আমি"
ব[illegible] এসে স[illegible],
সব চেয়ে শা[illegible] সে
আছে [illegible] জ[illegible]।
[illegible]রণের মত তবু
চ[illegible] ক[illegible] নয়
অ[illegible]তে [illegible] থাকে
একটুতে পায় ভ[illegible]।



[illegible]
[illegible]
কা[illegible] 'কিছু হয়না[illegible]'
[illegible] দিয়ে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] করে রবে।



[illegible] হরিণের
মাঝামাঝি ভাব [illegible]
[illegible]
[illegible] কাটি [illegible]
চেহারাতে [illegible]
ভাবনা সে জানোয়ার
[illegible] ভাবখানা
[illegible] নাক' ক[illegible] তার







[illegible] প্রাণী,
আনাগোনা করে,
কভু থাকে বাহিরেতে
কভু থাকে দ্বারে॥
দেখে যেন মনে হয়
পোষাপোষা ভাব
পোষ কভু মানেনাকো
পালানো স্বভাব॥







বিশ্বসাহিত্য

তীর্থযাত্রীর সম্মুখ যাত্রা

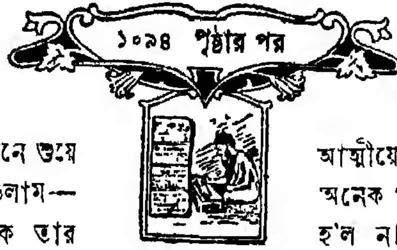
[বাইবেল ছাড়া কোন ধর্ম্ম পুস্তক খৃষ্টান জগতে জন্ বনিয়ানের তীর্থ যাত্রীর কথার মত মানুষের মনে অধিকার বিস্তার করতে পারেনি। Pilgrim's Progress বইখানা সোজাসুজি সাদাসিদা ইংরাজীতে লেখা—গ্রন্থকার নিজেও আড়ম্বরহীন মানুষ-টিনের কাজ তিনি করিতেন। মনে প্রেরণা অনুভব করে এই বইখানি লেখেন—আর এই বইখানিতেই তিনি জগদ্বিখ্যাত হয়েছেন। ইংরাজী সাহিত্য যতদিন থাকবে ততদিন তিনি অমর হয়ে থাকবেন। গল্পটি রূপক রূপে বলা হয়েছে। আমাদের প্রত্যেকেরি জীবনে যে সব বিপদ, প্রলোভন জীবনের উন্নতিকে বাধা দেয় এতে তারি বিষয় বিবৃত হয়েছে। তবে এক হিসাবে বইখানি রূপকের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর, কেননা—এখানে যেকয়টি লোকের তীর্থযাত্রা অবতারণা করা হয়েছে তারা সকলেই প্রত্যেকের জীবন যাত্রার পরিণতি জান্‌বার জন্যে উৎসুক।



জন বনিয়ান

পুস্তক প্রণেতা জন বনিয়ান ১৬২৮ খৃষ্টাব্দে বেডফোর্ড প্রদেশে এল্‌স্‌টোও (Elstow) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৬৮৮ সালে লন্‌ডন্ নগরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তিনি ধর্ম্মযাজক ছিলেন না তবু ধর্ম্ম প্রচার করতেন বলে ১২ বৎসর কাল তাঁকে বেডফোর্ড বন্দীশালায় আবদ্ধ রাখা হয়—সেই সময় তাঁর অমর গ্রন্থের প্রথম অংশ রচনা করেন। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে "The Pilgrim's Progress" প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। বইখানা প্রকাশিত হবার পরেই বনিয়ানের নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পৃথিবীর নানা ভাষায় এ গ্রন্থ অনূদিত হয়েছে। 'তীর্থ যাত্রীর সম্মুখ যাত্রা' এমনি চিত্তাকর্ষক বই যে, একবার পড়তে আরম্ভ করলে শেষ না করে থাকা যায় না। কোন পারিবারিক কারণে বনিয়ানকে অশ্বারোহণে বেডফোর্ড (Bedford) হ'তে রিডিং (Reading) যেতে হয়েছিল। ফিরবার পথে ঝড়-বৃষ্টিতে পড়েছিলেন,—ফলে তাঁর খুব জ্বর হয়। এইজ্বর আর ছাড়লো না। অবশেষে লন্‌ডনে এক বন্ধুর বাড়ীতে বনিয়ানের মৃত্যু হয়।]

তীর্থযাত্রীর সম্মুখ যাত্রা—খৃষ্টানের পথে বাধা, পিঠের বোঝা হ'তে মুক্তি


১০৯৪ পৃষ্ঠার পর

আমি এই পৃথিবীর অরণ্য পথের মধ্য দিয়ে যাত্রা করলাম আর এমন স্থানে পৌঁছলাম যেখানে একটি গহ্বর ছিল। সেইখানে শুয়ে বিশ্রাম করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম—স্বপ্নে দেখলাম কি-একজন লোক তার পরণের পোষাক একেবারে শত ছিদ্র—এক জায়গায় নিজ বাড়ীর দিকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে একখানি বই, পিঠে প্রকাণ্ড বোঝা—দেখলাম সে বইখানি খুলে পড়'ল, তার শরীর কেঁপে



বনিয়ানের স্বপ্ন

উঠ্‌ল চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগ্‌ল, বল্লে হায় হায় আমি কি করব?—এই বিপন্ন অবস্থায় সে আবার বাড়ীর ভিতর গেল, আর স্ত্রীকে বল্লে দেখো সংবাদ পেলাম আমরা যদি এখান হ'তে পলায়ন না করি তাহলে সকলেই পুড়ে মারা যাব। তুমি আমি আর আমাদের এই অবস্থায় কচি ছেলেমেয়েরা। এখন কি করা যায় বল তো? তার আত্মীয়েরা তাকে বাড়ীতেই থাকতে বলে অনেক পরামর্শ দিলে, তাতে কোন ফল হ'ল না। আমি এই খৃষ্টানকে আগেও দেখেছিলাম—মাঠের মধ্য দিয়ে হাতের বইখানি পড়ছিল আর বলছিল হায় হায় কি করলে উদ্ধার হব, মুক্তি আমার কোন্ পথে। তারপর দেখলাম খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক— Evangelist একজন তার কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন এত কাঁদছ কেন? খৃষ্টান যখন



মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাতের বইখানা পড়ছিল

নিজের অবস্থার কথা জানালেন—তখন প্রচারক বল্লেন তোমার অবস্থা যদি এমন বিপন্ন হয়ে থাকে তবে আর দাঁড়িয়ে কেন? আগিয়ে যাও। কোন্

পথে যাব জানিনে ত ? প্রচারক তাকে খুব দামী কাগজে লেখা গোটান কাগজ হাতে দিয়ে বল্লেন—দেবতার রোষ হতে পলায়ন করো—সম্মুখে ছোট দুয়ার দেখতে পাচ্ছ—লোকটি বল্লে, কৈ—না তো। প্রচারক বল্লেন আলো দেখতে পাচ্ছ ? দেখছি বলে মনে হচ্ছে—তাহলে আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে যাও—পরে বড় ফাটক দেখতে পাবে—তাতে গিয়ে ঘা দাও, সেখানে এগোবার পথের খবর পাবে।

দেখলাম লোকটি দৌড়ে চল্লে—বাড়ী হতে অধিক দূর যেতে না যেতেই তার স্ত্রীপরিবার প্রতিবেশীরা তাকে দৌড়ে পালিয়ে যেতে দেখে—ফিরবার জন্য পিছু ডাক দিতে সুরু করলে। ততক্ষণে সে কিন্তু সম্মুখের মাঠে পৌঁছে গেছে।

দুজন প্রতিবেশী যাদের নাম একরোখা আর দুর্ব্বলচিত্ত—সঙ্কল্প করলে জোর করে তাকে ফিরিয়ে আনবে, কিন্তু তা হল না। খৃষ্টান বল্লেন, ধ্বংসপুরীতে যদি তারা পুড়ে মরে তবে কবরেও তাদের স্থান হবে না। তারা একত্রে কথা কইলে খৃষ্টান হাতের



একরোখা

বইখানি তাদের পড়তে বল্লেন—একরোখা বল্লে যাও যাও—বই রাখো—ফিরবে কিনা তাই শুনি খৃষ্টান আমি কিছুতেই ফিরবো না—আমার এখন কাজের পালা। একরোখা ফিরে গেলো। দুর্ব্বল-চিত্ত কিন্তু খৃষ্টানের সহ-যাত্রী হয়ে এগিয়ে চলবার জন্য তাড়া দিতে লাগল—বই পড়ে পড়ে তাকে সব কথা ঠিক ঠিক জানাতে বল্লে—এগিয়ে গেলে কি কি সুবিধা হবে কোথায় কি উপভোগ্য সামগ্রী ভাগ্যে লাভ হতে পারে সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেছিল। খৃষ্টানের পিঠে মস্ত বড় বোঝা ছিল—দুর্ব্বল-চিত্তের কিন্তু কোনো বালাই ছিল না।

পরে স্বপ্নে দেখলাম তাদের কথা শেষ হতে না হতে তারা একটা জলাভূমির কাছে পৌঁছলে—সাবধান হয়নি বলে দু'জনাই সে জলায় পড়ে গেল, এই জলার নাম অবসাদ—খৃষ্টানের পিঠের বড় বোঝার ভারে সে ক্রমেই ডুবতে লাগল—দুর্ব্বল চিত্ত প্রশ্ন করল ভাই খৃষ্টান তুমি এখন কোথায় ? সে উত্তর করলে কিছুই তো বুঝতে পারছিনে। দুর্ব্বল-চিত্ত বিরক্ত হয়ে রাগতঃভাবে বল্লে,—ঐ সুখের কথা এতক্ষণ বলছিলে ? একবার প্রাণ নিয়ে বেরতে



দুর্ব্বলচিত্ত

পারলে হয়—সুখের দেশে তুমি যেও—আমি আর সঙ্গী হচ্ছি এই না বলে খুব জোরে এক ঝাঁকি

দিয়ে উঠে পড়ে সে বাড়ী গেল, খৃষ্টানের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। খৃষ্টান অবসাদ সবোবরে একাই পড়ে রইল—আর যেদিকে সহরের খিড়কি দরজা ছিল সেই দিকে উঠে পড়বার চেষ্টা করেও পারেনি কেননা তার পিঠে ছিল মস্ত ভারী এক বোঝা।



দুর্ব্বলচিত্ত ফাঁকি দিয়ে উঠে পবে বাড়ী গেল

আমি কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম তার কাছে একজন লোক এলো যার নাম আশা—আশ্বাস সেই লোকটিই সাহায্য করে তাকে অপর পারে শক্ত মাটির উপর পৌঁছে দিলে।

তার পর খৃষ্টান একাই চল্‌ল, পথে বিষয়-বুদ্ধি বলে একজনের সঙ্গে দেখা, সে তাকে পরামর্শ দিলে দেখ হে পিঠের বোঝা তুমি এখনই ফেলে দিতে পার—ঐ যে উঁচু পাহাড়ের উপর আইনজ্ঞের বাড়ী দেখছ তিনিই তোমাকে উপায় বলে দিতে পারবেন। খৃষ্টান তখন সোজা পথ ছেড়ে সেই দিকেই চল্‌ল—কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছে দেখলে পাহাড়টি এতই খাড়া আর পথের ধারে জায়গায় জায়গায় এম্নি ঝুঁকে পড়েছে যে, সেদিকে এগোতে আর তার ভরসা হল না, উপরন্তু তার পিঠের বোঝাও যেন বেশী ভারী বোধ হ'তে লাগ্‌ল—পাহাড়ের চারিদিকে আগুনের ঝল্‌কা দেখা যেতে লাগল—সে পথ ছাড়তেই হল।

এম্নি করে ধর্ম্ম-যাজকের সঙ্গে দেখা, তিনিও তাকে ঠিক পথ নির্দ্দেশ করলেন—তাই সময় যেমন এগিয়ে চল্‌ল খৃষ্টানও তেম্নিভাবে ক্রমে সহরের খিড়কি দরজায় পৌঁছে গেলেন। দরজা খুলে গেল, সদিচ্ছা তার অভিপ্রায় জানতে পেরে—সম্মুখের সঙ্কীর্ণ পথ ধরে চল্‌তে বলে দিলেন।

খৃষ্টান জিজ্ঞাসা করলেন—এর মধ্যে ডাইনে বাঁয়ে ঘোরাফেরা নেইত যাতে পথ ভুল হতে পারে? সদিচ্ছা বল্লে আছেই ত—তবে সে এধারে বাঁকা পথ প্রশস্ত—আর সোজা যে পথ যা দিয়ে তোমাকে যেতে হবে তা, কিন্তু—সঙ্কীর্ণ।

খৃষ্টান এগিয়ে চল্লেন, দোভাষীর বাড়ীতে গেলেন—সদিচ্ছার আদেশ মত দুয়ারে ঘা দিতে দুয়ার খুলে গেল। তারপর দেখলাম দোভাষী খৃষ্টানের হাত ধরে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গিয়ে আমাদের প্রভুর



খৃষ্টান সে রাত্রিতে সেখানে বিশ্রাম করলেন

প্রতিকৃতি দেখিয়ে যা' যা' করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে আশীর্ব্বাদ করলেন, খৃষ্টান সে রাত্রিতে সেখানে বিশ্রাম করলেন। পরের দিন খৃষ্টানও সেই সব কথা মনের মধ্যে গেঁথে নিয়ে তারি বিষয় ভাবতে ভাবতে চল্লেন।

তার পর দেখ্‌লাম যে উঁচু পথ বেয়ে তাকে যেতে হবে তার দু'ধারে প্রাচীর দেওয়া—আর সেই প্রাচীর দুটির নাম মুক্তি—খৃষ্টানও পিঠের বোঝা বয়ে দৌড়ে চল্‌লেন, দৌড়ে যেতে কষ্টই হচ্ছিল—ক্রুশ-চিহ্নিত স্থানে পৌঁছামাত্র তার পিঠের বোঝা খসে পড়ল, গড়াতে গড়াতে সেই বোঝা এক কবরের মধ্যে চলে গেল আর দেখতে পেলাম না। তারপর খৃষ্টান হাল্কা খুসী মনে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখেল আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়ে দু'কপোল ভাসিয়ে দিলে। হাসি কান্নার সেই শুভক্ষণে সে যখন প্রতীক্ষা করছিল তিনটি উজ্জ্বল মূর্ত্তি তার কাছে এসে স্বাগত জানিয়ে বল্‌লে, প্রথমা বল্‌লেন "শান্তি" লাভ কর—সকল পাপ মুক্ত হও", দ্বিতীয়া তার শতছিন্ন পরিচ্ছদ খুলে নিয়ে নব বস্ত্র দান করলেন—তৃতীয়া কপালে শুভ-চিহ্নে চিহ্নিত করে শীল মোহর করা তাঁর হাতে এক তাড়া কাগজ দিয়ে আদেশ করলেন এই লেখা পথে যেতে যেতে খুলে দেখো—স্বর্গদ্বারে পৌঁছে দ্বারীকে এই পত্রখানি দিয়ো। এই তিনটি—দিব্যমূর্ত্তি স্বর্গদূতী।—তাঁরা তাঁদের পথে গেলেন—খৃষ্টানও মহানন্দে তিন লম্ফ দিয়ে স্তব বন্দনা গান গাইতে গাইতে আগুয়ান হলেন।



অবিশ্বাস

অন্ধকার দৈত্যের সাথে খৃষ্টানের দ্বন্দ্বযুদ্ধ

নম্রতা অধিত্যকায় যুদ্ধ

খৃষ্টান মুস্কিল পর্ব্বতে বিশ্রাম করতে করতে গভীর নিদ্রামগ্ন হয়ে পড়ল—ঘুমের ঘোরে হাতের কাগজখানি খসে পড়ল। পর্ব্বত চূড়ার কাছে দুটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হল, একজনের নাম অবিশ্বাস, অন্যের নাম ভীরু। তারা দুজনেই ফিরে আসছিল কেননা পথে নানা বিপদে পড়েছিল। এই কারণে—খৃষ্টান হাতে যে কাগজ নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল তার খোঁজ করলে, কেননা সে মনে করেছিল কাগজখানিতে যা' লেখা আছে পড়ে দেখলে সান্ত্বনা পাবে, সেখানে কিন্তু

মচে

গিয়ে যখন পেলে তখন তার আনন্দের সীমা রইল না, স্বর্গরাজ্য প্রবেশের সেইখানি ছাড়পত্র। এবার তিন লাফে আবার পাহাড় চূড়ায় উঠে এল, কিন্তু ঠিক্ পৌঁছবার কিছু আগেই সূর্য্যাস্ত হল, তখন "অবিশ্বাস" ও ভীরু যে সিংহের কথা বলে গিয়েছিল তাই মনে হ'ল কিন্তু ঘুমের জন্য যখন নিজেকে দোষী করছিল—তখন চোখ তুলে সৌন্দর্য্য প্রাসাদ দেখতে পেয়ে সত্বর রাত্রির আশ্রয়ের জন্য সেখানে গেল।

বেশী দূর যাবার আগেই—দ্বারীর ঘরের আগে একটি সঙ্কীর্ণ পথ পেলে সেটা লম্বায় এক পোয়া হবে। সিংহদের শিকলে বাঁধা হয়েছিল কিন্তু শিকল দেখতে না পেয়ে একটু ভয় হচ্চে। দ্বারীর নাম সতর্ক—মাঝ পথে যাও খৃষ্টানকে ডেকে বল্‌লে মনে বিশ্বাসের বল রেখো, মাভৈঃ। খৃষ্টান তাই করে সৌন্দর্য্য-প্রাসাদে পৌঁছে গেল—সে প্রাসাদ তীর্থ যাত্রীদের বিশ্রাম ও আশ্রয়ের জন্যই নির্ম্মিত হয়েছিল।

তাকে স্বাগত জানাতে সুবিবেচনা বাহিরে এল, খৃষ্টানের বৃত্তান্ত শুনে 'ধর্ম্মশীলা", "সাবধিতা" আর "জীবেদয়া" এই তিন জনকে ডাকলে, খৃষ্টানকে সমাদরে প্রাসাদের ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল।

এখানে সে অনেক সদুপদেশ পেয়েছিল—দোভাষীও তাকে এই সব কথা বলেছিলেন,—রাত্রির শেষে খাবার পর দোতালায় খৃষ্টানকে যে ঘরে শুতে দেওয়া হল, তার জানালাগুলি, সূর্য্যোদয়ের দিকে, এই সুন্দর ঘরটিতে খৃষ্টান রাত্রি ভোর হওয়া পর্য্যন্ত আরামে ঘুমিয়েছিলেন।



তিমির দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ

বাড়ী ছাড়বার আগে খৃষ্টানকে সেখানকার সব সৌন্দর্য্য সংগ্রহ দেখিয়ে তাকে ছাদে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল—সেখান হতে তিনি সুগম বহুদূর পার্ব্বত্য পথ দেখলেন, পর্ব্বতের নাম আনন্দ শিলা, দেশের নাম খৃষ্টাবতারের দেশ—সেখান হতে স্বর্গরাজ্যের তোরণ দৃষ্টিগোচর হয়।

খৃষ্টানের সেই আগ্রহ ক্রমে ক্রমেই বেড়ে চল্‌ল—কিন্তু যাত্রার পূর্ব্বে পাছে কোন আক্রমণের আত্মরক্ষা করতে হয় তাই অস্ত্রাগারে নিয়ে গিয়ে সম্মুখ যুদ্ধের বর্ম্মচর্ম্ম আপাদমস্তক পরিয়ে দেওয়া হল কিন্তু পিঠের দিকটা খালি রাখা হয়েছিল। তোরণ দ্বারে দ্বারী বল্‌লে তাঁদেরি নগরের "বিশ্বাস" তাঁর আগেই সেই পথ দিয়ে আগে গেছেন।

তখন খৃষ্টান ও এগিয়ে চল্‌লেন, তবে সুবিবেচনা, ধর্ম্মশীলা, জীবেদয়া, বিবেকবুদ্ধি,' তাঁর সঙ্গে সঙ্গে পর্ব্বতের পাদদেশ অবধি গিয়ে নম্রতা অধিত্যকা পর্য্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন। খৃষ্টান অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে গিয়েছিলেন, পথ নিরাপদ ছিল না, তবুও যে দু'-এক আছাড় খান্‌নি তা নয়। সৎসহ-যাত্রীরা তাঁকে একখানি রুটি কিছু সুরা ও কিস্‌মিস্ পথে খাবার জন্যে দিয়েছিলেন—বেশী দূর যেতে না যেতেই কিন্তু খৃষ্টান দেখলেন একজন দুষ্ট এগিয়ে এল, সে দেখতে যেমন কুৎসিত তেম্নি ভয়ানক। সে দুষ্টাত্মার নাম তিমির দৈত্য—প্রথমটা খৃষ্টানের ভয় হয়েছিল, তিনি ভেবেছিলেন ফিরবো না যুদ্ধ করব? পিঠের দিকে ত কোন বর্ম্মচর্ম্ম ছিল না—ভাবলেন ফিরলে যদি শত্রু আক্রমণ করে তবে আত্মরক্ষার কোন পন্থা হবে না—তার চেয়ে এগিয়ে যুদ্ধ করাই ভাল, তিমির দৈত্য যখন দেখলে পথিক ফিরলো না, তখন বীরোচিত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে তার বুকে অগ্নিবাণ মারলে, বিষম যুদ্ধ অর্দ্ধেক দিন ধরে চল্‌ল। খৃষ্টানের মাথায় হাতে গায়ে আঘাত লাগল, ততক্ষণে কিন্তু তিমির দৈত্যের অস্ত্র নিঃশেষ প্রায়, কাছে আসতে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হল, দৈত্য ভূমিসাৎ হতেই—হাতের তালোয়ার নিয়ে দৈত্য বল্‌লে এবার তোমায় দেখছি—এই না বলে মারবার জোগাড় করলে।

তিমির দৈত্য যখন শেষ অস্ত্র বাহির করছিল, খৃষ্টান সেই সুযোগে সহজে হাত বাড়িয়ে তলওয়ার নিয়ে শয়তানটিকে এমন এক ঘা দিলে যে সে তার বাদুড়ের মত ডানা মেলে উড়ে শীঘ্র পলায়ন করল। অতঃপর কে যেন একখানি হাত বাড়িয়ে খৃষ্টানকে জীবন-তরুর কতকগুলি তাজা পাতা দিলে, সেই সতেজ পাতা তার শরীরের আহত স্থানে দিতে না দিতে বেদনা যাতনা দূর হয়ে গেল। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবার পর আবার তার যাত্রা আরম্ভ হল। এবার খৃষ্টান খোলা তলওয়ার হাতে নিয়েই গেলেন—পথে কিন্তু আক্রান্ত হননি, কোন আততায়ীর সাক্ষাৎও মেলেনি।

পৃথিবীর ঘৃণা-হাটের অতিথিগণ
বিশ্বাসী ও খৃষ্টানের রক্ষা ও পলায়ন

অপমানের অধিত্যকা ছেড়ে আর একটি পথ—যার নাম মৃত্যুছায়া। খৃষ্টানের সেই পথেই যেতে হ'ত, কেননা স্বর্গপুরী যেতে হলে তারি মধ্যে দিয়েই তাকে

যেতে হয়। পথ অতি সঙ্কীর্ণ, ডানদিকে ছিল গভীর গহ্বর, বাঁদিকে জলা জল কাদায় ভরা—পড়লে ক্রমেই ডুবে যেতে হয়, উদ্ধারের উপায় থাকে না। তা ছাড়া চারিদিকে এমনি সূচীভেদ্য অন্ধকার যে, খৃষ্টান বুঝতেই পারছিল না কোন পথে চলেছে সম্মুখে কি পিছনে।

এই অধিত্যকার মাঝে পথের ধারে ছিল নরকের দ্বার। সেখান হ'তে থে'ক থেকে আগুন আর ধোঁয়া বেরিয়ে আস্‌ছিল. সেই সঙ্গে মানুষের আর্তনাদ দৈত্যদানব বেরিয়ে এসে চুপি চুপি কাণে কুমন্ত্রণা দিচ্ছিল, খৃষ্টান কিন্তু ভাবছিল সেগুলি তারি মনের কুচিন্তা। এইভাবে বহুদর ভাবাক্রান্ত মনে অগ্রসর হয়ে শুন্‌তে পেলে, সম্মুখে যে লোক যাচ্ছিল সে বল্‌ছে আমি যদি মরণের অধিত্যকার মধ্যে দিয়েও যাইতবুও ভীত হব না—কেননা হে ভগবান তুমি আমার সঙ্গী ও সহায়। তখন খৃষ্টানের মনে বল ও ভরসা হ'ল, সে বুঝলে তারি মত স্বর্গ-তীর্থ-যাত্রী ঐ পথে চলেছে। তারপর প্রভাত হ'ল, যাকে বলে সুপ্রভাত। খৃষ্টান বল্লেন, ভগবান মৃত্যুছায়াকে দিব্য সুন্দর দিনে পরিণত করেছেন।

তার মনে হল এই "সূর্য্য করোজ্জল" প্রভাত তাঁরি প্রতি ঈশ্বরের বিশেষ করুণা; কেনন', খৃষ্টান যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান হতে অধিত্যকার শেষ পর্য্যন্ত অনেক গুহা গহ্বর ছিল—প্রলোভনে পড়বার ব্যাপারের সংখ্যার ফাঁদে পড়বার সম্ভাবনার অন্ত ছিল না—কাজেই আলো তাঁর পক্ষে আবশ্যকই ছিল। এই আলোতে তিনি অধিত্যকার সীমান্তে পৌঁছে গেলেন।

এখন অধিত্যকা ছেড়ে উপরে উঠতে হ'ল, এই যে উপরে ওঠা তারো প্রয়োজন ছিল, কেন না তীর্থ যাত্রীদের সম্মুখ পথটা যাতে দৃষ্টিগোচর হয় তার ব্যবস্থা দরকার তাই পাহাড় বেয়ে উঠতে হয়েছিল। খৃষ্টান চেয়ে দেখলেন বিশ্বাসী আগে চলেছে—তাঁরি নগর প্রতিবেশী তাঁর পরিচয় অজানিত ছিল না—সৌন্দর্য্য প্রাসাদের দ্বার-রক্ষীর কাছে হতে পূর্ব্বেই জেনেছিলেন তাই খৃষ্টান আনন্দের সুরে জোরে বল্লেন, তুমিও ভাই চলেছ বুঝি? আগে চল্ আগে চল্ ভাই—কি বল?

তারপর আমি স্বপ্নে দেখলাম, তারা দু'জনে গলাগলি করে চলেছে আর দুজনে প্রীতমনে বহু পরিচিত বন্ধুদের মতই কথা বলছে। ধ্বংসপুরী ছেড়ে উভয়ে যে সব প্রলোভন এড়িয়ে এত দূরে আগুয়ান হতে পেরেছে তারি ইতিহাস।



ছায়া অধিত্যকা

বন জঙ্গল হতে বেরিয়ে এসে তাদের সম্মুখে একটি সহর দেখতে পেলে যার নাম বৃথা গর্ব্বের হাট আমাদের হাট যেমন সপ্তাহে দুএকবার হয়, এ হাট—কিন্তু—সারা বছর সমান চলে। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে হতে তীর্থযাত্রীরা স্বর্গ দ্বারে এই হাট পার হয়েই যেত—আর অন্ধকারের দৈত্য অসৎ পরামর্শের সয়তান তাদের অসংখ্যাতীত সঙ্গী সহায় নিয়ে বৃথা গর্ব্বের হাট বসিয়েছিল, সেই সেখানেই যত প্রলোভনের সামগ্রীর বেচা কেনা চল্‌ত।

খৃষ্টান আর বিশ্বাসী এই হাটে প্রবেশ করতে সকলে তাদের পোষাক পরিচ্ছদ দেখে কথাবার্ত্তা শুনে অবাক হয়ে গেল। সহরে তখন তাদের নিয়ে খুবই তোলাপাড়া চলছিল—সবচেয়ে আশ্চর্য্য হয়েছিল ব্যবসায়ী লোকরা যারা বেচা কেনা করছিল। যখন তারা দেখলে এই দুই পথিক তাদের মাল পত্রের দিকে নজরই দিলে না, কেনা ত দূরের কথা—যখন দোকান-



বৃথা গর্ব্বের হাট

দার কিনবার কথা বল্লে তখন তারা শুধু বলেছিল আমরা কিনি সাচ্চা মাল যা' সত্যি শুধু তাই।

খৃষ্টান আর বিশ্বাসীর ব্যবহার আর সকলের এতই অবিশ্বাস্য বোধ হয়েছিল যে পরীক্ষা করে লোকে বল্লে হয় তারা উন্মাদ নয় তো এমন দুষ্ট মতলবী যে তাদের শহরটাতে গোলমাল বাধাতে এসেছে। সেই জন্যে তাদের ধরে নিষ্ঠুর ভাবে প্রহার ও গায়ে ধূলো দিয়ে একটা খাঁচায় বন্ধ করে রাখলে যাতে করে এই দুই সৎলোককে চিড়িয়াখানার জন্তুর মত অন্যে দেখতে পাবে।

সহরে যে শুধু দুষ্ট লোকই ছিল তা তো নয়—যারা ওরি মধ্যে ভাল, সৎবুদ্ধিমান, তারা যখন দেখলে, এই দুই লোক মারলে 'মার' ফিরে দেয় না, গালি দেয় না, তখন অন্যদের সঙ্গে তাদের বচসা সুরু হ'ল তবে—কথায় সারা হল না লাঠী সড়কি নিয়ে মার পিটও চলল।

তারপর আবার তাদের বিচারকদের সম্মুখে এনে অন্যে বল্লে সহরের সব গোলমাল অশান্তির মূল কারণ এরাই তাই তাদের শিকলে বেঁধে পথে পথে পথিকদের দেখিয়ে এনে আবার খাঁচায় ভরে রেখে দিল।

একটা সুবিধামত সময় ঠিক সেখানকার বাদশাহ মহাশয়ের কাছে বিচার করবার জন্যে হাজির করা হল। এই যে নবাব তিনি কারো তোয়াক্কা রাখতেন না মানুষ মাত্রকেই তুচ্ছ মনে করতেন, যেন তারা পোকা-মাকড়, পা দিয়ে দলিয়ে দেবার মতই জীব।

বিশ্বাসীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন ঈর্ষাপরায়ণ, কুসংস্কারী, আর হাঁ-জী হাঁ, জুরিতে যারা সাক্ষী শোনেন তারা সকলেই একমত হয়ে তাকে দোষী সাব্যস্ত করলেন, আর যতদূর নিষ্ঠুর ভাবে তার মৃত্যু দণ্ড হ'তে পারে তার বিধান দিলেন। সেই জন্যে তাকে খাঁচা খুলে বাইরে এনে ঝাঁটা, লাথী, ঢিল মেরে, তলোয়ারদিয়ে খুঁচিয়েও যখন তৃপ্তি হ'ল না তখন আগুনে পুড়িয়ে ভস্মসাৎ করে ফেল্‌লে। তবে ঈশ্বরের দয়ায় মেঘের আড়ালে চমৎকার রথ প্রস্তুত ছিল তাতেই করে' তাকে একেবারে স্বর্গরাজ্যে নিয়ে গেল।

খৃষ্টানকে আবার বন্দীশালায় নিয়ে আরো কিছুদিন বন্ধ করে রাখলে কিন্তু যিনি বিশ্বের নিয়ন্তা আর যাঁর দয়ার অন্ত নাই তাঁরি কৃপায় খৃষ্টান আপনি মুক্ত হয়ে পলায়ন করে' সম্মুখে পথে অগ্রসর হয়ে চল্‌ল।

সন্দেহ দুর্গে আবদ্ধ বন্দীগণ—নৈরাশ দৈত্যের হাত ছাড়িয়ে তীর্থ যাত্রীদের পলায়নের কথা

স্বপ্নে এখন দেখলাম বৃথা গর্ব্বের হাট ছাড়িয়ে আশা-আশ্বাসের সঙ্গে চল্‌লেন, হাটে খৃষ্টান, বিশ্বাসীর ব্যবহার দেখে কথাবার্ত্তা শুনে তাদের কাছে গিয়ে বল্লেন আমি তোমাদের প্রতি ভ্রাতৃস্নেহ সহানুভূতি অনুভব করছি তোমাদের ছেড়ে যাব না।

আরাম-হীন মাঠ ছাড়িয়ে দেমাস (Demas) যে বলেছিলেন সংকীর্ণ পথ ছেড়ে এসো ধনলুব্ধের রোপ্যখনি দেখে যাও, সে নিমন্ত্রণ তারা নিলেন না—পার্শ্বের পথে মাঠ দিয়েই চল্‌লেন। যে পথে এসে যেখানে পৌঁছেছিলেন, সে পথ প্রাচীর পার হবার সিঁড়ি বেয়ে উঠে খৃষ্টান আজ আশ্বাসকে বল্‌লেন চলনা ভাই এই পথে যাই, পথটা ভালই বোধ হচ্ছে যেতে কষ্ট হবে না। আশা বিশ্বাস বল্‌লেন এই সহজ পথ যদি আমাদের

বিপথে নিয়ে যায় তখন কি উপায় হবে? খৃষ্টান উত্তর করলেন—পথ ছাড়বো না তো, পাশে পাশেই যাব। আশা-আশ্বাস রাজী হলেন, তখন সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্যদিকে গিয়ে তাঁরা চললেন, পথটা সহজই ছিল, কষ্ট করতে হয়নি।

রাত্রি হয়ে এলো। ক্রমে গভীর অন্ধকারে চারিদিক ছেয়ে গেল। শুধু তাই নয়, ঝড়-বৃষ্টি, বজ্র-বিদ্যুৎ চারিদিকে বিভীষিকা বিস্তার করলে। তারা দেখলে পথ হারিয়ে ফেলেছে—বন্ধু সঙ্গীকে এমন ভাবে বিপথে আনবার জন্যে খৃষ্টান অনুতাপ করতে লাগল।

আশা-আশ্বাস কিন্তু তাকে ক্ষমা করে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, চল ফিরে যাওয়া যাক্ এবার কে কত শীঘ্র



নৈরাশ দৈত্য মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়ল

যেতে আর আগে পৌঁছিতে পারে তারি প্রতিযোগিতা চল্‌ল। ঠিক্ হল, কোন বিপদকে ভয় করবেন না। এরি মধ্যে বৃষ্টির তোড়ে জলটা পথে খুবই বেড়ে উঠে এত জোরে চলছিল—সে পথে যাওয়া বিপজ্জনক।

অবশেষে ডুবতে ডুবতে কোন রকমে রক্ষা পেয়ে সামান্য একটি আশ্রয় লাভ করলেন। প্রায় নয়, দশ বার ডুবেছিলেন আর কি! তখন তাঁরা মনস্থ করলেন, ভোর অবধি সেইখানটিতে বিশ্রাম করবেন, বড়ই শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাই অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাঁরা যেখানে ঘুমিয়েছিলেন, তার কাছেই একটি সুরক্ষিত অট্টালিকা ছিল, যার নাম সংশয়-দুর্গ—এই দুর্গের অধিকারী নৈরাশ দৈত্য। এই দৈত্যের অধিকারের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। ভোর বেলায় উঠে যখন এই দৈত্য দেখলে, তারা তার এলাকার মধ্যেই ঘুমিয়েছে, তখন সে তাদের জাগাবার হুকুম দিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে একটি ঘরে বন্দী করে রাখলে। এই দুর্গন্ধ অন্ধকার ঘরে তারা বুধবার সকাল হ'তে শনিবার রাত্রি পর্য্যন্ত ছিল।

বৃহস্পতিবারে দৈত্য-পত্নী সঙ্কুচিতার পরামর্শে নৈরাশ দৈত্য এসে তাদের উপদেশ দিয়েছিল, আত্ম-হত্যা করাই তাদের উচিত—যখন তারা মিনতি করে মুক্তি প্রার্থনা করল, তখন দৈত্য তাদের আক্রমণ করে নিজেই হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল, কিন্তু তার ছিল মূর্চ্ছারোগ, বিশেষ করে সূর্য্যালোকিত দিন সহ্য করতে পারত না, তাই কিছুক্ষণের জন্য একেবারে এমন অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, হাত কি পা ব্যবহার করা তার সাধ্যায়ত্ত ছিল না।

সন্ধ্যার দিকে দৈত্য আবার বন্দীদের ঘরের দিকে গেল। দেখলে, তারা তখনও জীবিত, এমনি ক্রুদ্ধ হয়ে চীৎকার আরম্ভ করলে যে খৃষ্টানের সাহস কমে আসতে লাগল। কিন্তু আশা-আশ্বাস তাকে সান্ত্বনা দিয়ে তিমির দৈত্যকে জয়ের মৃত্যু-ছায়ার অধিত্যকা অতিক্রম করে আসবার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে।

শনিবার প্রাতে দৈত্য-দম্পতী পরামর্শ করে বন্দী-দের দুর্গের প্রাঙ্গণে এনে পূর্ব্ব-মৃত বন্দীদের অস্থি-পুঞ্জ দেখিয়ে বল্লেন, এই তো দেখছ যারা আগে এসেছিল তাদের দশা, ঐ অবস্থা তোমাদেরও হবে; শুধু দিন দশেকের দেরী। এই বলে আবার তাদের মারতে মারতে নিয়ে গিয়ে পুনরায় কয়েদে পূরল।

সেই রাত্রে দৈত্য দম্পতী আবার তাদের সম্বন্ধে পরামর্শ আরম্ভ করলে। দৈত্য আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল যে, এত প্রহারেও তারা অবিচলিত। সঙ্কুচিতা বল্লে, বোধ হয় আশায় আছে কেউ এসে তাদের উদ্ধার করবে, কিংবা কয়েদের দরওয়াজা ভেঙ্গে পালাবার কোন যন্ত্র-তন্ত্র তাদের কাছে অবশ্য আছে, অতএব সকালে ভাল করে খোঁজ করা ভাল।

কিন্তু শনিবার মাঝ রাতে খৃষ্টান ও বিশ্বাসী একান্ত মনে প্রার্থনা করেছিল, ভোর হবার কিছু পূর্ব্বে

খৃষ্টান বল্লে, আমি বড়ই নির্ব্বোধ, অকারণে এই দুর্গন্ধ ঘরে পড়ে আছি, আমার বুক-পকেটে যে প্রতিজ্ঞার চাবি আছে তাই দিয়ে আমার বিশ্বাস, সন্দেহ-দুর্গের ফাটক্ খুলে বাহিরে যেতে পারব, মুক্তি আমাদের প্রায় হস্তগত। এই বলে চাবি বার করে তাই



খৃষ্টান ও বিশ্বাসী একান্ত মনে প্রার্থনা করছিল

দিয়ে কয়েদ-ঘরের দরজা খুলে পরে সদর দরজাও খুলে ফেললে। ফাটক্ খুলবার সময় এত আওয়াজ হল যে, দৈত্যের ঘুম ভাঙল, উঠে তাদের পিছু দৌড়াবার চেষ্টা করলে কিন্তু কাজের হল না, আবার মূর্চ্ছা বশে শুয়ে পড়তে হল। ইত্যবসরে তারা প্রশস্ত রাজপথে বেরিয়ে এগিয়ে চলল—দৈত্যরাজ্য ছাড়িয়ে গেল, আর তাদের আপদে পড়তে হয়নি।

তীর্থযাত্রীর যাত্রা শেষ
খৃষ্টান ও বিশ্বাসী খৃষ্ট ভক্তের স্বর্গ নগরে উপস্থিতিবার্ত্তা

খৃষ্টান ও আশাপূর্ণ কিছুক্ষণের মধ্যেই সুখ-শৈলে গিয়ে পদার্পণ করেছিল, মেষপালকেরা তাদের স্বাগত জানালে। মেষপালকদের নাম, জ্ঞান, অভিজ্ঞতা, সতর্ক ও সরল। সকলেই খুসী হয়ে তাদের সৎপরামর্শ দিলে, প্রত্যেকের দর্পণে স্বর্গ-দ্বারের ছবি তাদের দেখাল।

তখন তারা আবার যাত্রা করল। ইতিমধ্যে একজন লোক তাদের সম্মুখীন হল, কাফ্রিদের মত তার গায়ের রং কিন্তু পরণে খুব দামী পোষাক—এত সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ যে শরীর দেখা যাচ্ছিল। খৃষ্টান ও বিশ্বাসী স্বর্গরাজ্যের পথিক শুনে বল্লে, আমায় অনুসরণ করো আমারও গন্তব্য স্থান সেই একই।

এই লোকটির নাম তোষামোদ। বুঝবার আগেই সে এই দুজনকে ফাঁদে ফেল্‌লে—তখন তাদের মেষপালকদের সতর্ক-বাণী স্মরণ হল।

এর পরেই দেখ্‌লে একজন এগিয়ে আসছেন। তাঁর দীপ্ত দিব্য মূর্ত্তি; হাতে চাবুক—যখন তিনি শুন্‌লেন, এরা দুজন স্বর্গ-যাত্রী তোষামোদের ফাঁদ ছিঁড়ে তাদের দুজনকে বেশ করে কয়েক ঘা চাবুক মেরে সাজা দিয়ে ছাড়িয়ে নিলেন আর বলে দিলেন মেষপালকদের পরামর্শ যেন ভুলে না যায়।

তারাও এগিয়ে চলল—সে দেশের বাতাস যেন ঘুমে ভরা, আশা-আশ্বাস ঘুমিয়ে পড়ছিল—খৃষ্টান কিন্তু মনে রেখেছিল এটা মায়া-দেশ, তাই ঘুমিয়ে যাতে না পড়ে, সেই চেষ্টায় কথাবার্ত্তা কইতে সুরু করলে। মায়ার দেশ ছাড়িয়ে যেখানে পৌছল তার নাম Beulah (সুন্দরা পথ?) সেখানকার আবহাওয়া অতি সুন্দর। পথেই সে স্থান পড়ে বলে, সান্ত্বনা ও শান্তি লাভ করবে বলে কিছুদিন বাস করলে—পাখীর কল কাকলিতে মধুর, পুষ্প সুরভিত, কপোতের গদ গদ গম্ভীর সুরে প্রতিধ্বনিত। এই দেশে দিন রাত্রির ভেদ নাই—আলো অস্ত যায় না—তার কারণ মৃত্যু-অধিত্যকার কোন ছায়া সেখানে পড়ে না। নৈরাশ সংশয়-দুর্গ ছেড়ে আসে না—এমন কি, সে দুর্গ কারো দৃষ্টিগোচর হয় না যতই অগ্রসর হল, স্বর্গদ্বার ততই স্পষ্টতর হয়ে উঠল।

মুক্তাপ্রবালে প্রাচীর নির্ম্মিত আর পথ সোণায় মণ্ডিত—এক তো আপন ঐশ্বর্য্য তার উপর সূর্য্যালোকে সে রাজ্য এমনি মনোহর হয়েছিল, চির অভীপ্সিত রাজ্যের দর্শনে খৃষ্টান একেবারে মুগ্ধসম্বিৎহারা হয়ে পড়েছিল, আশাময়ের অবস্থাও তারি মত হল। কিন্তু কিছু মনোবল সঞ্চয় করে তারা না থেমে এগিয়েই চলল। দুজনের সঙ্গে দেখা হল যাঁদের পরিচ্ছদ কিংখাবের, আপাদমস্তক দিব্যালোকে উজ্জ্বল। এঁরা যাত্রীদের জিজ্ঞাসা করলেন, কোথা হতে এসেছ? তারা তাদের দেশের উল্লেখ করবার পর স্বর্গদূতরা বল্‌লেন, এখনও তোমাদের সম্মুখে দুটি মুস্কিল—সে দুটি কাটলেই স্বর্গরাজ্যে পৌছে যাবে। খৃষ্টান ও আশাময় তাঁদের পথ-সঙ্গী হবার জন্যে অনুরোধ করলে তাঁরাও সম্মত হলেন। চার জনে একত্র চলে স্বর্গদ্বারে এসে উপস্থিত হলেন। কিন্তু সম্মুখেই নদী আছে, সেতু নাই—নদীর জলও গভীর। দিব্য সঙ্গীরা বল্‌লেন, সাঁতার দিয়ে নদী পার হতে হবে,

বিশ্বাস-বল যদি হ্রাস হয়, তবে স্রোত দুরন্ত হবে, জলের গভীরতা বেড়েই চল্‌বে কিন্তু যদি বিশ্বাস হ্রাস না হয়, স্বর্গ-সম্রাটের প্রতি ভক্তি অচলা থাকে, তবে কোন ভয়ই থাকবে না। খৃষ্টান জলে ঝাঁপ



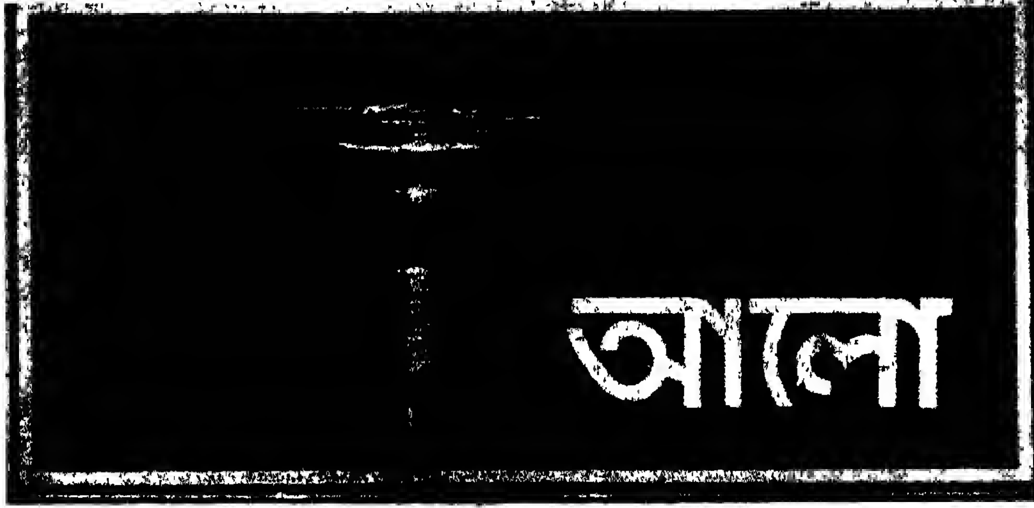
তরঙ্গ সব মাথার উপর দিয়ে চল্‌ছে।

দিয়ে পড়লেন। তারপর বল্‌লেন, হায় হায় আশাময়! ডুবছি যে, তরঙ্গ সব আমার মাথার উপর দিয়ে চলেছে, কি করি! আশাময় বল্‌লেন, ভয় কি?—ভাই হে মাথা উঠিয়ে থাক। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের সাহস বাড়ল—দুজনেই নদীর অপর পারে পৌঁছে গেলেন। নদীর অপর পারে তাঁরা দিব্য দুই মূর্ত্তি দেখতে পেলেন। তাঁরা তাঁদের জন্যই প্রতীক্ষা করছিলেন, জল হতে বাহির হবার পর তাঁরা তাঁদের বল্‌লেন, আমরা তোমাদের শুশ্রূষার জন্য এসেছি—মুক্তি অধিকারীদের শুশ্রূষা আমাদেরই বিশেষ কর্ত্তব্য।

স্বর্গ রাজধানী প্রকাণ্ড পর্ব্বত-চূড়ায় অবস্থিত, তীর্থ-যাত্রীরা কিন্তু অতি সহজেই উঠতে পেরেছিল, পার্থিব পরিচ্ছদ তাদের শরীর হতে খসে গিয়েছিল, তা ছাড়া দিব্যদূতরা, তাদের হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

স্বপ্নে দেখলাম, খৃষ্টান ও আশাময় দ্বারে তাদের প্রশংসা-পত্র দেখালে, তারা প্রবেশের অধিকার পেলে। প্রবেশের পরই তাদের মূর্ত্তি হল দেবতার, আর পরিচ্ছদ উজ্জ্বল রত্ন-মণিমণ্ডিত। যারা তাদের অভিনন্দিত করবার জন্য সম্মুখে এল—সকলেরি মূর্ত্তি দিব্য সুন্দর, হাতে বীণা, মাথায় স্বর্গ-মুকুট—শুন্‌তে পেলাম নগরের ধর্ম্ম-মন্দিরের ঘণ্টা রাগরাগিণী আলাপের মত সুস্বরে বেজে উঠল, মনে হল তারা যেন আনন্দ-ধ্বনি করে বল্‌ছে—হে দীর্ঘ-তীর্থ-পথ-যাত্রী-দ্বয়, তোমরা জয়ী, দেবানুগ্রহ তোমাদের করগত। তখন আমি জেগে উঠলাম—বুঝলাম এ আমার স্বপ্ন—যা' প্রেরণার মত জাগ্রত।

স্ত্রীর সম্মুখ যাত্রা (The Pilgrim's Progress-র দ্বিতীয় ভাগও বনিয়ান্‌ লিখিয়াছেন। দ্বিতীয় ভাগে দেখিতে পাই, খৃষ্টানের স্ত্রী-পুত্র-পরিবারেরাও খৃষ্টানের ন্যায় সম্মুখ যাত্রা করিয়া-ছিলেন এবং স্বর্গে যাইয়া পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন। সমালোচকেরা বলেন, দ্বিতীয় ভাগ প্রথম ভাগের ন্যায় চিত্তাকর্ষক হয় নাই। কিন্তু তথাপি তাহার মধ্যে স্থানে স্থানে এমন সুন্দর বর্ণনা আছে যে, ঐগুলি ইংরাজী সাহিত্যের গৌরব বলা যাইতে পারে। আমরা অনাবশ্যক বোধে দ্বিতীয় ভাগের গল্পাংশ প্রকাশিত করিলাম না।



ইন্দ্রধনু

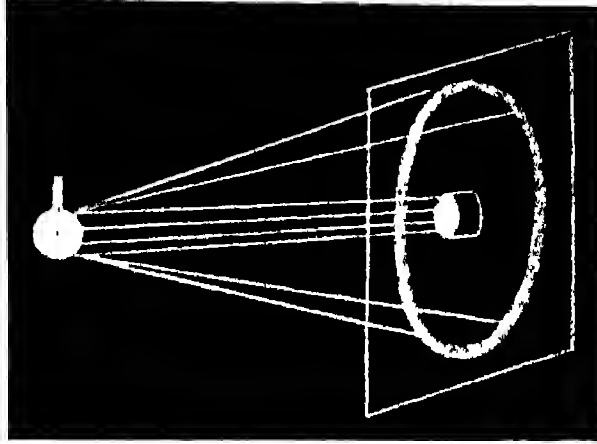


শিশু মাত্রের কাছেই ইন্দ্রধনু একটা অতিশয় অদ্ভুত ব্যাপার, নানা বর্ণে সজ্জিত হইয়া যখন তাহা উন্মুক্ত আকাশে উজ্জ্বল হইয়া নিজেকে প্রকাশ করে, তখন শিশুর মনে আপনা হইতেই নানা কৌতূহল জাগিয়া উঠে। এই যে অদ্ভুত একটা বিস্ময়কর ব্যাপার, ইহার কারণটা যে কত সাধারণ, তাহা যখন তোমরা জানিতে পারিবে, তখনও আবার তোমরা বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারিবে না। তোমরা সর্ব্বত্রই লক্ষ্য করিয়াছ যে, পদার্থ হইতে পদার্থান্তরে যাইতে হইলে আলোক রশ্মির পথ বাঁকিয়া যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহা নানা রঙে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রিজমের মধ্য দিয়া আলোক-রশ্মিকে চলিয়া যাইতে দিয়া নিউটন এই ব্যাপারটি খুবই স্পষ্ট ভাবে দেখিবার সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন। প্রিজম্ লইয়া সাদা আলো ভাঙ্গিয়া নানা রঙ্ সৃষ্টি করিবার নিউটনের চমৎকার পরীক্ষাটি তোমরা এই স্থানে স্মরণ করিয়া দেখ। ইন্দ্রধনু তৈয়ার হইতে প্রকৃতির এই নিয়ম দুইটিরই প্রধানতঃ হাত রহিয়াছে। কি ভাবে এই সামান্য নিয়ম দুইটি এই বিরাট্ একটা দৃশ্য সৃষ্টি করিল, তাহাই তোমাদের এইবার বুঝাইবার চেষ্টা করিব।

বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে কিরূপ অবস্থা বিপর্য্যয় ঘটিলে ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি হয়, তাহা তোমরা এইখানে ভাবিয়া দেখ। ইন্দ্রধনু প্রকাশ পাইবার সময় সাধারণতঃ বৃষ্টি থামিয়া আসে এবং সূর্য্য যে-দিকে বর্ত্তমান সে দিক্‌কার আকাশ পরিষ্কার হইয়া সূর্য্যকে উন্মুক্ত করিয়া দেয়, অথচ তাহার উল্টা দিক্ বেশ মেঘাচ্ছন্ন থাকিয়া তখনও অল্প অল্প বৃষ্টি দিতে থাকে। ইহার অতিরিক্ত আরও একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিবার আছে। ইন্দ্রধনু প্রকাশ হইবার সময় সূর্য্য কখনও খুব উচ্চ আকাশে থাকে না বেশ নীচু হইয়াই কিরণ ছড়াইতে থাকে। তোমরা দুপুর বেলা কেহ কখনও ইন্দ্রধনু প্রকাশ পাইতে দেখিয়াছ কি? সকাল বেলা অথবা অপরাহ্ণ সময় ইন্দ্রধনু প্রকাশ পাইবার প্রশস্ত সময়। অল্প কথায় বলিতে গেলে এই সময় সূর্য্য নিম্নস্থ হইয়া অপর দিকের আকাশ হইতে বৃষ্টিরূপে যে জলবিন্দুগুলি ঝরিয়া পড়িতেছে, নিজের কিরণকে পৃথিবীর সমান্তরাল ভাবে তাহাদের উপর পাঠাইয়া দেয়। এই জলবিন্দুগুলি তখন সেই রশ্মির চলিয়া যাইবার পথকে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া তাহাকে নানা রঙে বিভক্ত করে এবং আমাদের কাছে এই রঙীন আলো পাঠাইয়া দেয়।

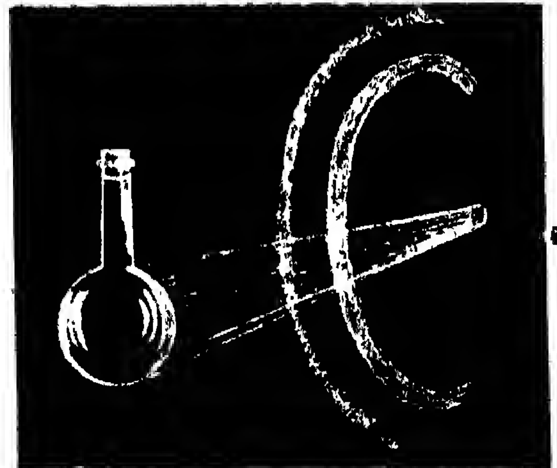
জলবিন্দু কেমন করিয়া সাদা আলো-কে ভাঙিয়া রঙীন আলো তৈয়ার করে, তাহা এইবার তোমাদিগকে বলিতেছি। তোমরা একটা গোল সাদা কাঁচের শিশি জোগাড় করিয়া লও এবং তাহাতে খুন-গোলা জল

ভর্ত্তি কর। এই ছোট গোল শিশিটা তোমাদের কাছে বৃষ্টির ফোঁটার কাজ করিবে। নিউটন আলোক-রশ্মি লইয়া পরীক্ষা করিবার সময় যে জানালা দিয়া সূর্য্য-রশ্মি ঘরে আসিত, তাহাতে একটা ছোট ছিদ্র করিয়া লইয়াছিলেন। এই ছিদ্র দিয়া সরু সুতার মত রৌদ্র যখন ঘরে ঢুকিত, তখন সেই রশ্মি লইয়া তিনি নানা রকম পরীক্ষা ও প্রয়োগ করিয়া আলোর নিয়ম সকল অনুসন্ধান করিতেন। এইরূপ করাতে তাঁহার ঘরে অনাবশ্যক আলো ঢুকিয়া তাঁহার পরীক্ষায় ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিত না তোমরাও যদি ঘরের জানালার এইরূপ একটা ছিদ্র দিয়া রশ্মি পাইতে পার, তবে এই পরীক্ষাটির পক্ষে খুব সুবিধা হইবে। এখন এই সূর্য্য-রশ্মির পথে তোমার নুন-জল-ভরা গোল শিশিটি আনিয়া রাখ। এইবার রশ্মিটি যে ছিদ্র দিয়া ঘরে প্রবেশ করিতেছে তাহার চতুর্দ্দিকে লক্ষ্য কর ;—একটি চমৎকার পূর্ণ গোলাকার ইন্দ্রধনু তোমার অন্ধকার ঘরে তৈয়ার হইয়া পড়িয়াছে। তোমাদের বোধ হয় বলিয়া দিতে হইবে না, যে সত্যকারের ইন্দ্রধনুও প্রায় এই ভাবেই আকাশে তৈয়ারী হয়। তুমি তোমার ঘরে যে ইন্দ্রধনু তৈয়ার করিলে, তাহাতে অবশ্য একটা কথা আছে। ইহাতে যে রঙ্ দেখিতে পাইতেছ তাহা সত্যকারের ইন্দ্রধনুর রঙ্ যেভাবে থাকে সেভাবে নাই। আকাশের ইন্দ্রধনুতে লাল রঙ থাকে বাহিরের দিকে তাহার পর পর্য্যায়ক্রমে অন্য ছয়টা রঙ্ পাওয়া যায়—বেগুনী রঙ্ থাকে ভিতরের দিকে। কিন্তু তোমাদের কৃত্রিম ধনুতে বেগুনী রঙ দেখিবে বাহিরের দিকে এবং লাল রঙ্ দেখিবে ভিতরে। ইহার কারণ অবশ্য তোমরা পরে জানিতে পারিবে।



টি চমৎকার গোলাকার ইন্দ্রধনু তৈয়ার হইয়া পড়িয়াছে

গোল শিশিটাকে এই অবস্থায় যদি বেশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখ তবে কয়েকটা জিনিষ লক্ষ্য করিবে। তোমরা দেখিতে পাইবে যে, সূর্য্যের কতকগুলি রশ্মি শিশিটার গায়ে লাগিয়া সেইখান হইতেই প্রতিফলিত হইয়া পড়িতেছে। শিশিটা যে উজ্জ্বল দেখাইতেছে, সে এই রশ্মিগুলিরই নিমিত্ত। তাহার পর যে রশ্মিগুলি শিশিটার গায়ে সোজা বা লম্বভাবে গিয়া লাগিতেছে, দেখিতে পাইবে যে, সেগুলি শিশিটাকে ভেদ করিয়া জলের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়া শিশিটার অপর দিক দিয়া বাহির হইয়া যাইতেছে। এই যে রশ্মিগুলির কথা বলিলাম, এইগুলি ইন্দ্রধনু তৈয়ারী করে না। তোমরা দেখিতে পাইবে যে, কতকগুলি রশ্মি শিশিটার উপর এবং নীচে আসিয়া পড়িতেছে, এবং তাহার পর বাঁকিয়া গিয়া বা পরাবর্ত্তিত হইয়া (Refracted) জলের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে। এই রশ্মিগুলি দিয়াই ইন্দ্রধনু তৈয়ারী হয়। ইন্দ্রধনুকে বুঝিতে হইলে এই রশ্মিগুলি কি কাজ করিতেছে, তাহা ভাল করিয়া অনুধাবন করিতে



অর্দ্ধবৃত্তাকার ইন্দ্রধনু তৈয়ার হইয়া পড়িয়াছে

হইবে। অতএব আমরা একটি বৃষ্টির ফোঁটাকে বড় করিয়া আঁকিয়া এই রশ্মিগুলির চলিবার পথকে ভাল করিয়া জানিবার চেষ্টা করি।

একটা বস্তু হইতে অন্য বস্তুতে প্রবেশ করিবার অবস্থায় আলোক-রশ্মি লম্বভাবে না আসিয়া যদি অসম কোণে (Oblique angle) আসিয়া থাকে, তবে তাহার চলিবার পথ বাঁকিয়া যায়। এই তত্ত্বটি তোমাদের কাছে আমি এত বার বলিয়াছি যে, শুধু নাম করিবা মাত্র ইহার ছবিটি তোমাদের সামনে উদয় হওয়া উচিত। তোমরা জান যে, এক কথায় বলিতে গেলে ইহাকে আলোক রশ্মির পরাবর্ত্তন হওয়া বলে। বৃষ্টির ফোঁটার মধ্যে রশ্মিগুলি ফোঁটাটির উপর এবং নীচে আসিয়া লাগিয়া পরাবর্ত্তিত হইয়া তাহার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতেছে এবং এই ভাবে ফোঁটাটির মধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহার পিছন দিকের দেওয়ালে আসিয়া লাগিতেছে। এই দেওয়ালটি এই রশ্মিগুলিকে দর্পণের মত সম্পূর্ণ প্রতিফলিত করিয়া থাকে। রশ্মিগুলি তাই ছবিতে যেরূপ দেখানো হইতেছে, সেইভাবে জলের ফোঁটাটির ভিতরে প্রতিফলিত হইয়া Total internal reflection ফোঁটাটির যে দিক দিয়া ঢুকিয়াছিল, প্রায় সেই দিক্ দিয়াই বাহির হইয়া আসে। জলের ফোঁটাটি আলোক-রশ্মির পথকে এই ভাবে অনেকটা ঘুরাইয়া দেয়।

প্রিজ্মের কথা যখন বলিতেছিলাম, তখন তোমরা জানিতে পারিয়াছিলে যে, কোনও পদার্থের ভিতর দিয়া যাইতে হইলে রশ্মি যদি বাঁকা পথে চলিয়া যায়, তাহা হইলে রশ্মিটি যে রঙগুলি দিয়া তৈয়ারী, তাহা সেই রঙে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এখানেও সেই কারণেই যে রশ্মিটি ফোঁটাটির মধ্যে পথ গণ্ডগোল করিল, সে অবশেষে বাহির হইবার পর তাহার সাদা পোষাক পরিবর্ত্তন করিয়া ইন্দ্রধনু রঙের পোষাক পরিয়া বাহির হইয়া আসিল।

তোমরা যদি জীবাণুর (microbe) মত ছোট হইয়া গিয়া বৃষ্টির ফোঁটাটির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িতে পার, অথবা কোন উপায়ে তাহাকে ঘরের মত বড় করিয়া তাহার মধ্যে যাইতে পার তবে একটা মজার ব্যাপার দেখিতে পাইবে। তোমার মনে হইবে যে, তুমি একটি গোলাকার দর্পণের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছ। বৃষ্টির ফোঁটাটির ভিতরের দিক সত্যসত্যই একটা দর্পণের মত। তাই আলোক-রশ্মি একবার ঢুকিলে ফোঁটাটির ভিতরে কয়েকবার প্রতিফলিত হইতে থাকে। অবশ্য, প্রত্যেকবার কিছু না কিছু রশ্মি বাহির হইয়াও থাকে। তোমরা বুঝিতেই পারিতেছ যে, ততবার ভিতরে রশ্মি ঘুরিতে থাকিবে, তাহার তেজও তেমনিই কমিয়া থাকিবে। অতএব তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, আকাশে একটিমাত্র ইন্দ্রধনু হয় না। সত্য কথা বলিতে গেলে অনেকগুলি ইন্দ্রধনু একটার উপরে একটা হইয়া দেখা দেয়। তবে সাধারণতঃ আমরা দুইটির অধিক দেখিতে পাই না। তাহার কারণ, প্রথমতঃ অন্যগুলির ঔজ্জ্বল্য খুব কমিয়া যায় এবং ক্রমে ক্রমে তাহারা সূর্য্যের নিকটে সরিয়া যাইতে থাকে বলিয়া আরও অস্পষ্টতা আসিয়া পড়ে। তোমরা দিন দুপুরে চাঁদ দেখিয়া থাকলে তাহাকে কেমন অস্পষ্ট মলিন দেখায়, লক্ষ্য করিয়াছ কি ? অথচ সেই চাঁদই রাত্রে কেমন উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পায়। এক্ষেত্রেও তাহাই ঘটিয়া থাকে। খুব উজ্জ্বল ধনুটির পাশে অনুজ্জ্বল ধনু আমাদের চোখের দৃষ্টিকে উত্তেজিত করিতে পারে না। তাই তাহারা অদৃশ্যই রহিয়া যায়।

যে রশ্মিগুলি বৃষ্টিবিন্দুর মাথার দিক দিয়া বিন্দুটির ভিতর প্রবেশ করিয়া, মাত্র একবারই প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া লাগে। প্রধান ধনুটি এই রশ্মিগুলি দিয়াই তৈয়ারী হয়। বৃষ্টির ফোঁটাটির যে ছবি গোড়াতে দেখান হইয়াছে, তাহাতে এই প্রধান ধনুটি তৈয়ারী হইবার ব্যাপারটিই দেখান হইয়াছে। অপর পক্ষে যে রশ্মিগুলি বৃষ্টিবিন্দুর নীচে দিয়া ঢুকিয়া দুইবার প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে আসিয়া লাগে (দ্বিতীয় ছবিটি দেখ) তাহাদের দ্বারাই দ্বিতীয় ধনুটি তৈয়ারী হয়। তোমরা জান যে, দ্বিতীয় ধনুটি প্রথমটি হইতে কিছু উচ্চে অবস্থিত থাকে এবং তাহার ঔজ্জ্বল্যও প্রথমটি হইতে অনেক কম হয়।

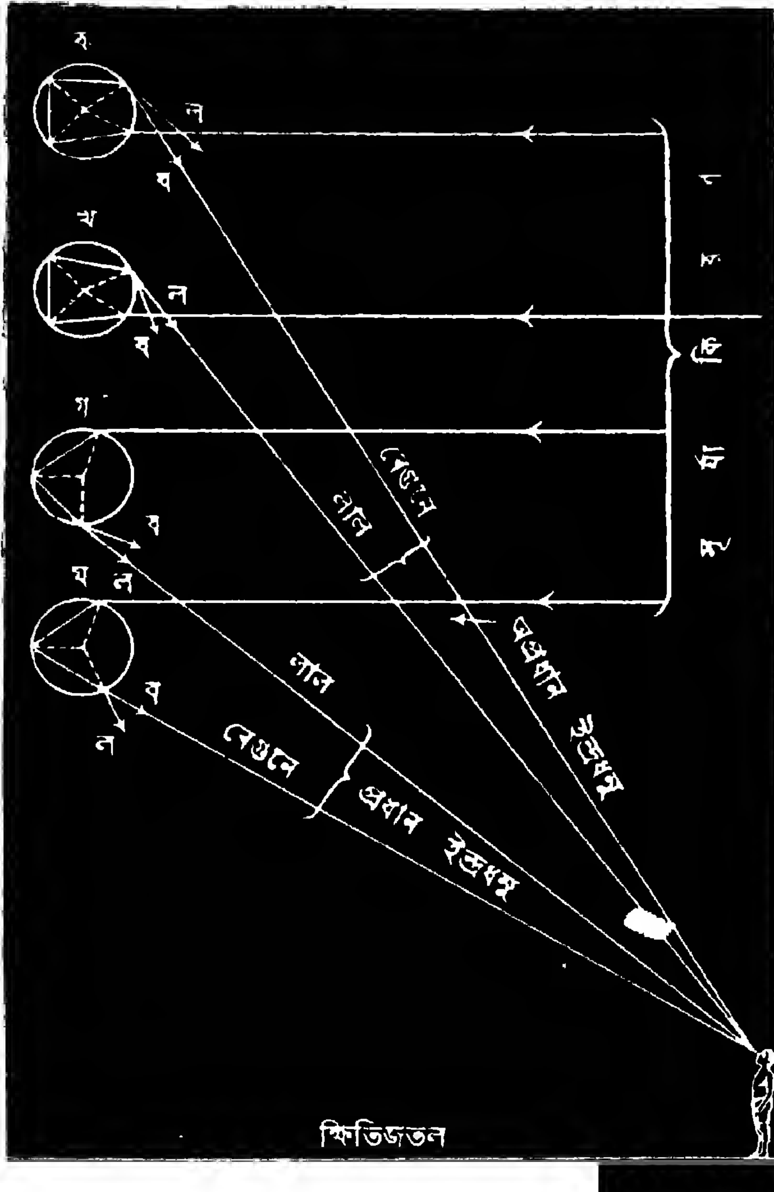
এখন প্রশ্ন হইতেছে এই যে, ইন্দ্রধনু ত আকাশের গায়ে জাগিয়া উঠিতে আমরা সকলেই দেখিয়া থাকি, কিন্তু বাস্তবিকই কি আকাশের গায়ে কোনও উপায়ে ঐভাবে রঙ লেপিয়া যায়, বা ঐ ব্যাপারটার আগাগোড়া হইতে গোড়া পর্য্যন্ত সমস্তটাই ভুয়া। ইহা ভুয়া বা তাহা নয়, এ প্রশ্নের উত্তর বলিতে পারি না, তবে এইটুকু বলিতে পারি যে আকাশের যে স্থানে ইন্দ্রধনু আছে মনে করিতেছ, উড়ো জাহাজ করিয়া বা যে কোনও উপায়ে যদি সেখানে পৌঁছিতে পার, তবে সেখানে বৃষ্টি এবং রৌদ্রই শুধু পাইবে—রঙের কোনও চিহ্নই দেখিবে না। বাস্তবিক পক্ষে নিকটে পৌঁছিবার বহু পূর্ব্বেই উহা তোমার নিকট হইতে মুছিয়া যাইবে। দর্পণে তোমার চেহারা কেমন স্পষ্ট ও অবিকল তোমারই মত হইয়া তৈয়ারী হইতে দেখ, দর্পণের পিছনে

হাত দিয়া তোমার ঐ দ্বিতীয়টিকে ধরিবার চেষ্টা করিলে ধরিতে পার কি? ছেলেবেলা সকলকেই একবার না একবার ঐরূপ চেষ্টা করিয়া বিফল মনোরথ হইতে হইয়াছে। দর্পণের প্রতিবিম্বটি তাই বলিয়া কি ভুয়া হইয়া যায়? সে কেমন তোমার দিকে মুখ ফিরাইয়া হয়ত তোমার অবস্থা দেখিয়া দাঁত বাহির করিতে থাকে। তাহা দেখিয়া তুমি যদি রাগ করিয়া উহাকে অস্বীকার কর, এবং ভুয়া বলিয়া প্রচার করিয়া দাও, তাহা হইলে সেই ভাবে ইন্দ্রধনুও ভুয়া হইয়া যাইবে। আর যদি তাহা না বল তবে ইন্দ্রধনুও তাহা হইবে না। দর্পণে তোমরা একটা ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছ কি? তোমার বাঁ দিক দর্পণের ডান দিক হইয়া যায় এবং তোমার ডান দিক দর্পণের বাঁ দিক হয়। তুমি যদি তোমার ডান হাত উঠাও সে তাহার বাঁ হাত তুলিবে। তোমার গায়ে যদি ডান দিক হইতে বাঁ দিক পর্য্যন্ত লাল হইতে বেগুনে পর্য্যন্ত প্রিজমের রঙগুলি ক্রমিক ভাবে লাগান থাকে, তবে দর্পণে তোমার যে ছায়া বহিবে, তাহার গায়ে তাহার ডান দিক হইতে বামদিক পর্য্যন্ত ঐ রঙগুলি ঐ ক্রমেই সজ্জিত থাকিবে। তোমরা কাঁচের গোল শিশি সূর্য্যের আলোতে ধরিয়া যে ইন্দ্রধনু তোমাদের ঘরের দেয়ালে তৈয়ারী করিয়াছিলে, তাহার রঙের ক্রম আকাশের ইন্দ্রধনুর রঙের ক্রমের উল্টা ছিল। এইবার তাহার কারণ ধরিতে পারিবে। আকাশের ইন্দ্রধনুটি দর্পণে প্রতিবিম্ব বিশেষ। দর্পণটি হইল ঐ ক্ষুদ্র জলকণাটি—যাহা বৃষ্টি হইয়া আকাশ হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। অতএব আকাশে ইন্দ্রধনুকে ফুটিয়া উঠিতে দেখা সত্ত্বেও আকাশে উহার কোনও স্থান নাই। অদ্ভুত কথা নহে কি?

ইন্দ্রধনু সম্পর্কে আরও একটি অদ্ভুত কথা তোমাদের জানাই। তোমরা প্রায় শতাধিক বালক মিলিয়া বিকাল বেলায় মাঠে খেলা করিতে গিয়াছ। এমন সময় বৃষ্টি আসিল এবং ক্ষণপরে তাহা কাটিয়া গিয়া পূর্ব্বাকাশ উজ্জ্বল হইয়া একটি ইন্দ্রধনু জল্ জল্ করিতে লাগিল। তোমরা তোমাদের খেলা ভুলিয়া তাহার দিকে অবাক্ দৃষ্টিতে তাকাইয়া রহিলে। তোমারা শতজনই উহাকে দেখিতেছ এবং একইরূপ দেখিতেছ, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আকাশে তোমরা প্রধান ধনুটি ও অপ্রধান আরও একটি ধনু দেখিতেছ এবং একজন যাহা দেখিতেছ, অপরজনকে বলিলে সে তাহাতে সম্পূর্ণ অনুমোদন করিতেছে। শুধু তাহাই নহে—তোমরা মাঠটির এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত চলিয়া যাও, তখনও ঠিক ঐ ধনুটি ঐ ভাবেই দেখিতে পাইবে—তাহার বর্ণের বা আকৃতির এই স্থান পরিবর্ত্তনের জন্য কোনও রূপ বৈলক্ষণ্য হইতেছে এরূপ পাইবে না। এইরূপ অকাট্য যুক্তির পরে যদি আমি বলি যে, তুমি যে ধনুটি দেখিতেছ, রাম সেটিকে দেখিতেছে না বা রাম যাহাকে দেখিতেছে শ্যামের ধনুটি তাহা হইতে স্বতন্ত্র, এবং অপর পক্ষে যদু তাহার জন্য একটি নূতন ধনু তৈয়ার করিয়া লইয়া শুধু সেইটিকেই দেখিতেছে এবং তোমরা তাহা দেখিতে পাইতেছ না। তাহা হইলে সে কথা বিশ্বাস যোগ্য বলিয়া মনে করিবে কি? শুধু ইহাই নহে, আমি আরও অদ্ভুত কথা বলিতে পারি। তুমি এখন যে ধনুটি দেখিতেছ এক পা পাশে সরিয়া গিয়া দেখ। এইবার যাহাকে দেখিতেছ সে ধনুটি তোমার প্রথমটি হইতে স্বতন্ত্র। তোমার স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই তোমার দেখা ধনুটিও নূতন হইয়া উঠে।

ইহার কারণ ঠিক যে কি, তাহা তোমাদের কাছে বলা কঠিন হইবে। তবে ব্যাপারটি যে ঐরূপই, তাহা একটি উদাহরণ দিয়া বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি। একটা গোল রিং ঘরের মধ্যে ঝুলাইয়া লও। এই রিংটির প্রতি তোমরা কয়েকজন মিলিয়া বিভিন্ন দিক হইতে দৃষ্টিপাত কর। মনে কর, রিংটি উত্তর-দক্ষিণ হইয়া ঝুলিতেছে। তোমাদের মধ্যে যাহারা পূর্ব্বপশ্চিম দিক হইতে উহাকে দেখিতেছে, সে উহাকে পূর্ণ গোলাকারই দেখিবে। আবার যে উত্তর দক্ষিণ দিক্ হইতে দেখিতেছে সে আর রিং দেখিতে পাইবে না—তাহার বদলে একটি রেখা মাত্র দেখিবে। মাঝামাঝি স্থানে যাহারা আছে, সে উহাকে চেপ্টা হইয়া যাইতে দেখিবে। তুমি যদি স্থান পরিবর্ত্তন করিতে থাক, তবে তোমার দৃষ্ট রিংটিও তাহার আকার পরিবর্ত্তিত করিতে থাকে। তোমার দৃশ্য বস্তু যদি একই হয় এবং তাহা যদি একেবারে বলের মত না হয় তবে তোমার স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে তাহার দৃশ্য এবং আকারও বদলাইতে থাকিবে। তুমি ইহার পরীক্ষা যেভাবে যখন ইচ্ছা করিয়া দেখিয়া ইহার সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পার। এইবার যখন ইন্দ্রধনুতে এই তত্ত্বটি আরোপ করিতে যাই, তখন দেখি তাহা ঠিক্ হয় না। পূর্ব্বে বলিয়াছি, ইন্দ্রধনু সব দিক হইতে একই রূপ আকারে দৃশ্যমান হয়। যদি সকল স্থান হইতে শুধু একটি মাত্র ধনুকেই দেখিতে হইত,

তবে রিংটির মত তাহাকে কখনও পূর্ণ গোলাকার এবং কখনও ডিম্বাকার (Oval) দেখিতে পাওয়া যাইত। অথচ ইন্দ্রধনু সকল স্থানেই একই আকারের। তাহা মাঠের মধ্যে সকল বালক যখন ইন্দ্রধনুকে একই আকারে দেখিলে, তখনই বুঝিলাম তোমরা নূতন



কিরূপে ইন্দ্রধনু তৈয়ারী হয় ?

নূতন ধনু দেখিতে পাইতেছ—একজন যাহা দেখিতেছে, অপর জনের নিকট তাহা অদৃশ্য রহিয়া যাইতেছে। ইন্দ্রধনুর মধ্যে কত বিস্ময়ই না নিজেকে গোপন করিয়া রাখিয়াছে।

তাহা হইলে তোমরা দেখিতেছ, সূর্য্যের আলো জলবিন্দুর উপর পতিত হইয়াই ইন্দ্রধনুর সৃষ্টি করে। পার্শ্বের চিত্রে এই বিষয়টি মোটামুটিভাবে বুঝান হইতেছে। মনে কর, সূর্য্য পশ্চিম আকাশে ক্ষিতিজতল রেখার ঠিক উপরে আছে, এবং পূর্ব্বাকাশে ক, খ, গ, ঘ প্রভৃতি কয়েকটি জলবিন্দু রহিয়াছে। সূর্য্যের কিরণ পৃথিবীর সমান্তরাল ভাবে আসিয়া (চিত্রের ডানদিক হইতে) বিন্দুগুলির উপর (obliquely) পড়িতেছে। ইহার ফলে আলোক রশ্মি ক বিন্দুর ভিতরে প্রবেশ করিয়া একবার প্রতিফলিত হইয়া বাহির হইতেছে। কিন্তু বাহির হইবার সময় ইহা লাল হইতে বেগুনে পর্য্যন্ত সাত রঙে ভাগ হইয়া পড়িতেছে। দ্বিতীয় বিন্দু খ হইতেও ঐরূপ আর একটি বর্ণচ্ছত্র তৈয়ারী হইয়াছে। উভয় ক্ষেত্রেই বর্ণচ্ছত্রের লাল রঙ নীচের দিকে ও বেগুনে রঙ উপরের দিকে হইবে। ইহার ফলে ক বিন্দু হইতে বেগুনে রঙ ও খ বিন্দু হইতে লাল রঙ তোমার চোখে আসিয়া পড়িবে। অবশিষ্ট পাঁচটি রঙ ক ও খ এর মধ্যস্থ জলবিন্দুগুলি হইতে তোমার চোখে আসিবে। এইরূপে সাতরঙা ইন্দ্রধনু তুমি দেখিতে পাইবে। একটি বিষয় লক্ষ্য করিও। একই বিন্দু হইতে সাতটি রঙ তোমার চোখে আসিতে পারে না। আবার গ, ঘ বিন্দু দুইটিতে আলোক-রশ্মির পথ লক্ষ্য কর। দেখিবে, ইহার প্রত্যেকটি বিন্দু হইতে আলোক-রশ্মি দুইবার প্রতিফলিত হইয়া বাহির হইতেছে। এক্ষেত্রে যে ইন্দ্রধনু তৈয়ার হইতেছে, তাহা প্রথম ধনু হইতে ভিন্ন প্রকারের। ইহার বাহিরের দিকে বেগুনে রঙ ও ভিতরের দিকে লাল রঙ দেখা যাইবে। প্রথম ধনুটিকে Primary ও দ্বিতীয়টিকে



Secondary ইন্দ্রধনু বলা হয়। অনেক সময় তোমরা উজ্জ্বল ইন্দ্রধনুর পাশে একটি অস্পষ্ট ইন্দ্রধনু দেখিয়া থাকিবে। এইটিই Secondary ইন্দ্রধনু। সাধারণতঃ ইহার উজ্জ্বলতা এত কম হয় যে, ইহা মোটে দেখা যায় না।

কিরূপে ইন্দ্রধনু তৈয়ারী হয়, পূর্ব্বপৃষ্ঠার চিত্রে তোমাদিগকে তাহা দেখাইয়াছি। এখন ইহার সম্বন্ধে কয়েকটি মজার কথা বলিব। বহুকাল হইতে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বাহ্ণ ও অপরাহ্ণ ব্যতীত ইন্দ্রধনু দেখা যায় না। আরও মজার কথা, ইন্দ্রধনু সর্ব্বদাই গোলাকার হইয়া থাকে। কেহ কখনও ত্রিকোণাকার, বা ডিম্বাকৃতি ইন্দ্রধনু দেখিয়াছ কি? তোমরা বলিবে, 'না'। আবার সম্পূর্ণ বৃত্তাকার ইন্দ্রধনুও কেহ কখন দেখে নাই, সবচেয়ে বড় অর্দ্ধবৃত্তাকার ইন্দ্রধনু দেখা গিয়াছে। কিন্তু যদি তোমরা বেলুনে বা এরোপ্লেনে উপরে উঠ, তাহা হইলে অনেক বড় ইন্দ্রধনু দেখিতে পাইবে। তোমরা বলিতে পার এই সব অদ্ভুত ব্যাপারের কারণ কি?

আলোকবিজ্ঞানের সাধারণ নিয়মানুসারে প্রমাণ করা যায় যে, যদি একটি আলোকরশ্মি জলবিন্দুর ভিতরে গিয়া একবার প্রতিফলিত হইয়া এরূপ ভাবে বাহির হইয়া আসে যে incident ও refracted আলোর মধ্যে ৪৩° কোণ থাকে, তবে এই রশ্মিটি আমাদের চোখে উজ্জ্বল দেখাইবে। ইহার কম অথবা বেশী কোণে যে সব রশ্মি আসিবে, তাহাদের উজ্জ্বলতা এত কম যে, তাহা আমরা দেখিতেই পাইব না। এই সিদ্ধান্ত হইতে জ্যামিতির সাহায্যে প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, সূর্য্য পশ্চিম আকাশে যে স্থানে আছে, সেখান হইতে দর্শকের চোখের ভিতর দিয়া যদি পূর্ব্বাকাশ পর্য্যন্ত একটি রেখা টানি, তাহা হইলে এই রেখা যে বিন্দুতে পূর্ব্বাকাশে মিলিত হয়, সেই বিন্দু রেখা হইতে ৪৩° উর্দ্ধে পর্য্যন্ত অবস্থিত জলকণাগুলি ইন্দ্রধনু তৈয়ারী করিবে। ইহার অধিক উচুতে যে সব জলকণা আছে, তাহারা কোন কাজে লাগিবে না। অতএব পূর্ব্বাকাশের এই বিন্দুটিকে কেন্দ্র করিয়া ৪৩° ডিগ্রী ব্যাসার্দ্ধ লইয়া যদি একটি বৃত্ত টানি, ইন্দ্রধনু-সৃষ্টিকারী জলকণাগুলি এই বৃত্তের উপরে বা সামান্য নীচে থাকিবে। কাজে কাজেই ইন্দ্রধনুটি বৃত্তাকার হইবে ও উপরিউক্ত বিন্দুটি হইবে ইহার কেন্দ্র। ইহা ছাড়া ইন্দ্রধনু বৃত্তটির ব্যাসার্দ্ধ মোটামুটি সর্ব্বদা ৪৩° ডিগ্রী হবে, ইহার কম বা বেশী হইতে পারে না। মনে কর, সূর্য্য পশ্চিম আকাশের ক্ষিতিজরেখার ঠিক উপরে আছে; তাহা হইলে ইন্দ্রধনু বৃত্তের কেন্দ্রও ঠিক পূর্ব্বাকাশের ক্ষিতিজরেখার উপরে থাকিবে। ইহার ফলে ইন্দ্রধনু অর্দ্ধবৃত্তাকারে আমাদের চোখে পড়িবে। কিন্তু সূর্য্য যদি ক্ষিতিজরেখার অনেক উপরে থাকে, তবে ধনুর কেন্দ্রও ঐ রেখার নীচে থাকিবে এবং ইন্দ্রধনুর অর্দ্ধবৃত্ত হইতেও কম অংশ আমাদের চোখে পড়িবে। এইরূপে সূর্য্য যদি আকাশে ডিগ্রীর বেশী উপরে থাকে, তখন আমরা মোটেই ইন্দ্রধনু দেখিতে পাইব না। কাজেই, এখন তোমরা বুঝিতে পারিতেছ, সকালে এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভিন্ন ইন্দ্রধনু দেখা সম্ভবপর নহে।

কিন্তু যদি আমরা বেলুনে করিয়া শূন্যে উঠি, তবে ধনুর কেন্দ্র পূর্ব্ব হইতে অনেকটা উন্নত হইবে, তজ্জন্য সূর্য্য পৃথিবীতল হইতে অনেক উঁচুতে থাকিলেও আমরা ইন্দ্রধনু বৃত্তের বহুদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাইব। প্রকৃতপক্ষে বেলুনে করিয়া যদি আমরা সূর্য্য হইতে ৪৩° ডিগ্রী উর্দ্ধে উঠিতে পারি, তবে সম্পূর্ণ ইন্দ্রধনু বৃত্তই আমাদের নয়নগোচর হইবে। অনেক এরোপ্লেন ভ্রমণকারী সত্যই ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

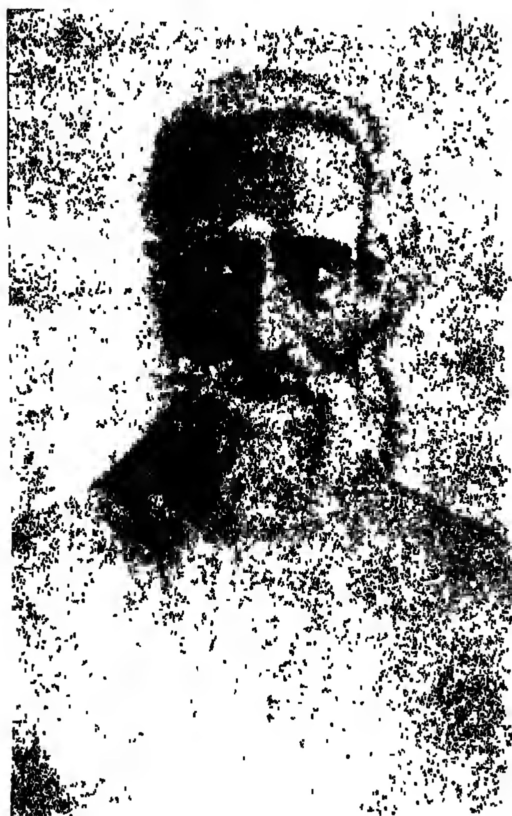
সমুদ্রে যখন ইন্দ্রধনু প্রকাশ পায় তখন বিস্তৃত জলভাগ থাকার জন্য ইহার মধ্যে নানাপ্রকার বৈচিত্র্য পাওয়া যায়। জলের ভিতর প্রতিবিম্বিত হইয়া এবং আরও অন্য কারণে ইহার মধ্যে বিস্ময়কর অবস্থা এত বেশী হয় যে, জলভাগের ধনু তাহার কাছে অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়।



দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

ভারতবর্ষ

ভারতবর্ষ (মিলে সবে ভারত-সন্তান) এই সঙ্গীতটি স্বর্গীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের লিখিত। ইহার স্বরলিপি করিয়াছেন শ্রীইন্দিরা দেবী বি, এ। কলম্বিয়া, হল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড মেক্সিকো, রুমানিয়া ও সুইডেন-এর জাতীয় সঙ্গীত শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় বি,এ, কবিশেখর কর্ত্তৃক ও তুরস্ক এর জাতীয় সঙ্গীত শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত বি, এ কর্ত্তৃক অনূদিত]



দ্রনাথ ঠাকুর

"মিলে সবে ভারত সন্তান"

খাম্বাজ—তাল ফেরতা

১

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?
কোন অদ্রি অভ্রভেদী হিমাদ্রি সমান ?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শত খনি কত মণিরত্নের নিধান ॥
ভারতের জয়।

ধ্রু ॥ জয় ভারতের জয়! হোক্ ভারতের জয়

জয় ভারতের জয়!
জয় জয়! জয় জয়!
গাও ভারতের জয়!

রূপবতী সাধ্বী সতী ভারতললনা
কোথা দিবে তাদের তুলনা ?
শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা,
দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা ॥
ভারতের জয় ।
ধ্রু ॥ জয় ভারতের জয় ! (ইত্যাদি)

বশিষ্ঠ গৌতম অত্রি মহামুনিগণ,
বিশ্বামিত্র ভৃগু তপোধন,
বাল্মীকি বেদব্যাস, ভবভূতি কালিদাস,
কবিকুল ভারত-ভূষণ ॥
ভারতের জয় ।
ধ্রু ॥ জয় ভারতের জয় ! (ইত্যাদি)

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ ?
পৃথ্বীরাজ-আদি বীরগণ ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল-ধূমকেতু,
আর্ত্তবন্ধু দুষ্টের দমন ॥
ভারতের জয় ।
ধ্রু ॥ জয় ভারতের জয় ! (ইত্যাদি)

বারযোনি এই ভূমি বীরের জননী—
অধীনতা আনিল রজনী ।
সুগভীর সে তিমির ব্যাপিয়া কি রবে চির,
দেখা দিবে দীপ্ত দিনমণি !
ভারতের জয় ।
ধ্রু ॥ জয় ভারতের জয় ! (ইত্যাদি)

কেন ডর ভীরু ! কর সাহস আশ্রয় ;
যতোধর্ম্মস্ততোজয় ।
ছিন্নভিন্ন হীনবল ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল হইবে নিশ্চয় ॥
ভারতের জয় ।
ধ্রু ॥ জয় ভারতের জয় ! (ইত্যাদি)

স্বরলিপি

II { ধনা-া ধাঃ মঃ | গমপা-মগরা-গা-া | মমা পা-ধপা
মি ০ লে স রে ০ ০ ০ ভার তে ০

| পা-া-া-া II { মা মা গা-া | -াঃ গঃ গমপা -মা |

| গমরা -গা- াঃ- রঃ | -সনা -সা-া I সা মা-গা মা | র্সা-ধণা-পনণা র্সা
প্রা ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ গা ও ০ ভা র ০ ০ ০

| না র্সা-া-া | না-া র্সাঃ- ণধঃ I ধণর্সা -ণর্সণা -ধাঃ মঃ | গমপা-
তে র ০ ০ য ০ শো ০ গা ০ ন স রে

-মগরা -গা -া | মমা পা -ধপা মা | গা-া-া- II
০ ০ ০ ভার ত ০ স দা ০ ০ ন

সা -া সা | গা -া গা | মা -া মা | পা া-পা I ধণা -া ধা |
ভা ০ র ত ০ ভূ মি ০ র তু ০ ল্য আ ০ ছে

পা -মা গা | মা -া -া | -া -া-া I র্নর্সা -া র্সা | র্সা -ণা ধা |
কো ০ ন্ স্থা ০ ০ ০ ০ ন্ কো ০ ন্ অ ০ দ্রি

ণা -া ণা | ণা ধা পা I ধা -া পা | মা -া গা | মা-া-া | -া-া-া I
অ ০ ভ্র ভে ০ দী হি ০ মা দ্রি ০ স মা ০ ০ ০ ০ ন্

মা -া মা | ধা -া ণা | র্সা-া ণা | র্সা-া র্সা I র্গা -া র্গা | র্রর্গা -মা র্গা |
ফ ০ ল ব ০ তী ব ০ সু ম ০ তী স্রো ০ ত স্ব ০ তী

র্র-া র্সা | ণা -া ধা I গমা-া মা | পা -া ধা | পা -া মা | গা -া গা I
পু ০ ণ্য ব ০ তী শ ০ ত খ ০ নি ক ০ ত ম ০ ণি

সা -া সা | গা -া গা | মা -া া | -া -া -া I সর্গা -া র্গা | র্গা -া র্গা—
র ০ ত্নে র ০ নি ধা ০ ০ ০ ০ ন্ শ ০ ত থ ০ নি

র্গা - র্মা র্গা | র্সা -া র্সা I ধা-ণধা পা | মা -া গা | মা -া -া | -া -া -া |
ক ০ ত ম ০ ণি র ০ ত্নে র ০ নি ধা ০ ০ ০ ০ ন্

॥ধ্রু॥ মা-া-া | পা া -া | মা -া-া | গা -রা -গা I গমা -া -া | -া -া -া | -া -া -া |
ভা ০ ০ র ০ ০ ০ ০ ০ ব ০ ০ জয় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

সা -া -া I সমা -া মা | মা -া মা | মা-া-া | মা-া-া I মপা -া পা | পা া পা |
হোক্ ০ ০ ভা ০ র তে ০ র জয় ০ ০ গাও ০ ০ ভা ০ র তে ০ র

পা -া -া | পা -া -া I পধা -া ধা | ধা -া ধা | ধা -া -া | -া -া না I না -া -া |
জয় ০ ০ জয় ০ ভা ব জয় জয় জয়

| না - ধনর্সা -া | সা -া -া | র্সা-া -া I ধা -া -া | পা -া-া | মা -া -া | মগা -রা-গা I
জয় ০ ০ জয়্ ০ ০ গাও ০ ০ ভা ০ ০ র

গমা -া -া | -া -া -া | -া -া -া | -া -া -া ||
জয় ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I মা মা মা ণা | -ধপধা -া না না | র্সা -নর্সর্রা-র্সা না | র্সা -া -া -া I
(১) রূ প ব তী ০ ০ ০ সা ধ্বী ০ ০ স তী ০ ০ ০
(২) ব শি ষ্ঠ ০ ০ ০ গৌত ম ০ ০ অ ত্রি ০ ০ ০
(৩) ভী ষ্ম দ্রো ০ ০ ০ ণ ভী মা ০ ০ র্জু ন ০ ০ ০
(৪) বী র যো ০ ০ ০ নি এ ই ০ ০ ভূ মি ০ ০ ০

I গা মা পা ধা | ধা ণা -া -া | -ধণর্সা -ণর্সণা -া -া | ধা পা-ধপা মা I
(১) ভা র ত ল ল না ০ ০ ০ ০ ০ ০ কো থা ০ দি
(২) ম হা ম নি গ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্ বি শ্বা ০ মি
(৩) না হি কি স্ম র ০ ০ ০ ০ ০ ০ ণ্ পৃ থী ০ রা
(৪) বী রে ন্দ্র জ ন নী ০ ০ ০ ০ ০ ০ অ ধী ০ ন

I মা -া -গরা -গা | মা মা পা -ধপা | মা পা পা -া I(-গমা -পধা -ণর্সা -ণা)I
(১) বে ○ ○ ○ তা দে র ○ তু ল না ○ ○ ○ ○ ○
(২) ত্র ○ ○ ○ ভৃ গু ত ○ পো ধ ○ ন্ ○ ○ ○ ○
(৩) জ্ ○ ○ ○ আ দি বী ○ র গ ○ ণ্ ○ ○ ○ ○
(৪) তা ○ ○ ○ আ নি ল ○ র জ নী ○ ○ ○ ○ ○

I { মা মা ণা -ধপা | -ধা -া না না | র্সা -নর্সরা -র্সা না | র্স -া -া না I
(১) শ ম্মি ষ্ঠা ○ ○ ○ সা বি ত্রী ○ ○ সী তা ○ ○ দ
(২) বা ল্মী কি ○ ○ ○ ○ বে দ ○ ব্যা ○ ○ স্ ভ
(৩) ভা র তে ○ ○ ○ র ছি ল ○ ○ সে তু ○ রি
(৪) সু গ ন্ধী ○ ○ ○ র সে তি ○ ○ মি র ○ ○ বা

I র্রা র্সা র্রা -া | -র্সা -না -া না | র্সনা -র্রর্সা -ণর্সা ণা | ধা -া -া ণধা } I
(১) ম য় ন্তী ○ ○ ○ ○ প তি ○ ○ ব তা ○ ○ ○
(২) ব ভূ তি ○ ○ ○ ○ কা লি ○ ○ দা ○ ○ ○ স্
(৩) পু দ ল ○ ○ ○ ○ ধূ ম ○ ○ কে তু ○ ○ ○
(৪) পি য়া কি ○ ○ ○ ○ র বে ○ ○ চি র ○ ○ ○

I পা র্সা না র্সা | -া র্সা না র্সা | র্সা র্সা নর্সর্রা -র্সর্রর্সা | -ণর্সণা -ধা -া -পমা I
(১) অ তু ল না ○ ভা র ত ল ল না ○ ○ ○ ○ ○
(২) ক বি কু ল ○ ভা র ত ভূ ষ ○ ○ ○ ○ ○ ণ্
(৩) আ র্ত্ত ব ন্ধু ○ দু ষ্টে র দ ম ○ ○ ○ ○ ○ ন্
(৪) দে খা দি বে ○ দী প্ত দি ন ম ণি ○ ○ ○ ○ ○

ধ্রু ॥ ভারতের জয়, পরে জয় ভারতের জয় ইত্যাদি পূর্ব্ববৎ।

I নর্সা -া ণা ধা | পা মা র্সা -া | ণা ধা পা মা | গা রগমা মা -া I
কে ○ ন ড র ভী রু ○ ক র সা হ স আ শ্র য়

I মা -মা -া -া | পা -া পা -া | ধা -া না ধনর্সা | র্সা -া -া -া I
য তো ○ ○ ধ ○ র্ম্ম ○ স্ত ○ তো ○ জয় ○ ○ ○

I { মা মা সণা -ধপা | -ধা -া না না | র্সা -নর্সরা -র্সা না | র্সা -া -া -া I
ছি ন্ন ভি ○ ○ ○ ন্ন হী ন ○ ○ ব ল ○ ○ ○

[-া]
I না র্রা -া র্সা | র্রাঃ -র্সঃ -না না | র্সনা -র্রর্সা ণর্সা ণা | ধা -া -া পমা I }
ঐ ক্যো ○ তে পা ○ ○ ই বে ○ ○ ব ল ○ ○ ○

I র্ধণা ধা পা ধপা | -মা মা -গা মা | র্মগা -ধণা -পধা -ণর্সা | না র্সা -া -া I
মা য়ে র ○ ○ মু ○ খ উ ○ ○ ○ জ্জ ল ○ ○

I র্গা -া র্গা -া | র্মা -া র্পা -া | র্গা া -া -া | -া -া -া -া I ভারতের জয় ইত্যাদি।
হ ○ ই ○ বে ○ নি ○ শ্চয় ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

কলম্বিয়া

জয়তু কলম্বিয়া
আনন্দময় লোক,
স্বর্গীয় তেজে সঞ্জাত তব
বীরেরা ধন্য হোক্।



মুক্তির লাগি ঢেলেছে তাহারা
বুকের রক্তধারা,
রণঝঞ্ঝায় হইয়াছে তারা
উদ্যমে মাতোয়ারা,
ঝঞ্ঝা থেমেছে শান্তি নেমেছে
তব শৌর্য্যের বলে,
শোণিত মূল্যে তারা যে শান্তি
কিনিয়াছে কুতূহলে।
আনন্দময় ধাম,
চিরগৌরব হোক তাই যার
শোণিতে দিয়েছ দাম।
রহ কৃতজ্ঞ, লভিয়াছ তুমি
স্বাধীনতা বৈভব,
গগন ভেদিয়া তাহার বেদিকা
প্রচারিছে গৌরব।

কোরাস ঃ—

প্রাণে প্রাণে মিলি সবে এস বীর-গৌরবে,
দাঁড়াও ঘিরিয়া সেই বেদিকারে,
পরম ভ্রাতৃভাবে,
অভয় শান্তি লাভে।

অমর স্বদেশ-ভক্তেরা জাগ
আজিকে পুনর্ব্বার,
রক্ষ' স্বদেশ-গৌরব-ধারা
রাখ নিজ অধিকার।
শোণিত-ধারায় শ্রমজল-পাতে
অজ্জিত মহাধন,
যে শুচি দেউলে করিছে বিরাজ
সে পুণ্য নিকেতন,
কোন বর্ব্বর অরাতি আসিয়া
কলুষ-মলিন করে
দেখো দেখো যেন পরশিয়া তার
শুচিতা কভু না হরে।
উজলিব মোরা শান্তির ন্যায়-
সত্যের মহিমায়,
পৌরুষময় বিশ্বাস রাখি
বিশ্বপিতার পায়।
ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হইবে
আপনার গৌরবে,
দেশবৈরীর কৌশল-জাল
সকলি ব্যর্থ হবে।

কোরাসঃ—

প্রাণে প্রাণে মিলি সবে এস বীর-গৌরবে,
দাঁড়াও ঘিরিয়া স্বাধীনতা ধনে
পরম ভ্রাতৃভাবে,
অভয় শান্তি লাভে।

চেয়ে দেখ বীর নায়ক চলেছে
স্বদেশ-সেবার তরে,
তোমাদেরি পরিচালনার লাগি
আবার কৃপাণ ধরে'।

গিরিশৃঙ্গের মত
কত না ঝঞ্ঝা কত না আঘাত
করিয়াছে পরাহত।

সুদৃঢ়চিত্ত সত্যনিষ্ঠ
ধর্ম্ম আয়ুধ ধর,
ভগবান্ আর তোমাদের পরে
করিল সে নির্ভর।

কলম্বিয়ার ভরসা যখন
ভাসিল অগাধ নীরে,
চারিদিক হতে দুর্দ্দিনে যবে
আঁধার আসিল ঘিরে,
অটলচিত্ত তার
'মৃত্যু কিংবা স্বাধীনতা'-পণে
ধরিল সে তরবার।

কোরাস ঃ—
প্রাণে প্রাণে মিলি সবে এস বীর-গৌরবে
দাঁড়াও ঘিরিয়া স্বাধীনতা ধনে
পরম ভ্রাতৃভাবে ;
অভয় শান্তি লাভে।

হল্যাণ্ড

কে আছ ওলন্দাজ !
মোদের সঙ্গে গৌরব-গানে
যোগ দাও সবে আজ।
সবল অবাধ নিষ্কলঙ্ক
ডাচের শোণিত-ধারা
কাদের শিরায় হয়নিক আজো হারা
এস এস আজ তারা।

মোদের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলাও
গাহ গৌরব-গীতি,
দেশের জন্য রাজার জন্য
উথলি উঠুক প্রীতি,
সেই গীতি গাহ সবে
যে গীতি শুনিয়া সকল হৃদয়
মেতে উঠে তাণ্ডবে।

দেশ-জননীর সন্তান মোরা—
সকলেই মোরা ভাই,
প্রাচীন সে গীতি গাই,
দেশেরে ভুলেছে রাজারে ভুলেছে যেবা,
দূর হোক তারা, দেশ-মঙ্গলে
তাহারে পূজিবে কেবা ?
দেশগুণ-গানে নৃপগুণ-গানে
মাতে না যাহার প্রাণ,

মানবহৃদয় তাহার মাঝারে
পায়নি কখনো স্থান,
তাহার সঙ্গে আমাদের কোনো
রহিবে না পরিচয়,
মানুষ তাহারা নয়।

মোদের পিতৃগণে
একদা দিলে যে ভূমি,
সে প্রিয় প্রাচীন ভূমিরে হে প্রভু
বাঁচাও বাঁচাও তুমি।

শৈশবকালে দোলায় দুলেছি
যে ভূমির তরু-ছায়।
যে ভূমির তলে লভিব সমাধি,
বাঁচাও হে প্রভু তায়।

দূর কর সব লাজ—
মৃত্যু-দ্বারের সমীপে দাঁড়ায়ে
তোমারে ডাকি হে আজ।

যাচি তব পরসাদ
দেশের জন্য রাজার জন্য
অভয় আশীর্ব্বাদ।
উৎসব মাঝে উচ্চকণ্ঠে
আমাদের নিবেদন,
শুন শুন ভগবন্ !
আমাদের রাজা রাজবংশেরে
পরাণের ধন জানি,
তাঁহাদের শিরে বিরাজ করুক
তোমার অভয় পাণি।
সারাটি জীবন দেশ-জননীর
গৌরব-গীতি গাই,
শিশুকাল হতে মৃত্যু অবধি
গাহি মোরা শুধু তাই।
ভুলিনাক যেন কভু,
মোদের দেশের মোদের রাজার
গৌরব রাখ প্রভু।

ফিনল্যাণ্ড



মোদের স্বদেশ, মোদের স্বদেশ,
মোদের পিতৃভূমি,
গৌরব-ধাম তোমার এ নাম,
ধন্য ধন্য তুমি।

হউক যতই উচ্চ বিরাট্
বিশাল মহিমময়,
কোনো মহীধর এ মহীমাঝারে
তোমার তুল্য নয়।

হউক যতই মোহন শ্যামল
সরস শস্যময়,
কোনো গিরিমূল কোনো উপকূল
তোমার তুল্য নয়।

মোদের পিতৃভূমি !
এই পৃথিবীর উত্তর দিক্
ধন্য করেছ তুমি।

মেক্সিকো



হে দেশ আমার, অলিভ পাতার মুকুট তোমার শিরে,
সরস শ্যামল মাধবী-কান্তি স্ফুরিত তোমারে ঘিরে।
তোমার গগন মাঝে
মহাশান্তির বাণী অঙ্কিত অবাধ ভাষায় বাজে।
শান্তির গান গাহ—
তুমি ত চাহ না রণ-বাদন, তুমি যে শান্তি চাহ।
তবে যদি কোনো বিদেশী আরাতি মত্ত অহমিকা ভরে
তোমার বক্ষে বিহরি তোমার শান্তিভঙ্গ করে,
নাহি তার নিস্তার,
সিক্ত করিবে তব পদধূলি তাহার শোণিত-ধার।
এই কথা মনে রেখ দেশমাতা, জীবন সঁপিবে পায়,
প্রতি সন্তান তব সৈনিক তুমি ডাক যদি তায়।

কোরাস :—

রণদেবতার হুঙ্কার শুনি মিল সবে একবার,
সাজাও অশ্ব বাজাও তূর্য খোল খোল তলোয়ার,
কেন্দ্র হইতে ধরা হোক কম্পিত হোক
কামানের গুরু গর্জনে হোক বিদীর্ণ ব্যোম লোক।



রুমানিয়া

শান্তিতে র'ন আমাদের রাজা দীর্ঘকাল,
বিক্রম তাঁর দিন দিন আরো হোক বিশাল।
বহুকাল যেন তাঁহার শাসন-ছায়াটি পাই,
মিলিত কণ্ঠে এই নিবেদন আমরা গাই।

মহান নৃপতি মহিমোজ্জ্বল তাঁহার দেশ
যাচি নিতি তাঁর জয়-গৌরব হোক অশেষ।
এই পূত ভূমি মাগে তব পায় বিশ্বনাথ,
রাখ তাঁর শিরে আশ্বাসময় অভয় হাত।

কিবা শান্তিতে কিবা সংগ্রাম-ঝঞ্ঝা মাঝে,
মোদের রাজার বিজয়তূর্য্য যেন গো বাজে
রুমানিয়া রাজমুকুট তোমার পদাশ্রিত,
চিরদিন তার রক্ষক হয়ো বিশ্বপিতঃ!

সুইডেন



মোদের জাতীয় হৃদয়াবেগের
আকুতি রাজার প্রতি,
দেশভক্তিতে সিক্ত কণ্ঠে উদ্গীত হোক আজ।
বিধির কৃপায় এ দেশ জননী
হউক ভাগ্যবতী,
বিধির আশীষে ধন্য হউক আমাদের মহারাজ।

সন্তোষময় প্রফুল্ল প্রাণ
আছি মোরা চিরদিন,
জীবন মোদের মীন সম ডুবে সুখের সাগর-নীরে,
উচ্চকণ্ঠে গাহ রবে আজ
হরষে কুণ্ঠাহীন
বিধির আশীষ বর্ষিত হোক রাজা ও দেশের শিরে।

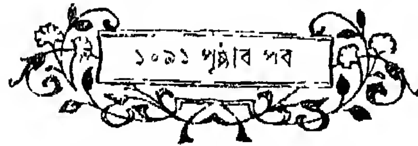
তুরস্ক



শক্তি মোদের নিয়োজিত প্রিয় জন্মভূমির করিতে কাজ ;
সন্তান শত সঁপিয়াছে প্রাণ রচিতে দুর্গ দেশের মাঝ ;
তুর্কীর মত বাঁচা, নয় মরা—রক্ত-বসনে করেছি সাজ !
একতান
কামনা পূরণ হয় করি' রণ
স্বদেশের তরে ত্যজিয়া প্রাণ,
তুর্কীদেশের গৌরবে করি
তুর্কী আমরা জীবন দান !
এখনো মোদের পতাকায় আঁকা মুক্ত কৃপাণ রক্তময়,
জুড়িয়া বাহুর শৌর্য্য অভয়, নাহি হেথা কভু মৃত্যুভয়।
সিংহের শিশু চৌদিকে অই দৃষ্টি হানিছে ?—সে কিছু নয় !
একতান
কামনা পূরণ হয় করি' রণ,
স্বদেশের তরে ত্যজিয়া প্রাণ,
তুর্কীদেশের গৌরবে করি
তুর্কী আমরা জীবন দান !



হিব্রুজাতি ও ওল্ড টেষ্টামেণ্ট



ভগবানের দয়ায় ইস্রায়েল-সন্তানেরা দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে মুক্তি লাভ করিল। কিন্তু তাই বলিয়া এত শীঘ্র তাহাদের দুঃখকষ্ট শেষ হইল না। জনশূন্য মরুভূমির মধ্য দিয়া গমনকালে তাহাদের খাদ্য ও পানীয় জলের অনটন উপস্থিত হইল। এই কষ্ট তাহারা সহ্য করিতে না পারিয়া মোসেস্‌কে তিরস্কার করিতে আরম্ভ করিল। তাহার প্ররোচনাতেই ত তাহারা মিশর পরিত্যাগ করিয়া এখানে এত দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতেছে, ইহা অপেক্ষা মিশরে দাসত্ব শতগুণে শ্রেয়ঃ ছিল। সেখানে ত আর আহার ও পানীয়ের কোন কষ্টই ছিল না। কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদে অভাবনীয়রূপে তাহাদের অন্ন ও জলের কষ্ট নিবারিত হইল।

এইবার আর এক বিপদ উপস্থিত হইল। আমালেক্ (Amalek) নামে একদল লোক তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া বিশেষ ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। তখন মোসেস যোশুয়া (Joshua) নামক একজন যোদ্ধাকে বলিলেন, "কাল আমি পাহাড়ের উপর দাঁড়াইয়া ঈশ্বর-দত্ত দণ্ডটি উত্তোলন করিয়া ধরিব তুমি আমালেক্‌দের আক্রমণ করিয়া পরাভূত করিবে।" তাঁহার নির্দেশমত পরদিন যোশুয়া আমালেক্‌দের আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল।

ইহার পর মোসেসের শ্বশুর জেথ্রো তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। হিব্রুদের পরিত্রাণে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ভগবানকে ধন্যবাদ দিলেন। পরদিন মোসেস্ যখন একা হিব্রুদের বাদবিবাদের নিষ্পত্তি করিতে লাগিলেন, তখন তাহা জেথ্রোর মনঃপূত হইল না। তিনি জামাতাকে বলিলেন, "ইহা ত ঠিক হইতেছে না। এইরূপে একা বিচার করিলে তুমি শীঘ্রই অতি পরিশ্রমে মৃতপ্রায় হইবে, আমার পরামর্শ গ্রহণ কর। তুমি হিব্রুদের আইনকানুন শিক্ষা দাও। তাহাদিগকে সৎপথে থাকিয়া কর্তব্য করিতে উপদেশ দাও। আর তাহাদের মধ্য হইতে সৎলোক নির্বাচন করিয়া তাহাদিগকে সহস্রপতি, শতপতি, পঞ্চদশপতি, দশ-পতিরূপে নিযুক্ত কর। তাহারাই সর্বসময়ে বিচার করিবে। তবে গুরুতর বিষয়গুলি তাহারা তোমার নিকট লইয়া আসিবে।" মোসেস্ তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং তাঁহার উপদেশ মত ব্যবস্থা করিলেন।

মিশর হইতে নিষ্ক্রমণের তিন মাস পরে তাঁহারা সিনাই মরুপ্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এখানে ভগবান মোসেস্‌কে বলিলেন, ইস্রেল সন্তানদের বল যে তাহারা দেখিয়াছে আমি তাহাদিগকে কি ভাবে রক্ষা করিয়াছি। তাহারা যদি আমার আদেশ পালন

করে ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে, তবে তাহাদিগকে আমি বিশেষভাবে সমাদর করিব। তাহারা স্থাপনা করিবে আমার পুরোহিতদের রাজ্য, তাহারা হইবে পবিত্র জাতি (a kingdom of priests and a holy nation)।* মোসেস্ তাহাদিগকে এই কথা জানাইলে সবাই ইহাতে সম্মত হইল। তখন ভগবান মোসেসকে বলিলেন, "আজ হইতে তৃতীয় দিবসে আমি মেঘের মধ্য দিয়া তোমার নিকটে আসিব। সমস্ত ইস্রেলসন্তানদের আজ ও কাল পবিত্রভাবে যাপন করিতে বল। পরশুদিনে তাহারা সিনাই পর্ব্বতে তোমার সঙ্গে আমার যে বাক্যালাপ হইবে তাহা শুনিতে পাইবে।" তাহারা তাহাই করিল। তৃতীয় দিবসে একখণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘ সিনাই পর্ব্বতের উপর আরোহণ করিল। ভয়ানক মেঘগর্জ্জন ও তূর্য্যধ্বনি শোনা গেল—ক্ষণে ক্ষণে বিজলী চমকাইতে লাগিল। মোসেস্ তাঁহার সমস্ত লোকজন লইয়া পর্ব্বতের পাদদেশে উপস্থিত হইলেন। যিহোবা তখন মোসেস্‌কে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে বলিলেন। মোসেস্ তাঁহার নিকটে গেলে বলিলেন, "দেখ, কেহ যেন আমাকে দেখিবার জন্য পাহাড়ের দিকে অগ্রসর না হয়। তাহা হইলে তাহাদের মৃত্যু হইবে। শুধু আরনকে (Aaron) লইয়া তুমি এখানে আইস।" মোসেস্ তাহাই করিলেন। তখন যিহোবা বলিলেন—



মোসেস্ সিনাই পর্ব্বত হইতে নামিয়া আসিলেন

"আমি তোমার ভগবান্। আমিই তোমাকে মিশর হইতে—তোমার বন্দীনাগার হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছি।

"আমা ব্যতীত কোন দেবতার পূজা করিবে না।

"কোন মূর্ত্তি গড়িবে না। স্বর্গ-মর্ত্ত্য ও সাগরস্থিত কোন কিছুরই প্রতিমূর্ত্তি করিবে না।

"তাহাদের নিকট মাথা নত করিবে না—তাহাদের সেবা করিবে না। কারণ, তোমার ভগবান্ আমি ঈর্ষাযুক্ত (for I the Lord thy God am a jealous God)। যাহারা আমাকে অবমাননা করে, আমি পিতৃপিতামহের অপরাধের জন্য তাহাদের পুত্র-পৌত্রাদি তৃতীয় চতুর্থ বংশানুক্রম পর্য্যন্ত শাস্তি দিয়া থাকি।

"আর যাহারা আমাকে ভালবাসে ও আমার আদেশ পালন করে তাহাদের সহস্রবংশানুক্রম পর্য্যন্ত করুণা প্রদর্শন করি।

"বৃথা ভগবানের নাম লইবে না (শপথ করিবে না।)

* ইহুদীরা বিশ্বাস করে যে, তাহারাই ভগবানের বিশেষ প্রিয় জাতি (chosen people), ভগবান একমাত্র তাহাদেরই—তাহারাই শুধু তাঁহার করুণা লাভ করিবে। এখনও ইহুদীরা (য়িহুদীজাতীয় লোক) অনেকে তাহা বিশ্বাস করে, তবে ভগবানের করুণা যাহারা বিশেষভাবে লাভ করে তাহারাই সর্ব্বপ্রকার নির্যাতন ও অপমান ভোগ করে। এই কথা যদি সত্য হয়, তবে ইহুদীরা যে ভগবানের বিশেষ প্রিয় জাতি, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। আবহমানকাল হইতে এই জাতি যে নির্যাতন ও অপমান ভোগ করিয়াছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহার তুলনা নাই।

কারণ যে, বৃথা ভগবানের নামে শপথ করে, সে ভগবানের চক্ষুতে অপরাধী।

"বিশ্রাম দিবসের কথা স্মরণ রাখিবে (Sabbath day)। ঐ দিবস পবিত্রভাবে যাপন করিবে।

"সপ্তাহে ছয়দিন পরিশ্রম করিয়া তোমার কাজ সমাপন করিবে।

"কিন্তু সপ্তম দিবস ভগবানের বিশ্রামের দিন। এই দিন তুমি, অথবা তোমার পুত্রকন্যা, দাসদাসী গৃহপালিত জীবজন্তু, এমন কি তোমার সহরে আগন্তুক বিদেশী পর্য্যন্ত কেহই কোন কাজ করিবে না।

"কারণ ভগবান্ ছয়দিনে স্বর্গমর্ত্য স্থাবর-জঙ্গম প্রভৃতি সমগ্র চরাচর সৃষ্টি করিয়া সপ্তম দিবসে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। সেইজন্য সেই দিবস ভগবান পবিত্র বিশ্রাম দিবস বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"পিতামাতাকে সম্মান করিবে, তাহা হইলেই দীর্ঘজীবন লাভ করিবে।

"হত্যা করিবে না।

"নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিবে।

"পরদ্রব্য অপহরণ করিবে না।

"তোমার প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না।

"প্রতিবেশীর গৃহ, স্ত্রী, দাসদাসী, গাধা, গরু কোন কিছুর প্রতি লোভ করিবে না।"

সমবেত লোকেরা বজ্রনিনাদ ও তূর্য্যধ্বনি শুনিয়া এবং ঘন ঘন বিজলীর চমক দেখিয়া ভীত সন্ত্রস্তভাবে দূরে সরিয়া গেল। তাহারা মোসেসকে বলিল, "আমরা তোমার মুখেই ভগবানের বাণী শুনিতে চাই। তাঁহার নিজের মুখের কথা শুনিতে আমাদের ভয় হয়।" মোসেস তখন তাহাদিগকে সাহস দিয়া বলিলেন, "ভয় নাই, ভগবান তোমাদের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্যই আবির্ভূত হইয়াছেন—যেন তোমরা আর পাপ না কর।"



তখন মোসেস্ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইলে তিনি বলিলেন, "তুমি ইস্রেল সন্তানদের বলিবে যে, তাহারা যেন সোনা রূপার দেবমূর্ত্তি না গড়ে। মৃত্তিকা দ্বারা বেদী নির্ম্মাণ করিয়া তাহার উপর বলি উৎসর্গ করিবে। আমি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিব।" তারপর ভগবান্ তাঁহাকে হিব্রুদের জীবন যাত্রা নির্দ্দেশের জন্য অনেক আইনকানুন শিক্ষা দিলেন।

ইহার পর ভগবান পুনরায় মোসেসকে পাহাড়ে যাইতে আদেশ করিলেন। মোসেস্ যোশুয়াকে সঙ্গে লইয়া সেখানে গেলেন। এখানে ৪০ দিন ভগবানের নিকট হইতে আইনকানুন সংক্রান্ত নানাবিধ উপদেশ প্রাপ্ত হইলেন। ভগবান্ মোসেসকে তাঁহার বাসের জন্য বস্ত্রাবাস (Tabernacle) নির্ম্মাণ করিতে শিক্ষা দেন। এই বস্ত্রাবাসের মধ্যে ভগবানের প্রতিশ্রুতির নিদর্শন স্বরূপ আর্ক (Arc of the testimony) থাকিবে। এই মন্দিরের সেবার জন্য



ইস্রেল সন্তানেরা মোসেসের [illegible]

আরন্ ও তাঁহার পুত্র নাদাব, আবিহু, এলিজার (Eleazar) ও ইথামারকে দীক্ষা দিতে বলেন।

তারপর হঠাৎ তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া মোসেসকে সেই স্থান পরিত্যাগ করিতে বলেন। কারণ, ইতিমধ্যে ইস্রেল সন্তানেরা মোসেসের অনুপস্থিতিতে আরনের দ্বারা একটি স্বর্ণের গোবৎস তৈয়ারী করিয়া তাহাকে ঈশ্বর জ্ঞানে পূজা করিয়াছে ও মহোল্লাসে উৎসব আরম্ভ করিয়াছে। মোসেস্ তাহাদের [illegible] উপস্থিত হইয়া লেভির (Levi) পুত্রদের সাহায্যে অনেক পাপীকে বিনাশ করেন ও স্বর্ণ [illegible] টি চূর্ণ-





বিচূর্ণ করিয়া ঝর্ণাতে নিক্ষেপ করেন। তারপর তিনি ভগবানের নিকট ইস্রেল সন্তানদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

ইহার পর আবার যাত্রা আরম্ভ হয়। তিন দিন পরে তাহারা একটি পার্ব্বত্যপ্রদেশে উপস্থিত হয়। এখানে তাহারা মাংস খাইবার জন্য বিশেষ উৎসুক হয়। অনেকে মিশর ত্যাগ করিয়া আসার জন্য দুঃখ করিতে আরম্ভ করে—কারণ, সেখানে তাহারা বিনা খরচে ভাল ভাল জিনিষ খাইতে পাইত। ইহাতে মোসেস্ বিশেষ ক্রুদ্ধ হইলেন। তখন ভগবান্ ইস্রেল-বৃদ্ধদের বলিলেন যে, 'আগামী কল্য ইস্রেল-সন্তানেরা অপর্য্যাপ্ত মাংস খাইতে পাইবে।" তারপর তাঁহার আদেশমত হঠাৎ প্রচণ্ডবেগে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল এবং অসংখ্য সামুদ্রিক পক্ষী উড়িয়া আসিয়া পড়িতে লাগিল। মহা উৎসাহে ইস্রেল সন্তানেরা তাহাদিগকে মারিয়া শুকাইতে আরম্ভ করিল কিন্তু এই মাংস যাহারা মুখে দিল তাহারাই মহামারীতে (প্লেগরোগে) আক্রান্ত হইয়া মারা গেল। লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু।

অবশিষ্ট লোকেরা আবার চলিতে আরম্ভ করিল। পথে উল্লেখযোগ্য কিছুই ঘটে নাই; অনেকদিন চলার পর তাহারা প্রতিশ্রুত দেশের প্রান্তে (Land of the promise) উপস্থিত হয়। কিন্তু বিনা যুদ্ধে ইহা অধিকার করা সম্ভব নহে। কারণ ক্যানন্ দেশীয় লোকেরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। কাজেই, এই দেশের আভ্যন্তরিক অবস্থা জ্ঞাত হইবার জন্য তাহারা বারোজন নেতা নির্ব্বাচন করে। তাহাদের মধ্যে যোশুয়া ও ক্যালেব দুইজন।

চল্লিশ দিন পরে তাহারা নানাবিধ সুখাদ্য ও ফল লইয়া ফিরিয়া আসে। সমবেত জনতাকে সম্বোধন করিয়া তাহারা এই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদের খুব প্রশংসা করিল। কিন্তু এই দেশ জয় তাহাদের মতে অসম্ভব। কারণ এখানকার লোকেরা খুব বীর ও তাহাদের নগরগুলি বিশেষ সুরক্ষিত। ইহা শুনিয়া হিব্রুদের মনে বিশেষ আতঙ্ক উপস্থিত হইল। ক্যালেব তাহাদিগকে সাহস দিতে চেষ্টা করিল কিন্তু অন্য চরেরা বলিল, "এই লোকদের সম্মুখে আমরা দাঁড়াইতে পারিব না। ইহারা সব অ্যান্তাকের বংশোদ্ভূত দৈত্যসন্তান। তাহাদের তুলনায় আমরা ক্ষুদ্র পতঙ্গ মাত্র।"

আর যায় কোথায়! সমস্ত জনতা চীৎকার করিতে করিতে ছত্রভঙ্গ হইল। সমস্ত রাত্রি বস্ত্রাবাসগুলিতে একটানা ক্রন্দনধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। তাহারা তাহাদের নেতাদের দোষ দিতে লাগিল। মোসেস্ তাহাদের সাহস দিতে চেষ্টা করিলেন। স্বয়ং ভগবান্ তাহাদের সহায়—কি ভয় তাহাদের? কিন্তু কে শোনে তাঁর কথা? তাহারা মিশরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে ব্যাকুল হইল। যোশুয়া ও ক্যালেব তাহাদের ঐরূপ উত্তেজনা দূর করিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু ক্ষিপ্ত জনতা তাহাদিগকে প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হইল।

সহসা ভগবানের জ্যোতিঃ প্রকাশ পাইল। তিনি ক্রুদ্ধস্বরে মোসেস্‌কে বলিলেন, "না, আর না। এই সব অবিশ্বাসীদের আমি প্লেগ দ্বারা বিনাশ করিব।" তখন মোসেস্ অনেক কাকুতিমিনতি করিতে আরম্ভ করিলেন, "প্রভো, ক্ষমা কর, এই পাপীদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন কর।"

ভগবান্ বলিলেন, "বেশ, এদের আমি ক্ষমা করিলাম। কিন্তু জানিয়া রাখ, যাহারা আমার অবাধ্য হইয়াছে, তাহারা প্রতিশ্রুত দেশ দেখিতে পাইবে না। তাহারা মরুভূমিতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করিবে। তবে তাহাদের শিশুসন্তানেরা ও ক্যালেব এবং যোশুয়া এই দেশে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইবে। আর সবাই ৪০ বৎসর কাল মরুভূমিতে ঘুরিয়া বেড়াইবে ও মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।"

ইহাতেও মূর্খদের জ্ঞান হইল না। এইবার তাহারা ঠিক করিল যে, যুদ্ধ করিয়া এই দেশ অধিকার করিবে। মোসেস্ তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিয়া বিফল হইলেন। পরদিন তাহারা যুদ্ধ করিতে গেল। ক্যানানীয়েরা ও আমালেকেরা তাহাদিগের অনেককে হত্যা করিল ও বাকী সকলকে তাড়াইয়া দিল।

* * * প্রায় চল্লিশ বৎসর ইস্রেলসন্তানেরা স্থান হইতে স্থানান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইল। একে একে বৃদ্ধেরা মরিতে লাগিল। অবশেষে তাহারা পুনরায় কাদেশে আগমন করিল। এতদিন পরে তাহাদের ভ্রমণের পালা শেষ হইয়া আসিল। কিন্তু তাহাদের দুঃখের শেষ এখনও হয় নাই। কাদেশের কূপগুলি শুষ্ক হইয়া যাওয়াতে দারুণ জলকষ্ট উপস্থিত হইল। তখন আবার তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহের চিহ্ন দেখা গেল। তাহারা নেতাদের স্কন্ধে সমস্ত দোষ আরোপ করিতে লাগিল। তখন যিহোবা মোসেসকে বলিলেন,





"মন্দির হইতে তোমার যষ্টি লইয়া যাও। সমস্ত ইস্রেল-সন্তানদের একস্থানে জড় করিয়া কাদেশের পাহাড়ের কাছে জল চাও। সে তোমাদের জল দিবে।

ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া মোসেস্ হিব্রুদের নিকট গিয়া বলিলেন, "শোন, বিদ্রোহিগণ এই পাহাড় হইতেই কি তোমাদের জন্য জল সংগ্রহ করিতে হইবে?" এই বলিয়া তিনি তাহার দণ্ডদ্বারা পাহাড়কে বার বার আঘাত করিলেন। তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে প্রচুর পরিমাণে জল বাহির হইল। হিব্রুরা প্রাণ ভরিয়া এই জল পান করিয়া পিপাসা দূর করিল।

ভগবান্ কিন্তু মোসেস্ ও আরনের ব্যবহারে বিশেষ বিরক্ত হইলেন, কারণ তাহারা তাঁহার আদেশ পালন করেন নাই। তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিলেন, 'যেহেতু আমার কথায় অবিশ্বাস করিয়া তোমরা ইস্রেল সন্তানদের কাছে আমার মহিমা প্রদর্শন কর নাই, সেই কারণে তোমরা ইহাদিগকে প্রতিশ্রুত দেশে লইয়া যাইতে পারিবে না।"

এইবার হিব্রুরা প্রতিশ্রুত দেশ অধিকার করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। মোসেস্ এডোমের (Edom) রাজার নিকট দূত পাঠাইলেন যেন তিনি তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া হিব্রুদের জর্দন (Jordon) অভিমুখে যাইতে দেন। তিনি অস্বীকার করাতে তাহারা অন্যপথে ঘুরিয়া অগ্রসর হইল। হোর পর্ব্বতে পৌছিলে আরনের মৃত্যু হয়। যিহোবার আদেশমত মোসেস্ তাঁহার পুত্র এলিজারকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করেন। ইহার পর তাহারা দক্ষিণদিকে অগ্রসর হইয়া মোয়াবের (Moab) পূর্ব্বদিকে উপস্থিত হয়। তারপর তাহারা পিজগার শিখরদেশে উপস্থিত হইল। তখন মোসেস্ হেসবোনের রাজা শিহোনের (Sihon) রাজ্যের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়া পাঠান। কিন্তু শিহোন তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। এখানকার সমস্ত সহর হিব্রুদের হস্তগত হইল। অনেকে পলাইয়া গিয়া বাসানের রাজা অগের (Og) সাহায্য প্রার্থনা করিলে তিনি তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করিয়া ভীষণভাবে পরাস্ত হন। তাঁহার সমুদয় রাজ্য হিব্রুরা অধিকার করে। এইরূপে আর্ণন হইতে হার্মন্ পর্য্যন্ত জর্দনের পূর্ব্বপার স্থিত সমগ্র ভূপ্রদেশই তাহাদের হস্তগত হয়।

অতপর ইস্রেলসন্তানেরা মোয়াব রাজের সমতল ভূমিতে প্রবেশ করে। এই রাজ্য লটের বংশধরের বলিয়া তাহারা ইহা অধিকার করিতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু মোয়াবের রাজা বালাক (Balak) তাহাদের পরাক্রম দেখিয়া রাজ্যচ্যুত হইবার আশঙ্কায় তাহাদের প্রতি শত্রুতা করিতে আরম্ভ করেন।

সে যাহা হউক, এখানে থাকাকালীন হিব্রুরা মোয়াব ও মিদিয়ানদের সংস্পর্শে আসিয়া নানারূপ ব্যভিচার আরম্ভ করে। এমন কি, তাহারা ব্যালের (Baal) পূজা করিতে শিখে। ইহাতে যিহোবা ক্রুদ্ধ হইয়া এই পৌত্তলিকদিগকে প্লেগের সাহায্যে বিনাশ করেন। তারপর তিনি মোসেস্কে বলেন যে, মিদিয়ানদের ধ্বংস করিয়া এই পাপের প্রতিশোধ লইতে হইবে। তাঁহার আদেশ মত হিব্রুরা মিদিয়ানদের সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে। তাহাদের বাড়ীঘর জ্বালাইয়া স্ত্রী-পুত্র ছাগল-ভেড়া সোনারূপা প্রভৃতি লুঠ করে। তারপর আর্ণন নদের তীর হইতে হার্মণের পাদদেশ পর্য্যন্ত সমুদয় ভূখণ্ড মোসেস্ রিউবেন, গ্যাড্ ও ম্যানাসের বংশধরদের অর্পণ করেন।

এদিকে ৪০ বৎসর নির্ব্বাসন শেষ হইয়া আসিল। মোসেস্ ইস্রেল সন্তানদের সম্বোধন করিয়া নানারূপ উপদেশ দিলেন ও তাহাদের হাতে একটি গ্রন্থ প্রদান করিলেন। এই গ্রন্থে ভগবানের আদেশগুলি ও তিনি তাহাদের জন্য কি কি করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করা হইয়াছিল।

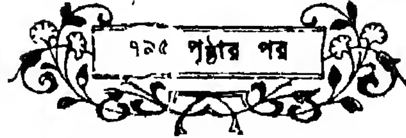
ইহার কয়েকদিন পরে ভগবান্ মোসেস্কে বলিলেন, "তোমার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে। যোশুয়াকে লইয়া আইস। তাহাকে আমার আদেশ জানাইবে।" যোশুয়া উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন সাহসে বুক বাঁধ। তুমিই ইস্রেল সন্তানদের প্রতিশ্রুতি-দেশে লইয়া যাইবে।"

তারপর ভগবানের নির্দ্দেশমত তিনি নেবো পর্ব্বতে আরোহন করিলেন। পিসগার শিখরদেশ হইতে যিহোবা তাঁহাকে প্রতিশ্রুত দেশ দেখাইয়া বলিলেন, বৎস, ঐ দেশ আমি আব্রাহাম, আইজাক ও জেকবের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছিলাম যে, এই দেশ তাহাদের সন্তানদিগকে দিব। তুমি স্বচক্ষে ইহা দেখিলে কিন্তু এখানে তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

এইখানে মোসেসের মৃত্যু হয়। ভগবান্ তাঁহাকে বেথপিওরের নিকটে সমাধিস্থ করেন। তাঁহার কবর কোথায়, আজ পর্য্যন্ত তাহা অজ্ঞাত রহিয়াছে



সমুদ্র-শৈবাল



তোমরা পুকুরে, ছোট নদীতে, খালে-বিলে দেওয়ালের গায়ে কিংবা ভিজা জমিতে নানারূপ শেওলা নিশ্চয় দেখিয়াছ।

আমরা সচরাচর পুষ্পকজাতীয় পানা বা জলের মধ্যে অবস্থিত আগাছাকে শৈবাল বলিয়া থাকি, কিন্তু শৈবাল বা শেওলা শব্দ পুষ্পক বা পর্ণাদি জাতীয় গাছ-গাছড়া বুঝাইতে ব্যবহার করা উচিত নয়। ইহা শৈবাল; Moss বা Algæ জাতীয় উদ্ভিদ্ বুঝাইতে ব্যবহার করা উচিত। মনে হয় যে, Algæ জাতীয় গাছ-গাছড়ার জন্য শৈবাল শব্দটি ব্যবহার করিলেই সঙ্গত হয়। সাধারণতঃ শৈবালকে আমরা চারি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া থাকি। ইহাদের শ্রেণীবিভাগ রঙের উপর নির্ভর করে। সবুজ বর্ণ শেওলাকে 'সবুজ কিংবা হরিৎ শৈবাল', পিঙ্গল বর্ণ শৈবালকে 'পিঙ্গল শৈবাল', লাল বর্ণ শৈবালকে 'রক্ত শৈবাল এবং নীলাভ শৈবালকে নীল হরিৎ শৈবাল' বলিতে পারা যায়।

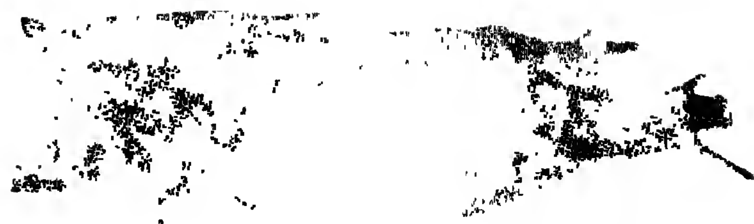
পিঙ্গল ও রক্ত শৈবাল সমুদ্রে পাওয়া যায়। কোন কোন রক্ত শৈবাল কেবল ঝরণা ও নদীর মোহানায় হয়। সবুজ শৈবাল সমুদ্রেও হয় এবং সচরাচর মিঠা জলেই পাওয়া যায়।

এখানে সামুদ্রিক শৈবালের বিষয় বলিব। ভারত-বর্ষের সর্ব্বত্রই সমুদ্রের ধারে এই সব শৈবাল দেখিতে পাওয়া যায় না। পুরী ইত্যাদি স্থানে যেখানে সমুদ্রের তটভূমি বালুকাপূর্ণ, সেখানে উহা পাওয়া যায় না এবং যদি কখনও বা উহা পাওয়া যায় তাহা হইলে অন্য জায়গা হইতে ঢেউয়ের সঙ্গে ভাসিয়া আসিয়াছে এইরূপ মনে করিতে হইবে।

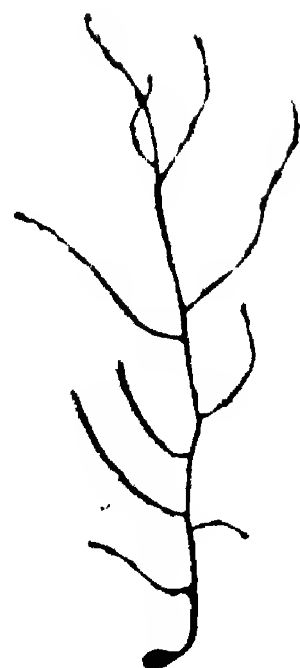
পুরীর কয়েক মাইল দূরে সমুদ্র-গর্ভে একটি দ্বীপ আছে। শুনা যায় যে, তাহার পাথরের গায়ে নানা জাতীয় সামুদ্রিক শৈবাল জন্মিয়া থাকে। করাচি, বোম্বাই, ওখা পোর্ট পামন, দ্বারকা ইত্যাদি স্থানে নানা রকমের সামুদ্রিক শৈবাল পাওয়া যায়। আমরা প্রায় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ওখা পোর্ট হইতে নানা জাতীয় সামুদ্রিক শৈবাল সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলাম।

এখানে তাহাদের কয়েকটির ছবি দিলাম। সমুদ্রে যখন ভাটা আসে তখন এই সমুদয় শৈবাল আহরণ করা সুবিধাজনক। ভাটার টানে জল নামিয়া যাওয়ায় সমুদ্রের জলের নীচের পাথরে কিংবা পাথরের গায়ে নানা রঙের শৈবাল লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে একজাতীয় ফিতার মত সবুজ শৈবাল (চিত্র নং ১) যাহাকে ইংরাজীতে Ulva বলে, বহু পরিমাণে পাওয়া যায়। আর এক রকম ছোট কোষ যুক্ত কিংবা সবুজ পালকের মত শৈবাল দেখা যায়, ইংরাজীতে তাহাকে বলে Caulerpa (চিত্র ২নং ও ৩নং)। ইহারা দেখিতে অতি মনোহর, ভাষার সাহায্যে তাহাদের সৌন্দর্য্য বুঝান যায় না।

রক্ত শৈবাল বেশীর ভাগই ঢেউয়ের সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া আসে এবং তার মধ্যে পিঙ্গল শৈবালও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। এই রক্ত শৈবালের মধ্যে একটি ঠিক Ulvaর মত কিন্তু চওড়ায় বেশী। ইহাকে



চিত্র ২নং
কলার পা (Caulerpa)



চিত্র [illegible]নং
কলার [illegible] (Caulerpa)

Rhodymenia Ciliata



রোডিমেনিয়া (Rhodymenia) বলে। পাতার মত পিঙ্গল শৈবালও অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন —'হালিসেরিস্ (Haliseris)। এই সামুদ্রিক শৈবাল লবণাক্ত জল পছন্দ করে; যদি তাহাদের মিঠাজলে আনা যায়, তাহা হইলে তাহারা আর জীবিত থাকে না। তেমনি মিঠাজলের শৈবাল যদি লবণাক্ত জলে ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহারা জীবিত থাকিবে না—লোনা জল উহারা সহ্য করিতে পারে না।

সমুদ্রের অল্প কয়েক ফিট নীচেই সবুজ শৈবাল পাওয়া যায়। পিঙ্গল শৈবাল ১৮ হইতে ৩৬ ফিট পর্য্যন্ত ও রক্ত শৈবাল ৩০ হইতে ৯০ ফিট নীচে পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। সবুজ শৈবাল লাল আলো পছন্দ করে, পিঙ্গল শৈবাল নারাঙ্গী ও হলদে আলো, এবং রক্ত শৈবাল নীল আলো পছন্দ করে। পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে যে, লাল আলো সাধারণতঃ জলের উপরি-ভাগে কয়েক ফিট নীচে পর্য্যন্ত যায়, সবুজ, নারাঙ্গী ও হলদে আলো আরো নীচে যায় এবং নীল আলো সকলের নীচে অনেক দূর পর্য্যন্ত যাইয়া থাকে। তোমরা যদি কখনও দ্বারকা যাও, তাহা হইলে সামুদ্রিক শৈবালের সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইবে।

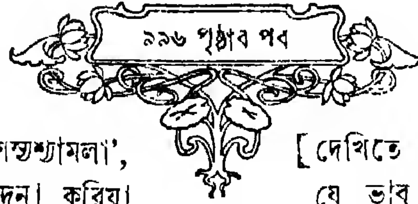
আমরা সমুদ্র দেখিয়া বিস্মিত হই। অসীম অনন্ত নীল জল, দিনরাত ঢেউয়ের কোলাহল - কোথায় তার শেষ কে জানে? আমরা সমুদ্রের অনন্ত বিস্তার হইতে বুঝিতে পারি না সমুদ্রের তলে কি আছে। পৃথিবীর উপরিভাগের তরুলতা, উদ্ভিদ্ প্রভৃতি আমরা দেখিতে পাই। যাহা দেখিতে পাই না, তাহার কল্পনাও আমরা করিতে পারি না, কিন্তু বৈজ্ঞানিকেরা কোন বিষয় লইয়াই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে ভালবাসেন না, তাই তাঁহারা পৃথিবীর উপরিভাগের তরুলতা, জীবজন্তু প্রভৃতির ইতিহাস যেমন সংগ্রহ করিতেছেন, তেমনি অতল জলের জীবজন্তু, গাছপালা, পাহাড় পর্ব্বত প্রভৃতির তথ্য অনুসন্ধান করিতেছেন। এখন আমরা বেশ সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি যে, পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ স্থলে যেমন নানাজাতীয় উদ্ভিদ দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ পুষ্করিণী, খাল, বিল, নদ-নদী ও সমুদ্রের জলের তলেও নানাজাতীয় জলজ উদ্ভিদ্ দেখা যায়।

তোমরা দেখিতে পাও, নানাজাতীয় ফুলের গাছ মাটীর উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহাতে কেমন সুন্দর ফুল ফোটে—লতাগাছ কেমন লতাইয়া চলে। তাহাতে কোন কোন 'অর্কিড' জাতীয় গাছ বিনা লাঠিতেও শূন্যে ঝুলিয়া পরগাছারূপে বাঁচে। জলজ উদ্ভিদেরাও ঠিক্ এই ভাবেই জলের নীচে শোভা পায়। আজ আমরা তোমাদের কাছে যে জাতীয় গাছের কথা বলিতেছি, তাহাদিগের নাম সমুদ্র শৈবাল। ইংরাজীতে তাহাদিগকে বলে Seaweeds। সমুদ্র শৈবাল এক অদ্ভুত জাতীয় গাছ ইহাদের না আছে পাতা, না আছে কাণ্ড, না আছে মূল, না আছে ফুল। তবুও কিন্তু এরা উদ্ভিদ্ সংজ্ঞাযুক্ত। এই জাতীয় সমুদ্র শৈবালের সংখ্যা যে কত, তাহা গণিয়া শেষ করা যায় না। সাধারণ কথায় ইহারা সমুদ্র শৈবাল বলিয়া পরিচিত হইলেও ইহাদের প্রকৃত নাম "Algæ" (শৈবাল)।

ইহাদের দেহ কোষ (Cells) দ্বারা গঠিত। এই কোষের গঠন এমনি অদ্ভুত রকমের যে, ইহাদের গঠনপ্রণালী আলোচনা করিলে বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারা যায় না। এই ক্ষুদ্র গাছটিকে তোমরা ক্ষুদ্র বলিয়া উপেক্ষা করিও না, পরস্পরে সম্মিলিত হইলে এই জলজ উদ্ভিদের আকার অতি বৃহদাকারের হইয়া থাকে।



বাঙ্গলা সাহিত্যের গোড়ার কথা


৯৯৬ পৃষ্ঠার পর

আমাদের এই বাঙ্গলা দেশ অতি আদরের দেশ। কবি ইহাকে 'সুজলা' 'সুফলা' 'শস্যশ্যামলা', 'মলয়জশীতলা' বলিয়া বন্দনা করিয়া গিয়াছেন। ইহার কথা বলিতে গিয়া কেহ বা গাহিয়াছেন, 'হেথায় পাখীর ডাকে ঘুমিয়ে পড়ি পাখীর ডাকে জেগে'। কত শিল্পীর কল্পনা এখানে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়া মন্দিরে পরিণত হইয়াছে, কত বীরের আত্মদানের কাহিনী এই দেশের ধূলির সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে কত সাধু-তপস্বীর সমাধি-স্থান ইহার গ্রামে নগরে অজ্ঞাতভাবে পড়িয়া আছে। আমরা ইতিহাস পড়িয়া এই সকল কীর্ত্তিকাহিনী, আমাদের অতীত গৌরবের কথা জানিতে পারি। ইতিহাসে অতীতের কথা লেখা থাকে। কবে কোন্ রাজা দিগ্বিজয়ে বাহির হইয়াছিলেন, কবে তাঁহার রাজ্যে দুর্ভিক্ষ বা মহামারী দেখা দিয়াছিল, কোথায় কোন্ দীর্ঘিকা বা রাজপথ কাহার আদেশে নির্ম্মিত হয়, সে সকল সংবাদ ইতিহাসের পাতা হইতে আমরা জানিতে পারি।

কিন্তু মানুষ বাহিরে যাহা করে শুধু তাহার চিহ্নই ইট-কাট-পাথরে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার মনে যে ভাব উঠে নামে, তাহার দাগ আমরা দেখি সেকালকার পুঁথি-পাটাতে। তখন সাহিত্য-রচনা পুঁথি-পাটাতে থাকিত। সাহিত্য আমাদের কোন্ কাজে লাগে? উহা আমাদের মনের চিন্তাভাবনাকে রূপ দেয়। সেই রূপ দেখিয়া পুরাতনের মানুষের সঙ্গে আজকালকার মানুষের চিন্তাধারা, তাহার প্রকৃতি, সকলই মিলাইয়া দেখি। আমরা বাহিরে যাহা করি,—ছুটি, চলি, গল্প বলি,—সকলেরই মূল মনে। লোকে যখন সাহিত্য রচনা করিয়া বই লেখে, তখন এই মনের ভয়, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, সাধ, আহ্লাদ সকল প্রকার ভাবের ছায়া সেই বইয়ের উপর পড়ে। সেই ছায়া দেখিয়া আমরা তখনকার মানুষ কিরূপ ছিল, তাহা ধারণা করিতে শিখি। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্য পড়া আর অতীত কালের বাঙ্গালী যাহা ভাবিত তাহার সঙ্গে পরিচিত হওয়া, তাহা জানা,—এ দুই-ই এক কথাকেই বুঝাইতেছে।

কিন্তু এই যে সাহিত্য পড়িব, ইহা কত দিনের? কত দিনের পুরাতন বাঙ্গালী-মনের সহিত পরিচিত হইতে পারি? আমাদের বাঙ্গলা দেশ কত দিনের? বাঙ্গলা ভাষার বয়স কত? যে দেশের সাহিত্য ও যে ভাষায় এই সাহিত্য রচিত, সেই দেশে ও সেই ভাষার সম্বন্ধে আপনাআপনি প্রশ্ন উঠে।

ভূতত্ত্ব নামে বিজ্ঞানের এক শাখা আছে। তাহাতে আমরা বাঙ্গলা দেশের বয়স কত, ইহা কত দিনের, তাহা অনুমান করিতে পারি। দেশের কথা ছাড়িয়া দিলে আমরা জিজ্ঞাসা করিতে পারি,—আচ্ছা, সেকালের বাঙ্গলার লোকদের সম্বন্ধে কথা কত কাল হইল প্রথম শোনা গিয়াছে,—বাঙ্গালী—বাঙ্গলার বীরের কথা ইত্যাদি। প্রায় আড়াই হাজার বৎসরেরও বেশী হইল, এদেশের কোনও একজন বীর, সুদূর আনাম দেশে গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাহা ছাড়া চারি বেদের মধ্যে অথর্ব্ব যে একটি বেদ, তাহা তোমরা জান; সেই অথর্ব্ব বেদের পরিশিষ্টে বাংলা দেশের নাম পাওয়া যায়। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে আর্য্য জাতি বাঙ্গলায় প্রথম আসেন। এই সব দেখিলে মনে হয়, বাঙ্গলা দেশের বয়স নিতান্ত কম নহে, এবং ইহাতে সুপ্রাচীন আর্য্যসভ্যতা বহুদিন হইতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

তাই বলিয়া বাঙ্গলা দেশ যত দিনের, বাঙ্গলা ভাষাও ততদিনের, এমন তো আর হইতে পারে না। কারণ, দেশে যখন ভিন্ন দেশের লোক আসিয়া বসবাস করিতে আরম্ভ করিল, তাহার বহু পরে দেশের ভাষা এক বিশেষ রূপ ধারণ করে। লোকে নূতন ভাষাকে প্রথমে অনাদর অবজ্ঞা করে, ভাবে ও বলে যে,—এ কি আবার একটা ভাষা! ক্রমে অনেক বৎসর গেলে সেই ভাষায় রচনা করে, এবং বহুকাল রচনা করিলে তবে ভাল রচনা সম্ভব হয়। বাঙ্গলা সাহিত্য যত পুরাতন, বাঙ্গলা ভাষা তাহার অপেক্ষা বেশী পুরাতন এবং বাঙ্গলা দেশের বয়স তার চেয়ে আরও বেশী, এই কথা কয়টি আমাদের মনে রাখা উচিত। যাহারা বাঙ্গলা ভাষার ইতিহাস ভাল করিয়া আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন, তাহাদের মত এই যে, খৃঃ ৯৫০—১২০০ সালে অর্থাৎ এখন হইতে হাজার বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গলা-ভাষার বনিয়াদ পাওয়া যায়। প্রায় আড়াই শত বৎসর পরে উহা এক স্বতন্ত্র বা বিশেষ আকার ধারণ করে। অর্থাৎ বাঙ্গলা সাহিত্যের আদিযুগ এখন হইতে প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে একথা বলিতে পারা যায়।

বই লেখা ও তাহা ছাপানো আজকাল কিছু কঠিন কথা নয়। বাঙ্গলা দেশের প্রত্যেক শহরেই একাধিক ছাপাখানা আছে, অল্প সময়ের মধ্যে সে সব স্থানে সংবাদপত্র বা বই অনেক কাপি একত্রে ছাপাইতে পারা যায়। কিন্তু একদিন এই সব ছাপাখানা মানুষের কল্পনারও অগোচর ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে অর্থাৎ প্রায় দেড়শত বৎসরের কিছু বেশীকাল হইল, বাঙ্গলা দেশে প্রথম ছাপাখানার প্রবর্ত্তন হয়। তাহার পূর্ব্বে হাতের লেখা কাপি করিয়াই লোকের বই লেখার কাজ চলিত। এখন কথা হইতেছে এই, যেদিনে ছাপাখানার কল হয় নাই, সেদিনও মানুষ বই লিখিয়াছে, সেদিনও মানুষ আকাশে মেঘ দেখিয়া নানা কথা ভাবিয়াছে, মধুর মলয়-হিল্লোলে খুসী হইয়াছে, আনন্দে গাহিতে ও শোকে কাঁদিতে শিখিয়াছে, বিচিত্র ভাবতরঙ্গে ভাসিয়া গিয়া কাব্য রচনা করিয়াছে। আজকাল মানুষ যত ভাল ভাবে, ভাল বাঁধুনি দিয়া কবিতা লেখে, সেদিন

হয়তো তাহা পারিত না। তবে আজকাল সে হয়তো খ্যাতির তাড়নায় কিংবা সহজে ছাপানো যায় বলিয়া লেখে, সেদিন তাহা কম ছিল। আর, তখন সাহিত্য ছিল গানে, গান গাহিবার একটা স্বতন্ত্র আনন্দ আছে, শুধু কবিতা পড়িয়া সে আনন্দ পাওয়া যায় না; আবার ধর্ম্ম ছিল সেকালের কবিতা লিখিবার এক প্রধান কারণ, জীবনের এক প্রধান সংস্কার। তাই সেকালে লোকে কবিতা লিখিতে হইলে ধর্ম্ম বিষয়ক গান বাঁধিতে বসিত।

এই ধর্ম্মবিষয়ক গান দিয়া বাঙ্গলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন হয়। এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম সারা ভারতে প্রচলিত ছিল। অহিংসা পরম ধর্ম্ম এবং অহিংসা অভ্যাস করিতে হইলে আমাদিগকে নানাপ্রকার সাধনা করিতে হয়। বৌদ্ধধর্ম্মের কতকগুলি সাধনপথ বা সাধন প্রণালী বিশেষ করিয়া ছিল; প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যের কতকগুলি গান বা দোঁহা এই সকল সাধন প্রণালী লইয়া লিখিত। দোঁহা কথাটা এখন আর আমাদের ভাষায় চলিত নাই, কিন্তু অন্য প্রদেশের ভাষায় আছে। যেমন হিন্দীতে তুলসীদাসের দোঁহা, গুজরাটিতে মীরাবাইয়ের দোঁহা ইত্যাদি। দুইয়ে দুইয়ে, অর্থাৎ প্রতি দুই ছত্রে একটা মিল দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া বোধ হয় দোঁহা এই নামকরণ হইয়াছে। এইরূপে মারহাটী সাহিত্যে আছে অভঙ্গ—যাহার ভঙ্গ হয় না, যাহাতে মিল আছে এই অর্থে।

এই গান বা দোঁহাগুলি যে কিরূপে বাহির করা হইল, তাহা শুনিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী আমাদের দেশের একজন খুব বড় দরের পণ্ডিত ছিলেন। তিনি কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত এবং বাংলা সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বে তাঁহার খুব নাম ছিল। সোজা কথায়,



৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

প্রাচীন কালের বর্ণনা। তিনি এমন সুন্দর ভাবে করিতে পারিতেন যে, লোকে তাহা মুগ্ধ হইয়া শুনিত। এইরূপ চমৎকার কল্পনা ও সরল কথায় বর্ণনা শক্তি তাঁহার পাণ্ডিত্যের সঙ্গে সুন্দর ভাবে মিশিয়াছিল। তিনি আজ বাইশ বৎসর হইল পরলোকে গিয়াছেন। প্রায় ষাঠ বৎসর পূর্ব্বে পুরাণো পুঁথি খুঁজিতে গিয়া তিনি নেপাল দরবারে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি কয়েকখানি পুঁথি পান—তাহাদের মধ্যে কয়েক স্থানের ভাষা ঠিক সংস্কৃত নয়, হয় তাহা সংস্কৃতের টীকা, নয় তো

সংস্কৃত লেখা অংশই তাহার টীকা। শাস্ত্রী মহাশয়ের মনে হইল, সংস্কৃতের কাছাকাছি এই নূতন ভাষাই প্রাচীন বাঙ্গলা।

এখন কথা হইতেছে, নেপালে বাঙ্গলা গেল কি করিয়া! নেপালের সঙ্গে আচারে-ব্যবহারে বাঙ্গলা দেশের অনেক বিষয়ে মিল আছে। বিশাল ভারতবর্ষের মধ্যে কোন্ দেশের সঙ্গে যে কাহার মিল আছে, আর কাহার নাই তাহা স্থির করিয়া বলা সুকঠিন। গুজরাট ভারতের একেবারে পশ্চিমে, আর বাঙ্গলা পূর্ব্বে—তথাপি এই দুই দেশের ভাষায় এবং অন্য অনেক বিষয়ে বেশ মিল আছে। সুতরাং প্রাচীন কালে বাঙ্গলা-দেশ হইতে কয়েকখানি ভাল ভাল গান নেপালে গিয়াছিল, এ কথা ভাবা নিতান্ত অসঙ্গত নয়। দ্বিতীয়তঃ, বাঙ্গলা ও নেপালে দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও যে সাহিত্যের ভিতর দিয়া এরূপ মেলামেশা হইত, তাহার পরিচয় আমরা নেপালের বাঙ্গলা নাটকের মধ্যে পাই। সুতরাং বাঙ্গালীর লেখা কবিতা যাহা কিনা বাঙ্গলায় পাওয়া যায় না, তাহার যে নেপালে একসময়ে প্রচার হইয়াছিল, ইহার মধ্যে অসম্ভব কিছু নাই। শুধু নেপালে কেন, বাঙ্গালীর লেখা অন্যান্য প্রদেশেও খোঁজ করিলে পাওয়া যাইতে পারে।

আর এক কথা, সেকালে বাঙ্গালীরা নিতান্তই 'কুণো' ছিলেন না। ধর্ম্ম প্রচারের জন্য তাঁহারা দেশ হইতে দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইতেন। সেকালের পণ্ডিতদের মধ্যে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের কথা খুব প্রসিদ্ধ। বগুড়া জিলায় পাহাড়পুরে মাটী খুঁড়িয়া অতীতের অনেক স্মৃতিচিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। এই পাহাড়পুরে 'সোমপুরী' নামে এক বিহার ছিল। সেখানে বহু ছাত্র আসিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এই সোমপুরী বিহারে ছিলেন। জগদ্দল, মহাস্থান প্রভৃতি স্থানে এইরূপ আরও বিহার ছিল। এক একটি বিহার যেন এক একটি ছোট-খাট বিশ্ববিদ্যালয়। অতীশ বা দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিক্রমশীল বিহারেরও অধ্যক্ষ ছিলেন। তিব্বতের রাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেইখান হইতে নিজের দেশে লইয়া যান। তখন তাঁহার বয়স ছিল ৫৮ বৎসর। অতীশকে তিব্বতের লোকেরা প্রভু বলিয়াই জানে। মুসলমানদের বিক্রমশীল আক্রমণের সময় একজন দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, যাহাকে কিনা অতীশ উপাধি দেওয়া হইয়াছিল, তিনি বণিক্‌দের সঙ্গে সুবর্ণদ্বীপে যান এবং সেখানে বারো বৎসর থাকিয়া প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ধর্ম্মকীর্ত্তির নিকট বিদ্যাশিক্ষা করেন। এই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গলাভাষায় অনেকগুলি কীর্ত্তনপদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইনি আরেক জন আচার্য্যকে বই লেখায় সাহায্য করেন। তাঁহার নাম লুই। লোকে অনুমান করিত যে, তাঁহারও বাড়ী ছিল এই বাঙ্গলাদেশে। শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার লেখা কয়েকটি দোঁহা পাইয়াছিলেন। আর একজন বৌদ্ধ পণ্ডিতের নাম ছিল ভুসুকু। তাঁহার বাড়ীও ঢাকা জিলায় ছিল বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। তিনিও কয়েকটি বাংলা দোঁহা লিখিয়া গিয়াছেন। এই সকল দোঁহা গাওয়া হইত। গাহিবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন সুর দেওয়া থাকিত। এইরূপ একটি রাগিণীর নাম ছিল বাঙ্গলা। সুতরাং দেখিতে পাইতেছি যে, পদকর্ত্তাদের মধ্যে বাঙ্গালী ছিলেন, পদের ভাষা ছিল বাঙ্গলা। আর যে সকল রাগ রাগিণী অনুসারে তাহা গাওয়া হইত, তাহাদের একটির নাম [illegible] বাঙ্গলা। যে সকল দোঁহা শাস্ত্রী [illegible]শয় পাইয়াছিলেন, তাহারা খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হইয়াছিল বলিয়া

তিনি মনে করিতেন। ইহাদের তিব্বতী অনুবাদও পাওয়া যায়।

মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয় যে সকল গান বা দোঁহা পাইয়াছিলেন, তাহা ১৩২৩ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। তাহার পর নেপালে আরও কয়েকটি প্রাচীন গানের সন্ধান মিলিয়াছে। সুতরাং আমরা অনুমান করিতে পারি, দেশের অন্যত্র এরূপ গান আরও ছড়াইয়া আছে; সময়ে তাহাদের সন্ধান মিলিতে পারে। নীচে অনুবাদ সহ দুইটি গান উদ্ধৃত করা হইল।

দুলি দুহি পিটা ধরণ ন জাই
রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাঅ॥
আঙ্গন ঘরপণ সুন ভো বিআতী
কানেট চৌরি নিল অধরাতী॥
সুসুরা নিদ গেল বহুড়ী জাগঅ।
কানেট চোরে নিল কা গই মাগঅ॥
দিবসই বহুড়ী কাড়ই ডরে ভাঅ
রাতি ভইলে কামরু জাঅ॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরীপএঁ গাইড।
কোড়ি মঝেঁ একুহিঅহিঁ সমাইড়॥

কচ্ছপ দোহন করিয়া তাহা আর ভাঁড়ে ধরে না; বৃক্ষের তেঁতুল কুম্ভীরে খাইয়া যায়। ঘরের দিকে আঙ্গিনা, হে বিদুষি, অর্দ্ধরাত্রে চোর আসিয়া কানের দুল চুরি করিল। শ্বশুর ঘুমাইয়াছিল, বধূ ছিল জাগিয়া; দুল চুরি করিয়া লইয়া গেল, কোথায় গিয়া খুঁজিব। দিন দুপুরে বধূ ভয়ে চীৎকার করিতেছে, রাত্রি হইলে সে কামরূপে যায়, কুক্কুরীপাদ (কবির উপাধি) এইরূপ চর্য্যা গাহিলেন; কোটীর মধ্যে একজনের হৃদয়ে তাহা প্রবেশ করিল।

বাস্তবিকই চর্য্যার ভাষা এমনি জটিল, সোজা কথায়, এমন সব ভাব লুকাইয়া আছে যে, কোটীতে গোটি বা একজন ইহার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিত। এখন অবশ্য টীকা বা অর্থ ছাপান হইয়াছে, সুতরাং বুঝিবার কষ্ট দূর হইয়াছে।

আর একটি চর্য্যাপদ নীচে দিলাম। ইহার ভাষায় হেঁয়ালীর ভাব অনেকটা কম।

জো মণ গো অর আলা জালা
আগাম পোথী ইষ্টামালা॥
ভণ কই সেঁ সহজ বোল বা জাঅ।
কায়বাক্‌চিঅ জাসু ণ সমাঅ।
আলে গুরু উত্রসই সীস
বাক্‌পথাতীত কাহিব কীস॥
জে তেঁই বোলী তে তাবাটাল
গুরু বোবসে সীসা কাল॥
ভণই কাহ্ন জিন রঅণ বি কইসা।
কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা॥

যাহা মনের গোচর, তাহা গোলমেলে, শাস্ত্রগ্রন্থ এবং জপের মালাও তাহাই—অর্থাৎ গোলমেলে। সহজকে কি করিয়া প্রকাশ করি বল, যাহাতে কায়বাক্‌চিত্ত প্রবেশ করে না? গুরু শিষ্যকে বৃথাই উপদেশ দিতেছেন, যাহা বাক্‌পথের অতীত, তাহা কি করিয়া বলা যায়? সুতরাং যে বলে সে নষ্ট করে, গুরু বোবা, শিষ্য কালা। কাণু বলেন, জিন রত্ন কেমন? না, কালাকে বোবা বোঝাইলে যেমন হয়।

দুরূহ অর্থ হইলেও এই পদটির ভাব বুঝিতে পারা তেমন কঠিন নহে। 'আলা জালা' কথাটি পূর্ব্ববঙ্গের চলিত ভাষায় 'আল্যা ঝাল্যা' হইয়া পড়িয়াছে।

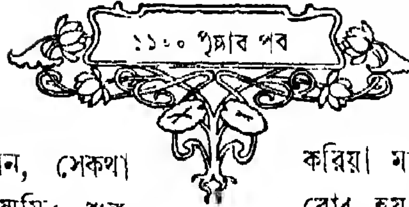
এই দুইটি পদ হইতে বৌদ্ধ দোঁহা—প্রাচীন বাঙ্গলার প্রথম যুগের গান যে কিরূপ ছিল, তাহার সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মিবে। তত্ত্বকথা লইয়াই তখন লোকে সাহিত্য রচনা করিত, এবং তখনকার ছন্দোবদ্ধ, ভাষার কাঠামো—সকলই ছিল সরল, অথচ গভীর অর্থ তাহার মধ্যে থাকিত। প্রথম যুগের এই কয়টি দোঁহা আমাদের ভাষার, সাহিত্যের এবং জাতির পরম সম্পদ।



ভারতবর্ষ

শুঙ্গরাজাদের কথা

[আনুমানিক ১৮৫ খৃঃ পূঃ—৭৩ খৃঃ পূঃ]


১১০০ পৃষ্ঠার পর

মগধের শেষ মৌর্য্য সম্রাট্ বৃহদ্রথ যে তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্রের হস্তে প্রাণ হারাইয়াছিলেন, সেকথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। পুষ্যমিত্র শুঙ্গ প্রভুর প্রাণবধ করিবার জন্য ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'হর্ষচরিত' নামক বিখ্যাত সংস্কৃত কথাগ্রন্থের লেখক বাণভট্ট খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর লোক; তিনি বৃহদ্রথের এই হত্যা সম্পর্কে লিখিয়াছেন যে, অনার্য্য পুষ্যমিত্র নিজ প্রভুকে সৈন্য পরিদর্শন করাইবার কৌশল করিয়া সমস্ত সেনাদল একত্র সমবেত করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে নিষ্পেষিত করিয়াছিলেন অর্থাৎ মারিয়া ফেলিয়াছিলেন। বৃহদ্রথকে মারিবার কারণ এই যে, তিনি 'প্রতিজ্ঞা-দুর্ব্বল' ছিলেন। যিনি প্রতিজ্ঞা করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে পারেন না, তাঁহাকেই লোকে 'প্রতিজ্ঞা-দুর্ব্বল' বলিয়া থাকে। সম্রাট্ বৃহদ্রথ রাজ্যাভিষেকের সময় প্রজাপালন করিবেন বলিয়া যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই। এখানে সকলের মনেই আপনা হইতে একটা প্রশ্ন আসে—পুষ্যমিত্র, গুপ্তভাবে রাজাকে হত্যা না করিয়া সৈন্য সমবেত করিয়া মারিলেন কেন? তাহার উত্তর, বোধ হয় পুষ্যমিত্র সেনাপ্রিয় সেনানী ছিলেন, তিনি সেনার উপর নির্ভর করিয়া এই ভয়ানক কার্য্যে হাত দিয়াছিলেন ও অশেষ দূরদর্শিতার সহিত ভাবিয়াছিলেন যে, সেনার সমক্ষে প্রভুকে বধ করিলে উপস্থিত জনতা আর কোনোরূপ গোলযোগ করিতে সাহসী হইবে না। কারণ, সৈন্যদলের নেতা যিনি—সৈন্যদল সহায় যাঁহার, তাঁহার আবার নিরস্ত্র জনসাধারণকে কি ভয়?

প্রভুকে বধ করিয়া পুষ্যমিত্র মৌর্য্যদের শূন্য সিংহাসন বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়া শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেন। নীতির দিক্ হইতে আমরা পুষ্যমিত্রের এই অন্যায় কার্য্যের সমর্থন করিতে পারি না। কিন্তু রাজনীতির দিক্ দিয়া তাহা সমর্থন-যোগ্য নয়, এমন কথা বলা চলে না। প্রথম ক[illegible], বৃহদ্রথ প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন না, দ্বিতীয়তঃ, তিনি দুর্ব্বল স্বভাবের লোক ছিলেন এবং ক্ষত্রিয় নামের কলঙ্ক

কাম্বোজ
হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণী
সিন্ধু নদ
যমুনানদী
গঙ্গানদী
অযোধ্যা
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
বারাণসী
ভাগলপুর
অঙ্গ
সিন্ধু
চিতোর
ভরহুত
কৌশাম্বী
সাঁচী
ভিলসা
নর্ম্মদানদী
তাপ্তী নদী
বঙ্গ
মহানদী
বেরার
গোদাবরী নদী
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
শুঙ্গ সাম্রাজ্য

ছিলেন। সে সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিদেশীয় শকরা আসিয়া দেশের স্বাধীনতা হরণ করিবার জন্য ভয় দেখাইতেছিল। ভারতের রাজনৈতিক আকাশে তখন বিপদের কালো মেঘ দেখা দিয়াছিল। এ হেন দুঃসময়ে কোনও দেশভক্ত ভারত-সন্তানের পক্ষে কি শুধু নীতির একটা আদর্শ ধরিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা সম্ভব? বৃহদ্রথের পক্ষে তাহাই সম্ভব ছিল।

পুষ্যমিত্র জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও বোধ হয় মৌর্য্য রাজাদের রাজপুরোহিত-বংশীয় ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ নিশ্চয়ই লোপ পাইয়াছিল। পুরোহিত-বংশ নামে মাত্র পূর্ব্বপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

পুষ্যমিত্র ব্রাহ্মণ হইয়াও ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালের ইতিহাসে এইরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তোমরা মহাভারতে দ্রোণের কথা শুনিয়াছ। তিনি একজন মস্ত যোদ্ধা ছিলেন ও কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কৌরববাহিনীর দ্বিতীয় সেনাপতি হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যে কেবল যজ্ঞ ও অধ্যয়ন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন, তাহা নহে; আবশ্যক হইলে তাঁহারা দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেও কুণ্ঠিত হইতেন না, আবার তাঁহারা অনেকেই অতিশয় রাজনীতিকুশলও ছিলেন।

মৌর্য্যরাজাদের রাজত্ব কালে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম ও সভ্যতা অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। মৌর্য্যনৃপতিরা উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা অন্য কোনও ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করেন নাই, তথাপি সে সময়ে রাজধর্ম্ম বৌদ্ধ বা জৈন হওয়াতে ব্রাহ্মণ্য-প্রাধান্য খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হইয়াছিল। পুষ্যমিত্র সিংহাসন গ্রহণ করিলে পর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া পাইলেন।

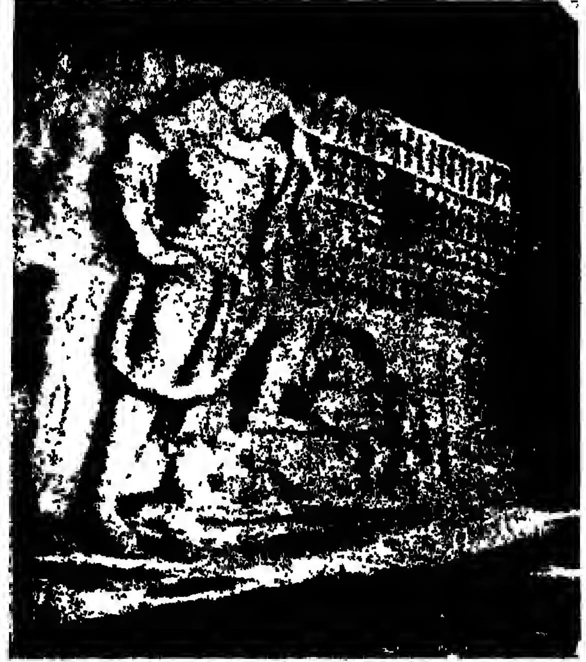
পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে অনেক কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রথমেই গ্রীক্‌দের আক্রমণের কথা বলিতে হয়। বাহ্লীক প্রদেশের গ্রীক্‌দিগের আক্রমণের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ বিষয়ে আরও একটু বিশদ ভাবে বলা প্রয়োজন। তোমরা কি পতঞ্জলির নাম শুনিয়াছ? ইনি একজন বিখ্যাত বৈয়াকরণ ছিলেন। অর্থাৎ পতঞ্জলি খুব ভাল ব্যাকরণ জানিতেন ও মহর্ষি পাণিনির ব্যাকরণ সংক্রান্ত অনেক জটিল বিষয়ের আলোচনা করিয়া একখানি অসামান্য গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ঐ গ্রন্থখানির নাম মহাভাষ্য। পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন, একথা মহাভাষ্য হইতেই জানা যায়। এই মহাভাষ্যকার পতঞ্জলিই আবার বিদেশী আক্রমণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি ব্যাকরণের একটি নিয়ম বুঝাইবার জন্য যে উদাহরণ দিয়াছেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, তাঁহার সময় কোনও এক গ্রীক্ রাজা সাকেত অথবা অযোধ্যা ও মাধ্যমিকা নামক চিতোরের নিকটবর্ত্তী একটি নগর (আধুনিক নাগর) অবরোধ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তোমরা দেখিতে পাইতেছ যে, সেকালে গ্রীকেরা মধ্যদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসিয়াছিলেন। কবি কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্র নামক নাটক হইতেও জানা যায় যে, পুষ্যমিত্রের পৌত্র বসুমিত্রের সহিত বুন্দেলখণ্ডের নিকটবর্ত্তী সিন্ধু নদীর তীরে গ্রীক্‌দের সংঘর্ষ হইয়াছিল। বোধ হয় পাটলিপুত্র পর্য্যন্তও তাহারা অভিযান করিয়াছিল। তাহাদের আক্রমণ কালে ঘোর রাষ্ট্রবিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল। একখানি প্রাচীন গ্রন্থে তাহাদিগকে 'দুষ্টবিক্রান্ত' বলা হইয়াছে, অর্থাৎ তাহারা বীর যোদ্ধা হইয়াও দুরাচার ও দুষ্কর্ম্মরত ছিল।

যে গ্রীক্ নৃপতি সাকেত ও মাধ্যমিকা অবরোধ করিয়াছিলেন, তিনি কে, এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে একটু মত-ভেদ আছে। অনেকে মনে করেন, তিনি শাকলাধিপতি মিনেন্দার, আবার অনেকের মতে তিনি ডেমিট্রিয়স্ অবশ্য। ডেমিট্রিয়া-সেরই পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক হওয়া অধিক সম্ভব। মিনেন্দার বোধ হয় পুষ্যমিত্রের অনেক পরে রাজা হইয়াছিলেন।

ডেমিট্রীয়সের পরে গ্রীক্‌দের মধ্যে পর-স্পর গৃহ-বিবাদের ফলে পঞ্জাবের রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

পুষ্যমিত্র গ্রীক্ আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৃহ-বিবাদের ফলে ও ব্রাহ্মণ রাজার তপোবলে না হউক, বাহুবলের প্রভাবে গ্রীক্‌রাজকে ভারতে গ্রীক্-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার স্বপ্ন ত্যাগ করিতে হইয়াছিল।

এদিকে বৃহদ্রথ মৌর্য্যের সচিবের জনৈক আত্মীয় যজ্ঞসেন বিদর্ভ দেশে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই (আধুনিক ভিল্‌সার) শাসনকর্ত্তা ছিলেন। যুদ্ধের ফলে বিদর্ভ-রাজের পরাজয় হইলে



দেবগিরি গুহায় খোদিত চিত্র ইত্যাদি



পাটলিপুত্রের ধ্বংসাবশেষ

বিদর্ভরাজের সহিত পুষ্যমিত্রের পুত্র অগ্নি-মিত্রের যুদ্ধ হইয়াছিল। অগ্নিমিত্র বিদিশার

তাঁহার রাজ্যের অর্দ্ধাংশ তাঁহার ভ্রাতা মাধব-সেনকে প্রদান করিতে হইয়াছিল ও বরদা নামক নদী-(Modern Wardah) দুইটি রাজ্যের সীমা রেখা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। মাধব-সেন শুঙ্গদের মিত্র ছিলেন। অতএব তোমরা দেখিতে পাইতেছ, পুষ্যমিত্র শুঙ্গের প্রভাব বিদর্ভ দেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

পুষ্যমিত্রের রাজধানী পাটলিপুত্র ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধ, তীরভুক্তি,

কোশল, অযোধ্যা ইত্যাদি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হয় ত উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। মনে হয়, পঞ্জাব ও সুরাষ্ট্র ছাড়া সমগ্র উত্তরাপথ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল।

অনেকেই মনে করেন যে, কলিঙ্গরাজ খারবেল পুষ্যমিত্রকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। এই ঘটনার প্রমাণ একটু জটিল। তোমাদিগকে কেবল এইটুকু বলিলেই চলিবে যে, উড়িষ্যায় কটকের নিকট, উদয়-গিরি নামক পর্ব্বত-গুহায় অনেকদিন হইল একটি প্রাকৃত ভাষায় লেখা অত্যন্ত অস্পষ্ট শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। শিলা-লিপিখানির অতি কষ্টে পাঠোদ্ধার হইয়াছে। কিন্তু বিভিন্ন স্থানের পাঠ সম্বন্ধে বিস্তর মত-ভেদ আছে। শিলালিপিটিতে কলিঙ্গরাজ খারবেল রাজ্যাভিষেকের পর তের বৎসর মধ্যে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথের রাজাদের মধ্যে কাহাকে কাহাকে জয় করিয়াছিলেন, ও কি কি জনহিতকর অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, ও জৈন ধর্ম্মের জন্য কি কি কার্য্য করিয়া-ছিলেন তাহা বর্ণিত আছে। কলিঙ্গরাজ-কর্তৃক পরাজিত নৃপতিদের মধ্যে মগধের রাজা বৃহস্পতি মিত্র একজন ছিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন, বৃহস্পতি মিত্র নামের দ্বারা পুষ্যমিত্র শুঙ্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে ডেমিট্রিয়সকে শিলালিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা যদি হয়, তবে খারবেল পুষ্যমিত্রের সম-সাময়িক বলিয়াই বোধ হয়। কারণ তোমা-দিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গ্রীক্‌রাজ ডেমিট্রিয়সকে পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক মনে করিবার অনেক কারণও আছে। গ্রীক্‌দের সহিত যুদ্ধে জয়যুক্ত হইয়া ও বিদর্ভরাজকেও সংগ্রামে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র নিজেকে সমগ্র উত্তরাপথের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও নিজের সার্ব্বভৌমত্বের নিদর্শন স্বরূপ দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। বৌদ্ধপ্রভাবে, উপনিষদের যুগে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের ফলে, ও অহিংসার প্রচার হওয়াতে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপে জনতার আর তেমন অবস্থা ছিল না। অশোকবর্দ্ধন যজ্ঞে পশুহিংসা নিবারণ করিয়াছিলেন; বৈদিক যজ্ঞ সকল লুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। মনে হয়, পুষ্যমিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া অবসাদগ্রস্ত বৈদিক ধর্ম্মে জীবনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞ কি প্রকারে অনুষ্ঠিত হইত, তাহা বলিবার স্থান নাই; তোমরা রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি পড়িলেই জানিতে পারিবে। যিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ সুসম্পন্ন করিতে পারিতেন, তাঁহাকে রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া মানিয়া লওয়া হইত।

যজ্ঞে নিমন্ত্রণ করিয়া পুষ্যমিত্র পাটলি-পুত্রের যজ্ঞশালা হইতে অগ্নিমিত্রকে বিদিশাতে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, মালবিকাগ্নিমিত্র হইতে আমরা একথা জানিতে পারি। এই পত্রখানি হইতে জানা যায়, একদল গ্রীক্ অশ্বারোহী সৈন্য যজ্ঞীয় অশ্বকে বলপূর্ব্বক ধরিয়াছিল। অশ্বের রক্ষক পুষ্যমিত্রের পৌত্র, বসুমিত্র তুমুল যুদ্ধ করিয়া, বুন্দেলখণ্ডের নিকট সিন্ধুতীরে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

বৈয়াকরণ পতঞ্জলি যজ্ঞটি নিজে অনুষ্ঠিত হইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি একজন মুখ্য পুরোহিতের মধ্যে ছিলেন।

পুষ্যমিত্রের নামে একটা কলঙ্ক আছে। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাঁহাকে ঘোরতর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলিয়াছেন। তিনি নাকি বৌদ্ধ শ্রমণদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন ও তাঁহাদের বিহারগুলি পোড়াইয়া দিতেন। অবশ্য, সত্য ব্যাপারটিকে একটু অতিরঞ্জিত করা হইয়াছে। কিন্তু পুষ্যমিত্র যে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার

করিতেন, এ কথা অস্বীকার করিবার হেতু নাই। ভারতে হিন্দু রাজাদের আমলে এবংবিধ অত্যাচারের উদাহরণ খুব বিরল নহে। আমাদের তাহাতে বিশেষ লজ্জা পাইবার কিছুই নাই—বরং ইহা গৌরবের বিষয় যে, সমগ্র প্রাচীন ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা অত্যাচারের দৃষ্টান্ত খুবই কম পাই।

পুষ্যমিত্র প্রায় ১৮৫ খৃঃ পূঃ হইতে ১৪৯ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে অগ্নিমিত্র রাজা হইলেন। অল্পদিন রাজত্ব করিয়া অগ্নিমিত্রের মৃত্যু হইলে বসুজ্যেষ্ঠ সিংহাসন অধিকার করেন। বসুজ্যেষ্ঠের পরবর্ত্তী রাজা বসুমিত্র, অগ্নিমিত্রের পুত্র ও পুষ্যমিত্রের প্রপৌত্র পঞ্চম শুঙ্গ রাজার বিষয়ে মতভেদ আছে। বোধ হয়, তাঁহার নাম কাশীপুত্র ভাগভদ্র! গ্রীকরাজ অংতলিখিত (Antvalkidas) ত্রাতার (অর্থাৎ রক্ষাকর্ত্তা) কাশীপুত্র ভাগভদ্রের নিকট হেলিওদোরা নামক দূত প্রেরণ করেন। হেলিওদোরা একজন বৈষ্ণব ছিলেন। সে কালে গ্রীকেরা হিন্দু ধর্ম্ম বা বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেন। ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ মুদ্রা, শিলালিপি ও প্রাচীন সাহিত্য হইতে পাওয়া যায়। অবশ্য যতদূর মনে হয়, তাঁহাদিগকে সমাজে উচ্চ স্থান দেওয়া হইত না। তাঁহারা শূদ্র বলিয়া সমাজে গৃহীত হইতেন ও তাঁহাদের ব্যবহৃত বাসন মাজিয়া লইলেই শুদ্ধ হইত। অবশ্য, আজকাল হিন্দুধর্ম্ম এত উদার নহে। হেলিওদোরা বাসুদেবের পূজার্থে একটি গরুড়ধ্বজ স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ভাগভদ্রের পরবর্ত্তী তিন জন রাজার বিষয়ে কিছুই জানা যায় নাই। শুঙ্গ বংশের নবম রাজা ভাগবত বত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। ভাগবতের পরবর্ত্তী রাজা দেবভূমি চরিত্রহীন ও দুরাচার ছিলেন। দশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাঁহার অমাত্য বাসুদেব কাম্বর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। এই প্রকারে প্রায় ৭৫ খৃঃ পূর্ব্বে শুঙ্গ রাজ্যের অবসান হয়।



সাঁচী স্তূপের রেলিং ও তোরণ-দ্বার

শুঙ্গ রাজাদের কাল ভারত-ইতিহাসে এক গৌরবময় যুগ। কারণ, এই সময়ে বৈদিক ধর্ম্মের পুনরুত্থান হয়, সাহিত্যের উন্নতি হয় ও ভারতের শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন হয়। পতঞ্জলি এই সময় নিজের মহাভাষ্য লিখেন ও ভারতের কারুশিল্পীরা পাথরেতে কাঠের কাজের অনুকরণ করিয়া সাঁচী ও ভরহুত স্তূপের রেলিং ও তোরণ-দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া আজও জগতের বিস্ময় উৎপাদন করিতেছেন। গীতায় প্রচারিত ধর্ম্মের মহিমা লোকে অধিক সংখ্যায় বুঝিতে পারিতেছিল। এমন কি, গ্রীকেরা পর্য্যন্ত সেই ভাগবত ধর্ম্মে অনুপ্রাণিত হইতেছিলেন। গুপ্তকালের ন্যায় শুঙ্গকালও ভারতের স্বর্ণময় যুগ, সন্দেহ নাই।



সর্দ্দি হয় কেন ?

১৪০ পৃষ্ঠার পর

সর্দ্দি হওয়াটা মানুষের পক্ষে, বিশেষ ক'রে ছোট ছেলেদের পক্ষে এত সাধারণ ব্যাপার যে, তা থেকে কেউ যে নিস্তার পেয়েছে এমন মনে হয় না। শীত পড়তে আরম্ভ হ'লেই যাকে দেখা যায় সেই অনুযোগ করে—কি বিশ্রী যে ঠাণ্ডা লেগেছে, কিছু ভাল লাগছে না—আর তার কিছুই যে ভাল লাগছে না, তা তার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারা যায়। অথচ সামান্য কয়েকটা বিষয়ের জ্ঞান আমাদের থাকলে আর সব সময় কয়েকটা কথা মেনে চললে এ-থেকে খুব সম্ভব একেবারে পরিত্রাণ পাওয়া যেতে পারে।

সর্ব্বপ্রথমে তোমরা এইটা জেনে রাখ যে, ঠাণ্ডা লাগা বা সর্দ্দি হওয়ার সঙ্গে বাইরে শীত পড়ার কোনও সাক্ষাৎ সম্পর্ক নেই। মেরুর দেশে যে কল্পনাতীত ঠাণ্ডা, তা তোমরা জান। সে দেশে যাঁরা আবিষ্কারের জন্যে গিয়েছেন, সেখানে থাকতে সর্দ্দি হয়েছে এ অনুযোগ তাঁরা কখনও কেউ করেন নি। নির্ম্মল শুদ্ধ বাতাস, সে যতই ঠাণ্ডা হোক না কেন, তাতে সর্দ্দি হয় না। তুমি বৃষ্টিতে ভিজিয়ে জবজবিয়ে যাও না কেন, প্রহরের পর প্রহর জলে জলে কাটাও না কেন, বা অল্প ও শীতের অনুপযুক্ত কাপড়-চোপড় প'রে রাতের পর রাত নৌকো চালাও না কেন—সাধারণ ঠাণ্ডা লাগা বা চোখ মুখ নাক ভর ক'রে সর্দ্দি হওয়া যাকে বলে তা কিছুতেই হবে না। যদিও এমন গোঁয়ার্ত্তুমি করতে গেলে তোমার ব্রংকাইটিস বা বাত বা অন্য কোনও শক্ত অসুখ হওয়া বিচিত্র নয়। সর্দ্দি হবার প্রধান ও প্রথম কারণ হ'ল সর্দ্দি হয়েছে এমন কোনও ব্যক্তির ছোঁয়াচ লাগা। আমাদের নাকের ভিতরদিক্‌কার চামড়াতে সর্দ্দির জীবাণু এসে জমা হয়ে নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। এই অনিষ্টকর আগন্তুক জীবাণুগুলির বিরুদ্ধে নাকের কোমল ও মসৃণ চামড়াটা যে সাড়া দিয়ে ওঠে, তাকেই আমরা সর্দ্দি হওয়া বলি। সর্দ্দি হবার প্রত্যেক অবস্থার বর্ণনা এইবার করা যেতে পারে।

নাকের ভিতর দিক্‌কার এই Sensitive চামড়ার নাম Olfactory Patch। এইখানে আগন্তুক জীবাণুগুলো এসে জমা হ'লে এর Tissue-গুলোর ওপর নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করতে হ'লে কিছু সময় চাই। এই সময়টাকে সর্দ্দি হওয়ার গুপ্ত অবস্থা বলা যেতে পারে। এই সময়ে যার এই রকম ছোঁয়াচ লেগেছে—তার নিজের অতি সামান্য একটু মেজাজের বিকৃতি হওয়া ছাড়া সে আর বিশেষ কিছু টের পায় না, যদিও জীবাণুগুলো কিন্তু এই সময় অসম্ভব রকম তৎপর হয়ে থাকে। সাধারণতঃ দুই দিন এমন ভাবেই চলে আর এই দুই দিনই হ'ল অপরপক্ষে অন্যকে ছোঁয়াচ দেবার সর্ব্বপ্রধান সময়। এই হ'ল প্রথম অবস্থা।

এইবার দ্বিতীয় অবস্থা। এই অবস্থায় নাকের **Olfactory membrane**-এর জীবন্ত Cell-গুলি প্রথমে এই জীবাণু আসতে উত্তেজিত হয়ে যায়, পরে তাদের সংস্পর্শে এসে বিষাক্ত হয়ে ওঠে এবং অবশেষে

ধ্বংস হইতে থাকে। ফলে হয় এই যে, আমাদের নাক থেকে অনবরতঃ "কাঁচা জল" আসতে আরম্ভ হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে আমাদের শরীরের রক্ষক স্বরূপ Phogo y e- বা শ্বেত কণিকারা এসে এই আক্রমণকারী জীবাণুদের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে এই যুদ্ধের নিদর্শন স্বরূপ আমাদের নাক লালচে হয়ে উঠে ফুলে থাকতে দেখা যায়।

দুই চার দিনে এই রক্ষী কণিকারা যদি আগন্তুকদের পরাজিত করতে না পারে, তখন নাকের জল ঝরার আকৃতি পরিবর্ত্তন করে। এই পরিত্যক্ত জলটা তখন আর তত তরল থাকে না আর সঙ্গে সঙ্গে দুর্গন্ধযুক্ত হতে থাকে। এই পদার্থটা তখন অসংখ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত Cell দিয়ে পূর্ণ থাকে। এ সময় নাক বন্ধ হয়ে আসে - সর্দ্দি আরও জাঁকিয়ে উঠতে চায়; আর যে ক্ষতটা একদিন শুধু নাকেতেই আবদ্ধ ছিল, এখন অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়তে সুরু হয়।

এই ত হ'ল জীবাণুদের কাজ। আমাদের শরীরের স্বাভাবিক সুস্থ থাকবার যে শক্তি আছে, তা যদি বেশ স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে, তবে তার কাজও সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। শরীরকে সুস্থ রাখবার স্বাভাবিক নিয়মের একটা হচ্ছে তার নিজেকে নিজের ভিতরেই জল দিয়ে অনবরতঃ ধৌত ক'রে রাখা। আমাদের যে ঘাম হয়, তার একটা প্রকৃত উদ্দেশ্যই হ'ল শরীরকে পরিষ্কার রাখা। সর্দ্দির কারণগুলিকে দূর করবার জন্যে তাই শরীর এমনই কতকগুলি পরিষ্কার করবার পদার্থ তৈরী ক'রে নেয়। এগুলো হ'ল নাকের কফের অংশ (mucus), মুখের লালা ইত্যাদি। এমন কি, চোখ থেকে খুব বেশী বেশী জল পর্য্যন্ত বেরিয়ে, সর্দ্দির কারণকে ধুয়ে বার করে দিতে সাহায্য করে। চোখের জলের জীবাণু ধ্বংস করার একটা আশ্চর্য্য শক্তি আছে। এদের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বে যেমন বলেছি, রক্তের শ্বেত কণিকারা প্রত্যেকটা জীবাণুর চতুর্দ্দিকে ঘিরে তাদের খেয়ে ফেলতে থাকে। এ অবস্থায় মানুষ গলায় নাকে Paint লাগিয়ে কিংবা ওষুধ খেয়ে শরীরের সুস্থ হবার স্বভাবকে আরও বলীয়ান ক'রে দেবার চেষ্টা করে। আমরা তখন ক্রমে ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠি।

আমরা বাইরে থেকে যতই ঔষধ-পত্র ব্যবহার করি না কেন, এক বার সর্দ্দি হ'লে পরে তার নিজের সময় (Period) তা সে নেবেই নেবে। এর মধ্যে কোনও ওষুধই কাজ দেয় না। ওষুধ দিলে এই হয় যে, এই periodটা শেষ হলে সুস্থ হতে দেরী হয় না।

সর্দ্দি থেকে বাঁচতে হ'লে কি করা উচিত?

ভিটামিন A (Vitamin A) বলে একটা পদার্থ আছে। এই ভিটামিনের বিষয় তোমরা ভবিষ্যতে ভাল করে জানতে পারবে। আমাদের পুষ্টির জন্যে এই ভিটামিন এ (Vitamin A)-র অত্যন্ত প্রয়োজন। দেখা গিয়েছে যে, জন্তু-জানোয়ারদের খাবারে এই Vitamin A-র অভাব থাকলে মানুষের সর্দ্দি হলে যে সব লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাদেরও সেই রকম লক্ষণ প্রকাশ পায়। তাই আমরা যা খাই, তাতে Vitamin A-র পরিমাণ যথেষ্ট পরিমাণে থাকা দরকার। যাদের সর্দ্দি হয়েছে তাদের ছোঁয়াচ একেবারে বর্জ্জন করা অবশ্য প্রয়োজন। তা ছাড়া ছোট ঘরে ভিড় জমিয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকা উচিত নয়। পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সূর্য্যের আলো শরীরে লাগান উচিত। এমন ঘরে থাকা উচিত যেখানে বায়ু চলাচলের পথ উন্মুক্ত। প্রত্যহ উপযুক্ত রকমের ব্যায়াম অভ্যাস করা উচিত এবং সব শেষে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা ও আমাদের আচরণ সম্বন্ধে একটা উচ্চ আদর্শ রাখা উচিত।

রাসায়নিক ক্রিয়া কা'কে বলে?

পৃথিবীতে কত রকমের জিনিষ আছে, তার সংখ্যা নেই। এই সব জিনিষের আবার অনবরত পরিবর্ত্তন হচ্ছে। বর্ষাকালে পুকুর-ভরা যে জল ছিল গ্রীষ্মকাল আসতে আসতে তা সব বাষ্প হয়ে উড়ে গেল। জঙ্গলের গাছ শুকিয়ে জ্বালানী কাঠ হ'ল, আর মানুষে তাকে পুড়িয়ে ধুঁয়া আর ছাই করে দিল। আজ দেখলাম, এক টুকরা লোহা বেশ চকচক্ করছে, সাত দিন যেতে না যেতেই মরচে পড়ে ময়লা হয়ে গেল। এইরূপ পরিবর্ত্তন নিয়েই জগৎ।

এই যে চিরন্তন পরিবর্ত্তন, মানুষ তাকে দেখে দেখে, তার বিষয় আলোচনা ক'রে, ভেবে, চিন্তা ক'রে দেখতে পেল যে, সব রকমের পরিবর্ত্তনকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। মনে কর, এক খণ্ড লোহার টুকরা তোমার কাছে আছে। একে গরম করলেই দেখতে পাবে যে, এ বড় হয়ে যায়। কিন্তু যেই আবার ঠাণ্ডা হয় ফিরে আবার আগেকার মতই

ছোট হয়ে পড়ে। অতএব পণ্ডিতেরা স্থির করলেন যে, যে সব পরিবর্ত্তন তার ঘটবার কারণটাকে সরিয়ে নিলে আবার নিজের অবস্থায় আপনিই চলে আসে, সে হ'ল এক রকমের পরিবর্ত্তন। এই রকম পরিবর্ত্তনে যে জিনিষটা পরিবর্ত্তিত হচ্ছে তার আকার এবং অবস্থারই পরিবর্ত্তন হয় মাত্র—জিনিষটার কিছু হয় না। লোহাকে গরম করলে লোহাই থাকে—সোনা কি রূপায় পরিণত হয় না।

আর এক রকম পরিবর্ত্তন হয় যেখানে পরিবর্ত্তনের দ্বারা নূতন জিনিষ তৈরী হয়ে পড়ে। ঐ লোহার টুকরাটাকে যদি তুমি অম্লজান (oxygen) গ্যাসের মধ্যে রেখে উত্তপ্ত করতে, তাহলে সে আর লোহা থাকত না। লালচে রঙের একটা জিনিষ তৈরী হত যাকে সাধারণতঃ লোহার মরিচা নাম দেওয়া হয়। লোহার মরিচার গুণ লোহাতে নেই। এ অবস্থায় লোহা অম্লজানের সঙ্গে মিশে গিয়ে এই নূতন পদার্থটা তৈরী হয়ে উঠল। এই রকম পরিবর্ত্তনের নাম পণ্ডিতেরা রাসায়নিক পরিবর্ত্তন দিয়েছেন।

রাসায়নিক পরিবর্ত্তন হ'লে সে ক্ষেত্রে দুই বা ততোধিক জিনিষ সংযোগে বা বিয়োগে কোনও নূতন জিনিষের উদ্ভব হয়ে থাকে। "শিশু-ভারতীর" যে শাদাপাতাটা তুমি দেখছ তা তিনটে জিনিষের এক সঙ্গে রাসায়নিক পরিবর্ত্তনের ফলে তৈরী হয়েছে। এ তিনটি হ'ল আর্দ্রজান (Hydrogen), অম্লজান (Oxygen), আর অঙ্গার (Carbon)। প্রথম দুটো গ্যাস। আর শেষেরটা কঠিন জিনিষ হলেও তার রঙ যে কি তা বোধ হয় ব'লে দিতে হবে না।

কিন্তু এই দুই রকমের পরিবর্ত্তনকে যদি একটা স্পষ্ট সীমা-রেখা দিয়ে ভাগ করতে যাওয়া যায়, তা হ'লে কিন্তু ব্যাপার কঠিন হ'য়ে দাঁড়ায়। রেডিয়ম ব'লে একটা জিনিষ আছে—এ নিজে নিজেই অনবরত পরিবর্ত্তিত হচ্ছে আর অনবরত নূতন জিনিষ তা থেকে তৈরী হচ্ছে। এর পরিবর্ত্তন কিন্তু রাসয়নিক পরিবর্ত্তন নয়। অতএব এই সব সূক্ষ্ম ব্যাপারের মধ্যে আপাততঃ না যাওয়াই ভাল।

আমাদের ঘুম পায় কেন ?

ঘুমটা খুবই একটা আরামের জিনিষ, তা'তে সন্দেহ নেই। কিন্তু সময়ে অসময়ে আমাদের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও ঘুম পায় না। এ যে আমাদের সত্যিকারের বিপদে ফেলবার চেষ্টা করে, তা আমরা সবাই জানি। এই মনে কর না কেন, মাষ্টার মশাই সকাল বেলা ২০টা বুদ্ধির অঙ্ক কষে রাখতে দিয়ে গেলেন, বা ইতিহাসের বইএর পাঁচটা পাতা দেখিয়ে বলে গেলেন যে, কালকেই এর সবটা কণ্ঠস্থ চাই। আর যদি একটা অঙ্ক বা পাঁচটা পাতার একটা শব্দও ভুল হয়, তবে দেখবে কেমন মজা! তারপর সন্ধ্যাবেলা আলো জ্বেলে ব'সে পাঁচটা অঙ্ক শুদ্ধ হ'তে না হ'তেই বা দেড়টা পাতা পড়া কণ্ঠস্থ হ'তে না হ'তেই যখন হাতের কলম অজানাভাবে হাত থেকে খসে পড়ে বা ইতিহাসের বইএর লেখাগুলো একাকার হ'য়ে কোথায় মিলিয়ে যায়, আর, একটু পরেই যখন মা এসে বলেন, "আয়, খাবি আয় দশটা বাজে যে।" তখন পরের দিনের মাষ্টার মশাই-এর রুদ্র মূর্ত্তির কথা স্মরণ ক'রে ঘুমকে 'আপাত মধুর ও পরিণামে পরিতাপের' পর্য্যায়ে ফেলতে ফেলতে বলতে ইচ্ছা করে নাকি "ঘুম পায় কেন ?"

উপরি উক্ত আরও কঠিন বিপদে আমাদের ফেলা সত্ত্বেও ঘুম যে আমাদের বাস্তবিকই খুব উপকারী, তাতে সন্দেহ নাই। জাগ্রত অবস্থায় আমাদের শরীর অনবরতঃ কাজ করতে করতে ক্লান্তি বোধ করে। ঘুম সেই ক্লান্তি থেকে শরীরকে মুক্তি দেয়। শুধু তাই নয়, ঘুম আমাদের শরীরকে নূতন করে আরও খানিকটা সময় কাজ করবার শক্তি এনে দেয়। ঘুমন্ত অবস্থা আমাদের জীবনীশক্তির সঞ্চয়ের অবস্থা—বৃদ্ধির অবস্থা। তাই চিকিৎসকেরা বলেন যে, রোগীর পক্ষে ঘুমের মত আর ঔষধ নেই। দেখা গেছে একদিন উপবাস করলে শরীর যত না শীর্ণ হয়, তার চেয়ে বেশী শীর্ণ হয় এক রাত না ঘুমুলে।

কিন্তু ঘুমের উপকারিতা বা উপযোগিতা সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা বা জ্ঞান যত উঁচুই হ'ক না কেন, তা থেকে আমরা তন্দ্রাগ্রস্ত কেমন ক'রে হই, তার কোনও সমাধান হয় না। তা ছাড়া দেখা গেছে যে, আমাদের মেরুদণ্ডের ঘুম নেই আর আমাদের মস্তিষ্কেরও কোনও কোনও অংশ অতি সামান্য তন্দ্রার ভাব পায় মাত্র। তারপর আমাদের বুকের ভিতর যে, হৃদ্‌পিণ্ডটা অক্লান্তভাবে ধুক্ ধুক্ ক'রে যাচ্ছে, তার বিশ্রাম যেদিন হবে, তখন থেকেই তার চির-বিশ্রাম, তারপর তার আর চলবার সুযোগ থাকবে না। অর্থাৎ, এই সব উদাহরণ দিয়ে তোমাদের এই কথাটা বলতে চাই যে, যখন আমরা ঘুমুই, তখনও

আমাদের শরীর ঘুমায় না। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস চলতেই থাকে আর যে সব দুষ্পাচ্য জিনিষ খেয়ে রাত্রিতে ঘুমুতে যাই, ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের পাকস্থলীর তাকে পরিপাক করে ফেলতে কোনও অসুবিধা হয় না। তাহলে কথা এই দাঁড়ায় যে, আমাদের শরীরের সমস্ত ক্রিয়া যদি অবিশ্রান্তভাবে চলতে পারে, তাহলে আমাদের অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় অনেক অল্প পরিশ্রম করে যে মগজ, তার কি জন্য ২৪ ঘণ্টায় অন্ততঃ একবার দীর্ঘ বিশ্রামের প্রয়োজন হয়। মানুষের কথা ছেড়ে দিলে দেখতে পাওয়া যায়, ইতর প্রাণীদের মধ্যে অনেকের মোটেই ঘুমের দরকার হয় না, এমন কি কেউ কেউ বিশ্রামও করে না। তাই সব দিক দিয়ে বিচার ক'রে বলতে হ'লে এই কথাই বলতে হয় যে, "ঘুম কেন পায়"—এ প্রশ্নের সত্যিকারের উত্তর আমরা জানি না। তবু বৈজ্ঞানিকেরা নানা দিক চিন্তা ক'রে যতটুকু সিদ্ধান্ত করতে পেরেছেন, তা জেনে রাখা বোধ হয় ভাল। সে কথাই তোমাদের বলছি।

তোমরা সবাই বোধ হয় এটা লক্ষ্য করেছ যে, যে দিনটায় খুব খেলা-ধুলো হৈ-চৈ ক'রে ক্লান্ত হয়ে পড়ি সেদিন সন্ধ্যা হতে না হতেই ঘুমে চোখ ভারি হয়ে আসে। তাই এই কথাটা বোধ হয় বলা চলে পরিশ্রান্ত হবার সঙ্গে ঘুমের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। খুব পরিশ্রম করবার সময় স্নায়ুগুলির ক্রিয়া দ্রুততর হয়ে উঠে ব'লে কতকগুলি বিষ (Toxin) শরীরে জন্মায়। এই বিষগুলি একত্র হ'তে হ'তে শেষ পর্য্যন্ত এত বেশী হ'য়ে পড়ে যে, স্নায়ুকেন্দ্র (Nerve centre)-গুলির যে স্তর বা ভাগ আমাদের সজ্ঞান বা জাগ্রত অবস্থাকে সঠিক অবস্থায় রাখে, এ তাদের চেপে রাখতে বা শুব্ধ ক'রে ফেলতে চায়। ঘুমের সময়, বিশেষ ক'রে ঘুমের প্রথম অবস্থায় এই বিষগুলো শরীর থেকে অন্তর্দ্ধান করে। তাই জেগে উঠলে আমরা আবার চাঙ্গা হয়ে উঠি। এই বিষগুলো আমাদের শরীরে থাকলে আমাদের জেগে থাকা দুরূহ হয়ে ওঠে। তাদের অবশ্য কেউ চোখে দেখতে পায় না। তবে এ দেখতে পাওয়া গেছে যে, খুব পরিশ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে চাচ্ছে এমন একটা জন্তুর শরীর থেকে রক্ত নিয়ে যদি এমন আর একটা জন্তু, যার মধ্যে ঘুমের কোনও চিহ্ন তখন নেই, তার শরীরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, তবে এই দ্বিতীয় জন্তুটিও তৎক্ষণাৎ ঘুমিয়ে পড়ে। শরীর পরিশ্রান্ত বা ক্লান্ত হ'লে আমাদের মাথার স্বাভাবিক রক্ত চলাচলের ক্রিয়া কমে আসে, অন্য পক্ষে গভীর ঘুমের সময় দেখতে পাওয়া গেছে, মাথার মধ্যে এই রক্তের চলাচল হওয়া অনেক পরিমাণে বেড়ে গেছে। এই ব্যাপার থেকে এই মনে হয় যে, স্নায়ুমণ্ডলীর অত্যধিক ক্রিয়ার ফলে মাথার মধ্যে যে বিষগুলো জমা হচ্ছিল, ঘুমের সময় মাথার মধ্যে বেশী বেশী রক্ত গিয়ে সেগুলোকে পরিষ্কার হয়ে যেতে সাহায্য করল।

তা যাই হ'ক না কেন, ঘুম সম্বন্ধে সবচেয়ে প্রধান কথা এই যে, সাধারণতঃ অব্যাহত ভাবে আমাদের যে জাগ্রত অবস্থাটা বর্ত্তমান রয়েছে, তা থেকে যে জন্যই হ'ক না কেন, অব্যাহত ভাবে আর থাকতে পারছে না। দুইটা জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্ত্তী এই যে অবস্থা, যাকে বোধ হয় আমরা সুপ্তাবস্থা বলতে পারি, আর যার সম্বন্ধে আমাদের নিজেদের কোনও জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়, সে অবস্থাটায় আমরা আমাদের জীবনের অনেক সময় অতিবাহিত করি। হিসেব করলে দেখতে পাওয়া যায় যে, আমাদের জীবনের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ সময় আমরা ঘুমিয়েই কাটাই। তাই বলে এতে লজ্জার কোনও কারণ নেই। যতদূর দেখতে পাওয়া গেছে, বুদ্ধিমান প্রাণীদেরই ঘুমের দরকার হয়। যে সব প্রাণীর বুদ্ধিবৃত্তি খুব উন্নত নয়, তারা ঘুমের ধার ধারে না। গিনিপিগ্-এর মস্তিষ্কের পরিমাণ নামমাত্র। গিনিপিগ্ তোমরা নিশ্চয়ই কেউ কেউ পুষেছ, লক্ষ্য করে দেখো, তারা কখনও ঘুমায় কি? অথচ ঘোড়া বা কুকুরের মত যথেষ্ট বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণীরা সুবিধা পেলেই ঘুমিয়ে পড়ে। তাই ঘুমকে বুদ্ধিবৃত্তির উপর কর (Tax)-স্বরূপ বলা যেতে পারে।

তাই ব'লে সময়ে অসময়ে ইচ্ছায় বা ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে সব ঘুম তোমাদের পায়, তাকে খুব বুদ্ধিবৃত্তির পরিচায়ক বলে প্রচার করতে যেন যেও না। এ করতে গেলে শুধু যে অতি-বুদ্ধির পরিচয় দেওয়া হবে, তাই নয়, এ মনোভাব নিয়ে অযথা ঘুমকে প্রশ্রয় দিলে তোমাদের মূল্যবান্ সময় যা নষ্ট হবে, তার আর পূরণ হবে না। আমাদের জীবন কাজ করবার জন্যে—ঘুম সেই কাজকে সাহায্য করবে বলেই জীবন সৃষ্টি ক'রে নিয়েছে। তাই অভ্যাস এমন করা উচিত যে, ঘুম আমাদের কাজকে সাহায্যই করবে—তার কখনও অন্তরায় হ'য়ে দাঁড়াবে না।